যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

স্থিতি-প্রকরণ।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক
মূল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ

প্রকাশক

জি, পি, বসু

শ্যামপুকুর ২নং, অভয়চরণ ঘোষের লেন, রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট,

কলিকাতা

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত

নূতন সংস্করণ।

দি গ্রেট ইষ্টারণ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,—৪৩, গ্রে ষ্ট্রীট।

শ্রীলক্ষ্মনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ সাল।

স্থিতি-প্রকরণের সূচীপত্র।

বিষয়	সর্গ	পত্রাঙ্ক।

স্থিতি-প্রকরণ-সূচীপত্র সমাপ্ত।

——:•:——

ওঁ তৎসৎ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ।

স্থিতি-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ইতঃপূর্ব্বে উৎপত্তি-প্রকরণ বর্ণন করিয়াছি। অনন্তর স্থিতি-প্রকরণ শ্রবণ কর। এই স্থিতি-প্রকরণ বিদিত হইলে নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করা যায়।

হে রাঘব! এই যে পরিদৃশ্যমান জগৎ, ইহার উৎপত্তি যেমন মিথ্যা, ইহার স্থিতিও তেমনি মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়; সুতরাং এই যে জগদ্-ভিধেয় চিত্ত ও তদ্বিকার অহঙ্কার প্রভৃতি, উহাদিগকে বস্তুস্বরূপ বলিয়া না বুঝিয়া ভ্রান্তিমাত্র—কাজেই অসৎ বলিয়াই বিদিত হইবে। কোন রঞ্জন-কর্ত্তা নাই বা শ্বেতপীতাদি কোন রঞ্জন-দ্রব্যও নাই; তথাপি কখন কখন গগনপটে যেমন বিবিধ রঙ্গ-রঞ্জিত চিত্র দৃষ্ট হয়, জানিবে—জগৎও অবিকল সেইরূপই। ইহার কোন স্রষ্টা নাই, অথচ ইহা দেখিতে পাওয়া যায়; সুতরাং এ জগৎ নিদ্রা-বিরহিত স্বপ্নদর্শনের ন্যায়ই প্রতিভাত। একটা কোন নগর নির্ম্মাণ করিবার পূর্ব্বেই নির্ম্মাণকর্ত্তার অন্তরে যেমন সেই ভবিষ্যৎ নগর নির্ম্মিত হইয়া বিরাজ করে, এই যে বিশ্ব দেখিতেছ, ইহার নির্ম্মাণও সেইরূপই একটা কল্পনামাত্র। লোহিতাভ গুঞ্জাফলগুচ্ছ কিম্বা গৈরিকাদি মৃত্তিকাস্তূপ, ইহারা অবশ্য অনল নহে; কিন্তু তাহা না হইলেও মর্কটগণ দূর হইতে উহাদিগকে দেখিয়া অনল জ্ঞানে যেমন আপনাদের

শৈত্য-ক্লেশ অপনয়ন করে, তেমনি এই বাহ্য জগৎ যদিও অলীক বা অকিঞ্চিৎ বটে, তথাপি অজ্ঞ জনের নিকট ইহা বস্তুরূপে বিবেচিত হইয়া সুখ-দুঃখাদি অর্থ-সাধক হয়। জলমধ্যে আবর্ত্ত দেখা যায়, ঐ আবর্ত্ত নিশ্চয়ই জল হইতে পৃথক্ বস্তু নয়; কিন্তু তাহা না হইলেও উহা যেমন বিভিন্ন বস্তু বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি এই যে বিশ্ব দেখা যাইতেছে, ইহাও ব্রহ্ম হইতে যদিও অভিন্ন, তথাপি বিভিন্নাকারে স্ফুরিত হইতেছে। অজ্ঞ লোকে এই বিশ্বকে গগনগত সৌর তেজের ন্যায় শূন্য হইতে পৃথক্ কোন একটা বাস্তব পদার্থ বলিয়া মনে করে, বস্তুতঃ কিন্তু এ বিশ্ব, আকাশে দৃশ্যমান রত্নরাজির প্রভাপুঞ্জ ও গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় নিতান্তই ভিত্তি-বিহীনরূপে অবলোকিত হইতেছে। মৃগতৃষ্ণিকায় জলের ন্যায় এ বিশ্ব যদিও অসত্য বস্তু, তথাপি সত্যবৎ প্রতীত এবং কল্পনাকার অলীক নগরের ন্যায় অনুভূত। বস্তুতঃ কবি-কল্পিত শৈলাদির ন্যায় দৃশ্য জগতের অস্তিত্ব কোথাও নাই; উহা সারবান্‌রূপে প্রতীয়মান হইলেও স্বপ্নদৃষ্ট অচলের ন্যায় নিতান্তই নিঃসার। সুতরাং এ বিশ্ব অসত্য বৈ আর কি? উহা শূন্যমাত্র হইয়াও ভূতাকাশের ন্যায় বিরাজমান। উহাকে ধ্বংস করিতে যাও, কিছুতেই পারা যাইবে না। উহা অবিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত এবং শরদভ্রের ন্যায় সমীপবর্ত্তী অথচ অস্থির। নভোমণ্ডলের নীলিমার ন্যায় উহা দৃশ্যমান হইলেও অকিঞ্চিৎ বা কিছুই নহে। স্বপ্নকালীন স্ত্রীসংসর্গের ন্যায় উহা অনর্থক হইলেও অর্থনিষ্ঠ। কুসুম-সমুদ্ভাসিত বিচিত্র উদ্যানের ন্যায় উহা বিরস হইলেও সরসবৎ প্রতীয়মান। চিত্রিত অর্ক ও অনলের ন্যায় প্রকাশমান হইলেও নিস্তেজের ন্যায় অবস্থিত এবং মনঃকল্পিত মিথ্যা রাজ্যের ন্যায় অবাস্তব। চিত্র-নিহিত কমলাকরের ন্যায় এ বিশ্বে কিছুমাত্র সার বা সৌরভ্য নাই। ঐ যে নানাবর্ণ-রঞ্জিত ইন্দ্রধনু গগনপটে সমুদিত হয়, যাহার গগনব্যাপী আয়তনের ইয়ত্তা করা অসম্ভব, উহারই ন্যায় অবিকল এই বিশ্ব বিরাজমান। জানিও—ইহা অসার জড় কদলীস্তম্ভের ন্যায় কল্পিত; যত কিছু ভূতবর্গ, তৎসকল কোমল পল্লবের ন্যায় বিরাজিত এবং ভ্রান্তিময় কল্পনাতেই তাহারা বিশুষ্ক। প্রগাঢ় অন্ধকারপুঞ্জের অভ্যন্তরে নেত্ররোগ-গ্রস্ত লোকের চক্ষে যেমন নানাবিধ চক্রচিত্র

অবলোকিত হয়, এই বিশ্ব তেমনি একান্ত অবস্তু হইলেও প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান। জানিবে—জলগত বুদ্বুদাবলীর ন্যায় ইহা অন্তঃশূন্য ও সুবিস্তৃত-রূপে প্রতিভাত। আপততঃ রসাত্মক বলিয়া বোধ হয় বটে, বস্তুতঃ কিন্তু ইহা নীরসরূপে প্রতীত। ইহা বস্তুগত্যা অবিচ্ছিন্ন; উহার ক্ষয়োদয় কোন কালেই নাই। সুবিস্তৃত নীহারমালা গ্রহণ করিলেও যেমন কিছুই নহে বলিয়া বোধ হয়, জানিও—এই বিশ্বপ্রপঞ্চ তথাবিধ অসদ্বস্তু বৈ আর কিছুই নয়। এই দৃশ্য বিশ্ব কাহারও মতে জড়াত্মক, কাহারও মতে জড় শূন্যাস্পদ, কাহারও মতে কেবল মাত্র শূন্য এবং কাহার কাহারও বা মতে পরমাণুবৎ প্রতিভাত। যদিও ইহা শূন্যমাত্র ও ভূত-বিহীন হউক, তথাপি 'আমি এক প্রকার প্রাণী' এবম্বিধ জ্ঞানহেতুই ইহা প্রকাশমান। ইহা গৃহ্যমাণ হউক, তথাপি অসৎস্বরূপ বেতালের ন্যায় ইহার অলীকত্ব নিশ্চিত।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! অঙ্কুর যেমন অদৃশ্যভাবে বীজে অব-স্থান করিয়া সমুৎপন্ন হয়, তেমনি মহাপ্রলয় উপস্থিত হইলে এই দৃশ্য বিশ্ব পরমাত্মায় অবস্থান করত পুনরায় সমুদিত হইয়া থাকে; এইরূপই ঋষিবাক্য শ্রবণ করিয়াছি। কিন্তু এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, বিশ্ব যদি প্রকৃতই সত্তাশূন্য হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত ঋষিবাক্যের সঙ্গতি হয় কিরূপে? তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন; আর এক কথা—যাঁহারা ঐরূপ নিশ্চয় করিয়াছেন, তাঁহা-দিগকে কি অজ্ঞ বলিয়া বুঝিব? অথবা তাঁহারা যাহা স্থির করিয়াছেন, তাহাই যথার্থ? হে ব্রহ্মন্! মদীয় সংশয়-নিরাসের জন্য আপনি আমায় ঐ বিষয়টী যথাযথরূপে বলিয়া দিন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! বীজে অঙ্কুরের ন্যায় মহাপ্রলয়ে এই দৃশ্য জগৎ পরমাত্মায় বিরাজ করে, এই কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা একা-ন্তই অজ্ঞ; আমার মতে তাঁহাদের বালকত্ব এখনও অপগত হয় নাই। যাহা হউক, তাঁহাদের ঐ প্রকার উক্তি যে কতদূর অসঙ্গত ও অলীক, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। জানিও—ঐ প্রকার ধারণা বক্তা ও শ্রোতা উভ-য়েরই মোহজনক। বীজে যেমন অঙ্কুর থাকে, পরব্রহ্মে তেমনি এই জগৎ অবস্থান করে, এরূপ বুদ্ধি প্রকৃতই অসৎ। অজ্ঞদিগের প্রলাপার্থই ঐরূপ

দৃঢ় বুদ্ধি ঘটিয়া থাকে; ঐ প্রকার বুদ্ধিকে কেন অসৎ বলা হয়, বলিতেছি শ্রবণ কর। দেখ, বীজ হইল দৃশ্য বস্তু, তাহা হইতে যে অঙ্কুর-পত্রাদির উদ্গম হয়, তাহাও দৃশ্য হইয়া থাকে; সুতরাং বীজ ও অঙ্কুর এই উভয় পদার্থই ইন্দ্রিয়গোচর হয়; কাজেই ধান্যাদি বীজকে পত্রাঙ্কুরাদি কার্য্যের কারণ বলিয়া অনুভব করা যাইতে পারে। পরন্তু যিনি চিত্তাদি ইন্দ্রিয়বর্গের গোচর নহেন, যাঁহার কোনই কারণ নাই, যিনি সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম, স্বয়ম্ভূ, তিনি এই দৃশ্য জগতের বীজ হইবেন কিরূপে? তাঁহাকে বীজ বলিয়া কল্পনা করা একান্তই অযৌক্তিক। বস্তুতঃ পরমাত্মা যিনি, তিনি আকাশ হইতেও সূক্ষ্মতর; কোনরূপ আখ্যাই তাঁহার নাই—সুতরাং তথাবিধ পরমাত্মার বীজত্ব সম্ভব কোনরূপেই হইতে পারে না। সেই অদ্বিতীয় পরমাত্মা এতই সূক্ষ্মতম যে, তিনি অসদাভাস বলিয়াই তাঁহাকে একরূপ অসদ্‌বস্তু বলিলেও বলিতে পারা যায়; সুতরাং কিরূপে তাঁহাতে বীজত্ব থাকিতে পারে? বীজতা অপ্রমাণিত হইলে অঙ্কুরের সম্ভাবনাই বা কোথায়? আরও ভাবিয়া দেখ, যে পরমপদ আকাশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, স্বচ্ছ ও শূন্য, তাঁহাতে কিরূপে সুমেরু, সাগর ও গগনাদি যাবতীয় জগৎ অবস্থান করিবে? ফলতঃ এমন কোন বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, যাহা সেই পরমপদ পরমাত্মায় অবস্থান করিতে পারে? ঐরূপ অবস্থান যদিও সম্ভব হয়, তাহা হইলে সেই বিদ্যমান বস্তু কি নিমিত্ত না দৃষ্টিগোচর হয়? অতএব বুঝিতে হইবে, পরমাত্মায় কিছুই বিদ্যমান নাই, ফলতঃ কোথা হইতে কিরূপেই বা কি আসিয়া উপস্থিত হইবে? বল দেখি, শূন্যময় ঘটাকাশ হইতে কবে কোথায় কিরূপ পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে? আরও দেখ, আতপে ছায়াস্থিতির ন্যায় কোন বিরুদ্ধ পদার্থে কোন প্রকার বিরুদ্ধ পদার্থ অবস্থিত হইতে পারে কি? কোথায় বল দেখি, তেজ ও তিমিরের ন্যায় ভাব ও অভাব পদার্থের সামানাধিকরণ্য বিদ্যমান? বট-বীজাদি সাকার পদার্থ, তাহাতে অঙ্কুরের অস্তিত্ব আছে, এ কথা যুক্তি-সিদ্ধ; কিন্তু ব্রহ্ম নিরাকার, তাঁহাতে যে মহাকার জগৎ অবস্থিত, ইহা একবারেই অযৌক্তিক। ঘট-পটাদি যাবতীয় বস্তু বুদ্ধ্যাদি নিখিল ইন্দ্রিয়-শক্তিতেই দৃষ্ট হয়, দেশান্তরে আবার ঐ ঘট-পটাদিই যখন বিভিন্ন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে এবং ব্যক্তিবিশেষের দৃষ্টিতেও যখন সে প্রকার প্রতীতির

অভাব হয় না, তখন উহা যে কিছুই নহে, ইহা সত্যই উক্ত হইয়াছে। যাঁহারা ব্রহ্মকেই জগৎ-কার্য্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাঁহাদের বুদ্ধিও নিতান্তই বিমূঢ় ; কেননা, এমন স্বীয় সহকারী কারণাদি কি কি আছে, যাহাদের দ্বারা তাঁহা হইতে জগৎকার্য্য সমুদিত হইয়াছে। অতএব এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই বুঝিতে হইবে যে, তাঁহারা কার্য্য-কারণ ভাব দূরে ফেলিয়াই স্ব স্ব দুর্ব্বুদ্ধিবলে ঐ প্রকার কল্পনা করিয়া থাকেন। এতাবতা এই কথাই নিশ্চিত যে, একমাত্র তিনিই সত্য ; তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, মধ্য নাই। এই যে নিখিল জগৎ দেখিতেছ, এই সমস্ত জগৎই তিনি ; জানিও—তিনি ব্যতীত অন্য কিছুই অবস্থিত নাই।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! যাঁহারা জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞ, তাঁহাদের মধ্যে তুমি প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছ ; তাই তোমায় বলিতেছি, এই যে জগৎ দেখিতেছ, যদি প্রলয়কালেই ইহার সত্তা স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে তাহা দোষাবহ হইয়া থাকে। দেখ, যিনি সর্ব্বাতীত মহাচিদাকাশ নির্ম্মল ব্রহ্ম, তাঁহাতে যদি জগতের আদ্য অঙ্কুর অবস্থিত থাকে, তাহা হইলে বলিতে পার কি যে, এমন কোন্ সহকারী কারণ আছে, যাহাতে সেই অঙ্কুর প্ররূঢ় হইয়া থাকে ? ফলতঃ বন্ধ্যা নারীর কন্যার ন্যায় সহকারী কারণের অভাবে কেহই কখন ঐ অঙ্কুরোদ্গম দৃষ্টিগোচর করে নাই। যদি চ সহকারী কারণের অসদ্ভাবেও রজ্জু-ভুজঙ্গাদির ন্যায় এই জগৎ আপনা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে ত এইরূপ ধারণা করাই উচিত যে, একই মূল কারণ ভ্রান্তিবৈভবে জগদাকার দৃষ্ট হইতেছে ; অর্থাৎ বাস্তবিক জগৎসৃষ্টি নাই। ভাবিয়া দেখ, যখন সৃষ্টির আদিতেও ব্রহ্মচৈতন্যই নিরাকার পরমাত্মায় তৎ-স্বরূপে অর্থাৎ আপনাতে আপনি

বিরাজ করেন, তখন আর জন্য ও জনকক্রম রহিল কোথায়? বলিতে পার, ক্ষিতিপ্রভৃতি পঞ্চভূত বা কোন না কোন পদার্থ, সহকারী কারণ হইয়া সৃষ্টি-ব্যাপারে সহায়তা করে; কিন্তু এরূপ বলিলে বলিব, ঐ ক্ষিতি প্রভৃতি সহকারী কারণ সকল, সৃষ্টির পূর্ব্বেই বা কিরূপে উৎপন্ন হইল? সুতরাং দেখা যায়, এ বিষয়ে অন্যান্যাশ্রয় দোষ অনিবার্য্য। অতএব এ জগৎ প্রলয়ে প্রকৃতি-পুরুষে বিলীনভাবে থাকিয়া পুনরায় চিত্ত হইতে প্রসার প্রাপ্ত হয়, এবম্প্রকার উক্তি বালকের মুখেই শোভা পায়, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত জন এমন কথা বলেন না।

হে রাঘব! এই জন্যই তোমায় বলিতেছি যে, এই নদী-নদ-নগাদিময় দৃশ্য জগৎ কোনকালেই ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না। তবে দৃশ্য জ্ঞান কোথা হইতে আইসে? ইহার উত্তরে বলিব, চিদাকাশই কেবল পরমাত্মাতে এবম্বিধ ভ্রান্তিমূলক জ্ঞান উদ্ভাবন করে। এ জগতের যখন এতাদৃশ অত্যন্তাভাব বিদ্যমান, তখন এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই যে ব্রহ্মস্বরূপ, তৎপক্ষে আর সংশয় আছে কি? মনে কর, ঈদৃশ জ্ঞান হইবার পূর্ব্বকালে যদি ঘটাদি বস্তু মুদ্গরাদির আঘাতে চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, তাহা হইলে 'উহারা তখন অন্য কোন এক প্রকার বস্তু, উহাদিগকে ঘটাদি বলা যায় না' এইরূপ অভাব জ্ঞান-নিবন্ধন ঐ ঘটাদি যে বিলয় পাইবে, সেরূপ বিলয়কে যথার্থ বিলয় বলা চলে না; কেননা, চিত্ত মধ্যে তখনও সেই ঘটাদির প্রতীতি হইয়া থাকে। সুতরাং তখন এইমাত্র হয় যে, উল্লিখিত ঘটাদির চক্ষুরাদি-ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যতাই বিলয় পাইয়া যায়; প্রকৃত পক্ষে সেই সেই ঘটাদি বস্তুর বিলয় ঘটে না। তবে কথা এই, যদি বাসনাদি বীজের সহিত উহার বিলয় ঘটে, তবেই উহার আত্যন্তিক উচ্ছেদরূপ অত্যন্তাভাব হইতে পারে, আর তাহা যদি নাই হয়, তখন চিত্ত হইতে উহা অন্তর্হিত না হইলেই বা কিরূপে উহার যথাযথ দৃশ্যতা তিরোহিত হইবে? ফলে তাহা কোন প্রকারে সম্ভব নহে। দৃশ্য জগতের অত্যন্তাভাব সর্ব্বথা এইরূপেই হয়। ভববন্ধন ছিন্ন করিবার পক্ষে এবম্বিধ যুক্তি ব্যতীত অন্য কোনই যুক্তি নাই। ব্রহ্ম ব্যতীত অপর দৃশ্য জগতের যে অস্তিত্ব আছে, ইহা কেবল চিদাকাশের জ্ঞান বৈ আর কিছুই নয়। প্রকৃত পক্ষে দেখা যাইবে, এ জগৎ

কিছুই নহে। 'এই আমি, আমি উহা নহি'-এবম্বিধ জাগদ্ব্যবহার বিচিত্র উপন্যাস ঘটনার ন্যায় অলীকরূপেই প্রতিভাত। এই সাগর, এই পৃথ্বী, এই অগ্নি, এই বর্ষ, এই মাস, এই কল্প, এই ক্ষণ, এই জনন-মরণ, এই কল্পান্ত-সংরম্ভ, এই মহাকল্পান্ত, এই সেই সৃষ্টিপ্রারম্ভ, এই ঈদৃশ শ্রুতিপুরাণাদি-সিদ্ধ আকাশাদির সৃষ্টিক্রম, কলাসমূহের ঈদৃশ লক্ষণ সকল, এবম্প্রকার কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা, এই সকল আগত, পুনরায় এই সকল অতীত, এই সকল জ্যোতিষ্ক, এই এই দেশ, কাল, কথা, ইত্যাদি যে কিছু—সকলই সেই একাদ্বয় অনন্ত অনাবৃত পরমাকাশরূপে প্রতিভাত। সেই শান্ত পরমাকাশ পূর্ব্বেও যেমন, বর্ত্তমানেও তেমনি এবং পরেও সেইরূপে বিরাজিত। বর্ণিত বিচিত্র কথা ন্যায় ঐ মহাচিদাকাশই উল্লিখিত সমস্তরূপে আপনাতে আপনি স্ফুরিত হইতেছেন। যেমন নভোমণ্ডল-বিস্তৃত সৌরালোকে অগণিত পরমাণু-পুঞ্জের ভেদ ও ভ্রমণ লক্ষিত হয়, তেমনি মহাচিৎ পরমাকাশেও এই অনন্ত কোটী জগদ্ব্রহ্মাণ্ড প্রতীত হইয়া থাকে। এই চিৎ-সমুল্লসিত অন্তশ্চমৎকার প্রতিভাসের রূপ নাই, আধার নাই, তথাপি উহা সৃষ্টিরূপে প্রতিভাত হইতেছে। অর্থাৎ মনঃপরিচ্ছিন্ন-চিৎ আপন অন্তর্গত এই জগৎকে আপনিই যেন বমন করিতেছে। নেত্রদোষ-প্রযুক্ত স্ফটিক-শিলার অভ্যন্তরে যেমন বিবিধ রেখা অচলভাবে বিরাজমান বলিয়া প্রতীত হয়, পরন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ সকল যেমন স্ফটিক বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এই নিখিল জগৎও পরব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। উহার কখন উদয় বা বিলয় নাই, এবং কোন স্থান হইতে উহা সমাগত বা কুত্রাপি প্রতিগত হয় না। নিরাকার নভঃপ্রদেশে যেমন নিরাকৃতি নভঃখণ্ড নিরীক্ষিত হয়, তেমনি অবিদ্যাবলে পরমাত্মাতে এই সৃষ্টিব্যাপার আপনা হইতেই পরিস্ফুরিত হইতেছে। যেমন জলে তারল্য, পবনে স্পন্দনস্বভাব, সমুদ্রে আবর্ত্ত এবং সগুণ পদার্থে গুণরাজি বিরাজিত, তেমনি এই উদয়াস্তময় সুবিশাল অনন্ত বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডই সেই উদয়াস্ত-বিরহিত সুবিস্তৃত নিরবচ্ছিন্ন বিজ্ঞান-ঘন সুবিমল পরব্রহ্মেই অধিষ্ঠিত বলিয়া প্রতিভাত। সহকারী কারণাদির অভাব থাকিলেও জগৎ যে শূন্যপ্রায় প্রকৃতি হইতে সম্ভূত এবং সেই অনাদি ব্রহ্মই যে জগৎস্বরূপে

[illegible], ইত্যাদিরূপ [illegible] প্রলাপ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হে রঘুনন্দন! তাই তোমাকে বলিতেছি, তুমি চিরদিনের তরে অবিদ্যারূপিণী দীর্ঘ নিদ্রা এবং সেই নিদ্রা-জনিত বিবিধ পদার্থের কল্পনা-রূপ কলকতুল্য স্বপ্ন-সকল দূরে পরিহার কর, পশ্চাৎ প্রবুদ্ধ হইয়া বিকল্প-ময়ী শয্যা হইতে উত্থান-পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানরূপ ভূষণ দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ-সম্প্রদায়ের সমিতি সমলঙ্কৃত করত জনন-মরণ-ভীতি হইতে পরিত্রাণ লাভ কর।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! মহাপ্রলয়ের অবসান হইলে পর-মাত্মা হইতে সৃষ্টির প্রারম্ভে স্মৃত্যাত্মা বা স্মৃতিস্বরূপ প্রজাপতি সর্ব্বাগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়া বিশ্ব সৃষ্টি বিস্তার করেন; সুতরাং আমি মনে করি, এই বিশ্বও তদীয় মনঃসঙ্কল্প-জনিত বলিয়া স্মৃতাত্মা বা স্মৃতিস্বরূপ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুবংশ-ধুরন্ধর! তুমি যে বলিতেছ, মহা-প্রলয়ের অবসানে সৃষ্টির আদিতে সর্ব্বাগ্রে স্মৃত্যাত্মা বা স্মৃতিস্বরূপ প্রজা-পতি প্রাদুর্ভূত হয়েন; সুতরাং এই জগৎও তদীয় সঙ্কল্পাত্মক বলিয়া স্মৃত্যাত্মা। তোমার এ কথা যে অসত্য, তাহা নহে। এই জগৎ সৃষ্টির আদিতে প্রজাপতির সঙ্কল্পনগর-স্বরূপ বিরাজিত হয়; পরন্তু আকাশে যেমন বিশাল বিটপীর অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই, তেমনি পরমাত্মার জন্ম নাই বলিয়া সৃষ্টির আদিতে কোনরূপেই তাঁহার স্মৃতি সম্ভাবনা হইতে পারে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! সুষুপ্তির পর জাগ্রদবস্থা ঘটিলে পুনরায় যেমন পূর্ব্বস্মৃতি আসিয়া সমুদিত হয়, সৃষ্টির আদিতে মনোময় প্রজাপতির পূর্ব্ব-স্মৃতি কি তাদৃশরূপে প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না? মহা-প্রলয়রূপ সম্মোহ প্রযুক্ত প্রাক্তন স্মৃতি বিলুপ্ত হইবে কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ব্রহ্মা প্রভৃতি যে সকল প্রাজ্ঞ মহাপুরুষ পূর্ব্ব পূর্ব্ব

মহাকল্পে নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছেন, তিনজনই তাঁহারা অস্মরণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং হে সুব্রত! বল দেখি, পূর্ব্বতন স্মৃতির কর্ত্তা কেহ থাকিতে পারে কি? যিনি স্মৃতিকর্ত্তা, তাঁহার যদি মুক্তি ঘটে, তাহা হইলে স্মৃতির বিলয়ও অবশ্যম্ভাবী। বস্তুতঃ স্মরণকর্ত্তা না থাকিলে, কোথাও কোনরূপে স্মৃতি সমুদিত হইতে পারে কি? এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মহাকল্পকালে সকলকেই একরূপ নির্ব্বাণপদে বিলীন হইতে হয়। যদি তাহাই সত্য হয়, তবে কিরূপে স্মৃতি রহিবে বল? অতএব হে রাঘব! তুমি যে জগৎস্থিতিকে হিরণ্যগর্ভের স্মৃতিরূপিণী বলিয়া ধারণা করিতেছ, উহা বাস্তবিক স্মৃতিও নহে। কেন না, যাহা জগৎস্থিতি, তাহাও চিৎপ্রভা বা ব্রহ্মের স্ফুরণভেদ। উহাই অনাদি অনন্ত প্রকাশমান সম্বিৎ ও স্বয়ম্ভূরূপে সেই জ্ঞানাতীত ও জ্ঞানগম্য চিদাকাশেই এই জগদাকারে বিরাজ করিতেছে। যাহা অনাদিকাল হইতে প্রবহমাণ নিত্য নিয়মিত ব্রহ্মসত্ত্বা বা স্ফূর্ত্তি, উহাই বিরাজ নামক আতিবাহিক সূক্ষ্মদেহ বলিয়া ব্যাখ্যাত এবং উহাই ব্রহ্মাণ্ডবপুর উপাদানস্বরূপ। এই যে দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্য এবং রাত্রি ও দিবস-ক্রমে সমন্বিত শৈল-জলদ-কানন-সমাকুল ত্রিভুবন দেখিতেছ, ইহা সেই একমাত্র চিদণুতেই প্রকাশমান। আবার ব্রহ্মাণ্ড-পরমাণুর অভ্যন্তরেও তথাবিধ অগণিত ব্রহ্মাণ্ডময় পরমাণু আছে এবং তদভ্যন্তরেও যে তাদৃশ কত শত জগৎপরমাণু বিরাজ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; এইরূপেই গিরি-নদী-সমাকুল অন্যান্য অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড-বিস্তার পাইতেছে। হে রাম! ঐ সকল জগৎপরমাণু তথাবিধ আকার-সম্পন্ন হইয়া সমবলোকিত হইলেও বাস্তবিক কিছুই নহে; উহারা পর-ব্রহ্মেরই প্রকাশ মাত্র।

হে অনঘ! এইরূপে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদিগের সৎস্বরূপ ব্রহ্মময় দৃষ্টি এবং যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ, তাহাদের অসৎ জগদ্দৃষ্টি, এই উভয়বিধ দৃষ্টিতেই জগৎ অনন্তরূপেই পরম অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়। উক্ত উভয় দর্শকের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট একমাত্র নির্ব্বিকার অবিনশ্বর ব্রহ্মই অনুভূয়মান এবং যাহারা অতত্ত্বজ্ঞ, তাহাদিগের দৃষ্টিতে এই বিশাল বাহ্য জগৎই দেদীপ্যমান। যেমন প্রতি পরমাণুতে পরমাণুতে অন্যান্য সহস্র সহস্র কোটি কোটি পর-

মাণুপুঞ্জ প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং স্তম্ভখচিত পুত্তলিকারও প্রতি অঙ্গে অঙ্গে আরও কত পুত্তলিকা ও সেই সকল পুত্তলিকারও ক্রোড়ে আরও অনেক পুত্তলিকা পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি এই ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরেও অনন্ত ত্রৈলোক্য-পুত্তলিকা বিরাজ করিতেছে। যেমন পর্ব্বতের অভ্যন্তর-গত পরমাণুপুঞ্জ অভিন্নভাবে অবস্থিত হইয়াও সংখ্যাতীত, তেমনি ব্রহ্ম-স্বরূপ মহামেরুর মধ্যেও অভিন্নাবস্থান অনন্ত ত্রৈলোক্য-পরমাণু বিরাজ-মান। সূর্য্যাদির রশ্মিজাল বিস্তৃত হইলে, তন্মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরমাণু পরিদৃষ্ট হয়, ঐ পরমাণুপুঞ্জের সংখ্যা করা যেমন কোন মতেই সম্ভব হয় না, তেমনি চিদাদিত্যের অভ্যন্তর ভাগেও যে সমস্ত ত্রৈলোক্য-পরমাণু প্রকাশ পাইতেছে, তাহাদেরও গণনা করা অসম্ভব। সৌরালোক, সলিল ও রজোরাজির অভ্যন্তরে যেমন নিরন্তর অসংখ্য পরমাণু ভ্রমণ করিতেছে, চিদা-কাশের অভ্যন্তরেও সেইরূপ অনবরত অনন্ত ত্রৈলোক্য-পরমাণু ভ্রমমাণ হইতেছে। এই ভূতাকাশ শূন্যমাত্র, তথাপি ইহা যেমন বস্তুবিশেষরূপে প্রতীত হয়, তেমনি ঐ চিদাকাশও সৃষ্টবস্তুরূপে অনুভূত হইতেছে। উহা সৃষ্টিভাবে বুঝিলে সৃষ্ট, এবং ব্রহ্মভাবে ভাবিলে ব্রহ্ম; কিন্তু সৃষ্টিভাবে বিদিত হইলে অধোগতি অনিবার্য্য, আর ব্রহ্ম শব্দার্থে জ্ঞান করিতে পারিলে তাদৃশ জ্ঞাতার কল্যাণ লাভ নিশ্চিত।

রামচন্দ্র! যিনি বিজ্ঞানাত্মা, যিনি বিশ্বের শাস্তা, যিনি বিশ্বের বীজ, যিনি বিজ্ঞানময় জীবোপাধি গ্রহণ করেন, যিনি পূর্ণ ও সতত একরূপ, যাঁহা হইতে যাবতীয় ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত, অন্তরে জ্ঞানোদয় হইবামাত্র যিনি বিশুদ্ধ চিন্মাত্ররূপে উপলব্ধ, যাঁহার স্বরূপ চিদাকাশমাত্র হইলেও যিনি পরিদৃশ্যমান অনন্ত জগদাকারে বিরাজমান, সেই একমাত্র বেদ্যবস্তু পরব্রহ্মকেই বিদিত হইতে যত্নপরায়ণ হওয়া কর্ত্তব্য।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩॥

চতুর্থ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! একমাত্র ইন্দ্রিয়বিজয়রূপ সেতুর সাহায্যেই এই অপার ভব-পারাবার পার হওয়া যায়; নতুবা এমন আর কোন কর্ম্মই নাই, যাহার দ্বারা উহা সাধিত হইতে পারে। শাস্ত্র-বাক্যের আলোচনা ও সাধু পুরুষের সঙ্গ লাভ করিবার ফলে যিনি বিবেকী ও জিতেন্দ্রিয় হয়েন, এই দৃশ্য বিশ্ব তাঁহারই নিকট চিরদিনের তরে বিলয় পাইয়া যায়। এ বিশ্বের অত্যন্তাভাব তিনিই বুঝিতে পারেন। হে প্রিয়দর্শনগণেরঅগ্রণী! এই সংসার-সাগর-লহরী যেরূপে আসিতেছে ও যাইতেছে, আমি তাহার স্বরূপাখ্যান সকলই তোমায় বলিলাম, এসম্বন্ধে আর অধিক বলিব কি? এ কথা নিশ্চয় জানিয়া রাখিও যে, একমাত্র মনই কর্ম্ম-বিটপীর অঙ্কুর; যদি সেই মনের উচ্ছেদ সাধন করিতে পারা যায়, তাহা হইলেই এই বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্ম-দেহময়, সংসারবিটপী অনায়াসেই উন্মূলিত হইতে পারে। হে রাম! এ জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, একমাত্র মনই সে সকলের নিদান; সুতরাং মনোব্যাধির চিকিৎসা করিতে পারিলেই এই জগদাড়ম্বরময় নিখিল রোগের চিকিৎসা ও প্রশমন হইয়া থাকে। মনের সঙ্কল্পই নিখিল ক্রিয়ায় সমর্থ; এবং তাহাই জগতে বিভিন্ন দেহাকারে উৎপন্ন। ফলতঃ মন ব্যতিরেকে কেহ কোথাও দেহ দেখিয়াছে কি? দৃশ্য বস্তুনিচয়ের অত্যন্তাভাব-জ্ঞান না হইলে, যাউক না শত শত কল্পকাল—তথাপি মনোরূপ পিশাচ প্রশমিত হইবার নহে। মনোরূপ-ব্যাধির চিকিৎসা করিবার পক্ষে দৃশ্যবস্তুসমূহের অত্যন্তাভাব-বোধই পরমোত্তম মহৌষধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। মনই মোহ বিধান করে, এবং মনই জন্মে ও মরে। মনই আপনার কল্পনাপ্রসাদে বদ্ধ হয়, এবং পুনরায় জ্ঞানপ্রভাবে মুক্তি পাইয়া থাকে। যেমন সুবিস্তৃত গগন মধ্যে শূন্যময় গন্ধর্ব্বনগর প্রতিভাত হয়, তেমনি মনন-মূর্চ্ছিত মনোমধ্যেই এই বিপুল জগৎ স্ফুরিত হইতেছে। পুষ্পগুচ্ছে যেমন সৌরভ, তেমনি এই বিশাল বিস্তৃত জগৎ একমাত্র মনেতেই স্ফুরিত ও অবস্থিত। তথাপি মন হইতে জগৎ যেন প্রকৃতই ভিন্নবস্তু

বলিয়া প্রতীত। তিলে তৈল, গুণীতে গুণ, ধর্ম্মীতে ধর্ম্ম, রবিতে রশ্মিমালা, তেজে প্রকাশ, অগ্নিতে উষ্ণতা, শিশিরে শৈত্য, আকাশে শূন্যতা এবং বায়ুতে চাঞ্চল্য, ইহারা যেমন অভিন্নভাবে অবস্থিত, তেমনি মনেই এ জগৎ বিরাজিত। অতএব নিখিল জগৎ একমাত্র মনই এবং সমগ্র জগতই মন। জগৎ ও মন উভয়েই পরস্পর অভিন্নভাবে বিরাজমান। উভয়ের বিশেষত্ব এই, মনের যদি উচ্ছেদ ঘটে, তাহা হইলে জগৎ যেমন উচ্ছেদ প্রাপ্ত হয়, জগতের উচ্ছেদ হইলে মনের সেরূপ হয় না। অর্থাৎ জগৎ বিলুপ্ত হইলেও মনের বিলোপ ঘটে না; মন থাকিয়া যায়।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনার অবিদিত কোন ধর্ম্মই নাই এবং যাঁহারা ভূত ও ভবিষ্যৎ বিষয়ের পারদর্শী, তাঁহাদিগের মধ্যে আপনিই অগ্রণী। অতএব হে অনঘ! আপনি পরিস্ফুট দৃষ্টান্ত দ্বারা এই বিষয়টী আমায় বুঝাইয়া দিউন যে, এই বিশাল বিশ্বসংসার কিরূপে মনে বিকাশ পায়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পূর্ব্বে ঐন্দব বিপ্রগণের কথা কহিয়াছি; সেই ইন্দুনন্দনগণের দেহ না থাকিলেও তাঁহাদের মনে যেমন সমগ্র জগৎ স্বদৃঢ়রূপে অনুভূত হইয়াছিল, তেমনি এই জগৎ সকলের মনেই অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্বোল্লিখিত লবণ ভূপতি ইন্দ্রজাল প্রভাবে ব্যাকুলমতি হইয়াছিলেন, তাঁহার যেমন চণ্ডালত্ব প্রাপ্তি হইয়াছিল, তেমনি সর্ব্ব সাধারণের চিত্ত মধ্যেই এই ভ্রমময় জগৎ বিরাজিত। পুরাকালে ভৃগুনন্দন শুক্র বহুকাল স্বর্গসুখভোগ কামনা করেন; সেই জন্য তাঁহার স্বর্গপুরে গমন, অপ্সরা সহ সম্ভোগ, বিবিধ ভোগৈশ্বর্য্য, সংসার ব্যবহার এবং সেই নিমিত্ত জন্মান্তর প্রাপ্তিও ঘটিয়াছিল; এই যেরূপ, মনোমধ্যে জগদাবস্থানও সেইরূপই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ভৃগুনন্দন স্বর্গভোগে বাসনা করিলে কিরূপে তাঁহার স্বর্গীয় অপ্সরা সম্ভোগ ও সংসার-ব্যবহার ঘটিয়াছিল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ভৃগু ও কাল এই উভয়ের এক পুরাতন সংবাদ কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। পুরাকালে মন্দরাচলের কুসুম-সমূহ-সমুদ্ভাসিত তমালতরু-মণ্ডিত কোন এক সানুদেশে ভগবান্ ভৃগু তীব্র তপস্যায় নিরত ছিলেন। তাঁহার পুত্রের নাম শুক্র। শুক্রের তখন নবীন বয়স; তিনি তেজস্বী ও মহামতি। তাঁহার আকার পরিপূর্ণ নিশাকরের ন্যায় মধুরোজ্বল। তিনি তপোনিরত পিতার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মহর্ষি ভৃগু বহুকাল পর্য্যন্ত সেই পার্ব্বত্য অরণ্য মধ্যে সমাধিমগ্ন হইয়া রহিলেন। তৎকালে তিনি বন-শিলায় সমুৎকীর্ণ পুত্তলিকার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিলেন। শুক্র বালক, তাঁহার মনে স্বর্ণবেদিকার উপর কুসুম-শয্যায় শয়ন ও মন্দারদ্রুম-লম্বিত মনোজ্ঞ দোলায় ক্রীড়ন করিবার বাসনা জন্মিল; তাহার ফলে পারমার্থিক আত্মতত্ত্ব-দর্শন ও ইহ জগতের সত্যতা-জ্ঞান, এই উভয়রূপ সঙ্কটে পড়িয়া তিনি স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থিত ত্রিশঙ্কু নরপতির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে তদীয় পিতা মহর্ষি ভৃগু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইলেন। তখন শুক্র একদা এক নির্জ্জন স্থানে বসিয়া কিঙ্কর্ত্তব্য-বিমূঢ়ভাবে নিঃসপত্ন নরপতির ন্যায় নিশ্চলা-কারে রহিলেন। ভগবান্ মধুসূদন যেমন ক্ষীরাব্ধি হইতে কমলাকে উত্থিত হইতে দেখিয়াছিলেন, তেমনি তিনিও তখন কোন এক অপ্সরাকে আকাশ-পথে যাইতে দেখিলেন। ঐ সুরাঙ্গনার গলদেশে মন্দার-মালা দুলিতেছিল, অনিল-তরঙ্গে তদীয় মুখমণ্ডলের অলকাবলী তরঙ্গিত হইতেছিল এবং তাঁহার কণ্ঠগত মণিময় হারের ঝঙ্কাররবে তদীয় মন্থরগতি অনুমিত হইতেছিল। শুক্র বুঝিলেন, তদীয় গলবিলম্বিনী মন্দারমালার সৌরভ-সম্পদ ইতস্ততঃ বিচ্ছুরিত হওয়ায় গগন পবন আমোদিত হইতেছে। সেই সুরাঙ্গনার নয়ন দুইটী মদাবেশে ঘুরিতেছে, তাহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন লাবণ্যতরঙ্গ একটী লতিকা ঊর্দ্ধদেশে হেলিয়া দুলিয়া উঠিতেছে এবং তাহার স্নিগ্ধোজ্বল দেহ-সুধাকরের লাবণ্যময় প্রভাপটলে আকাশ-দেশ যেন সুধাময় হইয়া পড়ি-

রেছে। যেমন নিশ্চল পূর্ণ সুধাকর-দর্শনে অগাধ সাগরবারি উচ্ছলিত হইয়া উঠে, তেমনি সেই কমনীয়াকৃতি ললনাকে দেখিয়া ভৃগুনন্দনের অন্তঃকরণ এককালে আকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। অন্যদিকে সেই সুরসুন্দরীও শুক্রের মুখমণ্ডল দেখিবামাত্র পরবশ হইয়া পড়িল।

রামচন্দ্র! তৎকালে ভৃগুনন্দনের হৃদয় মন্মথশরে বিদ্ধ হইতেছিল, তিনি নিজ হৃদয়কে যথাশক্তি বাহ্য ব্যাপার হইতে নিরুদ্ধ করিয়া রাখিলেও কামিনী-বিষয়ক একাগ্রতার ফলে সমস্ত জগৎই তখন কামিনীময় বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত। ৫

ষষ্ঠ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভৃগুতনয় শুক্র তখন একাকী নিমীলিত-নয়নে সেই ললনাকে ধ্যান করিতে করিতে এইরূপ এক মনোরাজ্য কল্পনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি ভাবিলেন, এই ত সেই ব্যোমদেশস্থ ইন্দ্রালয়ে সেই সুরললনা বিরাজমানা; আমিও ত এই সেই সুরবৃন্দ-পরিবৃত স্বর্গধামে উপনীত হইয়াছি। এই ত এখানে সুকোমল মন্দার-কুসুমের মালামণ্ডিত গলিত কনক-নিষ্যন্দের ন্যায় সুন্দরাকৃতি সুরসম্প্রদায় বিরাজ করিতেছেন! এই ত সেই মধুর হাস্যবিলাসিনী হরিণনয়না কামিনীরা ইতস্ততঃ বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নীল কমলমালার সৌন্দর্য্যরাশি ছড়াইয়া দিতেছে। এই ত সেই প্রফুল্লচিত্ত মরুদ্গণ পারিজাতাদি কুসুমসমূহমালায় সমুদ্ভাসিত ও স্ব স্ব সৌম্যদেহে পরস্পর প্রতিবিম্বিত হইয়া বিশ্বরূপধর হরির ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। এইত সেই গীর্ব্বাণগণের মনোমদ মধুর সঙ্গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে। ঐ ত মধুনিকর ঐরাবতের মদজলধৌত গণ্ডস্থলের আমোদে অনুরক্ত না হইয়া দেব-কণ্ঠোত্থিত সঙ্গীতঝঙ্কার শ্রবণ করিতেছে। এই ত স্বর্গের মন্দাকিনী; এই মন্দাকিনী জলে প্রস্ফুটিত স্বর্ণবর্ণ কমলকুলের মধ্য দিয়া বিরিঞ্চিবাহন হংসগণ বিচরণ করি-

তেছে। এইত মন্দাকিনীর তটস্থিত উদ্যানে বসিয়া সুরনায়কেরা বিশ্রাম করিতেছেন। এইত সেই ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, যম ও হুতাশন প্রভৃতি লোকপালবৃন্দ স্ব স্ব দেহপ্রভায় চতুর্দ্দিকে যেন দীপ্ত অনলশিখা বিচ্ছুরিত করিতেছেন। দৈত্যেন্দ্রগণ সমরাঙ্গণে যদীয় দন্তাঘাতে বিদারিত হয় এবং সঙ্গর-ব্যাপারে যাহার মুখমণ্ডল আয়ুধাঘাতে যেন কণ্ডূয়িত হইতে থাকে, এইত সেই ইন্দ্রবাহন ঐরাবত অবস্থিত আছে। যাঁহাদিগকে ভূতল হইতে ব্যোমমণ্ডলের তারকারাজিরূপে বিরাজমান দেখা যায়, যাঁহাদের বিমান ও বপুঃপ্রভা সুপরিষ্কৃত কনককান্তির ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইতে থাকে, এই ত সেই বিমানবিহারী দেবগণ বিরাজমান। এই ত দেখিতেছি, আকাশগঙ্গার তরঙ্গ-রাজি মন্দারতরু-মালার মূলদেশ সকল ধৌত করিতেছে এবং সুমেরুশিলার তলদেশে আহত হইয়া অদূর বিরাজিত দেবগণের দেহ শীকরনিকরে আকীর্ণ করিতেছে। যেখানে সুরসুন্দরীরা দোলায় চড়িয়া অনবরত দুলিতেছে, এবং মন্দারকুসুমের মঞ্জরীপুঞ্জে যাহা পিঞ্জরাভ হইয়া উঠিয়াছে, এই ত দেবেন্দ্রের সেই উপবনবীথি দৃষ্ট হইতেছে। এই ত সেই কুন্দ ও মন্দার-কুসুমের মকরন্দবাহী সুগন্ধি সমীরণ পারিজাত-পাদপ আন্দোলিত করিয়া সুধাংশুর অংশুসমূহের ন্যায় সর্ব্বদিকে প্রসারিত হইতেছে। যেখানে লতাবধূগণ কুসুম, কেসর ও নীহারপুঞ্জ প্রহার করতঃ পরস্পর সমরলীলা অভিনয় করে, এই ত সেই নন্দনবন বিদ্যমান। এই ত সেই নারদ ও তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্বযুগল বীণার ন্যায় মধুর ঝঙ্কারে সঙ্গীত আরম্ভ করিয়াছেন; তাহা শুনিয়া সুরাঙ্গনাগণ এই ত এখানে নৃত্য করিতেছেন। এই ত সেই স্বর্গীয় পুণ্যাত্মা সকল ভূরি ভূষণে ভূষিত হইয়া ব্যোমচারী বিমানসমূহে অবস্থান করিতেছেন, বনসেবা-নিরতা বনলতাবলীর ন্যায় ঐ ত সেই সুরকামিনীরা মদনমদে মত্ত হইয়া মহেন্দ্রের সেবা করিতেছে। যাহাদের কুসুমনিচয় ইন্দ্রনীলমণির ন্যায় এবং কলিকা-গুচ্ছগুলি চিন্তামণি-প্রতিম, এই ত সেই স্বর্গীয় কল্পপাদপ সকল পক্ব ফলস্তবকে যেন উন্নতদন্ত হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে, আর এই ত এদিকে দেখিতেছি, সুরপতি দ্বিতীয় ত্রিলোক-বিধাতার ন্যায় সিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। আমি ইঁহাকে সসম্মানে অভিবাদন করি।

হে রঘুনন্দন! ভৃগুনন্দন শুক্র মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই মনঃকল্পিত আকাশদেশে দ্বিতীয় ভৃগুর ন্যায় বিবুধনাথকে নমস্কার করিলেন। অনন্তর সেই কল্পনাকলিত সুররাজ, শুক্রকে সাদরে উত্থাপিত করিয়া অর্চনা করিলেন এবং হস্তে ধরিয়া তাঁহাকে আনিয়া নিজের নিকটে বসাইলেন। পরে শক্র কহিলেন,—হে শুক্র! আপনার আগমনে স্বর্গধাম ধন্য হইল। আপনি এখানে চিরদিন বাস করুন। তখন ভৃগুনন্দন সেখানে সমুপবিষ্ট হইয়া প্রফুল্লমুখে পরিপূর্ণ নিশাকর-শোভা ধারণ করিলেন।

এইরূপে ভৃগুকুমার শতমন্যুর পার্শ্বে উপবেশন-পূর্ব্বক সমগ্র সুরগণ কর্ত্তৃক বন্দিত হইয়া দীর্ঘদিন পরম পরিতোষ প্রাপ্ত হইলেন। সেখানে তিনি এক জন প্রধান নরপতির ন্যায় ভোগ সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত॥ ৬॥

সপ্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভৃগুনন্দন এইরূপে মরণদুঃখ অনুভব না করিয়াই স্বীয় প্রভাবে সুরপুরে গমন-পূর্ব্বক আপনার পূর্ব্বভাব ভুলিয়া গেলেন। স্বর্গীয় সুখাতিশয্যে তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র শচীপতির পার্শ্বে বিশ্রাম করিয়া স্বর্গবিহার করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। অনন্তর তিনি স্বর্গীয় শোভা সন্দর্শন-পূর্ব্বক রমণীজন-বাঞ্ছিত স্বীয় সৌন্দর্য্যের বিষয় আলোচনা করত নলিনী-দর্শনার্থী সারসের ন্যায় সুরকামিনীদিগকে দেখিতে চলিলেন। ভৃগুপুত্র কিয়দ্দূর গিয়া, তাঁহার সেই দৃষ্টপূর্ব্বা কুরঙ্গ-নেত্রা ললনাকে কানন-মধ্যবর্ত্তিনী চূতলতিকার ন্যায় কামিনীগণ মধ্যে অবলোকন করিলেন।

রামচন্দ্র! তৎকালে সেই কামিনীও ভৃগুকুমারকে দেখিতে পাইয়া বিবশ হইয়া পড়িল। যেমন চন্দ্রকর স্পর্শে চন্দ্রকান্তমণি নিষ্যন্দিত হয়, তেমনি সেই মনোমোহিনী বিলাসিনীকে দেখিয়া ভার্গবের সর্ব্বাঙ্গ কামরসে

জ্বলিয়া গেল। যেমন আকাশ-বিলাসিনী চন্দ্রিকার প্রতি দ্রবীভূত চন্দ্রকান্ত-মণি আকৃষ্ট হয়, তেমনি সেই ভৃগুকুমার স্বেদ-সমাচিত-দেহে সেই কামিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। অন্যদিকে নিশাবসানে চক্রবাকের কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া চক্রবাকী যেমন প্রগাঢ় অনুরাগে উৎফুল্ল হয়, তেমনি সেই সুরাঙ্গনাও ভৃগুনন্দনের দর্শনে প্রফুল্ল হইয়া তদধীনতা প্রাপ্ত হইল। প্রভাতকালে পদ্মিনী ও প্রভাকরের যেমন শোভা হয়, সেই সুরাঙ্গনা ও শুক্রেরও তখন পরস্পর অনুরাগভরে তেমনি এক অপূর্ব্ব শোভা হইয়া উঠিল। নন্দনবন সকলকেই সর্ব্বাভীষ্ট দান করিয়া থাকে, যেন এই কারণেই সে তখন সেই সুরবালার সর্ব্বাঙ্গ বিবশ করিয়া মদনের করে সম্প্রদান করিল। নলিনীপত্রে জলধারার ন্যায় সেই কোমলাঙ্গীর সর্ব্বাঙ্গে মদনের প্রচুর শর পতিত হইতে লাগিল। এইরূপে সেই সুরললনা মন্মথ-শরে সমাহত হইয়া কাঁপিতে থাকিলে, মনে হইল যেন বিলোল-ভৃঙ্গ-বিলীন চূতমঞ্জরী মন্দমারুতে আন্দোলিত হইয়া শোভিত হইল। তৎকালে সেই হংস-সারস-গামিনী ইন্দীবর-নয়না সুরবালাকে মদনদেব প্রপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইল মত্ত মাতঙ্গ যেন কমলিনীকে দলিত করিতে লাগিল।

অনন্তর সঙ্কল্পিত ফলের ভোক্তা ভৃগুকুমার সেই সুরাঙ্গনাকে তথাবিধ অবস্থায় উপনীত দেখিয়া অন্ধকার কল্পনা করিলেন। তাহাতে সুরলোকের সেই প্রদেশ প্রগাঢ় তিমিরে সমাচ্ছন্ন হইল। মনে হইল, প্রলয়কাল রুদ্র যেন অন্ধকার কল্পনা করিবামাত্র ভূর্লোকের গভীর তিমিররাশিতে লোকালোকাচলের তটভূমি আবৃত হইয়া গেল। তখন সেই শুক্র ও সুরাঙ্গনা উভয়ে যেমন পরস্পর স্থিরভাবে অবস্থান করিতে ছিলেন, তাঁহাদের লজ্জারূপ অন্ধকারের সূর্য্যসদৃশ নিবারক তিমিরমণ্ডল নন্দনবনে সেইরূপ স্থির হইয়া রহিলে, দিনাবসানে ভূলোকবিহারী বিহঙ্গমদিগের ন্যায় সেই সুরাঙ্গনার সখীগণ সেই স্থান হইতে অন্য কোন অভীষ্ট দিকে প্রস্থান করিল। অনন্তর বারিধরের সমীপে সমযোন্মুখী ময়ূরীর ন্যায় সেই লোলাপাঙ্গী বিশালনয়না সুরবালা প্রবল মদন-ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া ভৃগুনন্দনের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং লজ্জায় নতাননা হইয়া তালীদলের ন্যায় কম্পিত কলেবর-

মধ্যস্থ পর্য্যঙ্কোপরি তাঁহার সহিত উপবেশন করিল। ভগবান্ কমলাপতি যেমন কমলার সহিত ক্ষীরোদ সাগরে অবস্থান করেন, ভৃগুকুমার তেমনি সেই সুরবালার সহিত সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। তখন মনে হইল, কমলিনী যেন ঐরাবতের বক্ষোবিলগ্না হইয়া বিরাজিত হইল।

অতঃপর সেই সুরবালা হর্ষ ও বিলাস সহকারে গদগদস্বরে প্রণয়গর্ভ মধুর বচনে বলিল,—হে বিমল বিধুবদন! এই দেখুন, অনঙ্গরাজ আমাকে অবলা পাইয়া আপনার ফুলধনু আকর্ণ আকর্ষণ করত কতই না প্রহার করিতেছেন? নাথ! আমি অবলা জন; এ সংসারে আমার কেহই পরিত্রাণকর্ত্তা নাই। আমি অতি কাতরা; আপনি আমার জীবন রক্ষা করুন। হে সাধুপুরুষ! জানিবেন, এ জগতে দীনজনকে সান্ত্বনা প্রদানই সাধুদিগের মহৎব্রত। হে মহামতে! যে সকল মূঢ়লোক প্রণয় দৃষ্টির মর্ম্ম জানিতে পারে না, তাহাদের নিকটই পবিত্র প্রণয় অবমানিত হয়; কিন্তু যাঁহারা রসজ্ঞ জন, তাঁহাদের নিকট তাহার অবমাননা কদাচ হইবার নহে। ওহে প্রিয়! ঐ যে সুধারসবর্ষী সুধাকর, যিনি জগতে অতুল আনন্দ বিতরণ করিয়া থাকেন, পরস্পর অনুরাগসূত্রে গ্রথিত দম্পতির অবিচ্ছিন্ন পবিত্র প্রেমের নিকট তাঁহাকেও পরাজিত হইতে হয়। প্রথমানুরক্ত দম্পতির সুনির্ম্মল স্নেহ যেমন পরস্পরের প্রীতিপ্রদ হয়, মনে হয়—ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্যও বুঝি হৃদয়কে তথাবিধ আনন্দিত করিতে পারে না। হে প্রাণেশ! রজনীযোগে কুমুদিনী যেমন কুমুদকান্তের করস্পর্শে প্রফুল্ল হইয়া উঠে, এই অবলাও তেমনি আপনার চরণ-স্পর্শে সমাশ্বাসিত হইয়াছে। সুধাকরের সুধারস পান করিয়া চপলা চকোরী যেমন জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়, হে সুন্দর! আমিও তেমনি আপনার স্পর্শরূপ পীযূষপানে পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি আপনার চরণ-সরোজের মধুকরী; আমাকে আপনি করকিশলয় দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া ভবদীয় স্নেহ সুধাময় হৃদয়কমলে আশ্রয় দান করুন।

রামচন্দ্র! সেই কুসুম সদৃশ কোমলাঙ্গী সুরাঙ্গনা এইরূপ কহিয়া অলির ন্যায় চঞ্চল নয়ন দুইটী ঘূর্ণিত করত সুরতরুর মঞ্জরীর ন্যায় ভৃগুনন্দনের বক্ষঃস্থলে নিপতিত হইল। অনন্তর সেই বিলাসকান্তি দম্পতি

তত্রত্য বনস্থলী মধ্যে বিহারার্থ প্রবেশ করিলেন। কোথাও বা যেন পুষ্প-পরাগময় মারুত-চালিত পদ্মিনী মধ্যে পরস্পরানুরক্ত মধুপ-মিথুন প্রবেশ করিল।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! চিত্তের বিলাসবশে বহুদিন হইতে কল্পিত এবম্বিধ প্রিয় প্রণয়ে ভার্গবের সেই সুরকামিনীসহ তৎকালীন সম্মীলন একান্তই সন্তোষ-জনক হইল। ভৃগুনন্দন নিজে দ্বিতীয় সুধাকরের ন্যায় কান্তবপুঃ; সেই সুর-বালাও পরম লাবণ্যবতী; তদুপরি মন্দারমালায় মণ্ডিতা ও সুরজনভোগ্য মদিরাপানে প্রমত্তা। সুতরাং সুযোগ্য প্রেমিক-প্রেমিকার সমাগম তখন বড়ই মধুর হইয়া উঠিল। ভৃগুকুমার সেই কামিনীর সহিত কখন মত্ত মরাল-সেবিত হেমকমল-মণ্ডিত মন্দাকিনীতটে বিহার করিতে লাগিলেন, কখন ইন্দুকলায় কলিতদেহ দেবগণ, চারণগণ ও কিন্নরগণের সহিত বিলাসভরে পারিজাত-লতালয়ে রসায়নপানে প্রবৃত্ত হইলেন; কখন সুচারু চৈত্ররথোদ্যানে ব্যগ্র বিদ্যাধরীদিগের সহিত বহুকাল বল্লী-দোলায় দুলিতে লাগিলেন; কখন মন্দরাচলকৃত বারিধি-বিলোড়নের ন্যায় শিবানুচর প্রমথগণের সহিত নন্দনবন বিলোড়িত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কখন সুমেরু শৈলগত কমলকাননে মদ-মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় নব জাত হেমলতা-জালে জটিল তটিনী-বৃন্দে উদ্‌ভ্রান্তভাবে জলকেলি করিতে লাগিলেন; কখন কৈলাসশৈলের কাননকুঞ্জে কামিনীসহ বিলাসভরে প্রমথগণের কণ্ঠোত্থিত সুন্দর সঙ্গীত শুনিয়া হরশেখর-বিহারী সুধাংশুর অংশুপুঞ্জে ধবলিত যামিনী সকল সুখে যাপন করিতে লাগিলেন; কখন গন্ধমাদন-শৈলের সমুন্নত সানুদেশে বিশ্রাম করিয়া কনকচাঁপা কমলদল দিয়া প্রণয়িনীর অলকাদাম-কবরী সুসজ্জিত করিতে লাগিলেন এবং কখন বা সে হে রাঘব!

ভার্গব সেই ভামিনীর সহিত বিচিত্র বিস্ময়কর মনোহর লোকালোকাচলের তটে তটে সহাস্য-আস্যে ক্রীড়া কৌতুকে নিরত হইলেন।

অনন্তর ভৃগুনন্দন মন্দরাচলের নিম্নভূমিতে কল্পনাময় দেবভোগ্য-ভবনে বাস করিয়া তত্রত্য হরিণ-শাবকদিগের সমভিব্যাহারে ষষ্টিবর্ষ যাপন করিলেন এবং তৎপরে বনিতার সহিত ক্ষীরসাগর-তটে উপনীত হইয়া শ্বেতদ্বীপবাসী জনসাধারণের সঙ্গে সঙ্গে সত্যযুগের অর্দ্ধকাল কাটাইয়া দিলেন। এইরূপে ভৃগুকুমার কল্পনাবলে গন্ধর্ব্বনগর ও উদ্যানাদি নির্ম্মাণ করিয়া তৎসমুদায়ের মধ্যে বিহার করতঃ অনন্ত জগদ্বিধাতা কালের ন্যায় বিহার করিতে লাগিলেন। তাহার পর ভৃগুপুত্র পুনরায় সেই হরিণাক্ষীর সহিত পরম সুখে পুরন্দরপুরে দ্বাত্রিংশৎ যুগ যাপন করিলেন।

অতঃপর পুণ্যক্ষয়-ভাবনায় পতিত হইবার ভয়ে সেই দম্পতীর দিব্য দেহ গলিত হইল; তখন ভার্গব সেই মানিনী সুরকামিনীর সহিত ভূপৃষ্ঠে পতিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে রথারোহী যোদ্ধা যেমন রথাদি বাহন-বিহীন হইয়া বিশীর্ণদেহে স্বীয় সঙ্কট অবস্থা চিন্তা করিতে করিতে নিহত হইয়া ভূপ-তিত হয়, তিনিও তেমনি বসন, ভূষণ, ও বিমান প্রভৃতি নিখিল দিব্য ভোগ্য-বস্তু হইতে বঞ্চিত হইয়া চিন্তাক্রান্ত-মনে জর্জ্জরদেহে দয়িতা সহ ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া গেলেন। তখন শিলাখণ্ডের উপর পতিত নির্ঝরের ন্যায় তাঁহাদের দেহ শতধা চূর্ণ হইয়া গেল। দেহ যেমন বিশীর্ণ হইল, অমনি তাঁহাদের বাসনময় নিরাশ্রয় চিত্ত দুইটী কুলায়বিহীন বিহগযুগের ন্যায় ব্যোমমার্গে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঐ চিত্তদ্বয় চন্দ্রমার রশ্মিমধ্যে প্রবেশ করিয়া সত্বর শিশিরাকারে পরিণত ও শালিধান্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। পরে সেই ধান্য যখন পাকিল, তখন দশার্ণদেশনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ তাহা ভক্ষণ করিলেন। শুক্রের মনোময় ধান্যই ব্রাহ্মণ কর্তৃক ভক্ষিত হইল। অনন্তর ভৃগুপুত্র সেই ব্রাহ্মণের শুক্ররূপে পরিণত হইয়া তদীয় পত্নীর গর্ভে পুত্ররূপে উৎপন্ন হইলেন। অন্যদিকে সেই সুরাঙ্গনা জনৈক মুনির শাপে হরিণীর গর্ভে হরিণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। মনস্বী ভৃগুনন্দন ব্রাহ্মণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া মুনিগণের সংসর্গগুণে তীব্র তপস্যায় নিরত হইলেন। তিনি সেই অবস্থায় সুমেরু শৈলের কাননমধ্যে এক মন্বন্তরকাল অতি-

পাতিত করিলেন। সেখানে ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত হরিণীর গর্ভে তাঁহার এক মনুষ্যাকৃতি পুত্র সন্তান উৎপন্ন হইল। আবার তিনি সুতস্নেহে সাতিশয় মোহ প্রাপ্ত হইলেন। 'আমার এই পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া কিরূপে ধন, গুণ ও দীর্ঘজীবন লাভ করিবে' নিরন্তর এইরূপ চিন্তাতেই তাঁহার সত্য পথ হইতে বিচ্যুতি ঘটিল। ধর্ম্ম-চিন্তা চলিয়া গেল; পুত্র কিরূপে ভোগ-সুখে থাকিবে, এই চিন্তাতেই তিনি আসক্ত হইলেন। ঐরূপ চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার আয়ুঃক্ষয় হইল। তখন ভুজঙ্গ কর্ত্তৃক পবন-ভক্ষণের ন্যায় মৃত্যু আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল।

রামচন্দ্র! তিনি ভোগচিন্তায় নিরত থাকিয়াই গতাসু হইয়াছিলেন; এই জন্য মদ্রদেশীয় মহীপতির পুত্ররূপে জন্মলাভ করিয়া রাজ্যভার গ্রহণ-পূর্ব্বক দীর্ঘকাল নিরুপদ্রবে রাজ্যসুখ ভোগ করিলেন। অনন্তর জরা আসিয়া তাঁহার দেহ জীর্ণ করিল, মনে হইল যেন হিমাশনিপাতে পঙ্কজদল বিশীর্ণ হইয়া গেল। পরে মরণের পূর্ব্বে অন্তরে তাঁহার তপোনুষ্ঠান-বাসনা জন্মিল; সেই বাসনার সহিত মনোহর নৃপকলেবর পরিহার করিবার পর কোন এক তাপস-কুমার হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। এইবার সেই মহামতি ভৃগুনন্দনের মায়ামোহ কাটিয়া গেল; সকল ক্লেশের অবসান হইল। তিনি মহানদী সঙ্গমার তটদেশ আশ্রয় করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তরে নানা বাসনা জন্মিয়াছিল; সেই সকল বিভিন্ন বাসনার ফলে তিনি এতাদৃশ বিভিন্ন দেহ ও বিভিন্ন দশা উপভোগ করত বৈরাগ্যোদয়ে সঙ্গমা নদীর তটদেশে বদ্ধমূল মহীরুহের ন্যায় মহাসুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত॥ ৮॥

নবম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ভার্গব শুক্র তদীয় পিতার নিকট অবস্থান করিয়া ঐরূপ কল্পনা করিতেছিলেন। কল্পনা করিতে করিতে তাঁহার বহু বৎসর অতিপাতিত হইল। অনন্তর বহুকাল পরে তদীয়

কলেবর বাতাতপ-জর্জ্জর ছিন্নমূল পাদপের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে লুণ্ঠিত হইল। হরিণগণ যেমন বন হইতে বনান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়ায় এবং চক্র-বিক্ষিপ্ত বস্তু যেমন ভ্রান্ত ও উদ্‌ভ্রান্ত হইতে থাকে, তেমনি ঐ ভৃগুকুমারের চঞ্চল-চিত্তও এতকাল ঐ পূর্ব্ববর্ণিত বিবিধ দশাসমূহে ভ্রমণ করিতেছিল; কিন্তু অধুনা সে চিত্ত ঐ সঙ্গমার তটে বিশ্রান্তি লাভ করিল। শুক্র বিদেহ হইলেন বটে, পরন্তু অনন্ত-বৃত্তান্তময়ী এবং সুদৃঢ়া হইয়াও কোমলাবৎ প্রতীয়মানা তাঁহার সেই স্মৃতিদশা অপগত হইল না। সেই ধীমান্ ভৃগুনন্দনের কলেবর মন্দর-গিরির সানুদেশে পড়িয়া রহিল এবং তাহা সৌরতাপে শুষ্ক হইয়া চর্ম্মমাত্রে অবশিষ্ট হইল। তখন তাঁহার দেহরন্ধ্র দিয়া বায়ু প্রবেশ করায় শীৎকার শব্দ সমুত্থিত হইতে লাগিল; তাহাতে মনে হইল, সেই দেহ যেন সর্ব্ব দুঃখ-ক্ষয়-নিবন্ধন সানন্দে অবিস্পষ্ট মধুর ধ্বনি সহকারে স্বীয় দুর্দ্দশার কথা গান করিতে লাগিল এবং শরতের পয়োদপঙ্‌ক্তির ন্যায় শুভ্র দন্তরাজি বিকসিত করত ভবভূমির ভোগাশারূপ শুষ্ক পল্বলে অনবরত বিলুণ্ঠিত স্বীয় মনকে যেন উপহাস করিতে লাগিল। তাঁহার মুখমণ্ডল অরণ্যস্বরূপ এবং চক্ষুরাদির রন্ধ্রগুলি সেই অরণ্যস্থ জীর্ণ কূপের ন্যায় প্রতিভাত; মনে হইল, উহারা যেন বিবেকীদিগকে প্রত্যক্ষরূপে জগতের স্বতঃসিদ্ধ শূন্যতা দেখাইতে লাগিল। সেই শুক্র-দেহ যখন দিবসকরের প্রখর করে উত্তপ্ত হইয়া অনন্তর বর্ষার বারিধারায় সিক্ত হইতে লাগিল, তখন সকলেই ভাবিল, যেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব ক্লেশরাশির কথা স্মরণ করিয়া সেই দেহ বাষ্পবারি বর্ষণ করিতেছে। সেই দেহ কখন প্রবল বায়ুবেগে বনস্থলীতে বিলুণ্ঠিত হইতেছিল, কখন বর্ষায় বারিধারায় ক্লিন্ন হইতেছিল, কখন কখন গিরিনদীর তটদেশে বর্ষার নির্ঝর-নিপতিত ধাতুরাগে রঞ্জিত হইতেছিল, কখন কখন আপনার দুষ্কৃতরূপ পবনচালিত ধূলিজালে ধূসরিত হইতেছিল এবং কখন কখন বা বায়ুবেগে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় সর্ব্বদিকে সঞ্চালিত হইয়া এক প্রকার অস্ফুট-ধ্বনি করিতেছিল, তাহাতে মনে হইতে লাগিল, যেন প্রচণ্ড পবনের চীৎকারময় যমভূমিতে [illegible] ভূত-ভয়ঙ্করী শুষ্ক শিরাজালমালিনী [illegible] তপোনুষ্ঠানে নিরতা রহিয়াছে।

হে রাম! ভৃগু মুনির তপঃপ্রভাবের তদীয় আশ্রমস্থ সমস্ত প্রাণীই রাগদ্বেষ-বিহীন ছিল; সেই জন্য বন্য পশুপক্ষীরা ঐ শুক্রদেহ ভক্ষণ করিল না। এইরূপে ভার্গব শুক্রের শরীর সুপতিত হইলে, তাঁহার চিত্ত যম-নিয়মবশে কৃশীকৃত হইয়া সেখানে তপোনুষ্ঠানে নিরত হইল এবং তাহার সেই পাঞ্চভৌতিক দেহ পবনবশে অপনীত-শোণিত হইয়া বিশাল শিলাতলে বহুকাল ঐরূপে লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।

নবম সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! অনন্তর দেব-পরিমিত সহস্র বৎসর অতীত হইলে ভগবান্ ভৃগু পরমাত্মার সাক্ষাৎকারক সমাধি হইতে বিরত হইলেন। তাঁহার তনয় শুক্র মূর্ত্তিমান্-পুণ্যরাশি ও গুণগণ-সেনার সেনাপতিস্বরূপ ছিলেন। ভৃগু সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া তাঁহার সেই বিনয়াবনত পুত্রকে আর স্বীয় সম্মুখে দেখিতে পাইলেন না। তিনি দেখিলেন, মূর্ত্তিমান্ অভাগ্য ও দারিদ্র্যের ন্যায় তদীয় কঙ্কালমাত্র সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহার তাপশুষ্ক দেহের চর্ম্মরন্ধ্রের মধ্যে মধ্যে তিত্তিরি পক্ষী সকল অবস্থান করিতেছে; দর্দুরদল উহার শুষ্ক নাড়ীময় উদরগুহার ছায়াতলে বিশ্রাম করিতেছে; নেত্রগর্ত্তের অভ্যন্তর নবজাত কীটনিচয়ে পরিপূর্ণ রহিয়াছে এবং পার্শ্বপঞ্জরে কোশকার-কৃমিকুল অবস্থান করিতেছে। বিবিধ বিচিত্র সন্ধি-বন্ধনে দেহ নির্ম্মাণ করে রহিয়া ভোগবাসনা ও শরীরাভিমান উভয়ই তুল্যরূপে প্রতিভাত; সুতরাং বারিধারায় বিধৌত শুক্র-শরীরের শুষ্ক অস্থিনিচয় দেখিলে মনে হইতে লাগিল, যেন উহারা ইষ্টানিষ্টজনক জননী প্রাক্তনী ভোগবাসনা ও সুখাকাঙ্ক্ষিক অনুভব শুভ্র মসৃণ জটাকৃতি মস্তকাদি যেন কর্ণরন্ধ্রে শিশুদিগের জ্যোৎস্নোপমা শ্রবণ করিতেছিল; তদীয় সরল গ্রীবাভাগ শুষ্ক শিরাজালে বেষ্টিত ও অস্থিমাত্রে অবশিষ্ট;

উহা যেন আত্মার অশুচিবীর্যায় লজ্জিত হইয়া তদীয় দেহযষ্টিকে অধিক দীর্ঘীকৃত করিতেছে। তাঁহার নাসিকাগ্রের অস্থ্যংশ বারিধারায় গলিয়া গিয়াছে, সেই অস্থি তখন মৃণালের ন্যায় পাণ্ডুমাত্রা ধারণ করিয়াছে; দেখিলে বোধ হয়, উহা যেন শঙ্কুর ন্যায় প্রোত্ত হইয়া মুখমণ্ডলের মধ্যসীমা নির্ণয় করিতেছে। শুক্রের শুষ্ক মুখমণ্ডল কন্দর দেশ উচ্চ করিয়া রহিয়াছে; দেখিলে বোধ হয়, উহা যেন অম্বরদেশে সমুৎক্রান্ত স্বীয় প্রাণবায়ুকে নিরীক্ষণ করিতেছে। শুক্রের জঙ্ঘাদ্বয়, উরুদ্বয়, জানুদ্বয় ও দোর্দ্দণ্ডদ্বয় এই অষ্টাঙ্গ যেন দ্বিগুণ দীর্ঘ হইয়া দেহকে পরলোকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইল; পরন্তু পরলোকের দীর্ঘ পথ-পর্য্যটনের শ্রম-ভয়ে উহারা যেন ভীত হইয়া অষ্টদিকে পলায়ন করিল। সে দেহের উদর-দেশ চর্ম্মমাত্রে অবশিষ্ট, শূন্যগর্ভ এবং শুষ্ক; বোধ হইল, উহা যেন অজ্ঞানান্ধ জনগণের হৃদয়ের শূন্যতা প্রদর্শন করিতেছে। ভৃগুমুনি আরও দেখিলেন, শুক্রের দেহ শুষ্ক কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট এবং উহা যেন দুঃখরূপ মাতঙ্গের বন্ধনস্তম্ভ-স্বরূপ। তদ্দর্শনে তিনি আর পূর্ব্বাপর কিছুই বিবেচনা করিলেন না, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং সেই শুক্রশরীর দেখিবামাত্রই তাঁহার মনে এইরূপ একটা বিতর্ক উপস্থিত হইল যে 'তাই ত, এ কে? এই কি আমার পুত্র শুক্র প্রাণহীন হইয়া ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া রহিয়াছে?' এইরূপ বিতর্কের পর স্থির করিলেন, পুত্র নিশ্চিতই গতায়ু হইয়াছে। তখন পুত্রের জন্য ভৃগুমুনি অধীর হইয়া উঠিলেন; কিন্তু অবশ্যম্ভাব্য বিষয়ের জন্য কিছুমাত্রই চিন্তা করিলেন না। পুত্র অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল, এই ভাবিয়া তিনি কালের প্রতি কুপিত হইলেন।

অনন্তর কুপিত ভৃগুমুনি কালকে অভিশাপ প্রদানে উদ্যত হইলে, সর্ব্বভূত-ভক্ষক কাল নিরাকৃতি হইয়াও আধিভৌতিক দেহ ধারণপূর্ব্বক তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কালের তাৎকালিক কলেবর সমুজ্জ্বল কান্তিময়; তদীয় ভুজযুগলে খড়্গ ও পাশ এবং কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল বিরাজমান। তাঁহার উভয় পার্শ্বে ষট্‌ষট্ সংখ্যায় দ্বাদশ মাসরূপ দ্বাদশ বাহু বিদ্যমান। এতদ্ভিন্ন শরৎ হেমন্ত প্রভৃতি ছয়টী ঋতু তাঁহার ছয়টী মুখ। তদীয় শরীর-সমুত্থিত প্রদীপ্ত জ্বালামালা নভোমণ্ডল প্রকাশিত হইতেছে

মনে হইল, উহা যেন ধূম্র পলাশস্তবক-শোভিত অদ্রির শোভা ধারণ করিল। কালের করে যে ত্রিশূল অবস্থিত, তাহারই অগ্রভাগ হইতে নিঃসৃত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ অনল দেখিলে বোধ হয় দিঙ্মণ্ডল যেন কনককুণ্ডল ধারণ করিয়াছে। তাঁহার নিশ্বাস-মারুতে গিরিশৃঙ্গ সকল উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। শৈলকুল যেন দোলায় আরোহণ করিয়া চলিত, ঘূর্ণিত ও পতিত হইতে লাগিল। তদীয় খড়্গমণ্ডলের প্রভাপটলে রবিবিম্বও শ্যামবর্ণ হইয়া উঠিল, তাহাতে বোধ হইল, উহা যেন প্রলয়-দগ্ধ জগতের ধূমপুঞ্জে পর্য্যাকুল হইল।

হে মহাভুজ! ঈদৃশাকৃতি মহাকাল সেই কোপাক্রান্ত মহামুনির সমীপে আসিয়া কল্পান্তক্ষুব্ধ জলদগম্ভীর স্বরে সান্ত্বনা সহকারে কহিলেন, হে মুনে! আপনি লোকমর্য্যাদায় অভিজ্ঞ; কি পূর্ব্ব, কি অপর কোন বিষয়ই আপনার অজ্ঞাত নাই। আমরা বিলক্ষণ জানি, ভবাদৃশ উদারহৃদয় লোক মোহের হেতু সত্ত্বেও কদাচ মোহগ্রস্ত হয়েন না, আর যদি হেতু না থাকে, তাহা হইলে যে আপনাদের মোহ একেবারেই হইবার নয়, সে কথা বলাই বাহুল্য। হে সাধো! আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমরা নিয়তির দাস; নিয়তির আদেশেই আমরা পরিচালিত হই। আপনি পরম তপঃ-পরায়ণ, তদুপরি ব্রাহ্মণ, সুতরাং সকলেরই পূজার পাত্র। আমি কাল, আমারও আপনি এইজন্যই পূজনীয়। এই সকল কারণে আপনাকে বলি-তেছি, হে নষ্টবুদ্ধে! আপনি বৃথা তপঃক্ষয় করিবেন না। জানিবেন,—প্রলয়ের হুতাশনও আমাকে দগ্ধ করিতে পারে না। এ অবস্থায় আপনি আমায় অভিশাপ দিয়া কি করিবেন? আপনার শাপানলে আমার কিছুই দগ্ধ হইবে না। হে মুনে! আমরা কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-পরম্পরা গ্রাস করি-য়াছি; কত কোটি কোটি রুদ্র আমাদের কবলিত হইয়াছে, এবং কত বিষ্ণু-বৃন্দ আমরা ভক্ষণ করিয়াছি; সুতরাং কোথায় আমাদের অক্ষমতা বা অক্ষতির প্রকাশ পাইয়াছে? হে ব্রহ্মন্! আমরা ভোজনকর্ত্তা আর আপনারা ভোজ্য সামগ্রী; এ নিয়ম অবশ্য আপনার বা আমার ইচ্ছায় হয় নাই; বরং নিয়তি দেবীই এইরূপ নিয়মের প্রণয়নকর্ত্রী। ফলতঃ জগতের স্বাভাবিক মর্য্যাদা এইরূপই। একবার নিয়তির ক্ষমতা আলোচনা করিয়া দেখুন,—নিয়তিবশেই অগ্নি বায়ু ঊর্দ্ধজ্বলিত হয় ও সলিল সকল আপনা

আপনিই নিজাভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে; ভোজ্য বস্তু নিজেই আসিয়া ভোক্তার নিকট উপস্থিত হয়, এবং বিনাশকাল স্বতঃই আসিয়া উৎপন্ন বস্তুকে আক্রমণ করে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বলিতে কি, হে মুনে! এ জগতে কেহই ভক্ষক অথবা কেহই ভক্ষ্য বস্তু নহে। এই যে কিছু দেখা যায়, সকলই সেই পরমাত্মা ; পরমাত্মা ভিন্ন কোথাও কিছুই নাই। আমিও পরমাত্মা ; এ সংসারে সকলেরই আমি ভক্ষক এবং সকলেই যে আমার ভক্ষ্য বস্তু, জানিবেন—এ হেন স্বাভাবিক রূপ আমার আপনাতেই কল্পিত ; কেন না, পরমাত্মা যিনি, তিনি আপনাতেই আপনি জগদাকারে প্রকাশিত। সুতরাং তিনিই যে স্বয়ং সকল সংহার করিয়া থাকেন, এই সংহার-কার্য্য যে তাঁহারই কৃতিত্ব, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে কি? বিশুদ্ধ বিবেক-দৃষ্টি লইয়া অবলোকন করুন, নিজেই তখন বুঝিতে পারিবেন, এ বিশাল বিশ্বে কর্ত্তা বা ভোক্তা কেহই নাই ; তবে যে বহুকর্ত্তার প্রতীতি হইয়া থাকে, তাহা কেবল অজ্ঞানদুষ্ট স্বীয় দৃষ্টিরই ফল বলিতে হইবে। হে ব্রহ্মন্! অজ্ঞানরূপ অন্ধকারে যাহাদিগের দর্শনশক্তি সমাচ্ছন্ন রহে, তাহারাই কেবল অমুকে কর্ত্তা আর অমুকে কর্ত্তা নহে, এইরূপ কল্পনা করিয়া থাকে। কিন্তু যিনি সম্যক্‌দর্শী পুরুষ ; অজ্ঞানাবরণ নাই বলিয়া যাঁহার বিবেকদৃষ্টি সমুজ্জ্বল, তিনি কখনই ঐরূপ ভ্রমে পতিত হয়েন না। পাদপনিবহে পুষ্পপুঞ্জ এবং সমগ্র ভুবনে ভূতবৃন্দ আপনা হইতে উদ্‌গম হয়, এবং আপনা হইতেই বিলয় পাইয়া থাকে। কিন্তু অজ্ঞ লোক বুঝে না, তাই তাহারা উহার হেতু ও নাম কল্পনা করিতে থাকে। জলের মধ্যে চন্দ্র প্রতিবিম্ব পতিত হয়, সেই প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের গতাগতি ব্যাপারে যেমন কর্ত্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব কোনটাই সত্য নয়, অথচ কিন্তু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, জানিবেন —এই জগৎ-সৃষ্টি-ব্যাপারে কালেরও কর্ত্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব সেইরূপই ; ফলে, উহা মনেরই কেবল মিথ্যা ভ্রম। রজ্জুতে ভুজঙ্গ-ভ্রমের ন্যায় অজ্ঞ-দৃষ্টিই কেবল উল্লিখিত কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্বময়ী ভ্রান্তি উদ্ভাবন করে। তাই বলিতেছি, হে মুনে! বৃথা শোকগ্রস্ত হইয়া ক্রোধ করিবেন না ; ক্রোধ—ক্রোধ অনর্থপরম্পরারই কারণ। আপনি অন্তর্দৃষ্টিতে বিচার করিয়া দেখুন, দেখিবেন,—যাহা যেমন, তাহা তেমনিই রহিতেছে ; নিয়তিই—ব্রাহ্মণ

হয় নাই। হে তাত! আমরা লোকোত্তিকল্পিত খ্যাতি বা প্রতিপত্তির প্রত্যাশা করি না এবং কোন অভিমানেরও আমরা বশীভূত নহি। আমরা কেবল একমাত্র ব্যক্তিরই বশীভূত। সে ব্যক্তির নাম নিয়তি, আমরা স্বতঃই তাহার বাধ্য। কথা হইতে পারে, তবে আপনার সমীপে আসিলাম কেন? তাহার উত্তরে বক্তব্য—আপনার ক্রোধের ভয়ে আমি এখানে আসি নাই; কিন্তু তপস্বী জনকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হয়, এই নিয়তি বশতই আমার এখানে আগমন হইয়াছে। দেখুন, ঈশ্বরেচ্ছারূপ মহা নিয়তির বশতাপন্ন হইয়া অবান্তর প্রকৃত ব্যবহারেচ্ছারূপ নিয়তির অনুবর্তন, প্রাজ্ঞমাত্রেই করিয়া থাকেন; পরন্তু অভিমানরূপ মহাতমের অনুসরণ কেহই করেন না। যাঁহারা কার্য্যকোবিদ বা ব্যবহারজ্ঞ ব্যক্তি, নিয়ত কর্ত্তব্য-পরায়ণ হওয়াই তাঁহাদের পক্ষে সঙ্গত; সুতরাং আপনি তমোভাব আশ্রয় করিয়া কদাচ আপন কর্ত্তব্য বিনষ্ট করিবেন না। আপনার সেই জ্ঞানময়ী দৃষ্টি, সেই মহত্ত্ব এবং সেই ধৈর্য্য, এ সকল কোথায় গেল? যে পথ সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ, তাহাতেই বা আপনি মুগ্ধ হইতেছেন কেন? হে মুনে! আপনার এই বর্ত্তমান অবস্থা, আপনার কর্ম্মফলেরই পরিপাক-নিবন্ধন ঘটিয়াছে;—হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি এরূপ বিচার না করিয়া মূর্খ-জনের ন্যায় আমাকে বৃথা অভিসম্পাত করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? হে মুনে! আপনার কি ইহা জানা নাই যে, নিখিল দেহীরই দেহ দুই প্রকার; এক পঞ্চভূতময় ও অপর মনোময়। তন্মধ্যে ভৌতিক স্থূল দেহ একান্ত জড় ও ক্ষণভঙ্গুর এবং যাহা মনোময়, তাহা প্রাতিভাসিক অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দেহ; এই দেহই ক্রোধ-ভয়াদি দ্বারা নিয়ত পীড়িত হইয়া থাকে। আপনারও এই দেহ একণে রোষবশে কদর্থীকৃত হইয়াছে।

হে সাধো! চতুর সারথি দ্বারা রথ যেমন বাহিত হয়, তেমনি মনই অভিমানবশে কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় আন্তরিক ব্যাপার-প্রভাবে বাহ্য জড় দেহকে চালিত করিতে থাকে। শিশু যেমন কর্দ্দম লইয়া ক্রীড়া-পুত্তলিকা প্রস্তুত করে, মনও তেমনি ক্ষণেকের মধ্যে দেহান্তর সঙ্কল্প করিয়া পূর্ব্ব দেহ বিনাশ করিয়া ফেলে। মনই সংসারে পুরুষ-পদ-বাচ্য; সেই পুরুষ যাহা করে, তাহাকেই কৃত বলা যায়। ঐ মনঃপুরুষ কল্পনাবশতই

ভববন্ধনে আবদ্ধ হয়; আর যদি কল্পনাশূন্য হয়, তবেই উহার মুক্তি ঘটিয়া থাকে। 'এই আমার দেহ, এই সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং এই উহার মস্তক' এ সকল কেবল মনেরই বহুল বিকার বলিয়া বর্ণিত। মনই এক জীব হইতে জীবান্তর আখ্যা লাভ করিয়া থাকে। মনঃকল্পিত বিষয়ে এক-নিশ্চয়তা বশতঃ অহঙ্কার মনের অনুগমন করে এবং অহঙ্কার-জনিত অভি-মানের বশীভূত হইয়াই মন নিজেই নিজের নানাবিধাকার কল্পনা করিয়া লয়। মন দেহবাসনা হেতুই নিজের এবং অন্যের মিথ্যা পার্থিব দেহ-পর-ম্পরা পরিদর্শন করে; পরন্তু যখন সত্য বিষয় অবলোকন করে, তখন অসত্য দেহ ভাবনা পরিহার করিয়া পরম নির্বৃতি প্রাপ্ত হয়।

হে মুনে! আপনি যখন সমাধিমগ্ন ছিলেন, তখন আপনার পুত্রের মন স্বীয় মনোরথ-পথ অবলম্বনপূর্ব্বক দূর হইতে দূরান্তরে গমন করিয়া-ছিল। ভবৎপুত্র শুক্রের জীব মন্দর-কন্দরে তদীয় এই দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নীড় হইতে উড্ডীন বিহঙ্গের ন্যায় বিবুধালয়ে প্রস্থান করে। অনন্তর শুক্র মধুকর কর্ত্তৃক কমলিনী-উপভোগের ন্যায় তৎকালে কখন মন্দারকুঞ্জ-পুঞ্জে, কখন পারিজাত-তলে, কখন নন্দনোদ্যানে এবং কখন কখন বা লোক-পালদিগের রম্যপুরে, সুরসুন্দরী ঘৃতাচীকে উপভোগ করিয়া দ্বাত্রিংশৎযুগ যাপন করেন। তৎপরে তীব্র ভোগকল্পনায় রাত্রিজাত নীহারের ন্যায় তদীয় পূর্ব্বার্জ্জিত পুণ্য ক্ষয় হইল, কুসুমাবতংশ ম্লান ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল অবসাদগ্রস্ত হইল, তিনি সেই নভঃ-প্রদেশেই স্বীয় দেব-দেহ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক প্রণয়িনী ঘৃতাচীর সহিত কালপক্ক ফলের ন্যায় পতিত হইলেন এবং ভূতাকাশ প্রাপ্ত হইয়া বসুধাতলে জন্মগ্রহণ করিলেন। ভবদীয় পুত্র শুক্র অগ্রে দশার্ণ-দেশে ব্রাহ্মণ হইয়া, পরে কোশল দেশের অধিপতি হইয়া, তদনন্তর মহারণ্যে ধীবর হইয়া, তৎপরে ভাগীরথীকূলে হংস হইয়া, তৎ-পশ্চাৎ পৌণ্ড্রদেশে সূর্য্যবংশীয় নরপতি হইয়া, তাহার পর শাল্বদেশে মন্ত্রোপদেশক ব্রাহ্মণ হইয়া, তদন্তে কল্পকাল যাবৎ স্বর্গভূমে ধীমান্ শ্রীমান্ বিদ্যাধর হইয়া, পরে মদ্রদেশে মহীপতি হইয়া এবং সর্ব্বশেষে সমঙ্গা সরিৎ-তটে বাসুদেব নামক জনৈক তাপসকুমার হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। অনন্তর তিনি বাসনা বশতঃ অপরাপর বিবিধ বিচিত্র বিষম নীচ যোনিসমূহেও পরি-

ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বিন্ধ্যাচলে ও কৈকট দেশে কিরাত হইয়া জন্মিয়াছিলেন; এইরূপে সৌবীর দেশে মারুত, ত্রিগর্ত্তদেশে গর্দ্দভ, কিরাতজনপদে বংশগুল্ম, চীনদেশীয় জঙ্গলে কুরঙ্গ, তালতরুতে সরীসৃপ ও তমালবৃক্ষে বনকুক্কুট হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। আপনার এই পুত্রই পুনরায় মন্ত্রজ্ঞগণের অগ্রগণ্য ব্রাহ্মণ হইয়া, যাহার প্রভাবে বিদ্যাধরপুরে উপনীত হওয়া যায়, এবম্প্রকার এক মন্ত্র পুরাকালে জপ করিয়াছিলেন; হে ব্রহ্মন্। সেই জপসাধনার ফলে তিনি স্বর্গধামে এক প্রধান বিদ্যাধর হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার গলে হারগুচ্ছ, কর্ণে মণি-কুণ্ডল এবং ভুজযুগে কনককেয়ূর বিরাজিত ছিল। তিনি দ্বিতীয় মীনকেতনের ন্যায় ও কামিনীরূপিণী নলিনীর ভানুর ন্যায় বিদ্যাধরীগণের পরম প্রণয়াস্পদ ছিলেন। ফলতঃ তখন তাঁহাকে গন্ধর্ব্বনগরের ভূষণ বলিয়াই বোধ হইত। অনন্তর কালচক্রের পরিবর্ত্তনে তদীয় কল্পনা চরম অবস্থায় উপনীত হইল; প্রলয়-কাল আসিল। তখন কল্পাবসানে যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশাদিত্যের প্রচণ্ড ময়ূখমালায় পাবকে পতঙ্গের ন্যায় তিনি ভস্মীভূত হইয়া গেলেন। ঐ সময় কুলায়-বিরহিত বিহগীর ন্যায় তদীয় বাসনা আশ্রয়বিহীন হইয়া জগদ্বিরহিত অনন্ত ব্যোমপথে বিচরণ করিতে লাগিল। অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মরাত্রির অবসানে পুনর্ব্বার বিস্ময়াবহ সংসার-নির্ম্মাণ আরম্ভ হইল।

হে মুনে! তদনন্তর ভবদীয় পুত্রের সেই বাসনা বায়ুবেগে বিচালিত হয় এবং অধুনা এই বর্ত্তমান সত্যযুগে ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হইয়া বসুধাতলে জন্মলাভ করে। হে মুনিবর! সেই বিপ্রকুমার এক্ষণে বাসুদেব নামে পরিচিত হইতেছেন। তিনি ধীমান্‌গণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়া নিখিল বেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন।

হে মহামুনে! আপনার পুত্র এইরূপে বিবিধরূপ বিষয় বাসনার অনুসরণ করিয়া কখন খদির-করঞ্জাদি নানা তরুকোটরে, কখন জগতে নানা জঠর-যোনিতে এবং কখন কখন নিবিড়তর বনস্থলীতে পরিভ্রমণ করিয়া পরে কল্পকাল বিদ্যাধররূপে অবস্থানান্তে অধুনা গঙ্গা-সরিতের তীরদেশে তপশ্চরণে নিরত রহিয়াছেন।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

কাল কহিলেন,—হে মুনে! যেখানে উদ্দাম তরঙ্গমালার ভয়ঙ্কর ধ্বনি পরিশ্রুত ও যথায় মন্দানিল প্রবাহিত হইতেছে, সেই সঙ্গমা নদীর তীরদেশে আপনার পুত্র অধুনা তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন। তিনি মস্তকে জটাজুট ও হস্তে অক্ষবলয় ধারণ করত জিতেন্দ্রিয় হইয়া আটশত বর্ষ যাবৎ অবিচলভাবে তপোনুষ্ঠান করিতেছেন। হে মুনে! আপনি যদি সেই স্বপ্নোপম মনোভ্রম দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে সত্বর জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া অবলোকন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—সমদৃষ্টিশালী বিশ্বনিয়ন্তা কাল এই কথা কহিলে, মুনিবর ভৃগু জ্ঞাননেত্র দ্বারা পুত্রের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিবার জন্য ধ্যাননিষ্ঠ হইলেন। তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার জ্ঞানবিভা বিকাশিত হইল; তদীয় বুদ্ধিরূপ দর্পণে বিম্বিত হওয়ায় পুত্রের সমস্ত বৃত্তান্তই তিনি অবগত হইলেন।

অনন্তর ভগবান্ ভৃগু সঙ্গমা-তীর হইতে প্রত্যাগমনপূর্ব্বক কালের সমীপে মন্দরগিরির সানুস্থিত স্বীয় শরীরে প্রবেশ করিলেন। অর্থাৎ তিনি যে ধ্যানযোগে পুত্রের কার্য্য-কলাপ দেখিতে ছিলেন, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন। পরে সেই বিষয়রাগ-বিহীন মুনি, বীতরাগ কালের প্রতি বিস্ময়-বিস্ফারিত-নেত্রে দৃষ্টিপাত করত, কহিলেন,—হে ভগবন্! আপনি ভূত ও ভাবী সকল ঘটনাই বিদিত আছেন; পরন্তু হে দেব! আমাদিগের বুদ্ধি বিষয়-রাগাদিতে একান্তই মালিন্য-সম্পন্ন; এই জন্যই আমরা কিছুই সুস্পষ্ট দেখিতে পাই না। আপনাদিগের বুদ্ধি নির্ম্মল; আপনারা ভূত ও ভাবী বিষয় সকল স্পষ্টতই দেখিতে পাইতেছেন। এই জগৎ যদিও অসত্যস্বরূপ, তথাপি ইহা নানাকারে সত্যবৎ প্রতীত হইয়া বুধগণকেও মহাভ্রমে নিমগ্ন করিতেছে। হে দেব! একমাত্র মনোবৃত্তিই যে ইন্দ্রজালের ন্যায় মহামোহ উদ্ভাবন করিয়া থাকে, ইহা আপনারই বিশেষ পরিজ্ঞাত; কেন না, এই সকলই ত আপনারই অভ্যন্তরে

বিরাজিত। হে ভগবন্! আমি জানিতাম, আমার পুত্রের কল্পকাল মধ্যেও মৃত্যু নাই; অথচ তাহার মৃত্যু ঘটিল, ইহা দেখিয়াই আমি এরূপ জ্ঞানশূন্য হইয়াছিলাম। দেব! আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার পুত্র চিরজীবী হইলেও কালই স্বেচ্ছায় তাহাকে কবলিত করিল; এই ভাবিয়াই নিয়তি বশতঃ নিতান্ত তুচ্ছ হইলেও অভিসম্পাত করিবার বাসনা আমার হৃদয়ে জাগরূক হইয়াছিল। হে বিভো! ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, আমরা সংসারের প্রকৃত গতি পরিজ্ঞাত হইয়াও বিপদে বিষণ্ণ হইয়া পড়ি এবং সম্পৎ-সমাগমে আনন্দিত হইয়া থাকি। হে ভগবন্! যে জন অনিষ্ট বা অপকার করে, তাহার প্রতি ক্রোধ আর যে জন ইষ্ট বা উপকার করে, তাহার প্রতি প্রসন্নতা-প্রকাশ করা কর্ত্তব্য; ইহাই সংসারের চিরপ্রসিদ্ধ পদ্ধতি। কিন্তু হে জগদ্‌গুরো! এরূপ সংসার-রীতি চিরদিন থাকে না; যতদিন জগদ্‌ভ্রম, ততদিনই এই সংসাররীতির স্থিতিকাল। জগদ্‌ভ্রান্তি তিরোহিত না হওয়া পর্য্যন্তই ইহা কর্ত্তব্য আর ইহা অকর্ত্তব্য, এইরূপ বোধ জন্মিয়া থাকে; জাগতিক ভ্রমে পড়িয়া আমারও তাহাই হইয়াছিল। পরন্তু ভবদীয় কৃপায় আমার অধুনা তত্ত্ববোধের উদয় হইয়াছে; সুতরাং সে ভ্রম এখন আর নাই। ভ্রম নাই বলিয়াই ক্রোধ বা প্রসন্নতা এ উভয়ের কর্ত্তব্যতা-নিয়ম যে নিতান্ত হেয়, তাহা এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি। ভগবন্! আপনার বিষয় কোন চিন্তা না করিয়াই আমি যখন অজ্ঞানবশে আপনার প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়াছিলাম, তখন অবশ্যই আপনার আমি দণ্ডার্হ। আপনিই আমার পুত্রের বিবরণ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন; এইজন্য পুত্রকে আমি সঙ্গমাতটে দেখিতে পাইয়াছি। অধুনা আমার স্থির ধারণা হইল, এই মনঃকল্পিত জগতে সকল প্রাণীরই বাহ্য ও আন্তরভেদে দ্বিবিধ দেহ বিদ্যমান। তন্মধ্যে অন্তর্দেহ মনই সর্ব্বত্র গতিশীল; কেন না, উহা দ্বারাই সমস্ত জাগতিক বিষয় অনুভবগম্য হয়।

কাল কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যথার্থ কথাই কহিয়াছেন। কুম্ভকার যেমন নিজের কল্পনানুরূপ ঘট গঠন করে; এইরূপ মনোময় দেহও স্বীয় কল্পনানুসারেই বাহ্য দেহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। বালক যেমন মোহ ক্রমে কল্পনায় নূতন নূতন মিথ্যা বেতালবপুঃ গঠন করিয়া লয়, তেমনি

একমাত্র মনই ক্ষণমধ্যে কল্পনাবলে নূতন আকার নির্ম্মাণ করে ও পুনরায় তাহা বিনষ্ট করিয়া থাকে। গন্ধর্ব্ব নগরের ন্যায় অনেক অসত্য বিষয় নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম, এরূপ যথেষ্ট শক্তিই যে মনের বিদ্যমান এবং ঐ শক্তি যে ভ্রান্তি, স্বপ্ন ও মিথ্যা-জ্ঞানাদিতে প্রতিভাত, ইহা সকলেরই অনুভবগম্য। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! পুরুষের আন্তর ও বাহ্য এই যে দুইটী শরীরের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, জানিবেন,—উহা স্থূল দৃষ্টিরই কার্য্য। বাস্তবিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে দেখা যাইবে, এই যে ত্রিজগৎ, ইহা একমাত্র মনেরই কল্পনা-প্রসূত। সুতরাং ইহাকে মনের মনন ভিন্ন আর কিছুই বলা যায় না। ইহা অসৎ হইলেও সৎ ও সুবিশালরূপে প্রতীয়মান। দৃষ্টি দোষ-দুষ্ট হইলে গগনে যেমন দ্বিচন্দ্র দৃষ্ট হয়, তেমনি অজ্ঞান নিবন্ধন চিত্তদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্থির বাসনাদিতেই জগতের বিভিন্ন ভাব দেখা যায়। ঘটপটাদি যে কিছু পদার্থ, একমাত্র মনই তৎসমুদায়কে বিভিন্ন বাসনায় অবলোকন করত সর্ব্বত্রই ভিন্ন ভিন্নরূপে দেখিয়া থাকে। মন আপন ভেদ-বুদ্ধি হেতু 'আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়' ইত্যাদি ও ঐরূপ আরও নানাবিধ চিন্তা করে এবং ঐরূপ চিন্তা করিয়াই সংসারদশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যখন সে জানিতে পারে যে, মৎকৃত মনন একান্তই কাল্পনিক, কেন না, আমি ত ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই নহি; কাজেই আমারই যখন অস্তিত্ব নাই, তখন মৎকৃত মনন আবার কি? এ সকল জানিতে পারিলে মন তৎকালে মনন হইতে নিবৃত্ত হইয়া শান্ত সনাতন ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করিতে থাকে। দেখ, যাহা বহুল জলকল্লোলময়, সতত সাম্যসম্পন্ন, এবং শুদ্ধ, স্বচ্ছ, স্বাদু, শীতল, অবিনশ্বর, বিস্তীর্ণ, বারিময়, বিশাল ও প্রশান্ত, তাদৃশ মহাসাগরের একটী ক্ষুদ্র তরঙ্গ যদি স্বীয় স্বভাবানুসারে আপনার রূপের বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ মহাসাগরের সহিত নিজের ভেদবুদ্ধিজ্ঞানে নিজেই যেমন নিজেকে ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ করে, এইরূপ যদি মহাতরঙ্গও স্বীয় স্বাভাবিকতায় নিজের বিষয় চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহার যেমন ভেদবুদ্ধিবশে নিশ্চয়ই 'আমি অতি বৃহৎ' এইরূপ বোধ নিজ হইতেই জন্মিয়া থাকে, ক্ষুদ্র সাগরতরঙ্গটী যেমন নিজের পূর্ব্বোক্ত চিন্তা হেতু 'আমি অতিশয় ক্ষুদ্র, আমি পাতালে পতিত হইতে চলিয়াছি' এইরূপ মনে করিয়াই যেন জড়িমার

চিন্তা করিতে করিতে পাতাল-পতন-ভয়ে তটভূমি উদ্দেশে ধাবিত হয় ও নিমেষমাত্রে ঊর্দ্ধে উঠিয়া আপনাকে যেন উন্নত বলিয়া মনে করত তীরগত শৈলমালার রত্নকিরণে ভূষিত ও সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়, আবার কখন কখন যেমন চন্দ্রবিম্বে থাকিয়া 'আমি যেন সুশীতল হইয়াছি' বলিয়া মনে করে, কখন যেমন তীরগত গিরির দাবানলপ্রভা স্বশরীরে প্রতিবিম্বিত হইলে যেন 'দগ্ধ হইতেছি' বলিয়া জ্ঞান করতই ভীত ও নীরবে কম্পিত হইতে থাকে, কোন সময়ে যেমন তীরগত-শৈলমালার সৌন্দপ্রতিম বনতরু-নিচয় প্রতিবিম্বিত হইলে আপনাকে যেন মহারাজ্য লাভে কৃতকৃত্য বলিয়া মনে করত শোভমান হইতে থাকে এবং কদাচিৎ যেমন বায়ু-বিক্ষোভে স্বীয় চঞ্চল অবয়ব বিধ্বস্ত হইলে 'আমি খণ্ডিত হইয়া গেলাম' এইরূপ মনে করত তাৎকালিক অস্ফুট ধ্বনি ব্যপদেশে যেন রোদন করিতে থাকে, পরন্তু বস্তুগত্যা জলধির জলরাশি হইতে ঐ তরঙ্গরাজি যেমন পৃথক্ নহে; উহাদিগের যেমন কোনই ভিন্ন রূপ নাই, উহারা অসত্য হইলেও যেমন সত্যবৎ প্রতীয়মান; ক্ষুদ্রতা বা দীর্ঘতা প্রভৃতি কোন গুণই যেমন উহাদের নাই, উহারাও যেমন কোন গুণেই অধিষ্ঠিত নহে, উহারা জলধিতে অবস্থান না করিলেও তাহাতে যেমন অবস্থিত বলিয়াই বোধ হয়, কেবল স্বীয় স্বভাবস্থ ভেদ জ্ঞানি নিবন্ধন উহারা যেন রূপান্তরিত হইয়া যেমন বারম্বার উৎপন্ন ও বারম্বার নষ্ট হয়; পরন্তু পরস্পর মিলিত হইলে তখন যেমন আর উহাদের ভেদজ্ঞান থাকে না; তৎকালে সাগর ও সাগরের তরঙ্গরাজিকে যেমন একই নিরাময় জলরাশিময় বলিয়াই প্রতীতি হয়, তেমনি এই বিবিধ বিচিত্র ব্যাপার-পরম্পরান্বিত নিখিল জগৎই সেই সর্ব্বব্যাপী, শুদ্ধ, স্বচ্ছ, নিরাময়, সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, অনাদি, অনন্ত পরমাত্মাতেই তদভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ অবস্থিত বলিয়া প্রতীত হইতেছে এবং ভ্রমবশতই তথাবিধ বিবিধ অবস্থা ভোগ করিতেছে। স্বীয় শরীরস্থিত নানাবিধ শক্তিই জগতের এবম্বিধ নানা কারণ উৎপাদন করে; প্রকৃতপক্ষে কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই জলে তরঙ্গরাজির ন্যায় আপনাতেই আপনি বিলসিত হইয়া থাকেন এবং নিজেই স্ত্রী-পুরুষ প্রভৃতি কল্পিতরূপের সহায়তায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। এ জগৎ কল্পনামাত্র। কল্পনা ভিন্ন জগৎ আদৌ কোন কিছুই ছিল না, বর্ত্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও অসম্ভব। কেন না, ব্রহ্ম ও

জগৎ এ উভয়ের অণুমাত্রও পার্থক্য বিদ্যমান নাই। এই যে পরিদৃশ্যমান নিখিল জগৎ, ইহা ব্রহ্মই; ব্রহ্মই কেবল সকল। তুমি যত্নের সহিত ইহাই নিরন্তর ভাবনা কর এবং অন্য সমস্ত পরিত্যাগ কর। সত্তা সতত একরূপিণী হইলেও নানারূপে পদার্থমাত্রেই অধিষ্ঠিত রহিয়াছে; তাহার বিভিন্ন-প্রকারতা প্রকৃতপক্ষে যদিও নাই, তথাপি সেই সত্তাই পদার্থসমষ্টির অনন্ত বিভিন্নতা উৎপাদন করিয়া থাকে। জড় ও অজড় এই দ্বিবিধ পদার্থের একরূপ সত্তা কি করিয়া সম্ভবিতে পারে, এরূপ আশঙ্কার বিষয়ও কিছুই নাই; চিদাভাস জীবাত্মা যখন চিত্ত প্রাপ্ত হয়েন, তখনই চিত্তের নানারূপিণী আত্মস্বরূপা শক্তিতেই 'ইহা জড় বা ইহা জড় নয়,' ইত্যাদিরূপ বোধ সমুদিত হইয়া থাকে। নতুবা জড় ও অজড় এ উভয় কিছুই নয়। সুতরাং হে অনঘ! একমাত্র ব্রহ্মই বিবিধ প্রতিবিম্বিত বস্তুপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় নানাকারে বিস্তৃতরূপে বিলসিত হইতেছেন এবং সলিলময় সাগরে তদীয় সলিলরাশির ন্যায় একমাত্র আত্মাই আপনি আপনাতে আপনা দ্বারা নানাকারে বিহার করত নানাত্ব গ্রহণ করিতেছেন। জলরাশির বিচিত্র বীচিমালা যেমন জল ভিন্ন আর কিছুই নয়, তেমনি কল্পিত যাবতীয় পদার্থই সেই বিশ্বেশ পরমাত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া অভিহিত নহে। যেমন শাখা, পুষ্প ও কোরকাদি সমস্তই একটী মাত্র বৃক্ষবীজে অবস্থিত, তেমনি সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তি একই মাত্র ব্রহ্মে বিরাজিত। যেমন প্রখর সৌরকরে নানা বিচিত্র বর্ণ দৃষ্ট হয়, তেমনি দেবেশ ব্রহ্মেতেই সৎ ও অসন্ময়ী বিচিত্র শক্তি লক্ষিত হইয়া থাকে। যেমন একবর্ণময়ী মেঘমালা হইতে নানাবর্ণরঞ্জিত ইন্দ্রচাপ সমুদিত হয়, তেমনি সতত অবিচিত্ররূপ শিবময় পরমাত্মা হইতে এই বিচিত্ররূপ শক্তির আবির্ভাব হইতেছে। সচেতন ঊর্ণনাভ ও পুরুষ হইতে যেমন যথাক্রমে তন্তুজাল ও স্বপ্নসম্ভূত রথ ঘোটকাদি আবির্ভূত হয়, তেমনি জড়তাভাবনা হেতুই সেই অজড় আত্মা হইতে জড়তা জন্মিয়া থাকে। যেমন আপন ইচ্ছায় আপনার বন্ধন হেতু কোশকার কীট তন্তুময় কোশ প্রস্তুত করে, সেইরূপ সেই পরম শিবময় ব্রহ্মই স্বেচ্ছায় স্বীয় বন্ধনার্থ জড়চিত্তের শক্তি সকল বিস্তার করিতেছেন।

হে ব্রহ্মন্! উল্লিখিত কোশকার কীটের ন্যায় আত্মা আপন

ইচ্ছাতেই আত্মবিস্তার ভাবনা করত আপনাকে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করেন এবং আপন ইচ্ছাবশতই স্বীয় প্রকৃতিগত শরীরের বিষয় ভাবনা হইতে হ্রাসপ্রাপ্ত সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন। আত্মা যেমন যেমন ভাবনা করেন, স্বয়ং সেই সেইরূপই হইয়া থাকেন। তিনি যদিও পূর্ণ বটেন, তথাপি আপনার ভাবনারূপ শক্তিতে সত্বর পরিপূর্ণ হইয়া উঠেন। বর্ষা-কালের মহতী হিমরাজি যেমন সমগ্র গগনমণ্ডলকে ঢাকিয়া ফেলিয়া নিজেরই স্বরূপ করিয়া লয়, তেমনি সেই আত্মা যখন যেরূপ শক্তির ভাবনা করেন, সেই শক্তিই সত্বর তাঁহাকে স্বরূপতায় উপনীত করিয়া থাকে। যে কালে যে ঋতুর অভ্যুদয় হয়, তরু যেমন তৎকালে সেই ঋতুরই অধীনতা উপগত হইয়া তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি যখনই যে শক্তির অভ্যুদয় হউক, আত্মা সত্বর তন্ময়ভাব লাভ করিয়া থাকেন। * এ দিকে প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে বন্ধন-অবন্ধন বা মোক্ষ-অমোক্ষ ইহার কিছুই আত্মার নাই। এ জগতে আত্মার বন্ধ-মোক্ষ-কল্পনা কিরূপে যে উত্থিত হয়, তাহা আমার বুদ্ধির অবিষয়। বস্তুতঃ ইহা আশ্চর্য্যই বটে যে, এই মায়াময় জগৎ অবিদ্যা-সম্ভূত ভোগ্য ও ভোক্তৃতাদি বিবিধভাবে আচ্ছন্ন বলিয়া আত্মার বন্ধ-মোক্ষ যদিও নাই, তথাপি যেন বন্ধ-মোক্ষ-যুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কোশকার কীট যেমন নিজ-নির্ম্মিত তন্তুজালে নিজেই আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তেমনি সেই অখণ্ড আত্মা যখনই বিত্ত কল্পনা করেন, তখনই স্বরচিত আবরণে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। মন ও মনঃশক্তি অভিন্ন; মনের তথাবিধ শক্তিতেই নানা দেহ কল্পিত। এইরূপ কোটি কোটি মনঃশক্তি একমাত্র আত্মা হইতেই প্রতিনিয়ত নির্গত হইয়া থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় ঐ শক্তিসমষ্টি যদিও মন হইতেই জন্মে এবং মনেতেই থাকে, তথাপি পৃথগাকার বলিয়া বোধ হয় এবং চন্দ্রজাত মরীচিমালার ন্যায় উহারা মনঃসম্ভূত ও মনঃস্থিত হইলেও অন্য স্থানেও অবস্থিতরূপে প্রতীত হইয়া থাকে। সেই চিৎস্বরূপ সলিল-পরিপূর্ণ অতি বিস্তৃত [illegible] মহার্ণবে জলবিন্দুর ন্যায় সেই

সমুদয় শক্তির কোন দিক্ শক্তি ব্রহ্মা, কোন শক্তি বিষ্ণু, কোন কোন শক্তি একাদশ রুদ্র, কয়েকটি শক্তি [illegible], কতিপয় শক্তি [illegible], কোন কোন শক্তি কৃমি, কীট, পতঙ্গ, ভুজঙ্গ, গো, মশক ও অজগর প্রভৃতি, কোন

কোন শক্তি জলজন্তু, কোন কোন শক্তি পিপীলিকাপরবর্ত্তী মশমাছুর, বৃক্ষ, তৃণ, ও জম্বুকাদি এবং কেলাজাত ও ঘবঘটীয়বুদ্বুদের তরঙ্গ-তরঙ্গাদিরূপে পরিস্ফুরিত হইতেছে। এই মশসদৃশ সংসারে উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার দীর্ঘায়ু, কেহ কেহ অল্পায়ু, কাহারও কাহারও অনুভবসংস্থান বৃহৎ, কাহার কাহার তুচ্ছ, কেহ স্থির, কেহ অস্থির, কেহ কেহ সঙ্কল্প বিকল্পে বিহত হইয়া অস্থির জগতের স্থিরত্ব কল্পনায় তৎপর, কেহ কেহ অসার ভাবনাগ্রস্ত, কেহ কেহ দৈন্যদোষে আকুলিত, কেহ কেহ 'আমি কৃশ, আমি দুঃখী, আমি মূঢ়' ইত্যাদি দুঃখে অভিভূত, এতদ্ভিন্ন কেহ কেহ জগতে শত শত কল্পকাল যাবৎ স্থাবর-শৈলাদি ও সাগরাদিরূপে অবস্থিত এবং কেহ কেহ বা সুধাকরবৎ সুনির্ম্মল হইয়া পরমপদ অধিগত হইতেছে। এইরূপে ব্রহ্মরূপ মহার্ণব হইতে তদীয় বিলোল-লহরীরূপে ঐ চিৎ সম্বিৎ রূপে সমুদিত ও স্ফুরিত হইতেছে। উল্লিখিত চিৎসম্বিতেরই বাসনার ফল।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত। ১১

দ্বাদশ সর্গ।

কাল কহিলেন,—মুনিবর! সুর, অসুর নর, ইত্যাদি সকলই সেই ব্রহ্মের চিৎসম্বিৎ; উহারা ব্রহ্মার্ণব হইতে অভিন্ন। এই সিদ্ধান্তই সত্য; এতদ্ব্যতীত অন্য যে কিছু সিদ্ধান্ত, সকলই মিথ্যা। হে ব্রহ্মন্! উহারা আপন বিকল্প-কল্পনায় কলঙ্কিত হইয়া অসত্যভাবনায় 'আমরা ব্রহ্ম নহি' ইত্যাকার আন্তরিক নিশ্চয়েই অধঃপতিত হইয়া থাকে। উহারা ব্রহ্মরূপ মহাসাগরের মধ্যে থাকিয়াও সেই অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের পরিচ্ছিন্নতা কল্পনা করিয়া লয় এবং সেই জন্যই ভীষণ ভবভূমিতে অশেষ যাতনা ভোগ করিতে থাকে। দেহাত্মভাবের পুনঃপুনঃ অনুশীলনের নাম বাসনা; উহাই সমস্ত পাপ ও পুণ্য কর্ম্ম-প্রবৃত্তির বীজ। এই কর্ম্মবীজ সকল দ্বারা উল্লিখিত ব্রহ্মসম্বিৎ কলঙ্কিত হইলেও জানিবে—উহা সেই নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম উক্ত প্রকার

কিছুই নাই। হে রাম! অন্যান্য সকলের সম্বন্ধেই কর্ম্মপ্রচয়রূপ মহাত্ম্য করঞ্জ-বৃক্ষের বীজস্বরূপ। ঐ বাসনানুরূপ কর্ম্ম বশতই আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত জগতের সর্ব্বত্র প্রস্তরবৎ বিবিধ জড় দেহ সকল অবস্থিত। এই দেহসমূহ কখন বায়ুর ন্যায় স্পন্দিত হয়, কখন উল্লাস প্রকাশ করে, কখন আস্ফালন করিতে থাকে, কখন রোদন করে, কখন হাসে, কখন ম্লান হয় এবং কখন বা বিলয় পাইয়া যায়। ঐ সকল দেহীদিগের মধ্যে কেহ কেহ অতি বিশুদ্ধ,—যেমন হরি হর ইত্যাদি; কেহ কেহ অল্প মোহগ্রস্ত—যেমন সুর, নর, ও উরগাদি; কেহ কেহ নিতান্ত মোহাক্রান্ত—যেমন তরু তৃণ প্রভৃতি; কেহ কেহ বিশেষরূপ অজ্ঞানমূঢ় হইয়া কৃমি-কীটাদি দেহপ্রাপ্ত এবং কেহ কেহ ব্রহ্মরূপ মহাসাগরের অতি দূরে তুচ্ছ তৃণের ন্যায় ভাসমান, সাগরসলিলবাহিত উরগ-নগাদির ন্যায় ইহাদের কেহই ভূমিকাপ্রাপ্ত হয় নাই। কেহ কেহ মনুষ্যত্বাদি প্রাপ্ত হইয়া সৎশাস্ত্রে সংসারভ্রম-বিশ্রান্তির হেতুভূত যোগ-ভূমিকাদির বিষয় শ্রবণ করত তৎসাধনায় প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু পুনঃপুন জন্মগ্রহণ করিলেও দুরদৃষ্টরূপ দুষ্ট মূষিক তাহাদের ঐ ভূমিকা দূষিত করিয়া ইষ্টলাভে ব্যাঘাত জন্মাইয়া থাকে। কেহ কেহ হরি, হর ও ব্রহ্মা প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাম্বুধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করত—সশরীরেই তন্ময়তা উপগত হইয়া থাকেন। ব্রহ্মরূপ মহাবারিধির পারভূমি কেহই দর্শন করিতে পারে না; সুতরাং কেহ কেহ মাত্র অনেকাংশে মোহবিহীন হইয়া সমাধি দ্বারা তাঁহাকে অবলম্বন করত অনন্তকাল অবস্থান করিতেছে। কোন কোন প্রাণী কোটি কোটি বার জন্মিয়াছে; তথাপি পুনরায় সংখ্যাতীত বার জন্মদুঃখ ভোগ করিবার জন্য বিষয়ানুরাগে [illegible] হইয়া বৃথা জীবন বহন করিতেছে। [illegible] কেহ কেহ ঊর্দ্ধ হইতে অধঃপ্রদেশে পতিত হইতেছে; কেহ কেহ ঊর্দ্ধ হইতেও ঊর্দ্ধতর প্রদেশে গমন করিতেছে এবং কেহ কেহ বা অধঃস্থান হইতেও অধোভূমিতে পড়িয়া যাইতেছে।

হে মুনে! জগতে জীবসমূহের [illegible] দশা অনাদি [illegible] [illegible] নিবারণকারণ [illegible] সেই পরম পদার্থ ব্রহ্মকে ভুলিয়া গেলেই ঐরূপ দশা ঘটিয়া থাকে। আর [illegible] এক্ষণে নিশ্চিত [illegible] [illegible]

হইলেই গরুড়-স্মরণে যেমন বিষব্যথা হইতে নিষ্কৃতি লাভ হয়, তেমনি সমস্ত জ্বর-যন্ত্রণার হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

কাল কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! মহাসাগর হইতে সমুৎপন্ন ঊর্ম্মি-রাজির ন্যায় ও বৈশাখমাসীয় বিবিধ বিচিত্র বল্লীসন্ততির ন্যায় ঐ যে নানা-জাতীয় ভূতপরম্পরা বিরাজিত, উঁহাদের মধ্যে যক্ষ, গন্ধর্ব্ব ও কিন্নর প্রভৃ-তিরা জগতের পূর্ব্বাপর বিষয় সকল পর্য্যালোচনা করত মনোমোহ জয় করিয়াছেন এবং সেইজন্যই তাঁহারা জীবন্মুক্ত,—সুতরাং কৃতকৃত্য হইয়া সংসারে বিচরণ করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন স্থাবর ও জঙ্গম প্রভৃতিরা বিমূঢ়-ভাবে কাষ্ঠ ও কুড্যাদির ন্যায় অবস্থিত রহিয়াছে। অপর যাঁহারা মায়ামোহ উচ্ছেদ করিয়াছেন, তাঁহাদের আর বিচার্য্য বিষয় কি থাকিতে পারে? অর্থাৎ তাঁহাদের ত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কিছুই নাই; তাঁহারা সে সকলের অতীত হইয়াছেন। চিশুদ্ধচেতা প্রাণিগণ যাহাতে আত্মসিদ্ধি লাভ করিতে পারে, তাহারই জন্য ঐ সকল আত্মতত্ত্বজ্ঞ সাধুপুরুষেরা অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন; এ সংসারে সেই সকল শাস্ত্রই অধুনা জ্ঞানপথের প্রদর্শক। ফলে, শাস্ত্র-প্রণয়ন করিয়া অজ্ঞদিগের উদ্ধার সাধনার্থই ঐ সকল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের দেহধারণের প্রয়োজন। দুষ্কৃতরাশি পরিক্ষীণ হইলে যাঁহাদের অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ বা সম্প্রবুদ্ধ হয়, উল্লিখিত শাস্ত্রসমূহের সমালোচনায় তাঁহাদিগেরই বিমল জ্ঞানজ্যোতিঃ বিকাশ পাইয়া থাকে। দিনমণি গগনে সমুদিত হইলে নৈশ অন্ধকারপুঞ্জ যেমন এককালে অপসারিত হইয়া যায়, সৎশাস্ত্রের বিচারণায় মনের মোহও তেমনি বিলীন হইয়া থাকে। যদি মনোমোহ না বিলয় পায়, তাহা হইলে সিদ্ধিলাভ ত দূরের কথা, উত্তরোত্তর অধিক মোহেই আচ্ছন্ন হইতে হয়। মোহ তখন নীহারের ন্যায় চিত্তকে আবৃত করিয়া বেতালবৎ নৃত্য করিতে থাকে।

হে মুনে! এ সংসারে দেহীদিগের যে মনোময় দেহ, তাহাই সুখ-দুঃখাদির ভাজন; পরন্তু তাহাদের মাংসময় স্থূলদেহের সহিত সে সকলের কোনই সম্পর্ক নাই। এই যে মাংসাস্থিসমষ্টি পাঞ্চভৌতিক দেহ দেখা যাইতেছে; জানিবে—ইহা কেবল মনের একটা বিকল্পমাত্র; পরমার্থ পক্ষে উহাকে দেহনামে অভিহিত করা যায় না। হে মুনিবর! আপনার পুত্র শুক্র ঐ মনোময় দেহে যে প্রকার কার্য্য করিয়াছেন, অবিলম্বে তাহারই অনুরূপ ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; এ বিষয়ে আমাদের অপরাধ কি? নিজের নিজের বাসনানুসারে যে লোক যেমন কর্ম্ম করে, তাহাকে সেইরূপ কর্ম্মফল প্রাপ্ত হইতে হয়; এ বিষয়ে ত অপর কাহারই কর্ত্তৃত্ব নাই। আপনার মনোবাসনা ক্ষণেকের মধ্যে অন্তরে যে কার্য্য সম্পাদন করিতে পারে, কৈ এমন কি কেহ ভুবনাধিপতি আছেন, যাঁহার কর্ত্তৃত্বে তথাবিধ কার্য্য সমাহিত হইতে পারে? জনন, মরণ, নরক ভোগ, এ সকল কেবল মনেরই মনন বৈ আর কিছুই নয়; বস্তুতঃ মনের ঈষৎ মননও দুঃখপ্রদ হয়। হে ভগবন্! এ সম্বন্ধে বহুবাক্য প্রয়োগের প্রয়োজন নাই। গাত্রোত্থান করুন, চলুন—আপনার পুত্র যেখানে আছেন, আমরা সেইখানে যাই। মুনিবর! ভবদীয় পুত্র শুক্র মনোময় দেহে ক্ষণমধ্যেই বহুভোগ্য বিষয় উপভোগ করিবার পর আকাশাদিক্রমে ভূতলে অবতরণপূর্ব্বক চন্দ্ররশ্মি-সম্পর্কে ওষধীমধ্যে প্রবেশ করেন, পশ্চাৎ অন্নাদিভাব ক্রমে জন্মপরম্পরা প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি সঙ্গাতীরে তাপসরূপে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার দেহত্যাগের পর তদীয় প্রাণবায়ু চৈতন্যশক্তি হইতে বিচ্যুত হইয়া অগ্রে শিশিরভাবে পরিণত ও চন্দ্ররশ্মি-সম্পর্কে চন্দ্ররশ্মির আকার প্রাপ্ত হয়, অনন্তর তৎসংযোগে শস্য দ্বারা তদীয় ফলস্বরূপ ধান্যাদিরূপে পরিণত হইয়া পশ্চাৎ পুরুষজঠরে প্রবেশ-পূর্ব্বক শুক্রাকার ধারণ করে এবং ইহার পর রমণীগর্ভে স্থান প্রাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। ভগবান্ কাল এই কথা কহিয়া জাগতিক অবস্থাকে যেন উপহাস করিয়াই সহাস্যমুখে স্বীয় কর দ্বারা ভৃগুর কর ধারণ করিলেন; মনে হইল, দিবাকর যেন স্বীয় কর দ্বারা নিশাকরকে গ্রহণ করিলেন। তখন ভগবান্ ভৃগু অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, 'অহো! নিয়তির কি বিচিত্র ব্যবস্থা!' এই বলিয়া তিনি মন্দরগিরি হইতে

গাত্রোত্থান করিলেন; মনে হইল—দিবাকর যেন উদয়াদ্রি হইতে উত্থিত হইলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! তখন সেই তমালতরু-মণ্ডিত মন্দরাচলের উপরিভাগে তেজোনিধি ভৃগু ও কাল-যুগপৎ দণ্ডায়মান হইলে মনে হইল, যেন জলদ-জাল-পরিব্যাপ্ত নভোমণ্ডলে এককালে দিবসকর ও নিশাকর অভ্যুত্থিত হইলেন।

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে, দিবা অবসান হইল। দিনমণি যেন সায়ন্তন বিধি সমাধা করিবার জন্যই অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। সভাস্থ সভ্যমণ্ডলী পরস্পর পরস্পরকে নমস্কারপূর্ব্বক সায়ং-কালীন স্নানাদি নির্ব্বাহ করিবার জন্য সভাগৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর নিশাবসানে দিনকরের করনিকর প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সভ্য-মণ্ডলী পুনরায় সভাগৃহে আসিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবেশন করিলেন।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তৎকালে ভগবান্ ভৃগু ও কাল-উভয়ে সেই সমুদ্রতটে গমন করিবার বাসনায় মন্দরাচলের সানুদেশ হইতে অবনীতে অবতরণ করিলেন। তাঁহারা যখন মন্দরগিরি হইতে অবরোহণ করেন, তখন দেখিতে লাগিলেন, সেখানকার স্থানে স্থানে কত কুঞ্জ আছে, সেই কুঞ্জগুলি সুপরিষ্কৃত সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল লতাজালে জড়িত; তাহাদের মধ্যে মধ্যে কোথাও গগনচরগণ এবং কোথাও বা বিহঙ্গমেরা নিদ্রা যাই-তেছে। কোন স্থানে সুরসুন্দরীরা লতাবলয়ের দোলায় চড়িয়া দোল খাইতেছে এবং হরিণবধূর ন্যায় অতিমনোজ্ঞ কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া চারি দিকে যেন নীলোৎপলমালা ছড়াইয়া দিতেছে। কোথাও ত্রিলোকদর্শী সিদ্ধগণ সমুচ্চ শিলাখণ্ডসমূহে মূর্ত্তিমান্ উৎসাহের ন্যায় উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

কোথাও বারিধার ন্যায় নিরন্তর রাশি রাশি পুষ্প পতিত হইতেছে; গজযূথ-পতিরা তন্মধ্যে থাকিয়া তালতরুপ্রতিম স্ব স্ব শুণ্ডাদণ্ড প্রসারিত করিতেছে। উহারা মদগর্ব্বে অলস হইয়া এমনভাবে নিদ্রাভিভূত হইয়া পড়িতেছে যে, যেন স্বয়ং মদগর্ব্বই সশরীরে বিরাজিত বলিয়া বোধ হইতেছে। কোথাও প্রিয়দর্শন চমর-মৃগগণ বিচরণ করিতেছে; পতিত পুষ্পপরাগে তাহাদের লাঙ্গুল সকল রঞ্জিত হইতেছে, তাহারা পবনবশে পরিচালিত হইলে বোধ হইতে লাগিল, যেন চমরমৃগেরা ভূধরকে বীজন করিতেছে। কোথাও অজস্র ধারে বারিবর্ষণের ন্যায় অবিরল কুসুমরাশি পতিত হইতেছে, আর তাহারই মধ্যে কিন্নরেরা মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। কোথাও কোথাও সুশোভন খর্জ্জুরবৃক্ষ সকল গগনপ্রান্তে স্ব স্ব সরল শাখাসমূহ বিস্তারপূর্ব্বক অবস্থান করিতেছে। কোথাও গৈরিকবৎ পাটল ও বিকৃতবক্ত্র বানরেরা খর্জ্জুর-ফল লইয়া পরস্পর পরস্পরের গাত্রে প্রহার করিতেছে এবং সিংহনাদের সহিত বেণুদণ্ড সকল আনত করত নৃত্য করিতেছে। কোথাও সানু-সংস্থিত উপবন-মন্দিরগুলি লতাবিতানে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। কোথাও সুরসুন্দরীরা সিদ্ধগণের গাত্রে মন্দারকুসুম সকল নিক্ষেপ করিতেছে। কোথাও নির্ঝর-তটভূমি সকল পাটলাভ জলদজালে আবৃত রহিয়াছে এবং জন-মানবের সমাগম নাই বলিয়া উহারা যেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। কোথাও গিরিনদীগুলির লহরী সকল কুন্দ ও মন্দারকুসুমে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, এবং উহারা যেন সাগর-সঙ্গমার্থ সমুৎকণ্ঠিত হইয়া মধুমাসীয় কুসুমাভরণে স্ব স্ব দেহ সুসজ্জিত করত সাগরাভিমুখে ধাবিত হইতেছে। কোথাও কোথাও বা কুসুমরাজি-রাজিত পাদপ সকল পবনভরে কম্পিত হওয়ায় উহারা যেন মধুপানার্থ মত্ত মধুপরূপ নেত্রসকল ঘূর্ণিত করিতেছে। এইরূপে ভৃগু ও কাল গিরিবরের এবম্বিধ মনোহর সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে পুর-পত্তন-মণ্ডিত মেদিনীতলে আসিয়া অবতরণ করিলেন এবং ক্ষণকাল মধ্যে সঙ্গমা নদীর তীরদেশে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, সেই তীরদেশ কুসুমসমূহে সমলঙ্কৃত ও চঞ্চল নদীতরঙ্গে পরিব্যাপ্ত; সুতরাং সঙ্গমা যেন পুষ্পময়ীরূপে প্রতিভাত।

তখন ভগবান্ ভৃগু ঐ সঙ্গমা নদীর তীরবর্ত্তী কোন এক প্রদেশে নিজ

তনয়কে দৃষ্টিগোচর করিলেন। দেখিলেন,—পুত্রের আর সে পূর্ব্বভাব কিছুই নাই। পুত্র এখন ভিন্ন দেহে অবস্থিত—ভিন্ন ভাবে নিমগ্ন। তদীয় ইন্দ্রিয়গ্রাম শান্ত হইয়াছে এবং মনোমৃগ স্থিরভাব লাভ করিয়াছে। তিনি সেই ভাবে সমাধি অবলম্বন করিয়া যেন অনন্তকালের শ্রান্তি শান্তি করিবার জন্যই চিরতরে বিশ্রাম সুখ ভোগ করিতেছেন। পূর্ব্বে যে তাঁহাকে ভববারিধির হর্ষশোকাদিময় প্রবাহবেগে ভাসিতে হইয়াছিল এবং বহুকাল হইল, যাহা হইতে তিনি মুক্ত হইয়াছেন, অধুনা যেন সেই অপার ভবপ্রবাহের বিষয়ই ভাবিতেছেন। কতকাল জগতের কত আবর্ত্ত-বিবর্ত্তনে পতিত হইয়া বারম্বার তাঁহাকে সাতিশয় ঘূর্ণিত হইতে হইয়াছে; এখন আর সে ঘূর্ণন তাঁহার নাই, তিনি অতি ভ্রমিত চক্রের ন্যায় স্থিরভাব ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। তিনি একাকী একান্তে সমাসীন; তাঁহার স্বভাব-কমনীয় কলেবর যেন স্বয়ং কান্তি দেবী আসিয়া আশ্রয় করিয়াছেন। এখন আর কোন বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা নাই, চিত্ত-সম্ভ্রমের সম্পর্কও তাঁহাতে নাই; তিনি অধুনা শীত উষ্ণ ও সুখ দুঃখাদি দ্বন্দ্ববৃত্তি হইতে নিবৃত্ত হইয়া নির্ব্বিকল্প সমাধিতে নিমগ্ন রহিয়াছেন এবং বিমল বুদ্ধি সহকারে যেন নিখিল সংসারগতিকে উপহাস করিতেছেন। তাঁহার সর্ব্ব বৃত্তান্ত বিগত হইয়াছে, অশেষ ভোগ্য বিষয় হইতে বিরতি ঘটিয়াছে ও কল্পনা-জাল নিরস্ত হইয়াছে, তিনি অপরিচ্ছিন্ন আত্মসুখ লাভ করিয়াছেন। হেয় বা উপাদেয় কোনরূপ সংকল্প-বিকল্প তাঁহার নাই; তদীয় হৃদয় জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়াছে, তাঁহাকে দর্শনমাত্রেই মনে হয় যেন কোন প্রতিবিম্ব-বিহীন স্বচ্ছ সমুজ্জ্বল মণি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার মতি সম্প্রবুদ্ধ হইয়াছে; তিনি ধীরভাবে অবস্থান করিতেছেন। মহর্ষি ভৃগু স্বীয় পুত্রকে এবম্বিধ অবস্থায় অবস্থিত দেখিলে পর ভগবান্ কাল সেই ভৃগুনন্দনকে দেখিয়া জলধিগর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীরস্বরে ভৃগুকে সম্বোধিয়া বলিলেন,—'মহর্ষে! এই আপনার সেই পুত্র, ইনি এক্ষণে বিবোধিত হউন।' বারিধরের গম্ভীর ধ্বনি শুনিয়া ময়ূর যেমন প্রবুদ্ধ হয়, তেমনি তখন সেই ভৃগুনন্দন কালের উক্ত বাক্যে প্রবুদ্ধ হইয়া ক্রমশঃ সমাধি হইতে নিবৃত্ত হইলেন এবং নয়নদ্বয় উন্মীলিত করিয়া একত্র সমুদিত রবি-শশীর ন্যায় সম্মুখাগত ভগবান্

কাল ও ভৃগুকে অবলোকন করিলেন এবং হরি-হরের ন্যায় তাঁহারা উভয় বিপ্র একসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন দেখিয়া ভৃগুকুমার স্বীয় আসন হইতে গাত্রোত্থান করতঃ তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলেন। তখন সকলেই পরস্পর তৎকালোচিত সম্ভাষণাদি করিয়া এক সঙ্গে এক শিলার উপর উপবিষ্ট হইলেন। বোধ হইল, যেন জগদারাধ্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর তিন জনে একত্র মেরুপৃষ্ঠে উপবেশন করিলেন।

রামচন্দ্র! অনন্তর ভৃগুপুত্র সমাধি হইতে বিরত হইয়া সঙ্গমাতটে সমাগত ভৃগু ও কালকে অমৃত-স্যন্দ-সুন্দর শান্তিময় বাক্যে বলিলেন,—অহো! অদ্য আমি যুগপৎ সমাগত দিবাকর ও নিশাকরের ন্যায় আপনাদিগকে দর্শন করিয়া পরম শান্তি লাভ করিলাম। শাস্ত্রাধ্যয়ন, তপোনুষ্ঠান এবং জ্ঞান ও বিদ্যার্জ্জন করিয়া আমি যে মনোমোহ হইতে নিষ্কৃতি পাইতে পারি নাই, অদ্য আপনাদিগের দর্শনলাভে আমার সেই মনোমোহ একেবারেই বিনষ্ট হইল। মহাপুরুষগণের সাক্ষাৎকার-লাভে যেরূপ আনন্দিত হওয়া যায়, মনে হয়, নির্ম্মল অমৃতধারা সিঞ্চনেও অন্তরে সেরূপ সুখানুভব হয় না। দিবাকর ও সুধাকর যেমন স্বস্ব পাদ দ্বারা স্পর্শ করত অম্বরদেশ পবিত্র করিয়া থাকেন, আপনারা মহাতেজস্বী মহাপুরুষ, আপনাদের উভয়ের পদার্পণেও অদ্য আমার আশ্রম তেমনি বিশুদ্ধ হইল। আপনারা কে? তাহা বলুন।

হে রঘুনাথ! তিনি এই কথা কহিলে, মহর্ষি ভৃগু সেই জন্মান্তরীয় পুত্রকে বলিলেন,—তুমি অজ্ঞ নও, তোমার জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তুমি স্বীয় পূর্ব্ব বিষয় স্মরণ করিয়া দেখ। ভৃগুর এই কথায় তাপস প্রবুদ্ধ হইলেন। তিনি মুহূর্ত্তমাত্র ধ্যানযোগ অবলম্বন করিবার পর তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। তখন তিনি স্বীয় জন্মান্তরীয় সমস্ত দশা স্মরণ করিতে লাগিলেন। বিস্ময়াবেশে তাঁহার মানস মুদিত হইল, মুখমণ্ডল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি বিতর্ক-মন্থর বচন-বিন্যাসপুরঃসর কহিলেন, যাহার কার্য্য-পরম্পরা জানিবার কোনই উপায় নাই, এই বিশাল সংসারচক্র যাহার প্রভাবে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, পরমাত্মার সেই মায়াশক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষশালিনী। অহো কি আশ্চর্য্য! আমার অবিদিত অনন্ত জন্ম-

দশা হইয়াছে? তাহার চিত্তবৃত্তি নাই, সে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। রে অপদার্থ দেহ! তুই সেই সেই বিলাস-নিবাস দেবোদ্যান-প্রভৃতিতে ও বাল্য-যৌবনাদি বিবিধ দশাসমূহে সেই সেই সৌন্দর্য্য, ভূষণ, গীত, হাস্য, ও রতিবিলাসাদি কত শত ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতে,সেই তুই আজ কেমন করিয়া সুস্থ হইয়া রহিয়াছিস্? রে আমার অভাগ্য দেহ! তুই তাপবশে শুষ্ক হইয়া এক্ষণে শবনাম ধারণ করিয়াছিস্; তোর আকার কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট হইয়াছে, তুই কি না আমাকেই ভয় প্রদর্শন করিতেছিস্? আমি যে দেহ অবলম্বন করিয়া বিবিধ ভোগ্য সামগ্রী উপভোগ করত পরমানন্দ লাভ করিতাম, আজ তাহা কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাকে দেখিয়া আমি ভীত হইতেছি। তাত! একবার তাকাইয়া দেখুন, আমার যে বক্ষে তারকারাজিবৎ সমুজ্জ্বল হারগুচ্ছ শোভিত হইত, আজ তদুপরি পিপীলিকাশ্রেণী বিচরণ করিতেছে! আহা! যে দেহের গলিত কাঞ্চনবৎ কমনীয় কান্তি সন্দর্শন করিয়া বরাঙ্গনা সকল রতিরঙ্গ-রসে স্পৃহাবতী হইত, ঐ দেখুন, তাহা অধুনা কঙ্কালমাত্রে পর্য্যবসিত। তাকাইয়া দেখুন, দেহ আমার প্রখর তাপে শুষ্ক হইয়াছে, মাত্রচর্ম্ম দ্বারা আবৃত আছে এবং কঙ্কালমাত্রে অবশিষ্ট রহিয়াছে, উহার মুখ-বিবরের দৃশ্য এরূপ বিশাল ও ভীষণ যে, উহা দর্শনে বন্য পশুরাও শঙ্কিত হয়। আহা! আমার শবদেহের উদরগহ্বর সম্যক্‌রূপে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে; উহাতে দিনমণির উজ্জ্বল রশ্মিজাল পতিত হওয়ায় আমার চক্ষে উহা যেন বিবেক-বিভায় উদ্ভাসিত হইতেছে; এই আমার দেহ বিশুষ্ক হইয়া অটল উপলে অবস্থান করিতেছে। মনে হয়, উহা যেন শরীরের অকিঞ্চিৎকরতা প্রদর্শন করিয়া সাধুগণের অন্তরে বৈরাগ্য আনিয়া দিতেছে! এই আমার দেহ রূপ, রস, শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধাদির প্রলোভন হইতে বিমুক্ত হইয়া যেন নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক শৈলোপরি শুষ্ক হইয়া যাইতেছে। ঐ দেখুন, আমার কলেবর যেন চিত্তরূপ পিশাচের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইয়া নিশ্চয়ই মহাসুখে অবস্থান করিতেছে এবং কোনরূপ দৈব উৎপাত হইতে কিছুমাত্র ভীত হইতেছে না। চিত্তরূপ বেতাল বিদূরিত হইয়াছে; এইজন্য আমার ঐ দেহ যতদূর প্রমোদ লাভ করিয়াছে, আমি মনে করি, নিখিল রাজ্যৈশ্বর্য্য

পাইলেও তাদৃশ প্রমোদ বা আনন্দোদয় হয় না। ঐ দেখুন, সর্ব্বসংশয় নিরস্ত হইয়াছে, নিখিল কৌতুকের বিরতি ঘটিয়াছে এবং যত কিছু কল্পনা, সকলই অপগত হইয়াছে; সুতরাং এ দেহ অরণ্যমধ্যে কেমন সুখে শয়ন করিয়া আছে! হে পিতঃ! চিত্তরূপ মর্কটের উপদ্রব বশতঃ দেহরূপ পাদপ ক্ষুব্ধ হইয়া এত দূর বেগে বিচলিত হয় যে, তদবস্থায় তাহাকে সমূলেই উৎপাটিত হইতে হয়। আমার দেহ আজ চিত্তরূপ অনর্থ হইতে মুক্ত হইয়া, পর্ব্বতোপরি গজোপম জলধরের সহিত কেশরীর সমর-ব্যাপার অবলোকন করিতেছে না, বুঝি বা এই জন্যই সে এখন পরমানন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছে! এই জন্যই বলিতেছি, হে পিতঃ! চিত্ত-রাহিত্যই লোকে মঙ্গলাবহ। চিত্তই নিখিল আশাঙ্কুরের নিদানভূত এবং মোহরূপ মেঘজনক বাষ্পের শরদাগম-স্বরূপ। আমার মতে ঐ চিত্ত-রাহিত্য ব্যতীত জীবগণের আর কিছুতেই মঙ্গল নাই। যে সকল মহাত্মারা স্ব স্ব মহতী ধীশক্তিবলে বিমনস্কতা প্রাপ্ত হইয়া, শান্তিপথে অবস্থান করিতেছেন, আমার মনে লয়, তাঁহারাই সুখ-সম্ভোগের শেষ সীমায় উপনীত হইয়াছেন। হে পিতঃ! আমার এই দেহ বিবিধ দুঃখদশা হইতে মুক্ত হইয়াছে, ইহার মোহজ্বর নাই, ইহা মননক্রিয়া-বিরহিত হইয়া অরণ্যমধ্যে পতিত রহিয়াছে, আমি আমার শুভাদৃষ্টবশতঃই অদ্য আবার ইহাকে দেখিতে পাইলাম।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি সর্ব্ব ধর্ম্মে অভিজ্ঞ; সুতরাং আপনার নিকট জিজ্ঞাসা করি এই যে, সে কালে ভৃগুকুমার ত' বারম্বার বহু দেহ পরিগ্রহ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ভৃগু হইতে উৎপাদিত দেহের প্রতিই নিতান্ত স্নেহশীল হইয়া অপরাপর দেহ অপেক্ষা তাহারই জন্য ঐরূপ বিলাপ করিলেন কেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ভৃগুনন্দন শুক্রের যে কল্পনা জীবাবস্থা উপগত হইয়া ভৃগু হইতে কর্ম্মময় ভার্গবরূপে উৎপন্ন হইয়াছিল, শুক্রের ঐ ভাবী দেহাকৃতি প্রাক্তনী কল্পনা বর্ত্তমান কল্পের আদিতে মায়াবচ্ছিন্ন ঈশ্বর হইতে অগ্রে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভূতাকাশতা প্রাপ্ত হয়, পশ্চাৎ বায়ু কর্ত্তৃক বিচালিত হইয়া অন্নাদিরূপে প্রাণ ও অপানক্রিয়ায় ভৃগুদেহে প্রবেশ করত রেতোরূপ ধারণ করিবার পর ক্রমশঃ শুক্রদেহাকারেপরিণত হয় এবং

ষোড়শ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তৎকালে ভগবান্ কাল ভৃগুনন্দনের বিলাপবাক্যে বাধা দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—হে ভার্গব! তুমি সঙ্গমার তীরে যে তাপস-তনু পরিগ্রহ করিয়া অবস্থিত ছিলে, এখন সেই তাপসী তনু পরিত্যাগপূর্ব্বক নরপতির নগরপ্রবেশের ন্যায় এই ভবদীয় পূর্ব্বদেহে প্রবেশ কর। হে নিষ্পাপ! তুমি তোমার প্রাক্তন শুক্রদেহ ধারণ করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতে থাক, কালক্রমে তুমি অসুরেন্দ্রগণের গুরুত্বপদে অধিরূঢ় হইবে। তখন মেঘ কর্ত্তৃক শৈল-সমালিঙ্গনের ন্যায় পিতা ভৃগু স্নেহার্দ্রমনে স্বীয় দেহ দ্বারা পুত্রকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, স্নেহপূর্ণ-নয়নে পুত্রের সর্ব্বদেহ দেখিলেন এবং আমা হইতে এই দেহ জন্মিয়াছে, ঈদৃশ ভাবনাময়ী সংসারাস্থার প্রতিও হাস্য করিতে লাগিলেন। আবার 'এই আমার পুত্র' এই রূপ চিন্তায় তাঁহার অন্তরে স্নেহেরও উদ্রেক হইল। ফলতঃ যতদিন দেহ মধ্যে জীবন থাকিবে, শরীরের প্রতি পরমাত্মীয়তা ততদিনই অবশ্যম্ভাবিনী।

অনন্তর সেই পিতা পুত্র উভয়েই নিশান্তে দিবাকর ও কমলাকরের ন্যায় পরস্পর পরম শোভা ধারণ করিলেন। বর্ষাগমে স্নেহবান্ ময়ূর ও জলধরের ন্যায় এবং বহুকালান্তে সম্মিলিত চক্রবাকদম্পতির ন্যায় সেই পিতা পুত্র ভৃগু ও শুক্র পরস্পর পরস্পরের প্রতি সাতিশয় স্নেহাকৃষ্ট হইলেন। দীর্ঘদিনের বিয়োগে তাঁহাদের উভয়ের সমাগমোৎকণ্ঠা অতীব প্রবল হইয়াছিল; তাঁহারা তখন উভয়েই সমান আনন্দ উপভোগ করিয়া সেই স্থানে মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থান করিলেন এবং তৎপশ্চাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই সঙ্গমা-সরিতের তীরে যে দ্বিজ দেহ পতিত ছিল, তাহার দাহকার্য্য সমাধা করিলেন। বস্তুতঃ কেই বা না জাগতিক আচার-ব্যবহার পালন করিয়া থাকে?

তখন সেই ভৃগু ও ভার্গব—উভয় তাপস, নভঃস্থিত দীপ্ত রবি-শশীর ন্যায় কিয়ৎকাল সেই পবিত্র অরণ্যে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা নিখিল জ্ঞাতব্য

ষোড়শ সর্গ।*

বশিষ্ঠ কহিলেন,—তৎকালে ভগবান্ কাল ভৃগুনন্দনের বিলাপবাক্যে বাধা দিয়া গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—হে ভার্গব! তুমি সঙ্গমার তীরে যে তাপস-তনু পরিগ্রহ করিয়া অবস্থিত ছিলে, এখন সেই তাপসী তনু পরিত্যাগপূর্ব্বক নরপতির নগর প্রবেশের ন্যায় এই ভবদীয় পূর্ব্বদেহে প্রবেশ কর। হে নিষ্পাপ! তুমি তোমার প্রাক্তন শুক্রদেহ ধারণ করিয়া তপোনুষ্ঠান করিতে থাক, কালক্রমে তুমি অসুরেন্দ্রগণের গুরুত্বপদে অধিরূঢ় হইবে। অনন্তর যখন মহাকল্পান্তকাল উপস্থিত হইবে, তখন পরিম্লান পুষ্পের ন্যায় তুমি এই ভার্গবদেহ পরিহার করিবে। তৎপরে আর তোমাকে দেহান্তর পরিগ্রহ করিতে হইবে না। হে মহামতে! তুমি এই পূর্ব্বকল্পার্জ্জিত কর্ম্মারব্ধ-কলেবরে জীবন্মুক্ত-পদ প্রাপ্ত হইয়া প্রধান প্রধান অসুরেন্দ্রগণের গুরুতা-কার্য্যে ব্রতী হইয়া অবস্থান কর। তোমাদের পিতাপুত্রের মঙ্গল হউক; আমি অধুনা অভিমত দিকে প্রস্থান করি। অর্থাৎ মদীয় পরম প্রেমাস্পদ আত্মভাবে অবস্থান করি।

তৎকালে ভগবান্ কাল এই কথা কহিয়া গলদশ্রুনেত্র ভৃগু ও শুক্রের সমক্ষেই অন্তর্হিত হইলেন; বোধ হইল, দিনমণি যেন আপনার করনিকর সঙ্কোচিত করিয়া উত্তপ্ত দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালে অস্তগমন করিলেন। এইরূপে ভগবান্ কৃতান্ত সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলে, ভৃগু-কুমার ভাবিলেন, ভবিতব্যতা লঙ্ঘনীয় নহে এবং ঈশ্বরেচ্ছারূপিণী নিয়তিকেও নিবারিত করিবার সাধ্য নাই। এইরূপ বিবেচনা করিয়া তিনি তখন কালরূপ কারণবশে বিশুদ্ধ, আপনার সেই প্রস্তর-পতিত দেহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল, শিশির-সমাগমে বনবল্লী বিশুষ্ক হইয়াছিল; ঋতুরাজ বসন্ত যেন তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। ভৃগুনন্দন তদীয় পূর্ব্বদেহে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার সেই তাপস-তনু বিবর্ণ হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে ছিন্নমূল লতিকার ন্যায় ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনন্তর মুনিবর ভৃগু স্বীয় পুত্র শুক্রের শরীরে জীব সঞ্চার করিলেন এবং কমণ্ডলুর মন্ত্রপূত জল-সেচনে তদীয় শান্তিকার্য্য

---

* পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় অর্থাৎ স্থিতি-প্রকরণের ৫০ পৃষ্ঠায় এই ষোড়শ সর্গের কতক অংশ একবার আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু ভ্রম ক্রমে তন্মধ্যে কয়েকটী শ্লোকের অনুবাদ ছাড় হওয়ায় আমরা এই পৃষ্ঠায় পুনরায় প্রথম হইতে সংশোধিত করিয়া ষোড়শ সর্গ সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলাম। আশা করি, পাঠকবর্গ আমাদের এই প্রথম ত্রুটি গ্রহণ করিবেন না।

সমাধা করিলেন। যেমন বর্ষাকালের জলপ্রবাহে শুষ্কগর্ত্ত গুলি পরিপূরিত হইলে নদীনিচয় সুশোভিত হয়, তেমনি সেই শুক্র-শরীরে জীবসঞ্চার হইলে, তদীয় শুষ্ক শিরা সকল পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিল। যেমন বর্ষার উদয়ে নলিনী ও বসন্ত-সমাগমে বনবল্লরী পল্লবিত হইয়া উঠে, তেমনি সেই শুক্র-শরীর তৎকালে অঙ্গুলিদল, নখর ও কুণ্ডলাদি দ্বারা পল্লবিতাকারে প্রতীত হইতে লাগিল। যেমন জলীয় বাষ্পময় মারুত-সহযোগে জলদজাল পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়; তেমনি সেই শুক্র-দেহও প্রাণবায়ুর প্রবাহে পরিপূর্ণতা উপগত হইলে, মহামতি শুক্র গাত্রোত্থান করিলেন এবং নবীন নীরদখণ্ড যেমন শিলোচ্চয় সমীপে অবনত হয়, তেমনি তিনি সম্মুখস্থ পূতচেতা পিতার চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে বন্দনা করিলেন।

তখন মেঘ কর্ত্তৃক শৈল সমালিঙ্গনের ন্যায় পিতা ভৃগু স্নেহার্দ্র মনে স্বীয় দেহ দ্বারা পুত্রকে প্রগাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিলেন, স্নেহপূর্ণ-নয়নে পুত্রের সর্ব্বদেহ দেখিলেন এবং আমা হইতে এই দেহ জন্মিয়াছে, ঈদৃশ ভাবনাময়ী সংসারাস্থার প্রতিও হাস্য করিতে লাগিলেন। আবার 'এই আমার পুত্র' এই রূপ চিন্তায় তাঁহার অন্তরে স্নেহেরও উদ্রেক হইল। ফলতঃ যতদিন দেহ মধ্যে জীবন থাকিবে, শরীরের প্রতি পরমাত্মীয়তা ততদিনই অবশ্যম্ভাবিনী।

অনন্তর সেই পিতা পুত্র উভয়েই নিশান্তে দিবাকর ও কমলাকরের ন্যায় পরস্পর পরম শোভা ধারণ করিলেন। বর্ষাগমে স্নেহবান্ ময়ূর ও জলধরের ন্যায় এবং বহুকালান্তে সম্মিলিত চক্রবাকদম্পতির ন্যায় সেই পিতা পুত্র ভৃগু ও শুক্র পরস্পর পরস্পরের প্রতি সাতিশয় স্নেহাকৃষ্ট হইলেন। দীর্ঘদিনের বিয়োগে তাঁহাদের উভয়ের সমাগমোৎকণ্ঠা অতীব প্রবল হইয়াছিল; তাঁহারা তখন উভয়েই সমান আনন্দ উপভোগ করিয়া সেই স্থানে মুহূর্ত্ত মাত্র অবস্থান করিলেন এবং তৎপশ্চাৎ গাত্রোত্থান করিয়া সেই সঙ্গমা-সরিতের তীরে যে দ্বিজ দেহ পতিত ছিল, তাহার দাহকার্য্য সমাধা করিলেন। বস্তুতঃ কেই বা না জাগতিক আচার-ব্যবহার পালন করিয়া থাকে?

তখন সেই ভৃগু ও ভার্গব—উভয় তাপস, নভঃস্থিত দীপ্ত রবি-শশীর ন্যায় কিয়ৎকাল সেই পবিত্র অরণ্যে অবস্থান করিলেন। তাঁহারা নিখিল জ্ঞাতব্য

বিষয় বিদিত, জীবন্মুক্ত ও জগতে পূজনীয় হইলেন। বিবিধ দেশকাল ব্যবহারে তাঁহাদের সমভাব উপস্থিত হইল। তাঁহারা স্থিরচিত্তে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে লাগিলেন। কালক্রমে ভৃগুপুত্র শুক্র অসুরগণের গুরুত্ব-পদে অধিষ্ঠিত হইলেন এবং ভৃগুও আত্মযোগ্য অনাময় প্রজাপতি-পদে অবস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র! উদারকীর্ত্তি ভৃগুপুত্র উল্লিখিত-রূপে সেই পরম পদ পরমাত্মা হইতে অগ্রে উৎপন্ন হইয়া পুনঃপুনঃ সেই সুরবালাকে স্মরণ করায় তৎপ্রযুক্ত মনোরাজ্য-ভ্রমে পতিত হন ও পশ্চাৎ অন্যান্য অনেক জন্মাদি ভোগ করেন।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! বহুকাল স্বর্গাদি মনোরাজ্যের অনুভূতি হেতু ভৃগুপুত্রের বাসনাপ্রতিভা যেরূপ সফলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল, অন্যের পক্ষে সেরূপ হয় না কেন? অর্থাৎ শুক্রের মনোরাজ্য যেমন সফল হইয়াছিল, অপরের মনোরাজ্য তদ্রূপ সফল না হইবার কারণ কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! সৃষ্টির আদিতে ভৃগুপুত্রের কলেবর প্রথমে পরম ব্রহ্মপদ হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। তাঁহার চরম জন্মানুষ্ঠিত কর্ম্ম সাধনা দ্বারা পূর্ব্বকল্পীয় দোষরাশি খণ্ডিত হওয়ায় বর্ত্তমান কল্পে তদীয় যে ব্রাহ্মণত্ব জাতি, তাহা জন্মান্তরীয় কলঙ্কে অস্পৃষ্ট,—সুতরাং সুবিশুদ্ধই ছিল। যখন নিখিল বাসনার শান্তি হইয়া যায়, তখন যে শুদ্ধ চিন্মাত্রের অবস্থান, তত্ত্বদর্শিগণ তাহাই সত্য চিৎস্বরূপ বলিয়া অভিহিত করেন। নির্ম্মল সত্ত্বময় মন যেমন যেমন ভাবনা করিতে থাকে, জলের আবর্ত্তাকারে পরিণতির ন্যায় সত্বর সেই সেইরূপেই পরিণত হয়। অর্থাৎ মানসী চিন্তা সফল হইবার পক্ষে দুইটী কারণ বিদ্যমান। সেই দুই কারণেই জীবের সঙ্কল্প সফল হইয়া থাকে। তন্মধ্যে একটী কারণ—সত্যসঙ্কল্পতা-বিধায়ক

সৎশাস্ত্রের সমালোচনা ও উপাসনা প্রভৃতি উপায় দ্বারা চিত্তের শুদ্ধি হইয়া থাকে। যদি চিত্ত-শুদ্ধি হয়, তাহা হইলেই সেই শোধিত চিত্তে সত্যেরই জ্যোতিঃ বা প্রতিভা প্রতিফলিত হইয়া উঠে। দীর্ঘকাল ধরিয়া একগ্রতার সুদৃঢ় অভ্যাসবশতঃ চিত্ত শুদ্ধ হয়, পরে সেই সঙ্কল্প-বিহীন বিশুদ্ধ চিত্তেরই প্রতিভা সমুদিত হইয়া থাকে; অর্থাৎ তথাবিধ চিত্তে সত্য-প্রতিভারই উদয় হয়। সুন্দর বর্ণ দ্বারা মলিন বস্ত্র সুশোভিত করিবার চেষ্টা করিলে সে চেষ্টা যেমন সফল হয় না, তেমনি রাগাদি দ্বারা যে চিত্ত কলুষিত, তাহাতে কখনই অদ্বৈত আত্মজ্ঞান উন্মেষিত হইতে পারে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! ভৃগুনন্দন শুক্রের স্বীয় চিত্তস্থিত প্রাতিভাসিক কল্পনাময় জগতে কি প্রকারে কাল, ক্রিয়া ও তদীয় ক্রম-পরম্পরার উদয় ও বিলয় সত্যস্বরূপে সমুদিত হইয়াছিল? অর্থাৎ জগদ্ভ্রম বাসনারই অনুরূপ হইয়া থাকে। শুক্র যে স্বর্গ ও স্বর্গীয় অপ্সরাদির সম্ভোগ করিলেন, সেই সম্ভোগ-বাসনা তাঁহার কোথা হইতে কি প্রকারে আসিল? তিনি ত পূর্ব্বে কোন সময়েই ঐ সমস্ত সম্ভোগ করেন নাই?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ভৃগুপুত্র তদীয় পিতার নিকট ঐহিক ও পারলৌকিক বিষয়ে যেরূপ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং শ্রুতি ও স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র-বাক্যের সমালোচনায় জগতের যাদৃশ উৎপত্তি-বিনাশ-বিশিষ্ট ক্রম-বিবরণ শ্রবণ ও স্বয়ং স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন, তৎসমস্ত তাঁহার চিত্তে ময়ূরাণ্ডে ময়ূরের ন্যায় সংস্কাররূপে দৃঢ়বদ্ধ হইয়াছিল। যেমন বীজ হইতে ক্রমে ক্রমে অঙ্কুর, পত্র, শাখা, কাণ্ড, পুষ্প ও ফল প্রভৃতির আবির্ভাব হয়, তেমনি ঐ সকল সংস্কার তাঁহার স্বভাব-কোষে বা চিদধিষ্ঠিত সজীব অবিদ্যায় আবদ্ধ থাকিয়া পশ্চাৎ ক্রমান্বয়ে সমুদিত হইয়াছিল। জীব যে যেরূপ বাসনায় আবদ্ধ হয়, অন্তরে সেই সেইরূপই সন্দর্শন করিয়া থাকে। এ বিষয়ে স্ব-কল্পিত স্বাপ্ন শরীরকেই উত্তম দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে। যদি তুমি শুক্রের ঐ সংসার স্বপ্ন বলিয়া মনে না করিয়া সত্যরূপে অবধারণ

কর, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, কেবল শুক্রের বলিয়া কথা কি, এই দৃশ্যমান নিখিল জগৎই একটা দীর্ঘ স্বপ্নরূপে প্রতিভাত। রাম! যেমন মানবেরা সৈন্য মধ্যে থাকিয়া দিবসের সৈন্যচিন্তা ফলে রাত্রিযোগে প্রত্যেকেই স্ব স্ব অন্তরে সুস্পষ্ট সৈন্যময় স্বপ্ন সন্দর্শন করে, তেমনি সমস্ত জীবেরই আত্মায় এই সংসার-পরম্পরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনাবশে সমুদিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! এই কল্পনাময় সংসারে আমরা যে সকল পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, উহাদের মধ্যে পরস্পর ঐক্য বা সম্মিলন হইতে পারে কি না? আপনি এই বিষয়টী আমার নিকট যথাযথ কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! বিশুদ্ধ মনের সহিত মলিন মন কদাচ পরস্পর সম্মিলিত হইতে সমর্থ হয় না; কেন না, শুদ্ধ মনের সহিত সম্মিলিত হইবার যে একটা সামর্থ্য, তাহা মলিন মনের একেবারেই নাই। তবে যদি সেই মলিন মন কখন বিশুদ্ধ হয়, তাহা হইলে, সন্তপ্ত শুদ্ধ লৌহ যেমন তথাবিধ অন্য কোন সন্তপ্ত শুদ্ধ লৌহের সহিত মিলিয়া যায়, তেমনি বিশুদ্ধ মনও বিশুদ্ধ মনের সহিত মিলিত হইতে পারে এবং এরূপ হইয়াও থাকে। যেমন একইরূপ সুপরিষ্কৃত জল পরস্পর মিশ্রিত হইয়া একতা প্রাপ্ত হয়; পরন্তু মলিন হইলে একরূপে মেলনা হয় না, তেমনি নির্ম্মল চিত্তসমষ্টিই পরস্পর সম্মিলনে সমর্থ হইয়া থাকে। কিন্তু মলিনের মেলন-সামর্থ্য নাই, হইতেও পারে না। যাহাতে ভূত বিষয়ের কোনই সম্বেদন নাই এবং সতত যাহা সমতাকে বিরাজমান, তথাবিধ আত্যন্তিকী বাসনা-নিবৃত্তিই চিত্তশুদ্ধি; এই চিত্তশুদ্ধি লাভ করিয়াই জীবগণ তত্ত্বজ্ঞতা প্রাপ্ত হয় এবং তত্ত্বজ্ঞ হইয়াই পরম কৈবল্যাত্মা সহ অচিরে একতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৭॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ! সমস্ত জীবের স্ব স্ব-কল্পিত সংসার-পরম্পরা মধ্যে প্রত্যেক জীবে যে স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণরূপ প্রপঞ্চের বিভিন্নতা উক্ত হয়, তাহা স্বপ্রকাশ চিদেকরস আত্মার প্রতিনিয়ত আকার কল্পনাতেই হইয়া থাকে; বস্তু বৃত্তি দ্বারা তাহা হয় না। কেন না, সকল জীবেরই সুষুপ্তির অব্যবহিত পরে যে দ্বৈত-ব্যবহারের প্রবৃত্তি হয় অথবা স্বপ্নদশায় কি জাগ্রদবস্থায় যে কোন কোন বিষয়ে প্রবৃত্তি কিম্বা কোন কোন বিষয়ে নিবৃত্তি হইয়া থাকে, জানিবে—সে সকল সেই চিদেকরস আত্মারই অধীন। প্রবৃত্তিমান্ জীবনিচয় সেই চিন্মাত্রের জ্যোতিতেই প্রকাশমান পদার্থ দর্শন করে, অন্য কোন জ্যোতি দ্বারা নহে। এতাবতা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জীবনিবহ স্ব স্ব সাক্ষি-চৈতন্যের উপাধি-সম্মিলনে কিম্বা চিত্তশুদ্ধি দ্বারা চিত্তোপহিত চৈতন্যের আবরণ অর্থাৎ অজ্ঞান অপনয়নে একীভাব উপগত হইয়াই পরস্পর পরস্পর-কল্পিত সৃষ্টিসমূহ অবলোকন করে। ফল কথা এই, একই ব্রহ্মচৈতন্য দ্বারা বিভিন্ন মন উপাধির বিভিন্ন কল্পনা প্রকাশ পায়; কাজেই সে সমস্ত বস্তুগত্যা কিছুই নয় অথচ কিছু না হইলেও শুদ্ধ চিত্তে সে সকলের প্রতিফলন হয়। বিশদার্থ এই—জীব যখন সাধন-বলে সর্ব্বজ্ঞ হইয়া উঠে, তখন সকল সৃষ্টিই তাহার দৃষ্টিগোচর হয়। চিন্মাত্রের একতা নিবন্ধনই বিচিত্র কল্পিত সৃষ্টিরূপ জলাশয় বহু হইলেও পরস্পর একত্র সম্মিলিত ও সত্যভ্রমে ঘনতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে। এক একটী জগৎ যেন এক একটী গুল্মাবলের ন্যায় প্রতিভাত। সেই সকল বিচিত্রদর্শন জগৎসমূহের মধ্যে কোন কোন জগৎ পৃথক্ ভাবেই অবস্থিত ও পৃথক্‌ভাবেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে এবং কোন কোন জগৎ বা পরস্পর সম্মিলিত হইয়া অক্ষয় বা চির স্থিররূপে বিরাজ করিতেছে। ফলতঃ প্রত্যেক পরমাণুতে পরমাণুতে যে সকল সংখ্যাতীত জগদ্‌গুল্ম পরিস্ফুরিত হইতেছে, তাহারা পরস্পর অসংলগ্ন এবং মায়া-শবলিত ব্রহ্মের বিহার কানন-মাত্র। ঐ জগদ্‌গুল্মগুলি পরস্পরের সম্মিলনে নিবিড় ভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্যবহারযোগ্য হয়;

তাহাদের মধ্যে সকল জগৎ সকলের দর্শনোপযোগী হয় না। যাহার যাহা কর্ম্মফল ভোগের অনুকূল হয়, সে তাহাই দেখিয়া কালাতিপাত করে। প্রত্যেক সৃষ্টিই উল্লিখিত নিয়মের অধীন; সুতরাং সমস্ত জীব নিয়মিত-ভাবেই সৃষ্টি দেখিয়া থাকে; তাহার ব্যত্যয় কখন হয় না। ফলতঃ যে, যে দেশে ও যে কালে বর্ত্তমান, সেই দেশ ও সেই কালের সৃষ্টিই তাহার দৃষ্টিগোচর হয়, দেশান্তরীয় বা কালান্তরীয় সৃষ্টি অর্থাৎ ভিন্ন দেশের বা ভিন্ন কালের সৃষ্টি বা ভাব দেখিবার সামর্থ্য তাহার নাই। মনোরূপ উপাধি ভিন্ন ভিন্ন, তাই জীবও অনেক সংখ্যায় বিভক্ত। মনের বিভিন্নতা হেতুই এক জনের মনোরাজ্য অন্য জনের ভোগ্য বা অনুভূতিযোগ্য হয় না; এই যে সর্ব্বানুভূতি-বিষয়ক প্রমাণ, ইহাই মনোভেদ ও তদনুসারে জীবভেদ জ্ঞাপনে সক্ষম। বিভিন্ন মনের যে বিভিন্ন মনোরাজ্য, তাহাই স্বর্গ বা সৃষ্টি আখ্যায় অভিহিত। কর্ম্ম, জ্ঞান ও বাসনা এ সকল যদি একের সহিত অন্যের একরূপ হয় আর তৎসমস্ত যদি একই সময়ে ফলোন্মুখ হইয়া উঠে, তাহা হইলে ব্যষ্টি কিম্বা সমষ্টি যাহাই বল না কেন, সর্ব্ব জীবেরই স্থূল দেহের সত্তা সে কালে দৃঢ় হইয়া পড়ে—সকলে একই রূপে নিজ নিজকে 'অহং দেহী' ইত্যাকারে অবলোকন করিতে থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে, কর্ম্ম বাসনাদি হইতেই মনোরাজ্যের উপস্থিতি, আর মনোরাজ্যের যে দৃঢ়তা, তাহাতেই দেহের অস্তিত্ব-নিশ্চিতি এবং উহার যে বিস্মরণ, তাহা হইলেই দেহের অভাব সিদ্ধি। সুবর্ণময় বলয়ের প্রতি সুবর্ণের সানুরাগ দৃষ্টি হইলে তাহা যেমন তাহার আত্মবিস্মৃতির পরিচায়ক হয়, তেমনি দেহ-রূপে বিবর্ত্তিত হইয়া চিৎশক্তিও যে অসত্য সংসারাকার অবিদ্যায় আকৃষ্ট রহিয়াছেন, ইহাও তাঁহার আত্মবিস্মৃতিরই পরিচায়ক বৈ আর কিছুই নয়। যোগীদিগের যোগ-বিশুদ্ধ প্রাণবায়ু যেমন পরকীয় দেহে প্রবেশপূর্ব্বক তদীয় পঞ্চ প্রাণ ও ইন্দ্রিয়গ্রামকে আপনার বশীভূতরূপে বুঝিয়া তাহাদের বেদ্য শব্দাদি বিষয় সকল বিদিত হইতে পারে, তেমনি বিশুদ্ধ চিত্তও সর্গান্তরীয় অপরাপর মনোরাজ্য বিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইয়া থাকে। যাবতীয় জীবই জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, এই ত্রিবিধ অবস্থার আশ্রয়ে অবস্থিত। এই অবস্থাত্রয়ের আশ্রয় লওয়া জীবেরই স্বভাব; পরন্তু দেহের স্বভাব

নয়। এইরূপে উল্লিখিত ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন আত্মাই যখন জীবভাব উপগত হয়েন, তখন জলে তরঙ্গের ন্যায় আত্মাতেই দেহভাব স্ফুরিত হইতে থাকে এবং উহার সম্যক্ পর্য্যালোচনা করিলে জল হইতে তরঙ্গ যেমন আর পৃথক্ বলিয়া অনুভূত হয় না, তেমনি আত্মাতেও পৃথক্‌দেহতা প্রকাশ পায় না। সুষুপ্তির অবসানভূত তুরীয়াবস্থায় অবস্থিত যে চৈতন্যময় পদ, তত্ত্বজ্ঞ জীব সে পদ প্রাপ্ত হইলে জীবভাব হইতে নিবৃত্ত হয় এবং যাহারা মূঢ় জীব, তাহারা স্ব স্ব কল্পনা-বশে পুনরায় সংসারে প্রবৃত্ত হইতে থাকে। অজ্ঞ ব্যক্তিও সুষুপ্তি অবস্থায় প্রচুর আনন্দ পায়, এ কথা শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে; সুতরাং বিজ্ঞ এবং অজ্ঞ উভয়েরই সুষুপ্তি অবস্থা সমান। উহাতে প্রভেদ কিছুই নাই। তবে কথা এই যে, অজ্ঞ জীবেরা সুষুপ্তি অবস্থাতেও বস্তুগত্যা আত্মজ্ঞানহীন এবং দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিরূপ যে ভ্রান্তিময় বাসনা, সেই বাসনায় তাহারা অন্বিত; সেইজন্য তথাবিধ জীবগণ সংসারে আবদ্ধ হইয়া থাকে; পরন্তু জ্ঞানী-জীবেরা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি-সম্পন্ন নহেন, তাই তাঁহাদের সুষুপ্তি দেহ সৃষ্টির কারণ হয় না। কেহ কেহ চিচ্ছক্তির সর্ব্বগামিতা প্রযুক্ত অন্য মনোময় জগতে প্রবেশিত হয়। উল্লিখিত প্রত্যেক জগতের মধ্যেই বিভিন্ন জগৎ বিদ্যমান এবং সেই সেই জগতের অভ্যন্তরেও কদলীপাদপের আবরণস্তরের ন্যায় আরও কত জগৎ বিরাজমান; কিন্তু ব্রহ্মবস্তু বহিরন্তর সকল জগতেরই অদূরবিহারী। যেমন চতুর্দ্দিকে প্রসারিত শাখা ও পত্রপুঞ্জ দ্বারা কদলীস্তম্ভ এক প্রকাণ্ড বৃক্ষ বলিয়া প্রতীত, তেমনি যিনি ব্রহ্ম, তিনিও জগৎপুঞ্জ দ্বারা বৃহদাকারে প্রতিভাত। কদলীপাদপ ও তদীয় পত্রপুঞ্জ যেমন ভিন্ন নহে, তেমনি ব্রহ্মতত্ত্ব ও সৃষ্টিপরম্পরাতেও কোনই পার্থক্য নাই। একই বীজ যেমন জলসেক দ্বারা পাদপরূপে পরিণত হইয়া পরে আবার বীজভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি একমাত্র ব্রহ্মই অজ্ঞানবশতঃ মনোরূপে পরিণত ও পরে জ্ঞান প্রভাবে পরব্রহ্মরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন। রসযুক্ত বৃক্ষবীজ যেমন স্বগত রস কারণ দ্বারা ফলাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি ব্রহ্ম কারণে জীব ও জগৎস্বরূপে প্রকাশিত হয়; পরন্তু এখানে কথা এই, বৃক্ষবীজে যে রস আছে, সেই

রসের কারণ কি? এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করাও যেমন অসঙ্গত, তেমনি ব্রহ্মের কারণ কি? এবম্বিধ প্রশ্নও অযুক্ত। ব্রহ্ম অনাদি নির্ব্বিকার; তাঁহাতে কোন নিমিত্তীভূত বস্তুর অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই। সেই ব্রহ্মই আদি কারণ; তাঁহার কোনই আদি কারণ নাই। বলিতে পার, এই জগৎ জড় মিথ্যা ও দুঃখরূপ; সুতরাং ইহার জড়, মিথ্যা ও দুঃখ-রূপকেই আদি কারণ বলিয়া বলা যায়, কাজেই তাহাই এক্ষণে বিচার্য্য বিষয় হউক, কারণ-বিহীন ব্রহ্মের বিচার দ্বারা কি ফল হইবে? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, অসার বিচারণা পরিহারপূর্ব্বক যাহা সার, তাহাই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অসার বিচারণায় কোনই ফল নাই; সার-বিচারেই পুরুষার্থ লাভ ঘটে। সকলেই দেখিতে পায়, বীজ বীজাকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক ফল-ভাব প্রাপ্ত হয়; কিন্তু ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় নিয়ম অন্যরূপ। ব্রহ্ম আপন আকৃতি পরিত্যাগ করেন না, অথচ জগদ্ভাব ধারণ করেন। বীজ ফলাকারে বিরাজ করে; বীজের যাদৃশ আকৃতি, তাহার অঙ্কুরাদিও তদনুরূপই প্রাদুর্ভূত হয়; পরন্তু ব্রহ্মবস্তুর কোনই আকৃতি নাই, তিনি নিরাকার; সুতরাং বীজের সহিত ব্রহ্ম পদের উপমাই হইতে পারে না। বস্তুতঃ যাহা শিবস্বরূপ, তাহার কোনই উপমা নাই। এই জগৎ আত্মা হইলেও অজ্ঞ দর্শনে আত্মাকারে স্ফুরিত হয় না; বিশেষতঃ আত্মা অন্যরূপে জন্ম গ্রহণও করেন না। অতএব হে রাঘব! তুমি এই উৎপন্ন অথচ অনুৎপন্ন অসত্য জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়াই বিদিত হও। দ্রষ্টা বা জীব দৃশ্য দর্শন করেন, তিনি স্বীয় যথাযথ আত্মস্বরূপ দর্শন করিতে পারেন না; বস্তুতঃ কোন্ প্রপঞ্চদর্শীর সম্বিৎই বা নিষ্প্রপঞ্চ আত্মার স্থিতি অবগত হইতে পারে? ফলে ভ্রান্তিবশে তদীয় স্ব-প্রকাশতা পূর্ণানন্দতা কিছুই থাকে না। মৃগতৃষ্ণায় যদি জলভ্রান্তি জন্মে, তবে আর বিদগ্ধতা বা সত্যজ্ঞান কি? আর যদি বিদগ্ধতা বা সত্যজ্ঞান থাকে, তাহা হইলে মৃগতৃষ্ণায় তাদৃশ ভ্রম থাকিতে পারে, কি? চক্ষু সমস্তই দর্শন করে; কিন্তু সে নিজেকে দেখিতে পারে না, এইরূপ দ্রষ্টা আকাশবৎ বিশদ হইয়াও কোনরূপেই স্বীয় আত্মস্বরূপ অবলোকনে সমর্থ হয়েন না। অহো কি অপূর্ব্ব ভ্রান্তি! কথা হইতে পারে, বহির্ম্মুখ দ্রষ্টা স্বীয় আন্তর আত্মাকে না দেখুন, বাহ্য পরকীয় আত্মাকে ত তিনি দর্শন করিতে পারেন?

তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, যাঁহার সমস্ত ভ্রান্তি নিরস্ত হইয়াছে, তথাবিধ মুক্তাত্মা পুরুষ যেমন দৃশ্য দ্বৈত দর্শন করেন না, তেমনি ভ্রান্ত দ্রষ্টা বা জীব আকাশবৎ বিশদ ও সর্ব্ব-ব্যাপী স্বীয় আত্মাকে অবলোকন করে না এবং নিজ আত্মার অদর্শনের ন্যায় বাহ্য পরকীয় আত্মাও তাহার দৃষ্টিগোচর হয় না। আকাশ-বিশদ ব্রহ্ম অতি যত্নেও লক্ষ হইবার নহেন। কেন না, তাঁহাকে দৃশ্য ভাবিয়া দেখিতে গেলে তিনি বহুদূরে অবস্থান করেন। ফল কথা, দৃশ্যকে দৃশ্যরূপে দেখিলে ব্রহ্ম দর্শন কিছুতেই ঘটে না। যদি কেবল জ্ঞাননেত্রে দেখা যায়, তবেই তাঁহার দর্শন লাভ হয়। বলিতে পার, ব্রহ্ম বা আত্মা দ্রষ্টার অন্তঃস্থ তাই বাহ্য বিষয়োন্মুখ; দ্রষ্টা তাঁহাকে দেখিতে পারে না; কিন্তু ঘটাদি বাহ্য বিষয়াধিষ্ঠান আত্মাকে ত দেখা যাইতে পারে, সে দর্শনে ত অন্তর্দৃষ্টির কোনই উপযোগিতা নাই? এ কথায় বলিব, ঘটাদি বাহ্য-বিষয়ক আত্মা বাহ্য ঘটাদির আকারে অনুরঞ্জিত; সুতরাং দ্রষ্টা যিনি, তাঁহার নিজের তাদৃশ ভাবস্বরূপ ব্যতীত ঘটাদি বিষয় দর্শন করিবার শক্তি হয় না; তাহাতে সূক্ষ্ম চিন্মাত্ররূপে বিরাজিত রহিলে ত একেবারেই দৃশ্য হইবার নহে; তাই বলিতেছি, রামচন্দ্র! 'দ্রষ্টা দৃশ্য দেখিতে পারেন, কিন্তু দ্রষ্টা কখন দৃশ্য হইতে পারেন না। একমাত্র দ্রষ্টাই আছেন, দৃশ্য ইহাতে কিছুই নাই। কেন না দ্রষ্টা বা আত্মা যিনি, তিনিই সর্ব্বাত্মক; তিনি দৃশ্য হইলে তাঁহার আবার দ্রষ্টৃত্ব থাকে কি? বলিবে—নরপতির ন্যায় সর্ব্বশক্তিশালী আত্মা দৃশ্য সম্পাদনপূর্ব্বক তাহাকে তাদৃশ ভাবে অনুভব করত দ্রষ্টা হইয়া থাকেন। এ কথায় আপত্তি নাই; কেন না, তিনি ত অবিকৃতভাবে রহিয়াই সেই সেই দৃশ্যরূপে সমুদিত হইতেছেন। যেমন কালক্রমে বৃক্ষ মধ্যে রস-সঞ্চার হইলে বসন্ত সমুল্লসিত হয়, ও সেই রসের বিদ্যমানতায় ফল, পুষ্প ও শাখাদিরূপে পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, তেমনি জীব চিচ্ছশক্তিতে ভাসমান হইয়া পুনরায় দেহশালী হয় এবং সেই চিন্মাত্রতার সহকারিতায় অন্তরে আত্মভাবে ভাবিত হইয়াই এই দৃশ্য-দর্শনময় বিশ্বকে স্বপ্নের ন্যায় প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। যেমন একই পার্থিব রস ইক্ষু প্রভৃতি দ্বারা নানা খণ্ডাধারে বিভিন্ন স্বাদের বিভিন্ন খণ্ডসমূহ সৃষ্টি করে, তেমনি পার্থিব রসস্থানীয় অহঙ্কারাদি, পরমাত্মাতে বহু ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভাবন করিয়া থাকে। যেমন ভৌম রস

এক হইলেও ইক্ষুতে স্বাদ একরূপ এবং খর্জ্জুরের স্বাদ অন্যপ্রকার, তেমনি উল্লিখিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহের ভোগরসও অনন্তসংখ্য। এই দৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড যেন একটা অরণ্যের ন্যায় প্রতিভাত; ভিন্ন ভিন্ন ভাবের চৈতন্য প্রকাশ বা জীব-বৃন্দ ইহার পাদপরাজি, শত শত দৃশ্যনিচয়—শত শত শাখাপ্রশাখা, প্রত্যে-কের রস বা ভোগ অনন্ত বা বিচিত্রাকার এবং বিভিন্নভাবে বিরাজমান চিৎ উহার আস্বাদকর্ত্তা। যে জীবশক্তি হইতে যে যে সংসার যাদৃশরূপে সমু-দিত হয়, সেই জীবশক্তি তথাবিধ আত্মচিদাকার জগতে তাদৃশরূপে অব-স্থান করিয়া থাকে। সংসারে কোন কোন জীব পরস্পর একরূপ হয়; এই একরূপতার কারণ তাহাদের পরস্পর বাসনাসমূহের তুল্যতা। কোন কোন জীব বহুকাল সংসারে বিহার করিয়া স্বয়ং শান্ত হইয়া যায়।

রামচন্দ্র! তুমি যদি জ্ঞানচিত্তে সূক্ষ্ম দৃষ্টির সাহায্যে দেখিতে থাক, তাহা হইলে দেখিবে, পরমাণুর অভ্যন্তরেও সহস্র সহস্র জগৎ বিরাজ করি-তেছে। চিত্ত, আকাশ, অচল, অনল, অনলশিখা ও জল ইত্যাদি যাবতীয় পদার্থপুঞ্জেই তিলে তৈলবৎ লক্ষ লক্ষ জগৎ বিরাজমান। চিত্ত যখন সিদ্ধি লাভ করে, জীব তখন চিদাকারে পরিণত হয়। এই চিৎ শুদ্ধ এবং সর্ব্বগত; তাই উহার পরস্পর মিলন ঘটে। পদ্মযোনি প্রভৃতি কর্ত্তৃক অস্মদাদির যে সংসারদর্শন হয়, তাহা সেই শুদ্ধিবশেই ঘটিয়া থাকে। এই ভ্রান্তি-কল্পিত জগৎরূপ দীর্ঘ মহাস্বপ্ন পদ্মযোনি হইতে আরম্ভ করিয়া যাবতীয় প্রাণীরই অন্তরে সমুত্থিত হইয়া থাকে। কোন কোন জীব একরূপ স্বপ্ন হইতে স্বপ্না-ন্তর অবলোকন করে, তাহাতেই ক্রমে ঐ স্বপ্নজগৎ ভিত্তিগত শিলাখণ্ডের ন্যায় বাসনার দৃঢ়তায় দৃঢ়তর হয়। বাসনায় বাসিত চিৎ যেমন যেমন ভাবনা করে, তৎক্ষণাৎ সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হয়। ঐ চিৎ স্বপ্নকালে যে পদার্থ দেখে, তাহা তখন সত্য হইয়া থাকে। যেমন বীজমধ্যে পত্র, পুষ্প, লতা ও ফলের অণু সকল বিদ্যমান, তেমনি সূক্ষ্মীভূত জগদাকার বাসনা ঐ চিদণুর অভ্যন্তরে বিরাজমান। আমার নিকট ইহা আশ্চর্য্য বলিয়াই বোধ হয় যে, চিৎ ও জগৎ এই উভয় পরস্পর পরস্পরের অন্তরে প্রবিষ্ট; অথবা ইহা আশ্চর্য্য নয়—চিদাকাশই জগদ্‌ভ্রমে ভিন্নরূপে গৃহীত হইয়া চিদাকাশেই বিলীন। অতএব হে রাম! দ্বৈত কি অদ্বৈত, সে ভ্রম তুমি পরিহার কর;

এই মাত্র তোমার ধারণার বিষয় হউক যে, ঐ উভয় যেন আকাশে আকাশ লীন হইয়াই অবস্থিত। দেশ, কাল, ক্রিয়া ও দ্রব্যরূপ স্ব স্ব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম চিদংশে একই চিৎ আত্মভূত অণুসমষ্টিকে যেন পৃথক পৃথক ভাবে অনুভব করিতেছে; প্রকৃতপক্ষে উহারা পৃথক্ নহে। ব্রহ্মা হইতে সামান্য কীট পর্য্যন্ত সকলেরই সূক্ষ্ম চিদংশ সমান বা এক হইলেও বিভিন্ন অন্তঃকরণরূপ উপাধি দ্বারা উহা পরিছিন্নপ্রায় এবং প্রলয়কালে অস্ফুট হইলেও সৃষ্টি-স্বপ্নের প্রসক্তিতে তত্তৎদেহ দর্শনে উহা অনুভূত হয়। কি যে অনুভূত হয়, তাহা অনির্ব্বচনীয়; বস্তুতঃ কিছু না হইলেও তাহা কি? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, যেমন কোন ভ্রান্ত ব্যক্তি নিজেই নিজের স্কন্ধে আরোহণ করিতে অভিলাষী হয়, তেমনি চিৎপরমাণু-সমষ্টি অর্থাৎ জীবগণ সেই স্বয়ং সত্য আত্মরূপকেই ভ্রান্তিবশতঃ দ্বৈতরূপে অনুভব করিতে থাকে। ঐ চিৎপরমাণু-অংশ বিশাল বপু ধারণপূর্ব্বক নেত্রাদিরূপ কুসুম-দ্বার দিয়া সম্বিৎসৌরভ সমুদ্গিরণ করিতে করিতে আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়। অন্তঃকরণ-পরিচ্ছিন্ন চেতনাই আপনাকে দেহাকারে অনুভব করে এবং বাহিরে আবার ঘটাদির আকার দেখিয়া থাকে। যে কিছু দৃশ্যপ্রপঞ্চ আছে, সকলেরই বীজ সেই চিৎ বৈ আর কেহই নহে। কোন সমষ্টি স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডাত্মা চিৎ বাহিরে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না দেখিয়া তৎসমস্ত অন্তঃস্থ-রূপে অনুভব করে, কখন চিরাভ্যাসবশে তাদাত্ম্য অভিমানে বিলীন ও কখন কখন বা আবির্ভূত হয় এবং বারম্বার একরূপ স্বপ্ন হইতে স্বপ্নান্তর দর্শন করিতে করিতে শৈলশিখর-স্খলিত শিলাখণ্ডের ভূলুণ্ঠনের ন্যায় স্বাত্ম-বিচ্যুত হইয়া সংসাররূপ মহাগর্ত্তে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইয়া থাকে। কোন কোন দেহখণ্ড পরস্পর সম্মিলিত, কেহ কেহ অভ্রান্ত আত্মপথে অবস্থিত, এবং কেহ কেহ স্বীয় সম্বিৎপ্রসরে নিমগ্ন। এই জগজ্জীবের বিভ্রম যাহারা অন্তরে দেখিতে পারে, অর্থাৎ এই জগৎ, এই আমি, এই তুমি, এ সকলই অন্তঃস্থ সম্বিতে স্বপ্নবৎ স্ফুরিত বা উদিত হইতেছে, এইরূপে সমস্তই ভ্রান্তি-বিজৃম্ভিত বলিয়া বুঝিতে সক্ষম হয়, তথাবিধ কতিপয় জীব এই বিশাল অসত্য দৃশ্যপ্রপঞ্চকে স্বপ্নবৎ আশ্রয় করিয়া থাকে। স্বভাবের সর্ব্বাত্মতা-নিমিত্ত যে কিছু দৃশ্যবস্তু সমস্তই আত্মাতে সত্যরূপে স্ফুরিত হয়; ফলতঃ যথায় সর্ব্ব-

গামী ব্রহ্ম বিদ্যমান, তথায় সমস্তেরই আবির্ভাব সর্ব্বথা সম্ভব। সমষ্টিজীবের অন্তঃস্থিত প্রতিভাস অর্থাৎ অজ্ঞান-জনিত কল্পনাবশে ব্যষ্টিসমুদায় জীবের আবির্ভাব এবং সেই সমুদায়েরও অন্তঃস্থিত প্রতিভাস অর্থাৎ কাল্পনিক দৃষ্টিতে জীবান্তর ও পদার্থান্তরের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। জীব হইতে জীবের উৎপত্তি, তাহারও অন্তরে আবার জীবের অবস্থিতি, এইরূপে সর্ব্বত্রেই কদলীদল-স্তরের ন্যায় জীব মধ্যে জীব বিদ্যমান। বুদ্ধি যখন দৃশ্য দর্শন হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া প্রত্যগাত্মার অভিমুখীন হইয়া উঠে, তখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয় এবং সেই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তৎপ্রভাবে কনকে কটকাদি বুদ্ধির ন্যায় যাবতীয় ভেদজ্ঞান বিনষ্ট হইয়া যায়।

রামচন্দ্র! এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রপঞ্চ কি? আমিই বা কে? ইত্যাদি বিষয়ে যাহার বিচারোদয় হয় নাই, জানিবে—তাহার অন্তর হইতে ঐ দীর্ঘ জীবজ্বর-ভ্রম অপগত হয় নাই। যে সদাশয় পুরুষের ভোগ-লালসা দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে, বুঝিবে—তাঁহারই বিচার সফলতার দিকে অগ্রসর হইয়াছে। যেমন যথাযথ পথ্যাদি নিয়ম পালন করত দেহ মধ্যে ঔষধ প্রয়োগ করিলে, আরোগ্য লাভ নিশ্চয়ই হয়, তেমনি ইন্দ্রিয়-জয় অভ্যাস করিতে সক্ষম হইলে বিবেক-সাফল্য অবশ্যই ঘটে। যাহার বিবেক বাক্যমাত্রেই অবস্থিত; পরন্তু মনেতে অবিবেকই বিরাজমান, তাঁহার ঐ বিবেক চিত্রিত অনলের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর। ফলে, অবিবেকিতা তাহার অপগত হয় নাই; তাহা তদীয় দুঃখের নিমিত্তই বর্ত্তমান। যেমন বায়ুর সত্তা স্পর্শ দ্বারাই অনুভূত হয়; পরন্তু বাক্য দ্বারা তাহার অনুভব হয় না, তেমনি বিবেকোদয় হইয়াছে, কি হয় নাই, ইহা বাসনার বেগ ক্ষয় হইলে তাহা দ্বারাই বিদিত হওয়া যায়। জানিও—যেমন চিত্রিত সুধা, সুধা নয়, চিত্রিত অগ্নি, অগ্নি নয় এবং চিত্রিত অঙ্গনা, অঙ্গনা নয়, জানিও—তেমনি কথামাত্রে যে বিবেক, সে বিবেক বিবেকই নহে, অর্থাৎ ঐ বাচিক বিবেক কখনই প্রবোধ-ফল প্রসব করিতে পারে না।

হে রাঘব! বিবেকের অভ্যুদয়ে প্রথমে বিষয়-লালসা ও বৈরাদি সমূলে ক্ষয় পাইয়া যায়। অনন্তর ইষ্টলাভ ও অনিষ্ট পরিহার বিষয়ে প্রযত্নও পরিক্ষীণ হয়। অতঃপর জ্ঞানপ্রতিষ্ঠা হইয়া থাকে। অতএব যাঁহাতে

যথার্থ বিবেকিতা আছে, অর্থাৎ যিনি প্রকৃত পক্ষে বিবেকী, তিনিই পরম পবিত্র।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! পরমব্রহ্মই জীবের বীজভূত; তিনি আকাশবৎ সর্ব্বত্রই বিরাজিত। এইজন্য জীবোদরে যে জগৎ আছে, তাহাতেও বহুবিধ জীবের অস্তিত্ব রহিয়াছে। কেবল-চৈতন্য পরমাত্মা যখন সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন, তখন যে ধরণীগর্ভে কীটস্থিতির ন্যায় জীবমধ্যে কদলীদলবৎ স্তরে স্তরে জীবজাতি অবস্থান করে, এ কথা বিশেষ বিস্ময়াবহ নহে। যেমন নিদাঘকালে দেহমধ্য-গত মল ও স্বেদ সঞ্চয় হইতে কৃমি জন্মিয়া থাকে, তেমনি যিনি শুদ্ধ চিৎ, তিনি আকাশপ্রায় হইলেও যেখানে যে যে দৃশ্যের অবস্থান, সেইখানে সেই সেই দৃশ্যভোগ নিমিত্ত আপনা হইতেই তদনুরূপ জীবে পরিণত হয়েন। ঐ জীবনিবহ যে যেখানে স্ব স্ব আত্মসিদ্ধির নিমিত্ত যে যেরূপে প্রযত্ন প্রকাশ করে, বিচিত্র উপসনাদি ক্রমে সেইখানে সেইরূপই হইয়া থাকে। এইজন্য যাঁহারা দেবযাজী, তাঁহারা দেবভাব প্রাপ্ত হয়েন, যক্ষযাজীরা যক্ষলোকে গমন করেন এবং যাঁহারা ব্রহ্মোপাসক, তাঁহারা ব্রহ্মপদ লাভ করিয়া থাকেন। অতএব উপদেশ এই যে, যাহা অতুচ্ছ অর্থাৎ সত্যবস্তু, তাহাই আশ্রয় করা কর্ত্তব্য। দেখ, ভৃগুনন্দন শুক্র প্রথমতঃ অপ্সরোরূপ দৃশ্য দেখিয়া বদ্ধ হইয়াছিলেন, পশ্চাৎ নির্ম্মল আত্মসম্বিৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহারই প্রভাবে মুক্তি লাভ করেন। এই বালিকারূপিণী আত্মসম্বিৎ ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া প্রথমতঃ যাহা প্রাপ্ত হয়, তৎস্বরূপই হইয়া থাকে, কদাচ অন্যরূপ হয় না; অতএব প্রকৃত কথা এই যে, ঐসম্বিৎকে মিথ্যা জীবাদিভাবে পরিচালিত না করিয়া বাস্তব ব্রহ্মাত্মভাবেই তাহার পরিচালন করা বিধেয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন এই দুই অবস্থার পার্থক্য কি? জাগ্রৎ কেন জাগ্রৎ অর্থাৎ সত্যতা-ব্যবহারের হেতু হয় এবং স্বপ্নই বা কি হেতু জাগ্রদাকার ভ্রম হইয়া থাকে? ইহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরত্ব আছে, তাহা জাগ্রদাখ্যায় অভিহিত এবং যাহাতে প্রত্যয়ের স্থিরত্ব নাই, তাহাই স্বপ্ন-নামে নিরূপিত। যদি চ স্বপ্নও কালান্তরে অবস্থিত ও প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত হয়, তবে তাহাও জাগ্রৎবিশেষ এবং জাগ্রৎও যদি কালান্তরে অনবস্থিত ও ক্ষণেকের জন্য স্বপ্নবৎ অনুভূত হয়, তবে সে জাগ্রৎও স্বপ্ন-সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট। এইরূপে জাগ্রৎও স্বপ্ন এবং স্বপ্নও জাগ্রৎ হইয়া থাকে। ফলের বেলায় স্থির ও অস্থির প্রত্যয় লইয়াই জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশার পার্থক্য। স্থিরতা ও অস্থিরতা ব্যতীত জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই উভয় দশার ভেদ কিছুই নাই। স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই উভয়ের সমস্ত অনুভবই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সমান। ফলে প্রত্যক্ষবৎ প্রতীত দীর্ঘ স্বপ্নও জাগ্রৎ এবং অস্ফুট প্রতীত ক্ষণিক জাগ্রৎও স্বপ্ন মধ্যে গণ্য। যদি জাগ্রদ্বুদ্ধিতে স্বপ্নেরও স্থিরতা গ্রহণ করা যায়, তবে তাহা জাগ্রৎ হইয়া পড়ে এবং স্বপ্নবুদ্ধিতে জাগ্রৎও স্বপ্ন হইয়া দাঁড়ায়। যাহাতে স্থির-প্রতীতি হয়, তাহার নাম জাগ্রৎ; পরন্তু ঐ জাগ্রৎ যাহাতে ক্ষণভঙ্গুরতা হেতু স্বপ্ন আখ্যা প্রাপ্ত হয় তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

রামচন্দ্র! এই শরীর মধ্যে এমন এক সার বস্তু আছে, যাহা জীবন ধারণের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ঐ বস্তু জীবধাতু আখ্যায় অভিহিত। এই জীবধাতুরই নামান্তর তেজো বীর্য্য। এই শরীর যখন মন, কর্ম্ম ও বাক্য দ্বারা ব্যবহারী হইবার চেষ্টা করে, তখনি ঐ জীবধাতু বায়ুদ্বারা বিচালিত হইয়া হৃদয় হইতে নির্গমনপূর্ব্বক সঞ্চরণ করিতে থাকে। জীব-ধাতু উক্তরূপে সঞ্চরণ করিতে থাকিলে শরীর-মধ্যস্থ নাড়ীনিচয়ে বিবিধ প্রবৃত্তি সমুদিত হয়। ঐ সকল সম্বিদের উদয় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারেই হইয়া থাকে। অন্তরে যে চিত্তাখ্য পদার্থ আছে, উহার অভ্যন্তরে জগৎ স্ব বিলীন; জীবধাতু প্রসর্পিত হইয়া উহার সহিত মিলিত হইলেই

বাসনানুরূপ সম্বিদের অনুসরণ করে। এই যে বাসনাময়ী সম্বিৎ ইহারই নাম স্বপ্ন; পরন্তু যৎকালে ঐ সম্বিৎ চক্ষুরাদি রন্ধ্রপথে প্রসর্পিত হইয়া আত্মাতে নানাকার-বিকারময় বাহ্যরূপ অবলোকন করে, তখনকার তাদৃশ অবস্থায় স্থিরপ্রতীতি থাকে বলিয়া উহাকে জাগ্রৎরূপে অনুভব করা যায় এবং উহাই জাগ্রদবস্থা নামে অভিহিত হয়। হে রাঘব! জাগ্রৎক্রম যে কি, তাহা বলা হইল, এক্ষণে সুষুপ্ত্যাদি অবস্থাক্রম শ্রবণ কর।

যৎকালে মন, কর্ম্ম ও বাক্য এই তিনটীর কোন একটির দ্বারাও দেহের কিছুমাত্র ক্ষুব্ধতা ও চাঞ্চল্য থাকে না, ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত জীবধাতু তখন প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া সুস্থ অবস্থায় বিরাজ করিতে থাকে। নির্ব্বাত নিকেতনস্থিত প্রজ্বলিত প্রদীপের ন্যায় উহা তখন শরীরস্থ বায়ুর নিস্পন্দতা বা সাম্যভাব অবলম্বনে হৃদয়াকাশে নিশ্চল হইয়া অবস্থান করে। কোন অঙ্গে বা চক্ষুরাদি রন্ধ্রপথে বাহিরেও তখন সম্বিৎ সঞ্চলিত হয় না; এইজন্য কোনরূপ ক্ষুব্ধতারই প্রসার উহাতে থাকে না। যেমন তিলে তৈলসম্বিৎ, হিমে শীতসম্বিৎ এবং ঘৃতে স্নেহসম্বিৎ বিদ্যমান, তেমনি সম্বিৎ তখন জীবে জীবভাবাপন্ন হইয়া স্ফুরিত হইতে থাকে এবং সেই জীবাকৃতি চৈতন্যকলা তৎকালে উপাধিকালুষ্য হইতে নির্ম্মুক্ত ও স্বচ্ছ হইয়া ব্রহ্মাত্মাতে প্রাণবাত-কৃত বিক্ষেপ-বিরহিত পৃথক্ চেতনহীন সৌষুপ্ত দশা প্রাপ্ত হয়। চিত্ত সর্ব্বব্যবহার হইতে উপরত হইলে যোগী পুরুষেরা শাস্ত্রালোচনা ও গুরূপদেশাদি দ্বারা সর্ব্বত্র অবৈষম্য জ্ঞান লাভ করিয়া একাগ্রতার সাধনা ও বিচারণা বলে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থায় সমভাবে বিচরণপূর্ব্বক সমাধিমগ্ন হয়েন এবং তীব্র প্রযত্ন বলে আত্মস্বরূপ সাক্ষাৎকারে তুর্য্যব্রহ্ম বা নির্ব্বিশেষ পরমাত্মপদে বিরাজ করেন। যোগী জন এই সময় তুর্য্যাবস্থায় অবস্থিত বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। সুষুপ্তি অবস্থায় প্রাণবায়ু সৌম্যভাব ধারণ করে; কিন্তু যখন সেই জীবধাতু ভোক্তার অদৃষ্ট পরিণতি-বশতঃ বৈষম্যপ্রাপ্ত প্রাণবায়ুর প্রেরণায় পরিচালিত হয়, তখন আবার সেই জীবচৈতন্য ভোগানুকূল প্রাক্তন সংস্কারের উদ্বোধনে চিত্তরূপে প্রকাশিত হয়। যোগী যেমন যোগবলে বীজমধ্যস্থ ভাবী বৃক্ষ দর্শন করিতে

পারেন, সেইরূপ ঐ চিত্ত তখন স্বীয় অন্তর্গত সংস্কারীভূত জগৎপরম্পরাকে ভাব ও অভাবরূপ ভ্রান্তি অনুসারে অন্তরে অবলোকন করিতে থাকে। ইহারই নাম স্বপ্নদর্শন। পূর্ব্বোল্লিখিত জীবধাতু যখন বায়ুবশে কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তখন সুপ্ত ব্যক্তি "অহমস্মি" ইত্যাকার অনুভব করে; আবার যখন ঐ জীবধাতু বায়ুদ্বারা অত্যধিক ক্ষুব্ধ হয়, তখন আপনার আকাশ-গতি অনুভব করিতে থাকে। এইরূপে যখন ঐ জীবধাতু ঐ নাড়ীমধ্যগত শ্লেষ্ম-রসে প্লাবিত হয়, তখন কুসুম কর্তৃক আপনার সৌরভ অনুভবের ন্যায় 'আমি জলে পড়িয়াছি' ইত্যাদিরূপ জলাদি সম্ভ্রম অনুভব করে। জীবধাতু যখন পিত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হয়, তখন বাহিরে নিদাঘতাপাদি অনুভূতির ন্যায় অন্তরেও নিদাঘাদি স্বপ্ন সংলক্ষিত হয়। এবং যখন ঐ জীব-ধাতু নাড়ীমধ্য-চলিত রুধির প্রবাহে প্লাবিত হইতে থাকে, তখন বাহিরের ন্যায় স্বীয় অন্তরেই রক্তবর্ণ দেশকালাদি অবলোকন করে। অর্থাৎ বাহিরে তাহা না থাকিলেও যেন বাহিরে আছে বলিয়াই অন্তরে তাহার অনুভব হয়, এবং তথাবিধ অনুভব থাকে বলিয়া তাহাতেই মগ্ন হইয়া পড়ে। অপিচ প্রাণবায়ু প্রাণবায়ু কর্তৃক পরিচালিত হইয়া বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা যেরূপ বাসনায় আবিষ্ট হয়, নিদ্রিত হইয়া অন্তরে তাহাই অবলোকন করে। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় স্থানসমূহের অনাক্রমণে বায়ুকৃত অন্তরের ক্ষুব্ধতায় জীবের যে চৈতন্যানুভব হয়, তাহাই স্বপ্ন নামে নির্দ্দিষ্ট। জীব যখন ইন্দ্রিয়চ্ছিদ্র সকল নিরোধপূর্ব্বক বায়ুকর্তৃক ক্ষুব্ধ হইয়া ঐ সমস্তই দর্শন করে, জীবের তাৎকালিক তাদৃশ দর্শনকেই মহর্ষিরা জাগ্রৎ আখ্যায় অভিহিত করেন।

রামচন্দ্র! এই সকলই তুমি বিদিত হইলে; তোমার অন্তরে অধুনা সদ্বুদ্ধি সমুদিত হইল। এখন আর এই অসত্য জগৎকে তুমি সত্যভাবে ভাবনা করিও না। কেন না, ঐরূপ অসত্যে সত্যজ্ঞান—আধ্যাত্মিক আধি-ভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিবিধ মরণ ও তৎকারণ দোষরাশির জনক সম্পাদক।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৯॥

বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! তোমার নিকট আমি এই প্রকারে মনের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া কহিলাম। পূর্ব্বে ঐ যে জাগ্রদাদি বর্ণিত হইল, উহা কেবল মনঃস্বভাবের পরিজ্ঞানার্থই পরিস্ফুট। এতদ্ভিন্ন উহাতে আর কোনই প্রয়োজন বিশেষ নাই। যেমন বহ্নিসংযোগে লৌহপিণ্ড যেন বহ্নিভাব উপগত হয়, তেমনি সুদৃঢ় নিশ্চয়সম্পন্ন হইয়া চিত্ত যখন যাহা ভাবনা করে, তখনই সেইভাব প্রাপ্ত হয়। কি সৎ, কি অসৎ, কি হেয়, কি উপাদেয়, সকলই মনের কল্পনামাত্র। কাজেই ঐ সকল সত্যও নহে এবং অসত্যও নহে। একমাত্র মনের চাঞ্চল্যই ঐ সকলের কারণ বলিয়া কথিত। মনই মোহকর্ত্তা এবং মনই জগৎস্থিতির কারণ। ঐ মালিন্য-সম্পন্ন মনই ব্যষ্টি ও সমষ্টিরূপে এই দৃশ্য বিশ্ব বিস্তার করিতেছে। মনই কর্ত্তৃপুরুষ; অতএব উহাকে মঙ্গলের পথে নিয়োগ করাই কর্ত্তব্য। মন শুভপথে নিযুক্ত ও বিজিত হইলে জাগতিক যাবতীয় অণিমাদি বিভূতি ও তত্ত্ববোধ বশীভূত হইয়া থাকে। দেখ, শরীরই যদি পুরুষ হইত, তাহা হইলে মহামতি শুক্রাচার্য্য বিবিধাকার শত শত জন্ম ভ্রম প্রাপ্ত হইবেন কেন? অতএব চিত্তই পুরুষ-পদবাচ্য; শরীর তাহার চেত্য মাত্র। ঐ চিত্ত যে যেরূপ ভাবনায় তন্ময় হইবে, সেই সেইরূপই প্রাপ্ত হইবে; এ বিষয়ে কোনই সংশয় নাই।

রামচন্দ্র! যাহা তুচ্ছ নহে, যাহাতে কোনই আয়াস নাই, যাহা নিরুপাধি ও ভ্রম-বিরহিত, তুমি যত্নের সহিত তাহারই অনুসন্ধান কর; তাহা হইলেই তন্ময়তা প্রাপ্ত হইতে পারিবে। যে দেশ বা যে বিষয় মনের অভিলষিত হয়, শরীর তাহারই অভিমুখে ধাবিত হইয়া থাকে; কিন্তু শরীরের আচরিত বিষয়ে মন অনুগমন করিতে বাধ্য হয় না। তাই বলিতেছি, হে সুন্দর! তোমার মনও অধুনা সত্য বিষয়ের অভিমুখেই উপনীত হউক এবং দেহেন্দ্রিয়াদি যে কিছু অসত্য দ্বৈতভ্রম, তৎসমস্ত পরিহার করুক।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ, ভগবন্! বাৱাংধি-বক্ষে বিলোল কল্লোলের ন্যায় আমার হৃদয়ে যে আর একটী মহাসংশয় উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে, আপনি তাহা নিরাস করুন। আমার সেই সংশয়টী এই যে, আত্মা যিনি, তিনি ত দিক্ ও কালাদিকৃত পরিচ্ছেদ-পরিহীন; সুতরাং তিনি বিস্তৃত, নিত্য ও নিরাময়; তাঁহাতে কিরূপে কোথা হইতে এই বিষয়াকার-কলঙ্কিতা মনোনাম্নী সম্বিৎ সমুপাগত হইল? এই সম্বিৎ কে? আমার এই প্রশ্নের উত্তরে যদি এইরূপ বলেন যে, উহা অবিদ্যা-কলঙ্কবশেই হয়, তাহা হইলে বলিব, এ কথা সম্ভব হয় না; কেন না, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ের মধ্যেও যাঁহাতে আর দ্বিতীয় কেহই নাই; যিনি নিত্য নিরঞ্জন নির্ম্মল বস্তু, তাঁহাতে কিরূপে কোথা হইতে কিরূপ কলঙ্কের বিদ্যমানতা সম্ভব হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তুমি অধুনা উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ; তোমার মতি অধুনা মোক্ষোপযোগিনী হইয়াছে। নন্দনবনস্থ পারিজাত-পুষ্পের সুন্দর মকরন্দ-নিষ্যন্দশালিনী মঞ্জরীর ন্যায় ত্বদীয় মতি সম্প্রতি উত্তম পদার্থ অনুভবে চমৎকৃত ও পূর্ব্বাপর অর্থ বিচারে সমর্থ হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করপ্রভৃতি মহাপুরুষেরা যে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও সেই পদ প্রাপ্ত হইবে। পরন্তু হে রাম! এখনও তোমার এইরূপ প্রশ্ন করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত হয় নাই। যখন সিদ্ধান্ত বিষয় বলা হইবে, তখনই এইরূপ প্রশ্ন উত্থাপন করা সঙ্গত; সুতরাং আমি যে কালে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিব, তুমি তখনই ঐ বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করিও। তাহাতে করা-মলকবৎ অনায়াসে ঐ বিষয়ের সিদ্ধান্ত তোমার স্ফূর্ত্তি হইবে। যেমন বর্ষা-গমে ময়ূরের ও শরদাগমে হংসের রব উৎকর্ষ লাভ করে, তেমনি তোমার এই প্রশ্ন সিদ্ধান্তকালে হইলেই উত্তম হইবে। দেখ, বর্ষা যখন চলিয়া যায়, তখন নভোমণ্ডলে সহজ নীলিমা বিরাজ করে; কিন্তু যতক্ষণ বর্ষা থাকে, সে পর্য্যন্ত কেবল পয়োদপঙ্ক্তিই নভোমণ্ডল ঢাকিয়া রাখে, তখন তাহার

সহজ নীলিমা নেত্রগোচর হয় না। এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝিবে, তোমার প্রশ্নের উত্তর যথাকালেই প্রদত্ত হইবে; অসময়ে হইবে না।

হে সুব্রত! যাহা হইতে জনগণের জন্ম, আমি অধুনা সেই মনের স্বরূপ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকারে অজ্ঞান-মালিন্য, অজ্ঞজনেরও অনুভবসিদ্ধ। ঐ অজ্ঞানোপহিত চিদ্বস্তু বিকৃতিকালে প্রকৃতি-স্বরূপে বিরাজ করেন। উহাই আবার মননধর্ম্মিণী হইয়া মন হইয়া থাকেন। এইরূপে দর্শনশক্তির অভ্যুদয়ে চক্ষু, শ্রবণশক্তির আবির্ভাবে শ্রোত্র এবং কর্ম্মেন্দ্রিয়-ভাবাপন্ন হইলে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মাদিরূপে প্রথিত হইয়া থাকেন; মুমুক্ষুগণ শ্রুতি প্রমাণাদি দ্বারা ইহাই নির্ণয় করিয়াছেন। শ্রবণ কর, আরও এক কথা এই যে, ভিন্ন ভিন্ন বাদিগণ স্ব স্ব বুদ্ধি ও মতানুসারে এবং বিচিত্র শাস্ত্রসমূহের সমালোচনায় সেই একই পদার্থের নানাবিধ নাম, রূপ ও আকার কল্পনা করিয়াছেন। কেন এরূপ ঘটে? তাহার কারণ এই যে, পবন যেমন পরস্পর বিভিন্ন সুগন্ধি কুসুমশ্রেণীর মধ্যে থাকিয়া সেই সেই কুসুমরাজির গন্ধগুণে ভিন্ন ভিন্নভাবে সুরভিসম্পন্ন হয়, মনন-ব্যাপারে চঞ্চল মনও তেমনি যে যেরূপ বাসনা ধারণা করে, সেই সেইরূপেই পরিণতি লাভ করে। মন প্রথমে বাসনানুরূপ মনন বা কল্পনার আবির্ভাব, অনন্তর বুদ্ধিবলে তাহারই অবধারণা, পরে অন্তঃস্থিত অনুরঞ্জনা অর্থাৎ স্বকল্পিত বিষয়ে আত্মীয়তা ও সত্যতা জ্ঞান এবং তৎপরে তাহা অহঙ্কারে রঞ্জিত করত বারম্বার আস্বাদনপূর্ব্বক চমৎকারিতা অনুভব করে। জানিবে, বিষয়ী-দিগের বিষয়াস্বাদ সম্বন্ধেও নিয়ম এইরূপই। মন যন্ময় হয়, শরীর ধারণ ও বুদ্ধিপ্রভৃতি সকলই তন্ময় হইয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! মন যাদৃশ ভাবাপন্ন হয়, সেই মনের বশতাপন্ন শরীরও গন্ধানুসারী পবনের গন্ধভাব লাভের ন্যায় সেই মনের ভাব ধারণ করে; ফল কথা, মন শরীরে যে যেরূপ বাসনায় বাসিত হয়, শরীরও তদনুরূপই হইয়া থাকে। যেমন প্রবল পবন প্রবাহিত হইলে পার্থিব রজোরাশি স্বতই সমুত্থিত হয়, তেমনি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যখন আবির্ভূত হইয়া স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যাপৃত হয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলও তৎকালে আপনা হইতে তদনুরূপ কার্য্যে নিরত হইয়া থাকে। যখন [illegible]য়-সমূহ চালিত হইয়া স্ব স্ব ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তৎকালে

অনিলে ধূলিজালবৎ ইতস্ততঃপ্রসর্পী কর্ম্মনিচয় সম্পন্ন হইতে থাকে। মনের কর্ম্ম এইরূপ; এইজন্য মন কর্ম্মবীজ নামে অভিহিত। কুসুম ও গন্ধের সত্তার ন্যায় কর্ম্মের ও মনের সত্তা অভিন্ন অর্থাৎ একই। সুদৃঢ় অভ্যাসের বশে মন যেমন যেমন ভাব প্রাপ্ত হয়, দেহস্পন্দ ও কর্ম্মের শাখা-প্রশাখা সেই সেইরূপ ভাবেই বিস্তার করে; অনন্তর সমাদর সহকারে কার্য্য সম্পাদন-পূর্ব্বক তৎফলের আস্বাদন করিয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে। মন যে যে ভাব গ্রহণ করে, সেই সেই ভাবই তাহার নিকট বস্তুরূপে উপলব্ধ হয়। মনের তখন এইরূপ ধারণা সুদৃঢ় হইয়া উঠে যে, উহা অপেক্ষা শ্রেয়স্কর আর কিছুই নাই। এই মনই স্বীয় বুদ্ধিবলে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের নিমিত্ত সতত যত্ন করিয়া থাকে। কপিল-মতবাদীরা এইরূপ স্বীকার করেন যে, মনই স্বীয় জ্ঞানে আত্মার স্বরূপনৈর্ম্মল্য প্রদান করে। এই সুখদুঃখ-মোহাত্মক জড় জগতের উৎপাদন কারণ মনই। উহাই ত্রিগুণাত্মক ও প্রধান পদবাচ্য; সুতরাং উক্ত মতাবলম্বীরা ঐ মনকেই তত্ত্বরূপে নিরূপণ করিয়া সেই অনুসারে শাস্ত্রদৃষ্টি কল্পনা করেন। উল্লিখিত উপায় অবলম্বন ব্যতীত কাহারও মোক্ষলাভ ঘটিবে না; এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের কল্পিত নিয়মনিচয় অবলম্বনপূর্ব্বক স্ব স্ব জ্ঞান গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন এবং অপরাপরকে তাহা বুঝাইবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। বেদান্তবাদিগণের মতে এ জগৎ ব্রহ্মই; ব্রহ্ম বৈ ইহা আর কিছুই নয়; এইরূপ স্থির বুদ্ধিতে সর্ব্বানর্থ-নিবৃত্তি ও বাস্তব নিরতিশয়ানন্দময় ব্রহ্মাত্মভাবে আবির্ভাবরূপে মুক্তি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইহা ভিন্ন প্রকারান্তরে মুক্তি প্রাপ্তি নাই, এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব কল্পিত নিয়মনিচয়ে জ্ঞানদৃষ্টি সকল শাস্ত্রাকারে প্রকটিত করত জনসাধারণের বোধোপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। বিজ্ঞানবাদিগণেরও এই জগদ্ভ্রম স্বীকার্য্য। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, প্রলয়োপপ্লব প্রশমন ও ইন্দ্রিয়দ্বার নিরোধনপূর্ব্বক শমদমাদি প্রসিদ্ধ সাধনচতুষ্টয় দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধিধারায় অনুপ্রবেশই মুক্তি। ইহা ভিন্ন অন্য উপায়ে মুক্তি প্রাপ্তি ঘটে না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাঁহারা স্ব স্ব কল্পিত নিয়মে শাস্ত্রাকারে মুক্তির উপায় প্রকাশ

প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ আর্হত প্রভৃতি অপরাপর মতাবলম্বীরাও নিজ নিজ ইচ্ছামত বিচিত্র আচারে অর্থাৎ নগ্ন অবস্থায় ও ভিক্ষাচরণাদি ব্যবহারে বিচিত্র শাস্ত্রদৃষ্টি কল্পনা করিয়াছেন। যেমন কারণ নাই, অথচ জল হইতে নানাবিধ বুদ্‌বুদাবলী উদ্ভূত হয়, তেমনি বিবিধ বাদিগণের বিবিধ নিশ্চয়ে মোক্ষোপায় শাস্ত্রসমূহের রীতিও নানাবিধ হইয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; পরন্তু হে মহাভুজ! যেমন নানাবিধ মণিশ্রেণীর একমাত্র আকর সাগর, তেমনি নানাকারসম্পন্ন রীতি, নীতি, আকৃতি ও সংস্থানাদির একমাত্র আকর মনই। প্রকৃত পক্ষে নিম্বও কটু নয়, ইক্ষুও মধুররস নয়, সুধাকরও শীতল নহে এবং বহ্নিও উষ্ণ নহে; তবে কথা এই, মনের যাহা যে প্রকারে দৃঢ়ভাবে অভ্যস্ত, তাহা সেইরূপেই উপলব্ধ হয়; অতএব যাহা অকৃত্রিম আনন্দস্বরূপ, সর্ব্বসাধারণেরই তাহার জন্য যত্নপরায়ণ হইয়া মনকে আনন্দময় করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করিলে অকৃত্রিম আনন্দপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী। এ কথা নিশ্চয়ই জানিবে যে, এই শিশু সন্তানবৎ স্নেহাস্পদরূপে প্রতীত অসত্য মনোরূপ দৃশ্য যদি পরিহার করিতে পারা যায়, তাহা হইলে মমোজনিত যে সুখ-দুঃখ, তাহাতে আর কখন আকৃষ্ট হইতে হয় না।

হে নিষ্পাপ! এই প্রতীত দৃশ্য বিশ্ব অপবিত্র, অসৎস্বরূপ, মোহজনক, ভীতিপ্রদ ও বন্ধনকারক; সুতরাং তুমি ঐ দৃশ্য ভাবনা করিও না। এই দৃশ্য-ধর্ম্মই মায়া বা অবিদ্যা নামে কথিত। উহার ভাবনা হইতেই ভয় জন্মিয়া থাকে। বুধগণ বিদিত আছেন; আত্মচৈতন্যের ঐ যে মায়াসম্বন্ধ, উহাই বন্ধনের হেতুভূত কর্ম্ম। রামচন্দ্র! ঐ মোহজনক মনকেই তুমি দৃশ্য বলিয়া ধারণা করিবে এবং এই যে অতি মলিন মিথ্যা মনঃপঙ্ক, ইহা তোমাকে প্রক্ষালিত করিয়া ফেলিতে হইবে। হে রাম! এই যে নৈসর্গিক দৃশ্য তন্ময়ত্ব অনুভূত হয়, বুধগণ ইহাকেই সংসার-মদিরারূপিণী অবিদ্যা বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মনুষ্য যখন এই অবিদ্যায় উপহত হয়, তখন অন্ধ যেমন উজ্জ্বল সৌরালোক লাভে সমর্থ হয় না; তেমনি তাহার পক্ষেও কল্যাণ লাভ ঘটে না। যেমন সঙ্কল্প-কল্পিত আকাশতরুর আবির্ভাব, তেমনি ঐ অবিদ্যারও সঙ্কল্পবশেই স্বয়ং সমুত্থান।

হে মহামতে! যদি সঙ্কল্প মাত্র পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে ঐ অবিদ্যা ভাবনা ক্ষীণ হইয়া যায়। পরে অসঙ্কল্পভাবের অভ্যাস হইলে, কি নিত্য, কি যে অনিত্য, ঈদৃশ বস্তুবিবেক উৎপন্ন হয়; ক্রমশঃ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন উপস্থিত হইয়া থাকে; এইরূপে সমাধি অভ্যাস সুদৃঢ় হইয়া উঠে। সমাধির সুদৃঢ়তা সম্পন্ন হইলে তখন দৃশ্যের সহিত আত্ম-সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, সত্য-দর্শনে স্থিরতা জন্মে এবং আমিই সেই 'আত্মা' এবম্বিধ বোধ তখন সর্ব্বপদার্থেই স্থিরতা লাভ করে। যখন সত্যদৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন অসত্যের উচ্ছেদ হয় এবং নির্ব্বিকল্প নির্ম্মল চিন্ময় আত্মা তখন লব্ধ হইয়া থাকেন। সত্তা বা অসত্তা, সুখ বা দুঃখ ইহার কিছুই আত্মার নাই। তিনি কেবল কৈবল্যরূপেই স্বীয় অনুভব দ্বারা অন্তরে উপলব্ধ হইয়া থাকেন। অনর্থপরম্পরার হেতুভূত দেহা-দিতে তিনি লব্ধ হইবার নহেন। চিত্ত ও ইন্দ্রিয়দৃষ্টির সম্বন্ধ তাঁহাতে নাই। তিনি নিখিল বাসনাজাল হইতে নির্ম্মুক্ত। মেঘাচ্ছন্ন ব্যোমভাগের ন্যায় যদীয় আত্মা অনন্ত বাসনাজালে পরিবৃত, এবং রজ্জুতে ভুজঙ্গদর্শনের ন্যায় আপনাতে যে জন দেহাদি দর্শন করে, সে নিজেই নিজের বন্ধন-কর্ত্তা হয়। চিদাকাশ অর্থাৎ আত্মা অবদ্ধস্বভাব; সুতরাং তাঁহার যে বন্ধনভাব, তাহা কল্পিত। তিনি আপনিই আপনার কল্পনায় বন্ধনগ্রস্তের ন্যায় হইয়া থাকেন। একই আকাশ যেমন দিবা ও রাত্রি কালে বিভিন্ন বর্ণ ধারণ করে, তেমনি একমাত্র পরব্রহ্মই বিভিন্ন কল্পনা বলে নানাকৃতি ধারণ করিয়া থাকেন; কিন্তু যৎকালে তিনি কল্পনাজাল পরিহার করেন, তখন সত্যস্বরূপ, নিরুপাধি, ভ্রান্তিবিহীন পরম পুরুষার্থ-সুখে পরিশেষিত হইয়া থাকেন। শূন্য ধান্যাগারে সিংহ না থাকিলেও তাহাতে সিংহ আছে ভাবিয়া লোকে যেমন ভীত হয়, তেমনি শূন্য শরীরে আত্মা বদ্ধ আছেন, এ ভাব বাস্তব না হইলেও 'আমি বদ্ধ' ভাবিয়া লোক ভীত হইয়া থাকে। পরন্তু যে জন সিংহ ভাবিয়া ভীত, সে যেমন শূন্য ধান্যাগার পর্য্যবেক্ষণ করিলেই নির্ভয় হয়, তেমনি কে বদ্ধ? কাহার বন্ধন? এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধান করিলেই বন্ধনমুক্ত হওয়া যায়; কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিলে আত্মার বন্ধন পরিলক্ষিত হয় না। যেমন আপনার ছায়া দর্শনে তিন কি চারি

বৎসর-বয়স্ক বালকের মনে বেতাল বলিয়া ধারণা জন্মে, তেমন 'এই জগৎ' 'এই আমি' ইত্যাদিরূপ ভ্রম উত্থিত হয়। প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে বেতালবৎ সকলই অলীক বৈ আর কিছুই নহে। জীব সকলের বৈভব ও দারিদ্র্য ইত্যাদিরূপ শুভাশুভ ভাবপ্রবাহ তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে ক্ষণেকের মধ্যেই অসৎ হইয়া পড়ে, আবার কল্পনায় ক্ষণেকের মধ্যেই সৎ হইয়া থাকে। ফলতঃ যেমন যেমন কল্পনা, অর্থক্রিয়াও সেই সেইরূপই হয়; একথা ত প্রসিদ্ধই আছে। দেখ, মাতৃস্থানীয়া রমণীকে যদি পত্নীভাবে ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে ঐ রমণী কণ্ঠলগ্নিনী হইলে পত্নীর ন্যায়-সম্ভোগ সুখ প্রদান করিয়া থাকে, আবার পত্নীকে যদি মাতৃভাবে গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ পত্নীও—হউক না কণ্ঠলগ্নিনী, তথাপি মাতৃভাবনায় নিশ্চিতই সে কামভাব বিস্মরণ করাইয়া দেয়। ফলতঃ ফলাফল যে কিছু, সকলই ভাবনার অনুযায়ী হয়; ইহা দেখিয়া জ্ঞানিগণ কোন পদার্থেই ঐকরূপ্য অঙ্গীকার করেন না। চিত্ত সুদৃঢ়ভাবে যে যে বিষয় যতকাল ভাবনা করে, তত কাল সে, সেই ভাব, সেই আকার ও সেই ফল অবাধে অবলোকন করিতে পারে। ফলে এমন কিছুই নাই, যাহা মিথ্যা নহে। বুদ্ধিবলে যে যাহা নির্ণয় করিয়া লয়, সে তাহা তদাকারেই লক্ষ্য করিয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্ত দেখ, আকাশে যদি দৃঢ়ভাবে হস্তী ভাবনা করা যায়, তাহা হইলে মন তখন আকাশ-হস্তিরূপে আকাশ-কানন-চারিণী হস্তিনীর অনুধাবন করে। অতএব হে রাঘব! তুমি ইহাই জানিও যে, একমাত্র সঙ্কল্পই সর্ব্বভাবাত্মক এবং তাহা তোমার পরিত্যাজ্য। সুতরাং তুমি ঐ সঙ্কল্প পরিহার কর এবং সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় পারমার্থিক অদ্বয় আনন্দ উপভোগ করিতে থাক। যদি বল, আমি নিখিল সঙ্কল্প সহ দ্বৈতভাব পরিত্যাগ করিলেও মণিমধ্যে প্রতিবিম্ব-পাতের ন্যায় আমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৎসমস্তের প্রসার থাকিতে পারে? এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, মণি হইল—জড় পদার্থ; সুতরাং আপনাতে যে অন্য বস্তুর প্রতিবিম্বপাত হয়, তাহা তাহার নিবারণ করিবার ক্ষমতা নাই; কিন্তু রামচন্দ্র! আপনারা হইলেন—প্রাজ্ঞ জন; সুতরাং ভবাদৃশ ব্যক্তি আত্মা হইতে ঐরূপ অসত্য

প্রতিবিম্বিত বস্তু কেন যে দূরীকৃত করিতে পারিবেন না, তাহা ত আমার ধারণাতীত।

হে রঘুনন্দন! তোমার আত্মাতে যে জগৎ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাকে তুমি অবস্তু বলিয়া নির্ণয় কর; পরন্তু তাহাতে তুমি অনুরক্ত হইও না। ঐ জগৎ পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, সত্যরূপে প্রতিভাত; তুমি এইরূপেই উহাকে বিদিত হও এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে অনাদি অনন্তরূপে ভাবনা করিতে থাকে। হে রাম! তোমার চিত্তে যে সমস্ত পদার্থ প্রতিবিম্বিত হইতেছে, সেই অসত্য পদার্থপুঞ্জ যেন তোমায় রঞ্জিত করিতে পারে না। জীবের মন স্ফটিকমণির ন্যায় প্রতিভাত; মন মনন দ্বারা মন্তব্য পদার্থসমূহের প্রতিবিম্ব গ্রহণ নিশ্চয়ই করিবে। কিন্তু মনন পরিত্যাগ করিতে পারিলে তখন আর কোনও পদার্থের প্রতিবিম্বপাত হইবে না। তুমিও মনন পরিহার কর; প্রারব্ধ ভোগোচিত জগদ্ব্যবহার-কামনা প্রগাঢ় ভাবে তোমায় যেন আশ্রয় করে না।

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, রামচন্দ্র! যৎকালে জীব বিচার-পরায়ণ হইলে তদীয় চিত্তবৃত্তি বিগলিত হইয়া যায়, কোনও রূপ মননই তাহার থাকে না; বিশুদ্ধ আত্মভাবে জীব যখন কিঞ্চিৎ পরিণত হয়, যৎকালে এই দৃশ্য অজ্ঞান-ভূমিকার পরিহার এবং উপাদেয় জ্ঞানভূমিকার প্রাপ্তি ঘটে; যখন সমস্ত দৃশ্য বিশ্বই চিন্মাত্র দ্রষ্টার আকারে পরিদৃষ্ট হইতে থাকে; ঐ চিন্ময় দ্রষ্টা ব্যতীত আর কিছুই যখন লক্ষিত হয় না; যখন জীব বোদ্ধব্য পরম তত্ত্বে অবস্থিত, তদনুধ্যানে নিরত, ও এই গভীর অজ্ঞান-বিকারাত্মক সংসারপথে সুপ্তপ্রায়; যখন একান্ত বৈরাগ্যোদয়ে সরস, নীরস ও আপাতত-মধুর ভোগ-পরম্পরায় আত্মা বিরক্ত এবং প্রারব্ধ উপনীত ভোগসমূহেও

আশাবিহীন; যখন এই অনাদি জড় অজ্ঞানাকাশ বিগলিত ও আত্মস্বরূপ সলিলের সহিত একীভূত হওয়ায় আতপে হিমবিন্দুর ন্যায় একেবারেই উহা নিঃশেষ হইয়া যায়, বর্ষাবসানে বিলোল জলকল্লোলশালিনী তরঙ্গিণীর ন্যায় যৎকালে সকল তৃষ্ণার শান্তি হয় এবং যখন মূষিক-ছিন্ন পক্ষি-বন্ধন-বাগুরার ন্যায় সংসারের সমস্ত বাসনাজাল ছিন্ন ও বৈরাগ্যবেগে হৃদয়গ্রন্থি শিথিলিত হইয়া যায়, তখন কতক-ফলের রেণুযোগে নির্ম্মলীকৃত জলের ন্যায় বিজ্ঞানবশে মন প্রসন্ন হইয়া উঠে; তখন মন নিষ্কাম হয়, তাহাতে বিষয়ানুসন্ধান থাকে না, সে দ্বন্দ্বরহিত ও পুনঃপুনঃ ভোগলালসার ভূমি হইতে বিরত হয়; এই অবস্থায় পিঞ্জর হইতে বিহঙ্গমের ন্যায় মন হইতে মোহ বিনির্গত হয়। তখন সমস্ত সন্দেহ-দৌরাত্ম্য শান্ত হইয়া যায়, সমস্ত কৌতুক-বিভ্রম অপগত হয়, মন তখন পরিপূর্ণ হইয়া পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় বিরাজ করিতে থাকে। যেমন পবন প্রশান্ত হইলে সাগর সাম্য-ভাব অবলম্বন করে, তেমনি তখন অন্যান্য ভাবের অপগমে সর্ব্বত্রেই সমুন্নত সমদর্শিতা সমুদিত হইয়া অসাধারণ সৌন্দর্য্য-সম্পন্ন হয়। রবির উদয়ে তমস্বিনী যামিনীর যেমন অবসান ঘটে, তেমনি তখন সংসারবাসনার ক্ষয় হইয়া যায়। তৎকালে দেখিতে পাওয়া যায়, চিদাদিত্যের অভ্যুদয় হইতেছে; সেই চিদাদিত্যের আলোকচ্ছটায় পুণ্য পল্লবশালিনী বিবেক-কমলিনী বিকাশ পাইতেছে। মনে হয় যেন নির্ম্মলদ্যুতি প্রভাত-গগনস্থলী মূর্ত্তিবতী হইয়া বিরাজ করিতেছে। তখন পূর্ণ সুধাংশুর অংশুরাজির ন্যায় সত্ত্বগুণের উপচয়ে উপগত মনোহারিণী জগদাহ্লাদিনী প্রজ্ঞা পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ সম্বন্ধে আর অধিক বলিব কি? যে মহামতি মহাপুরুষ সর্ব্ব বেদিতব্য বিদিত হইয়াছেন, সেই মহাত্মা মারুতাদি ভূত-চতুষ্টয়-বিরহিত আকাশকোষবৎ অপরিচ্ছিন্ন; তাঁহার আর উদয় অস্ত কিছুই নাই। যিনি বিচারবলে আত্মভাব পরিজ্ঞাত হইয়া আত্মস্বরূপে সমুদিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও শঙ্করও অনুকম্পার পাত্র হইয়া থাকেন। অর্থাৎ হউন না তাঁহারা দেবপ্রধান, আত্মজ্ঞ আত্মস্বরূপ পুরুষ তাঁহাদের অপেক্ষাও উচ্চপদে সমারূঢ়। যেমন হরিণশাবকেরা মরীচিকা-জল পায় না, তেমনি যিনি অন্তঃপ্রকটাকার নিরহঙ্কার ব্যক্তি, তাঁহাকে আর বিকল্পজাল প্রাপ্ত

হয় না। এই জীবপরম্পরা তরঙ্গাবলীর ন্যায় চিত্ত হইতে জন্মিতেছে এবং পুনরায় বিলীন হইতেছে, যে অনভিজ্ঞ জন ইহা জানে না, জনন মরণ আসিয়া তাহাকেই আয়ত্ত করে; পরন্তু যিনি জ্ঞানী, তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। একবার আবির্ভাব আবার তিরোভাব, ইহাই সংসারের ক্রম; এই ক্রম বিদিত হইয়া যে জ্ঞানী জন সংসারের আবির্ভাব ও তিরোভাবে সমদৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি কৌতুক দর্শনের জন্যই সংসারে ক্রীড়া করেন; পরন্তু তাহাতে কখন আসক্ত হয়েন না; আর যাহারা অজ্ঞ জন, তাহারাই তাহাতে আসক্ত হইয়া আবদ্ধ হইয়া থাকে। যেমন ঘটে ঘটাকাশের উৎপত্তি বিনাশ নাই, তেমনি দেহ উৎপন্ন অথবা বিনষ্ট যাহাই কেন হউক না, আত্মার তাহাতে কিছুই হয় না; তিনি যেমন—তেমনই থাকেন। যিনি এই রহস্য জানেন, তথাবিধ আত্মজ্ঞ জন, দেহ—ভূষিত বা দূষিত যাহাই হউক, কোন কিছুতেই লিপ্ত থাকেন না। সায়ংকাল আসিলে মরুভূমিগত মরীচিকা যেমন বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি যখন বিবেকরূপ শীতাংশুর অভ্যুদয় হয়, তখন এই মিথ্যা ভ্রমরূপ মরুস্থলী হইতে সমুৎপন্ন বাসনা বিলীন হইয়া যায়। 'আমি কে? এই দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চই বা কিরূপে কোথা হইতে আসিল?' এইরূপ বিচার যতদিনে না সমুদিত হয়, এই সংসার-আড়ম্বর ততকালই অন্ধকারের ন্যায় অবস্থান করে। এই যে দেহ দেখিতেছ, ইহা মিথ্যা ভ্রমসমূহ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া আপদের আস্পদ হইয়াছে; যিনি ইহাকে আত্মভাবনায় অবলোকন না করেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। দেশ ও কালের বশে এই দেহে কত অনন্ত সুখ-দুঃখ সমুৎপন্ন হইতেছে; যিনি সে সকল সুখ-দুঃখকে 'আমার' বলিয়া না বুঝেন, অর্থাৎ আত্মাতে যাঁহার সুখ-দুঃখ ভ্রম নাই, সেই অভ্রান্ত পুরুষই প্রকৃত তত্ত্বদর্শী। এই যে অসীম অনন্ত নভোমণ্ডল, এই যে দিক্ ও কালাদি এবং এই যে বিবিধ বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপ-সম্পন্ন বিশাল বিশ্ব, সর্ব্বত্রই আমি এবং সকল পদার্থই আমি, এই-রূপে সর্ব্ববিধ পদার্থপুঞ্জে যাঁহার আত্মবোধ বিদ্যমান, তিনিই যথার্থ আত্ম-দর্শী। যিনি জানিতে পারেন, 'অহং' বা 'আত্মা' সর্ব্বব্যাপী বা সর্ব্বত্র বিদ্যমান হইলেও কেশাগ্রের কোটি কোটি লক্ষভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা। যিনি আপনাকে এবং অপর সমস্ত দৃশ্য-

কেই অভেদজ্ঞানে এইরূপ দেখিতে থাকেন যে, এই সমস্তই চিজ্জ্যোতিঃ; চিজ্জ্যোতিঃ ব্যতীত অন্য কিছুই নহে; তিনিই যথার্থ দেখিতে জানেন। যিনি—সর্ব্বশক্তি-সম্পন্ন নিখিল পদার্থের অভ্যন্তরস্থিত অনন্তাত্মা অদ্বিতীয় চিদ্বস্তুকে আপনার অন্তরে দেখিতে থাকেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। এই যে আধি-ব্যাধি-ভয়ে সমুদ্বিগ্ন, জরা-মৃত্যু-গ্রস্ত দেহ, এই দেহই আমি বা আত্মা, এইরূপে যিনি স্থির ধারণা না করেন, তিনিই প্রকৃত তত্ত্বদ্রষ্টা। যিনি বুঝিয়া দেখেন যে, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্, সর্ব্বত্রই মদীয় মহিমা পরিব্যাপ্ত, আমি অদ্বিতীয়; আমার দ্বিতীয় আর কেহই নাই, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। যিনি দেখিয়া থাকেন, সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি সর্ব্ব পদার্থ আমাতেই গ্রথিত রহিয়াছে, আমি অন্তঃকরণ নহি; এবম্বিধ দ্রষ্টাই প্রকৃত দ্রষ্টা। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ এই কালত্রয়ের মধ্যে আমি বা আর কেহই নাই, একমাত্র নিরাময় ব্রহ্মই বিদ্যমান; এইরূপ যিনি ধারণা করেন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। এই যে কিছু ত্রিভুবন, সকলই সাগরের তরঙ্গরাজির ন্যায় আমারই অবয়ব বৈ আর কিছুই নয়; এইরূপ যিনি অন্তরে অবলোকন করেন, তিনিই সম্যক্ দর্শন করিয়া থাকেন। এই ত্রিলোকী আমার কনীয়সী ভগিনী; ইহার দুঃখে আমাকে দুঃখ পাইতে হয়; সুতরাং ইহার যাহাতে প্রতিপালন হইতে পারে, তাহা আমার করা কর্ত্তব্য। যিনি এইরূপে সম্যক্‌দর্শী হয়েন, তিনিই যথার্থ তত্ত্বদর্শী। যে মহাত্মার অন্তর হইতে সর্ব্ববিধ ভেদজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে, সংসারে যাঁহার আত্মীয়, পর-কীয়, তুমি বা আমি, ইত্যাদি প্রকার কোনই ভেদ নাই, সেই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরই প্রকৃত দর্শনশক্তি জন্মিয়াছে। যিনি দেখিতে থাকেন, এই বিশ্ব-প্রপঞ্চ দৃশ্য-সম্পর্ক-হীন অখণ্ডস্ফূর্ত্তি চিন্মাত্রেই পরিপূর্ণ, তিনিই যথার্থ দর্শন করেন। যাঁহার সুখ, দুঃখ, দেহ, গুরু, দেব ও শাস্ত্রবাক্যাদিতে শ্রদ্ধা এবং নিত্যানিত্য বস্তুবিবেক, ইত্যাদি নিখিল বিষয়েই 'আমি' ইত্যাকার জ্ঞান বিরাজমান, তাদৃশ পুরুষের অবসাদ কদাপি ঘটে না। এই ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত নিখিল জগৎই আত্মসত্তায় পরিপূর্ণ, অর্থাৎ সর্ব্বত্রই আত্মা ভিন্ন আর কিছুই নাই, আমি মাত্র ইহার এক দেশে অবস্থান করিতেছি; আমার নিকট ইহার কি হেয়, কিই বা উপাদেয় হইতে পারে? এইরূপে যিনি

বিচার করিয়া দেখেন, তাঁহাকেই প্রকৃত সম্যক্‌দর্শী বলা যায়। এই যে প্রপঞ্চ দেখা যায়, ইহা বিক্ষেপশক্তি-বিরহিত কেবলই সম্মাত্র; তর্ক দ্বারা ইহার তত্ত্ব জানিবার উপায় নাই। এইরূপ ভাবনায় যিনি ইহাতে হেয় এবং উপাদেয় ভাব পোষণ করেন না, তিনিই প্রকৃত পুরুষপদ-বাচ্য। যিনি আকাশের ন্যায় একাত্মা ও সর্ব্ব পদার্থে পরিব্যাপ্ত হইলেও কোন পদার্থেই রঞ্জিত রহেন না; তথাবিধ মহাত্মাই মহেশ্বর আখ্যায় অভিহিত। যিনি স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ এই ত্রিবিধ অবস্থা হইতে পরিমুক্ত ও মৃত্যুরও নিরতিশয় প্রেমাস্পদতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং যিনি সৌম্য, তুরীয়াবস্থায় উপনীত ও সমদর্শী হইয়া রহিয়াছেন, তথাবিধ পরম পদ-প্রাপ্ত পুরুষকে আমি অভিবাদন করি। এই বিচিত্র সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় ব্যাপারে যাঁহার অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকার দৃষ্টি বিরাজমান, এই নিখিল জগৎকেই যিনি একমাত্র ব্রহ্ম বলিয়া ধারণা করেন, তথাবিধ পরমবোধ-সম্পন্ন সাক্ষাৎ শিব-স্বরূপ মহাপুরুষকে আমার নমস্কার।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যিনি উত্তম পদ অবলম্বন করিয়া কুলাল চক্র-ভ্রমণের ন্যায় বিরাজিত অর্থাৎ জীবন্মুক্তভাবে অবস্থিত, তথাবিধ মহাপুরুষ এই দেহরূপ রাজধানীতে রাজত্ব করিতে থাকিলেও ইহাতে সত্য-বুদ্ধি নাই বলিয়া লিপ্ত হয়েন না। সেই পরমপদ-নিষ্ঠ জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের ভোগ ও মোক্ষ নিমিত্ত স্বীয় শরীররূপ মহানগরী উপবনভূমির ন্যায় ক্রীড়া-বিনোদের হেতুভূত হইয়া কেবল সুখেরই জনক হয়; পরন্তু কোন দুঃখ-ভোগই তাহাতে করিতে হয় না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহামুনে! এই শরীরের নগরীত্ব-সম্ভাবনা কিরূপে করা যায়? এবং যোগী পুরুষ ইহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া কিরূপেই বা রাজ্যসুখ ভোগ করিয়া থাকেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই দেহনগরী সর্ব্বগুণে মণ্ডিত ও মনোহর। জীবন্মুক্ত পুরুষের ইহা অনন্ত বিলাসের আকর। আত্মার আলোকরূপ রবির কিরণে ঐ নগরী প্রকাশমান। এই দেহনগরীর নেত্ররূপ গবাক্ষদ্বারে যে দুইটী ইন্দ্রিয়প্রদীপ প্রদীপ্ত রহিয়াছে, তাহাতে এই নিখিল জগন্মণ্ডল প্রকাশ পাইতেছে। করদ্বয় উহার প্রশস্ত পথ; সেই পথের পার্শ্বে আজানু চরণদ্বয় বিশাল জঙ্গলভূমির ন্যায় বিরাজমান। দেহের রোমরাজি উহার লতাগুল্ম, চর্ম্মগত শিরাজাল গুল্মমূল, এবং গুল্‌ফ ও অঙ্গুলি-দল পর্য্যন্ত জঙ্ঘাযুগ্ম সুবৃহৎ স্তম্ভশ্রেণীর ন্যায় সুশোভন। ঐ নগরী রেখান্বিত পাদাগ্ররূপ শিলাখণ্ডে সুনির্ম্মিত। উহার বাহিরে চর্ম্ম, অন্তরে চর্ম্মমূল এবং মধ্যে মধ্যে শিরাশাখা ও অস্থিসন্ধি সকল সন্নিবিষ্ট থাকিয়া ঐ দেহনগরীর সীমারূপে নিরূপিত হওয়ায় উহা অতি মনোরমরূপে প্রতিভাত। উহার ঊরুদ্বয় ও মধ্যকায় এই উভয়ের সন্ধিস্থলে উপস্থেন্দ্রিয় নদীর ন্যায় প্রবাহিত।' নগরের মধ্যে নদীপ্রবাহ অপ্রসিদ্ধ নহে; সুতরাং এই দেহনগরীর মধ্য দিয়াও উপস্থনদী প্রবাহিত হইতেছে। শ্মশ্রু ও কক্ষরোমাদি ঐ দেহনগরীর বনবিভাগ; শিরোদেশ ক্রীড়াশৈল এবং কেশাবলী উহার নীলবর্ণ পাদপ-পত্র-রাজি। ঐ নগরী ভ্রূ, ললাট ও ওষ্ঠরূপ পল্লব-পুষ্পাদিময় বদনরূপ উদ্যানশোভায় সুশোভিত। উহার কপোলরূপ বিশাল বিহারভূমি কটাক্ষপাতরূপ নীলোৎপল-মালায় মণ্ডিত। উহার বক্ষঃস্থল-রূপ সরোবর মধ্যে স্তনযুগ্মরূপ পদ্মকোরক সুশোভিত। স্কন্ধ যেন ঐ নগরীর পর্ব্বতের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া নিবিড়তর রোমরাজি দ্বারা পরিবৃত। উহার উদরগহ্বরে কত অন্ন ও অন্যান্য ভক্ষ্য দ্রব্যরূপ ধনরাজি নিহিত। সুদীর্ঘ কণ্ঠনালী দিয়া যে প্রাণবায়ু নির্গত হইতেছে, তাহার শব্দ শুনিলে মনে হয়, যেন ঐ নগরীর কপাটদেশ উদ্‌ঘাটিত হইতেছে। উহার হৃদয়রূপ বিপণি মধ্যে যে সকল বিচাররূপ পরীক্ষকেরা অবস্থান করিতেছে; তাহারা চক্ষুরাদির সাহায্যে যথাযোগ্য প্রাপ্ত অর্থসমূহ নির্ণয় করিয়া লইতেছে এবং সেই নির্ণীত অর্থরাশি দ্বারা ঐ নগরী সুশোভিত হইতেছে। উহার নবদ্বার দিয়া নিরন্তর প্রাণরূপ নাগরিকেরা যাতায়ত করিতেছে এবং মুখদেশে বিস্তৃত দন্তপঙক্তি অস্থিখণ্ডের

ন্যায় দেখা যাইতেছে। ঐ নগরীর মুখস্থানে রসনারূপিণী চণ্ডীদেবী বিবিধ ভোজ্য দ্রব্য চর্ব্বণ করিতে থাকেন। উহার কর্ণকোটর কূপের ন্যায় প্রতিভাত। ঐ কূপ রোমরাজিরূপ দীর্ঘ দীর্ঘ তৃণ দ্বারা সমাচ্ছন্ন। স্ফিকরূপ শৃঙ্খলায় উহার পৃষ্ঠপার্শ্ব-দেশ আবদ্ধ। ঐ পৃষ্ঠদেশ যেন এক বিশাল জঙ্গলের ন্যায় প্রতিভাত। মূত্রস্থান যেন একটী ঘটীযন্ত্র, মলরূপ কর্দ্দমরাশি উহার পার্শ্বস্থ গুহ্যদেশ হইতে নির্গত হইয়া থাকে। চিত্ত উহার উদ্যানভূমি; তাহাতে কত আত্মচিন্তারূপিণী বারাঙ্গনারা প্রতিনিয়ত ক্রীড়া করিতেছে। চপল ইন্দ্রিয়গণ ঐ দেহনগরীর মর্কটকসকল; উহারা বুদ্ধিরূপ শৃঙ্খলা দ্বারা সর্ব্বদাই সুদৃঢ়ভাবে আবদ্ধ রহিয়াছে। কত স্মিত-কুসুমরাজি সতত উহার বদনোদ্যানে বিকাশ পাইতেছে।

হে রাঘব! স্বীয় শরীর ও মনস্তত্ত্ব যাঁহার বিদিত আছে, তথাবিধ তত্ত্বজ্ঞ জনের পক্ষে ঐ সর্ব্বাঙ্গ-সৌন্দর্য্যময়ী দেহনগরী অসীম সুখ ও পরম হিতেরই হেতু হয়; পরন্তু কদাচ উহা দুঃখ উৎপাদন করে না। ঐ যে দেহনগরীর উল্লেখ করিলাম, যাহারা অজ্ঞ জন, তাহাদের নিকট উহা অনন্ত দুঃখ-পরম্পরার আধার; কিন্তু যাঁহারা তত্ত্ববিৎ, তাঁহাদের নিকট উহা অনন্ত সুখের ভাণ্ডার। হে অরিন্দম! এই দেহ-নগরী বিধ্বস্ত হইলে, তত্ত্বজ্ঞ জনের যে ক্ষতি হয়, তাহা অতি সামান্য, অর্থাৎ তিনি তাহাতে মনে করেন, মাত্র একটা তুচ্ছ বস্তুই নষ্ট হইল; কিন্তু উহা যদি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার সমস্তই রহিল। সুতরাং ঐ দেহনগরী কেবল তত্ত্ববিদেরই সুখাবহ। তত্ত্বজ্ঞ জন এই দেহনগরীতে আরোহণপূর্ব্বক অনন্ত ভোগ ও মোক্ষ লাভের নিমিত্ত নিরন্তর বিহার করিয়া থাকেন; এই জন্য ঐ নগরী তত্ত্বজ্ঞ পুরুষের রথ বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। তত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিরা ঐ দেহনগরী দ্বারাই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, বন্ধু ও বহু সমৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন; এইজন্য এই দেহনগরী তত্ত্বজ্ঞ জনেরই লাভপ্রদ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

হে রাম! ঐ দেহনগরী নিজেই সুখ, দুঃখ ও ক্রিয়াকলাপ উদ্বহন করিয়া থাকে; এইজন্য উহা সর্ব্বজ্ঞ জনের সর্ব্ববস্তু-সংরক্ষণে সক্ষমা বলিয়া অভিহিত। যেমন দেবরাজ অমরাবতীতে রাজত্ব করেন, তেমনি

তত্ত্বজ্ঞ জন ঐ শরীর-নগরীতে রাজ্য করত জ্বর-বিরহিত ও স্বস্থ হইয়া অবস্থান করিয়া থাকেন। মন মত্ত তুরঙ্গের ন্যায় বিরাজমান; তত্ত্বজ্ঞ জন তাহাকে কামভোগে নিযুক্ত করেন না এবং লোভরূপ বিষবৃক্ষকে শুল্কস্বরূপে গ্রহণ করিয়া কদাচ তিনি প্রজ্ঞারূপিণী নন্দিনীকে মোহ ও অধর্ম্ম প্রভৃতি অকুলীনদিগের হস্তে সম্প্রদান করেন না। অজ্ঞানরূপ পররাষ্ট্র তাঁহার রন্ধ্র দেখিতে পায় না; তিনি সংসাররূপ শত্রুভয়ের মূলোৎপাটন করিয়া থাকেন। তৃষ্ণারূপিণী নদী কাম-সম্ভোগরূপ দুষ্টগ্রহে পরিপূর্ণ; তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ কদাচ উহার প্রবাহ-আবর্ত্তে নিমগ্ন হয়েন না এবং সুখ বা দুঃখ জ্ঞান তাঁহার কিছুতেই থাকে না। তিনি অন্তরে ও বাহিরে সতত পরমাত্মদর্শী হইয়া থাকেন; এইজন্য তাঁহার যখন ইচ্ছা, তখনই তিনি পুণ্য সরিৎসঙ্গমাদি তীর্থে স্নান করেন। সমস্ত ইন্দ্রিয়রূপ জনসাধারণের যে আপাত-দৃশ্য বিষয়-সুখ, তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না; তিনি সর্ব্বদা কেবল ধ্যানরূপ অন্তঃপুর মধ্যেই অবস্থান করিতে থাকেন। এই যে দেহনগরী, ইহা সর্ব্বদাই আত্মজ্ঞ পুরুষের সুখ উৎপাদন করে। ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় ঐ নগরী আত্মজ্ঞ জনের বিহারস্থলী এবং ভোগ ও মোক্ষ-দায়িনী। ঐ মহীয়সী দেহনগরী বিদ্যমান রহিলে, সমস্তই বিদ্যমান থাকে, আর যদি নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলেও তাঁহার কোন অনিষ্টই দৃষ্ট হয় না; সুতরাং এ হেন দেহনগরী কেনই বা না তাঁহার সুখজননী হইবে? দেখ, ঘট বিনষ্ট হইলে পরমাকাশ ঐ ঘটাকাশকে আত্মসাৎ করিয়া লয়, সুতরাং ঘটাকাশের তাহাতে কোনই ক্ষতি হয় না; এইরূপ দেহনগরী বিধ্বস্ত হয় হউক, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞ জনের কোনই ক্ষতি নাই। যেমন ঘট বিদ্যমান থাকিলে, বায়ু তাহাকে কদাচিৎ স্পর্শ করিয়া থাকে, আর যদি ঘটের অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে বায়ু তাহাকে ত স্পর্শ করেই না; তেমনি দেহী বা তত্ত্ববিৎ যিনি, তিনি ঐ স্বীয় দেহনগরী থাকিলেই তাহাকে কিঞ্চিৎ স্পর্শ করেন, আর তাহা না থাকিলে যে তাহাকে স্পর্শ করেন না, এ কথা বলাই বাহুল্য। আত্মা অর্থাৎ তত্ত্ববিৎ সর্ব্বব্যাপী হইলেও এই শরীরনগরীতে অবস্থান করত প্রারব্ধ ভোগজাল উপভোগ করিয়া অবশেষে প্রাক্‌সাক্ষাৎকৃত পূর্ণ পরম পুরুষার্থ মোক্ষপদ প্রাপ্ত হইয়া

থাকেন। তিনি অসঙ্গভাবে নিখিল কর্ম্মক্রিয়ায় উন্মুখ হইয়া কখন ব্যবহার-দৃষ্টিতে কর্ম্ম করিলেও পরমার্থ দৃষ্টিতে তাহা করেন না, আবার কখনও বা যাবতীয় প্রস্তুত কর্ম্মই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির বিমল চিত্ত ভোগাভিলাষী হইলে তিনি তাহার বিনোদনের জন্য স্বেচ্ছায় অব্যাহত গমনে কখন বিমানারোহণ করেন। তত্ত্বজ্ঞ জন যতদিন এই দেহনগরীতে অবস্থান করেন, ত্রিলোকসুন্দরী শীতলাঙ্গী মৈত্রীরূপিণী রমণীর সহিত সর্ব্বদাই তিনি রমণ করিতে থাকেন। তাঁহার উভয় পার্শ্বে আরও দুইটী প্রেয়সী অবস্থান করে, তাহাদের একের নাম সত্যতা এবং অপরের নাম একতা। বিধুর যেমন বিশাখাদ্বয়, তেমনি তাহারা নিয়তই তাঁহার চিত্তাহ্লাদ উৎপাদন করে। অতি উচ্চ নভোমণ্ডলে থাকিয়া দিবাকর যেমন পৃথি[illegible] বস্তু অবলোকন করেন, তেমনি সেই তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও [illegible] থাকিয়া দেখিতে থাকেন যে, অজ্ঞ লোকেরা পর[illegible] জঙ্গলের ন্যায় পরস্পর বিজড়িত হইয়া দুঃখরূপ [illegible] বিপাটিত হইতেছে। তিনি জগতের লোকদিগকে [illegible] ভাবে দুঃখ-বিজড়িতই দেখেন; পরন্তু কদাচ নিজে তাহাতে [illegible] হইয়া পড়েন না। তত্ত্ববিৎ ব্যক্তির কোন আশাই অপূর্ণ থাকে না, সকল আশাই পূর্ণ হইয়া যায়; এজন্য তিনি আত্মসাক্ষাৎকার প্রযুক্ত সকল সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সুন্দরাকার ধারণ করেন এবং পূর্ণ শশধরের ন্যায় অপুনঃক্ষীণ-ভাবে বিরাজ করিতে থাকেন। তিনি ভোগরাজি নিরন্তর সেবা করিতে থাকিলেও তাহা তাঁহার কদাচ কোন খেদের কারণ হয় না। বস্তুতঃ মহেশের কণ্ঠে কালকূট তাঁহার শোভাই সম্বর্দ্ধন করে। ফলতঃ যদি তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া বিষয়রাশি ভোগ করা যায়, তাহা হইলে তাহা তুষ্টিপ্রদই হইয়া থাকে। দেখ, যদি কোন লোককে চোর বলিয়া চিনিতে পারিয়া তাহার সহিত মৈত্রীবন্ধন করা যায়, তাহা হইলে সেই চোর মিত্রই হইয়া থাকে; সে কখন শত্রুতা করে না। তত্ত্বজ্ঞ লোকের নিকট ভোগসমৃদ্ধি সকল, উৎসব-সম্মিলন ভঙ্গ হইলে নানা দূরদেশগমনশীল নর-নারী ও নটনিচয়ের যাত্রার ন্যায় পরিদৃষ্ট হয়। যেমন পান্থ জনগণ সহসা সম্প্রাপ্ত গ্রাম্যোৎসব অবলোকন করে, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরাও ব্যবহারময় ক্রিয়া-

সকল সেইরূপই সন্দর্শন করিয়া থাকেন। যেমন অযত্নোপনত পদার্থপুঞ্জের প্রতি অনুরাগহীন লোকলোচন নিপতিত হয়, তেমনি প্রাক্তন ইন্দ্রিয় চেষ্টায় উপস্থাপিত ব্যবহারসমূহকে তত্ত্বজ্ঞ জন প্রত্যাখ্যান করেন না; অনাসক্তভাবেই তাহাতে তিনি নিবিষ্ট হইয়া থাকেন এবং যাহা অপ্রাপ্ত অর্থ, তাহা গ্রহণ করিবার জন্যও তিনি যত্ন প্রকাশ করেন না। তত্ত্বজ্ঞ জন পরিপূর্ণভাবেই বিরাজ করিতে থাকেন। ময়ূরপুচ্ছ দিয়া আঘাত করিলে অচল যেমন কদাচ বিচলিত হয় না, তেমনি অপ্রাপ্ত বিষয়ের চিন্তা ও প্রাপ্তবিষয়ের উপেক্ষা, এই দুই কারণ-জনিত কোন অনুতাপই তত্ত্বজ্ঞ জনের বুদ্ধি বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির সর্ব্ব সন্দেহ বিদূরি[illegible] বিষয়ের কৌতূহল বিগলিত এবং কল্পনাদেহ পরিক্ষীণ হওয়ায় তি[illegible] ন্যায় বিরাজ করিতে থাকেন। ফলতঃ যদি অজ্ঞান-দৃ[illegible] তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞ জনের উল্লিখিত অবস্থা স্বর্গীয় রাজ্য-ভো[illegible] হইতে পারে; কিন্তু তত্ত্বদৃষ্টি দ্বারা দেখিলে দেখা যা[illegible] তাদৃশ অবস্থা অতুলনীয়। তিনি পরিপূর্ণ ক্ষীরাব্ধির ন্যায় আপনি [illegible] দৃষ্টান্ত, আপনিই আপনাতে উদ্বৃত্ত এবং আপনাতেই আপনি [illegible]। যাহারা ভোগ-লালসায় পরতন্ত্র, ও নিতান্ত হীনচিত্ত, তথাভূত জন্তুগণকে এবং দীনদশাপন্ন ইন্দ্রিয়গণকে উন্মত্তবৎ অবলোকন করিয়া প্রশান্তচিত্ত অনুন্মত্ত তত্ত্বজ্ঞ জন উপহাস করিয়া থাকেন। যেমন কোন ব্যক্তি তাহার পত্নীকে পরিত্যাগ করিলে, অপর ব্যক্তি সেই পরিত্যক্ত পত্নীকে কামনা করিয়া হাস্যাস্পদ হয়, তেমনি ভোগাকাঙ্ক্ষী ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানী জনের উপহাসযোগ্য হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারে যে সৌম্যসুখ সমুৎপন্ন হয়; মন তাহা পরিত্যাগ করিয়া বিষয়বাসনায় ধাবিত হইয়া থাকে; সুতরাং অঙ্কুশাঘাতে মাতঙ্গকে যেমন বশীভূত করে, সেইরূপ বিচারবলে মনকে আয়ত্ত ও বিষয় হইতে প্রবৃত্তিনিবৃত্ত করিয়া আত্মসুখে নিরত করিতে হয়। যে মনোবৃত্তি ভোগের দিকে অগ্রসর, তাহাকে বিষাঙ্কুরের ন্যায় অগ্রেই বিনষ্ট করা কর্ত্তব্য। বলিতে পার, মনকে ঐরূপে নিগৃহীত করিলে মন রুষ্ট বালকের ন্যায় কিছুতেই আত্মানুরক্ত হইবে না; তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, প্রথমে যদি নিতান্ত নিগৃহীত করা হয়, তবে পশ্চাতে

সম্মাননা করিলে আর সে নিগ্রহপীড়া থাকে না। কেন না, প্রথমে কাহাকে তাড়িত করিয়া পরে যদি তাহাকে সম্মানিত করা যায়, তাহা হইলে সেই সম্মান তাহার নিকট অনন্ত সুখের বলিয়া বোধ হয়। নিদাঘতপ্ত ধান্যে যদি অল্পমাত্রও জল সেক করা যায়, তাহা হইলে তাহা সুধার ন্যায়ই প্রতীত হয়। পক্ষান্তরে কথা এই যে, অগ্রে যদি ক্লেশ না পাওয়া যায়, তাহা হইলে প্রাপ্ত সম্মানও বহুমান বলিয়া বোধ হয় না। দেখ, যে নদী প্রভূত জলে পরিপূর্ণ, সামান্য বর্ষাজলপ্রবাহে তাহার কিছুই উপচয় হয় না। তবে প্রাকৃত ব্যক্তি সর্ব্বথা পূর্ণ হইলেও পুনরায় অন্য বস্তুর আকাঙ্ক্ষা করে; ইহার দৃষ্টান্ত—সমুদ্র জগৎ-পূরণযোগ্য জলরাশি ধারণ করিলেও পুনরায় জলান্তর গ্রহণ করিয়া থাকে। ফলে, অগ্রে যদি বিষয়বাসনা হইতে মনকে সবলে বিরত করত নিগৃহীত করা যায়, তাহা হইলে পশ্চাৎ ঐ মন আত্ম-সুখ লাভ করিয়া যথেষ্টই সুখী হয়; কদাপি তাহাতে বিরক্ত হয় না। বিষয়াভিলাষ হইতে বিরতি ঘটাইলে মন নিগৃহীত হয়, সেই নিগৃহীত মন পশ্চাৎ যে ভিক্ষাস্বরূপ যৎসামান্য ভোগলাভ করে, অগ্রে ক্লিষ্ট হয় বলিয়া তাহাই তাহার নিকট প্রচুর বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। দেখ, কোন নরপতি শত্রুকর্ত্তৃক কিয়দ্দিন বন্দীকৃত হইয়া পশ্চাৎ যদি মুক্তিলাভ করেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ প্রদত্ত একখানি মাত্র গ্রাম লাভ করিয়াও তিনি যথেষ্ট সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। কিন্তু যে ভূপতি শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত বা বন্দীকৃত হয়েন নাই, বিশাল রাজ্যসুখ লাভ করিলেও তিনি তাদৃশ তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না।

রামচন্দ্র! এ দেহে ইন্দ্রিয়গণই প্রধান শত্রু; সুতরাং তাঁহাদিগকে জয় করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া সকল প্রকার নিগ্রহোপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। হস্তদ্বারা হস্ত আক্রমণ, দন্তদ্বারা দন্ত-চূর্ণন, এবং অঙ্গদ্বারা অঙ্গ-নিপীড়ন করিয়াও যদি ইন্দ্রিয়রূপী শত্রুদিগকে জয় করিতে হয়, তবে তাহাও করিবে। যে সকল পণ্ডিত পুরুষ অন্যান্য শত্রু জয় করিতে উৎসাহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে সর্ব্বাগ্রে ইন্দ্রিয়রূপ অন্তঃশত্রুদিগকে জয় করাই কর্ত্তব্য। যাহারা স্বকীয় চিত্ত কর্ত্তৃক বিজিত হয়েন নাই, অর্থাৎ স্ব স্ব চিত্ত যাঁহাদের বশীভূত, এই বসুধাতলে তাঁহারাই সৌভাগ্যশালী, তাঁহারাই সাধুচিত্ত

এবং তাঁহারাই সৎপুরুষ মধ্যে গণনীয়। মনোরূপ মহাভুজঙ্গ গর্ব্বের সহিত হৃদয়-কন্দরে কুণ্ডলাকারে অবস্থিত। সেই মনোভুজঙ্গ যাঁহার উপাশান্ত হইয়াছে, তথাবিধ সুনির্ম্মল তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে আমি অভিবাদন করি।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্ব্বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তপন, অবীচি, মহারৌরব ও রৌরব প্রভৃতি মহানরকগুলি এক একটী পৃথক্ পৃথক্ সাম্রাজ্য; ইন্দ্রিয়রূপ দুর্জ্জয় শত্রুদল উল্লিখিত প্রত্যেক সাম্রাজ্যে অভিষিক্ত। যত কিছু দুষ্কৃত, তাহারা ঐ ইন্দ্রিয়শত্রুর মত্ত বারণ এবং আশারাশি উহার শর-শলাকা। যাহারা প্রথমতঃ স্বীয় আশ্রয়ীভূত দেহকে বিনষ্ট করে, সেই সকল পাপরাশিরূপ-ধনসঞ্চয়ী কৃতঘ্ন ইন্দ্রিয়-শত্রুদল একান্তই সুদুর্জ্জয়। এই দেহ কুলায়স্বরূপ; কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যরূপ দুইটী প্রবল পক্ষসম্পন্ন ইন্দ্রিয়রূপ গৃধ্রদল উক্ত দেহ-কুলায় আশ্রয় করিয়া বিষয়রূপ আমিষলালসায় সর্ব্বদাই চঞ্চল। যে জন বিবেক-সূত্রের বাগুরা বিস্তার করিয়া ঐ ধূর্ত্ত ইন্দ্রিয়-গৃধ্রদলকে আয়ত্ত করিতে পারেন, যৎসামান্য জালবিস্তারে হস্তীদিগকে বন্ধন করিতে না পারিবার ন্যায় ইন্দ্রিয়রূপ গৃধ্রদল তাঁহার অঙ্গ বিদারণ করিতে পারে না। এই যে কদর্য্য কলেবর-নগর, ইহাতে যিনি বিবেকধনে ধনী হইয়া আপাতরম্য বিষয় সকল ভোগ করিতে থাকেন, তিনি কাহারও বশীভূত হয়েন না; ইন্দ্রিয়রূপ অন্তঃ-শত্রুদল যতই প্রবল হউক, তাহারা তাঁহাকে কিছুতেই অভিভূত করিতে পারে না। স্বাধীনচেতা পুরুষেরা স্বীয় শরীরনগরীর অধীশ্বর হইয়া যাদৃশ সুখ-শান্তি লাভ করেন, সুপ্রশস্ত মৃন্ময় পুরের অধিবাসী বসুধাপতিগণও তাদৃশ সুখে সুখী হইতে পারেন না। যিনি মনোরূপ রিপুকে নিগৃহীত করিয়াছেন, ইন্দ্রিয়রূপ ভৃত্যবর্গের প্রতি যাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত, তথা-বিধ সাধুজনের বিশুদ্ধ বুদ্ধি বসন্তকালীন কুসুমমঞ্জরীর ন্যায় নিয়তই বর্দ্ধিত

হয়। যদীয় চিত্ত-দর্প বিগলিত ও ইন্দ্রিয়শত্রু নিগৃহীত হইয়াছে, হেমন্ত-কালীন কমলিনীর ন্যায় তাঁহার যাবতীয় ভোগবাসনা ক্ষীণ হইয়া যায়। যেমন অজ্ঞদৃষ্টিতে নিশীথকালে বেতালদল বিলসিত হয়, তেমনি যতদিনে না একমাত্র আত্মতত্ত্বের সুদৃঢ় অভ্যাসবশে মনোজয় সাধিত হয়, তত দিন অন্তরে বাসনারাশি বিকাশ পাইতে থাকে। মনীষী বিবেকী জনের বিজিত মন, আমার মতে নানাকারে সুশোভন। আমি মনে মনে ধারণা করিয়া দেখিয়াছি, ঐ মন বিবেকীর অভিমত কার্য্য সাধন করিয়া দেয়, এইজন্য উহা তাঁহার ভৃত্য, সর্ব্বসৎকার্য্যের হেতু হয় বলিয়া মন্ত্রী, ইন্দ্রিয়দলকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করে, এইজন্য উহা সামন্ত, সাতিশয় লালন করে বলিয়া স্নেহময়ী ললনা; সবিশেষ পালন করে বলিয়া পরম পবিত্র পিতা এবং যথেষ্ট বিশ্বাসের পাত্র বলিয়া ঐ মন পরম মিত্র। ঐ পিতৃস্থানীয় মনকে যদি বুদ্ধি ও শাস্ত্রজ্ঞানের সহায়তায় অন্তরে আত্মরূপে অনুভাবিত কিম্বা সম্যক্ অবলোকিত করা যায়, তাহা হইলে ঐ মনঃপিতা স্বীয় স্বরূপ পরিহার-পূর্ব্বক পরম সিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন। মন যেন একটী মণির ন্যায় প্রতিভাত; ঐ মনোমণি সুদৃষ্ট, সুপরামৃষ্ট, সুপ্রবোধিত ও সুযোজিত হইলে তখন হৃদ্য হইয়া হৃদয়ে পরিস্ফুরিত হইতে থাকে। যিনি বিধি বোধিত শুভকর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত, ঐ মনোরূপ মন্ত্রী তাঁহাকে জন্মতরুর কুঠারস্বরূপ ভবিষ্যৎ মঙ্গলময় কর্ম্ম করিতে পরিচালিত করে।

রামচন্দ্র! ঐ যে মনোমণির কথা কহিলাম, উহা প্রবৃত্ত পঙ্কে কলঙ্কিত রহিয়াছে; আপনার সিদ্ধি লাভার্থ উহাকে বিবেকবারি-সেচনে ধৌত করিয়া স্বয়ং আলোকবান্ হও। এই ভবভূমি একান্তই ভয়াবহ, তুমি ইহাতে বিবেকবিহীন হইয়া বাস করিও না এবং প্রাকৃত জনের ন্যায় এই বিবিধ বাধা-বিপত্তিময় ভবভূমিতে বিবশভাবে পতিত হইও না। এই যে সংসারমায়া সমুদিত রহিয়াছে, ইহা শত শত অনর্থ-পরম্পরায় সমাকুল। তুমি এই মহতী মোহামিহিকাকে উপেক্ষা করিও না। বুদ্ধিবলে পরম বিবেক আশ্রয় করিয়া যাহা সত্য, তাহাই নিরীক্ষণ করত ইন্দ্রিয়রূপ শত্রুদলকে জয় করিয়া এই ভীম ভবার্ণব হইতে সমুত্তীর্ণ হও।

রঘুনন্দন! এই যে শরীর দেখিতেছ, ইহা অসৎ এবং ইহার যে সুখ-দুঃখ,

তাহাও অসত্য; সুতরাং তোমায় বারম্বার বলিয়া দিতেছি, ইহাতে যেন তোমার দাম-ব্যাল-কটের দশা সঙ্ঘটিত হয় না; তাহা না হইলে তুমি ভীম-ভাস-দৃঢ়ের ন্যায় স্থৈর্য্য লাভে বিশোক হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে; তোমার কোনই অনর্থ প্রাপ্তি ঘটিবে না। হে মহামতে! 'এই যে দৃশ্য দেহ, ইহাই আমি' এবম্প্রকার বৃথা নিশ্চয় তুমি আপনার বুদ্ধিবলে পরিত্যাগ কর এবং ইহা ভিন্ন অন্য সেই যে পরম ব্রহ্মপদ, তাহাকে তুমি আশ্রয় করিয়া অমনস্কভাবে পান, ভোজন ও গমনাদি করিতে থাক, এইরূপ করিলে তোমাকে আর কখনই বিষয়জালে জড়িত হইতে হইবে না।

চতুর্ব্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ! তুমি লোকারাম ও ধীমান্ হইয়া ইহলোকে বিহার করিতে থাক, এবং শমদমাদি সাধন-সম্পদ্গুলি স্বীয় আত্মায় প্রকাশিত করত শ্রেয়োলাভে যত্ন-পরায়ণ হও। পরন্তু পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং এখনও বলিতেছি, তোমার যেন দাম, ব্যাল, ও কটের দশা হয় না; তুমি কেবল ভীম, ভাস ও দৃঢ় ন্যায়ে স্থৈর্য্য লাভ করত বিশোক হইয়া অবস্থান কর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি বলিলেন, দাম, ব্যাল ও কটের অবস্থাপন্ন হইও না; পরন্তু ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের ন্যায় স্থিতি লাভ করিয়া বিশোকভাবে অবস্থান কর। কিন্তু বলিতে কি, হে প্রভো! আপনি এই দ্বিবিধ কথার অবতারণা করিয়া কি যে কহিলেন, তাহা ত আমি বুঝিতে পারিলাম না; আপনি সকলের ভবতাপহারী; অতএব আপনাকে বলি, বর্ষার বারিধর যেমন নিদাঘতাপ নিরারণ করিয়া ময়ূরকে সমুল্লাসিত করে, আপনি তেমনি উদার উপদেশে আমাকে বিশদভাবে বিবোধিত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! দাম, ব্যাল ও কটের দশা কি এবং

ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের স্থিতিই বা কি, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিবার পর তোমার যাহা ইচ্ছা, করিতে পার। পুরাকালে সর্ব্বাশ্চর্য্যময় মনোহর পাতালকুহরে মায়ামণির আকারস্বরূপ শম্বর নামে এক দৈত্যবর বাস করিত; তাহার মায়ার এমনি মহিমা যে, সে নভোনগরীর উদ্যান মধ্যে অসুরবৃন্দের ব্যবহারের জন্য এক সুন্দর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিল। তৎকৃত কৃত্রিম দিবাকর ও নিশাকর দ্বারা তদীয় ভবনমণ্ডল ভূষিত হইত। ঐ দানব অনায়াসেই শিলাখণ্ড-প্রতিম পদ্মরাগাদি নানা মণি লাভ করিত এবং সেই সকল মণিদ্বারা সে যখন বিভূষিত হইত, তখন তাহাকে নানামণি-মণ্ডিত হিমাদ্রির ন্যায় দেখা যাইত। তাহার অতুল বৈভব ছিল; সে তাহা দ্বারা বহু দানবের ভরণ পোষণ করিত। তদীয় গৃহস্থিত রত্নের ন্যায় শত শত রমণীরত্ন তাহার প্রণয়িনী ছিল; তাহাদের সঙ্গীতে স্বর্গের সুরাঙ্গনাগণের গীতধ্বনিও পরাজিত হইত। তাহার বিলাস-বনে বহুবৃক্ষ বিরাজ করিত; ঐ সকল বিলাস-বনের বৃক্ষাবলী সর্ব্বদাই চন্দ্রকলায় পূর্ণ থাকিত। ঐ দানবের ক্রীড়াভবনগুলি সতত প্রফুল্ল নীলোৎপল-মালায় মণ্ডিত রহিত; কত রাজহংস নিজ নিনাদে হৈম সরোজ-সারসদিগকে আহ্বান করিত। সেই শম্বর দানব নিজ হস্তে হিরণ্ময় পাদপের প্রতি শাখাগ্রে কমল-কলিকা রোপণ করিয়া দিত। তাহার রোপিত মন্দার-তরুর কুসুমপুঞ্জ করঞ্জ-কুঞ্জে নিয়ত নিপতিত হইত। শম্বরের সহায়স্বরূপ অনেকসংখ্যক দৈত্য ছিল; তাহারা সকলে কর্ত্তরীযন্ত্র ধারণ করিত; শম্বর তাহাদিগের সহায়তায় বাসবকে বিজিত করিয়াছিল। তাহার উদ্যানস্থ মণ্ডপগুলি বহ্নিশিখায় নির্ম্মিত; কিন্তু সে শিখায় তাপ নাই, তাহা সততই হিমের ন্যায় শীতল থাকিত। তদীয় পুরীর প্রায় স্থানেই কুসুমোদ্যান বিরাজমান; সেই উদ্যানগুলি নন্দন অপেক্ষাও সুশোভন। মলয়াচলে যে সকল চন্দনতরু জন্মিত, ঐ অসুর ভুজঙ্গগণ সহ সবলে সে সকল হরণ করিয়া আনিত। তাহার অন্তঃপুরিকা রমণীরা এমনি সুন্দরী ছিল যে, তাহাদের সৌন্দর্য্যে সুবর্ণকান্তি ও যাবতীয় কামিনীর লাবণ্য পরিম্লান হইত। তদীয় গৃহপ্রাঙ্গণে জানু-পরিমিত রাশি রাশি নানা কুসুম নিপতিত থাকিত। সেই শম্বরাসুর ক্রীড়া নিমিত্ত গদা-চক্র-ধর বিষ্ণুর পরাজয় কর্ত্রী এক মৃন্ময়ী ঈশানমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিল।

তদীয় পুর মধ্য হইতে অনবরত রত্নরাশি খদ্যোতের ন্যায় উড্ডীন হইত; তাহাতে পুরীর উপরিতন আকাশ ও পুরান্তর তারকিত হইয়া থাকিত। সেই দৈত্যের এমনি প্রভাব যে, কৃষ্ণপক্ষীয় নিশীথসময়েও শশাঙ্ক সমুদিত রহিত। শম্বরের স্বহস্ত-রচিত বহুল শালভঞ্জিকা ছিল; সে সকল যেন লোকসঙ্ঘের ন্যায় তদীয় রণ-নৈপুণ্যের যশোগাথা গান করিত। শম্বরাসুর মায়া-কল্পনায় এক ঐরাবত হস্তী প্রস্তুত করিয়াছিল; সেই মায়াহস্তীর তাড়নায় ইন্দ্রহস্তী পলায়ন করিত। ত্রিভুবন-মধ্যে যত কিছু উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য্য আছে, শম্বরাসুরের অন্তঃপুরে তৎসমস্তই বিরাজিত ছিল। ঐ দানব সর্ব্ববিধ সম্পদের অধিপতি ছিল; এই জন্য তাহার নিকট সকল ঐশ্বর্য্যই অবনত হইত। তদীয় কঠোর শাসন সমস্ত দৈত্য-সামন্তই মানিয়া চলিত। অন্যান্য অসুরসমাজ শম্বরাসুরের বাহুবন-চ্ছায়ার আশ্রয়ে বিশ্রাম করিত। শম্বর সর্ব্ববুদ্ধির আধার ছিল। সে সর্ব্বদাই রত্নমণ্ডলে মণ্ডিত থাকিত। তাহার আকৃতি কঠিন ও ভীষণ ছিল। সে তাদৃশ আকার ধারণ করিয়াই সুর-সমবায়ের উচ্ছেদ সাধন করিত। তাহার বিপুল আসুর সৈন্য ছিল; ঐ সৈন্যদল সকলেই সুরসমূহ-সম্মর্দ্দনে সক্ষম।

একদা শম্বরাসুরের মায়া-কল্পিত সৈন্যদল দেশান্তরে গিয়া নিদ্রিত হয়; দেবগণ আসিয়া এই সুযোগে তাহাদিগের হত্যা সাধন করেন। তখন শম্বরাসুর আত্মরক্ষার নিমিত্ত মুণ্ডি, ক্রোধ ও দ্রুমপ্রমুখ সামন্তগণকে স্বীয় সৈন্যদলে নিযুক্ত করিল। গগনান্তর-গত শ্যেনগণ যেমন ভয়াকুল কলবিঙ্ক বিহঙ্গদিগকে বিনাশ করে, সেই ভীষণ সুরগণ তেমনি ছিদ্র পাইয়া তাহা-দিগেরও প্রাণ বধ করিলেন। এক তরঙ্গ তিরোহিত হইলে, সাগর যেমন অন্য তরঙ্গ প্রস্তুত করে, তেমনি ঐ অসুরশ্রেষ্ঠ মায়াবলে অন্যান্য সেনাপতি-দিগকে সৃষ্টি করিয়া লইল। দেবগণও শত্রুসংহারে উদাসীন রহিলেন না, তাঁহারা সত্বরই সেই শাম্বরী সেনার সংহার সাধন করিলেন।

এইবার শম্বর সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল; সে সুরগণকে সংহার করিবার জন্য সুরাবাস স্বর্গধামে গমন করিল। দেবগণ সেই অসুরের মায়াদর্শনে ভীত হইয়া ভবানাবাহন সিংহ হইতে শঙ্কিত মৃগপালের ন্যায় সুমেরুশৈলের কাননকুঞ্জে অন্তর্হিত হইলেন। শম্বর দেখিল,—

অনেক অক্ষম অমর পলায়নে অপারগ হইয়া ক্রন্দন করিতেছে এবং স্বর্গীয় অপ্সরাগণের মুখমণ্ডল বাষ্পজলে প্লাবিত হইতেছে। প্রত্যুত প্রলয়কালীন পরিক্ষীণ জগতের যেমন একটা শূন্যভাব উপস্থিত হয়, সেই স্বর্গধামও সেইরূপই শূন্যাকারে পরিণত হইয়াছে। অসুরবর শম্বর তখন সেই সুরশূন্য স্বর্গধামে ক্রুদ্ধ হইয়া বিচরণ করত যেখানে যে যে উৎকৃষ্ট বস্তু প্রাপ্ত হইল, তাহাই সে, সেখান হইতে হরণ করিয়া লইল; অবশেষে লোকপালদিগের সমস্ত পুরী অগ্নি-সংযোগে দগ্ধ করিয়া নিজ ভবনে প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর এই ঘটনায় দেব ও দানবদিগের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব দৃঢ়ীভূত হইল। দেবগণ স্বর্গবাস পরিত্যাগ করিয়া নানাদিকে অন্তর্দ্ধান করিলেন। এ দিকে শম্বরাসুর যে যে অসুরকে সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিতে লাগিল, দেবগণ যত্নের সহিত অতর্কিত ভাবে আসিয়া তাহাদিগের বধ সাধন করিতে লাগিলেন। শম্বর এই ব্যাপারে চিন্তিত হইল এবং তৃণ-সংলগ্ন অনলের ন্যায় ক্রোধভরে অত্যধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন ক্রোধাবেগে তদীয় নাসারন্ধ্র হইতে এক একটা দীর্ঘ নিশ্বাস নির্গত হইতে লাগিল। সে তখন, দেবগণ কোথায় আছেন, তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল; কিন্তু অকৃতপুণ্য লোক যেমন নিধিলাভে সমর্থ হয় না, তেমনি সেই দানব তখন যত্নের সহিত বহু অন্বেষণ করিয়াও কুত্রাপি দেবগণকে দেখিতে পাইল না। তৎকালে শম্বর স্বীয় মায়া-বলে অসুরসৈন্য রক্ষা করিবার জন্য কালান্তক যমপ্রতিম তিন জন ভীষণ অসুর সৃষ্টি করিল। সেই মায়া-নির্ম্মিত মহাবল মহা ভয়ঙ্কর অসুরত্রয় পক্ষ-ক্ষুব্ধ পর্ব্বতত্রয়ের ন্যায় স্বপক্ষীয় বল-বৃক্ষাবলী রক্ষা করতে প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ অসুরত্রয়ের নাম—দাম, ব্যাল ও কট। উহাদের ধর্ম্ম চেতনামাত্র এবং দুষ্কর বা সুকর যে কোন কর্ম্ম উপস্থিত হউক, তাহাই উহারা সম্পাদন করিতে সমর্থ। তাহারা কোন পূর্ব্বসিদ্ধ জীব নহে, তাহাদের স্ব স্ব অনুষ্ঠিত কর্ম্মের অভাব নিবন্ধন কোনরূপ বাসনাও ছিল না। কেবল চিন্মাত্রের সান্নিধ্য হেতু ভয়, শঙ্কা ও পলায়নাদি বিকল্পবিহীন যে দেহ-পরিস্পন্দ, তাহাই তাহাদের একমাত্র ধর্ম্ম ছিল। বলিতে পার, তাহাদের যখন কোন বাসনা ছিল না;

তখন জন্মবীজের অভাবে তাহাদের ত জন্ম হওয়াই অসম্ভব। বীজের অভাবে যদি জন্ম হইতে পারে, তাহা হইলে যাঁহারা মুক্ত পুরুষ, তাঁহাদেরও ত পুনর্জ্জন্ম সম্ভবিতে পারে? অতএব তাহাদের কর্ম্ম কিম্বা বাসনাদি কিছুই ছিল না, এরূপ কথা বলা অসঙ্গত নহে কি? এ কথার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, ঐ অসুরত্রয় স্বতন্ত্র জীব নহে। উহারা অন্তর্যামি চিৎ নিমিত্ত কর্ম্মজীব শম্বরের কৌশলরূপ কলা এবং যাহা অল্প-পরিমিত, অপুষ্ট ও কর্ম্ম-বাসনাদি দ্বারা অনুপচিত, এবম্বিধ কৃত্রিম ও ভোগসারহীন সৃষ্টি-সঙ্কল্প-বৃত্তি গ্রহণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছিল। উহাদের কোন বাসনাই ছিল না, উহারা অন্ধপরম্পরা ক্রমে অথবা কাকতালীয় ন্যায়ে উপস্থিত কার্য্যের অনুবর্ত্তন করিত। অর্থাৎ বহু অন্ধ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একত্র কোথাও যাত্রা করিলে অগ্রণী অন্ধ যে পথ ধরিয়া চলে, পশ্চাদ্বর্ত্তী সমস্ত অন্ধ যেমন তাহার অনুবর্ত্তী হয়, উল্লিখিত অসুরত্রয়েরও কার্য্যপ্রণালী সেইরূপই ছিল। অর্দ্ধসুপ্ত বালকেরা স্ব স্ব হস্ত-পদাদি সঞ্চালন করে; কিন্তু তাহাতে যেমন তাহাদের বাসনা বা আত্মাভিমান থাকে না, ঐ যে দাম, ব্যাল ও কট নামক অসুরত্রয়ের কথা কহিলাম, উহাদের ক্রিয়া বা চেষ্টাও সেইরূপই। উহারা পতন, উৎপতন, পলায়ন, জীবন, মরণ, যুদ্ধ, জয় কিম্বা পরাজয়, এ সকলের কিছুই বুঝিত না; কেবল অগ্রভাগে শত্রু-পক্ষীয় সৈনিকদিগকে হননোদ্যত দেখিবামাত্রই তাহাদের প্রতি ধাবিত হইত। উহারা এরূপ ভীষণভাবে প্রহার করিত যে, তাহাতে অদ্রি পর্য্যন্ত দলিত হইয়া যাইত।

অনন্তর ঐ অসুরত্রয়ের কার্য্য-প্রণালী দর্শনে শম্বরাসুরের চিত্ত একান্ত সন্তুষ্ট হইল। শম্বর তখন মনে মনে ভাবিতে লাগিল—এইবার উত্তম হইয়াছে। মদীয় সৈন্যদল এই মায়াময় অসুরত্রয় কর্ত্তৃকই সুরক্ষিত হইবে। শত্রু-সৈন্যের অতর্কিত আগমনে ইহারা আর পরাভূত হইবে না। অধিকন্তু শত্রুর সহিত সঙ্ঘর্ষে ইহারাই জয়লক্ষ্মী লাভ করিবে। সুমেরুশৈলের হৈম শিলা যেমন ঐরাবতের শুণ্ডাঘাতেও অচল, তেমনি এই মহাবল অসুর-সেনানীদিগের দোর্দ্দণ্ড-পালিত মদীয় সেনাশ্রেণীও একান্তই অচল ও অটল হইয়া রহিবে।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! দৈত্যরাজ শম্বর মনে মনে এইরূপ নির্ণয় করিয়া স্বীয় সুর-সংহারিণী সেনাদিগকে সেই মায়া-কল্পিত দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় দানবত্রয়ের অধিনায়কতায় ভূতলে প্রেরণ করিল। তৎকালে দৈত্যগণ নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া পক্ষযুত পর্ব্বতবৃন্দের ন্যায় ভয়ঙ্কর নিনাদ করিতে করিতে জলধি, বেলাবনকুঞ্জ ও গিরি-কন্দরাদি হইতে নির্গত হইল। অল্পকাল মধ্যেই সেই দাম, ব্যাল ও কট-পরিচালিত অসুর-বাহিনী সমস্ত ভূভাগ ও নভোমণ্ডলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। তাহাদিগের হস্তস্থিত আয়ুধরাজির প্রভাপুঞ্জে প্রভাকরের প্রভাপটল পরিম্লান হইল।

এই সময় সুমেরুগিরির কুঞ্জপুঞ্জ ও কন্দর-বৃন্দ হইতে ভয়ঙ্কর সুরসৈন্য-দল অবিচলিত-চিত্তে সমুত্থিত হইলে, মনে হইল যেন প্রলয়াবসানে পুনর্ব্বার প্রাণিগণ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল। তখন আকালিক মহাপ্রলয়ের ন্যায় স্বর্গ ও মর্ত্তভূমির মধ্যস্থলে দেব ও দৈত্য উভয় পক্ষীয় সৈন্যদলের ঘোরতর সংগ্রাম আরম্ভ হইল। কত শত শত সৈন্য নিহত হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল। তখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ছিন্ন মুণ্ডসকল ভূলুণ্ঠিত হইলে তাহাদের কর্ণলগ্ন কুণ্ডলসমূহের জ্যোতিঃপটলে চতুর্দিকস্থ অন্ধকারপুঞ্জ অপসারিত হইতে লাগিল, তাহাতে মনে হইল যেন প্রলয়কালে বিপর্য্যস্ত চন্দ্র-সূর্য্যের দীপ্তিচ্ছটা ভূতলে পতিত হইয়াছে। ঐ সকল ছিন্ন মুণ্ড ভূপৃষ্ঠে পতিত হইবার পর যোদ্ধৃবৃন্দের সিংহনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া ঘূর্ণিত হইতে লাগিল; তাহাতে মনে হইল যেন পর্ব্বত সকল প্রলয়-কালীন প্রভঞ্জন-তাড়নে অন্তঃস্ফুটিত ও মারুতপূর্ণ হইয়া হাসিতে হাসিতে ইতস্ততঃ বিলুণ্ঠিত হইতেছে। সুরগণ বৃহৎ বৃহৎ পার্ব্বত্য শিলাখণ্ডের ন্যায় অস্ত্র শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। সেই অস্ত্র-শস্ত্রসমূহের দারুণ আঘাতে কুলাচলকুলের সানুদেশগুলি ভীষণ ধ্বনি সহকারে বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তাহাতে সেই সেই গিরি-গহ্বরশায়ী কেশরিকুল ভীত হইয়া আরও অভ্যন্তরে বিলীন হইতে লাগিল। অস্ত্রশস্ত্র সমূহের পরস্পর

ঘাত-প্রতিঘাতে ইতস্ততঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল বিকীর্ণ হইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ তারকানিকরবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। এইরূপে কিয়ৎকাল ভীষণ সংগ্রাম চলিল।

অনন্তর উন্নত-কলেবর বেতালগণ দলে দলে সেই মাংস-শোণিতময় রণ-মহার্ণব-তীরে প্রলয়কালীন তালতরুর ন্যায় অবতরণ-পূর্ব্বক তাল লয় সহকারে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। অজস্র রুধিরধারা-বর্ষণে ধূলিময় জলদজাল প্রশমিত হইয়া গেল। অস্ত্রাহত মুণ্ডসমূহের কুণ্ডলদল নির্ম্মল নভোমণ্ডলে দিবাকরবৎ দেদীপ্যমান হইল। দৈত্যসেনা সবলে কল্পতরু সকল উৎপাটন-পূর্ব্বক হস্তে লইয়া এরূপ ভয়ঙ্কর প্রহার করিতে লাগিল যে, তাহাতে শৈলকুলও দলিত হইয়া গেল। কি দিক্, কি বিদিক্, সমস্ত স্থলই দানবদলে পরিপূর্ণ হইল। যেখানে দানব নাই, এমন স্থান তখন কুত্রাপি আর লক্ষিত হইল না। প্রচণ্ড-পবনবেগের ন্যায় যোধগণের সমুজ্বল অসিধারায় সমাহত হইয়া শৈল সকল যেন প্রলয়ানলে দলিত হইয়াই চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল।

তখন বিবুধগণ দানবগণের অস্ত্রাঘাতে বিপর্য্যস্ত হইলেও যেন অশ্বমেধ-যজ্ঞীয় হবির্ভোজনে বিবর্দ্ধিত হইয়াই দানবদলকে আক্রমণ করিলেন। তাঁহাদের সেই আক্রমণ দর্শনে মনে হইল যেন জলদাবলীকে প্রচণ্ড পবন এবং যেন বৃদ্ধ মূষিকদলকে মার্জ্জারগণ আক্রমণ করিল। কিন্তু সে আক্রমণে অসুরদল বিচলিত হইল না; তাহারাও সেই মুহূর্ত্তে সমরোন্মত্ত সুরগণকে আক্রমণ করিল। তখন বোধ হইল, যেন ভল্লুকেরা বৃক্ষারূঢ় প্রাণীদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিল। সুর ও অসুরেরা তৎকালে প্রফুল্লপুষ্প নবপল্লবিত চঞ্চল বনতরু-নিকরের ন্যায় প্রতিভাত হইলেন; তাঁহাদের ভুজ-পরম্পরা ঐ বনতরু-নিচয়ের শাখা-প্রশাখা, অসি-লতা সকল পল্লবদল এবং বাণরাজি উঁহাদের কুসুম-সমূহ। সুর ও অসুরদল নিরন্তর অস্ত্র বর্ষণে দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিলেন; তখন বোধ হইল, সমীরণ যেন কুসুম-নিকর বিকিরণ করিয়া সুমেরুগিরির বনস্থলীগুলি পরিপূরণ করিয়া ফেলিলেন। এইরূপে দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালরূপ উডুম্বরফলের মধ্যভাগে মশকবৃন্দের ন্যায় দেব ও দানবসেনার তৎকালে তুমুল সংগ্রাম আরম্ভ হইল। লোক-

পালদিগের উত্তুঙ্গ মাতঙ্গগণের পদাঘাতে দানবদল দলিত হইতে লাগিল; তাহাদের আর্ত্ত-চীৎকার ও মাতঙ্গগণের ভীষণ বৃংহণ-নাদ এই উভয় মিলিয়া প্রলয়কালের ঘন-ঘোর গর্জ্জনের ন্যায় এক ভীষণ সমর-কোলাহল সমুত্থিত হইল। বিশাল নভোমণ্ডল অপার অনন্ত সৈন্য-সমবায়ে সমাচিত হইয়া ভূভাগের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। জলভার-মন্থর ঘোর ঘনাবলীর গভীর গর্জ্জনের ন্যায় ঈদৃশ ঘনীভূত রণ-কোলাহল পরিশ্রুত হইল যে, যেন উহা মুষ্টিগ্রাহ্য বলিয়া মনে হইতে লাগিল। সেই দারুণ সমরে শরাঘাতে অসংখ্য উভয়পক্ষীয় যোধবৃন্দের বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ হইল; রথ-পাত-পিষ্ট শস্ত্রসমূহের ঝঞ্ঝনারব সহ তাহাদিগের কর্কশ ক্রন্দনধ্বনি শুনিয়া মনে হইল, যেন শৈলস্থিত নর্ত্তনশীল নটদল তাল-লয়-সহকারে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল। প্রলয়ের প্রভঞ্জন ও হুতাশনের বিস্ফুরণে যাদৃশ প্রচণ্ড নিনাদ সমুত্থিত হয়, সেই সুরাসুরগণের সমরধ্বনিও সেইরূপ সমুত্থিত হইতে লাগিল। তৎশ্রবণে মনে হইল, বুঝি বা প্রলয়সময়ে যুগপৎ দ্বাদশাদিত্য সমুদিত হইয়াছে এবং সেই জন্য সুমেরুগিরি দ্রবীভূত হওয়ায় তদীয় শব্দ পরিশ্রুত হইতেছে। প্রখর স্রোতস্বিনীর সলিলসমূহের ভয়ঙ্কর নিনাদের ন্যায় তাৎকালিক সেই সংগ্রাম শব্দ যেন ব্রহ্মাণ্ড কটাহে সমাহত হইয়াই প্রত্যাবৃত্ত হইতে লাগিল। সপক্ষ শৈলকুল ইতস্ততঃ সঞ্চরমাণ হইলে তদীয় পক্ষ-বিক্ষেপ হইতে যে মহাশব্দ সমুত্থিত হয় এবং মন্দরাচলে মথ্যমান ক্ষীরোদ-মহাব্ধির আলোড়নে যে ভীষণ ধ্বনি প্রাদুর্ভূত হয় ও মন্থনকালীন সুধা-লাভ-লালসায় একান্ত আসক্তির সহিত সেই ধ্বনি শ্রবণ-পরায়ণ সুরাসুরগণ সানন্দে যে প্রচণ্ড ভুজাস্ফোটন রব করেন, তাহার ন্যায় কর্ণবিদারী সেই সমরধ্বনি সমুত্থিত হইয়া নিখিল দ্বীপ-মালিনী মেদিনীকে আপূরিত করিয়া ফেলিল এবং শৈলেন্দ্রসমূহের কন্দরবৃন্দ যেন কর্ণাকারে প্রতিভাত হইয়া উল্লিখিত তীব্র সমরধ্বনির প্রবেশ হেতু বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

হে রাঘব! সেই যুদ্ধক্ষেত্রে এইরূপ একটা ঘন ঘোর সমর-কোলাহল সমুত্থিত হইলে, সেই ক্রোধোদ্দীপ্ত সুরাসুরসেনার সংগ্রাম অতি ভীষণাকারে পরিণত হইল। তখন নগর, গ্রাম, পর্ব্বত, কানন কিম্বা মানব, সে সংগ্রামে সকলেই নিষ্পিষ্ট হইয়া গেল। কত শত মহাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে

লাগিল, তাহাতে দানবদল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অচলের ন্যায় দশদিক্ পরিপূর্ণ করিয়া তুলিল। পরস্পর আহত হইয়া অস্ত্র সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে লাগিল। সেই চূর্ণীকৃত অস্ত্রজালে অম্বরোদর পূর্ণ হইয়া গেল। অগণিত ভুশুণ্ডী অস্ত্রের আস্ফোটনে শত শত মেরুশিখর স্ফুটিত হইল। শরসমূহ-রূপ সমীরণের প্রবাহবেগে দেব ও দানবদলের মুখাম্বুজ সকল উৎপাটিত হইতে লাগিল। চক্ররূপ আবর্ত্ত-বিবর্ত্তে শত শত দেব-দৈত্যরূপ জীর্ণ-শীর্ণ তৃণপুঞ্জ ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। উভয় পক্ষীয় সেনাদলের পরস্পর প্রহার-রূপ কল্লোলকুলের সঞ্চলনে নভোমণ্ডল যেন চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনবরত শস্ত্র-সঞ্চালনে প্রচণ্ড পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল; সেই পবন-তাড়নে বিমানচারী সকল নিষ্পিষ্ট হইয়া নিপতিত হইতে লাগিল। সমরে বরুণাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতেছিল; সেই অস্ত্রপ্রভাবে সমুদ্ভূত সাগরজলের প্রবাহে স্বর্গভূমি প্লাবিত হইয়া গেল। অসি, শূল ও শক্তি প্রভৃতি যে সকল মহাস্ত্র নিপ-তিত হইতেছিল, তাহারা শত শত শৈবলিনীর ন্যায় প্রবাহিত হইতে লাগিল। শৈলসমূহের পার্শ্বদেশে বীরবৃন্দ ভীষণ বাহ্বাস্ফোট করিতে প্রবৃত্ত হইলে, ঐ শৈল সকল কম্পিত হওয়ায় বোধ হইল যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডপই কুম্পিত হইতে লাগিল। দৈত্যদলের অজস্র পার্ষ্ণিপ্রহারে লোকপালদিগের পুর-পত্তন সকল বিধ্বস্ত হইয়া পতিত হইল। পুর-মহিলাগণের হলহলাধ্বনি ও কঙ্কণ-নিক্কনে সমস্ত গৃহপ্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। বহু দৈত্য অস্ত্রাঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া ভূলুণ্ঠিত হইতেছিল; তাহাদের দেহ হইতে নিরন্তর রুধিরধারা নির্গত হওয়ায় সমস্ত রণস্থল যেন জলপ্লাবিত হইয়া গেল। যোদ্ধৃবৃন্দ রক্তাক্ত-দেহে আর্ত্তনাদ করিতে আরম্ভ করিলে জন-মণ্ডলীর হৃদয় যেন দ্রবীভূত হইতে লাগিল। পদ্মিনী মধ্যে মধুকরের ন্যায় যমরাজ যেন কখন কখন লোকপালদিগের মৃত সেনাপতিগণের প্রাণহরণার্থ প্রচ্ছন্ন এবং কখন কখন বা যুদ্ধার্থ প্রকট হইতে লাগিলেন। কত সৈন্য প্রাণভয়ে পলাইতে লাগিল; প্রতিদ্বন্দ্বী সুরাসুরগণ তাহাদের প্রতি ভীষণ অস্ত্র প্রহার করিতে লাগিল। তাহারা অস্ত্রাহত হইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন-পূর্ব্বক প্রহারে প্রবৃত্ত হইলে সমরস্থল আকুল হইয়া উঠিল। পক্ষবান্ পর্ব্বতের ন্যায় ভীমাকৃতি দানবেরা বারম্বার গমনাগমনে 'শকশবা' শব্দ ও ভূমি

ভূরি ভয়ঙ্কর রব করিতে লাগিল, তাহাতে তখন রণাঙ্গন নিতান্ত ভীষণ ভাব ধারণ করিল। দানবরূপ মহীধরগণ অস্ত্রাঘাতে বিদীর্ণ হইলে, তাহা হইতে নির্ঝরাকার রুধিরধারা নির্গত হইতে লাগিল; তাহাতে নিখিল ভূমণ্ডল, সমগ্র সাগর-খাত ও সমস্ত শৈলভূমি অরুণিত হইয়া গেল। সেই সমর-সঙ্ঘর্ষের ফলে কত রাষ্ট্র, কত নগর, কত কানন ও কত গ্রাম যে উৎসন্ন হইল, তাহার ইয়ত্তা রহিল না। সেই সমরস্থলে কত সংখ্যাতীত গতপ্রাণ মাতঙ্গ, তুরঙ্গ, দানব ও মানবের স্তূপীকৃত শবদেহ সকল পর্ব্বতবৎ প্রতীয়মান হইতে লাগিল। গাত্রবিদ্ধ উত্তুঙ্গ নারাচ-নিকরে করিগণ সুশোভিত এবং মুষ্ট্যাঘাতে উন্মত্ত ঐরাবতের স্কন্ধদেশ নিষ্পিষ্ট হইতে লাগিল। প্রলয়ের জলদাবলীর বারিধারা বর্ষণের ন্যায় অজস্র শরধারা-পতনে সমস্ত পর্ব্বতদেশ দলিত হইল। মুহুর্মুহুঃ ভীষণ বজ্রপাতে কুলাচল সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া উড্ডীন হইতে লাগিল।

এই সময় দেবগণ আগ্নেয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন; তাহাতে শিখা-জাল-জটিল প্রচণ্ড বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া দানবদল দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। তখন ভীমকর্ম্মা দানবেরাও বরুণাস্ত্র নিক্ষেপ করিল। সেই অস্ত্রপ্রভাবে দানবগণ যেন জলনিধিকে একাঞ্জলিপুটে আনয়ন করিয়াই সেই বহ্নিরাশি নির্ব্বাপিত করিয়া দিল। তাহারা মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলাখণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের পরস্পর সংঘর্ষ-সমুৎপন্ন ভীষণ বহ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তুলিল। তখন দেবগণও বনব্যূহ সদৃশ রাশীকৃত ইন্ধনস্তূপ দ্বারা মহাবহ্নি প্রজ্বালিত করিলেন, তাহার প্রভাবে সেই দৈত্য-দীপিত ভীষণ বহ্নি তৎক্ষণাৎ তিরোহিত হইয়া গেল।

অনন্তর দেবগণ এমন এক অপূর্ব্ব অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন যে, তাহার প্রভাবে যেন কল্পান্ত রাত্রিকালীয় দুর্ব্বার তমস্তোম প্রাদুর্ভূত হইল। এদিকে দানবেরাও পরাঙ্মুখ নহে; তাহারাও তৎক্ষণাৎ মায়াবলে মার্ত্তণ্ড-মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া সেই ঘন-ঘোর তমস্তোম অপসারিত করিয়া ফেলিল। সেই ভয়াবহ সংগ্রামক্ষেত্রে মায়াময়ী মেঘমালা সমুদিত হইয়া প্রচুর বারি বর্ষণে প্রবৃত্ত হইলে মায়াময় বহ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল; তাহাতে ঐ বারিবর্ষণ প্রশমিত হইয়া গেল। এইরূপে কখন কখন আগ্নেয়াস্ত্র

অস্ত্র-শস্ত্রের সীৎকার সহকৃত পরস্পর সংঘট্টনে ভয়ঙ্কর অগ্নিবৃষ্টি হইতে আরম্ভ হইল এবং কখন কখন অশনিবর্ষিণী অস্ত্রধারায় শৈলবর্ষী অস্ত্র নিরাকৃত, এবং কখন নিদ্রাস্ত্রে প্রবোধাস্ত্র অন্তর্হিত হইতে লাগিল। কখন অনলোদ্গারী অস্ত্রসমূহ নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র প্রতিপক্ষ কর্তৃক বিহত, কখন পাদপাস্ত্র পাতন মাত্র ক্রকচাস্ত্র নিক্ষিপ্ত এবং কখন কখন বা বহ্নি ও বারিবর্ষী অস্ত্রের বৈপরীত্যে রণাঙ্গন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইতে লাগিল। কখন উভয় পক্ষ হইতেই ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র রণক্ষেত্র সঙ্কট-সঙ্কুল হইল এবং কখন বা তৈজসাস্ত্রে তিমিরাস্ত্র প্রতিহত হইয়া গেল। ফলতঃ তৎকালে সুর ও অসুর পক্ষ হইতে যে সকল অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল, সেই সেই অস্ত্র হইতে আবার বিবিধ আয়ুধশ্রেণী প্রাদুর্ভূত হইয়া অম্বরতল পরিপূরিত করিল। তখনকার দৃশ্য এইরূপ হইল যে, কখন যোধবৃন্দ শিলাস্ত্র বর্ষণে বিদলিত এবং কখন বহ্নিবর্ষী অস্ত্রজালে সমুদ্দীপিত হইতে লাগিল। সেই লোমহর্ষণ সংগ্রামে অত্যুচ্চ রথরাজি পরিদৃষ্ট হইল ; সেই সকল রথস্থিত পতাকাশ্রেণী যেন শশাঙ্কমণ্ডল স্পর্শ করিতে সমুৎসুক বলিয়াই বোধ হইতে লাগিল। ঐ রথরাজি স্ব স্ব চক্রচয়ের ঘর্ঘর শব্দে চীৎকার করত যেন মুহূর্ত্ত -মধ্যে উদয় ও অস্তগিরি লঙ্ঘন করিতে আরম্ভ করিল। তখন অবিরত অশনি-পাতনে যে সকল অসুর মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল, শুক্রাচার্য্যের মৃতসঞ্জীবনী নাম্নী মহাবিদ্যার মহা মহিমায় তৎক্ষণাৎ তাহারা পুনর্জ্জীবন প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

এই সময় দেবগণ রণে ভঙ্গ দিয়া কখন পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কখন আবার জয়লাভে উল্লসিত হইতে লাগিলেন। কখন শুভগ্রহ সমুদিত হইলে, যোদ্ধৃগণ তাহাদিগকে উৎপাতসূচক মহাকেতু বোধে শঙ্কিত হইতে লাগিল, আবার কখন বা সেই উৎপাত-জনক কেতুদিগকেই মঙ্গলকর বলিয়া মনে করত তাহাদের দর্শনাশায় সমুদ্-গ্রীব হইয়া রহিল। তখন যাবতীয় অচল, নভোমণ্ডল, বসুধা, বারিধি, সুরপুরী, অধিক কি, এই সমগ্র জগন্মণ্ডলই যেন একটা শোণিত-সাগর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই শোণিতময় সমর-সাগর সুরাসুরবৃন্দের দুর্ব্বার বৈরিভাবের পরিণতিবশে পর্ব্বত-পরিমিত স্তূপীকৃত অসংখ্য শব-

দেহে পরিপূর্ণ হইয়া প্রস্ফুটিত কিংশুক-কাননের সমান শোভায় পরিণত হইল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শবদেহ সকল তরু-নিকরের শাখাগ্র দেশে লম্বিত হইয়া দুলিতে লাগিল। তালতরু-প্রতিম সুবৃহৎ শরসমূহ যেন মহারণ্যবৎ নভস্তল অচ্ছাদিত করিল। শরনিকরের পক্ষগুলি ঐ মহারণ্যের পুষ্প এবং ফলকাবলী উহার ফলশ্রেণীরূপে প্রতিভাত। শৈলাকার অসংখ্য কবন্ধবৃন্দের নর্ত্তন-রত শত শত বাহু-বিক্ষেপে বারিধর, বিমান-বিহারী সুরনিকর ও তারকাদল পতিত হইতে লাগিল। এত অসংখ্য শর, শক্তি, গদা, প্রাস ও পট্টিশাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হইতেছিল যে, তাহাদের আঘাত-বেগে বহুল শৈল ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। অনবরত অস্ত্রাঘাতে ঊর্দ্ধস্থিত সপ্তলোকের ভিত্তিভূমি খণ্ডবিখণ্ড হইয়া গেল; সেই সকল ভূমিখণ্ড ঐ সুরলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া আকাশতল আবৃত করিয়া ফেলিল। প্রলয়ের ঘনঘটার গভীর গর্জ্জনের ন্যায় অবিরত প্রচণ্ড দুন্দুভিধ্বনি হইতে লাগিল। তৎশ্রবণে পাতালতলস্থিত দিগ্‌গজগণ প্রতিগর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল। গণাধিপতির সুদীর্ঘ শুণ্ডবেষ্টনে ভূধরোপম দানবগণ আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সূর্য্য ও শক্র প্রভৃতি সুরগণ রণ সম্ভ্রমে সহসা একই দিকে মিলিত হইলেন; সিদ্ধ, সাধ্য ও মরুদ্‌গণ দানবভয়ে নিষ্পন্দ হইয়া রহিলেন এবং গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, অমর ও চারণবৃন্দ পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

তৎকালে সমরাঙ্গণের সর্ব্বদিকে ঔৎপাতিক ঝঞ্ঝাবায়ু বহিতে লাগিল। বৈদ্যুতাগ্নি-পাতে প্রাণিবর্গের অঙ্গ সকল খণ্ডিত ও অগণিত শিলাখণ্ড দলিত হইতে লাগিল। সেই সকল শিলাখণ্ডের ভয়ঙ্কর রবে কল্প পাদপস্থিত ভ্রমর ও কোকিলাবলীর মধুর ধ্বনি তিরোহিত হইয়া গেল। ফলতঃ তখনকার সেই প্রচণ্ড পবন যেন সুরসমূহের প্রলয়কাল সূচনা করিয়া দিল।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৬ ॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! তাৎকালিক সেই ঘোরতর সমর-সম্ভ্রম আরম্ভ হইলে অভ্রোদর-সন্নিভ দেব ও দানবদলের দেহগর্ত্ত হইতে অস্ত্রাঘাত-জনিত অজস্র অসৃক্‌প্রবাহ অম্বর দেশ হইতে গঙ্গা-প্রবাহের ন্যায় নিম্নে পতিত হইতে লাগিল। দাম-নামক অসুর-সেনাপতি দেবদলকে বেষ্টন করিয়া ঘোরতর সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল। ব্যাল-নামধেয় অসুর-সেনানী স্বীয় করে সুরগণের বাসভবন সকল আকর্ষণ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং কট-নামধেয় অসুরসেনানী ঘোরতর সমরে সুর-সমূহকে সম্মর্দ্দিত করিতে লাগিল।

এইরূপে কিয়ৎকাল ঘোর সংগ্রাম চলিল। অনন্তর ইন্দ্রবাহন ঐরাবত ক্ষীণকণ্ঠে পলায়নে প্রবৃত্ত হইল। দানবদল মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডবৎ দীপ্ত হইয়া উঠিল। সুরসৈন্য সকল ভগ্নাঙ্গ ও ব্যথিত হইল। তাহারা শোণিত-চর্চ্চিত-দেহে ভগ্নসেতু সলিলের ন্যায় দ্রুত-পদক্ষেপে পলায়ন করিতে লাগিল। এই সময় দাম, ব্যাল ও কট এই অসুরত্রয় সিংহনাদ করিতে করিতে সুরসৈন্যদলের পশ্চাদ্ধাবন করিল। তাহাতে মনে হইল, অনল যেন ইন্ধনের অনুসরণ করিল; কিন্তু মৃগগণ নিবিড়তর লতাজালময় অরণ্যমধ্যে লুক্কায়িত হইলে, সিংহ যেমন তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া পায় না, তেমনি অসুরসৈন্যেরাও বহু যত্নে বহু অন্বেষণ করিয়াও সুরসৈন্যের সন্ধান পাইল না। তখন সেই দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অসুরত্রয় জয়লাভে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া পাতালতলস্থ স্বীয় প্রভু শম্বরের নিকট প্রস্থান করিল।

এদিকে দেবগণ পরাজিত হইলেন। পরাজয়-জনিত বিষাদভরে তাঁহারা ক্ষুণ্ণমনে ক্ষণকাল বিশ্রামের পর জয়লাভের উপায় উদ্ভাবনের নিমিত্ত অমিততেজা ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন। সায়ংসময়ে সুধাকর যেমন রবিকর-নিকরে লোহিতায়মান সাগর-বারির সম্মুখবর্ত্তী হয়েন,

তেমনি তখন ভগবান্ ব্রহ্মা সেই শোণিতারুণিত মুখমণ্ডল-সম্পন্ন সুরগণের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন; অমনি সুরগণ সেই ব্রহ্মাকে প্রণিপাত-পূর্ব্বক শম্বরাসুরের মায়া-নির্ম্মিত দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অসুরত্রয় হইতে আপনাদিগের সঙ্কট-সঙ্ঘটন বিজ্ঞাপন করিলেন। বিচারবিৎ ব্রহ্মা তাঁহাদের সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্ব্বক মনে মনে বিচার করিয়া আশ্বাস বাক্যে বলিলেন, হে সুরগণ! অযুতবর্ষ অতীত হইলে শম্বরাসুর সমরাধিপ হরির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবে; তোমরা এতাবৎ কাল অপেক্ষা করিয়া থাক। হে অমরশ্রেষ্ঠগণ! এখন হইতে তোমরা দাম, ব্যাল ও কট-দানবের সহিত পুনঃপুন মায়াযুদ্ধে প্রবৃত্ত ও পুনঃপুন পলায়মান হইতে থাক। ঐ অসুরত্রয় বহুবার যুদ্ধাভ্যাস করিতে থাকিলে, সেই অভ্যাসবশে উহাদের দর্পণবৎ বিমল হৃদয়ে প্রথমতঃ অহঙ্কার-চমৎকার প্রতিবিম্বিত হইবে; অনন্তর অহঙ্কারগ্রস্ত হইলে ক্রমে উহাদের বাসনা উপচিত হইবে। যখন বাসনা জন্মিবে, তখনই উহারা জালবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় তোমাদিগের হস্তে পরাজিত হইবে। সম্প্রতি উহাদের কোনই বাসনা নাই; তাই উহারা সুখ দুঃখাদি হইতে পরিমুক্ত। উহাদের সুখ-দুঃখ নাই বলিয়াই উহারা এখন ধৈর্য্যবলে দুর্জ্জয় হইয়া শত্রুসংহারে সক্ষম হইয়াছে। হে সুরগণ! যাহারা বাসনা-সূত্রে আবদ্ধ, তাহারাই বাসনাপাশে বশীকৃত হইয়া রজ্জুবদ্ধ বিহঙ্গমদিগের ন্যায় এ জগতে বশ্যতা প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা বাসনা বিসর্জ্জন করিয়াছেন, চিত্ত যাঁহাদের কোন কিছুতেই আসক্ত নহে, যাঁহারা হর্ষের কারণ সত্ত্বেও হৃষ্ট হয়েন না বা ক্রোধের কারণ থাকিলেও ক্রোধ আশ্রয় করেন না, তথাবিধ ধীরচেতা বীরগণ সর্ব্বত্রই দুর্জ্জয় হইয়া থাকেন। যাঁহার অন্তঃকরণ বাসনা-সূত্রে গ্রন্থিবদ্ধ, তাদৃশ জন মহৎ ব্যক্তিই হউন অথবা বহুদর্শীই হউন, সামান্য বালকের নিকটও তাঁহাকে পরাভূত হইতে হয়। যে জন 'এই সেই আমি, ইহা আমার, তাহাও আমার' এবম্প্রকার কল্পনা-পরায়ণ হয়; সাগর যেমন সর্ব্ব সলিলের আধার, তাদৃশ জনও তেমনি সর্ব্বাপদের পাত্র হইয়া থাকে। যত কিছু দুর্ব্বাসনা আছে, তন্মধ্যে দেহাদিতে যে আত্মভাবনা, তাদৃশ বাসনাই মহানর্থের মূল; যিনি ঐরূপ বাসনায় বাসিত, তিনি যদি সর্ব্বজ্ঞও হয়েন, তথাপি তাঁহাকে সর্ব্বত্র দীনতা প্রাপ্ত হইতে হয়।

যিনি অনন্ত ও অপ্রমেয়, সেই আত্মার যিনি ইয়ত্তা কল্পনা করেন, তিনি আপনা দ্বারা আপনিই আপনাকে সংসারের অনর্থপরম্পরায় বিহ্বল করিয়া তুলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জগতে যদি আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু থাকিত, তবেই না হয় উপাদেয় জ্ঞানে তাহাতে বাসনা হওয়া সম্ভব হইত; পরন্তু তাহা যখন নাই, তখন যে কেন বাসনা উৎপন্ন হয়, তাহা ত আমার ধারণাতীত। দেখ, অসৎপদার্থে আস্থা স্থাপনই অনন্ত দুঃখের আকর; আর, তাহাতে যে অনাস্থা, তাহাই অনন্ত সুখের মূল; সুখ ও দুঃখ বিষয়ে জ্ঞানীদিগের ইহাই অভিমত। সুতরাং উল্লিখিত দাম, ব্যাল ও কট-নামক দানবত্রয় যত দিন না এই ভবসংস্থানে আস্থাবান্ হইতেছে, তাবৎকালের মধ্যে উঁহাদিগকে পরাজয় করা তোমাদিগের পক্ষে একান্তই অসম্ভব। দেখ, মশকের পাল কোথাও কখন অগ্নিরাশিকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে কি? ফলতঃ বাসনাবশেই লোক পরাজয় প্রাপ্ত হয়। যাহা কাতরতার অনুগত, ও দেহাদিতে অহম্ভাবের গ্রাহক, তথাবিধ আন্তরিক বাসনাই জীবের পরাজয়-প্রাপ্তির হেতু। অন্যথা অর্থাৎ তাদৃশ বাসনার অভাবে অতি ক্ষুদ্রতম মশকও সুমেরু শৈলের ন্যায় অপ্রকম্প্য হয়। যেখানে বাসনা আছে, সেইখানেই তাহার পীনতা প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে; কেন না, যাহা সগুণ দ্রব্য, তাহাতেই গুণ পদার্থের অস্তিত্ব থাকে। উপচয় ব্যতীত পীনত্ব সিদ্ধি ঘটে না, সেই উপচয়ও দ্বিতীয় অবয়ব-সিদ্ধিতেই ঘটিয়া থাকে; এই যে দ্বিত্ব, ইহা ভাব-দ্রব্যেরই দৃষ্ট হয়, অভাব-দ্রব্যের দেখিতে পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছিলাম, একবার যদি বাসনা হৃদয়কে অধিকার করিয়া বসিল, তাহা হইলে ক্রমশঃই তাহা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। সুতরাং ওহে শক্র! যাহাতে দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় দানবত্রয় অন্তরে 'এই দেহাদিই সেই আমি; এই জয়, পরাজয় ও পূজাদি আমারই' এবম্প্রকার বাসনা পোষণ করে, তোমরা সর্ব্ব-প্রযত্নে তাহারই উপায় করিতে থাক। জীবের যে যে ভাব ও অভাব দশা এবং সেই সেই দশায় তাহার যে যে বিপদ্-সঙ্ঘটন, সে সকল কেবল তৃষ্ণারূপিণী করঞ্জ-বল্লীরই কটু-কোমল মঞ্জরী। যে লোক বাসনাসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিদ্যমান, তাহার সেই বাসনা অতিমাত্র দুঃখের নিমিত্তই বর্দ্ধিত হয়, এবং চিরদিনব্যাপী সুখের জন্যই উচ্ছেদ পাইয়া যায়।

সিংহ যেমন শৃঙ্খলে বন্ধন প্রাপ্ত হয়, তেমনি জীব যত বড় বিজ্ঞই হউন, এবং যাদৃশ ধীরপ্রকৃতি, সৎকুলসম্ভবা মহানুভবই থাকুন, তৃষ্ণায় তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন। একমাত্র তৃষ্ণাই চিত্তরূপ বিহঙ্গমের বাগুরারূপে কল্পিত। ঐ চিত্ত-বিহঙ্গম দেহরূপ পাদপে হৃদয়রূপ কুলায়মধ্যে বাস করিয়া থাকে। কোন বিহঙ্গ রজ্জুবদ্ধ হইয়া বিবশভাবে শ্বাস পরিত্যাগ করিতে থাকিলে, বালক যেমন অনায়াসেই তাহাকে আকর্ষণ করে, বাসনাবদ্ধ দীন জন তেমনি কৃতান্তকরে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্যই বলি, হে দেবেন্দ্র! আয়ুধ-ভার-বহন ও রণ-প্রাঙ্গণে ভ্রমণ, এ দুইটী ব্যাপারে তোমাদের অধুনা তত প্রয়োজন নাই। সেই তিন প্রধান শত্রুর যাহাতে অভিমান-উপচয় হয়, তোমরা যুক্তিবলে তাহারই চেষ্টা কর। হে সুরনায়ক! শত্রুর অন্তরে যতদিন পর্য্যন্ত ধৈর্য্যবল অবিচল রহিবে, তাবৎকাল শুক্রাদির নীতি-শাস্ত্রই বল, আর অস্ত্রশস্ত্রই বল, কোন কিছুতেই শত্রুজয় সাধিত হইবার নয়। এই অবস্থায় জয়লাভের যে উপায়, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এবং এখনও আবার বলিতেছি; ঐ দাম, ব্যাল ও কট, তোমাদের সহিত যদি বারম্বার যুদ্ধ করে, তাহা হইলেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে; কেন না, ঐরূপ যুদ্ধ অভ্যাসের ফলে নিশ্চয়ই তাহারা উন্মত্তচিত্ত হইবে এবং অহঙ্কারময়ী বাসনাও তাহাদিগকে বশ করিয়া লইবে। শম্বরের মায়ানির্ম্মিত সেই অতি অজ্ঞ দানবত্রয় যখন বাসনাকে আশ্রয় করিবে, তোমরা তখনই তাহাদিগকে জয় করিতে পারিবে; সুতরাং যতক্ষণ না তাহারা অভ্যাসদোষে বাসনার বশে বাস করে, ততকাল তোমরা যুক্তিবলে যুদ্ধ চালাইতে বদ্ধপরিকর হও এবং যুদ্ধের ফলে যাহাতে তাহারা সাংসারিক ব্যবহারে অভিজ্ঞ হইয়া উঠে, সে পক্ষে যত্ন প্রকাশ কর। এ কথা নিশ্চয় জানিয়া রাখিও, তাহারা যখন বাসনায় বদ্ধ হইবে, তখনই তোমাদের বশতাপন্ন হইয়া পড়িবে। তৃষ্ণায় যাহাদের আশয় মগ্ন নয়, এ জগতে তাহাদিগকে কি সামান্য ব্যক্তি বলিতে পারা যায়? কখনই না; অর্থাৎ তাহাদিগকে সামান্য ভাবিয়া তাহাদের বাসনার উদ্রেকবিষয়ে যত্ন-শৈথিল্য করিও না; করিলে, কার্য্যসিদ্ধি হ'বে না। দেখ, এই যে নিখিল বিচিত্র বিশ্ব বিরাজমান, বারিধিগর্ভে বিলোল লহরী-মালার ন্যায় বাসনার উদরেই ইহার প্রকৃত পক্ষে অবস্থান; অতএব

যেরূপ করিলে সেই দানবত্রয়ের অন্তরে বাসনার বিকাশ হয়, তোমাদের অধুনা তাহাই করা বিধেয়।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জলতরঙ্গ যেমন বেলাতট নিকটে কিছুকাল কলনাদ করিয়া তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি তখন ভগবান্ পিতামহ অমর-দিগকে ঐরূপ কহিয়া অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর অমরগণ ব্রহ্মার মুখ-কমলচ্যুত উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া স্ব স্ব অভিমত দিকে প্রস্থান করিলেন। তৎকালে মনে হইল, অনিলগণ যেন যথেষ্ট কমলপরিমল গ্রহণ করিয়া বনাবলী মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর যেমন মধুকর-নিকর কমনীয় কমলা-লয়ে বিশ্রাম লাভ করে, সেইরূপ সেই সুরগণ স্ব স্ব কান্ত মনোজ্ঞ মন্দির-বৃন্দে কিয়দ্দিন বিশ্রাম করিবার পর একদা আপনাদিগের শুভ অভ্যুদয় কাল প্রাপ্ত হইয়া প্রলয়কালীন ঘনঘটাবলীর ঘন ঘোর গর্জ্জনের ন্যায় গভীর দুন্দুভিনির্ঘোষ করিতে লাগিলেন। অবিলম্বে পাতালতলস্থ দৈত্য-দলের সহিত মহাব্যোম-পথে পুনরায় তাঁহাদের ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেই যুদ্ধ বহুকাল ধরিয়া চলিল।

তখন ঐ যুদ্ধ আরম্ভ হইবামাত্র অসি, শর, শক্তি, মুদ্গর, মুষল, গদা, পরশু, চক্র, শঙ্খ, অশনি, শৈলাকার শিলা, অনল, পাদপ এবং সর্পমুখ ও গরুড়-মুখাদি অশেষবিধ অস্ত্রশস্ত্র নানাদিকে নিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল যুদ্ধ হইবার পর এক মায়াকৃত আয়ুধরূপ মহাজল-প্রবাহবতী স্রোতস্বতী ক্ষিপ্রবেগে নির্গত হইল। উহাতে লক্ষ লক্ষ শিলা, শৈল, ও বৃক্ষাবলী নিক্ষিপ্ত হইলে উহার বিক্ষুব্ধ অম্বুরাশি হইতে ঘন ঘোর নির্ঘোষ সমুত্থিত হইতে লাগিল। ঐ স্রোতস্বতীর মধ্যস্থ প্রবাহ দিয়া কত শত শত উল্মুক, শূল, শৈল, প্রাস, অসি, কুন্ত, শর, তোমর ও

মুদ্গরশ্রেণী ভাসিয়া চলিল। ঐ মায়াময় আয়ুধ-তরঙ্গিণী অশনিবর্ষণে অনবরত দেবনিবাস সুমেরুপ্রভৃতির বপ্রচ্ছেদনে তদীয় চতুর্দ্দিক পরিবেষ্টন করত মন্দাকিনীর প্রবাহবৎ প্রবলবেগে নির্গত হইল। সেই ভয়াবহ সমরক্ষেত্রে কি দেব, কি দানব, উভয় পক্ষ হইতেই বারম্বার বিবিধ প্রকার মায়া উদ্ভাবিত ও বারম্বার প্রশমিত হইয়া যাইতে লাগিল। ঐ মায়ার উদ্ভাবনা এইরূপ; যথা—কখন উহা মহীময়ী, কখন জলময়ী, কখন তেজোময়ী, কখন বায়ুময়ী ও কখন আকাশময়ী হইয়া বিকাশ পাইতে লাগিল। পৃথিবীময়ী মায়ার প্রভাবে এই বসুধামণ্ডল যেন ঘূর্ণিত, যেন পতিত, যেন নিরুদ্ধ এবং যেন জলমগ্ন হইতে লাগিল। জনগণ কখন যেন অগ্নিদগ্ধ, কখন যেন পবনোড্ডীন, ও কখন যেন মহাগর্ত্তাকাশে নিপতিত হইতে লাগিল। কখন কখন দারুণপ্রকৃতির রাক্ষস ও পিশাচাদি প্রাদুর্ভূত হইয়া যত্র তত্র বিচরণ, উৎপতন, ধাবন, যোধন, ভক্ষণ ও চর্ব্বণ করিতে লাগিল। কখন তাহারা আপনা আপনি নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র বিতরণ ও গ্রহণ করিতে লাগিল। কখন কখন স্তূপীকৃত বিপক্ষ-শরীরে যুদ্ধস্থল অগম্য হইয়া উঠিল। সুর, অসুর ও সিদ্ধসম্প্রদায় এবম্বিধ বহু মায়া বহুবার প্রশমিত করিয়া ফেলিলেন, আবার উভয় পক্ষ হইতে ঐ ঐরূপ মায়াজাল বিস্তার পাইতে লাগিল; তাহাতে মনে হইতে লাগিল, সেই সেই মায়া যেন একই ভাবে স্থির হইয়া রহিল। ফলে, তাহাদের তত্ত্ব তখন অবিজ্ঞেয়রূপে প্রতিভাত হইল। মায়ার প্রভাবে শৈলাকার আয়ুধ-নিকরে ভূধরবৃন্দ বিঘট্টিত হইতে লাগিল। রুধিরনদীর জল প্রবাহে মহার্ণব সকল পরিপূর্ণ লক্ষিত হইল। দেবেন্দ্র ও অসুরেন্দ্রগণের শবসমূহরূপ শৈলোপরি কুন্তরূপ তালীবন সকল বিরূঢ় হইয়া উঠিল। তখনকার সেই যুদ্ধ-ব্যাপারে দিঙ্মণ্ডল এইরূপেই বিরাজ করিতে লাগিল। তখন মায়ার মহিমায় কত যে অঘটন ঘটিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কখন দলে দলে লৌহময় সিংহ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া সচেতনবৎ বিচরণ করিতে লাগিল এবং ক্রকচাকার নখ ও দন্তপংক্তি দ্বারা সুশোভিত হইল। ঐ সিংহদল সুরাসুর-নিক্ষিপ্ত কুন্ত, শর, শক্তি, গদা, অসি ও শৈলসমূহ অনায়াসে কবলিত করিতে লাগিল। কখন মায়াময়ী মহতী বিষধরাবলী আবির্ভূত হইল। তাহাদের জ্বালা-জটিল নয়ন-গরলের

অনল-তাপে দিঙ্মণ্ডল দগ্ধ হওয়ায় মনে হইতে লাগিল যেন যুগান্তোদিত দ্বাদশ দিবাকরের সেনাশ্রেণী অবতীর্ণ হইল এবং তাহারা যেন উড্ডীয়মান মহামহী-ধ্র-মগ্ন মহাব্ধির ন্যায় উল্লসিত হইতে লাগিল। কখন কখন বিবিধ আয়ুধ-নদীর প্রবাহপরম্পরায় সর্ব্বদিক হইতে সুমেরুগিরি বেষ্টিত হইলে মনে হইল, অব্ধি যেন ক্ষুব্ধ হইয়া বীচিবলয়ে নিখিল বিশ্ব ব্যাকুল করিয়া তুলিল এবং বিবিধ রত্নরাজি ও মকরনিকরের সঞ্চলনে উহার অন্তর যেন কর্কশ ও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তখন মায়ার মহিমায় কখন শৈলাস্ত্র প্রাদুর্ভূত হইল; আবার গারুড়াস্ত্র প্রকটিত হইয়া সেই শৈলকুল বিচালিত করিল এবং শৈল-চলনের সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রাগ্‌বর্ণিত দৃষ্টিবিষ বিষধরগণ পলাইয়া গেল। মায়াবলে কতই অঘটন ঘটিল। সুরাসুরবৃন্দের সমর-স্থল—নভস্তল কখন জলধিজলে প্লাবিত হইয়া গেল; কখন বহ্নিশিখায় দগ্ধ হইতে লাগিল; কখন দিবাকর-করে পরিপূর্ণ হইল এবং কখন আবার অন্ধকারপুঞ্জে পরিপূরিত হইয়া উঠিল। ব্যোমপথ, মায়ানির্ম্মিত গরুড়গণের 'গুড় গুড়' নাদে আকুল হইল; তাহাতে মায়ারচিত পর্ব্বতপুঞ্জ ও অস্ত্র-জাত হুতাশসজ্ঞ প্রসর্পিত হইল; তখন মনে হইতে লাগিল, অসহ্য কল্পকালের আবির্ভাবে সুরালয়, ভূতল ও তদুভয়ের অন্তরাল সহ জগৎ যেন পুনরায় জ্বলিয়া গেল। তখন অদ্রিতট হইতে পক্ষিগণের ন্যায় বসুধাতল হইতে দানবদল উৎপতিত হইতে লাগিল; অন্যদিকে প্রলয়-চালিত শৈলশিলার ন্যায় বিবুধবৃন্দ অতিবেগে ভূতলে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন। সমুন্নত শরদণ্ড সর্ব্বল সুরাসুরগণের শরীরে বিদ্ধ হইয়া বনাবলীর ন্যায় প্রতিভাত হইতেছিল; তাহাতে যেমন মায়াগ্নির সংযোগ ঘটিল, অমনি তাঁহারা তৎকালে কল্পানল-জ্বলিত ভূধরবৃন্দের ন্যায় গগনাঙ্গণে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সুরাসুরদিগের দেহসকল পর্ব্বতাকার বিশাল; তাহা হইতে অবিরল ধারে সর্ব্বদিকে শোণিতপ্রবাহ নির্গত হওয়ায় আকাশগঙ্গা পরিপূর্ণ হইলে মনে হইল যেন সুমেরুশৈলের চতুর্দ্দিক্‌স্থিত গগন-নায়ক সন্ধ্যা-নায়িকার নখ-ক্ষত-চিহ্ন ধারণ করিতে লাগিল। তখন নীতিকোবিদ দেব ও দানবগণ অস্ত্রাঘাতে অগণিত গিরীন্দ্রভিত্তি দলিত করত যেন উৎসব-বিশেষে ক্রীড়ার্থ নলিকা-যন্ত্রযোগে করিকুম্ভোপরি লাক্ষা, কুঙ্কুম ও চন্দনাদি

রসপ্রবাহ-বর্ষণের ন্যায় দিকে দিকে কখন বজ্রবর্ষণ, কখন অম্বুবর্ষণ, কখন বিবিধ ভীষণ অস্ত্রবর্ষণ, কখন বিষম অশনিবর্ষণ এবং কখন বা হুতাশন-বর্ষণ, আবার কখন বা পরস্পর ঐ সকল একই সময়ে বর্ষণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে দেব ও দানবেরা পরস্পর পরম উদ্যম সহকারে অস্ত্রশস্ত্র-প্রহারে পরস্পরের গাত্র বিদারণ করিতে লাগিলেন এবং ঐরাবত প্রভৃতি দিগ্‌গজগণের বংশপ্রভব বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গদিগের সমুন্নত পৃষ্ঠপ্রদেশে অবরোহণ করিয়া নভোভাগে অপূর্ব্বশোভা বিস্তারপূর্ব্বক আয়ুধহস্তে সর্ব্বদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। অস্ত্রপ্রহারে বীরবৃন্দের হস্তপদাদি ছিন্ন ভিন্ন হইয়া অশিবসূচক শলভমালার ন্যায় সৌরমণ্ডল ও দিগ্‌দিগন্ত আচ্ছাদিত করত নভোমণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিল; তাহাতে মনে হইল, বুঝি বা ভীষণ জলদজালে ভূতল ও নভস্তলের অন্তরাল দেশ আবৃত করিয়া ফেলিল। সেই ভীষণ সমরে বিবিধ কৌশলসহকারে যে সকল অস্ত্র ও শিলা শৈলাদি নিক্ষিপ্ত হইতেছিল, তাহাদের পরস্পরের আঘাতে ও সিংহ-নাদবর্ষী বীরবৃন্দের আস্ফালনে সে সকল স্ফুটিত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হওয়ায় বোধ হইল বসুধা যেন শতধা বিদীর্ণ হইয়া গেল। মেরুপ্রতিম বীরেন্দ্রবর্গের পরস্পর অঙ্গ-সঙ্ঘর্ষণে এবং দেব ও দানব পক্ষ হইতে নিক্ষিপ্ত নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র ও বৃক্ষাদি বর্ষণে তৎকলে যে নিদারুণ 'চটচটা' শব্দ সমুত্থিত হইতেছিল, তাহাতে বোধ হইল যেন গগনমণ্ডল স্ফুটিত হইয়া গেল এবং রণভূমি যেন প্রলয়কালীন ভীষণ দৃশ্যে পরিণত হইল।

এইরূপে সুরাসুরগণ মায়াবলে বঞ্চিত হইয়া ভয়ঙ্কর সংগ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমীরণ প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং অধোদিকে অনল ও জলরাশিকে এবং ঊর্দ্ধদিকে সৌর মণ্ডলকে বিক্ষোভিত করত সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডস্থান যেন বিদীর্ণ করিবার উপক্রম করিল। ব্রহ্মাণ্ড তখন আকস্মিক প্রলয়-সমাগমের ন্যায় ভয়ঙ্কর আকারে পরিণত হইল। যৎকালে বিশাল শৈলকুল আত্মপ্রমাণ কঠিনতর অস্ত্রাঘাতে আহত হইয়া 'রণরণ' রবে ঘুরিতে ঘুরিতে দিগ্‌দিগন্ত পরিপুরিত করিতেছিল, তখন মনে হইল, উহা-দিগের গভীর গহ্বর মধ্যে প্রচণ্ড পবন প্রবেশে উহারা যেন ক্লিষ্ট হইয়া কাতরধ্বনি করিতে লাগিল এবং তন্মধ্যস্থ কেশরিকুল ভয়বিহ্বল হইয়া

নানাদিকে প্রস্থানপূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে প্রবৃত্ত হইলে বোধ হইল, বুঝি শৈলকুল ক্রন্দন করিবার উপক্রম করিল। বাতাবকীর্ণ বনপর্ণরাশি যেমন মধ্যে মধ্যে ঘূর্ণিত হইয়া পতিত হয়, তেমনি তখন অন্তরীক্ষ ও রণক্ষেত্রের সর্ব্বত্র ভ্রমণশীল মায়ানদী, জলধি-জল, যোদ্ধৃবৃন্দ, জলদজাল, অগ্নিদাহ, বৃক্ষরাশি, দেবদানবদিগের শবদেহ সকল, শৈলকুল এবং শর, শক্তি, অসি, ও গদা প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র আপতিত হইয়া ঊর্দ্ধ অধঃ পূর্ণ হইয়া গেল। যুদ্ধক্ষেত্রে অগণিত মাতঙ্গশ্রেণীর সমাগম হইয়াছিল; তাহাদের প্রত্যেকতঃ দেহ-পরিমাণ সুমেরুগিরির প্রত্যন্তপর্ব্বতের অনুরূপ। ঐ দুর্ব্বার মাতঙ্গ-দলের সুবৃহৎ শবদেহে চলাচল পথ রুদ্ধ ও দিকৃতট পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল এবং পতিত বীর-দেহে, চূর্ণবিচূর্ণ গিরিগণে ও প্রচণ্ড সমীরবেগে বিধ্বস্ত সুর-মন্দিরবৃন্দে সাগরজল পরিপূরিত হইয়া গেল। বীরবৃন্দের তাৎকালিক নিরবচ্ছিন্ন ঝুঞ্ঝুমরবে অন্তরীক্ষ পথ পরিপূর্ণ হইল এবং রুধির প্রবাহে ধরা ও ধরাধর-পৃষ্ঠ প্রক্ষালিত হইয়া গেল; যেন তাহতে ব্রহ্মাণ্ডোদর রাক্ষসাদির ভয়ঙ্কর ভাব পরিগ্রহ করিল।

অনন্তর সংসার যেমন অনন্ত আত্মচৈতন্যেও জগদ্‌বিকার উৎপাদন করে এবং ক্ষয়োন্মুখ মনুষ্যবর্গের অন্তরে দুঃখের ও উদয়োন্মুখ জীবনিবহের হৃদয়ে সুখের বিকাশ করাইয়া দিয়া আশাস্ত্রীয় ও শাস্ত্রীয় চিত্তবৃত্তিরূপ দানব ও দেবগণের পরস্পর দ্বন্দ্বের ফলে বিষম আকার ধারণ করে, সেই সুরাসুর-বৃন্দের সমর-ক্রিয়াও তেমনি তখন অনন্তচক্ষু ইন্দ্রপ্রভৃতি দেবেন্দ্রগণের অন্তঃকরণে ভয়-বিষাদাদি বিকার জন্মাইয়া ক্ষয়োন্মুখ বীরেন্দ্রবর্গের অন্তরে-দুঃখ ও উদয়োন্মুখ যোধগণের হৃদয়ে সুখ উৎপাদন করত দেব ও দানব পক্ষীয়গণের পরস্পর সঙ্ঘর্ষের ফলে নিতান্তই বিষম হইয়া উঠিল।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

ঊনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ! অসুরগণ ঐরূপ সংগ্রাম করিয়া অনন্ত প্রাণীর প্রাণসংহার করিল; কিন্তু তাহাতে তাহাদের সমর-পিপাসা নিবৃত্তি পাইল না; তাহারা সহসা সমধিক ক্রুদ্ধ হইয়া পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ-তেজে যুদ্ধারম্ভ করিল। অনন্তর দেবগণ কখন মায়াজাল বিস্তার করিতে লাগিলেন, কখন বাগ্‌যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন, কখন সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, কখন বিগ্রহে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইলেন, কখন সময়বিশেষে পলায়ন করিলেন, কখন ধৈর্য্য ধরিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিলেন, কখন প্রচ্ছন্নভাবে আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন, কখন আত্মদৈন্য প্রকাশ করিলেন; কখন অস্ত্রযুদ্ধে ব্যাপৃত হইলেন এবং কখন কখন বা পুনঃপুনঃ পলায়ন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাদের প্রথম বারের যুদ্ধ ত্রিংশদ্বর্ষ, দ্বিতীয় বারের পঞ্চবর্ষ, আট মাস, দশ দিন এবং তৃতীয় বারের যুদ্ধ মাত্র দ্বাদশ দিন যাবৎ হয়। ঐ সকল যুদ্ধের প্রতি যুদ্ধেই কখন অজস্র বৃক্ষ বর্ষণ, কখন অনল বর্ষণ, কখন অস্ত্র বর্ষণ, কখন অশনি বর্ষণ এবং কখন পর্ব্বত বর্ষণ হইয়াছিল।

রামচন্দ্র! উল্লিখিত দীর্ঘ দিনব্যাপী যুদ্ধের ফলে সেই দাম, ব্যাল ও কট নামক অসুরত্রয় অহম্ভাবের কঠোর অভ্যাসে 'অহং' বাসনায় গ্রস্ত-চিত্ত হইয়া তাহাতেই আসক্ত হইয়া পড়িল। অত্যন্ত সান্নিধ্য বশতঃ দর্পণে যেমন অবাধে পদার্থ প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি অভ্যাসের আধিক্য নিবন্ধন ঐ অসুরত্রয়ের হৃদয়াদর্শেও অহঙ্কার প্রতিভাসিত হইল। যেমন কোন দূরস্থ বস্তু দর্পণে প্রতিবিম্ব প্রাপ্ত হয় না, তেমনি বস্তু-বাসনাও অভ্যাসের অভাব সত্ত্বে হৃদয়কে অধিকার করিতে পারে না। ঐ দাম, ব্যাল ও কট, যেই মাত্র 'অহং আত্মা' এবম্প্রকার বাসনায় গ্রস্ত হইল, তখনই তাহারা 'আমার জীবন, আমার ধন' ইত্যাদি ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িল এবং ঐরূপ ভাবনাবশেই তাহাদের দৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমশঃ তাহারা মোহগ্রস্ত হইয়া ভব-বাসনায় জড়িত ও আশাপাশে নিযন্ত্রিত হইয়া পরম

দীনতায় উপনীত হইল। তখন 'কিরূপে আমার এই দেহ চিরস্থির, নীরোগ ও ভোগক্ষম হইবে' ইত্যাদি মোহবাসনা তাহাদিগকে আশ্রয় করিল এবং 'ইহা কর্ত্তব্য ও ইহা কর্ত্তব্য নহে' এবম্প্রকার ভব-বাসনায় তাহারা জড়িত হইয়া পড়িল। অনন্তর যেমন দৃষ্টি দোষে রজ্জুতে ভুজঙ্গ কল্পনা হয়, তেমনি সেই অসুরেরা নিরহঙ্কার হইয়াও মোহের বশে আপন হৃদয়ে মমত্ব কল্পনা করিল।

তৎকালে সেই দাম, ব্যাল ও কটের এইরূপ তৃষ্ণা জন্মিল যে, এই মদীয় আপদমস্তক সমস্ত দেহ বিদ্যমান, ইহা কিরূপে চিরতরে স্থির থাকিবে, এবম্বিধ তৃষ্ণায় আকুল হইয়াই তাহারা শেষে দীনতার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইল। তাহাদের বাসনা জন্মিল, 'এই দেহ চিরস্থায়ী হউক এবং ধন আমার সুখের নিমিত্ত থাকুক'; ঈদৃশ বাসনায় তাহারা যখন বদ্ধচিত্ত হইল, তখন তাহাদের সেই প্রসিদ্ধ ধৈর্য্য লোপ পাইল। ঐরূপ বাসনায় বিজড়িত হইল বলিয়া তাহাদের শরীরের সামর্থ্যও হ্রাস পাইতে লাগিল; ইহাতে শত্রুপক্ষের প্রতি তাহাদের যে একটা অনন্যসাধারণ প্রহার-পটুতা ছিল, অচিরাৎ তাহা মার্জ্জিত লিপির ন্যায় অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। 'কিসে আমরা এ জগতে অমর হইয়া থাকিব' এইরূপ চিন্তায় বিভোর হইয়া তাহারা তখন অমুদক দেশস্থ পথের ন্যায় বিবশভাবে দীনদশায় পতিত হইল।

এইরূপে সেই অসুরত্রয়ের অন্তরে অহঙ্কারের প্রাদুর্ভাব হইলে অঙ্গনা ও অন্ন-পানাদির উপভোগবশে পুনঃপুনঃ জনন-মরণের কারণ যে প্রগাঢ় বিষয়ানুরাগ, অবিলম্বেই তাহা আসিয়া উপস্থিত হইল। অনন্তর কাননমধ্যে কুরঙ্গেরা কুপিত মাতঙ্গ দেখিয়া যেমন সভয়ে প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়াস প্রকাশ করে, তেমনি রণক্ষেত্রে তাহারা ভীত হইয়া স্ব স্ব জীবনের প্রতি মমতা করিতে লাগিল। সেই সমরাঙ্গণের মধ্য দিয়া ক্রুদ্ধ ঐরাবত হস্তী যখন সকলকে দলিত মথিত করিতে লাগিল, তখন সেই অসুরত্রয় 'আমরা মরিলাম, এই মরিলাম' এইরূপ চিন্তায় অধীর হইয়া ভয়ে ভয়ে মন্দ মন্দ বিচরণ করিতে প্রবত্ত হইল। এইরূপে তাহারা একমাত্র শরীরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া মরণ-ভয়ে ভীত হইল; সুতরাং বলক্ষয় নিবন্ধন অচিরেই তাহাদের উপর শত্রুপক্ষ অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিল।

অনন্তর ইন্ধন-ক্ষয়ে অগ্নি যেমন হবির্ভোজনে অক্ষম হইয়া পড়ে, তেমনি সেই অসুরত্রয়—প্রতিপক্ষীয় যোদ্ধৃবৃন্দ সম্মুখে আসিয়া সংহার সাধনে সমুদ্যত হইলেও তাহাদিগকে সংহার করিতে সক্ষম হইল না। তখন প্রহার-নিরত দেবগণ তাহাদিগকে হীনবল বলিয়া মনে করিলেন। তাহারা ক্ষত-বিক্ষত-দেহে সাধারণ সৈনিকের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিল। অধিক বলিব কি, দেবগণ তাহাদিগের প্রতি যৎকালে সরোষে ধাবিত হইলেন, তখন তাহারা মৃত্যুভয়ে ভীত হইয়া রণাঙ্গন হইতে পলায়ন করিল।

হে রাম! সেই প্রখ্যাতকীর্ত্তি দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অসুরত্রয় যখন ভীত হইয়া পলায়ন করিল, তখন দানব-সৈন্যদল প্রলয় বাতাহত তারকানিবহের ন্যায় গগনপ্রাঙ্গণ হইতে নানাদিকে নিপতিত হইতে লাগিল। তখন সেই পর্ব্বতাকার দীর্ঘদেহ অসুরদল মধ্যে অধিকাংশই বিদীর্ণবপু ও ছিন্ন-করচরণ হইয়াছিল; তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সুমেরুকুঞ্জে পলাইয়া গেল, কেহ কেহ শিখরাগ্রে প্রস্থান করিল, কেহ কেহ সাগরতটে আশ্রয় লইল, কেহ কেহ পয়োদপটলে বিলীন হইল এবং কেহ কেহ সমুদ্রের আবর্ত্তরূপ গর্ত্তের মধ্যে লুক্কায়িত হইয়া রহিল। কতিপয় অসুর গিরিগুহায় আত্মগোপন করিল, কতিপয় জঙ্গলে আবৃত হইল, কতিপয় দিগ্‌দিগন্তে প্রস্থান করিল এবং কতিপয় অসুর জলদরণ্যে প্রবিষ্ট হইল। সুরাসুরগণের বাণবর্ষণে বহু গ্রাম, নগর, জনপদ, রণভূমি, ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়াছিল, বহুসংখ্যক অসুর সেই সেই স্থানে গিয়া আশ্রয় লইল, অনেকে মরুভূমির দিকে ধাবিত হইল; কতিপয় অসুর দাবানলে প্রবেশ করিল; কতিপয় লোকালোকাচলের প্রান্তভাগে উপনীত হইল; কতকগুলি অসুর পর্ব্বত ও হ্রদ মধ্যে নিপতিত হইল; এবং কেহ কেহ অন্ধ্র, দ্রবিড়, কাশ্মীর ও পারসীক দেশে প্রস্থান করিল। অন্যান্য অসুরেরা কেহ সাগর-তরঙ্গে, কেহ গঙ্গাজল প্রবাহে, কেহ কেহ দ্বীপান্তরে কেহ কেহ মৎস্য-বেধী জালমধ্যে, কেহ কেহ জম্বুখণ্ডে এবং কেহ কেহ ব্রততীনিবহে নিপতিত হইল। ঐ সকল দানবের মধ্যে অনেকের অন্ত্রতন্ত্রী বৃক্ষশাখায় লগ্ন হইল; অনেকের দেহ হইতে রুধিরধারা স্ফুরিত হইতে লাগিল; অনেকের মস্তক হইতে মুকুট-কিরীট খসিয়া পড়িল; অনেকের অঙ্গ-

সন্ধি ও চরণদ্বয় স্ফুটিত হইল, অনেকের নেত্র ক্রোধ-কষায়িতের ন্যায় ভীষণাকার ধারণ করিল এবং অনেকের হস্তযুগে অস্ত্রশস্ত্র বিরাজ করিতে লাগিল। বিপক্ষীয় মায়া ও অস্ত্রপ্রভাবে বহু দানবের বর্ম্ম ও অস্ত্রজাল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল; কতকগুলি অসুরের বিবিধ আয়ুধ ও গাত্রাবরণ বহুদূর হইতে পতন-জন্য বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িতে লাগিল। বহু দানবের কণ্ঠ-দেশে শিরস্ত্রাণ লম্বিত হইলে তাহাদের চটচটাশব্দে সেই সকল দানব অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িল। কতকগুলি দানবের মস্তকদেশ শিখরশিলায় আহুত হইল; অনেকের দেহভাগ লম্বিত হইয়া পড়িল, অনেক অসুর শাল্মলীতরুর অগ্রভাগে পতিত হইল; তাহাতে তাহারা কণ্টকাকীর্ণ হইয়া দারুণ দুঃখ ভোগ করিতে লাগিল। কঠিনতর শিলাফলকে আস্ফালিত হইয়া বহু দানবের মস্তকাস্থি চূর্ণ হইয়া গেল।

হে রাম! বর্ষার বারি-ধারা পতনে ধূলিজাল যেমন প্রশমিত হইয়া যায়, সেই সমর-প্রাঙ্গণে নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ আরম্ভ হইলে ঐ অসুরেন্দ্রবৃন্দ তেমনি পূর্ব্বোক্তরূপে দিগ্‌দিগন্তে বিলীন হইয়া গেল।

উনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৯ ॥

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এইরূপে এক দিকে দানববাহিনী বিনষ্ট হইল; অন্য দিকে দেবগণ প্রহৃষ্ট হইলেন। তখন দাম, ব্যাল ও কট এই অসুরত্রয় ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িল। শম্বরের সেনাদল বিনষ্ট হইলে শম্বরাসুর ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া সেই দাম, ব্যাল ও কটের উদ্দেশে বলিল, তাহারা কোথায়? এইমাত্র বলিয়া প্রলয়কালীন পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তখন সেই দাম, ব্যাল ও কট-দানব, শম্বরাসুরের ভয়ে স্বস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক সপ্তম পাতালে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিল। ঐ পাতালে মৃত্যুর ন্যায় নিখিল প্রাণীর ভয়াবহ নরকার্ণব-রক্ষক যমকিঙ্করেরা সকুতূহলে অবস্থান করিতেছে। সেই নির্ভীকচেতা যমকিঙ্করেরা ঐ অসুর-

ত্রয়কে অভয় দান করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে এক এক মূর্ত্তিমতী চিন্তার ন্যায় কন্যা দান করিল। তাহারা সেই কন্যাত্রয়কে লইয়া দশ সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত নির্ভয়ে তথায় বাস করিল। সেই অসুরেরা কুবাসনায় জড়িত এবং 'এই আমার কামিনী, এইরূপ আমার প্রভুত্ব' ইত্যাদিরূপ স্নেহ-পাশে নিয়ন্ত্রিত হইয়া সেই দীর্ঘকাল কাটাইয়া দিল।

একদা ধর্ম্মরাজ যম মহানরকের কার্য্যসমূহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার জন্য যদৃচ্ছাক্রমে সেই প্রদেশে আগমন করিলেন; সেই অসুরত্রয় ধর্ম্মরাজকে চিনিতে পারিল না, তাহারা তাঁহাকে সামান্য একজন কর্ম্মচারী মনে করিয়া আত্মবিনাশার্থ অভিবাদনও করিল না। তখন ধর্ম্মরাজ ভ্রূভঙ্গী করিবামাত্রই তদীয় কিঙ্করদল সেই অসুরত্রয়কে প্রদীপ্ত ভীম ভূখণ্ডে নিক্ষেপ করিল। সেখানে পড়িয়া সেই অসুরেরা স্ব স্ব স্ত্রীপুত্র ও বন্ধুবান্ধবাদির সহিত ক্রন্দন করিতে করিতে ভস্মীভূত হইল; তদ্দর্শনে মনে হইল যেন পর্ণ-পরিপূর্ণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরুগুলি দাবানলে দগ্ধ হইয়া গেল।

অনন্তর ঐ অসুরত্রয় বধ ও বন্ধ-কর্ম্মে তৎপর যমকিঙ্করদিগের সহিত একত্র বাস নিবন্ধন আপনাদের তাদৃশ ক্রূর বাসনার ফলে পুনর্ব্বার বধ-কর্ম্ম-কর কিরাত হইয়া জন্মলাভ করত কোন এক কিরাত-নরপতির কিঙ্করত্ব গ্রহণ করিল। পরে কিরাত-জন্মের অবসানে সেই দেহ পরিত্যাগ করিয়া তরুকোটরে ও গিরিগর্ত্তসমূহে তাহারা বায়স হইয়া জন্মিল। সেই জন্মের পর তাহাদের গৃধ্রত্ব প্রাপ্তি ঘটিল এবং তদনন্তর তাহারা শুকপক্ষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিল। এই শুক-জন্মের অবসানে ঐ অসুরত্রয় ত্রিগর্ত্তদেশে শূকর হইয়া এবং তৎপরে শৈলোপরি মেষ হইয়া জন্মিল। এই সকল জন্মের পর ঐ কুবুদ্ধি-সম্পন্ন অসুরত্রয় মগধ-দেশে কীট হইয়া জন্ম গ্রহণ করে।

রামচন্দ্র! এইরূপে সেই অসুরত্রয় অন্যান্য বিবিধ বিচিত্র যোনি-পরম্পরায় ভ্রমণ করিয়া, অধুনা কাশ্মীরদেশস্থ কোন এক অরণ্যমধ্যে একটী ক্ষুদ্র জলাশয়ে মৎস্যদেহ ধারণপূর্ব্বক কালাতিপাত করিতেছে। তাহা-দের আশ্রয়ীভূত সেই জলাশয়ের জল দাবানল-তাপে উত্তপ্ত, অল্প-পরিমিত ও পঙ্কপ্রায় হইয়া গিয়াছে; তাহারা তাহার একএকটু জলবিন্দু পান

করিয়া, শুষ্ক শৈবালদলে জর্জ্জরিত-দেহে—না জীবিত, না মৃত, এইরূপ অবস্থায় কাল কাটাইতেছে। সেই দানবেরা এইরূপে বারম্বার বিবিধ যোনিতে জন্ম লইয়া জলধির তরঙ্গসমূহের ন্যায়, এক এক বার উৎপন্ন হইতেছে এবং আবার তাহারা বিলয় পাইয়া যাইতেছে। ঐ চিরবিমূঢ় দাম, ব্যাল ও কট ভবসমুদ্রে পড়িয়া বাসনারূপ তন্তুনিচয়ে নিবদ্ধ হইয়া, বিবিধ দেহ-পরম্পরা-রূপ তরঙ্গসমূহে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতেছে; অদ্যাপি তাহাদের বিরাম নাই—এখনও তাহাদের উপশম প্রাপ্তি ঘটে নাই। অতএব হে রামচন্দ্র! তুমি পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ—বাসনার মাহাত্ম্য কি নিদারুণ?

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩০ ॥

একত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ওহে মহামতে রাম! পূর্ব্বোক্ত কারণে তোমারই বোধবৃদ্ধির জন্য আমি এই দাম, ব্যাল ও কটের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছি। পূর্ব্বে যে আমি বলিয়াছি, তোমার যেন দাম, ব্যাল ও কটের অবস্থা না হয়, এখন এ কথার সার্থকতা হৃদয়ঙ্গম কর। দেখ, চিত্ত যদি অবিবেকের অনুসরণ করে, তাহা হইলে অনন্ত ভব-যাতনা ভোগের নিমিত্তই সহজে এবম্বিধ আপৎসমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আহা! ঐ অসুরত্রয়ের সুরসৈন্যধ্বংসী শম্বর-সৈনাপত্যই বা কোথায়, আর এখন তাহাদের আতপ-তপ্ত পঙ্কমগ্ন জীর্ণ শৈবালদলবৎ জর্জ্জরাকৃতি মীনত্বই বা কৈ? কোথায় সেই অসুরগণের তাদৃশ সুরসংহারক বিপুল ধৈর্য্য, আর কোথায়ই বা তাহাদের কিরাতরাজের অকিঞ্চিৎকর কিঙ্করত্ব? কোথায় তাহাদের সেই নিরহঙ্কার চিত্তসত্তার উদার ধীরতা? আর কোথাই বা অসত্যবাসনার আবেশে তথাবিধ অহম্ভাবের কু-কল্পনা? এই সংসাররূপ বিষমঞ্জরী শাখা-প্রশাখায় জটিল হইয়া বিস্তার পাইয়াছে; একমাত্র অহঙ্কারের অঙ্কুর হইতেই ইহা আবির্ভূত হইয়াছে; অতএব

হে রামচন্দ্র! তুমি আন্তরিক প্রযত্ন দ্বারা চিত্ত হইতে অহঙ্কারকে বিদূরিত করিয়া দাও এবং 'আমি কিছুই নহি' এতাদৃশ ভাবনা করিয়া সুখী হও। পরমার্থ-স্বরূপ চন্দ্রমণ্ডল সুধাময় ও সুশীতল; কিন্তু অহঙ্কার-রূপ জলদ-পটলের আবরণে উহা আচ্ছাদিত হইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়।

রামচন্দ্র! পূর্ব্বোক্ত দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অসুরত্রয় মায়াপ্রভাবে উৎপন্ন হইয়াছিল; উহারা অসত্য হইলেও অহঙ্কাররূপ পিশাচের আক্রমণে সত্তা লাভ করিয়া এক্ষণে কাশ্মীরদেশীয় মহারণ্যস্থ পল্বলমধ্যে মৎস্য-দেহ ধারণপূর্ব্বক শৈবালদল-কণিকার ভক্ষণ প্রত্যাশায় অবস্থান করিতেছে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! যাহা অসৎ, তাহার অস্তিত্ব এবং যাহা সৎ, তাহার অসদ্ভাব, এরূপ ত কখনই সম্ভব হইতে পারে না; সুতরাং জিজ্ঞাস্য এই যে, উক্ত দাম, ব্যাল ও কটনামক অসুরত্রয় অসত্য হইয়াও কি প্রকারে সত্তা লাভ করিল, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! যাহা অসৎ, তাহা কখনই সৎ হইতে পারে না, ইহা সত্য কথা; কিন্তু যাহা সৎ, তাহা কিঞ্চিৎ হইলেও কখন বৃহৎ এবং কখন বা সূক্ষ্ম হইতে পারে। যাহা হউক, তুমি এখন বল দেখি, সৎই বা কি আর অসৎই বা কি? অর্থাৎ তোমার অভিপ্রেত বিষয় কি? কি অভিপ্রায়ে তুমি সৎ ও অসৎ শব্দ প্রয়োগে প্রশ্ন করিয়াছ, তাহা বিশেষ করিয়া প্রকাশ কর; আমি সম্যক্ নিদর্শন দ্বারা তোমার সে বিষয়ে বোধ জন্মাইবার চেষ্টা করিব।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমরা বিদ্যমান রহিয়াছি, ইহার প্রমাণ প্রত্যক্ষ; সুতরাং আমরাই সৎস্বরূপে অবস্থিত। কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত দাম, ব্যাল ও কট দানব মায়া-নির্ম্মিত; সুতরাং তাহারা অসৎ, মৌলিক সত্তা তাহাদের নাই। এই কারণে জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহারা সৎস্বরূপ হইল কি প্রকারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ! মায়াময় দাম, ব্যাল ও কট দানব, ইহারা অসত্য হইলেও—যেমন মরীচিকা মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ প্রতীত হয়, তেমনি সৎস্বরূপে উপলব্ধ হইয়াছিল। এইরূপে আমরা এবং অন্যান্য সুরাসুর-

প্রভৃতি—সকলেই আমরা, মায়াময় ও অসত্য হইলেও সত্যের ন্যায় অবস্থান ও গমনাগমন করিতেছি; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে দেখিতে গেলে, যেমন স্বপ্নাবস্থায় স্বীয় মরণ সত্যবৎ অনুভূত হয়, তেমনি তুমি, আমি, ইত্যাদি সকলেই আমরা সত্যের ন্যায় প্রতীতিবিষয় হইলেও আমাদের অলীকত্ব ও অসত্যতাই নিশ্চিত। স্বপ্নে দেখা গেল, কোন বন্ধুর মৃত্যু হইয়াছে; এই মৃত্যু অনুভবগম্য হইলেও যেমন উহা অসত্য হইয়া থাকে, তেমনি এই ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে, ইত্যাকার জ্ঞানও অসত্য এবং এই যে জগৎপ্রত্যয়, ইহাও এইরূপ অসন্ময়। যে জন এই জগৎকে সত্য বলিয়া স্থির নিশ্চয় করিয়াছে, তাদৃশ জন একান্তই বিমূঢ়; তাহার নিকট জগতের অসারত্ব খ্যাপন করা, কোনরূপেই শোভা পায় না; কেন না, পরমার্থ-তত্ত্বের বিচার-অভ্যাস ব্যতীত এ জগতের সত্যত্বানুভবের অপলাপ কখনই সম্ভব হয় না। ফলতঃ যতক্ষণ না, পরমার্থতত্ত্বের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাবৎ কালের মধ্যে তাদৃশ মূঢ় জন অন্তরে যে অসত্যে সত্য ধারণা করিয়া রাখিয়াছে, সে ধারণা তাহার অন্তর হইতে কোন ক্রমেই অপনীত করা যায় না। এই দৃশ্য বিশ্ব অসত্য; পরন্তু একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, যিনি এইরূপ উক্তি করেন, উন্মত্ত মূঢ় জন তাঁহাকে উন্মত্তের ন্যায় মনে করিয়া, তদীয় কথা উপহাসের সহিত উড়াইয়া দেয়। যে ব্যক্তি মদিরা-পানে উন্মত্ত হইয়াছে এবং যাঁহার কোন মত্ততা নাই বলিয়া তিনি প্রকৃতিস্থ আছেন, এই উভয়বিধ ব্যক্তিনিষ্ঠ বোধের এবং আলোক ও অন্ধকারের কিম্বা ছায়া ও আতপের যেমন কুত্রাপি ঐক্য নাই, তেমনি অজ্ঞ ও বিজ্ঞ এই উভয়বিধ ব্যক্তিরও বোধবিষয়ে একতা কোনরূপেই সম্ভবপর হয় না। যাহার কোন জ্ঞান নাই, তাহাকে শত যত্ন করিয়া বুঝাইয়া দাও, তথাপি তাহার অন্তরে বাহিরে যে দ্বৈতজ্ঞান বদ্ধমূল আছে, সে তাহার সত্যতা বিষয়ের বাধা ঘটাইতে পারিবে না; সে যদ্যপি আপনার অজ্ঞতা লইয়া ঐ বিষয়ে চেষ্টা করে, তাহা হইলে শবদেহের স্বয়ঙ্কৃত ভ্রমণচেষ্টার ন্যায় তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই সমগ্র বিশ্বই একমাত্র ব্রহ্ম, তদ্‌ভিন্ন আর কিছুই নহে; এবম্বিধ বাক্য প্রয়োগ অজ্ঞজনের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হইতে পারে না; কেননা, তপস্যা ও বিদ্যা প্রভৃতির অনুভব-জন্য যে একটা

সংস্কার হয়, সে সংস্কার তাহার থাকে না; কাজেই সেই অজ্ঞ জন অনাদি কাল কেবল সংসারভাবই সন্দর্শন করে। অসংসারী আত্মভাব তাহার কদাপি অনুভূত হয় না। অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম, এরূপ কথা অজ্ঞ জনের নিকট স্থান পায় না, যদি পায়—তথাপি অন্তরে তাহার থাকিবার নয়; সুতরাং বিদ্যা ও উপাসনাদি দ্বারা অসংস্কৃত ব্যক্তি কখনই উপদেশ-যোগ্য হয় না। এখন কথা এই, ঐ উপদেশবাণী কোন্ আধারে বিরাজ করিতে পারে? এরূপ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য—হে রাম! যাঁহাদের কিঞ্চিৎ বোধ বিকশিত হইয়াছে, তাদৃশ অল্পজ্ঞ জনের প্রতিই 'সমস্তই ব্রহ্মময়' এরূপ উক্তি শোভা পায়; পরন্তু যিনি সম্পূর্ণ জ্ঞানী,তাঁহার নিকট ঐরূপ বাক্য বলা না বলা উভয়ই সমান; কেন না, তাদৃশ সম্যক্-বোধসম্পন্ন ব্যক্তির 'আমি' ইত্যাকার অহঙ্কার-পরামর্শে কিছুই বুঝিবার নাই অর্থাৎ তিনিও উপদেশার্হ নহেন। ফলতঃ যিনি একেবারে অজ্ঞও নহেন এবং সম্পূর্ণ বিজ্ঞও নহেন, তিনিই উক্ত উপদেশ-বাক্য গ্রহণের অধিকারী। সুধীগণ অনুভব করেন, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডই কেবল সেই শান্তিময় পরব্রহ্ম। তাঁহাদের এই অনুভবের বিলোপ বিধান করিবার ক্ষমতা কাহারই নাই। আমাতে পরমাত্মা ভিন্ন অন্য বিশেষ কিছু আছে, এরূপ ধারণাই তাঁহাদের নাই। সুবর্ণ ও অঙ্গুরীয়াদির যেমন অভিন্নতা, তাঁহাদের আত্মাতেও তেমনি পরমাত্মভিন্নতা নাই; কিন্তু অঙ্গুরীয়াদি বোধে সুবর্ণের ন্যায় মূঢ়জনের আত্মাতে পাঞ্চভৌতিক কার্য্য-কারণতা ব্যতীত অন্য কিছুই অনুভূত হয় না। অর্থাৎ বিজ্ঞ দৃষ্টিতে জগতের যেমন অসত্যতা, অজ্ঞদৃষ্টিতে পরমার্থেরও তেমনি একান্তই অসত্যতা; সুতরাং বিজ্ঞ জনকে যেমন জগতের সত্যত্ব উপলব্ধি করান যায় না, তেমনি অজ্ঞ জনকেও পরমার্থের সত্যত্ব বোধ জন্মাইয়া দেওয়া সম্ভব নহে। মূঢ় জন ভাবে,—সকলই মিথ্যা অহম্ভাবময়, আর সুধীজন দেখেন,—সকলই সত্য পরমার্থময়। অজ্ঞ ও বিজ্ঞের এই যে বিভিন্ন স্বভাব, ইহার অপহ্নব কিছুতেই করিয়া উঠা যায় না; বস্তুতঃ যে যন্ময় হইয়া থাকে, তাহার তাহাতে অপহ্নব সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? 'আমি ঘট' এবম্বিধ বাক্য যেমন পুরুষের উন্মত্ত প্রলাপ, তেমনি 'আমি মনুষ্য' ঈদৃশ বাক্য অজ্ঞ-প্রলাপ মধ্যেই

গণনীয়। অতএব আমরা এবং সেই দাম-ব্যালাদি অসুরত্রয়, সকলেই একরূপ অসত্য; আমাদের সত্যত্ব বা অস্তিত্ব কোন ক্রমেই সুভাব্য নহে।

হে রঘুনন্দন! যাহা একমাত্র সত্য, সম্বেদনস্বরূপ, শুদ্ধ, নিরঞ্জন, সর্ব্বগত, শান্ত, উদয়াস্ত-বিরহিত, নিঃশূন্য, সর্ব্বময় অথচ যেন অকিঞ্চিৎ-রূপে বিরাজিত; তাদৃশ বোধাকাশকেই তুমি সত্য বলিয়া অবধারণ করিবে। এই যে সকল সৃষ্টিপরম্পরা, সমস্তই সেই বিমল বোধাকাশেই প্রতিভাসিত হয়। লোকের দৃষ্টি যদি দোষদুষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার স্বাভাবিক দৃষ্টিতেও যেমন কেশোণ্ডুকাদিবৎ ভ্রান্তি দর্শন ঘটে, তেমনি আমাদেরও দৃষ্টিতে সেই আকাশে জগদাকার প্রতিভাত হইয়া থাকে। সেই সত্যাত্মা চিদাকাশ আপনাকে যে যে রূপে ভাবনা করেন, তৎক্ষণাৎ সেই সেইরূপেই অনুভব করিতে থাকেন। এই নিমিত্ত জগৎ অসত্য হইলেও তদীয় ঈক্ষণে সত্যরূপে অনুভূত হইয়া থাকে। এই কারণেই আমি বলিতেছি, এই ত্রিজগতে আত্মা ভিন্ন সত্য কিম্বা অসত্য কিছুই নাই; সেই চিৎস্বরূপ যখন যাহা অনুভব করেন, তৎকালে তৎস্বরূপেই সমুদিত হয়েন; ইহাতে সংশয় কিছুই নাই। তদীয় অনুভূতিবশে সেই দাম ব্যাল প্রভৃতি যেরূপে উদ্ভূত হইয়াছিল, আমরাও সেইরূপেই উৎপন্ন হইয়াছি। অতএব হে রাঘব! এ বিষয়ে তাহাদের প্রতি আর সত্য বা অসত্য বিকল্পনা কি? সেই চিদা-কাশ সর্ব্বগত, অনন্ত ও নিরাকার; তাঁহার চিৎ যেরূপেই সমুদিত হয়, স্বয়ং তিনি সেইরূপেই প্রতিভাত হয়েন। যৎকালে তদীয় চিৎ সেই দাম-ব্যালাদিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিল, তখন তদাকৃতি-অনুভূতি বশে আপনি তিনি তৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যৎকালে তিনি অস্মদাদিরূপে প্রকটিত হইয়াছেন, তথাবিধ অনুভূতি নিবন্ধন তখনই তাঁহার অস্মদাদিরূপে আবির্ভাব হইয়াছে। মরুস্থলীতে সৌরকরের যেমন সলিলরূপতা, তেমনি চিদাকাশের যে স্বীয় স্বপ্নপ্রতিভাস, তাহারই নাম জগৎ। সেই চিদা-কাশ যখন জগদ্বিষয়ে জাগরূক থাকেন, তখনই দৃশ্য জগদাকারে কল্পিত হইয়া থাকেন, আর যখন সুষুপ্তভাবে অবস্থান করেন, তখনই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত হয়েন। পরন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি কখনই সুষুপ্ত বা প্রবুদ্ধ নহেন; তবে যে তাঁহার সুষুপ্তি কিংবা প্রবুদ্ধি, তাহা মাত্র কল্পনা বৈ আর কিছুই

নয়। এতাবতা জানিও,—এই নিখিল দৃশ্য বিশ্বই পরমাত্ম ব্রহ্ম। সুতরাং নির্ব্বাণই সর্গশ্রী এবং সর্গশ্রীই নির্ব্বাণ; একপর্য্যায়ক শব্দদ্বয়ের ন্যায় ঐ উভয় শব্দের অর্থগত কোনই পার্থক্য নাই। নেত্র যদি দোষ-তিমিরে পরিবৃত হয়, তাহা হইলে সে যেমন আপনিই কেশোণ্ড্রক দর্শন করে, তেমনি পরমাত্মা নিজেই নিজেকে জগদাকারে দেখিতে থাকেন; পরন্তু ঐ কেশোণ্ড্রক যেমন বস্তুতঃ কিছুই নহে,—একমাত্র দোষদুষ্ট দৃষ্টিই ঐরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি এই যে দৃশ্য জগৎ, ইহাও কিছুই নহে,—একমাত্র চিদাকাশই তদাকারে বিকাশ পাইতেছেন। অধ্যারোপ-দৃষ্টিতে সর্ব্বত্রগ চিদাকাশে সমস্ত আরোপই সম্ভব হইতে পারে; এই জন্য সর্ব্বত্রই সর্ব্ববস্তুর অস্তিত্ব অনুভূত হয়; কিন্তু আবার অপবাদদৃষ্টিতে কিছুই কোথাও নাই বলিয়া অনুভবগম্য হইয়া থাকে। এইরূপে উল্লিখিত দ্বিবিধ প্রকারেই এই জগৎ ভেদ-বর্জ্জিত; অতএব ইহা একমাত্র সৎ ও পরিপূর্ণরূপেই বিরাজিত। এই কারণে বলিতেছি, হে রাম! তুমি সমস্ত ভেদজ্ঞান এবং সমস্ত ভয়-শোকাদি পরিহার করিয়া পূর্ণ ব্রহ্মরূপে বিরাজ কর। তোমার যেন ইহা স্থির ধারণা থাকে যে, এই স্ফটিকশিলার অভ্যন্তরের ন্যায় অন্তঃশূন্যরূপে ভাসমান অথচ ঘনাকার—জগৎ, একমাত্র পরমাত্মারই প্রতিবিম্ব; ইহার অস্তিত্ব কোথাও নাই; যাহা কিছু আছে, তাহা সেই একমাত্র ব্রহ্মই, ব্রহ্মই কেবল বিরাজমান।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! এতক্ষণে বুঝিতে পারিলাম, যক্ষ, ভূত ও পিশাচ প্রভৃতি যেমন বালকের দৃষ্টিতে সৎ হইলেও বিজ্ঞ-দৃষ্টিতে অসৎরূপে প্রতিভাত, তেমনি ঐ দাম, ব্যাল ও কট—অজ্ঞের দৃষ্টিতে অসদাকারেই ভাসমান। পরন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি,—ঐ অসুরত্রয়ের দুঃখ-নিবৃত্তি কোন্ উপায়ে কত কালে হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুরাজ ! যম-কিঙ্করেরা ঐ দামাদি অসুরত্রয়ের কুটুম্ব হইয়াছিল ; সেইজন্য তাহারাই যমের নিকট ঐ বিষয় প্রার্থনা করিয়াছিল। তাহাতে যমরাজ যেরূপ উত্তর প্রদান করেন, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। যমরাজ বলিয়াছিলেন,—ঐ দাম, ব্যাল ও কট নামক অসুরেরা যখন পরস্পর বিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব বিবরণ শ্রবণ করিবে, তখনই উহারা নিশ্চয় মুক্ত হইয়া যাইবে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্ ! ঐ দামাদি অসুরত্রয় কবে কোথায় কিরূপে উহাদের স্বীয় বিবরণ শ্রবণ করিতে পারিবে ? আপনি তাহা যথাযথ-রূপে কীর্ত্তন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র ! সুপ্রসিদ্ধ কাশ্মীরদেশে এক অতি বিপুল সরোবর বিদ্যমান ; ঐ সরোবর সততই সরোজসমূহে সমলঙ্কৃত। উহার তীর-সন্নিহিত স্থানবিশেষে যে একটী ক্ষুদ্রকায় জলাশয় আছে ; সেই দাম, ব্যাল ও কট বারম্বার ঐ ক্ষুদ্র জলাশয়ে মৎস্যযোনিতে জন্ম লইবে। পরে নিদাঘকালের অভ্যুদয়ে মহিষাদি জন্তুগণ কর্ত্তৃক ঐ জলাশয় আলোড়িত হইলে, তাহারা নিয়ত কাতর হইয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হইবে। অনন্তর মীনযোনির অবসানে তাহারা সেই সরোজরাজি-রাজিত সরোবর মধ্যে ভুবনভূষণ সারসরূপে জন্ম গ্রহণ করিবে। এই জন্মে কখন তাহারা প্রফুল্ল কহ্লারদলে, কখন প্রস্ফুটিত সরোজ-সমূহে, কখন শৈবালবল্লী-বলয়ে, কখন বিলোল তরঙ্গসঙ্গে, কখন কখন প্রফুল্ল কুসুমদোলায়, কখন নীলপদ্ম-লতিকায়, কখন শীকররাজিরূপ অভ্রলেখায় এবং কখন কখন বা শীতল সলিলাবর্ত্তের শ্রেণীবিভাগে বিহার করত বিবিধ সরস ভোগ সকল উপ-ভোগ করিতে থাকিবে। এইরূপে তাহারা সেখানে বহুকাল বিহার করিয়া, কালবশে বিশিষ্ট বিশুদ্ধি লাভ করিবার পর পরস্পর বিযুক্ত হইবে। পরে তাহারা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণবৎ যদৃচ্ছাক্রমে ভেদপ্রাপ্ত হইয়া, মুক্তি প্রাপ্তির জন্য বিচারবুদ্ধির আশ্রয় করিবে।

হে রঘুবর ! কাশ্মীর রাজ্যের মধ্য ভূখণ্ডে অধিষ্ঠাণ নামে এক মনোহর নগর বিদ্যমান ; ঐ নগর নানা পাদপ ও পর্ব্বতনিচয়ে সুশোভিত। উহার মধ্যভাগে এক নাতিসমুচ্চ গিরিশৃঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইবে ; সেই শৃঙ্গের

নাম প্রদ্যুম্ন শিখর। উহার আকৃতি হইবে পদ্মকোশের অনুরূপ। সেই গিরির শিখরদেশে এক প্রকাণ্ড গৃহ নির্ম্মিত রহিবে; অন্যান্য গৃহসমূহের মধ্যে ঐ গৃহ শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে। উহাকে দেখিয়া বোধ হইবে, যেন এক শৃঙ্গের উপর আর এক গগনস্পর্শী শৃঙ্গ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সেই গৃহভিত্তির ঊর্দ্ধদিকে ঈশানকোণে যে শিলাসন্ধি রহিবে, তাহার রন্ধ্র মধ্যে একটী অবিশ্রান্ত বায়ুকম্পিত তৃণময় কুলায় থাকিবে; ব্যাল নামক দানব তদীয় সারসজন্মের অবসানে সেই কুলায়মধ্যে কলবিঙ্ক বিহঙ্গরূপে জন্ম লইয়া প্রথমে কিঞ্চিন্মাত্র শাস্ত্রাধ্যায়ী দ্বিজ-বালকের ন্যায় অর্থহীন অস্পষ্ট রব করিতে থাকিবে। স্বর্গে যেমন সুররাজ থাকেন, তেমনি তখন সেই গৃহের মধ্যে শ্রীমান্ যশস্করদেব নামে জনৈক নরপতি বাস করিবেন। দামনামক দানব তখন স্বীয় সারসদেহের অবসানে সেই গৃহের ঊর্দ্ধভাগস্থ বৃহৎ স্তম্ভপৃষ্ঠের সামান্য একটা ছিদ্র মধ্যে মশকরূপে বাস করিবে এবং ঘুন ঘুন রবে মধুরধ্বনি করিতে থাকিবে। তৎকালে সেই অধিষ্ঠাননগরের রত্নাবলী নামে কোন এক ক্রীড়াগৃহে তত্রত্য নরপতির নরসিংহনামক জনৈক অমাত্য বাস করিবেন। সেই অমাত্য করামলকবৎ বন্ধ ও মোক্ষদর্শী হইবেন। তখন সেই মায়ানির্ম্মিত কট-দানব সারস-দেহ পরিহার করিয়া শারিকারূপে জন্মগ্রহণপূর্ব্বক সেই রাজামাত্যের ক্রীড়ার সামগ্রী হইয়া রজতপিঞ্জরে অবস্থান করিবে। একদা সেই রাজামাত্য নরসিংহ পণ্ডিতগণের প্রণীত দাম, ব্যাল ও কট-নামক অসুরত্রয়ের পদ্য-নিবদ্ধ মনোজ্ঞ ইতিবৃত্ত পাঠ করিবেন। তৎশ্রবণে সেই শারিকামূর্ত্তি কট-দানব অখণ্ড আত্মতত্ত্ব স্মরণ করিতে করিতে শান্তিময় পরম নির্ব্বাণ লাভ করিবে। এদিকে প্রদ্যুম্নশিখরে ব্যাল দানব চটক-রূপে বাস করিতে থাকিবে, সে তথাকার জনসাধারণের মুখে ঐ ইতিহাস শ্রবণ করিয়া পরম নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে। এতদ্ভিন্ন রাজপ্রাসাদের স্তম্ভ-পৃষ্ঠস্থিত দারুচ্ছিদ্রের অভ্যন্তরে যে দাম-দানব মশকরূপে বাস করিতে থাকিবে, কথাপ্রসঙ্গে তদীয় কর্ণে ঐ বৃত্তান্ত প্রবেশ করিলে সেও মুক্ত হইবে।

হে রঘুনন্দন! এইরূপে চটকপক্ষী হইয়া ব্যাল দানব প্রদ্যুম্নশৃঙ্গ

হইতে, মশকদেহ আশ্রয় করিয়া দাম, দানব রাজপ্রাসাদ হইতে এবং শারিকারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কট-দানব ক্রীড়াগৃহ হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

রামচন্দ্র! তোমার নিকট এই দাম, ব্যাল ও কট-দানবের সমস্ত জীবনবৃত্তান্ত বিবৃত হইল। তুমি ইহা শুনিলে এবং শুনিয়া এখন নিশ্চয় জানিয়া রাখ যে, এই সংসারটাই ঐরূপ মায়াময়। ইহা শূন্যময় হইলেও একান্ত বৈচিত্র্য-ময়রূপে প্রতীয়মান। যে মায়ায় এই সংসার পরিপূর্ণ, সেই মায়াই মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রমের ন্যায় অপক্কবুদ্ধি জনসাধারণকে বৃথা ভ্রামিত করিতেছে। মূঢ় মানবেরা সেই মায়ায় মোহিত হইয়া পড়ে; তাই তাহারা ঐ দাম, ব্যাল ও কট দানবের ন্যায় অজ্ঞানবশে মহৎপদ হইতে অধঃপতিত হয়। আহা! যে দাম, ব্যাল ও কটের ভ্রূভঙ্গী মাত্রে মেরু-মন্দর-মধ্যস্থ প্রাসাদসকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত, তাহাদের সেই পূর্ব্বতন বিপুল বিক্রম আজ কোথায়? আর কোথায়ই বা তাহাদের সেই পরবর্ত্তী কালের মশকরূপে উদ্ভব? তাহারা একদিন চপেটা-প্রহারে চন্দ্র ও সূর্য্যমণ্ডল ভূপাতিত করিত; কিন্তু তাহাদের সেই অবস্থাই বা কৈ? আর কোথায়ই বা তাহাদের প্রদ্যুম্নগিরির গৃহভিত্তি-গর্ত্তে বিহঙ্গরূপে অবস্থিতি! যাহারা কুসুমকলির ন্যায় বিলোল করতল দ্বারা অক্লেশে সুমেরুগিরি সমুত্তোলিত করিত, তাহাদের সেই অসীম শক্তি কোথায়? আর গিরিশৃঙ্গোপরি রাজামাত্য নৃসিংহের ক্রীড়াগৃহে পিঞ্জরাবদ্ধ শারিকামূর্ত্তিই বা কৈ? ফলে তাহাদের পূর্ব্বাবস্থার সহিত পরবর্ত্তী অবস্থার আকাশ-পাতাল ভেদ! অহো কি পরিতাপের বিষয়! যিনি নির্ব্বিকার চিদাকাশ, তিনিই কিনা অহম্ভাবরূপ রজঃপ্রক্ষেপে রঞ্জিত হইয়া, স্বীয় রূপ পরিহারপূর্ব্বক এবম্বিধ বিরূপ বলিয়া বিনির্ণীত হইয়া থাকেন! মরীচিকায় জল যেমন অসত্যবাসনায় সত্যবৎ প্রতীয়মান, তেমনি এই জীবগণ আপনারই অসত্য বাসনাবশে, যেন চিৎস্বরূপ হইয়াও বিভিন্ন হই-তেছে। যাহারা সৎশাস্ত্র ও স্বীয় প্রত্যক্‌প্রবণ বুদ্ধির সহায়তায়, এ দৃশ্যকে অসৎজ্ঞানে নির্ব্বাণপদে অধিরূঢ় হয়েন, তাঁহারাই ভবসাগর হইতে উদ্ধার পাইয়া থাকেন। যাহারা নানাদুঃখ-বিকারময় শুষ্ক তর্কের আশ্রয়

গ্রহণ করে, গর্ত্তমধ্যে সলিলধারার ন্যায় তাহারা সংসারগর্ত্তে পতিত হয়। আত্মলাভ তাহাদের ঘটে না, তাহারা তাহাতে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! যাঁহারা স্বীয় অনুভূতিসিদ্ধ শ্রৌত পথের অনুসরণ করেন, তাহাঁদের কখন বিনাশ ঘটে না; তাহাঁরা পরম গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে মতিমন্! যাঁহারা 'ইহা আমার, উহা আমার' এই প্রকার জ্ঞান আশ্রয় করেন, তাহাঁদের স্ব স্ব দৌর্ভাগ্য-প্রেরিত দৈন্যবশে পুরুষত্ব বিনষ্ট হইয়া যায়; সেই বিনষ্ট পুরুষার্থের ভস্মমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না; সুতরাং তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রকারেই নিরাশ হইতে হয়। যে উদারচেতা পুরুষ এই ত্রিভুবনকে সর্ব্বদা তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া ধারণা করেন, ভুজঙ্গ যেমন জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, তেমনি সমস্ত আপদই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। প্রতিনিয়ত যদীয় সত্যচমৎকৃতি পরিস্ফুরিত হইতে থাকে, তিনি অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় বিরাজ করেন; লোকপালগণ তাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ একান্ত দুরন্ত আপৎ-কাল উপস্থিত হইলেও কদাপি কাহারও অসৎপথে গমন করা বিধেয় নহে। দৃষ্টান্ত দেখ, রাহু বিপথে গিয়া অমৃত পান করিয়াছিল, তথাপি তাহাকে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইল। যাঁহারা সাধুশাস্ত্র ও সৎসঙ্গরূপ সমুজ্জ্বল সৌরকরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহারা কখনই মোহান্ধকারের বশ্য হইবার নহেন। যিনি বৈরাগ্য এবং শম-দমাদি গুণগ্রামে সাধু-সমাজের অগ্রণী বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন, তাঁহার নিকট যাহা অবশ্য, তাহাও বশ্য হয়; তদীয় সর্ব্ববিধ আপদ্ ক্ষয় পাইয়া যায়; তিনি অনন্ত অক্ষয় শ্রেয়োলাভের অধিকারী হইয়া থাকেন। যে সকল উদারচেতা পুরুষ বৈরাগ্যাদি গুণগ্রামের প্রতিও আস্থা রাখেন না, পরন্তু একমাত্র অধ্যাত্মশাস্ত্র ও সত্যের প্রতি যাঁহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ, তাদৃশ পুরুষই প্রকৃত পুরুষপদ-বাচ্য। তদ্ভিন্ন অন্য সকল পুরুষ পশুর সহিতই উপমানার্হ। যাঁহাদের যশঃকৌমুদীর প্রসর্পণে প্রাণিবর্গের হৃদয়সরোবর সমুদ্ভাসিত হয়, তথাবিধ ক্ষীরসাগর-প্রতিম মহাপুরুষগণের শরীরে স্বয়ং হরি বিরাজ করেন। কি দুঃখ! কি পরিতাপের বিষয়! মূঢ় মানবেরা নিখিল ভোগ্য বিষয় উপভোগ করে, যাবতীয় দ্রষ্টব্য বিষয় দর্শন করে, তথাপি ভবিষ্যৎ

জন্মপরম্পরায় আত্মবিনাশের জন্য পুনরপি কেন তাহাদের ভোগালুব্ধতা উৎপন্ন হয়? তাই বলিতেছি,—হে রঘুবংশধুরন্ধর! তুমি যথাক্রম, যথাশাস্ত্র, যথাচার ও যথাস্থিতি অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর এবং অন্তরে সমস্ত ভোগ্য বস্তুকেই অবস্তুজ্ঞানে মুক্ত হও। তোমার সৎকীর্ত্তি ও সদ্গুণাবলী স্বর্গ পর্য্যন্ত প্রসর্পিত হউক, তাহাতে সাধুগণ তোমায় সাধুবাদ প্রদান করিতে থাকুন। জানিবে,—সৎকীর্ত্তি ও সদ্গুণগ্রাম সঞ্চিত হইলেই লোক মৃত্যুকবল হইতে পরিত্রাণ পায়, পরন্তু ভোগরাশি পুরুষকে কখনই পরিত্রাণ করিতে পারে না। সিদ্ধ-সুন্দরীরা গগনস্পর্শী সঙ্গীত-ঝঙ্কারে যাহাঁদের সুধাংশু-শুভ্র যশোরাশি গান করেন, তাঁহারা যথার্থ চিরজীবী পুরুষ। তদ্ভিন্ন অন্য সকলেই মৃত বলিয়া অবধারিত। শাস্ত্রানুসারে প্রভূত পৌরুষ, প্রচুর যত্ন ও অদম্য উদ্যমের সহিত অনুদ্বিগ্নমনে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে কে না সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়া থাকে? যথাশাস্ত্র সাধনাকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। সিদ্ধি বিষয়ে হটকারিতা কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে; কেননা দীর্ঘকালে যে সিদ্ধি পরিপক্ক হয়, তাহা হইতে বিশেষ পুষ্ট ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই বলিতেছি, রঘুনাথ! তুমি ভয়, শোক, আয়াস, গর্ব্ব ও নির্ব্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রানুসারে ব্যবহার-পরায়ণ হও। তুমি বহু ব্যাপারে লিপ্ত থাকিতে হয়, থাক; কিন্তু তোমার জীব যেন উদ্দাম ইন্দ্রিয়গ্রামে আক্রান্ত হইয়া জীর্ণ অন্ধকূপপ্রায় সংসারগর্ত্তে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়। এখন হইতে তোমার যেন আর উত্তরোত্তর অধোগতি ঘটে না। ভীষণ রণক্ষেত্রে অজস্র নিশিত শরনিকর-পাতে শত শত বারণ বিধ্বস্ত হইতেছে, সদ্যই মহাভয়ঙ্কর মরণ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, এই অস্ত্রস্বরূপ শাস্ত্র ঈদৃশ বিষম সঙ্কটও নিবারণ করিতে সক্ষম ও অজর অমর নিত্য নিরতিশয়ানন্দ আত্মপ্রদর্শক; সুতরাং হে রাম! তুমি এই শাস্ত্রের আলোচনা করিতে থাক। এ সংসার নিদাঘ-তাপ-তপ্ত পল্বলের দুর্গন্ধময় পঙ্কপ্রায়; এ সংসারে আবার জীবনের আশা কি? বস্তুতঃ তাহা অতি তুচ্ছ বলিয়াই জানিও। অতএব হৃদয় হইতে ভোগবাসনা বিদূরিত করিয়া দাও; কিঞ্চিন্মাত্র ভোগ্য পদার্থেও ত কোনই প্রয়োজন নাই। হে সাধো! সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, এই মোক্ষশাস্ত্রের পর্য্যালোচনা কর। এই যে

কিছু বস্তু, সমস্তই প্রতিভাসমাত্র; তুমি এইরূপ অবধারণ করিয়া যাহা সত্য, তাহারই বিচারে নিরত হও। পরমতানুসারিণী বুদ্ধি লইয়া পশুর ন্যায় কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিও না। অশুভ বিচারণারূপিণী মহানিদ্রা —যাহা দুঃখদৌর্ভাগ্যদায়িনী, তাহাকে তুমি পরিত্যাগ করিয়া প্রবুদ্ধ হও। পল্বল-মধ্যস্থিত জরাজীর্ণ কচ্ছপবৎ আর তুমি সুপ্তাবস্থায় থাকিও না। জরা, মরণ ও ক্লেশ প্রশমনের জন্য তুমি এক্ষণে গাত্রোত্থান কর। জানিও, অর্থসম্পদ—অনর্থের মূলীভূত, ভোগরাশি—ভবরোগের উৎপাদক, সম্পৎ—আপদ এবং অনাদরই—জয়স্বরূপ। যাঁহারা লোকবৃত্তের অনুগমন ও শাস্ত্র-সিদ্ধ আচারপরম্পরা প্রতিপালনপূর্ব্বক কার্য্যানুষ্ঠান করেন, তুমি তাদৃশ জনগণের আচারানুসারে কর্ম্ম করিয়া সত্য ফল লাভের নিমিত্ত যত্ন-পরায়ণ হও। যাঁহার বিবেকোদয় হইয়াছে, যিনি সদাচারে নির্ম্মল-স্বভাব হইয়াছেন এবং সংসারের সর্ব্ববিধ সুখ-দুঃখদশা উপভোগে যাহাঁর অভিরুচি হইয়া থাকে, তাদৃশ পুরুষের জীবিতকাল, কীর্ত্তি, সদ্গুণাবলী ও সম্পত্তিনিচয় বাসন্তী বনলতার ন্যায় সৎফল প্রদান করিতে সমুল্লসিত হইয়া থাকে।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ! যত্নের যদি আতিশয্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্ববিষয়েই সর্ব্বত্র সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ অভীষ্টই ফলিত হইয়া থাকে। এই জন্য তোমায় আবার বলিতেছি, তুমি কদাপি সাধু উদ্যম পরিত্যাগ করিও না। দেখ, সমস্ত মিত্র, স্বজন ও বন্ধু-বান্ধবগণের আনন্দায়িতা নন্দী, মাত্র আপনার উত্তম উদ্যমপ্রভাবেই সরসীতীরে সুধাংশুমৌলি ভগবান্ মহাদেবকে প্রাপ্ত হইয়া, এমন যে ভীষণ মৃত্যু—তাহাকেও পরাভূত করিয়াছেন। বলি প্রভৃতি দানবগণের কথা শুনিয়াছি, তাঁহারা একমাত্র উদ্যম-শীলতার গুণেই প্রচুর সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুরগণকে

করিগণ কর্ত্তৃক কমলবন বিদলিত করিবার ন্যায় মথিত করিয়াছিলেন। পুরাকালে নরপতি মরুত্ত যখন যজ্ঞ করেন, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ন্যায় মহর্ষি সম্বর্ত্ত তখন অন্য এক সুরাসুর-পরিবৃত জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র একজন ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন, তিনি অসীম অধ্যবসায়ের সহিত পুনঃপুনঃ তপস্যাচরণ করিয়াই দুষ্প্রাপ্য বিপ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পুরাকালে হতভাগ্য উপমন্যু দুগ্ধের জন্য নিরতিশয় ক্রন্দন করিয়া পরে বহু যত্নের ফলে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে পিষ্টমিশ্রিত জল লাভ করত দুর্লভ রসায়ন জ্ঞানে তাহাই পান করেন। অনন্তর কিয়ৎকাল অবসানে ঐ উপমন্যুই তপঃপ্রভাবে মহাদেবকে সুপ্রসন্ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি মহেশ্বরের অনুগ্রহ হয়; তিনি মহেশপ্রসাদে ক্ষীরাব্ধিকেই লাভ করেন। শ্বেত নামে এক মুনি ছিলেন; তিনি অত্যধিক দৃঢ়তার সহিত তপোনুষ্ঠান করেন, তাঁহার তপঃপ্রভাবে—এমন যে বিশ্ববিধ্বংসী কাল, তিনিও পরাজিত হইয়াছিলেন। পতি-দেবতা সাবিত্রীর পতি সত্যবান্ মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, সাবিত্রী স্বীয় গুণে স্তুতি-প্রীতিকর বচন-বিন্যাসে যমরাজকে বশীভূত করিয়া তৎসহ সুচতুর বাক্যালাপে স্বীয় পতিকে পরলোক হইতে প্রত্যানয়ন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ যিনি সাধু উদ্যম করিয়াছেন, অথচ ফললাভ করিতে পারেন নাই, এরূপ লোক জগতে অতি দুর্লভ। ফলে, সকলেই মনে মনে এইরূপ বিচারালোচনা করিয়া সর্ব্ববিষয়ে সুদৃঢ় উদ্যম অবলম্বন করিবেন। অন্তরে ফললাভের তারতম্য বা দ্বিধাবৈধ বিচার করিয়া সাতিশয় উদ্যমশীলতা আশ্রয় করিলে নিশ্চয়ই তাহাতে ফললাভান্তে কৃতার্থ হওয়া যায়। তবে কথা এই যে, যাহাতে তুচ্ছ ফললাভের সম্ভাবনা, ঈদৃশ অকিঞ্চিৎকর কার্য্যের জন্য গুরুতর চেষ্টায় নিরত হওয়া কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পারে না। যত কিছু কর্ত্তব্য আছে, তন্মধ্যে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য চেষ্টা করাই প্রধান কর্ত্তব্য। কেন না, যে কিছু অনন্ত সুখ-দুঃখ-দশা থাকুক, একমাত্র আত্মজ্ঞানই তাহার মূলোচ্ছেদক। এই আত্মজ্ঞান লাভ করিবার জন্য বৈধ উপায়ে উৎকট যত্ন অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। ভোগানুরাগ পরিহার করাই আত্মজ্ঞান-লাভের প্রথম ও প্রধান উপায়। যত কিছু অনর্থ, ভোগদৃষ্টিই তাহার মূল; সুতরাং অগ্রে উহারই উচ্ছেদ সাধন

করিতে হয়। অনর্থপ্রসবিনী ভোগদৃষ্টি বিনষ্ট করিতে গিয়া, প্রথমেই তাহার দোষানুসন্ধান করা বিধেয়। তবে কথা এই, যিনি ভোগদৃষ্টির উচ্ছেদ-সাধনে বদ্ধপরিকর হয়েন, বিষয় বা বিষয়-ভোগের দোষানুসন্ধান করিতে গেলেই তাঁহাকে কিঞ্চিৎ কষ্ট স্বীকার করিতে হইবেই। আর এরূপ বিষয়ের জন্য কষ্ট স্বীকার করাই ত কর্ত্তব্য; কেন না, দুঃখ ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন সুখ কেহই ত পাইতে পারে না। মনে করিতে পার, প্রাপ্য পরমব্রহ্ম অশম, অর্থাৎ তাঁহাতে যখন শমগুণ বলিয়া কিছুই একটা নাই, তখন বৈরাগ্যাভ্যাস করিয়া বৃথা রাগাদি দোষ-প্রশমন করিবার প্রয়োজন কি? এ কথার উত্তরে বলিব, যদিও অশম অর্থাৎ চিদাত্মাই পরম ব্রহ্ম, এবং শমও পরমপদ, এ কথাও সত্য; তথাপি প্রথমে তুমি শমকেই শঙ্কর অর্থাৎ পরম পুরুষার্থ-সম্পাদক বলিয়া বিদিত হও। অগ্রে অভিমান পরিহার করিয়া শাশ্বত শমপথ অবলম্বন করত প্রজ্ঞাবলে স্বীয় মোক্ষলাভ-যোগ্য জন্মাদি লাভের বিচারপূর্ব্বক সযত্নে সাধুজনের সেবা করাই কর্ত্তব্য। কি তপস্যা, কি তীর্থপর্য্যটন, কি শাস্ত্রসেবা, সাধুজনসঙ্গ ব্যতীত উহাদের কোন কিছুই সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার পাইবার পক্ষে যথেষ্ট উপায় নহে। যাঁহার সেবা করিলে লোভ, মোহ ও ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগুলি দিন দিন ক্ষীণ হইতে থাকে এবং যিনি যথাশাস্ত্র স্ব স্ব কর্ম্মে ব্যবহার-পরায়ণ হয়েন, তাঁহাকেই সজ্জন আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এবম্বিধ সজ্জনের সেবা করিতে করিতে কিয়দ্দিন পরেই এমন একদিন উপস্থিত হয়, যে দিন সেই সজ্জনসেবী সাধুজনের সুকৃতিবলে সহসা কোন আত্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গলাভ সঙ্ঘটিত হইয়া উঠে। তখন আত্মজ্ঞ পুরুষের সঙ্গ লাভে একদিকে যেমন তাঁহার দৃশ্যদর্শন বিলুপ্ত হয়, অন্যদিকে তেমনি তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তদীয় অস্তিত্ব অর্থাৎ অহম্ভাবও অপগত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। যখন দৃশ্যদর্শন একেবারেই ঘুচিয়া যায়, তখন একমাত্র পরম বস্তুই অবশিষ্ট আছেন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; তখন অন্য সমস্ত বস্তুরই অভাব অবধারণা ঘটে বলিয়া জীব সেই চিরস্থির পরম পদার্থেই বিলীন হইয়া যায়; বস্তুতঃ বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, দৃশ্য বস্তু সকল কোন কালেই জন্মে নাই, পূর্ব্বে কখনও ছিল না, উত্তর কালেও থাকিবে না এবং এই

বর্ত্তমানেও নাই। একমাত্র পরম পদার্থ ব্রহ্মই ত্রিকাল-সিদ্ধ; তিনি ছিলেন, আছেন এবং চিরদিনই থাকিবেন। এই বিষয়টী পূর্ব্বে সহস্র সহস্র যুক্তি দিয়া দেখান হইয়াছে এবং এখনও হইতেছে। এ বিষয়ে সমস্ত বুধমণ্ডলীর অনুভূতি যেরূপ, আমিও সেইরূপই প্রদর্শন করিতেছি। এই যে ত্রিজগৎ দেখিতেছ, ইহা কেবল সেই বিমল, শান্ত, পরমতত্ত্ব সম্বিৎ বৈ আর কিছুই নয়। ইহাতে কিরূপে বা কোথা হইতে মায়ামূলক অবস্তুরাশি উৎপন্ন হইবে? বলিতে পার, যদি উৎপন্নই নয়, তাহা হইলে কিরূপে ইহা সকলের নিকট জগৎ বলিয়া অবধারিত হয়, এ কথায় বক্তব্য এই যে, আত্মা অচঞ্চল; তাহাতে কল্পিত চাঞ্চল্যবশে চঞ্চলা মায়াপ্রতিবিম্ব-চিৎ কর্ত্তৃক যে জগদ্ভাবের ন্যায় কল্পিত হয়, তাহাই সেই চিৎশক্তিবশে জগৎস্বরূপে বোধগম্য হইয়া থাকে। এই ত্রিভুবনে যত কিছু বিভিন্ন ভাব উপলব্ধ হয়, উহা চিদাদিত্যের ময়ূখমালার ন্যায়, প্রকৃত পক্ষে অভিন্ন হইলেও ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, অংশুমালীর সহিত অংশুমালার পদার্থগত কোনও ভেদ আছে কি? বস্তুতঃ তাহা নাই। এইরূপে দেখিলে দেখা যাইবে, চিদ্‌ব্রহ্মের সহিত তদংশুভূত অনুভূতিরও কোনই ভেদ নাই; সুতরাং বিভিন্নতা বোধরূপ যে বিকল্পনা, তাহা যখন সর্ব্বৈব মিথ্যা, তখন শত শত বা লক্ষ লক্ষ ত্রৈলোক্য অনুভূতি-গোচর হউক না কেন, অনুভবস্বভাব চিদ্‌ব্রহ্মকে নির্ব্বিকল্পরূপে স্বীকার করিয়া লইতে হইবেই হইবে। সবিকল্প চিৎ কি? যিনি নির্ব্বিকল্প চিৎ, তিনিই মায়িক প্রতিবিম্ববশে সবিকল্প হইয়া উঠেন। বিশদার্থ এই—যাহা চিদাভাস বা জীব, তাহাই সবিকল্প বা নানাভেদময়; যিনি ব্রহ্মচিৎ, তিনি সবিকল্পসংজ্ঞায় অভিহিত নহেন; তিনি একরূপ, একরস ও একাকার বলিয়া নির্ণীত। সবিকল্প চিদাভাসের উন্মেষণ ও নিমেষণেই জগতের উদয় ও অস্ত অবধারিত হইয়া থাকে। অহম্ভাবের প্রকৃত অর্থ কি, তাহা যতদিন অপরিজ্ঞাত থাকে, তত দিনই পরমার্থাকাশে মলস্বরূপে উহার বিদ্যমানতা; কিন্তু যখন তত্ত্বজ্ঞানের উন্মেষণে উহার প্রকৃত অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তখন উহা স্বয়ংই পরমার্থাকাশরূপে বিকাশ পাইয়া থাকে। ফল কথা, যেমন জলের সহিত জল মিলিয়া যায়, তেমনি অহম্ভাব অবগত হইবামাত্রই

উহা অনহন্তাবরূপ ধারণ করিয়া চিদাকার পরমাত্মার সহিত এক হইয়া যায়, বাস্তবিক এই 'অহ'মাদি দৃশ্য বিশ্ব কিছুই নাই ; কাজেই 'অহং' পদার্থ কি, এ বিষয়ের যদি প্রমাণ সহযোগে বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে যে, এক মাত্র চিদাকাশ পরমার্থই পর্য্যবসিত। কিন্তু অজ্ঞ লোকেরে এ তত্ত্ব বুঝাইয়া দিলেও বুঝিয়া উঠিতে পারে না ; বিমলবুদ্ধি বিজ্ঞ জনেরই ইহা বোধগম্য। দেখ, অমল ধীশক্তিশালী লোকের অন্তরে অপিশাচে পিশাচ-জ্ঞান হইলেও তাহা স্থায়ী হইতে পারে না ; পরন্তু অদূরদর্শী বালকের হৃদয়ে একবার পিশাচ-জ্ঞান জন্মিলে, তাহাকে যদি বারম্বার বলা যায় যে, উহা পিশাচ নহে, তথাপি তাহার অন্তর হইতে সহজে সে ধারণা যায় না ; তাহার তাহাতে সংশয় থাকিয়া যায়। অন্তরে অহঙ্কার-মেঘ সমুদিত হইয়া যত কাল চিৎ-কৌমুদীকে ঢাকিয়া রাখে, ততকালের মধ্যে পরমার্থরূপিণী কুমুদিনীর বিকাশ হওয়া সম্ভব নহে। ঐ অহঙ্কারের যখন অবসান হয়, স্বর্গ-নরক বা বন্ধ-মোক্ষাদি কোনও কল্পনা তখন থাকে কি ? ফলতঃ উহার কিছুই তখন থাকে না। যতদিন অহঙ্কার-মেঘ হৃদাকাশে বিকাশ পাইবে, তত দিনই তৃষ্ণারূপিণী কুটজমঞ্জরী প্রস্ফুটিত হইয়া রহিবে। অহঙ্কার-মেঘ চিদাদিত্যকে ঢাকিয়া রহিলে, নিয়ত কেবল জড়তারই প্রাদুর্ভাব হইতে থাকে ; আলোক-বিকাশ কিছুতেই তখন হইতে পারে না। শিশুর চক্ষে মিথ্যা বিলসিত যক্ষের ন্যায় ঐ মিথ্যা অহঙ্কার কেবল দুঃখের নিমিত্তই আপনা হইতে বৃথা কল্পিত হয় ; কখনই উহা সুখের নিমিত্ত হয় না। ঐ বৃথা-কল্পিত অহঙ্কারই মানবদিগের অভিমান-দূষিত অন্তরে অনন্ত ভবযন্ত্রণা-জনক মোহজাল বিস্তার করিতে থাকে ; ইহার দৃষ্টান্ত—সেই পূর্ব্বোক্ত দাম, ব্যাল ও কট। অহঙ্কার যে মোহ জন্মাইয়া দেয়, সেই মোহ হইতেই যাহা কখন হয় নাই, হইবার সম্ভাবনা নাই, এবম্বিধ অনর্থভূত প্রবল তমঃ প্রাদুর্ভূত হয়। সেই তমঃ হইতেই 'এই দেহ আমি, ইহা আমার' এইরূপ একটা ভাব সংসারে, বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ফলতঃ মূল খুজিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সংসারের যত কিছু সুখ-দুঃখ, সকলই একমাত্র সংসারচক্রের বিকার। যিনি বিচার-মার্জ্জিত মনোরূপ লাঙ্গলের সাহায্যে অহঙ্কারাখ্য বিষবৃক্ষের মূলোৎ-

পাটন করিতে পারেন, তাঁহারই আত্মক্ষেত্রে সংসারক্লেশহর জ্ঞানতরু সমুৎপন্ন হয় এবং সে তরু শাখা-প্রশাখায় সমন্বিত হইয়া দুশ্ছেদ্য ও ফলপ্রসূ হইয়া থাকে। অহঙ্কার অশেষ জন্মপরম্পরারূপ বিটপি-কুলের অঙ্কুরস্বরূপ। ঐ অহঙ্কার-অঙ্কুর হইতেই 'ইহা আমার, তাহা আমার' ইত্যাদি শত শত শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইতে থাকে। ধনাদি বাসনা উহাদের ফলস্বরূপ; যেমন বায়সাদির পতনজন্য সামান্য ভরে শাল্মলী প্রভৃতির ফল অস্ফুটরবে স্ফুটিত হয়, তেমনি জ্ঞানোদয় হইবামাত্রই ঐ ধনাদিগত বাসনাফল বিশীর্ণ হইয়া যায়; কাজেই ঐ সকল ফল যে একান্তই অসার ও তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর, তাহা নিশ্চিতই। বস্তুতঃ নিরহম্ভাব আত্মাই অহম্ভাব-জনিত আত্মভাবের তিরোধানে সংসারচক্রে পড়িয়া ঘুরিতে থাকেন। যতদিন জন্ম-কাননে অহঙ্কাররূপ তমস্তোম বিলসিত হইতে থাকিবে, চিন্তারূপিণী উন্মত্ত পিশাচীরা তত দিনই সবেগে বিচরণ করিবে। যে নরাধম ব্যক্তি অহঙ্কার-পিশাচের বশীভূত হয়, শাস্ত্রসজ্যই বল,—আর মন্ত্র-সমূহই বল, তাহার সেই পীড়াজনক পিশাচের শান্তি কিছুতেই হয় না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! এমন উপায় কি আছে, যাহা অবলম্বন করিলে ঐ অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইতে পারে না। আপনি আমার সংসার-ভীতি প্রশমিত করিবার নিমিত্ত এ সম্বন্ধে আমায় উপদেশ প্রদান করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! আত্মা যখন সতত আত্মস্বভাবের অনু-সন্ধানে বিমল মুকুরবৎ চিন্মাত্রস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে, তখন আর অহঙ্কার বর্দ্ধিত হইতে পারে না। এই যে জগদাড়ম্বর, ইহা ইন্দ্রজাল-সৌন্দর্য্যের ন্যায় সম্পূর্ণ ই মিথ্যা; অতএব এতৎপ্রতি আমার অনুরক্তি বা বিরক্তি দেখাইবার কোনই প্রয়োজন নাই, অন্তরে যখন এইরূপ ভাবের অনুসন্ধান হইতে থাকে, তখন আর অহঙ্কার তিষ্ঠিতে পারে না। 'আমার অহম্ভাব নাই বা কোনই দৃশ্যশ্রী নাই' এইরূপ দৃঢ় প্রত্যয় যাঁহার আছে, তিনিই নিরহঙ্কার হইয়া ব্যবহার করিতে পারেন এবং তাহাঁরই অহঙ্কার বর্দ্ধিত হয় না। অন্তরে অহম্ভাব এবং বাহিরে জগদ্ভাব, এই দুইটাই হইল হেয় ও উপাদেয় ব্যবহারের হেতুভূত। এই ভাবদ্বয় তিরোহিত ও সর্ব্বত্রে

সমদৃষ্টি প্রসন্ন হইলেই অহঙ্কার বৃদ্ধি পায় না। আমি চিৎ, আমারই অন্তরে জগৎ অবস্থিত, এইরূপ স্থির প্রতীতি জন্মিলে এবং হেয় ও উপাদেয়-ভাবের পরিক্ষয়ে সর্ব্বত্র সমদর্শিতা সমুদিত হইলে অহঙ্কারের আর বৃদ্ধি হইতে পারে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! অহঙ্কার কিমাকার? কিরূপে উহাকে পরিত্যাগ করা যায়? উহার কি শরীর আছে, অথবা নাই? এবং উহাকে পরিত্যাগ করিলেই বা কি হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! ত্রিভুবনে তিন প্রকার অহঙ্কার; তন্মধ্যে দুই প্রকার প্রধান;—সুতরাং উপাদেয়, আর এক প্রকার তুচ্ছ;—সুতরাং পরিত্যাজ্য। এই ত্রিবিধ অহঙ্কারের বিষয় বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। এই নিখিল বিশ্ব আমিই; আমিই সেই অবিনশ্বর পরমাত্মা। আমা ব্যতীত আর কোথাও কিছুই নাই; এইরূপ যে একটা ভাব, ইহাই উত্তম ও প্রথম অহঙ্কার আখ্যায় অভিহিত। এই অহঙ্কার ভববন্ধের নিমিত্ত নয়; ইহা মুক্তিরই নিদান। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গেই উহা বিদ্যমান। আমি সর্ব্ব পদার্থ হইতে স্বতন্ত্র এবং কেশাগ্রের এক ভাগ হইতেও শত গুণে সূক্ষ্ম; এইরূপ যে একটা জ্ঞান, তাহাই কল্যাণকর দ্বিতীয় অহঙ্কার। ইহা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের বন্ধ নিমিত্ত না হইয়া বরং মোক্ষেরই নিমিত্ত হয়। আর কর-চরণাদি অবয়বাদিতে যে অহংজ্ঞান, এই জ্ঞানই লৌকিক ও তুচ্ছ; ইহা তৃতীয় অহঙ্কারাখ্যায় অভিহিত। এই অহঙ্কার অতি দুষ্টপ্রকৃতি শত্রুরূপে নির্দ্দিষ্ট; সুতরাং উহা বর্জ্জনীয়। জীবগণ একবার যদি উহার করায়ত্ত হয়, তাহা হইলে আর কখনই অপরিচ্ছিন্নরূপে আবির্ভূত হইতে পারে না। এই অশেষ ক্লেশপ্রদ প্রবল শত্রু দুষ্ট অহঙ্কারের নিপীড়নে প্রাণিবর্গ আপনা হইতে ক্রমশ সঙ্কটসাগরে মগ্ন হইতে থাকে। প্রাণিগণ প্রথমোক্ত প্রধান বিশুদ্ধ অহঙ্কার দুইটিকে অবলম্বন করিয়া বিষয়ানুরাগাদি সমস্ত দোষ পরিহার করিবে এবং 'এই নিখিল বিশ্ব আমিই' এইরূপ অহঙ্কারের উপর মতি স্থাপনপূর্ব্বক 'আমিই ঈশ্বর' এবম্বিধ দৃঢ় ভাবনায় দেহাত্ম-বোধরূপ যে নিকৃষ্ট অহঙ্কার, তাহার আক্রমণ হইতে মুক্ত হইবে। মহাপুরুষগণের মত এই যে, দেহাত্ম-বোধ-

রূপ নিকৃষ্ট অহঙ্কারের ন্যায় প্রথমোক্ত বিশুদ্ধ অহঙ্কারদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া 'আমি দেহ নহি' ঈদৃশ বিচার নির্ণয়পূর্ব্বক পরে শেষোক্ত অবিশুদ্ধ অহঙ্কার পরিত্যাগ করিবে। তৃতীয় নিকৃষ্ট অহঙ্কার ক্লেশাবহ; সুতরাং সর্ব্বপ্রকারে উহা বর্জ্জনীয়। রামচন্দ্র! এই শেষোক্ত নিকৃষ্ট অহঙ্কারবশেই সেই পূর্ব্বোল্লিখিত দাম, ব্যাল ও কটদানব নিতান্ত শোচনীয় দশা প্রাপ্ত হইয়াছিল; বলিতে কি, তাহাদের সে অবস্থার বিষয় মুখ দিয়া উচ্চারণ করিতেও কষ্ট বোধ হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! পুরুষ যদি ঐ ক্লেশজনক লৌকিক অহঙ্কারকে চিত্ত হইতে অপসারিত করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার স্থিতিব্যাপার কিরূপ হয় এবং কিরূপ আত্মহিতই বা সে প্রাপ্ত হইয়া থাকে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাঘব! ঐ দুঃখপ্রদ তৃতীয় অহঙ্কার সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়; পুরুষ উহাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক যে কোন ভাবেই অবস্থান করুক, সেই সেই ভাবেই তাহার আত্মসুখের উৎকর্ষ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। পূর্ব্বে যে প্রথমোক্ত বিশুদ্ধ অহঙ্কারদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া অবিশুদ্ধ তৃতীয় অহঙ্কারকে বর্জ্জন করিবার কথা কহিয়াছি, পুরুষ যদি ঐ ভাবে নিকৃষ্ট তৃতীয় অহঙ্কার পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে ঐ দুই বিশুদ্ধ অহঙ্কারকেও বিদূরিত করিতে পারে, তাহা হইলে তৃতীয় অহঙ্কার বর্জ্জনপুরঃসর যাদৃশ সুখশান্তি পদ লাভ করেন, তাহা অপেক্ষাও অত্যুচ্চ সুখময় পদে সমধিরূঢ় হইতে পারেন। এই প্রকার বোধশক্তির সহায়তায় পুরুষ সর্ব্বদা সর্ব্ববিধ যত্নের সহিত পরমানন্দ পাইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে সেই দুষ্ট তৃতীয় অহঙ্কারকে পরিত্যাগ করিবেন। এই দুরহঙ্কার দেহগত ব্যাধির ন্যায় পাপময়; সুতরাং উহাকে বর্জ্জন করাই কল্যাণকর এবং পরম পদ লাভের প্রকৃষ্ট উপায়, মনুষ্যেরা বিচারপূর্ব্বক ঐ লৌকিক স্থূল অহঙ্কার পরিহার করিয়া অবস্থান করুক বা যে কোন ব্যবহার-পরায়ণই হউক, কদাপি তাহাদের আর অধঃপাতের সম্ভাবনা থাকে না।

হে মহামতে! যিনি নিরহঙ্কার হইয়া সসন্তোষে কাল কাটাইতে পারেন, ভোগ-বাসনায় তাঁহার আর স্পৃহা থাকে না; তিনি ভোগরাশিকে রোগের

ন্যায় মনে করেন। যেমন সুতৃপ্ত ব্যক্তি বিষ-সম্পৃক্ত রসে স্পৃহাযুক্ত হয় না, তেমনি তাঁহারও ভোগসমূহে কোনই রুচি থাকে না। পুরুষের যখন ভোগবাসনা তিরোহিত হইয়া যায়, তখন মঙ্গলশ্রী স্বতই সমুদিত হইয়া পুরোবর্ত্তিনী হইতে থাকে। বস্তুতঃ মনের অন্ধকার কাটিয়া গেলে অন্য এমন কি প্রতিবন্ধক হইতে পারে, যাহা কল্যাণশ্রী লাভ করিবার পক্ষে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে?

হে রঘুনন্দন! অসাধারণ ধৈর্য্য ও যত্নের সহিত অহঙ্কার পরিহার করিতে পারিলেই ভবার্ণব হইতে পার পাওয়া যায়। মহাত্মা ব্যক্তি প্রথমতঃ ধারণা করিতে থাকেন,—সকলই আমি এবং সমস্তই আমার। অনন্তর তাঁহাদের এইরূপ জ্ঞান জন্মে যে, দেহাদি যত কিছু, আমি ইহার কিছুই নই, ইহাতে আমার বা তোমার কিছুই নাই। তিনি এই প্রকার জ্ঞান করিয়া অন্তঃকরণ মধ্যে শ্রেষ্ঠতম আত্মজ্ঞান সুদৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করত পরম পদ অধিগত হইয়া থাকেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! সেই দাম, ব্যাল ও কট-নামধেয় অসুরত্রয় পলায়ন-পরায়ণ হইলে, এবং শারদীয় বারিদমণ্ডলীর ন্যায় শম্বরের সৈন্যশ্রেণী ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গগনাঙ্গন হইতে পরিভ্রষ্ট হইলে, শম্বরাসুর তদীয় সুমেরুপ্রতিম সমৃদ্ধি-সম্পন্ন নগর মধ্যে যেরূপ আচরণ করিয়াছিল, অধুনা আমি ভবৎসমীপে তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ কর। সেই অসুরসৈন্যদল সুরগণের হস্তে তাদৃশরূপে পরাভূত হইবার পর দানবাধিপতি শম্বর কতিপয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া পুনর্ব্বার সুরগণের বধসাধনে সমুদ্যত হইল এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিল, পূর্ব্বে আমি মায়াপ্রভাবে যে তিনটী অসুরকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, তাহারা সমরক্ষেত্রে গিয়া মূর্খতা বশতঃ মিথ্যা দুরহঙ্কার প্রাপ্ত হইল; সেই অহঙ্কারে তাহারা

মজিল, মজিয়া আমারও ইষ্ট-সাধনে ব্যাঘাত ঘটাইল। কিন্তু আমি অধুনা আরও কতিপয় দানবকে এরূপভাবে সৃষ্টি করিব এবং এরূপে তাহাদিগকে বিবেকশালী ও অধ্যাত্মশাস্ত্রে পারদর্শী করিয়া তুলিব যে, তত্ত্বজ্ঞানবলে তাহাদের মিথ্যা ভাবনা বিদূরিত হইবে; কদাচ তাহারা অহঙ্কারের বশীভূত হইবে না; তাহারাই সুরগণকে পরাজিত করিতে পারিবে।

এইরূপ চিন্তা করিয়া দৈত্যরাজ শম্বর মায়াবলে অপর অসুরত্রয়কে সৃষ্টি করিল; মনে হইল, যেন বারিধি হইতে বুদ্বুদাবলী উদ্ভূত হইল! এই পশ্চাৎ-নির্ম্মিত অসুরত্রয়ের নাম,—ভীম, ভাস ও দৃঢ়। ইহারা সর্ব্বজ্ঞ, বিদিতবেদ্য, ও বীতরাগ হইল; উহাদের পাপ কিছুমাত্র রহিল না। যখন যে কার্য্য উপস্থিত হইতে লাগিল, উহারা তাহাই একাগ্রতার সহিত সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইল। সেই পূতচেতা দৈত্যত্রয় নিখিল জগৎকে তৃণবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিত; উহারা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বর্ষার বারিধারার ন্যায় গভীর গর্জ্জন করিতে করিতে ঊর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং সলিলধারার ন্যায় অজস্র অস্ত্রবর্ষণে গগনপ্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত করিয়া বহুবর্ষ যাবৎ সুরগণ সহ সমর-ব্যাপারে নিরত রহিল; পরন্তু উহাদের বিবেকবল এমনি ছিল যে, তাহাতে তাহারা ক্ষণকালের জন্যও অহঙ্কারের আশ্রয় লইল না। কখন কখন তাহাদের অন্তরে 'ইহা আমার' বলিয়া বাসনা সমুদিত হইত সত্য; কিন্তু যেমন উদয়, অমনি 'আমি কে? ইহাই বা কি?' এই প্রকার আত্ম-বিচারের আবির্ভাবে তাহাদের সে বাসনা তৎক্ষণাৎ বিলয় পাইয়া যাইত। 'এই দেহ এবং ঐ দেবগণ, এ সকলই ত অসত্য; ঐ বা কে এবং আমিই বা কে?' এই প্রকার বিচার সমুদিত হইলে দেবগণ হইতে তাহাদের ভয় বলিয়া কিছুই একটা রহিল না। সেই অসুরত্রয়ের হৃদয়ে এইরূপ ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, এই দেহ অসত্য ও অসার; ইহা কিছুই নহে, একমাত্র শুদ্ধ চিৎসত্তাই আমাতে অবস্থিত। আমি বা আমাতে অহঙ্কার নাই এবং অন্য কোন পদার্থও নাই। এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া তাহারা সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইল। তাহাদের অহঙ্কারের লেশমাত্র ছিল না; জরা বা মরণ হইতে তাহারা কিছুমাত্র ভীত নহে। উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন করিয়া যাওয়াই তাহাদের স্বভাব; তাহারা অতীত বা ভবিষ্যতের জন্য চিন্তা করে

না, কোন বিষয়েই আসক্তি তাহাদের নাই ; কোনরূপ কর্ত্তৃত্বাভিমান তাহারা পোষণ করে না, কোন সময়ের জন্য কোনরূপ বাসনাই তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না ; এইজন্য তাহারা ধীরপ্রকৃতি ও কার্য্যক্ষম, অন্যকে নিহত করিলেও উহা যে আমি করিলাম, এরূপ অভিমান তাহাদের নাই। তাহারা মনে করিত, ইহা প্রভুর কার্য্য ; সুতরাং ইহা আমার অবশ্যই কর্ত্তব্য ; এই কর্ত্তব্য জ্ঞানেই তাহারা সমরে নিবিষ্ট-চিত্ত ; তাহাদের রাগ-দ্বেষ ছিল না, সর্ব্বদাই তাহারা সমদৃষ্টি-সম্পন্ন। ঈদৃশ প্রভাবশালী ভীম, ভাস ও দৃঢ়-নামধেয় দানবত্রয় কর্ত্তৃক দেববাহিনী অল্প কাল মধ্যেই হত, আহত, হৃত ও দগ্ধ হইতে লাগিল ; তখন সেই অসুরত্রয়ের ভীষণ আক্রমণে সেই দেববাহিনী হিমাচল-বিচ্যুতা মন্দাকিনীর ন্যায় ধাবিত হইয়া পলায়নে প্রবৃত্ত হইল।

অনন্তর মেঘমালা যেমন মারুত-চালিত হইয়া গিরিন্দ্র-কন্দরের আশ্রয় গ্রহণ করে,তেমনি সেই সুরসেনাশ্রেণী তৎকালে নিরুপায় হইয়া ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ বিষ্ণুর শরণ লইল। যেমন কোন একাকিনী কামিনীকে লম্পটেরা আক্রমণ করিলে তদীয় ভর্ত্তা তাহাকে আশ্বাস দান করে, তেমনি সেই ভগবান্ বিষ্ণুও তখন ভীতি-বিহ্বল দেবসেনাদিগকে সমাশ্বস্ত করিলেন।

অতঃপর সেই ভগবান্ যতদিনে না অসুরবাহিনীর সংহার সাধনে সমুদ্যত হইলেন, দেবসেনাগণ ততকাল সেই ক্ষীরাব্ধিমধ্যেই অবস্থান করিলেন। কিয়ৎকাল পরেই ভগবান্ শৌরি ও শম্বরাসুরের বিষম সংগ্রাম আরম্ভ হইল। আকালিক প্রলয়ের ন্যায় সেই সংগ্রাম ভীষণাকার ধারণ করিল। তখন কত কুলাচল বিধ্বস্ত হইয়া উড্ডীন হইতে লাগিল। কিয়দ্দিবসের যুদ্ধেই সবলবাহনে দৈত্যসৈন্য বিনষ্ট হইল এবং দানবাধিপতি শম্বর ভগবান্ নারায়ণের হস্তে নিহত হইয়া বিষ্ণুপুরে প্রয়াণ করিল। প্রচণ্ড পবন যেমন দীপমালা নির্ব্বাপিত করিয়া দেয়, তেমনি সেই সমরাঙ্গনে ভগবান্ বিষ্ণুও সেই প্রখ্যাত দানবত্রয়—ভীম, ভাস ও দৃঢ়কে অল্পকালমধ্যে নিহত করিয়া ফেলিলেন। ঐ অসুরত্রয়ের বাসনার লেশমাত্র ছিল না ; সুতরাং দেহত্যাগের পরই তাহারা পরম শান্তি লাভ করিল। নির্ব্বাণ-প্রাপ্ত প্রদীপের ন্যায় তাহারা যে কোথায় চলিয়া গেল, তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না।

অতএব বুঝিতে হইবে, এ সংসারে মন বাসনাপাশেই বদ্ধ এবং বাসনার অবসানেই মুক্ত। তাই পুনঃ পুনঃ বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি, রামচন্দ্র! তুমি বিবেকাস্ত্রে বাসনাপাশ ছেদন কর। যদি সম্যক্‌রূপে সত্য বিচার করা যায়, তাহা হইলেই বাসনার অবসান ঘটিয়া থাকে এবং বাসনার যদি অবসান ঘটে, তাহা হইলেই চিত্ত তখন আপনা হইতে প্রদীপবৎ প্রশমতা প্রাপ্ত হয়। সত্য বিচার বা সম্যক্‌দর্শন কি, সে সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, এই নিখিল জগৎই মিথ্যা; একমাত্র আত্মাই সত্য পদার্থ ও পরিপূর্ণ। তাঁহা ভিন্ন অপর কিছুই সত্য নহে; সুতরাং অপর কে কোথায় আর কিরূপ ভাবনা করিবে? সেই সত্য চিদাত্মাই নানা ভাবনা করিয়া থাকেন। অতএব ভাবনাপদার্থকে সত্য বলা যায় না। অর্থাৎ এ জগৎ আত্মারই প্রস্ফুরণ; সুতরাং ভাব্য, ভাবক, ভাবনা বা ভাবনার আধার সকলই সেই আত্মা; তদ্ভিন্ন ভাব্য বা ভাবনাদি পৃথক্ কিছুই নাই। এইরূপ সুদৃঢ় ধারণাই সম্যক্‌দর্শন বা সত্য বিচার। বাসনা ও চিত্ত এই দুইটী বিভিন্নার্থক শব্দ সত্যসন্দর্শনের ফলে যেখানে গিয়া বিলয় প্রাপ্ত হয়, তাহারই নাম পরম পদ। চিত্ত যখন বাসনাবদ্ধ থাকে, তখনই উহা স্থিতি প্রাপ্ত হয়, আর যখন বাসনা হইতে বিযুক্ত হয়, তখনই উহা বিমুক্ত আখ্যায় নির্ণীত হইয়া থাকে। চিত্ত ঘট-পটাদি নানাকারে অবস্থিত; সুতরাং মিথ্যা ভ্রান্তি-জাত বেতালের ন্যায় বাসনার পরিহারে সত্বর উহাকে প্রশমিত করা কর্ত্তব্য। যেমন দাম, ব্যাল ও কটের চিত্ত দেহাত্মভাবনায় পরিণত হইয়াছিল; তেমনি ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের অবলম্বিত নীতি তোমার ব্রহ্মাত্মভাবনায় অচল হইয়া থাকুক। হে রঘুনন্দন! দাম, ব্যাল ও কটের অবলম্বিত নীতি যেন কদাপি তোমার আশ্রয়ণীয় হয় না।

রামচন্দ্র! এই যাহা যাহা আমি তোমায় বলিয়া আসিলাম, মদীয় পিতা কমলযোনি ব্রহ্মা এই সকল ঘটনা পূর্ব্বে আমায় বলিয়াছিলেন। তুমি আমার শিষ্য এবং বিলক্ষণ ধীশক্তি-সম্পন্ন; তাই তোমার নিকট এ সকল ঘটনা বিবৃত করিলাম। আমি আবার বলি, হে রাঘব! তুমি দাম, ব্যাল ও কটের অবলম্বিত নীতি কখনই অবলম্বন করিও না। পরন্তু হে অনঘ! ভীম, ভাস ও দৃঢ়ের অবলম্বিত নীতিই নিত্য তোমার বিশেষরূপে

অবলম্বনীয় হউক। এই নীতি অবলম্বন করিলেই তোমার সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্তি বা বিতৃষ্ণা হইবে; বিষয়-বিতৃষ্ণার ফলে তত্ত্ব জ্ঞান জন্মিবে, এবং বিশিষ্ট তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হইলেই এই প্রতিনিয়ত সুখদুঃখ-সমাকুল ভববন্ধন তখন আপনা হইতেই খণ্ডিত হইয়া যাইবে।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৪ ॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! মন অবিদ্যার সমুল্লাসে বিষয়োন্মুখ হয়, সেই মনকে যাঁহারা জয় করিতে পারেন,তাঁহারাই প্রকৃত মহাশূর, মহাসাধু ও জয়শালী। এই সংসার অনন্ত দুঃখের আকর এবং সর্ব্ববিধ উপদ্রবের হেতু। ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার একটী মাত্র উপায় আছে; সে উপায়—স্বীয় মনের নিগ্রহ। হে রঘুনাথ! যাহা জ্ঞানসর্ব্বস্ব, তাহা তোমায় বলিতেছি; তুমি ইহা শ্রবণ কর; এবং শ্রবণান্তে হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখ। মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, মাত্র ভোগবাসনাই ভববন্ধন এবং ভোগবাসনার বিসর্জ্জনই মোক্ষ। অন্যান্য শাস্ত্রসন্দর্ভ দেখিয়া কি হইবে? আমার কথা রক্ষা কর; এ সংসারে যাহা যাহা স্বাদু বা মধুর বলিয়া বোধ হইবে, সে সকল বিষ-বহ্নিবৎ অবলোকন কর। বিনা বিচারে বিষয়রাশি পরিত্যাগ করা আপাততঃ একটা বিষম ব্যাপার হয় সত্য; কিন্তু যদি পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়া বিষয়বাসনা-বিসর্জ্জনপূর্ব্বক বিষয়োপভোগ করা যায়, তাহা হইলে পরিণামে ক্রমশঃ উহা বড়ই সুখের হয়। যে ভূখণ্ড কণ্টকবীজে আকীর্ণ, তাহা হইতে যেমন কণ্টক-তরু সকল সমুৎপন্ন হয়, তেমনি যে চিত্ত বিষয়বাসনায় আক্রান্ত, তাহা হইতে প্রগাঢ় রাগাদি দোষই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে চিত্ত যদি বাসনাজালে বিজড়িত না হয়, তাহা হইলে আপনা হইতেই তাহা সঙ্কুচিত হইয়া আইসে এবং রাগাদি দোষের অসম্পর্কে ক্রমশঃ তাহা পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন বিশিষ্ট বীজবতী ভূমি সময়ে সুফল-

জনক পাদপাঙ্কুর-নিকর প্রসব করে, তেমনি যাহাতে রাগ-দ্বেষাদির সম্পর্ক মাত্র নাই, তথাবিধ সুমতিও যথাকালে শমদমাদি সদ্‌গুণ-সম্পন্ন সকল-ক্লেশহর পরম কল্যাণ-কর মোক্ষফল-জনক জ্ঞানাঙ্কুর উদ্ভাবন করিয়া দেয়। যৎকালে দয়াদাক্ষিণ্যাদি শুভ ভাবগুলির অভ্যাসবশে চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হয়, যখন অজ্ঞানরূপ জলদাবলী ধীরে ধীরে তিরোহিত হইয়া যায়, যে সময় শুক্লপক্ষীয় শশধরের ন্যায় সৌজন্য বৃদ্ধি পায়, যে কালে গগনাঙ্গনগত মার্ত্তণ্ডমণ্ডলের ন্যায় হৃদাকাশে পুণ্যোজ্জ্বল বিবেকজ্যোতিঃ উদ্ভাসিত হইয়া উঠে, যখন বেণুমধ্যে মুক্তার ন্যায় হৃদভ্যন্তরে ইন্দ্রিয়জয়ী ধৈর্য্যগুণ উপচিত হয়, যখন বসন্তকালীন নিশাকরবৎ মনোমধ্যে স্থৈর্য্যগুণ সমুদিত হইয়া আত্ম-সুখলাভে কৃতকৃত্য হয়, যৎকালে সাধুসঙ্গ-রূপ শীতল ছায়াতরু সুফলে ফলবান্ হইয়া উঠে, এবং যে সময়ে সমাধিরূপ সরল বিটপী হইতে সুমধুর আনন্দরস স্যন্দিত হইতে থাকে, মন তখন স্বতই শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখ-ভাব হইতে নির্ম্মুক্ত হয়, তাহার কামনা কিছুই থাকে না; সে নিষ্কাম ও নিরুপ-দ্রব হইয়া থাকে। তৎকালে মনের না চাঞ্চল্য, না শোক, না মোহ, না ভয়, না শাস্ত্রার্থসংশয়, না কোন কৌতুক, না কোন কল্পনা, না আসক্তি, না চেষ্টা, না নিন্দা, না কোন বিষয়ের অপেক্ষা, না ক্ষোভ, ও না কোন কিছুতে অনুরাগ—কিছুই থাকে না; ঐ সকল তাহার তখন প্রশান্ত হইয়া যায়। তখন মনের শোক-তুষার বিগলিত ও ভববন্ধন-গ্রন্থি শিথিলিত হইয়া থাকে। মন ঐ সময় স্বীয় সম্মুখস্থ বিবিধ বাসনাবদ্ধ স্থূল দেহময় সন্দেহ-রূপ কুপুত্র ও তৃষ্ণারূপিণী পত্নীর সহিত আপনার মনোময়ী মূর্ত্তিকে বিনষ্ট করিয়া জীবন্মুক্তিরূপ পরমার্থ-সাধনে সমুদ্যত হয়। মন, প্রথমতঃ আত্ম-পুষ্টির হেতুভূত—এ শত্রু, এ মিত্র, এ সাধু, এ অসাধু, ইত্যাদি বিকল্পসমূহ পরিত্যাগ করে, এবং এই সকল বিকল্পে স্বীয় প্রভুত্বের বিষয় বিবেচনা করিয়া পরে স্বকল্পিত দেহ অনায়াসে তৃণের ন্যায় পরিহার করিয়া থাকে। অর্থাৎ মন যতকাল দেহাত্মভাবে বাসিত হইয়া দেহাকার হয়, ততকালই দেহের অনুকূল ও প্রতিকূল বিবিধ বিষয়ে রাগদ্বেষাদি-জাত সহস্র সহস্র বিকল্পে বিবর্দ্ধিত হইতে থাকে; অনন্তর ঐ দেহ যখন ক্ষীণ হয়, তখন সে আপনিই ক্ষয় পাইয়া যায়।

রামচন্দ্র! মন স্বতন্ত্রভাবে অভ্যুদয় কামনা করিতে পারে না, পরন্তু সে আত্মস্বরূপ হইয়াই হিতৈষী হইয়া থাকে। এ দিকে আত্মস্বরূপের যে মনোরূপতা, তাহাই অনর্থকর; তাহার নাশেই সর্ব্বানর্থ নিবৃত্তি হয় এবং আত্মা নিরতিশয় আনন্দস্বরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন; সুতরাং মনের অভ্যুদয়ই নাশ এবং মনের নাশই মহান্ অভ্যুদয়। প্রাজ্ঞ জনেরই মন বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং অজ্ঞ জনেরই মন বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। এই বিশ্বমণ্ডল মনোমাত্র এবং মনই পর্ব্বতপুঞ্জ, মনই গগন, মনই দেব, মনই মিত্র এবং মনই রিপু। বিকল্পজালে মলিনীকৃত চিত্তত্ত্বের যে আত্মবিস্মৃতি হয়, সংসার-বাসনায় বাসিত হইয়া তাহাই মন-আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। ঐ মনে বিষয়ানুপাত-কলিত যে চিন্মাত্র, তদবস্থিত ঈষদ্‌বিকল্প-বাসনা-কলুষিত ব্রহ্ম বা চিত্তত্ত্বই জীবনামে নিরূপিত। ঐ চিত্তত্ত্বই রূপ-রসাদি বিষয় ভাবে পতিত হইয়া আপনাকে বিষয়াকারে জ্ঞান করেন এবং আপনার আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া থাকেন। এই আত্মবিস্মৃত জীবরূপী চিত্তত্ত্বই বিষয় ভাবে পতিত ও তাহাতে চিরাভ্যাস নিবন্ধন আত্মাভিমান প্রাপ্ত হইয়া সহস্র সহস্র বিকল্পজালে বিমূঢ় হয়েন; এই কারণে তদীয় সারভূত সুখস্বভাবের অভাবে তিনি যখন অত্যধিক নিঃসার হইয়া পড়েন, তখন তাঁহাকে মনোরূপ পৃথক্ আখ্যায় অভিহিত করা হয়। জীব ও জীবোপাধি মন এইরূপই; কিন্তু যিনি বিশুদ্ধ আত্মা, তিনি জীব, শরীর ও শোণিত এ তিনের কিছুই নহেন, ঐ তিন পদার্থ হইতে তিনি সম্পূর্ণই ভিন্ন; কেননা, ঐ পদার্থত্রয় জড়, আর দেহী যিনি, তিনি—আকাশবৎ নির্লেপ ও চৈতন্যস্বরূপ। দেহ কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখ, তাহাতে রক্ত-মাংসাদি ব্যতীত কিছুই পাওয়া যাইবে না, বস্তুতঃ কদলীস্তম্ভ চিরিয়া ফেলিলে বল্কল ভিন্ন অন্য কিছু তাহাতে পাওয়া যায় কি? ফলে সেই বিশুদ্ধ আত্মা কোনক্রমেই জীবনামে নিরূপিত হইতে পারেন না। পূর্ব্বে যে মনের কথা কহিয়াছি, জানিবে—সেই মনই জীব এবং ঐ মনই সাকাররূপে নর। ঐ মনই বিকল্পবলে আপনাকে আত্মা বলিয়া কল্পনা করিয়া লয়। কোষকার কীট যেমন নিজেই নিজের বন্ধনার্থ জাল রচনা করে, তেমনি ঐ মনোরূপী জীব আপনারই বন্ধনের জন্য আপনাতে বহুবিধ বিকল্প-

জাল-বিস্তার করিয়া থাকে। অনন্তর ঐ জীব বর্ত্তমান দেহভ্রম পরিহার-পূর্ব্বক পুনর্ব্বার দেশান্তরে ও কালান্তরে অঙ্কুরের পল্লবত্ব প্রাপ্তির ন্যায় শরীরান্তর পরিগ্রহ করে। জীবরূপী মনের যেমন যেমন বাসনা সঞ্চিত থাকে, পরবর্ত্তী কালে তাহাকে সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হইতে হয়। দৃষ্টান্ত দেখ, চিত্ত যে ভাবনায় বিভোর হইয়া নিদ্রিত হয়, সে নিদ্রাবস্থায় তাহাই হইয়া থাকে। আরও দেখ, তিন্তিড়ী প্রভৃতি এমন অনেক অম্লফল আছে, তাহাদের বীজ যদি মধু দ্বারা সিক্ত করিয়া রোপণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ বীজ বৃক্ষ হইয়া যে ফল প্রসব করে, তাহা মধুররস হয়; পক্ষান্তরে মধুসিক্ত ফল যদি বিষবৎ ধুস্তুর ও করঞ্জাদির রসে সিক্ত করত রোপণ করা হয়, তাহা হইলে ফলকালে তাহা কটু হইয়া যায়। এ কথা নূতন নহে, ইহার প্রসিদ্ধি লোকসমাজে অবিরল। এইরূপ মন যদি মহতী শুভ বাসনা পোষণ করে, তবে সে মহাভাব প্রাপ্ত হয়; দৃষ্টান্ত দেখ, জাগ্রদবস্থায় অন্তরে ঐন্দ্র পদলাভ কল্পনা করিলে স্বপ্নদশাতেও তাহা অনুভূত হয়। অন্য দিকে চিত্ত ক্ষুদ্র বাসনায় বাসিত হইলে, ক্ষুদ্রভাব প্রাপ্ত হয়,—পিশাচ ভ্রমে আক্রান্ত হইলে রাত্রিযোগে স্বপ্নেও পিশাচ দর্শন ঘটে। সরোবর যদি স্বচ্ছভাব ধারণ করে,তাহা হইলে তাহাতে যেমন কালুষ্য থাকিতে পারে না, আবার কলুষভাব ধারণ করিলেও স্বচ্ছতা তাহাতে থাকে না, তেমনি মন যদি নিতান্ত কলুষিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে সে তাহার ফলও তদনুরূপ প্রাপ্ত হয়; আর মন নিতান্ত নির্ম্মল হইলে ফলও তাহার অনুরূপ লাভ করিয়া থাকে। যিনি চিত্ত-প্রসাদরূপ সমাধি সম্প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাবিধ উদারহৃদয় পুরুষ যদি দৈবক্রমে বিপদাপন্ন হয়েন, তথাপি ক্ষীণতনু শশলাঞ্ছনের ন্যায় সর্ব্বদা অধ্যবসায়গুণে নিজ নৈর্ম্মল্য কখনই তিনি পরিত্যাগ করেন না। বস্তুতঃ শশাঙ্ক যেমন স্বচেষ্টায় পুনরায় পূর্ণভাব উপগত হয়েন, তিনি তেমনি ক্রমশঃ পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; অথবা তত্ত্ববোধে বাধিত হয় বলিয়া সহস্র সহস্র উপপ্লবেও তাঁহার কালুষ্য প্রসক্তি হয় না। কেননা, তাঁহার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। তিনি ধারণা করেন, এ সকলই ঐন্দ্রজালিক লতার ন্যায় মিথ্যা-সমুত্থিত মায়া মাত্র। গন্ধর্ব্ব-নগরী, মরু-মরীচিকা ও দ্বিতীয় চন্দ্রমা, যেমন একান্ত

অলীক, তেমনি তাঁহার নিকট ঐ মায়া অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন। যে কিছু দৃশ্য বিশ্ব, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মসত্তা, তাহাতে একত্ব বা দ্বিত্ব কিছুরই অস্তিত্ব নাই। জানিবে—ইহাই সত্য পরমার্থতঃ। এই দৃশ্যমান বিশ্বসংসার অসন্ময়; ইহাতে সার বলিয়া কিছুই একটা নাই। 'আমি অপরিচ্ছিন্ন নহি, আমি ক্ষুদ্র' এইরূপ যে দুর্নিশ্চয় উদিত হয়, 'আমি অপরিচ্ছিন্ন, আমি সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর' এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয় দ্বারাই তাহা বিলয় পাইয়া যায়। একমাত্র সর্ব্বগামী স্বচ্ছ আত্মা বিদ্যমান; তিনি থাকিতে 'এই দেহই আমি' এবম্প্রকার যে ভাবনার উদয়, তাহাই লোকে বন্ধন আখ্যায় অভিহিত। ঐ বন্ধনকে কেবল আপনার বিকল্পবলেই কল্পনা করিয়া লওয়া হয়। বাস্তবিক এই সমস্তই একমাত্র ব্রহ্মসত্তা; ইহার বন্ধ বা মোক্ষদশা নাই এবং দ্বিত্ব বা একত্ব সংখ্যাও নাই। মন যদি সর্ব্ববস্তুতে অনাসক্ত, নির্ম্মলতা উপগত ও স্বীয় মনঃস্বরূপ দূরীকরণে সমর্থ হয়, তাহা হইলে এই বর্ত্তমান দেহেই নিশ্চয় ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিতে পারে। যেমন শুদ্ধ শুভ্র পটে রঞ্জনদ্রব্য সুস্পষ্ট সংলগ্ন হয়, তেমনি মনই শুভ-সংস্কাররূপ নির্ম্মলজলে ধৌত হইলে ব্রহ্মদৃষ্টি গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। এই জন্যই বলিতেছি,—হে অনঘ! 'এই সমস্তই আমার আত্মা' ইত্যাকার সর্ব্বময়ী ভাবনা দ্বারা তুমি সমস্ত শুভাশুভ জ্ঞান পরিহার কর। এইরূপ করিলেই বন্ধ-মোক্ষ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। মন যদি অগ্রে কায়িক পুণ্যার্জ্জন, শাস্ত্র-সমালোচনা, সাধু-সঙ্গ, বৈরাগ্য ও তত্ত্ববোধ বলে স্ফটিকোপলের ন্যায় নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ বা মার্জ্জিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তখনই তাহাতে এই জগৎ-রহস্য প্রতিভাসিত হইবে। মন বাহ্য বস্তুতে আসক্ত হইয়া ব্রহ্ম বস্তুতে একাগ্রতা অবলম্বন করিতে পারে না, ইহাই মনের অসত্য জ্ঞানদৃষ্টি; জানিবে,—ব্রহ্মদর্শনেই উহা ক্ষণবিনাশিনী। মন যখন বহিরন্তর নিখিল দৃশ্য দর্শন হইতে নিবৃত্ত হইয়া পরম পদে লীনভাবে অবস্থান করিবে; বুঝিবে,—তখনই তাহার তৎপদ প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। এই যে দৃশ্যপ্রপঞ্চ দেখা যাইতেছে, ইহার অসন্ময়তা নিশ্চিতই। জানিবে—এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ-ময়তাই চিত্তের স্বরূপ; ইহা ভিন্ন উহার স্বরূপান্তর নাই। মনের আদিও নাই এবং অন্তও নাই; সুতরাং

তাহার মধ্যভাগও অসৎ বৈ আর কি বলিব? মনের এই অসদ্ভাব যিনি বুঝিতে পারেন না, তাঁহার দুঃখভোগ যে অনিবার্য্য, তাহা বলাই বাহুল্য। এই যে কিছু জগৎপ্রপঞ্চ, সকলই সেই এক আত্মা; এই আত্মজ্ঞান যাহার থাকে না, এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাহারই পক্ষে দুঃখজনক হয়, আর যাঁহার ঐরূপ আত্মজ্ঞান থাকে, তাঁহাকে উহা ভোগ ও মোক্ষসুখ সমর্পণ করে। জল ও জলতরঙ্গ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, এই প্রকার ভেদবুদ্ধির নামই অজ্ঞতা; কিন্তু যাঁহার নিকট জল ও জলতরঙ্গ একই বস্তু বলিয়া অবধারিত, তিনিই যথার্থ বিজ্ঞ। এই বস্তু হেয় এবং এই বস্তু উপাদেয়, এই প্রকার ভেদবুদ্ধি যদি রহিল, তাহা হইলে উপাদেয়ের অভাব নিবন্ধন দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি তত্ত্বজ্ঞানবলে উল্লিখিত ভেদবুদ্ধি বিদূরিত করিয়া যাহা উপাদেয় তাহাই গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে একমাত্র অনন্ত আত্মস্বরূপই পর্য্যবসিত থাকেন; তখন আর কোন অভাবেই দুঃখানুভব হয় না। ফলতঃ নানাত্বই হেয় এবং একত্বই উপাদেয়।

হে রাঘব! উল্লিখিতরূপে সঙ্কল্প-কল্পিত বলিয়া মনের রূপ অসন্ময়; ইহাই নিশ্চয়। অতএব ঐ অসন্ময় মনের উচ্ছেদ সাধনে আবার শোক কিসের বল? দেখ, বন্ধুজন যদি স্নেহহীন হয়, তাহা হইলে তৎপ্রতি অনুরাগ বা বিদ্বেষ প্রকাশ না করিয়া উপেক্ষা প্রদর্শনে যেমন কোন অনিষ্টাশঙ্কা থাকে না, তেমনি তুমিও এই আত্মপিঞ্জর-ভূত ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূততত্ত্বময় দৃশ্যপ্রপঞ্চকে উদাসীনদৃষ্টিতে দর্শন করত ইহাতে আসক্ত হইও না; এইরূপ করিলেই তোমার কোন অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা রহিবে না। বন্ধু যদি স্নেহবিহীন হয়, তাহা হইলে লোক যেমন সে বন্ধুর সুখ-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে না, বা তাহার সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ রাখিতে সমুৎসুক হয় না; তেমনি তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে পুরুষ এই পাঞ্চ-ভৌতিক দেহের সুখ-দুঃখে লিপ্ত হয় না। যাহা দ্রষ্টা ও দৃশ্য, এই উভয়ের অন্তরালে অবস্থিত, তাহাই নিত্য নিরাতিশয়ানন্দময় অনাদি ব্রহ্ম। যখন এই সিদ্ধান্ত দ্রঢ়ীভূত হইয়া উঠে, তখন বায়ুবিগমে পাংশুর ন্যায় মনও প্রশমিত হইয়া যায়। মনোরূপ মারুত যদি একবার প্রশান্ত হয়, তাহা

হইলে তৎকালে দেহধূলিরও উপশম ঘটিয়া থাকে। সে কালে সংসার-নগরে পুনরায় আর নীহারপাত হয় না; অর্থাৎ নগরের ন্যায় সংসারের অধিষ্ঠান যে প্রত্যক্‌ব্রহ্ম, তাহাঁতে তখন আর অবিদ্যা সঞ্চয় থাকে না। যৎকালে বাসনারূপিণী বর্ষার অবসান হয়, মনঃ স্বীয় স্বচ্ছ পূর্ণরূপে বিহার করে, হৃৎকম্প-জনক জাড্য-পঙ্ক পরিশুষ্ক হইয়া যায়, তৃষ্ণারূপ বটবৃক্ষ বিশীর্ণ হয়, রাগাদি গুল্ম-বিরহিত হৃদয়কানন পরিস্কৃত হইয়া উঠে, ইন্দ্রিয়রূপ কদম্ব-পাদপ বিলয় পাইয়া যায় এবং মিথ্যাজ্ঞানরূপ বারিধর তিরোধান করে, তখন প্রভাত-সমাগমে বিভাবরীর ন্যায় মোহরূপিণী মিহিকা আপনা হইতেই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং মন্ত্রাহত বিষের ন্যায় জড়তা যে কোথায় চলিয়া যায়, তাহার আর সন্ধান থাকে না। তখন কলেবররূপ ভূধরের মধ্য দিয়া ভয়রূপিণী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তটিনীকুল আর প্রধাবিত হয় না; সঙ্কল্পরূপ শিখণ্ডিসকল তখন আর স্ব স্ব পক্ষ বিস্তার করিয়া উল্লাস প্রকাশ করে না; তখন সম্বিদাকাশ সাতিশয় নির্ম্মল হয় এবং জীবাদিত্য স্বরূপসম্বিৎরূপ আকাশে অপরোক্ষ-ভাবে পরিস্ফুরিত হইয়া মহান্ অভ্যুদয়ের সহিত অত্যধিক নির্ম্মল ভাবে বিরাজ করিতে থাকে। যেমন দিবাকর ও নিশাকরের উদয় কালে বিভাগযুত বিশাল দিঙ্মণ্ডল রজোরাজি-বিরহিত ও মেঘমুক্ত হইয়া সমধিক সুশোভিত হয়, তেমনি সমাধিকালে তৃষ্ণাসকল বিবেক-প্রাপ্ত, মোহমুক্ত ও রজোগুণে অস্পৃষ্ট হইয়া অতীব শোভা ধারণ করে। শরদাকাশে সমুদিত চন্দ্রিকা যেমন দিঙ্মণ্ডল শীতল করিয়া বিশিষ্ট শোভা প্রাপ্ত হয়, তেমনি তখন পুণ্যফলের অনুবর্ত্তিনী চিত্তবৃত্তিরূপিণী চিদাকাশের মঞ্জরী পরম প্রমুদিত হইয়া সবিশেষ প্রতিভাত হইতে থাকে। এইরূপে তখন সুবিবিক্ত বিবেকভূমি পরমানন্দ-দাতা ও সর্ব্বসম্পদের প্রকাশকর্ত্তা আত্মরূপ ফল দ্বারা পরম সাফল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন এই সুবিশাল শৈলবনশালী ভুবনমণ্ডল পরমাত্মার মনোহর আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া নিতান্ত নির্ম্মল ও শীতল হইয়া উঠে। তখন মনোরূপ সরোবর স্ফটিকের ন্যায় স্বচ্ছ, পরিচ্ছিন্নতার অভাবে বিস্তারিত এবং বিবেক-জলের উপচয়ে স্ফারিত হইয়া, রজঃসম্পর্ক-হীন হৃদম্বুজ-কোশ ধারণ করত পরম শোভা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তখন চঞ্চল ও মলিন

অহঙ্কাররূপ মধুকর সেই হৃদম্বুজ হইতে কোথায়—কোন্ অজ্ঞাত দেশে চলিয়া যায়, আর তাহার দর্শন পাওয়া যায় না। তখন এই দেহনগরের যিনি অধিপতি, অর্থাৎ আত্মা, তাঁহার মন শান্তভাব অবলম্বন করে, বাসনা বিদূরিত হইয়া যায় এবং তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বত্র নেতৃত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; তাঁহার সর্ব্ব সঙ্কোচ অপসারিত হইয়া যায়।

হে রাঘব! যে ধীরচেতা পুরুষ স্বীয় দোষরাশি দূরীকৃত ও মনকে বিগলিত করিয়া জনন-মরণে ঐহিক পারলৌকিক নীরস গতি অবলোকন করেন, এবং বিচারবলে আত্মদীপ প্রাপ্ত হয়েন, তাদৃশ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিই গতজ্বর হইয়া স্বীয় শরীর-নগরে বিরাজ করিয়া থাকেন।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! পূর্ব্ব-বর্ণিত প্রকারে এই দৃশ্য বিশ্ব যেরূপে সেই বিশ্বাতীত চিদাত্মায় অবস্থিত, তাহা আমার বোধ-বৃদ্ধির নিমিত্ত পুনরায় প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সলিলে যেমন ভাবী তরঙ্গাবলী অনভিব্যক্ত-রূপে বিরাজ করে, তেমনি চিদাত্মতত্ত্বে এই সৃষ্টিপরম্পরা তাঁহা হইতে অভিন্নভাবে বিরাজিত। যেমন আকাশ সর্ব্বগামী হইলেও সূক্ষ্মতা বশতঃ লক্ষিত হয় না, তেমনি নিরবয়ব চিত্তত্ত্ব যদিও সর্ব্বগামী, তথাপি তাহা প্রত্যক্ষগোচর হয় না। স্ফটিকাদি মণিগণ আবৃত বা অনাবৃত যাহাই কেন হউক না, তদ্গত প্রতিবিম্বকে যেমন সত্য কিম্বা অসত্য কিছুই বলা যায় না, অর্থাৎ তাহা যেমন সত্য ও অসত্য উভয়ই, তেমনি এই সৃষ্টিও আত্মাতে সত্য এবং অসত্য দ্বিবিধরূপেই প্রতিভাত। সত্য বটে, মেঘের আধার আকাশ; কিন্তু তাহা হইলেও উহা যেমন মেঘস্পৃষ্ট নয়,—সুতরাং নির্লেপ, তেমনি এই সৃষ্টিপ্রবাহ চৈতন্যে অবস্থিত হইলেও সৃষ্টির সংস্পর্শ হইতে তিনি দূরে বিরাজ করেন। যেমন দিনকর-কিরণ জলমধ্যে পতিত হইলে জল-

সংস্পর্শে স্ফুটরূপে তাহা লক্ষিত হয় না; পরন্তু প্রতিবিম্বাকারে স্পষ্টতই দৃস্ট হইয়া থাকে, তেমনি পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, পঞ্চবায়ু ও অবিদ্যাময় দেহে আত্মচৈতন্য লক্ষিত হইয়া থাকেন। বাস্তবিক পক্ষে ঐ চৈতন্যে, কোনরূপ সঙ্কল্প অথবা কোনও প্রকার সংস্কারই সম্ভাব বিদ্যমান নাই। ঐ চিদাত্মা অবিনাশি-স্বরূপ ; তবে যে তাহাঁতে সৃষ্টি-প্রপঞ্চের বিদ্যমানতা, তাহা কেবল তাহাঁর একটা কল্পিত অভিধা বৈ আর কিছুই নয়। তত্ত্বজ্ঞগণ মনে করেন, ঐ চিদাত্মা আকাশের শত ভাগের এক ভাগ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম, নির্ম্মল ও নিষ্কল-স্বভাব। তাঁহাদের ধারণায় সংসারের স্বরূপ স-কল হইলেও পরমাত্মায় নিষ্কলরূপে প্রতিভাত এবং ঐ পরমাত্মাই একমাত্র স্ব-স্বরূপের প্রদর্শক। যেমন তরঙ্গ, বুদ্বুদ ও কল্লোলাদিময় বহু ভাব সমুদ্রজলে জলাভিন্নরূপে অবস্থিত, তেমনি 'তুমিত্ব' 'আমিত্ব' প্রভৃতি বিবিধ ভাব চিদর্ণবে অভিন্নভাবেই বিরাজিত। ফলতঃ চিন্মাত্র ব্যতীত কোন ভাববিকারই প্রকাশ পাইতে পারে না। বলিতে পার, চিৎ যিনি, তিনিই আপনাতে চেত্য অর্থাৎ তদতিরিক্ত বিশ্বপ্রপঞ্চ সংগ্রহ করিয়া থাকেন। তদুত্তরে বলিব, ঐরূপ বলা সঙ্গত নহে ; কেন না, চিদতিরিক্ত ত কিছুরই অস্তিত্ব নাই ; সুতরাং মনে করিতে হইবে, চিৎ চিৎই সংগ্রহ করেন। এইরূপ মননে ফলের বেলায় ইহাই দাঁড়াইবে যে, চিতের স্বীয় আত্মায় কোনই ব্যাপার-যোগ নাই বলিয়া আত্মায় একমাত্র চিৎস্বরূপই অবস্থিত ; বস্তুতঃ তিনি কিছুই সংগ্রহ করেন না। এই বিশ্বসংসার তাঁহা হইতে ভিন্ন বস্তু —ইহা কেবল মূঢ় জনেরই কল্পনা। যাঁহারা তত্ত্বদর্শী, তাহাঁদের জ্ঞানে এই সকলই একমাত্র অদ্বয় চিৎ বৈ আর কিছুই নয় ; চিৎই প্রকাশরূপে বিরাজ করিতেছেন ; তিনিই অনুভূতি বশতঃ সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলীর প্রকাশ বিধান করেন, সর্ব্বপ্রাণীর বিষয়াস্বাদন-শক্তি উদ্ভাবিত করিয়া দেন এবং জীবনিবহের জন্মাদির নিমিত্তভূত হয়েন। তাঁহার উদয়, অস্ত, উত্থান, অবস্থান, গমন, আগমন, কিছুই নাই। এ জগতে তিনি আছেনও বলা যায়, আবার তিনি নাইও বলিতে পারি ; অর্থাৎ অজ্ঞদিগের নিকট জন্মাদির নিমিত্তভূত হইলেও তত্ত্বজ্ঞ-দৃষ্টিতে তিনি কূটস্থ, অপরিচ্ছিন্ন, একরূপ ব্যতীত কিছুই নহেন।

হে রঘুনন্দন! ঐ বিশুদ্ধ চিৎ আপনিই আপনাতে অবস্থিত হইয়া এই জগদভিধেয় প্রপঞ্চরূপে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। জগৎপ্রপঞ্চ-রূপ ধারণ করেন বলিয়া তাহাঁর স্বরূপক্ষতি কিছুই নাই; তিনি যেমন, তেমনই বিরাজমান। যেমন জল জলাকারেই এবং তেজ তেজোরূপেই প্রকাশ পায়, জানিবে—চিৎও তেমনি সৃষ্টিপ্রপঞ্চরূপে প্রকাশমান। ফল কথা, এই যে সৃষ্টিপ্রপঞ্চ দৃষ্ট হয়, ইহা চিতের চিৎ-স্বরূপতা হইতে কিঞ্চিন্মাত্রও পৃথক্ নহে। চিদাখ্য স্বভাব প্রকাশস্বরূপ ও অবয়বহীন হইলেও ব্যবহারতঃ সর্ব্বগামী বলিয়া সাবয়ব এবং 'আমি অজ্ঞ' এবম্বিধ অজ্ঞানের প্রচ্ছাদনে অপ্রকাশ, অর্থাৎ অবস্থাবিশেষে চিতের দ্বিবিধ রূপ লক্ষিত হয়; যথা—পরমার্থদশায় তিনি প্রকাশময় শুদ্ধ চিন্ময়, আর ব্যবহারতঃ 'আমি অজ্ঞ, আমি কি, তা জানি না' ঈদৃশভাবে অপ্রকাশ, অশুদ্ধ ও অসর্ব্বগামী। এইরূপে চিৎস্বরূপ অবিদ্যায় প্রতিবিম্বিত হইলে আপনার অপরিচ্ছিন্ন পদ পরিহার করত ক্রমশঃ 'এই দেহই আমি' এবম্প্রকার দেহাত্মভাবনায় আবিষ্ট হইয়া অজ্ঞত্ব অর্থাৎ জীবপদ গ্রহণ করেন। অহম্ভাবনার আবেশে জীব হইবার পর তাহাঁর সংসারভাব উপস্থিত হয়। তখন জীবের বৃথা নানাত্ব উপচিত হইয়া উঠে, তাহাতে 'ইহা আছে, উহা নাই, এইটী গ্রহণীয়, ঐটী গ্রাহ্য নয়, ইহা হেয়, তাহা উপাদেয়, ইহা হিত, উহা অহিত' এবম্প্রকার বহু ভেদবুদ্ধি ও তদনুযায়ী যত্নাদি তিনিই প্রকাশ করিতে থাকেন। তখন পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, পঞ্চবায়ু ও অবিদ্যা, এই আটটী, আত্মভাবে অধ্যস্ত হইয়া শত শত স্পন্দন প্রকাশ করে, তদ্দর্শনে মনে হয়, তিনিই বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মপরম্পরা দ্বারা এই ভোগ্য জগৎ নির্ম্মাণ করিতেছেন; বস্তুতঃ কিন্তু তিনি কিছুই করেন না। পুর্য্যষ্টকের স্পন্দনেই এই জগৎ নির্ম্মাণ নিষ্পন্ন হয়, ইহাতে তাঁহার নিজের কর্ত্তৃত্ব নাই। ঐ যে ভূগর্ভস্থিত অঙ্কুর ভূতল ভেদ করিয়া উচ্ছ্রিত হইতেছে, ঐ ক্ষেত্রে সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি সর্ব্বমূর্ত্তি ব্যোম যদি আপনাতে উহার অবকাশ-বিবর ধারণ না করে, তাহা হইলে ঊর্দ্ধ অবকাশের অভাব নিবন্ধন ঐ অঙ্কুরোদগম কিছুতেই সম্ভব হয় না। এইরূপে স্পন্দৈকধর্ম্মী বায়ু

যদি ঐ অঙ্কুরকে আকর্ষণ না করে, জল যদি আপনার রস-বিতরণে উহাকে স্নিগ্ধ করিয়া না তুলে, পৃথ্বী যদি স্বীয় দৃঢ়তা প্রদান না করে এবং তেজ যদি উহাকে স্বীয় রূপে অনুপ্রাণিত না করে, তাহা হইলে ঐ অঙ্কুরের উদ্গম কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না। এইরূপে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, সমস্ত জগৎই পারম্পরিক সাহায্যগুণে স্থিতিশালী হইতেছে। হেমন্ত-শিশিরাদি বিভিন্ন কালও সার্ব্বকালিক অঙ্কুরোৎপত্তির বাধক হইয়া স্ব-স্ব-কালোচিত অঙ্কুরোদ্গমের প্রতি কারণ হইয়া থাকে। চিৎই পুষ্পসমূহে গন্ধভাবাপন্ন হইয়া ধীরে ধীরে বিকাশ পায়। ভূগর্ভে রস-ভাবাপন্ন হইয়া তিনিই ভূতলে তরুমূল-দারুতা প্রাপ্ত হয়েন, এবং তিনিই ক্রমশঃ পল্লব, ফল ও শিরাদি সন্নিবেশ লাভ করিয়া ইন্দ্রচাপবৎ বৃক্ষাবয়বের অপূর্ব্ব অভিনবত্ব উদ্ভাবন করিয়া থাকেন। এইরূপে এই দৃশ্য বিশ্বে যত কিছু বস্তু নবভাবে আবির্ভূত হইতেছে, তাহাদের প্রত্যেকটীর মূলেই ঐ চিতের অনুগ্রহ সুস্পষ্ট। তাঁহারই অনুগ্রহে বিবিধ পুষ্প-পল্লব-দল বাসন্তী শোভা ধারণ করে, সূর্য্যের তাপশক্তি নিদাঘ-বিধির অনুগামী হয়, সুনীল জলদাবলী প্রাবৃট্‌কাল প্রকট করিয়া দেয়, সমস্ত ফলসম্ভার শরতের অনুধাবন করে, হেমন্তকালে দশদিক্ হিমশালিনী হয়, এবং শিশিরে শীতল অনিল জলকে উপল করিয়া তুলে। কাল যে আপনার যুগময়ী মর্য্যাদা পরিত্যাগ করে না, কিম্বা তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালার ন্যায় এই যে অবিরত সৃষ্টিপরম্পরা প্রবাহিত হইতেছে, এই উভয় ব্যাপারও চিদনুগ্রহের ফল। ঐ চিতের অনুগ্রহগুণেই স্থৈর্য্য-চাতুর্য্য-কারিণী নিয়তি স্থিতিশালিনী হইয়াছে। এই যে সর্ব্বভূতধরিত্রী ধরা দেবী ধীরভাবে প্রলয়াবধি অবস্থান করিতেছেন, এবং এই যে চতুর্দ্দশ প্রকার ভূতগ্রাম সমগ্র ভুবনবিবরে নানাকারে নানা ব্যবহারে বারম্বার আবির্ভূত হইয়া বারম্বার বিলয় পাইতেছে, ইহা নিয়তিরই স্থৈর্য্য-চাতুর্য্যকারিতার উদাহরণ। চিৎই নিয়তিরূপে উল্লিখিতক্রমে জগন্মর্য্যাদার ব্যবস্থাপক।

রামচন্দ্র! জলে যেমন বুদ্বুদাবলী বিলীন হয়, তেমনি ভূতগণের ঐ জনন-মরণ-প্রবাহপরম্পরা তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেই অপগত হইয়া যায়। আহা! একমাত্র তত্ত্বজ্ঞান নাই বলিয়াই এই শোচনীয় মূঢ় জনগণ

যেন কৃতান্তভবনের জনন-মরণশীল অতিথি হইয়াই প্রাক্তন বাসনাবশে কামনাকুল ও মুগ্ধ-ভাবে এ সংসারে একবার আসিতেছে, আবার পরলোকে যাইতেছে, কখন ঐহিক ও আমুষ্মিক ধন-ধর্ম্মাদিরূপ স্বার্থ সকল উপার্জ্জন করিতেছে, কখন স্থাবরাদি জন্ম গ্রহণ করিতেছে, আবার কখন কখন জন্মনাশে ধাবিত হইতেছে। এইরূপেই উহারা অনাদি কাল সংসারে ঘূর্ণমান হইতেছে।

ষটত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এইরূপে এই সংসার-পরম্পরা পরব্রহ্ম হইতেই বারম্বার আসিতেছে, আসিয়া স্থিরতর আকার ধারণ করিতেছে, আবার তাঁহাতেই বিলীন হইতেছে। এই সমগ্র দৃশ্য বিশ্ব পরস্পর হেতু-ভাবাপন্ন হইয়া স্বতই অর্থাৎ স্বাধিষ্ঠান চৈতন্য হইতেই জন্মিতেছে এবং বিনাশকালে পরস্পর হেতুভাবে স্বতই বিলয় পাইতেছে। যেমন অগাধ জলরাশির অভ্যন্তরে জলাপূর্ণ স্থানের অভাবে জলস্পন্দ থাকিলেও তাহা নাই বলিয়াই প্রতীত হয়, তেমনি এই যে দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ, ইহা সত্য চিদাকারে লক্ষিত না হইলেও একমাত্র সত্য চিৎস্বরূপেই অবস্থিত বলিয়া অবধারিত। নিদাঘকালে নিরাকার ব্যোমমণ্ডলে যেমন নদী বলিয়া ভ্রম জন্মে, এই সৃষ্টিপ্রবাহ চিত্তত্ত্বে তেমনি ভ্রম বলিয়া নিশ্চিত হয়। যেমন আত্মা অচল অটলভাবে রহিলেও মদাবস্থায় তাঁহাকে ঘূর্ণমান বলিয়াই বোধ হয়, ঐ চিৎতত্ত্বও তেমনি চিৎস্বরূপে অবস্থিত রহিলেও তদন্যথারূপে প্রতীত হইয়া থাকেন। একমাত্র চিৎই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ-বেশ ধারণ করিয়া আছেন; এই জন্য এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, আবার তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে উহার অস্তিত্ব থাকে না বলিয়া উহা সদাখ্যায়ও অভিহিত হইবার নয়। দৃষ্টান্ত দেখ, হেমবলয়াদির হেমত্ব হেমবলয়াদি হইতে ভিন্ন না হইলেও ভিন্নরূপেই প্রতীত।

হে রঘুনন্দন! তুমি যাঁহার সত্তাবত্তায় শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি পরিজ্ঞাত হইতে পারিতেছ, তাঁহাকেই পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চয় কর। সেই পরমাত্মাই এই নিখিল দৃশ্য বিশ্ব ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনিই এক, অনেক, অতীত, সর্ব্বগ ও অমলাত্মা; তাঁহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় কল্পনা নাই, একত্ব বা নানাত্ব প্রভৃতির তিনিই আধার। তদতিরিক্ত অন্য কল্পনা বৃথা; তিনিই একমাত্র সত্য।

রামচন্দ্র! পদার্থান্তরের ভাব, অভাব ও শুভাশুভ সৃষ্টিপ্রবাহ বাসনা-বশেই কল্পিত হয়; ঐ কল্পনা সকল অনাত্মস্বরূপ মায়াতেই অথবা তত্ত্বদৃষ্টিতে সকলই আত্মমাত্র বলিয়া আত্মাতেই হইয়া থাকে। ফল কথা, আত্মরূপা সৃষ্টি আত্মাতেই আছে, এইরূপ পক্ষ যখন স্থির হইল, তখন আত্মাতিরিক্ত সৃষ্টি নাই, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত। যদি আত্মাতিরিক্ত অন্য কোন বস্তু সিদ্ধ হইতে পারে, তাহা হইলে তাহাতে সৃষ্টিবিষয়ক বাসনা হওয়া সম্ভব; যখন আত্মাতিরিক্ত কিছুই সম্ভব নহে, তখন আত্মা আবার কিরূপ বাঞ্ছা পোষণ করিবেন? কোন্ বিষয়ের স্মরণ করত ধাবিত হইবেন এবং ধাবিত হইয়াই বা কিরূপ ফল পাইবেন? সুতরাং 'ইহা কাঙ্ক্ষিত আর ইহা আমার কাঙ্ক্ষিত নহে' এবম্বিধ বিকল্প আত্মাকে স্পর্শও করে না। কাজেই অনীহত্ব নিবন্ধন কিছুই তিনি করেন না; কেন না, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, এ সকল ভেদ কিছুই নয়,—সকলই সেই একত্বে পর্য্যবসিত। আধার ও আধেয়ের একত্ব নিবন্ধন কুত্রাপি তিনি অবস্থানও করেন না। আত্মা নিরীহ বা নিরিচ্ছ বলিয়া তাঁহাকে কি 'কর্ম্ম-বর্জ্জিত' বলা যাইবে? না,—কেন না, তাঁহাতে ত দ্বিতীয় কল্পনা একেবারেই অসম্ভব; আত্মাকে 'কর্ম্মবর্জ্জিত' বিশেষণ প্রদান করিতে হইলেই পূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্ম ছিল, এ কথা অবশ্য স্বীকার করিয়া লইতে হয়। কিন্তু বলিতে কি, আত্মাতিরিক্ত পৃথক্ কর্ম্ম তাঁহাতে কোন কালেই নাই; তাই বলিতেছি,—রাম! উক্ত প্রকার হইতে অন্যবিধ সাফল্যাদি কল্পনা একেবারেই নাই। জানিবে—ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। যদি তুমি এ বিষয়ে পৃথক্ কল্পনা জানিয়া থাক, তাহা হইলে সর্ব্বদ্বন্দ্ব হইতে নির্ম্মুক্ত ও গতজ্বর হইয়াই তুমি কর্ত্তা হইতে হয়—হও, আমি নিষেধ করিব না; কিন্তু রাঘব! এ বিষয়ে পুনরায় বলিয়া রাখি, তুমি যদি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ সহকারে পুনঃ পুনঃ কর্ম্ম করিতে

থাক, তাহা হইলে তাহাতে দেহাদির উপচয় ভিন্ন অন্য এমন কি ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে, যাহাতে তোমার নিত্য নিরতিশয়ানন্দ আত্মোচিত ফল ঘটিবে? ফলতঃ সে ব্যাপারে সেরূপ ফল পাইবার আশা একেবারেই নাই। তাই বলিতেছি, তুমি সমস্ত কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিহারপূর্ব্বক স্ব স্বরূপের সমুচিত যে অকর্ত্তৃত্ব, তাহাতেই আস্থা স্থাপন কর। বস্তুতঃ তুমি শ্রুতি ও গুরুবাক্যাদি দ্বারা আত্মপ্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছ; সুতরাং কেনই বা তোমার কর্ত্তৃত্বাভিমান হইবে? তুমি স্বস্থ হও, স্বচ্ছ হও এবং নির্ব্বাত নীরনিধির ন্যায় নিস্তব্ধ হইয়া থাক।

রামচন্দ্র! যাহাতে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়া যায় অর্থাৎ অনন্ত সুখলাভ সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে, বহুদূরে গিয়া বহু যত্ন করিয়াও কদাপি তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না; তুমি মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া মন দ্বারাও বাহ্য পদার্থের অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইও না। তুমি যে প্রত্যক্‌রূপ নহ, এমন নহে; পরমার্থ-দৃষ্টিতে দেখিলে দেখা যাইবে, তুমিই পূর্ণানন্দময় পরম পুরুষ।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৭ ॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বলিতে পার, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মপরম্পরায় তাঁহাদিগেরও ত কর্ত্তৃত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, আর সেই কর্ত্তৃত্ব অবশ্যই কোন না কোন ইষ্ট বা অনিষ্ট ভোগের উপস্থাপক হয়; সুতরাং অজ্ঞ জন হইতে তাঁহাদের বিশেষত্ব কি? তদুত্তরে বলিব, সুখ-দুঃখাদি ভোগফলজনক কর্ম্মে ও যোগাভ্যাসাদি ব্যাপারে তত্ত্ববিদ্‌গণের যে কর্তৃত্ব দৃষ্ট হয়, তাহা তত্ত্বদৃষ্টিতে অসৎ বলিয়াই প্রতিপন্ন; কিন্তু যাহারা মূর্খ, তাহাদের নিকট তাহা সৎ বলিয়া প্রতিভাত। কর্ত্তৃত্ব কাহাকে বলা যায়? শরীরের ক্রিয়া কখনই কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। কেন না, অবুদ্ধিপূর্ব্বক যদি কোন কর্ম্ম করা হয়, তাহাতে ত 'আমি করিতেছি' এরূপ প্রত্যয় প্রত্যক্ষ হয় না। তবে কর্ত্তৃত্ব কি? অন্তরস্থিত নিশ্চয়াত্মক যে মনোবৃত্তি, তাহাই কর্ত্তৃত্ব।

অথবা কার্য্যের অগ্রে ও পশ্চাতে ইহা হেয় কিম্বা উপাদেয়, এবম্বিধ যে মনোবৃত্তি, তাহাই কর্ত্তৃত্ব বলিয়া নিরূপিত। এই কর্ত্তৃত্ব হইতেই বাসনার আবির্ভাব এবং বাসনানুরূপ ফলভোক্তৃত্বও তদধীন চেষ্টাবশতঃ হইয়া থাকে ; এইরূপ হইবার কারণ এই যে, পুরুষ বাসনার অনুরূপই স্পন্দিত হয় এবং সেই স্পন্দানুসারেই ফলানুভব করিয়া থাকে। উল্লিখিত-রূপ কর্ত্তৃত্ব হইতেই ফলভোক্তৃত্ব হয় ; ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয়। বিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন—পুরুষ কোন কার্য্য করুক বা নাই করুক, যেমন যেমন মনোবাসনার উদয় হইবে, তদনুরূপ স্বর্গ বা নরক-ভোগ অবশ্যই ঘটিবে। ইহার ব্যত্যয় কিছুতেই হইবে না ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, যাহারা তত্ত্ববিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহারা কার্য্য করুক আর নাই করুক; বাসনাবশে তাহাদেরই কর্ত্তৃত্ব ; পরন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, বাসনা বিলীন হওয়ায় তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব হইতে পারে না। যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহার বাসনা শিথিলীভূত হয় ; সেইজন্য তিনি কোন কার্য্য করিলেও তাহার ফলানুসন্ধান রাখেন না, অথচ কেবল অনাসক্তবুদ্ধি হইয়া স্পন্দন মাত্র করিয়া থাকেন। যদিও তাঁহার কৃত কার্য্যের ফল উপস্থিত হয়,তাহা হইলে সে ফলকেও তিনি 'এ সকলই আত্মা' এইরূপ জ্ঞানে ভোগ করেন। বিষয়ভোগে মগ্নমনাঃ অজ্ঞ মানব যদি কোন কর্ম্ম নাও করে, তথাপি সে তাহার কর্ত্তা হইয়া থাকে। কেন না, মন যাহা করে, তাহাই ত কৃত হয়, আর সে যাহা না করে,তাহাই অকৃত হইয়া থাকে ; অতএব বুঝিতে হইবে, মনই কর্ত্তা, দেহ কর্ত্তা নহে। এ সংসার চিত্ত হইতেই আসিয়াছে ; সুতরাং ইহা চিত্তময় এবং চিত্তেই অবস্থিত। ইহাই প্রাথমিক বিচার্য্য বিষয়। সমস্ত-রূপ-রসাদি ও তদাকার চিত্তবৃত্তি এই উভয়ের উপশম হইলে তৎসমুদায়ের বাসনামাত্র তখন অবশিষ্ট থাকে। সেই বাসনা লইয়াই জীব বিরাজ করে। কিন্তু তথাবিধ জীবগণের মধ্যে যাহারা আত্মতত্ত্বে অভিজ্ঞ, তাঁহাদিগের মন জলদাবলীর বারিবর্ষণে মরীচিকা-সলিলের ন্যায় উপশম প্রাপ্ত হয় এবং প্রখর তাপে তুষারবিন্দুর ন্যায় বিলীন হইয়া তুর্য্যপদে অবস্থান করে। জ্ঞানিগণের মন—না আনন্দ, না নিরানন্দ, না চল, না অচল, না সৎ, না অসৎ, এবং না এতৎসমস্তের মধ্যাবস্থাবিশিষ্ট ; পরন্তু উহা প্রচুর-পরিস্থিত আত্মসুখ-রূপ একরস-সম্পন্ন।

বিরাটদেহ হস্তী যেমন স্বল্পজল জলাশয়ে নিমগ্ন হইতে পারে না, তেমনি যিনি তত্ত্বজ্ঞ জন—তিনিও বাসনাময় স্পন্দরসে কদাচ নিমগ্ন হয়েন না; কিন্তু মূর্খজনের মন সর্ব্বদাই ভোগভূমির দিকে ধাবমান, সে সতত ভোগভূমিই দেখে, আত্মতত্ত্বের দিকে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় না।

রামচন্দ্র! ঐ বিষয়ে আরও একটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখ, কোন লোক যদি সর্ব্বদা মনের মধ্যে এইরূপ একটা বাসনা পোষণ করে যে, আমি নিয়ত গর্ত্তমধ্যেই পতিত হইতেছি; তাহা হইলে প্রকৃত পক্ষে গর্ত্ত-পতন না ঘটিলেও শয্যায় শয়ন কিম্বা আসনে উপবেশন করিয়াও গর্ত্তপতন-বাসনার প্রাবল্যে গর্ত্ত-পতন-জনিত দুঃখ অনুভব করে। কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ জন, তাঁহার মন পরম উপশম প্রাপ্ত হয়; তাই তাঁহার গর্ত্ত-পতন ঘটিলেও শয্যায় শয়ন কিম্বা আসনে উপবেশনের ন্যায় তিনি সুখানুভব করেন। এইরূপে শয্যাসনে অবস্থান ও গর্ত্তমধ্যে পতন, এই উভয় ব্যাপারে একজন গর্ত্তপতনের কর্ত্তা না হইয়াও কর্ত্তা হয়; অপর অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি গর্ত্ত-পতনের কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তা হইয়া থাকেন। অতএব এখন বুঝিয়া দেখ, অজ্ঞ ও বিজ্ঞের বিশেষত্ব এখানেও কেমন পরিস্ফুট। ফলে কর্ত্তৃত্ব ও অকর্ত্তৃত্ব এ উভয়ের মূল একমাত্র চিত্তই। চিত্ত যেমন হইবে, পুরুষকেও সেইরূপই হইতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তাই বলিতেছি, রঘুনাথ! তুমি এ কথা নিশ্চয় জানিয়া রাখিও, তুমি কর্ত্তাই হও আর অকর্ত্তাই হও, তোমার চিত্ত নিত্য অসংসক্ত হউক। তুমি তত্ত্বদর্শী, তোমার যাহাতে আসক্তি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহা আত্মতত্ত্ব ব্যতিরিক্ত কিছুই নহে। এই জগদবস্থিত যে কিছু বস্তু, শুদ্ধ চিত্তত্ব হেতু তৎসমস্তই তুমি আভাস বা ভ্রান্তিমাত্র বলিয়াই জানিবে। এইরূপে পুরুষ যখন বেদ্য বিষয় বিদিত হয়,তখন আত্মা যে সুখ-দুঃখের গোচর নহেন, এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তই তাঁহার জন্মিয়া থাকে। আত্মাতিরিক্ত আধার-আধেয়-দৃষ্টি কিছুই বিদ্যমান নাই; এইরূপ যখন নিশ্চয় হয়, যখন 'আমি কর্ত্তা, ভোক্তা, সর্ব্বপদার্থের অতিরিক্ত ও কেশাগ্রের সহস্রাংশের একাংশ অপেক্ষাও সূক্ষ্ম' এই ধারণা তাঁহার জন্মে, যখন 'এই যে কিছু বস্তু, সকলই আমি' ইত্যাকার নিশ্চয় প্রতীতি হইয়া থাকে এবং যৎকালে 'সর্ব্ব বস্তুর অবভাসক, সর্ব্বগামী আমিই

কেবল অবস্থান করিতেছি' এইরূপ স্থির নিশ্চয় হয়, তখন 'আমি কোন্ সুখ-দুঃখের গম্য নহি' এই ধারণায় চিত্তবৃত্তি বিগতজ্বর হয়; সে তখন আত্মাতেই লীলাচ্ছলে ব্যবহার-পরম্পরায় নিরত হইয়া থাকে। তাহার আসক্তি তখন আর থাকে না; সুতরাং হউক না—সঙ্কটকাল উপস্থিত, তথাপি তত্ত্বজ্ঞ জনের দুঃখানুভূতি নাই। প্রত্যুত তখনও তাঁহার আনন্দ অক্ষুণ্ণ। তাঁহার আনন্দে মহাসঙ্কটেও সমস্ত ভুবনভাব জ্যোৎস্নার ন্যায় অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। তখন তাহাঁর দুঃখের লেশমাত্রও হয় না; কেন হয় না? তাহার কারণ এই যে, তত্ত্বজ্ঞজনের চিত্ত মৃতপ্রায় থাকে; সুতরাং চিত্ত ব্যতীত তিনি কোন কাজ করিলেও তাহার কর্ত্তা হয়েন না, এবং তাঁহার মন নির্লেপ থাকে বলিয়া তদীয় যত্নকৃত কর-চরণাদির বিক্ষেপরূপ যে কর্ম্ম, তাহারও তিনি ফলানুভব করেন না। এইরূপে যে কিছু কর্ম্ম, যে কিছু চেষ্টা, যে কিছু ভাব, যে কিছু লোক এবং যে কিছু গতিপ্রভৃতি, সমস্তেরই বীজ সেই এক মনই; সুতরাং মনকে যদি পরিহার করা যায়, তাহা হইলে সর্ব্বকর্ম্মেরই পরিহার হয়, সর্ব্বদুঃখ ক্ষয় পায় এবং সর্ব্বকর্ম্মই বিলয় পাইয়া যায়। তখন কোনরূপ শারীরিক বা মানসিক কর্ম্ম তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে না; কেন পারে না? তাহার কারণ এই যে, তিনি তাহাতে বশীভূত হয়েন না, বশীভূত না হইবার হেতু—তিনি কর্ম্মফলে রঞ্জনা লাভ করেন না; কেন না, পরমার্থ পক্ষে তাঁহার জ্ঞানে তখন স্বব্যতিরিক্ত কিছুই আছে বলিয়া বোধ হয় না।

রামচন্দ্র! কৃত যে অকৃত হয়, সে বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখ, যেমন কোন বালক মনে মনে নগর নির্ম্মাণ করে, এবং তাহা পরিষ্কার করিয়া লয়, পরে আবার ঐ মনঃকৃত নগর লীলাক্রমে অকৃত বলিয়া অবধারণ করে; সে নগরের সুখ-দুঃখ অনুপাদেয় ও কৃত্রিম বলিয়া আলোচনা করে; তাহার মনঃকৃত অবসানও কৃত বা বাস্তব বলিয়া দর্শন করে এবং লীলাক্রমে দুঃখ অনুভব করিয়াও তাহা দুঃখ বলিয়া মনে করে না, এইরূপ ঐ তত্ত্বজ্ঞ জন কোন কিছু করিলেও পরমার্থতঃ তাহাতে লিপ্ত হয়েন না।

এ জগতে নিখিল পদার্থই হেয় ও উপাদেয়ভাবে ব্যবহৃত হয়। ইহাতে দুঃখের কারণ কি? কাহাকে দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইবে?

হেয়কে দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না ; কেন না, হেয়তা উপাদানপূর্ব্বকই হইয়া থাকে ; হেয়ের উপাদেয়ত্ব নাই বলিয়া তাহা হইতে দুঃখ প্রসক্তি হইতে পারে না, এইরূপ যদি স্থির হইল, তাহা হইলে কি উপাদেয়কেই দুঃখের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব ? না—তাহাও কখন সম্ভব হয় না ; কেন না, কথা এই যে, দুঃখ কি নশ্বর উপাদেয় হইতে কিম্বা অবিনাশী হইতে উৎপন্ন হইবে ? যদি বল, নশ্বর হইতে হইবে, তদুত্তরে বক্তব্য, যে নিজে বিনশ্বর, সে আত্মরক্ষাতেই অসমর্থ ; সুতরাং তাহার কারণত্ব কোথাও হইতে পারে না। দ্বিতীয়,—যাহা অবিনশ্বর, তাহারও কারণত্ব অসম্ভব ; কেন না, এই উপাদেয় জগতে এমন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, যাহা অবিনশ্বর ও আত্মাতিরিক্ত। আত্মারও হেয়তা বা উপাদেয়তা হইতে পারে না। এইরূপে এই ভোগ্য দুঃখের কারণ নিরূপণ হয় না বলিয়া আত্মা অকর্ত্তা এবং অভোক্তা ; তবে যে তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অনুভূত হয়, তাহা অবাস্তবিক ;—অধ্যারোপমাত্র। কিন্তু ঐ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি জীবের পক্ষে অনিবার্য্য ; কেন না, জীবের সম্যক্‌দৃষ্টি নাই ; জীব মোহমালিন্যে আচ্ছন্ন বলিয়াই তাহার কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব প্রভৃতি অপ্রতিবিধেয়। তবে কথা এই, যখন যথাযথ বস্তু বিচারে মোহমালিন্য কাটিয়া যায়, তখন ঐ কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্ব প্রভৃতির নাস্তিত্বই নিশ্চিত হয়। ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি দ্বেষ ও অভিলাষাদি হইতে যে পাপ ও পুণ্যরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, যাহাদের দৃষ্টি সেই অদৃষ্টে ক্লিষ্ট বা বিধ্বংশীকৃত হইয়া পড়ে, তথাবিধ অজ্ঞদিগেরই উক্ত কর্ত্তৃত্বাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে ; পরন্তু যাহাদের ঐ প্রকার দৃষ্টি নাই, তাদৃশ তত্ত্বজ্ঞদিগের উহা দৃষ্ট হয় না। অতএব বুঝিতে হইবে, যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, এবং চিত্ত যাঁহাদের পূর্ণাত্মায় সংসক্ত, এ সংসারে তাঁহাদের মোক্ষকল্পনাও নাই। কিন্তু যাহারা স্বীয় আত্মায় সংসক্ত নহে, বন্ধ-মোক্ষাদি কল্পনা তাহাদেরই হয়। যিনি তত্ত্বজ্ঞ জন, তাঁহার নিকট কেবল আত্মতত্ত্বই প্রকাশ পায়। এই আত্মতত্ত্বই তাঁহার জীবনাদি ব্যবহারসিদ্ধির নিমিত্ত হইয়া থাকে। তিনি পর-প্রত্যয়-সিদ্ধ দ্বিত্ব ও একত্বেরও অভ্যুগম করেন, সত্ত্বাসত্ত্ব স্বীকার করেন এবং আপনার শক্তিমত্তাও অন্যান্য

শক্তিপুঞ্জ হইতে অভিন্নভাবে প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ বন্ধ-মোক্ষ নাই এবং অবন্ধ বা অমোক্ষ এ উভয়েরও কিছুই বিদ্যমান নাই। যত দিনে বোধ বিকাশ না হয়, তত দিনই এই সংসারদুঃখ অনুভূত হইয়া থাকে; পরন্তু যখন বোধ বিকাশ হয়, তখন এ দুঃখ বিলয় পাইয়া যায়। এ জগতে বন্ধকল্পনাও বৃথা এবং মোক্ষকল্পনাও বৃথা; অতএব রামচন্দ্র! তুমি ঐ সকল পরিহারপূর্ব্বক নিরহঙ্কার হও এবং আত্মনিষ্ঠ ও ধীর হইয়া স্বীয় বুদ্ধিবৈভবে ব্যবহার করত ভূতলে অবস্থান করিতে থাক।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! যদি এইরূপই সিদ্ধান্ত হয় যে, কেবল একমাত্র পরব্রহ্মই আছেন, তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই, তাহা হইলে, অধুনা আমার জানিবার বিষয় এই যে, এই বিচিত্র সৃষ্টি কোথা হইতে আসিল? ফলতঃ কিছুই নাই, অথচ সৃষ্টি আছে, এ কথাটা কেমন হইল! ইহা—যেন ভিত্তি নাই অথচ চিত্র নির্ম্মাণ হইতেছে, এইরূপ কথারই সাদৃশ্য ধারণ করিল! অতএব মহাত্মন্! আপনি বলুন,—এই সৃষ্টি-রহস্য কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাজকুমার! এই সমস্ত দৃশ্যই ব্রহ্মতত্ত্বের বিবর্ত্ত; কেননা, ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তিশালী। তিনি সর্ব্বশক্তিশালী বলিয়াই যত কিছু শক্তি সকলই তাঁহাতে লক্ষিত হয়। সত্ত্ব, অসত্ত্ব, দ্বিত্ব, একত্ব, অনেকত্ব, আদিত্ব, অনাদিত্ব ও অনন্তত্ব ইত্যাদি সমস্তই সেই ব্রহ্মের শক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। যেমন জলধির জলরাশি চন্দ্রোদয়-জনিত উল্লাসবশে বিকাশ পাইয়া তরঙ্গ-ভঙ্গিমায় নানাকার প্রদর্শন করত প্রকটিত হয়, তেমনি চিদ্ঘন বা আত্মাই—চিত্তোপাধিক জীব, এই

চিদাভাসরূপ জীবের চিত্ত হইতেই কর্ম্মময়ী, বাসনাময়ী ও মনোময়ী শক্তিসমূহকে একৈক ক্রমে সঞ্চয় করেন, সঞ্চিত শক্তিগুলিকে ফলাকারে প্রদর্শন করেন, উপভোগ দ্বারা ধারণ করেন, উদ্ভাবন করেন এবং পুনরায় তিরোভাবক্রমে নিক্ষেপ করাইয়া থাকেন। বলিতে কি, সমস্ত জীব, সমস্ত পদার্থ ও সমস্ত অভিতঃপ্রসারিত দৃষ্টি, সকলেরই অনবরত ব্রহ্ম হইতেই আবির্ভাব। সেই পরমাত্মা হইতেই সর্ব্বভাব সমুপাগত হইয়া তাঁহাতেই আবার বিলয় পাইতেছে। সমুদ্রের তরঙ্গরাজির ন্যায় সতত সর্ব্ব-পদার্থই তন্ময়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনার এই বচনবিন্যাস বড়ই কঠিন; আমি ইহার অর্থ এখনও বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই। ব্রহ্মতত্ত্ব মনোরূপ ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়েরও অতীত; সেই ব্রহ্মতত্ত্বই বা কোথায়? আর সেই ব্রহ্মতত্ত্ব হইতে আবির্ভূত ক্ষণভঙ্গুর পদার্থপুঞ্জই বা কৈ? ফলতঃ ঐ উভয়ের পার্থক্য অনেক; সুতরাং যাহা নিত্য ও অপরোক্ষ, তথাভূত ব্রহ্ম হইতে কিরূপে এই অনিত্য প্রত্যক্ষ জগৎ আবির্ভূত হইবে? কারণের শক্তি একপ্রকার এবং কার্য্যের শক্তি তাহার অন্যপ্রকার, এরূপ ত কখনই ঘটে না। যদি এই দৃশ্য বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতেই সমুপাগত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত অবিকল তাহারই অনুরূপ হওয়াই সঙ্গত। কেন সঙ্গত? সে সম্বন্ধে কথা এই যে, যাদৃশ কারণ হইতে যাদৃশ কার্য্যের উৎপত্তি, তথাবিধ কার্য্য—তথাবিধ কারণেরই ত অনুরূপ হইয়া থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে একটি প্রদীপ্ত প্রদীপ হইতে প্রদীপান্তর, পুরুষ হইতে পুরুষান্তর এবং শস্য হইতে তদনুরূপ শস্যান্তরের উৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করা যাইতে পারে। নির্ব্বিকার পরমাত্মা হইতেই যদি এই এই জগতের আবির্ভাব হয় বলা যায়, তাহা হইলে ত জগৎও নির্ব্বিকার হইতে পারে। ইহার বিকারিত্ব সম্ভাবনা কিছুতেই ত হইতে পারে না। কাজেই বলিতে হয়, যদি এই জগৎপ্রপঞ্চ চিন্ময়াত্মা হইতে পৃথক্ পদার্থ হয়, তাহা হইলে আর সন্দেহমাত্র থাকে না; নতুবা ঐরূপ বলায় নিষ্কলঙ্ক পরমাত্মাতে একটা কলঙ্কের আরোপ করা হয় মাত্র।

তৎকালে ভগবান্ ব্রহ্মর্ষি বশিষ্ঠ রামচন্দ্রের ঐ কলঙ্কাপত্তির কথা

শ্রবণ করিয়া তদুত্তরে বলিলেন,—হে নিষ্পাপ! এই যে কিছু দৃশ্য জগৎ, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম, ব্রহ্মে কিছু মাত্র মলস্পর্শের সম্ভাবনা নাই। দেখ, সাগরে তরঙ্গরাজির সহিত সলিলই সমুল্লসিত হয়, ধূলিকণা তাহাতে স্ফুরিত হইতে পারে না। হে রঘুবংশনায়ক! বহ্নিতে যেমন উষ্ণত্ব ভিন্ন অন্য কোন ভাব নাই, তেমনি একাদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত কোন দ্বিতীয় কল্পনা ইহাতে নাই।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ব্রহ্ম—নির্দ্বন্দ্ব ও নির্দুঃখ; পরন্তু তাঁহা হইতে জাত এই জগৎ সদ্বন্দ্ব ও দুঃখময়। আপনার এই কথার অর্থ বড়ই অস্পষ্ট বোধ হইল, আমি ইহা বুঝিতে পারিলাম না।

বাল্মীকি কহিলেন;—রামচন্দ্র! এই কথা কহিলে মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ তাহাঁকে উপদেশ দিবার জন্য মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এই রামচন্দ্রের মতি অদ্যাপি বিলক্ষণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় নাই। কিঞ্চিৎ নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছে সত্য; কিন্তু এখনও উহা অনিত্য বাহ্য বস্তুসমূহোপরি ভাসমান রহিয়াছে। এই জগতের জড়ভাব পরিহার করিয়া যে পুরুষ চিদেকরসতা অনুভব করিতে পারিয়াছেন, এবং বিবেকবলে মোক্ষোপায়-প্রদর্শক বাক্যাবলীর অর্থ যথাযথ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, আত্মায় কোনই বিরোধ নাই বলিয়া তথাবিধ ধীমান্ জনের মনে কোন কিছুই অসঙ্গত বলিয়া ধারণা হয় না। এক্ষণে কথা এই, যতক্ষণে না রামচন্দ্রকে আমি উপদেশ প্রদানে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেছি, তাবৎ ইহার বিশ্রান্তি লাভ কিছুতেই ঘটিবে না। যাহার বুদ্ধি অর্দ্ধ-ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাকে 'এই সমস্তই ব্রহ্ম' এরূপ উপদেশ প্রদান করিলে কোনই ফল হয় না; কেন হয় না? তাহার কারণ এই যে, তখনও তাহার দৃশ্য ভোগদৃষ্টি তিরোহিত হয় না, সে তৎসাহায্যে দৃশ্য দর্শন করিতে থাকে বলিয়া তত্ত্ব-বোধ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে। যখন পরম দৃষ্টি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন আর ভোগলিপ্সা জন্মে না; 'এ সকলই ব্রহ্ম' এরূপ সিদ্ধান্ত তখনই তাহার পক্ষে সুসঙ্গত হয়। প্রথমতঃ শমদমাদি গুণগণ দ্বারা শিষ্যকে বিশোধিত করিয়া লইতে হয়, পরে 'এ সকলই ব্রহ্ম, তুমিই ব্রহ্ম' এইরূপ উপদেশ দ্বারা তদীয় বোধ জন্মাইতে হয়। যে ব্যক্তি অজ্ঞ অথবা অর্দ্ধ-

প্রবুদ্ধ, তাহার নিকট 'এই সকলই ব্রহ্ম' এইরূপ কথা যিনি বলেন, তিনি সেই লব্ধোপদেশ ব্যক্তিকে ভীষণ নরকনিচয়েই নিপাতিত করেন। যাঁহার প্রকৃত জ্ঞান জন্মিয়াছে, ভোগবাসনা প্রক্ষীণ হইয়াছে এবং যিনি কোন বিষয়েরই আর আকাঙ্ক্ষা রাখেন না, তাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তিকে 'সকলই ব্রহ্ম, তাঁহাতে অবিদ্যামল নাই' এইরূপ উপদেশ প্রদান করা যুক্তিযুক্ত। যে অতি বড় মূঢ়মতি উপদেষ্টা, শিষ্যকে উল্লিখিতরূপে পরীক্ষা না করিয়া পূর্ব্বোক্ত সদুপদেশ প্রদান করে, তথাবিধ উপদেশদাতাকেও আকল্প কাল নরকভোগ করিতে হয়।

সেই অজ্ঞান-তিমির-হর ভূমি-ভাস্কর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এইরূপ চিন্তা করিবার পর শ্রীরামচন্দ্রকে বলিলেন,—হে অনঘ! পরব্রহ্মে তুমি যে কলঙ্কলেপের আপত্তি করিয়াছ, তাঁহাতে তাহা আছে, কি নাই, তাহার উত্তর সিদ্ধান্তকালেই প্রদান করিব। হে রঘুনাথ! তখন তুমি তাহা নিজেই বুঝিয়া লইতে পারিবে। বুঝিবে—ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বগামী এবং সমস্তই আমি। দেখিতে পাও তো, ঐন্দ্রজালিকেরা মায়ার মাহাত্ম্যে অদ্ভুত ক্রিয়া করে,—সৎকে অসৎ এবং অসৎকে সৎ করিয়া তুলে, তেমনি আত্মাও যদিচ মায়াময় নহেন, তথাপি যেন মায়াময় হইয়া থাকেন। সুদক্ষ ঐন্দ্রজালিকের কাণ্ড দেখ নাই কি? সে, ঘটকে পট এবং পটকেও ঘট করিয়া তুলে, তাহার চেষ্টায় প্রস্তরে লতা উৎপন্ন হয়, সুমেরুশৈলের সুবর্ণতটস্থ নন্দনবনবৎ প্রস্তরোপরি লতাপ্রতান প্রাদুর্ভূত হয, কল্পতরু-নিকরে রত্নস্তবকের ন্যায়, লতাগুচ্ছে উপলখণ্ড উদ্ভূত হয় এবং ব্যোম-দেশে বনসন্নিবেশ পরিদৃষ্ট হয়; এইরূপ আত্মশক্তিতেও নানা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিয়া থাকে। ঐরূপ মায়াশক্তিবলে বস্তুব্যত্যয়ের ন্যায় দেশ-কালেরও ব্যতিক্রম হয়। আত্মার কল্পনায় গন্ধর্ব্বোদ্যানবৎ ভবিষ্যৎ গগনে নগর নির্ম্মাণ হয় এবং নভোভাগের নৈল্যরূপ অঞ্জনাংশের অপগমে তাহা ধরাতলতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। আবার এমনও ঘটে, গন্ধর্ব্বপুরের রাজ-প্রাসাদে বহুল মহিলাজনের সন্নিবেশের ন্যায় ভূমণ্ডলে গগনমণ্ডল স্থাপিত হয়। এ জগতে যাহা কিছু ছিল, যাহা আছে বা যাহা কিছু থাকিবে, জানিবে—তৎসমস্তই পদ্মরাগমণিময় সৌধতলগত আকাশপ্রতিবিম্বের

ন্যায় প্রতিভাত। অর্থাৎ ঐ সকলের সত্তা স্বতই অসৎ হইলেও ব্রহ্মসত্তায় সতের ন্যায় হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে হেতু এই যে, স্বয়ং ঈশ্বরই ব্যক্তাকারে বিবিধ বিচিত্র রূপ ধারণপূর্ব্বক স্বীয় আত্মাকে প্রকটিত করিয়া থাকেন। ফলতঃ সেই একই বস্তু যখন সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সর্ব্বরূপে বিদ্যমান, তখন আর—হে রামচন্দ্র! হর্ষ, অমর্ষ বা বিস্ময় প্রভৃতির অবসর তাহাতে কৈ? ফলে, ধৈর্য্য ধারণ করিয়া সতত সমভাবে অবস্থান করাই কর্ত্তব্য। যিনি সমভাবে অবস্থান করিয়া তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তিনি কখনই বিস্ময়, গর্ব্ব, মোহ, হর্ষ বা অমর্ষ প্রভৃতি বিকার প্রাপ্ত হয়েন না। যতদিনে না ঐ সমভাবের পর্য্যবসান ঘটে, ততদিন এই দেশ-কাল-বিশিষ্ট জগতে বিবিধ বিচিত্র দৃশ্য রচনা দৃষ্ট হইতে থাকে। জলধি যেমন যত্ন করিয়া আপন বক্ষে তরঙ্গ উদ্ভাবন করে না বা তাহা উদ্ভূত হইলেও ভাঙ্গিয়া ফেলে না, তেমনি পরমাত্মাও সযত্নে এই দৃশ্য বিশ্ব রচনা করেন না এবং উৎপন্ন হইলেও তাহার প্রত্যাখ্যান করেন না। বলিতে পার, উহা তবে কিরূপে কোথা হইতে আসিল? তাহার উত্তরে বলিব, দুগ্ধে যেমন ঘৃত, মৃত্তিকায় যেমন ঘট, সূত্রে যেমন পট এবং বীজে যেমন বটবৃক্ষ বিরাজিত, তেমনি আত্মাতেই ঐ সকলের শক্তি অবস্থিত। দুগ্ধাদি হইতে ঘৃতাদির ন্যায় ঐ শক্তিসমষ্টি আত্মা হইতে প্রকট হইয়া ব্যবহারদশায় উপনীত হয়; এই ব্যবহারদৃষ্টিও কল্পনা বৈ আর কিছুই নয়। সুতরাং পরমার্থপক্ষে এ বিশ্ব অবিরচিতই সত্য; তবে যে উহার বিরচন, তাহা সাগরতরঙ্গের ন্যায় স্বতই সঙ্ঘটন। বস্তুতঃ এ জগতের কেহই কর্ত্তা, ভোক্তা বা বিনাশকর্ত্তা নাই; আত্মতত্ত্ব কেবল সাক্ষিমাত্রে অবস্থিত। সেই নিরাময় আত্মার সম বা অসংক্ষুব্ধভাবে অবস্থানকালেই ঐ সকল সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রদীপ প্রজ্বলিত রহিলে আপনা হইতেই যেমন আলোক বিকাশ হয়, দিবাকরের উদয় হইলে স্বতই যেমন দিবসাগম ঘটিয়া থাকে এবং পুষ্পপুঞ্জের প্রস্ফুটনে স্বতই যেমন সৌরভ সঞ্চার হয়, এই যে জগৎ—ইহাও তেমনি স্বতই সম্পন্ন হইয়া থাকে। বিশদার্থ এই যে—আলোকের বিকাশে, দিবসের সমাগমে বা সৌরভের সঞ্চারে যেমন দীপ, দিবাকর বা পুষ্পপুঞ্জের কোনই চেষ্টা নাই, তেমনি এ জগতের সম্পাদন-ব্যাপারে কোনই ঐশ্বরিক

চেষ্টা নাই। এই যে কিছু দেখা যাইতেছে, এ সমস্তই আভাসমাত্র বৈ আর কিছুই নয়; পবনের স্পন্দনের ন্যায় উহা সৎ বা অসৎ কোনরূপেই অবস্থিত নহে।

রামচন্দ্র! পরমাত্মার সান্নিধান মাত্রেই এ জগতের উৎপত্তি; কিন্তু তিনি জাগতিক দোষে লিপ্ত নহেন। আত্মা তাদৃশ দোষে লিপ্ত না হইলেও মনে হয়, তিনিই যেন বিনষ্ট-জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এবং তিনিই যেন সৃষ্ট-জগতের বিনাশয়িতা। ফলে, গগনে যেমন তারকাস্তবকরূপ কুসুমপুঞ্জ কখন প্রস্ফুট, কখন অস্ফুট এবং কখন কখন অল্পপরিস্ফুট দৃষ্ট হয়, আত্মাতেও তেমনি এই জাগতিক ভাবরাশি কচিৎ প্রকট, কচিৎ অপ্রকট এবং কচিদপি ঈষৎ-প্রকট হইয়া থাকে। অতএব যে বস্তু আত্মার আত্মভূত নয়, তাহাই নিশ্চয় নষ্ট হয়; পরন্তু যে বস্তু আত্মার আত্মভূত, তাহার নাশ হইবে কিরূপে? যে বস্তু আত্মার আত্মভূত নয়, তাহার উৎপত্তিও অসম্ভব; আর আত্মার যাহা আত্মভূত, তাহারই উৎপত্তি অবধারিত। বলিতে পার, আত্মার যাহা আত্মভূত, তাহার আবার উদ্ভব হইবে কিরূপে? তদুত্তরে বক্তব্য, উদ্ভবাত্মক যে সত্তা, তাহা জগতে আধ্যারোপিত। এতাবতা সম্যক্ জ্ঞানোদয়ে বিচারা-লোচনা করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ব্রহ্ম পদার্থ হইতেই সর্ব্বপদার্থের অবতারণা হয়। ব্রহ্মাবতীর্ণ পদার্থপুঞ্জের অবতরণ-সমকালেই অবিদ্যার আবির্ভাব ঘটে; এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান কালক্রমে দৃঢ় হইয়া উঠে। তৎপশ্চাৎ সংসারতরু বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ঐ তরু শত সহস্র স্কন্ধে সমাকুল; শুভাশুভ বিচিত্র ফলে পরিপূর্ণ এবং বহুতর শাখাপ্রশাখায় পরিশোভিত।

রামচন্দ্র! ঐ সংসারতরু, আশাপাশে মঞ্জরিত; দারুণ দুঃখাদি উহার বিবিধ ফল; ভোগ রাশি—পল্লবনিচয়, জরাভার—কুসুমসমূহ, এবং তৃষ্ণা উহার লতাসন্ততি। গজরাজ যেমন বন্ধনস্তম্ভ হইতে মুক্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করে, তেমনি তুমিও ঐ আত্মার শৃঙ্খলস্বরূপ সংসারাখ্য বৃক্ষকে বিবেকাস্ত্রে ছেদন করিয়া মুক্তভাবে যথাসুখে বিচরণ করিতে থাক।

উনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৯ ॥

চত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! ব্রহ্মপদ হইতে কিরূপে এই জীব-নিবহের উৎপত্তি হয়? উহারা কি প্রকার এবং উহাদের সংখ্যাই বা কত? আমার নিকট ইহা সবিস্তর বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাবাহো! ব্রহ্মবস্তু হইতে যেরূপে এই ভূত-পরম্পরা উৎপন্ন হয়, যেরূপে বিলয় পায়, যেরূপে মুক্ত হইয়া থাকে এবং যেরূপে উৎপন্ন হইয়া পরিবর্দ্ধিত, অবস্থিত ও অন্তর্হিত হয়,—হে অনঘ! তাহা তোমার নিকট সংক্ষেপত কীর্ত্তন করিতেছি; শ্রবণ কর।

সর্ব্বশক্তিশালিনী বিমলা ব্রাহ্মী চিৎশক্তি যদৃচ্ছাক্রমে আপনা হইতেই অগ্রে ভাবী দেহাদিরূপে ঈষৎ পরিস্ফুরিত হইয়া চেত্য হইয়া থাকেন। অনন্তর তিনিই কিঞ্চিৎ ঘনীভূত বা অহঙ্কারে স্ফুরিত হইয়া পশ্চাৎ সঙ্কল্পবলে মন ও জীবোপাধি হইয়া থাকেন। উল্লিখিত মন সঙ্কল্প করিবামাত্র যেন ব্রাহ্মী স্থিতি পরিহার করতই গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় এই অসত্য দৃশ্যসমূহ বিস্তার করিতে থাকে। চিৎস্বরূপ স্বপ্রকাশ পরমাত্মা শূন্যাকারে অবভাসিত হইয়া যে অবস্থান করেন, তাঁহার তাৎকালিক সেই অবস্থানই দৃশ্য আকাশ আখ্যায় অভিহিত। তথাবিধ আকাশাধারে চতুর্ম্মুখাদি স্থূল-দেহের ও দক্ষ প্রজাপতি হইতে যাবতীয় ভুবনের কল্পনায় তিনি আপনাতে তৎসমস্ত অবলোকন করেন। রামচন্দ্র! এইরূপে অনন্ত ভূতসমূহ-সমন্বিত চতুর্দ্দশ ভুবনের সৃষ্টি একমাত্র চিতের স্বভাব চিত্ত হইতেই কল্পিত হইয়া থাকে। এই সৃষ্টি কেবল চিত্তমাত্রময়ী, শূন্য-স্বরূপিণী, সঙ্কল্পনগরী ও ভ্রান্তিময়ী। ব্যোমমাত্রই ইহার আকৃতি। ফলতঃ ইহা মিথ্যা বৈ আর কি? ঐ ভুবনাভ্যন্তরে কোন কোন ভূতজাতি মহামোহে আবৃত রহিয়াছে; কেহ কেহ প্রকৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়াছেন; কেহ কেহ বা মধ্যাবস্থায় অবস্থিত হইয়া মোক্ষলাভার্থ যত্ন প্রকাশ করিলেও দৃঢ়-বৈরাগ্যের অভাব নিবন্ধন পুনঃ পুন বিঘ্ন ঘটনায় অকৃতকার্য্য হইতেছে। ঐ সকল ভুবনগত ভূতজাতির মধ্যে যাহারা ভারত-ভূখণ্ডস্থ নরজাতি, তাহারাই শাস্ত্রশ্রবণের

অধিকারী এবং সমধিক বৈরাগ্যশালী; সুতরাং তাদৃশ বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তিরাই উপদেশলাভের যোগ্য পাত্র।

রামচন্দ্র! সংসারে নরজাতি বিবিধ আধি, ব্যাধি, ভয়, মোহ, দ্বেষ ও দুঃখ প্রভৃতির দ্বারা অভিভূত; তাহাদের মধ্যে যাহারা উপদেশ গ্রহণের যোগ্য, রজোগুণ বা সত্বগুণ-সম্পন্ন, তাহাদের কথা জীবাবতরণ-প্রসঙ্গে কীর্ত্তন করিব। এতদ্ভিন্ন যিনি সর্ব্বব্যাপী, নিরাময়, অনাদি, অনন্ত, জগদ্ভ্রম-বিরহিত, অমৃত ব্রহ্ম, তিনি কিরূপে চিদাভাস বা জীবরূপী হইলেন এবং নিশ্চল অর্ণবে তরঙ্গরাজির চঞ্চলতার ন্যায় কিরূপে সেই পরমাত্মার নিস্পন্দমূর্ত্তি হইলেও তদীয় সত্তার একদেশে জীবাকার স্পন্দ ঘনীভাব লাভ করিল? তাহাও তথায় বর্ণন করিব।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! অনন্ত আত্মতত্ত্বে একদেশ কাহাকে বলা হইয়া থাকে? তাঁহার বিকারিত্ব ও দ্বৈত ভাবই বা কি প্রকারে হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সেই ব্রহ্ম নিমিত্ত এই জগৎ জন্মিয়াছে; তিনিই ইহার উপাদান কারণ, ইত্যাদি যে বচনরচনা, তাহা কেবল শাস্ত্র-ব্যবহারের জন্য; পরন্তু পুরমার্থত তাহা নহে। বিকারিতা, অবয়বিতা, দিক্, সত্তা ও একদেশতা প্রভৃতি প্রত্যক্ষত উৎপন্নরূপে দৃশ্যমান হইলেও বস্তুতঃ ঈশ্বরে সে সকলের সম্ভাবনা হইতে পারে না। বলিতে পার, যদি তাঁহাতে সম্ভব না হয়, তাহা হইলে জগতের অন্য কোন একটা মূল আছে, এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তিনি ব্যতীত কোনও কল্পনান্তর নাই এবং হইবেও না। তাঁহাতে কার্য্য-কারণ ভাব ও ব্যবহার-জনিত উক্তিপরম্পরা কোথা হইতে আসিবে? যে কিছু নামনিরুক্তি, যে কিছু কল্পনা ও যে কিছু বচনরচনা, তৎসমস্তই ব্রহ্ম হইতে জাত ও তন্ময়ত্ব বশতঃ সেই পরম পদ বলিয়াই বিদিত। দেখ, বহ্নি হইতে বহ্নি উত্থিত হয়; সেই উত্থিত বহ্নি যেমন বহ্নি বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি ব্রহ্ম হইতে যাহা কিছু আবির্ভূত, তৎসমস্ত ব্রহ্ম বলিয়াই নিশ্চিত। জন্য এবং জনক উভয়ই সেই ব্রহ্ম; সুতরাং তাঁহাতে ভেদকল্পনা একেবারেই নিরস্ত। ইহা হইতে ইহা উৎপন্ন, এই যেরূপ জাগতী স্থিতি, ইহাই ক্রিয়া-শক্তির আধিক্যে জন্য ও জনক এই বিবিধরূপে ভাসমান হইয়া থাকে।

'ইহা অন্য, ইহা ভিন্ন' এবম্বিধ নাম-রূপ-ব্যবহারের বৈরূব্য কেবল বাঙ্মাত্রেই বিদ্যমান ; পরন্তু পরমাত্মায় উহা নাই। কেন নাই? তাহার কারণ এই যে, পরিচ্ছিন্নতা রহিলেই ভিন্নতার সম্ভাবনা ; কিন্তু পরমাত্মায় একটুকুও পরিচ্ছিন্নতা নাই। ক্রিয়াশক্তি-জনিত যে মনঃশক্তি, তাহা দ্বারা স্বভাবতই সংজ্ঞা বা নাম বিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং তাহারই দৃঢ় ভাবনায় অভীষ্ট ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। দেখ, একটা অগ্নিশিখা হইতে আর একটা অগ্নিশিখার আবির্ভাব হইলে,আদি অগ্নিশিখাকে যে পশ্চাদুৎপন্ন অগ্নিশিখার জনক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, এই নির্দ্দেশ—উক্তিবৈচিত্র্য মাত্র ; পরন্তু ঐরূপ ব্যবহারে যেমন সত্যতার সম্পর্কমাত্রও নাই, তেমনি পরব্রহ্ম জগদুদ্ভবের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, এরূপ বাক্যার্থও অসত্য বৈ আর কিছুই নয় ; তাহাতে জন্য-জনকাদি উক্তি একেবারেই অসম্ভব। তিনি এক ও অনন্ত ; সুতরাং কিরূপে তিনি কি উৎপাদন করিবেন? উক্তি বা বাক্যের স্বভাবই এই যে, এক বাক্য উদিত হইবার পর অপর বাক্য পরস্পর ভেদ ও দ্বিত্ব প্রভৃতি সংখ্যাবিষয়ে সম্বন্ধ হয় ; বস্তুগত্যা সেরূপ সম্বন্ধ কল্পনা মাত্র। সমুদ্রে যেমন তরঙ্গরাজি লক্ষিত হয়, পরব্রহ্মে তেমনি ভিন্ন ভিন্ন অর্থব্যঞ্জক শব্দসমষ্টি পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। মনীষিগণ তৎসমস্তকেই ব্রহ্ম বলিয়া বিদিত হইয়া থাকেন। তত্ত্বদৃষ্টিতে প্রত্যাগত্মাও ব্রহ্ম, মনও ব্রহ্ম, বিজ্ঞানবস্তুও ব্রহ্ম, এবং বুদ্ধি, বৃত্তি, ভেদ, শব্দ, অর্থ এ সকলও ব্রহ্ম। শব্দ ও অর্থ,এতদুভয়ের যোগও ব্রহ্ম। এই সমস্ত বিশ্বই ব্রহ্ম। পরন্তু সেই ব্রহ্মপদও আবার বিশ্বাতীত বলিয়া বিদিত। বস্তুগত্যা জগৎ বলিয়া কিছুই একটা নাই ; সকলই কেবল পরব্রহ্ম। আকাশস্বরূপ পরমাত্মায় 'ইহা অন্য, উহা অন্য' এবম্বিধ যে বিভাগবাক্য, ইহাতে সত্যার্থতা কি আছে? ফলতঃ ঈদৃশ উক্তি মিথ্যাজ্ঞান-জনিত বিকল্পবাদ বৈ আর কিছুই নয়। একটা অগ্নিশিখা হইতে যেমন আর একটা অগ্নিশিখার উৎপত্তি, তেমনি ব্রহ্ম হইতে এই যে মনঃসংজ্ঞার উদ্ভূতি, ইহা চাঞ্চল্য-জনিত বিকল্পেরই শক্তি ; পরন্তু ব্রহ্ম—বস্তুগত্যা নিত্যসিদ্ধ কূটস্থ, তাঁহাতে কিছুই সিদ্ধ হইবার নহে। বিকল্পজাল অসত্য ; পরন্তু ভ্রান্তিবশত উহা সত্যরূপে প্রতীত হইয়া থাকে, তমঃ দ্বারা দৃষ্টিপ্রতিঘাতই তথাবিধ ভ্রান্তির কারণ উহা দ্বিচন্দ্র-

দর্শনের অনুরূপ। সেই ব্রহ্মপদ সর্ব্বগামী ও সর্ব্বময়; তদ্ব্যতিরিক্ত আর কিছুই সম্ভব নয়। তাঁহা হইতে যাহা উৎপন্ন, তাহাও সেই ব্রহ্মই। ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুরই কোথাও উৎপত্তি নাই। এই সকলই কেবল ব্রহ্ম, ইহাই পরমার্থতা।

হে প্রাজ্ঞ! যখন তুমি ঐরূপ সিদ্ধান্তেই উপনীত হইবে, তখন তোমায় ঐ সম্বন্ধে সমস্ত বাক্যবন্ধনই বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইব। ঐ পরমার্থতায় অবিদ্যাদি কোনই ভিন্ন ক্রম নাই। যখন অজ্ঞান অপসারিত হইবে, এই সমগ্র তত্ত্বই তখন বিদিত হইতে পারিবে। যেমন নৈশ তিমির নিরাকৃত হইলে এই দৃশ্য বিশ্ব দৃষ্টিপথে পতিত হয়, তেমনি যাহা অবস্তু, তাহা ক্ষয় পাইয়া গেলে, যাহা যথার্থ বস্তু, তাহাই বিশদাকারে বিভাত হইয়া উঠিবে।

রামচন্দ্র! অজ্ঞানদূষিত দৃষ্টিবশতই তোমার নিকট এই বিশাল বিশ্ব বিকাশ পাইতেছে, যখন তোমার অজ্ঞানদৃষ্টি বিনষ্ট হইবে, তখনই তুমি নির্ম্মল দর্পণসন্নিভ পরমার্থভূত পরম পদে অবস্থান করিতে পারিবে, এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র নাই।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ব্রহ্মন্! ভবদীয় বাক্যাবলী ক্ষীরোদাব্ধির গর্ভগত সুধাকরের ন্যায় শীতল, স্বচ্ছ এবং গভীর ও বিচিত্র। আমি আপনার ঐ সকল বাক্য দ্বারা বর্ষার আতপলেশ-বিহীন বিলোলাভ্র বাসরের ন্যায় কখন অন্ধতা প্রাপ্ত হইতেছি, আবার কখন বা প্রকাশতা উপগত হইতেছি। অর্থাৎ আপনার উপদেশবচনে কখন যেন কিছু বুঝিতেছি, আবার কখন যেন মোহে মগ্ন হইয়া পড়িতেছি। আমি বুঝিতেছি না, পরব্রহ্ম হইলেন—অনন্ত, অপরিচ্ছিন্ন, পূর্ণ ও স্বতঃপ্রকাশ; তাঁহার পরমার্থস্বরূপ প্রকাশ যদি সর্ব্বদাই বিদ্যমান, তাহা হইলে তাঁহাতে পরিচ্ছেদ-কল্পনাত্মক বিকারাগম হয় কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যাহা যথাযথ বাক্যার্থ, তাহাই আমি তোমার নিকট বলিয়াছি; মদীয় বাক্যে পরস্পর আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি-রাহিত্য ঘটে নাই, মহাবাক্যের সহিত আভ্যন্তরিক বাক্যের যে সমন্বয় নাই, তাহাও নহে এবং উপক্রম ও উপসংহারের বিরোধ ঘটনাও উহাতে দেখি না; তবে কেন তোমার বোধ-ব্যাঘাত ঘটিল? যাহা হউক, যখন তোমার বিমল জ্ঞানদৃষ্টি আবির্ভূত হইবে, তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় ঘটিবে, তখনই তুমি সুস্থ হইয়া বুঝিতে পারিবে যে, ইতরদৃষ্টি অপেক্ষা মদ্বাক্য প্রযুক্ত তত্ত্বদৃষ্টির বলাবল কি প্রকার? মিথ্যাভূত বাক্যার্থরচনাও সত্য শাস্ত্রার্থ-প্রতিপাদনের হেতু হইয়া থাকে; সুতরাং পূর্ব্বে যে বচনরচনা করা হইয়াছে, তৎসমস্তই উপদেশার্হ ব্যক্তিকে উপদেশ দিবার জন্য—তাহাকে সত্য শাস্ত্রার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত; বাস্তবপক্ষে তাহা ভ্রম। আমার কথা এই, তুমি সে ভ্রমে মগ্ন হইও না। যখন তুমি সেই নিতান্ত নির্ম্মল ব্রহ্ম পদার্থ বিদিত হইতে পারিবে, তখনই তোমার বাচ্য কিম্বা বাচক শব্দার্থে ভেদজ্ঞান চলিয়া যাইবে। উপদেশার্হ ব্যক্তিকে উপদেশদানে শাস্ত্রার্থ প্রতিপন্ন করিবার জন্য এই ভেদবোধক বাক্‌প্রপঞ্চ প্রকল্পিত হইয়াছে। বাক্‌প্রপঞ্চ কল্পনা করিবার প্রয়াস হয় কেন? উত্তর এই যে, যাহারা অজ্ঞ, তাহাদেরই জ্ঞানোদয়ার্থ। পরন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের নিকট উহার পারমার্থিকতা নাই। চিত্তের বিষয়োন্মুখতা, মলিনতা বা মোহাদি কিছুই আত্মায় নাই। তিনি নির্লেপ পরম ব্রহ্ম; তিনিই এই জগদাকারে অবস্থিত।

হে অনঘ! আমি এই বিষয়টী তোমাকে সিদ্ধান্তকালে পুনরায় বিবিধ বিচিত্রহেতু প্রদর্শনপূর্ব্বক বিস্তৃতরূপে বলিব। পরস্পরের সহায়তায় সমুদিত অতুলনীয় অজ্ঞানতমঃ ভেদ করা এবং তত্ত্বজ্ঞান সাধনে যত্ন প্রকাশ করা, এই দুই ব্যাপারে উল্লিখিত বাক্‌প্রপঞ্চ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই। হে রাম! বহু জন্ম-সঞ্চিত পুণ্যরাশি দ্বারা বিশুদ্ধ অন্তঃকরণাকারে পরিণত অবিদ্যাই স্ব-শরীরের বিনাশ-বাসনায় সকল দোষাপহারিণী বিদ্যার আবির্ভাব প্রার্থনা করিয়া থাকে। ফল কথা, এরূপ ভাবনা করিও না যে, বাক্‌প্রপঞ্চ-জনিত বিদ্যা অবিদ্যা মধ্যেই গণ্য; কাজেই তাহাতে তদ্‌বিরোধী আত্মজ্ঞানের

উদয় হইবে কিরূপে ? বস্তুতঃ আত্মজ্ঞান-উদয়ের বাধা কিছুই নাই ; কেন না, চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই তাহা ঘটে। চিত্তশুদ্ধি জন্মাইবার পক্ষেও তদ্ভিন্ন উপায়ান্তর নাই এবং আত্মবোধ-পথের পথিক হইতে হইলেও চিত্ত-শুদ্ধি ভিন্ন হইবার উপায় নাই। যেমন শস্ত্র দ্বারা শস্ত্রাঘাত প্রতিহত হয়, মল দ্বারা মলক্ষালন ঘটিয়া থাকে, বিষ দ্বারা বিষ ক্ষয় হয় এবং রিপু দ্বারা রিপু বিনাশ হইয়া থাকে, তেমনি অবিদ্যা দ্বারাই অবিদ্যার ক্ষয় নিশ্চয় হয়।

রামচন্দ্র ! ঐ অবিদ্যানাম্নী মায়ার এমনি স্বভাব যে, আত্মবিনাশেও তাহার কিছুমাত্র কাতরতা নাই ; প্রত্যুত সে তাহাতে হর্ষ প্রদান করে। ঐ মায়ার স্বভাব কিছুই লক্ষ্য হয় না, উহাকে যদি দর্শন করিতে যাও, তবে উহা নষ্ট হইয়া যাইবে। বিবেক ঐ মায়ার আবরণেই আচ্ছন্ন থাকে ; উহাই জগতের জনয়িত্রী। ঐ মায়া যে কি, তাহা বুঝিয়া উঠা যায় না। এই আশ্চর্য্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে—মায়া অল-ক্ষিতভাবে স্ফুরিত হইতেছে ; কিন্তু কেহ যদি দেখিল, অমনি তাহার বিনাশ ঘটিল। এই মায়ার স্বরূপ কি, তাহা না বুঝিলেই উহা পরিস্ফুট হয়। বস্তুতঃ এই ভববন্ধনকরী মায়া বড়ই বিচিত্র। ইহা একান্ত অসত্য হইলেও অতি সত্যবৎ অনুভূত হইয়া থাকে। ঐ অক্ষরাখ্যা মায়া সেই একান্ত অভিন্ন পরম পদে বিবিধ বহুল ক্ষরাত্মক ভেদ রচনা করিয়া বিরাজ করে ; এই জন্য সেই ক্ষরাক্ষররূপ পুরুষাতীত আত্মা পুরুষোত্তম আখ্যায় অভিহিত। পরমার্থত ঐ মায়া নাই, তুমি এইরূপ প্রকৃষ্ট ভাব-নায় বিজ্ঞ হইয়া যখন আত্মার প্রকৃত স্বরূপ বিদিত হইতে পারিবে, তখনই তোমার বুদ্ধি মদীয় উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিবে। যাবৎ না তোমার প্রকৃত বোধ সমুদিত হয়, তাবৎকাল তুমি মদ্বাক্যে নিশ্চয়বান্ হও। অবিদ্যার নাস্তিত্বে তোমার দৃঢ় নিশ্চয় হউক। এই যে কিছু দৃশ্য বিশ্ব, সকলই মনের মনন মাত্র ; সুতরাং অসৎ বা অতি তুচ্ছ। অসত্তার প্রতি কারণ এই যে, মনই সেই সেই দৃশ্যাকারে বিলসিত হইতেছে। কেবল সেই ব্রহ্মই সত্য বস্তু, এবম্বিধ নিশ্চয় যাহার সমুদিত হয়, সে জন যথার্থই মোক্ষফলের ভাজন। যাহা ভাবনাময়ী চল ও অচলাকার দৃষ্টি

তাহাই সমগ্র জগদ্গত ভূতগণরূপ বিহঙ্গমের বাগুরা-বন্ধন। যে জন অতীত বা অনাগত এই দ্বিবিধ মনন ব্যাপারে 'ব্রহ্মভাবনায় ইহা সত্য এবং জগদ্ভাবনায় ইহা অসত্য' এইরূপ দৃঢ় ধারণা করিয়া লয়, কোন কিছুতেই আসক্ত হয় না এবং জগৎকে স্বপ্নভূমির ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র বলিয়া অবলোকন করে, সে কদাপি সংসারদুঃখে মগ্ন হয় না। দেহেন্দ্রিয়াদি মিথ্যা দ্বৈতভাবনায় যাহার অহংজ্ঞান বিরাজমান রহে, সে ত মিথ্যাদর্শী; তাহার অবিদ্যা অপগত হইবার নহে। জলে যেমন ধূলিরাজির অস্তিত্ব থাকিতে পারে না, পরমাত্মায় তেমনি বিকারাদি দোষরাশির অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব। জগদভ্যন্তরগত নাম ও রূপের প্রতি তত্ত্ববেদীদিগের যে তাৎকালিক সম্বন্ধ-ভাবনা, তাহা ব্যবহারার্থই উৎপন্ন; কিন্তু তৎতাবতে তাহাদের অনুরঞ্জনা নাই। বস্তুতঃ উহা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন। উল্লিখিত লোকব্যবহার প্রয়োজন হইয়া থাকে; কেন না, সূত্রবিহীন বসনের ন্যায় কথিত প্রকার ব্যবহার ব্যতীত শাস্ত্রদৃষ্টিও স্থিতিলাভ করিতে পারে না। আত্মা অবিদ্যানদীতে প্রবাহিত হইতেছেন; আত্মজ্ঞান ব্যতীত তাঁহাকে সাক্ষাৎকার করা যায় না; ঐ আত্মজ্ঞানও শাস্ত্রার্থ-সমালোচনা বিনা ঘটে না।

হে রাম! আত্মলাভ ব্যতীত ঐ অবিদ্যানদীর পরপারে কিছুতেই উপনীত হওয়া যায় না। সেই পারপ্রাপ্তিই অক্ষয় পদ বলিয়া ব্যাখ্যাত। ঐ অবিদ্যা যে কোন স্থান হইতেই উৎপন্ন হউক, উৎপন্ন হইবামাত্র আত্মাকে সে মলিন করিয়া দেয়। পরম পদের আশ্রয়েই উহার নিশ্চয় অবস্থান। ঐ অবিদ্যা কোথা হইতে জন্মিল?—হে রাম! সেরূপ বিচারে তোমার প্রয়োজন এখন নাই; পরন্তু ঐ অবিদ্যানাম্নী মায়াকে আমি কি-রূপে সংহার করিব? এই বিষয়েই তোমার অধুনা বিচার প্রবৃত্তি হউক।

হে রঘুনন্দন! যখন ঐ অবিদ্যা অস্তমিত হইবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, উহা কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? উহার আকার কি প্রকার এবং কিরূপে উহা বিনাশ প্রাপ্ত হইল? বাস্তব পক্ষে ঐ অবিদ্যা বা মায়ার অস্তিতা নাই, উহা অনবেক্ষিত হইয়াই বিভাত হয়। বস্তুতঃ যাহা অসত্য, তাহার ভ্রান্তিকে সত্য বলিয়া কি নিমিত্ত কে ধারণা করিবে? ঐ অবিদ্যা

বা মায়া আপন আকৃতি বিস্তার করিয়া দোষের জন্যই প্রৌঢ় দশা প্রাপ্ত হইতেছে; সুতরাং অগ্রে উহাকে বলপূর্ব্বক প্রশমিত কর, পশ্চাৎ উহার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। এই ত্রিজগতে যিনিই যত শূর বা যিনিই যত প্রাজ্ঞ হউন না কেন? অবিদ্যায় বিবশীকৃত হন নাই, এমন পুরুষ বিদ্যমান নাই। ঐ অবিদ্যার স্বভাব ব্যাধির সহিত উপমিত; অতএব ঐ অবিদ্যা-ব্যাধির বিনাশার্থ যত্ন প্রকাশ কর। ঐ অবিদ্যা যাহাতে তোমাকে পুনর্ব্বার জন্মদুঃখে নিপাতিত না করে, সেজন্য সতর্ক হও। জানিও,—ঐ অবিদ্যা সর্ব্বাপদের সহচরী, অজ্ঞানপাদপের মঞ্জরী এবং অনর্থ-সার্থের জননী; সুতরাং উহার তুমি একেবারেই উচ্ছেদ সাধন কর। ভয়, বিষাদ, বিপদ ও আধি প্রভৃতি সকলই ঐ অবিদ্যা হইতে আবির্ভূত হয়; উহাই হৃদবস্থিত মোহরূপ আন্ধ্যহেতু স্থূলদেহাদির অঙ্কুর। তাই বলিতেছি, তুমি বলপূর্ব্বক ঐ অবিদ্যারূপিণী কুদৃষ্টি বিদূরিত করিয়া ভবার্ণবের পরপারে উপনীত হও।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! অবিদ্যা বড়ই অতীত আধি; এ ব্যাধি প্রেক্ষামাত্রেই বিনাশ পায় এবং অসৎ হইয়াও এইরূপ হয়; উহার ঔষধ কি, তাহা বলি,—শ্রবণ কর। হে রাম! দ্বিত হইমেনের বীর্য্য-বিচারার্থ তোমার নিকট রাজসী ও সাত্ত্বিকী জাতির কথা বলিবার উপক্রম করিয়াছিলাম, অধুনা তাহা বলিতে প্রস্তুত হইয়াছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মা—সর্ব্বব্যাপী, অনাময়, অনাদি, অভ্রান্ত ও অনন্ত; যেমন সৌম্য সাগর তরঙ্গাদি ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি তদীয় চিৎ-প্রতিবিম্বস্বরূপ সোপাধিক এক দেশ হইতে চিৎস্পন্দনই ঘনত্ব উপগত হইয়া থাকে। যেমন জলধিগর্ভের জল স্পন্দ ও অস্পন্দ উভয়ভাবেই অবস্থিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি সর্ব্বশক্তিশালী ব্রহ্ম অস্পন্দস্বভাব হইলেও কচিৎ

কোথাও স্পন্দশক্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। সমীরণ যেমন গগনগাত্রে নিজেই নিজেতে প্রবাহিত হয়, তেমনি আত্মাও আত্মাতে আত্মশক্তি দ্বারাই চাঞ্চল্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। নিশ্চল প্রদীপ যেমন আপন শিখার স্পন্দশক্তি দ্বারাই ঔন্নত্য উপগত হয়, আত্মাও তেমনি আপন অঙ্গে স্পন্দশক্তি প্রকটিত করিয়া থাকেন। জলান্তরে অম্বুধি যেমন জলের হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া উঠে, সর্ব্বশক্তিশালী আত্মাও তেমনি আত্মদেহে স্পন্দবিলাসে অন্বিত হয়েন। সাগর যেমন শারদীয় সৌরাতপচ্ছটায় দ্রবীভূত কনকাকারে পরিস্ফুরিত হয়, চিদর্ণব তেমনি ইন্দ্রিয়-প্রকাশ-পরিস্পন্দে উল্লসিত হইয়া থাকেন। আকাশ অতীন্দ্রিয়, তাহা দেখা না গেলেও তাহাতে যেমন কখন কখন মুক্তার মালা দুলিতে দেখা যায়, তেমনি মহাচিদাকাশ স্বভাবতঃ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও তাহাতে জগৎস্পন্দ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সেই মহাচিদাকাশে চিৎশক্তি কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধভাব ধারণ করিলেও অর্ণবে ঊর্ম্মির ন্যায় নির্ম্মল চিন্ময়ী হইয়াই স্ফুরিত হইয়া থাকে। চিৎশক্তি আত্মা হইতে অভিন্ন হইলেও ভিন্নাকারে প্রতীত হয়। আলোক সর্ব্বসাধারণ হইলেও সূচ্যাদির ছিদ্রগত হইয়া যেমন ক্ষুদ্র একটুকু পৃথক্ আলোক বলিয়া প্রতীত হয়, ঐ চিৎশক্তিও তেমনি উপাধির অধীন হইয়া পৃথক্—পরিচ্ছিন্নভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ঐ চিৎশক্তি আপনার সর্ব্বশক্তিমত্তায় কিঞ্চিৎকাল প্রকাশ পায়; অনন্তর সুধাংশু-কলার শৈত্যপ্রকাশের ন্যায় স্বয়ং স্বীয় শক্তি প্রকাশিত করিতে থাকে। প্রকাশাখ্য চিৎশক্তি পরমাত্মা হইতে সমুদিত হয়; দেশ, কাল, ও ক্রিয়ার শক্তিও ঐ চিৎশক্তিরই অভিন্ন সহচরী। চিৎশক্তি যদি আপনার স্বভাব জানিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি অনাদি অনন্ত পরমপদেই অবস্থান করেন এবং যখন আপনার স্বভাব ভুলিয়া গিয়া আর তাহার ভাবনা করেন না, তখন ভ্রান্তিবশত কল্পিতরূপ স্বীয় স্বভাব পরিগ্রহ করিয়া 'আমি পরিচ্ছিন্ন হইয়াছি' এইরূপে স্বীয় আত্মাকে ভাবনা করিতে থাকেন। যখন ঐ কল্পিত রূপকেই তিনি পরমার্থরূপে ভাবনা করেন, তখনই নাম-সংখ্যাদি দৃশ্যপ্রপঞ্চ তাঁহার অনুগমন করে। আত্মা সৎস্বরূপ; তাঁহা হইতে যে কিছু বিভিন্ন কল্পনা, সকলই অসৎ; সুতরাং মহার্ণব

হইতে উত্থিত অনন্ত লহরী যেমন মহার্ণবই, তেমনি চিৎকল্পিত সর্ব্ব-কল্পনা সেই বিশুদ্ধ চিৎই। ভাবনার ভিন্নতায় সুবর্ণের যেমন কটক ও কেয়ূরাদিরূপে ভেদ লক্ষিত হয়, তেমনি জগদাকার ভাবনাবতী চিতি ও আত্মারও রূপভেদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এক দীপ হইতে দীপান্তরের উৎপত্তি হইলে সেই উভয় দীপের যেমন পার্থক্য; দেশ, কাল ও অবয়ব-ভেদে আত্মা ও চিদাভাসেরও পার্থক্য সেইরূপ। ঐ চিৎ যখন দেশ, কাল ও স্পন্দশক্তি দ্বারা সমুদ্দীপিত হইয়া সঙ্কল্পের অনুসরণ করেন, তখন তিনি দৃশ্য বিশ্বাকার ধারণ করিয়া থাকেন।

হে মহাবাহো! যাহা বিকল্প-কল্পনায় সাকার এবং দেশ-কাল ও ক্রিয়ার আশ্রয়, চিতের তাদৃশ রূপই ক্ষেত্রজ্ঞ আখ্যায় অভিহিত। পণ্ডিতেরা ক্ষেত্রকে শরীর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; চৈতন্য পুরুষ ঐ বাহ্য ও আভ্যন্তর শরীরকে অখণ্ডিতাকারে জ্ঞান করেন বলিয়া তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ নামে নিরূপিত হইয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রজ্ঞ বাসনার অনুধাবন করিয়া অহঙ্কারদশায় উপনীত হয়েন। অহঙ্কার যখন অধ্যবসায়বশে কল্পনান্তরে কলঙ্কী হয়, তখন সে বুদ্ধিনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধি সঙ্কল্পে কলিত হইয়া মনের পদ লাভ করে; মন তদীয় প্রগাঢ় বিকল্পে ক্রমশ ইন্দ্রিয়ভাব উপগত হইয়া থাকে। বুধগণের মতে এই ইন্দ্রিয়ই ক্রমে কর-চরণাদি-ময় দেহাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ঐ দেহ লৌকিক জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া প্রসূত, জীবিত ও মৃত হইতে থাকে। এইরূপে জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ ক্রমশ সঙ্কল্প ও বাসনা এই দুই রজ্জু দ্বারা বেষ্টিত বা বদ্ধ এবং বিবিধ দুঃখজালে বিজড়িত হইয়া চিত্তভাব লাভ করিয়া থাকে। যেমন বদরাদি ফল সকল যথাকালে পরিপক্ক হইয়া কেবল রূপ-রসাদি গুণের পরি-বর্ত্তনে পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হয়, পরন্তু আপনার আকৃতিগত কোনই বৈলক্ষণ্য উপগত হয় না, তেমনি জীব অর্থাৎ ক্ষেত্রজ্ঞও অবিদ্যা-মালিন্যের পরিণাম বশত বৈলক্ষণ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু তদীয় চিৎস্বভাব পরিণামশীল নহে, তাই তাহা একইরূপে অবস্থান করে। জীব স্বীয় সঙ্কল্পে অহম্ভাব প্রাপ্ত হয়; অহম্ভাব বুদ্ধিরূপে পর্য্যবসিত হয় এবং সেই বুদ্ধি পরে সঙ্কল্পজালময় মনোরূপে পরিণতি লাভ করিয়া থাকে।

এই সঙ্কল্পময় মনই স্ত্রীপুত্রাদি দেহাকার-ধারণে তৎপর হয় এবং তুচ্ছ ও পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে আসক্ত হইয়া পড়ে। অনন্তর সরিৎ যেমন সাগরের দিকে ধাবিত হয় এবং কামোন্মাদিনী গাভী যেমন উন্মদ গোবৃষের অনুসরণ করে, তেমনি ইচ্ছা প্রভৃতি শক্তিসমষ্টিও ঘোর নিমিত্ত চিত্তের অনুধাবন করিতে থাকে। এইরূপ শক্তিসম্পন্ন চিত্ত প্রগাঢ় অহম্ভাব প্রাপ্ত হয় এবং কোষকার কীটের ন্যায় স্বেচ্ছাক্রমেই বন্ধনদশা লাভ করে। হায়! কি পরিতাপের বিষয়! পাশ-নিয়ন্ত্রিত মৃগাদি যেমন ক্লেশানুভব করে, তেমনি আত্মাও আপন দোষেই স্বীয় সঙ্কল্পের অনুসন্ধানক্রমে এ সংসারে পরিতাপ ভোগ করিয়া থাকেন। তখন তিনি প্রকৃতই মনে করিতে থাকেন, আমি বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি; কাজেই সে কালে আর তাঁহার বিদ্যাতত্ত্ব থাকে না। তিনি তখন জগৎ-জঙ্গলের রাক্ষসী—অবিদ্যা অর্থাৎ জনন-মরণ-ভ্রান্তিকে উৎপাদন করিতে থাকেন। সেকালে ঐ আত্মরূপ মন স্বীয় সঙ্কল্পিত শব্দ-স্পর্শাদি বিষয়রাশিরূপ শুষ্কেন্ধন হইতে সমুৎপন্ন রাগাগ্নিশিখার মধ্যে পড়িয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ মৃগপতির ন্যায় একান্ত বিবশভাবে কাল কাটাইতে থাকে। সে তখন বিচিত্র বাসনা বশত বিবিধ কার্য্যপরম্পরার কর্ত্তা হয় এবং স্বেচ্ছা-বিরচিত বিবিধ অবস্থার অনুবর্ত্তনপূর্ব্বক পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অবশভাব উপগত হইয়া থাকে। উল্লিখিতরূপে এই চিত্তই মননাদি বিভিন্ন বৃত্তি অনুসারে কচিৎ মন, কচিৎ বুদ্ধি, কচিৎ ক্রিয়া, কচিৎ জ্ঞান, কচিৎ অহম্ভাব, কচিৎ পুর্য্যষ্টক অর্থাৎ পঞ্চভূত, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম, পঞ্চবায়ু ও অবিদ্যা, কচিৎ প্রকৃতি, কচিৎ মায়া, কচিৎ মালিন্য, কচিৎ কর্ম্ম, কচিৎ বন্ধন, কচিৎ চিত্ত, কচিৎ অবিদ্যা এবং কচিৎ ইচ্ছাকারে অবস্থান করেন।

হে রঘুনন্দন! ঐ সেই চিত্তই সংসারাবদ্ধ, দুঃখমগ্ন, তৃষ্ণা ও শোক-প্রাপ্ত এবং নানা রোগের আকর হইয়া বিস্তৃত হইতেছে। ঐ চিত্তই জরা, মরণ ও মোহের অন্তর্ভব ভাবনায় আহত, চেষ্টা এবং অচেষ্টায় আকুলিত ও অবিদ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া থাকে। ঐ চিত্তই কর্ম্ম-তরুগহনের অঙ্কুর এবং আপনার উৎপত্তি-নিদান আত্মপদ বিস্মৃত হইয়া অনর্থকল্পনার কারণ। কোশকার কীটের ন্যায় চিত্ত বদ্ধ হইয়া শোকাস্পদ। শব্দাদি

ক্ষত্রিয়, কেহ কেহ বৈশ্য এবং কেহ কেহ শূদ্র হইয়া জন্মিয়াছে; কোন কোন জীব শ্বপচ, কোন জীব চণ্ডাল, কেহ কেহ কিরাত, কেহ কেহ পুক্কস এবং কেহ কেহ তৃণ, ওষধি, ফল, মূল ও পতঙ্গ হইয়া অবস্থান করিতেছে; কেহ কেহ নানা লতাগুল্মময় তৃণপূর্ণ পার্ব্বত্যভূমি হইয়া রহিয়াছে; কোন কোন জীব শাল, তাল, তমাল, কদম্ব কিম্বা জম্বীর বৃক্ষ হইয়া বিরাজ করিতেছে; কেহ কেহ বিপুল বৈভবময় সংসারে মন্ত্রী, সামন্ত কিম্বা নরপতি হইয়া অবস্থান করিতেছেন; কোন কোন জীব চীরাম্বরপরিধায়ী মৌন-ব্রতাবলম্বী মুনি হইয়া রহিয়াছেন; কেহ কেহ নাগ, কেহ কেহ অজগর, কেহ কেহ কৃমিকীট, ও কেহ কেহ পিপীলিকা হইয়া বাস করিতেছে; কেহ কেহ সিংহ, কেহ কেহ মহিষ, কেহ কেহ হরিণ, কেহ কেহ ছাগ ও কেহ কেহ চামরমৃগ হইয়া বিচরণ করিতেছে; কেহ সারস, ও কেহ কেহ চক্রবাক হইয়াছে; কেহ কেহ বক এবং কেহ কেহ বা কোকিল হইয়া অবস্থান করিতেছে; কেহ কমল, কেহ কহ্লার এবং কেহ কুমুদ এবং কেহ বা উৎপল হইয়া সরোবরের শোভা সম্পাদন করিতেছে; কেহ করভ হইয়াছে; কেহ মাতঙ্গ হইয়াছে; কেহ বরাহ হইয়াছে এবং কেহ বৃষ, কেহ গর্দ্দভ, কেহ দ্বিরেফ, কেহ মশক, কেহ পতঙ্গ ও কেহ কেহ বা দংশ হইয়া অবস্থান করিতেছে; কোন কোন জীব আপদ্‌গ্রস্ত এবং কোন জীব সমৃদ্ধ; কেহ কেহ স্বর্গবাসী এবং কেহ কেহ বা নরকবাসী; কেহ নক্ষত্রলোকে বিরাজিত; কেহ তরুকোটরে অবস্থিত; কেহ কেহ বায়ুভূত এবং কেহ কেহ বা আকাশ হইয়া অবস্থিত; কেহ সৌরকিরণে বিরাজমান এবং কেহ কেহ বা সুধাংশুর অংশুপুঞ্জে বিদ্যমান; কেহ কেহ তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতির সুস্বাদু রসরূপে বিরাজিত; কেহ কেহ সর্ব্বকল্যাণ-নিলয় চিরমুক্ত এবং কেহ কেহ পরমাত্মায় পরিণত; কোন কোন জীব বহুকাল পরে মুক্ত হইয়া শিবস্বরূপে অবস্থান করিবেন; কোন কোন বিষয়লম্পট জীব আত্মকৈবল্যে বিদ্বেষ-পরায়ণ; কেহ কেহ বিশাল দিঙ্মণ্ডলরূপে-বিরাজমান; কেহ কেহ মহাবেগবতী নদী হইয়া প্রবহমাণ; কেহ কেহ রম্যাকৃতি রমণী হইয়া বিরাজমান; কেহ কেহ ক্লীব হইয়া বিদ্যমান; কোন কোন

অসত্য দৃশ্য দর্শন থাকে না, তখন তৎসমস্ত পরিহারপূর্ব্বক সত্যাধিকার প্রাপ্ত হয় এবং যথাকালে পরম পদ অধিগত হইয়া থাকে ; সে সকল জীব পুনর্ব্বার আর এ সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না। এমন অনেক মূঢ় জীব আছে, যাহারা বিবেকপদ লাভ করিয়াও সহস্র সহস্র জন্ম ভোগ করিয়া পুনরপি এই সংসার-সঙ্কটে পতিত হইয়া থাকে। কোন কোন জীব আত্মদর্শনের শক্তি প্রাপ্ত হয়, অথচ তুচ্ছ বিষয়-লাম্পট্য বোধে পুনরায় সে শক্তি হারাইয়া তির্য্যগ্‌যোনি লাভ করে এবং পরে নরকে নিপতিত হয়। কোন কোন উদারবুদ্ধি জীব ব্রহ্মপদ হইতে আবির্ভূত হইয়া একবার জন্মভোগের পরই পুনর্ব্বার সেই ব্রহ্মে গিয়া বিলীন হয়।

রামচন্দ্র! এই ব্রহ্মাণ্ডের ন্যায় অপরাপর আরও অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড আছে। সে সকল ব্রহ্মাণ্ডেও আরও কত অগণিত জীব অবস্থান করিতেছে। তাহাদের মধ্যেও কেহ কমলযোনি হইয়াছে ; কেহ হরত্ব লাভ করিয়াছে ; এবং কেহ কেহ তির্য্যগ্‌যোনিতে জন্ম লইয়াছে। কোন জীব দেবত্ব প্রাপ্ত হইতেছে ; কেহ বা হস্তী হইয়া অবস্থান করিতেছে।

রাম! তোমায় আর বিশেষ করিয়া বলিব কি? এই বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডেও যেমন যেমন দেখিতে পাইতেছ, অপরাপর ব্রহ্মাণ্ডগুলিতেও সেই সেই রূপই ঘটিতেছে। এই যেমন একটা বিশাল ব্রহ্মাণ্ড, এমনি আরও কত বিশাল বিশাল ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে। কত ব্রহ্মাণ্ড অতীত হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও আবার কত ভূরি ভূরি ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিবে। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য বিচিত্র ক্রম ও হেতু যোগেও কত অনন্ত বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটিতেছে। ঐ সকল ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কোন কোন জীব গন্ধর্ব্ব হইতেছে; কেহ যক্ষ হইতেছে; কেহ দেব হইতেছে, কেহ দানব হইতেছে। এই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে জীবগণ যে যেরূপ ব্যবহারে কাল কাটাইতেছে, অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডগুলিতেও তথাকার জীবগণ সেই সেইরূপ ব্যবহার অবলম্বনে অবস্থান করিতেছে। সাত্তিক, রাজস ও তামসাদি স্ব স্ব স্বভাবের আবেশে এবং তত্তৎ অনুকূল ব্যবহারের অভিনিবেশে উল্লিখিতরূপে কত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টি নদীর তরঙ্গরাজির ন্যায় পরিবর্ত্তিত হইতেছে। তরঙ্গিণীর তরঙ্গমালার ন্যায় একবার আবির্ভাব, একবার তিরোভাব, একবার উন্মজ্জন, একবার নিমজ্জন, এইরূপে কত অনন্ত সৃষ্টির পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। এই জীবরাশি একমাত্র পরম ব্রহ্ম হইতেই প্রতিনিয়ত নির্গত হইতেছে; কিছুতেই উহাদিগকে পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশ করা যায় না; উহারা তাঁহাতেই সম্বেদ্য এবং তাঁহাতেই পরিস্ফুরিত বা স্ফুটরূপে ব্যবহার-পরায়ণ। যেমন দীপ হইতে আলোকচ্ছটা, সূর্য্য হইতে মরীচিমালা, উত্তপ্ত লৌহ হইতে তপ্তকণা, পাবক হইতে স্ফুলিঙ্গ-ঘটা, কাল হইতে ঋতু-বিভিন্নতা, কুসুম হইতে সৌরভসুধা, বর্ষাবারির প্রবাহ হইতে তুষাররাশি এবং সমুদ্র হইতে তরঙ্গরাজি প্রাদুর্ভূত হয়, তেমনি পরম পদ হইতেই ঐ সকল জীব অনবরত উদ্ভূত হইতেছে এবং দেহপরম্পরা ভোগ করিয়া কালক্রমে পুনরায় পরম পদে বিলয় পাইতেছে। যেমন জলধিজলে অনবরত লহরীলীলা বৃথাই খেলিতেছে, বাড়িতেছে ও লয় পাইতেছে, তেমনি এই বিশাল বিতত ব্রহ্মাণ্ডরচনাদি যে কিছু মোহমায়া, সকলই ইহার সেই পরম পদে জন্মিতেছে, বাড়িতেছে ও লয় পাইয়া যাইতেছে; বাস্তবিক কিন্তু সমস্তই মিথ্যা।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৩ ॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনার কথায় বুঝিলাম, জীব-নিবহ নানা দেহ ভোগ করিয়া প্রলয়কাল আসিলে, আপনা হইতেই পরম পদে স্থিতি প্রাপ্ত হয়; পরম পদে স্থিত হইলেই মুক্ত হইয়া থাকে। জীব যদি মুক্ত হয়, তাহা হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে পুনরায় তাহার দেহ প্রাপ্তি ঘটে কিরূপে? আপনিই না বলিয়াছেন যে, পরম পদ পাইলে আর পুনরাবৃত্তি ঘটে না?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! এ সম্বন্ধে যাহা বলিবার তাহা পূর্ব্বে তোমায় বহুবার বলিয়াছি; তুমি কি তাহা বুঝিতে পার নাই? তোমার সেই পূর্ব্বাপর-বিচারক্ষম বুদ্ধি এক্ষণে কোথায় গেল? বুঝিও—এই যে শরীর প্রভৃতি ও এই যে কিছু চরাচরাত্মক জগৎ, এ সকলই আভাসমাত্র এবং সকলই মিথ্যা স্বপ্নরূপে স্ফুরিত। হে অনঘ রাম! এই সংসারকে পরমার্থরূপে দেখিতে যাও, দেখিবে—উহা একটা দীর্ঘ স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। আরও দেখিবে, যেমন দ্বিতীয় চন্দ্র এবং যেমন ভ্রান্তিদৃষ্ট শৈল, তেমনি উহা মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন। যাঁহার অজ্ঞান-নিদ্রা প্রশমিত হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত ভাবনা নিরস্ত হইয়াছে, তথাবিধ প্রবুদ্ধমনা মনুষ্য এই সংসার-স্বপ্ন দেখিয়াও দেখেন না।

রামচন্দ্র! মোক্ষপদ লব্ধ হইলেও জীবগণের এই স্বভাবকল্পিত সংসার পরমাত্মাতে সতত সূক্ষ্মাকারে লীনভাবে অবস্থান করে, অর্থাৎ মোক্ষ-পর্য্যন্তও বীজভূত পরমাত্মায় ভাবী সংসার সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান; সুতরাং মুক্তি হইবার পরও পুনর্জ্জন্ম লাভ অসম্ভব নহে। যেমন জলে আবর্ত্ত, বীজে অঙ্কুর, ও অঙ্কুরে বিস্তৃত পল্লব বিলীনভাবে বিরাজিত, তেমনি জীবের অন্তরেও চঞ্চল দেহ অবস্থিত। যেমন পল্লবে পুষ্প ও পুষ্প-কোশে ফল প্রথমতঃ অনভিব্যক্তভাবে নিহিত রহে, তেমনি কল্পনারূপ দেহও মনের অন্তরে বিরাজ করে।

হে রাঘব! যদি এরূপ মনে কর যে, তাহাতেই বা দেহের অস্তিত্ব সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? সে পক্ষে আমার কথা এই যে, মনের বহুরূপত্ব ত প্রসিদ্ধই আছে; সুতরাং তাহাতে যে বাসনাকারে দেহরূপের অস্তিত্ব নাই,-এ রূপ সম্ভাবনা হয় না। বলিতে পার, তাহা হইলে বহু শরীরই যুগপৎ জন্মে না কেন? তাহার উত্তরে বলিব, সেরূপ হইতে পারে না; কেন না, বহু দেহ বাসনারূপে একত্র অবস্থিত থাকিলেও তন্মধ্যে মনের যে কোন একটী প্রতিভাস বা দেহ পরিপক্ক কর্ম্মপরম্পরায় ব্যক্তীকৃত হয়, তাহাই কেবল কালক্রমে জন্ম গ্রহণ করে; পরন্তু সমস্ত দেহই যুগপৎ জন্মে না। ঐ মনই সেই দেহ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে উত্তম কর্ম্মের পরিপাকে উত্তম দেহই হয়। মৃৎপিণ্ডের যেমন ঘটত্ব প্রাপ্তি ঘটে, সৃষ্টির আদিতে তেমনি মনের উত্তম দেহই প্রাতিভাসিক রূপ ধারণ করে। সেই উত্তম দেহই পদ্মকোশবাসী বিভু ব্রহ্মা; এই ব্রহ্মাও মনের সঙ্কল্পসম্ভব। ইনি সৃষ্টি-ব্যাপারে যাদৃশ সঙ্কল্প লইয়া অবস্থান করেন, ঘনমায়ায় মায়ার ন্যায় তাদৃশ সঙ্কল্পক্রমেই এই পর্য্যন্ত-পরিহীন সৃষ্টিপরম্পরা স্থিতি প্রাপ্ত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! জীব অগ্রে মনঃপদ প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎ যেরূপে পদ্মযোনি-পদ প্রাপ্ত হয়, তাহা আমার নিকট বিস্তৃত-রূপে বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! কিরূপে ব্রহ্মার দেহ পরিগ্রহ হয়, তাহা শ্রবণ কর। তুমি এই ব্রাহ্ম শরীর-পরিগ্রহের নিদর্শন দ্বারাই জাগতিক স্থিতি অবগত হইতে পারিবে। দিক্ ও কালাদিরূপে যাঁহার পরিচ্ছিন্নতা নাই, তথাবিধ আত্মতত্ত্ব যে আপন শক্তিতে অবলীলায় দিক্ ও কালাদি ক্রমে পরিচ্ছিন্ন রূপ ধারণ করেন, তাদৃশ বাসনাময় রূপই কল্পনাপ্রবণ মন। মন—চঞ্চল; জীব ঐ মনেরই পর্য্যায় শব্দ মাত্র। এই মনঃশক্তি আত্মতত্ত্ব হইতে আবির্ভূত হইয়া প্রথমতঃ সৃষ্টি-কল্পনায় উন্মুখ হইয়া উঠে এবং অত্যল্প কাল মধ্যেই নির্ম্মল আকাশ-ভাবনায় ভাবিত হইয়া শব্দতন্মাত্র শ্রবণেন্দ্রিয়ত্ব কল্পনা করিয়া লয়। তাহার পর ঐ আকাশভাবনায় ভাবিত মন ক্রমশঃ ঘন-স্পন্দনে ঘনীভূত

হইয়া উঠে। পরে স্পর্শতন্মাত্র ত্বগিন্দ্রিয়ের সঙ্কল্পোন্মুখ অনিলস্পন্দের ভাবনা করিতে থাকে, তৎকালে মনের ঐ আকাশ ও অনিলভাব অপঞ্চীকৃত হওয়ায় উহার অবস্থান এতদূর সূক্ষ্ম হয় যে, উহা মনঃপরিচ্ছিন্ন চৈতন্যময় জীবের দৃষ্টিপথে পতিতই হয় না। পরে ঐরূপ শব্দ ও স্পর্শস্বরূপ আকাশ ও অনিলের উপচয় ও অভিঘাত বশতঃ অনল উদ্ভূত হয়। এই অনলরূপ তন্মাত্র দর্শনেন্দ্রিয়ের সঙ্কল্পোন্মুখ বলিয়া বিদিত। অনন্তর মন—আকাশ, অনিল ও অনল এই পদার্থত্রয়ে ঘনীভাব উপগত হইয়া প্রকাশময় বিমল আলোক-ভাবনায় ভাবিত হয়, তাহাতে আলোক উপচিত হইয়া উঠে। তৎপরেই মন—আকাশ, অনিল ও অনল, এই পদার্থত্রয়ের পরস্পর ব্যতিকরে পরিপুষ্ট হইয়া রসতন্মাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বীজভূত জলীয় ভাব ধারণ করে। অনন্তর মন উল্লিখিত আকাশ, অনিল, অনল ও জল, এই চতুর্ব্বিধ ভূতের সমবায়ে সমুপচিত হইয়া গন্ধতন্মাত্র স্থূলাকার ভাবনায় ভাবিত হয়। তাহাতেই পৃথিবীর আবির্ভাব হইয়া থাকে। তৎপশ্চাৎ ঐ মন—আকাশ, অনিল, অনল, জল ও পৃথ্বী, এই ভূতপঞ্চক-তন্মাত্রে পরিবৃত হইয়া স্বীয় সূক্ষ্ম ভাব পরিহার পূর্ব্বক ব্যোম-দেশে এক স্ফুরদগ্নি-স্ফুলিঙ্গাকার দেহ দর্শন করে। ঐ দেহ অহঙ্কার-কলায় সমন্বিত ও বুদ্ধিবীজে বিজড়িত। উহাই পুর্য্যষ্টক বা লিঙ্গ-শরীর নামে নিরূপিত। এই লিঙ্গ-শরীর ভূতগণের হৃৎপদ্মের ষট্পদ-রূপে সুশোভিত। মন ঐ লিঙ্গদেহে তীব্র সম্বেগবশে ভাস্বর বৃহৎ শরীরের ভাবনা করিতে করিতে ভাবনার পরিপাকদশায় বিল্বফলবৎ ক্রমশঃ স্থূলভাব লাভ করে। মুষানিক্ষিপ্ত গলিত হেম অর্থাৎ ছাঁচে ঢালা গালা সোনা যেমন মুষা বা ছাঁচেরই তুল্যাকারে প্রকাশিত হয়, তেমনি ঐ তেজোময় লিঙ্গশরীর তখন বিমল অম্বরে নিজ ভাবনায় বিরাজ করিয়া ক্রমশঃ ভাবনাবশে স্বীয় দৈহিক সন্নিবেশবিশেষ কল্পনা করিয়া লয় এবং ঐ তেজঃপুঞ্জময় স্বীয় সন্নিবেশ গগন ব্যাপিনী ভূয়সী ভাবনায় ভাবিত হয়; ভাবনায় উহার ঊর্দ্ধদিকে মস্তক, অধোদিকে পদদ্বয়, পার্শ্ব-ভাগে হস্তদ্বয়, এবং মধ্যভাগে উদর দেশ কল্পিত হইয়া উঠে। এইরূপে ঐ তেজঃস্ফূর্ত্তিময় লিঙ্গমূর্ত্তি বাল্যাবস্থা হইতে অঙ্গুলি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ

অঙ্গের নিষ্পাদনে প্রকটাকার হইয়া স্বীয় মনোরথ বশতঃ বৃহৎ শরীর ধারণ পূর্ব্বক বিরাজ করেন।

রামচন্দ্র! এইরূপে ঐ মনোরূপ মুনি স্বীয় বাসনার আবেশবশেই অঙ্গ কল্পনা করিয়া থাকেন। তিনি ঋতুর ন্যায় যোগ্য কালে দেহকে স্ব স্ব ভাবে উপচিত করিয়া লয়েন এবং যথাকালে বিমল দেহে প্রকাশিত হইয়া থাকেন। এ হেন আকারবান্ মনই বুদ্ধি, সত্ত্ব, বল, উৎসাহ, বিজ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যবান্ হইয়া অখিল লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই ব্রহ্মা পরমাকাশ হইতে আবির্ভূত; ইহাঁর আকৃতি দ্রবীভূত কনকাকার মনোহর; ইনি অন্যপ্রকার রূপশালী হইলেও পরমাকাশে উহাঁর যাদৃশ আত্মসত্তায় অবস্থান, তাদৃশ ব্যবহারযোগ্য সত্তা দ্বারাই ইনি চিত্তলীলায় পঞ্চীকৃত স্থূল ব্যোমাদিরূপে আত্মমোহ উৎপাদন করিয়া থাকেন। এই ব্রহ্মা কখন আত্মায় কেবল অনাদি অমধ্য অনন্ত অপার পরমাকাশ সৃষ্টি করেন, কখন অর্থাৎ দৈনন্দিন প্রলয় কালে অমল জলরাশি উৎপাদন করেন, কখন অর্থাৎ কল্পান্তে দাহকালে জ্বালাময় ভাস্বরমণ্ডল সৃষ্টি করেন, কদাচিৎ অর্থাৎ পৃথিবীসৃষ্টির পর ভূতসৃষ্টির পূর্ব্বকালে হরিতবর্ণ কাননময়ী নিখিল মহী কল্পনা করেন এবং কখন বা অর্থাৎ পাদ্মকল্পে বিষ্ণুর নাভিকমলোদ্ভব শ্যামল কমলকুট্মল সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এইরূপে বিভু ব্রহ্মা প্রত্যেক জন্মেই ভুবন, অর্ণব ও জলাদি বহু বিবিধ রূপ কল্পনা করিয়া নিজেই বিষ্ণু প্রভৃতি রূপ ধারণপূর্ব্বক হেলাক্রমে তৎসমস্ত পালন করেন।

হে রাঘব! এই অমলজ্ঞান ব্রহ্মা যখন আত্মতত্ত্বরূপ ব্রহ্মপদ হইতে সর্ব্বাগ্রে আবির্ভূত হয়েন, তখনই অজ্ঞানবশে আপনার পূর্ব্ববর্ত্তী বাস্তব রূপ ও যে কিছু দেহ-ব্যবহারাদি, সকলই বিস্মৃত হইয়া থাকেন এবং তৎকালে তিনি ব্রহ্মাণ্ডগর্ভে অথবা বিষ্ণু প্রভৃতির কুক্ষিমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক তাদৃশ বিস্মরণরূপ সুখনিদ্রায় বিভোর হইয়া পড়েন। অনন্তর যখন ঐ গর্ভনিদ্রার অবসান হয়, তখন তিনি আপনার বিপুল ভাস্বর দেহ অবলোকন করিতে থাকেন। ঐ দেহ প্রাণ ও অপান বায়ু দ্বারা প্রবাহিত, পঞ্চভূতের স্বচ্ছ ভাগে নির্ম্মিত, অগণিত রোমনিচয়ে আকীর্ণ

এবং দ্বাত্রিংশৎ দশনে সমন্বিত; উরুদ্বয় ও পৃষ্ঠাস্থি উহার স্তম্ভত্রয়, পঞ্চ প্রাণ—পঞ্চ দেবতা এবং অধোদেশ উহার চরণদ্বয়। উহা কর, চরণ, শিরঃ, বক্ষ ও উদর এই পঞ্চভাগে বিভক্ত, ও নয়টী দ্বারে বিরাজিত এবং উহার ত্বগাবরণ মসৃণ। উহার বিংশতিটী অঙ্গুলি, বিংশতিটী নখ, দুইটী বাহু, দুইটী স্তন ও দুইটী চক্ষু বিরাজমান। আবার কখন কখন স্বেচ্ছাক্রমে উহার বহু বাহু ও বহু চক্ষুও হয়। উহা চিত্তরূপ বিহঙ্গমের নীড়, তৃষ্ণা-রূপিণী পিশাচীর নিকেতন, জীবরূপ কেশরীর কন্দর, মন্মথরূপ ভুজঙ্গের বিবর, অভিমানরূপ মাতঙ্গের বন্ধনকীলক এবং মানসরূপ সরোজ দ্বারা সুশোভন।

ত্রিকালদর্শী ভগবান্ ব্রহ্মা আপনার তথাবিধ কমনীয় কায় নিরীক্ষণ করিয়া ভাবনা করেন, এই যে মধুকরবৎ নীলকান্তি অপার অনন্ত গগনকুহর বিদ্যমান, আমি যখন উৎপন্ন হই নাই, তখন ইহাতে কি ছিল? সদ্যঃসম্ভূত অমল আত্মদর্শী ব্রহ্মা এইরূপ চিন্তা করিলে তৎকালে বহু অতীত দৃষ্টিপরম্পরা তদীয় দৃষ্টিপথে নিপতিত হয়। তদনন্তর যত কিছু ধর্ম্মাধর্ম্ম, সকলই তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া উঠে। বসন্ত যেমন কুসুমসমূহ গ্রহণ করে, তেমনি তখন তিনি তদীয় চিরপরিচিত বেদচতুষ্টয় লইয়া লীলাক্রমে মনঃসঙ্কল্পজনিত বিবিধ প্রজা ও তাহাদের নানা আচার ব্যবহার কল্পনা করেন। অনন্তর ঐ সকল প্রজার ধর্ম্ম, কাম, অর্থ, স্বর্গ ও মোক্ষ সিদ্ধির নিমিত্ত তৎকর্ত্তৃক বিবিধ বিচিত্র বহু শাস্ত্র কল্পিত হয়।

রামচন্দ্র! যেমন বসন্তাগমে কুসুমশোভা সমুদিত হয়, তেমনি বিরিঞ্চিরূপ মন হইতে আবির্ভূত হইয়া এই সৃষ্টি এবম্প্রকারে স্থিতি লাভ করে। হে রঘুবংশসম্ভব! এই যে সৃষ্টিসমৃদ্ধি দৃষ্ট হইতেছে, ইহা পদ্মসম্ভব পিতামহরূপ মনের কর্ত্তৃত্বে বিবিধ বিচিত্র কৃতিত্ব-বিলাসে ও কল্পনা-পারিপাট্যে, জগতে অতুল স্থিতি লাভ করিয়াছে।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! এই জগৎ সম্পন্ন বা পরিনিষ্ঠিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে ইহা কিছুই সম্পন্ন নয়। কেননা মনের বিলসিত সমস্তই প্রতিভাস-মাত্ররূপে অবস্থিত। তদন্যথা সকলই শূন্যাকারে প্রতিভাত। যদি বল, প্রতিভাস ব্যতীত শূন্যতা হয় কেন? তদুত্তরে বক্তব্য, এই পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাণ্ড—পরম মহত্তত্ত্বরূপে প্রসিদ্ধ হইলেও আকাশরূপী। ইহা একটুকু মাত্রও প্রতিভাস-দেশ-কালের কিছুই ব্যাপিয়া থাকে না। ফল কথা, চিৎপ্রতিবিম্বই প্রতিভাস; আতপান্তরে কোটি কোটি ত্রসরেণুর অবস্থিতির ন্যায় ঐ প্রতিভাসের অভ্যন্তরেই ভূত, ভবিষ্যৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড স্ফূর্ত্তিমান্ হইয়া থাকে; সুতরাং চিৎপ্রতিবিম্বের দেশ-কাল-ব্যাপকতা ব্রহ্মাণ্ডে একেবারেই নাই। ঐ চিৎপ্রতিবিম্বের অভাবে সকলই শূন্যাকার। এই দৃশ্য বিশ্বের স্বরূপ সঙ্কল্প মাত্র এবং ইহা স্বপ্ননগরের ন্যায় প্রতিভাত। এ জগৎ যে দেশে ও যে কালে চিন্মাত্রে প্রতিভাসিত হইতেছে, তথায় গিয়া দেখ, দেখিবে—মাত্র জগদাধিষ্ঠান চিৎই বিদ্যমান; জগৎ কেবল শূন্য ব্যোমাকার মাত্র। এ জগৎ দৃশ্য হইলে অসৎ বৈ আর কিছুই নয়, ইহা ব্যোমদেশস্থ অভিত্তিগত রাগরচনময় বিচিত্র চিত্র বস্তুর ন্যায় প্রতিভাত। এ জগৎ প্রকৃত পক্ষেও অকৃত। এই দেহ হইতে ত্রিভুবনময় যাবতীয় বস্তুই মনঃকর্ত্তৃক কল্পিত। আলোক-ব্যাপারে চক্ষুর ন্যায় ঐ মনই জগতের স্মরণ বিষয়ে কারণ। এ জগৎ ঘটপটাদির ভ্রম ক্রমে আবর্ত্তিত হইতেছে; বস্তুতঃ ইহা আভাস মাত্র। সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে জগদাদি দৃশ্য বস্তুর কোন কিছুই পৃথক্ ভাবে অবস্থিত নহে; প্রত্যুত সমস্তই ব্রহ্ম মাত্র। কোশকার কীট যেমন আপনার অবস্থানার্থ কোষ বা বাসস্থান নির্ম্মাণ করে, তেমনি মন নিজেই নিজের বসতির নিমিত্ত এই শরীর রচনা করিয়াছে অর্থাৎ কোষ বিষয়ে কোশকারের ন্যায় মনই শরীরের উপাদান; মন সঙ্কল্প মাত্রেই অসত্য বস্তুর নির্ম্মাণ-শক্তি প্রাপ্ত হয়। চিত্তের যে সঙ্কল্প শূন্য বা নিরর্থক, এমন কিছুই নাই এবং যাহা অতি দুর্গম বা অতি দুষ্কর, মন এমন কিছুই পায় না বা করে না

না। ফলে মনের সঙ্কল্পে সকলই সম্ভব হয়, বস্তুতঃ মনোদেব সর্ব্বশক্তিমান্, এমন কোন্ শক্তি আছে, যাহা তাঁহাতে বিদ্যমান নাই? বলা বাহুল্য, এমন কিছুই বা কোন শক্তিই নাই, যাহা ঐ মনোগুহার অভ্যন্তর আশ্রয় করে না!

হে মহাভুজ! মন সর্ব্বশক্তি-যুক্ত ও বিভুস্বরূপ; তাহাঁতে সর্ব্বদাই সর্ব্ব পদার্থের সত্তা ও অসত্তা সম্ভব হইয়া থাকে। ভাবিয়া দেখ, ঐ মন ভাবনাবলেই আত্মজ দেহ প্রাপ্ত হইল! এই জন্য মনীষিগণের অভিমত এই যে, মনের কল্পনাই সর্ব্বশক্তিমতী; তদীয় কল্পনায় সকল শক্তিই নিহিত। সুর, অসুর কিম্বা নর কল্পনার প্রভাবে সকলেরই আবির্ভাব হয়, আবার কল্পনার অবসান হইলেই স্নেহবিহীন প্রদীপের ন্যায় উহাদের সকলেরই নির্ব্বাণ লাভ ঘটে। হে মহামতে! এই সমস্ত জগৎটাকেই তুমি একটা কল্পনামাত্রে বিলসিত, আকাশবৎ প্রতিভাত এবং দীর্ঘ স্বপ্ন-স্বরূপে সমুত্থিত বলিয়া অবলোকন কর। সত্য সত্যই এ জগতে কদাচ কিছুই জন্মে না বা মরে না। পরমার্থতঃ সমস্তই ইহার মিথ্যা; হে সুমতে! ইহার হ্রাস-বৃদ্ধি কিছুই নাই, যাহা কখন কোন বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না, তাহার আবার খণ্ডন সম্ভাবনা কি? অথচ যাহা অখণ্ড বস্তু, খণ্ডন ব্যতীত তাহার পরিচ্ছেদ হওয়াও অসম্ভব।

হে রঘুনন্দন! তোমার আপন দেহের অভ্যন্তরেই অপরিচ্ছিন্ন আত্মা বিদ্যমান; তুমি সেই আত্মদর্শনে বিমুখ হইয়া পরিচ্ছিন্ন আত্মার পরিদর্শন করত কেন বৃথা অজ্ঞের ন্যায় মুগ্ধ হইতেছ? মরুস্থলীতে সৌর করে যেমন জল ভ্রম হয়, তেমনি ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তু বস্তুগত্যা অসৎ হইলেও একমাত্র মনের নিশ্চয়েই সমুদিত দেখা যায়। এ জগতে যত কিছু আকারপরম্পরা দেখিতে পাওয়া যায়, সকলই মনোরথবৎ সমুত্থিত ও দ্বিতীয় চন্দ্রবিভ্রমের ন্যায় মিথ্যা অজ্ঞানে ঘনাকার। দ্রুতগতি নৌকার উপর আরোহণ করিয়া যাইবার সময় যেমন তীরগত অচল তরুশ্রেণীকে সচল বলিয়া ধারণা হয়, তেমনি ঐ আকারপরম্পরা বস্তুগত্যা অসত্য হইলেও নিত্যই সমুত্থিত বলিয়া মনে হয়। জানিও—এই জগৎনির্ম্মাণ যেন একটা ঐন্দ্রজালিক ব্যাপার। মায়ার মাহাত্ম্যে

ইহা সুদৃঢ় পঞ্জরবৎ বিরাজিত। ইহার নির্ম্মাণ মনেরই মননমাত্র বৈ আর কিছুই নয়; সুতরাং ইহা অসৎ হইলেও সদাকারে বিরাজমান। ফলতঃ এই সমগ্র জগৎই একাদ্বয় ব্রহ্ম। যখন সমস্তই ব্রহ্ম, তখন ইহাতে ব্রহ্ম ভিন্ন আর পদার্থান্তরের অস্তিত্ব হইবে কিরূপে? এবং সে প্রসঙ্গ কি, বা কি প্রকার? আর কোথায়ই বা তাহার পরিনিষ্ঠা? ফল কথা, ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাব সম্পূর্ণই অসম্ভব। তবে যে এই গিরি, এই স্থাণু, ইত্যাদিরূপ ভেদভ্রম অসত্য হইলেও সত্য বলিয়া লক্ষিত হয়, তাহার কারণ কেবল মনেরই দৃঢ় ভাবনা। যে ব্যক্তির বিচারবোধ নাই, তাহারই নিকট এই মনোবাসনাময় বিশ্বপ্রপঞ্চ বিশাল আকারে লক্ষিত হয়। তাই বলিতেছি,— হে রঘুনায়ক! উল্লিখিতরূপ জগদ্ভাবকে তুমি বিবেক-বলে বিদূরিত করিয়া সেই যে নিষ্প্রপঞ্চ আত্মা,তাঁহারই ভাবনায় নিরত হও। স্বপ্ন যেমন মহাড়ম্বরময় হইলেও উহা ভ্রান্তি বৈ বাস্তব কিছুই নয়, তেমনি এই যে চিত্তকল্পিত জগৎ, ইহাকেও একপ্রকার একটা দীর্ঘ স্বপ্ন বলিয়াই বুঝিও। এই দৃশ্য বিশ্ব বহুবিস্তীর্ণ বা ভোগরম্য বটে; কিন্তু উহা গ্রহণ করিতে যাও, দেখিবে—উহা অবস্তু; উহার বস্তুত্ব কিছুই নাই। তাই আবার বলি, রাম! এই যে আশারূপিণী ভুজঙ্গরাজির আবাসগর্ত্ত সংসার-বিস্তার, ইহাকে তুমি সর্ব্বথা পরিত্যাগ কর। 'এ জগৎ অসৎ' এইরূপ অবধারণ করিয়া ইহাতে কেবল ব্রহ্মভাব সন্নিবেশিত কর। দেখ, কোন প্রাজ্ঞ-জনই মরীচিকার অলীকত্ব জানিয়া-শুনিয়া জলাকাঙ্ক্ষায় তদভিমুখে ধাবিত হয়েন না। যে মূঢ়মতি মানব সঙ্কল্পস্বরূপিণী মনোরথময়ী আপাত-রম্যা ভোগশ্রীর অনুগমন করে, সে সতত দুঃখেরই পাত্র হয়। বস্তু না থাকে, লোকে অবস্তুর অনুগামী হয়—যথেচ্ছ হউক; পরন্তু বস্তু থাকিলেও যে জন তাহা পরিত্যাগ করিয়া অবস্তুর অনুগমন করে, তাহার পক্ষে বস্তু-লাভ ত ঘটেই না; পরন্তু সে বিনাশই প্রাপ্ত হয়। রজ্জুতে সর্পশঙ্কার ন্যায় এ জগৎ মনেরই ব্যামোহ বৈ আর কিছুই নয়। জগতের যে চির-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, বলিতে হইবে—একমাত্র ভাবনা বৈচিত্র্যই তাহার কারণ। দেখ, যাহা জলান্তর্গত চন্দ্রের ন্যায় চঞ্চল ও অসৎরূপে উদীয়মান, তথাবিধ বাহ্য বস্তু দ্বারা কেবল বালক জনই বঞ্চিত হয়; পরন্তু ভবাদৃশ

বিজ্ঞ জন সে সমুদায়ে প্রতারিত হইবার নহেন। যে জড় ব্যক্তি শব্দাদি গুণসঞ্জাত দেহাদির ভাবনায় বিভোর হইয়া সুখান্বেষণ করে, তাহার সেই সুখসন্ধানের চেষ্টা—মনঃকল্পিত অনল-সাহায্যে শৈত্য নিবারণ করিবার প্রয়াস পাইবারই অনুরূপ। এই যে দৃশ্যমান বিশাল জড় দেহাদি, ইহা মনের মনন-নির্ম্মিত নগরের ন্যায় অসৎ; ইহাকে সৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। এই দেহাদি জড় জগৎ চিত্তের ইচ্ছাতেই সমুদিত এবং তাহার অনিচ্ছা বা রাগক্ষয়েই বিলয় প্রাপ্ত হয়। ফলে গন্ধর্ব্ব-নগরের ন্যায় উহা বৃথাই স্ফীত দেখা যায়।

হে রাম! এই জগৎ যদি নষ্ট হয়, তবে তাহাতে কিছুই নষ্ট হয় না, এবং ইহা সমৃদ্ধ হইলেও কিছুই বৃদ্ধি পায় না। ভাবিয়া বল দেখি, যদি একটা মনঃকল্পিত বিশাল নগরী সমৃদ্ধ বা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়, তবে তাহাতে কি কাহারও কোন বৃদ্ধি বা ক্ষতি হইয়া থাকে? বালকেরা খেলিবার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্রীড়াপুত্তলী লয়; লইয়া যেমন কোনটীকে পুত্র ও কোনটীকে বা কন্যা, এইরূপ বিবিধ ব্যবহার কল্পনা করে, তেমনি মনেরই কল্পনাবশে অনবরত এ জগৎ সমুদিত হইতেছে; সুতরাং জ্ঞানী জনের ইহাতে শোক বা হর্ষের অবসর কি? ঐন্দ্রজালিকের জল-বর্ষণে বা সে জল নষ্ট হইয়া গেলে কাহারও যেমন কিছুই অনিষ্ট ঘটে না, বা নষ্ট হয় না, তেমনি এ সংসার ভ্রষ্ট হউক, নষ্ট হউক বা বৃথাই সমুত্থিত হউক, তাহাতে কাহারও কিছুই নষ্ট হইবার নহে। যাহা অসৎ বস্তু, তাহার নাশে কাহার কি ক্ষতির সম্ভাবনা আছে? বস্তুতঃ তাহা নাই। অতএব বুঝিতে হইবে, এ সংসারে হর্ষ বা বিষাদের বিষয় কিছুই একটা নাই। আর এক কথা, যাহা একান্তই অসৎ, তাহার আবার বিনাশ হইবে কি? আর নাশই যখন নাই, তখন আবার দুঃখ-শোকাদির অবসরই বা থাকে কৈ? যাহা একান্ত পক্ষে সত্য বা অবিনাশস্বভাব, তাহারও ত নাশ হইতে পারে না। বস্তুতঃ এই সমগ্র বিশ্ব-বিস্তারই একাদ্বয় ব্রহ্মস্বরূপ; ইহাতে আর সুখ-দুঃখের বিষয় কি আছে?

হে মহামতে! যাহা একান্ত পক্ষেই অসৎ, তাহার বৃদ্ধি হইবে কি প্রকার? আর বৃদ্ধিই যদি নাই, তখন আর হর্ষের প্রসঙ্গ-সঙ্গতিই বা

কিরূপ? আর এক কথা, যদি ইষ্ট লাভ ঘটে, তাহা হইলেই হর্ষ হইয়া থাকে; কিন্তু যাহা মায়াময়, তাহাতে ত ইষ্টপ্রাপ্তির সম্ভাবনাই নাই। এই প্রপঞ্চময় সংসারের সর্ব্বত্রই অসত্যতা বা অসারতার আধিপত্য; সুতরাং যাহা প্রাজ্ঞ জনের বাঞ্ছিত হইতে পারে, এ সংসারে এমন কি উপাদেয় বস্তু আছে? ফলে কিন্তু সেরূপ কিছুই নাই। আর এক কথা, এই সংসারপ্রপঞ্চ—ব্রহ্মতত্ত্বময় সত্যভূত; সুতরাং এ হেন ভুবনে এমন কি আছে, যাহা প্রাজ্ঞ জনের পরিহারযোগ্য হেয় পদার্থ? বাস্তব পক্ষে সেরূপও কিছুই নাই। তবে কথা এই, যাঁহার নিকট এই জগৎ সৎ ও অসৎ এই উভয়রূপে প্রতিভাত, তিনি কখন সুখ বা দুঃখের আশ্রয় হয়েন না; কিন্তু এই জগতে যাহার সত্যবোধ আছে, তথাবিধ মূর্খ জনই জগতের অপায়ে দুঃখানুভব করে। যাহা পূর্ব্বে কখন জন্মে নাই এবং ভবিষ্যতেও যাহার অস্তিত্ব সম্ভাবনা নাই; জানিতে হইবে—এই বর্ত্তমানেও তাহা নাই। এইরূপ বিচার করিয়াও যে ব্যক্তি অসৎ বিষয়ের বাঞ্ছা করে, তাহার অসত্তাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাহা প্রথমে সত্য এবং ভবিষ্যতেও সত্য, এই বর্ত্তমানেও তাহা সত্যস্বরূপ; যাহার নিকট সমস্তই সৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহার দৃষ্টিতে সকলই সৎ হইয়া থাকে। মনের মোহ নিমিত্ত বালকেরাই কেবল জলান্তর্গত চন্দ্র ও ব্যোমতলাদি অসত্য বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করে, পরন্তু উত্তম পুরুষেরা তাদৃশ অসত্য পদার্থে কোনই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। ফলে, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যে সত্য ও অসত্য বিষয় লইয়া আলোচনা করা হইল; তন্মধ্যে সত্য—অখণ্ড ব্রহ্ম; আর অসত্য—দেশ-কালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন জগৎ। দেশ-কাল-পরিচ্ছিন্ন সত্তা কল্পনা সমস্ত শ্রুতিযুক্তির বিরুদ্ধ এবং উহা অন্ধ-পরম্পরায় কল্পিত। ঐ সত্তাকল্পনাই সর্ব্বানর্থের মূল; সুতরাং উহা মূর্খের পক্ষেই শোভা পায়; তোমার ন্যায় বিজ্ঞের উহা কিছুতেই উচিত নয়। বালকেই বিপুলাকার নিরর্থক সামগ্রী লইয়া সন্তোষ লাভ করে, পরন্তু তাহাতে কখনই সুখোদয় হয় না; তাহা অনন্ত দুঃখেরই মূল হইয়া উঠে। অর্থাৎ ঐরূপ দুঃখ হইবার কারণ এই যে, যদি কখন প্রীতিকর সামগ্রীর অভাব ঘটে, তাহা হইলে, সে অভাবে কেবল

কষ্টই পাইতে হয়; বরং যদি পূর্ব্ব হইতেই তাহা না থাকে, তাহা হইলে আর কষ্টের সম্ভাবনা হয় না; তাই বলিতেছি, হে নলিনাক্ষ, রামচন্দ্র! তুমি তেমন বালক হইয়া রহিও না; আত্মার অবিনশ্বরত্ব অবলোকন করিয়া তুমি সেই চির স্থির পরম বস্তুরই আশ্রয় গ্রহণ কর।

হে রাম! শ্রুতিবাক্য, গুরূপদেশ, যুক্তি ও স্বীয় অনুভব দ্বারা 'আমার অর্থাৎ অহঙ্কারের সহিত এই নিখিল বিশ্বই অসৎ' এইরূপ অবধারণ করিয়া পুত্র, মিত্র ও ধনাদির অপায়ে কখনই বিষাদমগ্ন হইও না; অপিচ 'আমি এবং সমগ্র জগৎ সকলই সৎ' এইরূপ স্থির ধারণায় আত্মপ্রতিষ্ঠ হইয়া পুনরায় তুমি জনন-মরণাদি-জনিত বিষাদ প্রাপ্ত হইও না।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা কহিতেছেন, ইত্যবসরে দিবা অবসান হইল। সায়ন্তন বিধি সমাধার জন্য সূর্য্য অস্তাচলে গমন করিলেন। সভাসদ্গণ পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিয়া সায়ং স্নান করিবার জন্য সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর রাত্রি প্রভাতে রবিকর-নিকর প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় তাঁহারা সভাগৃহে সমাগত হইলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আপাতরম্য ধনে ও পুত্র-কলত্রে শোকের অবসর কি? অর্থাৎ ঐ সকলের অভাবেও শোকের কিছুই নাই। ভাবিয়া দেখ, ইন্দ্রজাল কিছু কাল দৃষ্ট হইল কিম্বা তাহা নষ্ট হইয়া গেল, তাহার জন্য আবার পরিদেবনা কি? আরও দেখ, গন্ধর্ব্বনগর দূষিত বা ভূষিত, যাহাই কেন হউক না, তাহাতেও কোনই ক্ষতি হয় কি? এইরূপ পুত্রকলত্রাদি অবিদ্যারই অংশবিশেষ; তাহা দূষিতই হউক বা ভূষিতই হউক, তাহাতেই বা সুখ দুঃখের প্রসর কিরূপ হইতে পারে? ধন-দারাদি রম্য বা সমৃদ্ধ হইলেই বা তাহাতে হর্ষের অবসর কি? আরও দেখ, মৃগতৃষ্ণা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেই বা জলার্থীদিগের আনন্দের বিষয় কি? ধন-দারাদির সমৃদ্ধি হইলে বরং দুঃখ করাই বিধেয়, পরন্তু তাহাতে সন্তোষ প্রকাশ অবৈধ।

মোহমায়া পরিবর্দ্ধিত হইলে কে সংসারে সমাশ্বাসনা প্রাপ্ত হইতে পারে? যে সকল বর্দ্ধিত ভোগে মূর্খ জনের অনুরাগ জন্মে, প্রাজ্ঞ জনের তাহাতেই বিরাগ উৎপন্ন হয়। ধন-দারাদি যে কিছু বস্তু, সমস্তই নশ্বরস্বভাব; তাহাতে আবার হর্ষের অবসর কি? প্রত্যুত যাঁহারা পরিণামদর্শী সাধু পুরুষ, তাঁহারা তাহাতে বিরাগই আশ্রয় করেন। এই জন্যই বলিতেছি,—হে রাঘব! তুমি তত্ত্বজ্ঞ হও, হইয়া সংসার-ব্যবহারে যাহা যাহা অতীত হইয়াছে, তাহার তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর এবং যেমন যেমন প্রাপ্ত হইতেছ, সেই সেইরূপ বিষয়ই ভোগ করিতে থাক। স্বভাবতঃ অপ্রাপ্ত বিষয়ের অস্পৃহা এবং যথালব্ধ বিষয়ের সম্ভোগ, ইহাই পণ্ডিতের লক্ষণ; ফল কথা, যিনি পণ্ডিত, তিনি স্বভাবতই অলব্ধ বিষয়ের লালসা পোষণ করেন না; পরন্তু যথালব্ধ বিষয়ই তাঁহার ভোগ্য হইয়া থাকে। সংসারে কামই লোকেরে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলে। সেই কামরূপ ছদ্মবেশী জিঘাংসু আততায়ী সততই গুপ্তভাবে বিচরণ করিতেছে। অতএব দেখিও, যাহাতে মোহ প্রাপ্ত না হও, এমনি ভাবে সম্বুদ্ধ হইয়া সাবধানে বিহার করিও। যাহারা নিষ্প্রপঞ্চ পরম পদে সম্যক্ জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াও প্রমাদবশতঃ এই সংসারাড়ম্বর যে একটা প্রতারণার স্থল, সে বিষয় লক্ষ্য করে না, অর্থাৎ অনবধানতায় সংসারে আবার লিপ্ত হইয়া পড়ে, সেই হতভাগ্য ব্যক্তিরা প্রকৃতই কুবুদ্ধিশালী। যে কোন-রূপ যুক্তি অবলম্বন করিয়াই হউক, দৃশ্য বস্তু হইতে যাঁহার অনুরাগ অপ-সৃত হইয়া গিয়াছে এবং যদীয় বুদ্ধি পরমার্থ পদে অভিনিবিষ্ট হইয়া নির্ম্ম-লতা প্রাপ্ত হইয়াছে, তথাবিধ জনের মতি কখনই মোহাব্ধিমধ্যে মগ্ন হয় না। 'এ সকলই অসৎ' এইরূপ স্থির ধারণায় নিখিল বাহ্য বস্তু হইতে যদীয় আস্থা নিবৃত্তি পাইয়াছে, অবাস্তবী অবিদ্যা কখনই সেই সর্ব্বজ্ঞ সাধু জনকে আয়ত্ত করিতে পারে না। নিখিল জগতে ও নিজ আত্মাতে যাহার একত্ব বোধ হইয়াছে, তদীয় বুদ্ধির আস্থা বা অনাস্থা কোন বিষয়েই নাই। তথা-বিধ বুদ্ধি কদাপি মোহার্ণবে মগ্ন হইবার নহে। যাহা ব্যক্ত ও অব্যক্তের মধ্যও বিশুদ্ধ ব্রহ্মপদ, তাহাকে তুমি অবলম্বন করিয়া অবস্থান কর; অনন্তর বাহিরের ও অভ্যন্তরের দৃশ্যনিচয় গ্রহণ বা মোচন, ইহার কোনটাই তোমার করিবার আবশ্যক নাই।

রামচন্দ্র! তুমি জাগতিক কার্য্যে তৎপর রহিয়াও একান্ত উপরতি-যুত, সর্ব্বসঙ্গ-বিরহিত, স্বস্থ, ব্যোমবৎ স্বচ্ছ ও নীরাগ হইয়া অবস্থান কর। যে কর্ম্মনিষ্ঠ বিজ্ঞ জনের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এই উভয়ের একটীও ভোগের প্রতি নাই, নলিনীদল-গত সলিলের ন্যায় তদীয় বুদ্ধি কোন বিষয়েই লিপ্ত হইবার নহে। তোমার ইন্দ্রিয়-সহকৃত মন দর্শন ও স্পর্শনাদি কার্য্য করিতে হয়—করুক, বা নাই করুক, তুমি নিরীহ ও আত্মবান্ হইয়া থাক। ভবদীয় মন ইন্দ্রিয়ার্থে অমগ্ন হউক এবং তাহাতে অমগ্ন হইয়া মমত্ব পরিহার-পূর্ব্বক কোন কিছু করিতে হয়—করুক বা নাই করুক, অনিষ্ট কিছুই নাই। হে রঘুকুলতিলক! তোমার হৃদয়ে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলি যখন অপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হইবে, বুঝিবে—তখনই তুমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছ। যখন দেখিবে—বিষয়াস্বাদে বিরতি বা ইন্দ্রিয়ার্থে অরুচি হইয়াছে, তখন তুমি দেহধারী বা বিদেহ যাহাই কেন হইয়া থাক না, তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও মুক্তি আপনা হইতেই আসিবে। রাম! তুমি কুসুম হইতে উদার সৌরভ বিশ্লেষণ করিবার ন্যায় উচ্চপদ পাইবার জন্য পরম প্রজ্ঞাবলে চিত্তকে বাসনাপুঞ্জ হইতে পৃথক্ করিয়া রাখ। এই ভবার্ণব বাসনাজলে প্লাবিত; যাঁহারা বুদ্ধিরূপ নৌকায় আরোহণ করিয়া চলিতে থাকেন, তাঁহারাই ইহার পরপারে উপস্থিত হইতে পারেন; তদ্ভিন্ন অন্য লোকে ইহাতে ডুবিয়া যায়। তুমি ক্ষুরধারনিভ সুতীক্ষ্ণ ও পরম ধীর বুদ্ধির সাহায্যে আত্মতত্ত্ব বিচার করিয়া ব্রহ্মপদে অধিষ্ঠান কর। হে রাম! তত্ত্ববেদী বুধগণ জ্ঞানবলে পূর্ণচিত্ত হইয়া যেরূপে সংসারে বিহার করিয়া থাকেন, সেইরূপে তোমার বিহার করা কর্ত্তব্য। পরন্তু মূঢ়জনের ন্যায় তোমার অবস্থান করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। যাঁহারা নিত্যতৃপ্ত, মহানুভব মহাত্মা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, তাঁহারা যেরূপ ব্যবহারের অনুসরণ করেন, তোমারও তাহারই অনুগমন করা কর্ত্তব্য; পরন্তু ভোগাসক্ত শঠ-গণের অনুষ্ঠিত ব্যবহারের অনুচিকীর্ষা তুমি কদাচ করিও না। ব্রহ্মতত্ত্ব কি, এবং জগত্তত্ত্বই বা কি, এই দুই বিষয়ে যাঁহারা অভিজ্ঞতা লাভ করি-য়াছেন, জাগতিক ব্যবহারের অভিলাষ বা পরিহার, এ উভয়ের কিছুই তাঁহারা করেন না; বস্তুতঃ সমস্তেরই অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাঁহারা

তত্ত্বদর্শী মহানুভব ব্যক্তি—কদাপি প্রভাব, প্রতিপত্তি, অভিমান, গুণ বা যশ, এ সমুদায়ের কিছুরই তাঁহারা অভিলাষী নহেন। দেখ, সূর্য্য নিতান্ত শূন্যে অবস্থান করেন, তাহাতে তিনি খিন্ন নহেন; 'চিরদিন দেবোদ্যানেই বাস করি' এরূপ ইচ্ছাও তাঁহার নাই; এবং নিয়তিনির্দ্দিষ্ট পথের ব্যতিক্রমও তিনি করেন না; এইরূপ যাঁহারা মহাপুরুষ, তাঁহারা অতি শূন্যে থাকিলেও খিন্ন নহেন, স্বর্গোদ্যানে চিরবাসের অভিলাষও তাঁহাদের নাই এবং নিয়তির নিয়ম লঙ্ঘনেও তাঁহারা সচেষ্ট নহেন। তত্ত্বজ্ঞগণের ইচ্ছা কোন বিষয়েই নাই, যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের অনুবর্ত্তনই তাঁহাদের কার্য্য; তাঁহারা বিজ্ঞান-সারথি ও মনোরূপ প্রগ্রহবান্ হইয়া সুসম্বদ্ধভাবে দেহরথে অবস্থান-পূর্ব্বক স্বস্থভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! তুমি এরূপ সন্দেহ করিও না যে, তোমারও ঐরূপ গুণোদয় হইয়াছে কি না? বস্তুতঃ তোমার সে গুণের অভাব এখন নাই। তুমিও বিপুল বিবেক লাভ করিয়াছ। হে সুন্দর! তোমার তাদৃশ প্রজ্ঞা-বলও জন্মিয়াছে; তুমি এই প্রজ্ঞাবলেই সুস্থ হইয়াছ। এক্ষণে সুস্পষ্ট জ্ঞানদৃষ্টি অবলম্বন করিয়া মান ও মাৎসর্য্য পরিহার করত ধরাপৃষ্ঠে বিহার করিতে থাক। অদূর ভবিষ্যতে তোমার পরম সিদ্ধি লাভ ঘটিবে। হে পবিত্র! তুমি স্বস্থ হও, সর্ব্বচেষ্টা পরিহার কর এবং বিষয় দর্শনের বাঞ্ছা পরিত্যাগ করিয়া অন্তরে একান্ত শীতলভাব ধারণপূর্ব্বক পরম সুখে বিহার করিতে থাক।

বাল্মীকি কহিলেন,—বিমলচেতা বশিষ্ঠের বদন-বিনির্গত ঈদৃশ উদার উপদেশ শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র তখন সহসা সম্মার্জ্জিত দর্পণের ন্যায় স্বচ্ছ ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সুমধুর জ্ঞানসুধায় তদীয় অন্তঃকরণ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তিনি পরিপূর্ণ সুধাকরের ন্যায় শীতলভাব ধারণ করিলেন।

ষট্‌চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্ সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ও সর্ব্ব-বেদ-বেদাঙ্গের পারদর্শিন্! আমি অধুনা ভবদীয় বিশুদ্ধ বাক্যে যেন আশ্বস্ত হইয়া অবস্থান করিতেছি। আমার সুস্পষ্ট উদার উপদেশবাণী এতই সুকোমল ও সুমধুর যে, ঐ সকল বহুবার শ্রবণ করিয়াও আমি তৃপ্তির অবধি প্রাপ্ত হইতেছি না। অর্থাৎ যতই শুনি, শুনিবার সাধ আর মিটে না। পূর্ব্বে আপনি সাত্ত্বিক ও রাজস এই দ্বিবিধ জীবজাতির বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রুতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রীয় প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মার যে উৎপত্তিবার্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা পুনর্ব্বার পরিস্ফুটরূপে বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ বলিলেন, রঘুবর! পূর্ব্ব পূর্ব্ব কালে বহু লক্ষ ব্রহ্মা, শত শত শঙ্কর, শত শত ইন্দ্র ও সহস্র সহস্র নারায়ণ অতীত হইয়াছেন এবং অপরাপর বহু বিচিত্র ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরায় এখনও নানাবিধ আচার ও বিচারবিশিষ্ট সহস্র সহস্র ব্রহ্মাদি দেব ও দানববৃন্দ বিহার করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আরও কত কালান্তরবর্ত্তী অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তুল্যকালে অন্যান্য বহু বিচিত্র ব্রহ্মাদি প্রাদুর্ভূত হইবেন। হে মহাভুজ! ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরায় কমলযোনি প্রভৃতি দেববৃন্দের উৎপত্তি যেন একটা ইন্দ্রজালবৎ সমুত্থিত। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-বিস্তারের অভ্যন্তরে কখন কখন কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড রুদ্র-সম্পাদিত; কখন কখন কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মা কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত, কখন কখন কতিপয় ব্রহ্মাণ্ড বিষ্ণু কর্ত্তৃক বিসৃষ্ট এবং কখন কখন কতিপয় বহ্মাণ্ড মুনিগণ কর্ত্তৃক বিনির্ম্মিত। ব্রহ্মা কদাচিৎ পদ্ম হইতে উৎপন্ন হয়েন, কখন জল হইতে জন্ম লয়েন, কোন সময়ে অণ্ড হইতে আবির্ভূত হয়েন এবং কখন বা অম্বর হইতে জন্ম গ্রহণ করেন। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে ত্রিলোচন, কোথাও ইন্দ্র এবং কোথাও কোথাও বা পুণ্ডরীকাক্ষ সূর্য্যপদে প্রতিষ্ঠিত, আবার কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে এক মাত্র ত্রিলোচনই সমস্ত দেবাধিকারে বিরাজিত। কোন কোন সৃষ্টিতে

ভূমি কেবল নিবিড়তর তরুনিচয়ে সমাকীর্ণ, কোন কোন সৃষ্টিতে নর-পরম্পরায় নীরন্ধ্র এবং কোন কোন সৃষ্টিতে কেবলই শৈলমালায় পরিব্যাপ্ত। এইরূপে কোন ভূমি মৃন্ময়ী, কোন ভূমি প্রস্তরময়ী, কোন ভূমি হেমময়ী এবং কোন কোন ভূমি তাম্রময়ী। এই বর্ত্তমান ব্রহ্মাণ্ডেও কত কত আশ্চর্য্য ব্যাপার বিদ্যমান। অন্যান্য ব্রহ্মাণ্ডও এইরূপ বহুল আশ্চর্য্যে পরিপূর্ণ। কোন কোন ব্রহ্মাণ্ড সূর্য্যাদিবৎ আলোকমালায় অলঙ্কৃত এবং কোন কোন ব্রহ্মাণ্ডে আলোকের লেশমাত্রও নাই। এই ব্রহ্মতত্ত্বরূপ মহাকাশে অম্বুধির ঊর্ম্মিমালার ন্যায় কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড উদ্ভূত হইতেছে এবং আবার নিমগ্ন হইয়া যাইতেছে। যেমন জলধিজলে তরঙ্গ, মরুস্থলীতে মৃগতৃষ্ণা এবং চূতপাদপে কুসুমরাজি বিরাজমান, তেমনি পরম ব্রহ্মেও এই বিশ্ববিস্তার বিদ্যমান। যেমন রবিরশ্মিতে এত অসংখ্য ত্রসরেণু রহিয়াছে যে, সে সকল গণনা করিয়া উঠা যায় না, তেমনি পরমব্রহ্মে যে কত অগণিত বিলোল বিশ্ববৃন্দ বিরাজিত, তাহারও ইয়ত্তা করা অসম্ভব। মশকবৃন্দ যেমন বর্ষায় বারিবর্ষণে ব্যাকুল হইয়া বারম্বার উৎপতিত ও বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি এই লোকসৃষ্টিও বারম্বার উত্থিত ও বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই সৃষ্টিপরম্পরা নিত্যই আবির্ভাব ও তিরোভাবময়ী; ইহা যে কত কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা কিছুতেই জানিবার উপায় নাই। সাগরে অনন্ত তরঙ্গরাজি সমুত্থিত হয়, ঐ সকল তরঙ্গের মধ্যে কোন্ তরঙ্গটী প্রথম, কোন্টী তাহার পরে এবং তাহারই বা পরে কোন্টী হইয়াছিল, ইহা যেমন জানিতে পারা যায় না, তেমনি সৃষ্টিপরম্পরারও আদিত্ব অবগত হওয়া অসম্ভব। তবে এইটুকু মাত্র বুঝিতে পারা যায় যে, সৃষ্টি— উৎপন্ন বস্তু; কিন্তু তাহা তরঙ্গবৎ অনাদি ব্রহ্মাণ্ডে প্রবহমাণ। এ সৃষ্টির পূর্ব্বে এইরূপ অপর সৃষ্টি ছিল, এবং তাহারও পূর্ব্বে তদনুরূপ অন্য সৃষ্টি ছিল, এইরূপ সৃষ্টিক্রম ভাবিয়া দেখিলে সৃষ্টির অনাদিত্বই উপলব্ধ হইয়া থাকে। এই সুরাসুর-নর-নিকর-সমাকুল প্রাণিসকল নদীর তরঙ্গততির ন্যায় এক এক বার উৎপন্ন হইতেছে, আবার বিলয় পাইতেছে। এই যেমন একটা ব্রহ্মাণ্ড দেখিতে পাইতেছ, বৎসরে বৎসরে ঘটিকার ন্যায় এইরূপ কত হাজার হাজার ব্রহ্মাণ্ড পরিক্ষীণ হইয়া গিয়াছে।

অদ্যাপি হৃদাকাশস্থ বিতত ব্রহ্মপদে কত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করত বিদ্যমান রহিয়াছে। আকাশে শব্দ সম্ভূত হয়; হইয়া-হইয়া তাহাতেই তাহা লয় পাইয়া যায়। এইরূপ ব্রহ্মপুর বা হৃদাকাশের শোভাভূত অপরাপর কত শত ব্রহ্ম-বিরচিত ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা ব্রহ্মে বারম্বার উদ্ভূত হইয়া তাঁহাতে আবার বারম্বার বিলীন হইয়া যাইবে। মৃৎপিণ্ডে যেমন ভাবী ঘট ও অঙ্কুরে যেমন পল্লবদল, ব্রহ্মে তেমনি ভাবিনী সৃষ্টি-পরম্পরা বিরাজমান। তত্ত্ব দর্শন দ্বারা পরিদৃষ্ট হইয়া যত কাল না অকিঞ্চনাকারে পরিণত হয়, এই বিস্ফারিত আকার ও বিকারময়ী ত্রিভুবন-লক্ষ্মী ততকালই ব্রহ্মচিদাকাশে বিরাজ করিয়া থাকে। এই জড় জন কর্ত্তৃক অধ্যস্ত বিস্তীর্য্যমাণ ব্রহ্মাণ্ডপরম্পরা ব্যোমবল্লীর ন্যায় বারম্বার উন্মগ্ন ও নিমগ্ন হইতেছে, বাস্তব পক্ষে এই সমস্ত সত্য নহে; পরন্তু মূর্খ জনের অজ্ঞতার ফলেই সত্যাকারে প্রতিভাত হয়। স্বীয় অন্তর্গত সৃষ্টিসমষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডগুলির সৃষ্টিপ্রবাহের অন্তরে যে সকল প্রাণীর অধিষ্ঠান, তাহাদের চেষ্টাচরিত্রও বিচিত্র এবং ঐ সৃষ্টিসমষ্টির আকার-বিকারও বিচিত্রাকার। তরঙ্গভঙ্গীর ন্যায় উহাদের আকার এক একবার দৃষ্ট হয়, আবার পরক্ষণেই নষ্ট হইয়া যায়। পরন্তু হে রামচন্দ্র! জল হইতে বৃষ্টির যেমন পার্থক্য নাই, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ জনের দৃষ্টিতেও ঐ সৃষ্টিসমষ্টির পারম্পরিক ভেদ-ভিন্নতা একটা কিছুই নাই। কিন্তু যাহাদের তত্ত্বদৃষ্টি নাই, তাহারা এইরূপ ধারণা করিয়া লয় যে, যেমন বারিধর হইতে বৃষ্টির সৃষ্টি হয়, ঐ সৃষ্টিসমষ্টিও তেমনি ভাবে তটস্থ ঈশ্বর হইতে সমাগত হইতেছে। বস্তুতঃ পক্ষে দেখিতে গেলে কি অজ্ঞ, কি তত্ত্বজ্ঞ, কাহারও নিকট উহা ব্যতিরিক্ত নহে। অর্থাৎ সকলেরই চক্ষে উহা একই রূপে প্রতিভাত। শাল্মলী তরুর শিরা, শাখা, পত্র, দারু, বীজ ও গ্রন্থি প্রভৃতি যেমন শাল্মলী হইতে অব্যতিরিক্ত, তেমনি ঐ বিভিন্নাকার সৃষ্টিসমষ্টিও পরস্পর হইতে পরস্পর অভিন্ন।

হে রাঘব! স্থূল ভূতারব্ধ দেহাদিতে এবং সূক্ষ্ম ভূতারব্ধ ইন্দ্রিয়াদিতে অব্যাকৃত আকাশ হইতে সমুৎপন্ন হইয়া সূক্ষ্ম ভূতাভিধেয় পঞ্চতন্মাত্ররূপ মায়ামলের মালিকার ন্যায় নিখিল বস্তু বিরাজিত হয়। কদাচিৎ অগ্রে আকাশ

স্থূলভাব ধারণ করে; পশ্চাৎ ব্রহ্মা তাহা হইতে আবির্ভূত হয়েন। এই ব্রহ্মাই আকাশজ প্রজাপতি নামে নির্দ্দিষ্ট। কদাচিৎ বায়ু প্রথমতঃ স্থূলভাবে স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়। অনন্তর ব্রহ্মা তাহা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্রহ্মাই বায়ুজ প্রজাপতি। কদাচিৎ প্রথমতঃ তেজ স্থূলভাবে স্থিতি লাভ করে; পরে তাহা হইতে বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়েন। এই ব্রহ্মাই তৈজস প্রজাপতি নামে অভিহিত। কদাচিৎ অগ্রে জল স্থূলভাব লাভ করে; তৎপরে ব্রহ্মা তাহাতে জন্ম লয়েন। এই ব্রহ্মাই বারিজ প্রজাপতি বলিয়া কথিত। কদাচিৎ পৃথ্বী স্থূলাকারে প্রকট হয়। অনন্তর ব্রহ্মা তাহাতে উৎপন্ন হয়েন; এই ব্রহ্মা পার্থিব প্রজাপতি নামে নিরুক্ত হইয়া থাকেন। ঐ ভূতপঞ্চকের মধ্য হইতে যখন যে ভূত অপর ভূত-চতুষ্টয়কে আপন অংশ উপচয়ে তিরোহিতপ্রায় করিয়া নিজে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তখন ঐ ব্রহ্মা সেই ভূত-জাত হইয়াই এই জাগতী সৃষ্টিক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন। অর্থাৎ তন্মাত্রময়ী পৃথিবী—নিজের অর্দ্ধাংশ ও অপর তন্মাত্রময় ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকটীর অষ্টমাংশ, জল—নিজ অর্দ্ধাংশ ও অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকতঃ অষ্টমাংশ, তেজ—নিজ অর্দ্ধাংশ ও অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকতঃ অষ্টমাংশ, পবন—আপন অর্দ্ধাংশ ও অপর ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকতঃ অষ্টমাংশ এবং আকাশ—আপন অর্দ্ধাংশ ও অন্যান্য ভূতচতুষ্টয়ের প্রত্যেকতঃ অষ্টমাংশ লইয়া পরিবর্দ্ধিত হয়। এইরূপেই স্থূল ভূতের উদ্ভব; অনন্তর সমুৎপন্ন প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃষ্টিক্রিয়ার প্রকটন। জল, বায়ু, বা তেজ, ইহাদের কেহ যদি কদাচিৎ অধিকাংশ-বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তখন তদুপাধি প্রজাপতি পুরুষ প্রাক্তন উপাসনা-ক্রমের অনুগত স্বভাবে ভাবিত হইয়া জলজ, বায়ুজ বা তৈজস ইত্যাদি আকারে অকস্মাৎ আপনা হইতেই সম্পন্ন হইয়া থাকেন। প্রজাপতি পঞ্চাত্মক হইলেও তাঁহার যে এই একৈক জন্মব্যপদেশ, ইহা কেবল তদীয় বিশেষত্ব ব্যাখ্যারই নিদর্শন। তাঁহার আবির্ভাবের পর কদাচিৎ তদীয় বদন হইতে, কদাচিৎ পদ হইতে, কদাচিৎ পুরোভাগ হইতে, কদাচিৎ পশ্চাদ্‌ভাগ হইতে, কদাচিৎ নেত্র হইতে এবং কখন বা হস্ত হইতে শব্দাদি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। কোন সময়ে নারায়ণাখ্য পুরুষের নাভিদেশে

পদ্ম প্রকাশ পায়; সেই পদ্মে ব্রহ্মা বৃদ্ধি পাইতে থাকেন। এই কারণ তিনি পদ্মজনামে নির্দ্দিষ্ট।

রামচন্দ্র! এই ব্রহ্মোৎপত্তি মায়া বা স্বপ্নসদৃশী ভ্রান্তি। বিলোল জলাবর্ত্তের ন্যায় আপাতত ইহাকে সুন্দরী বলা যায় বটে; কিন্তু ইহা মনঃ-কল্পিত রাজ্যের ন্যায় মিথ্যা। যদি ব্রহ্মার নিজেরই নাভিপদ্মে নিজের জন্ম সম্ভাবনা স্বীকার করিয়া না লও, তাহা হইলে বল দেখি—অসঙ্গ অদ্বয় ব্রহ্ম-পদে কি আবার দ্বিতীয় জগৎরূপ সম্ভবিতে পারে এবং কি প্রকারেই বা তাহার সম্ভাবনা হইবে? বস্তুতঃ তোমার ঐরূপ পর্য্যনুযোগ বালকের মনো-রাজ্য কল্পনার অনুযোগতুল্য নহে কি? পূর্ব্বোক্ত পদ্মযোনির উৎপত্তির ন্যায় ব্যোমজ ব্রহ্মার উৎপত্তিও মনেরই অচিন্তনীয় রচনাসামর্থ্যে হইয়া থাকে। কদাচিৎ মনেরই তত্ত্বানুরঞ্জনায় শুদ্ধ অম্বরে সৌবর্ণ ব্রহ্মাণ্ড স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হয়। কখন পুরুষ জলমধ্যে স্বীয় বীর্য্য নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতে ভূপদ্ম অথবা মহাব্রহ্মাণ্ড সমুদ্ভূত হয়। কদাচিৎ সেই অণ্ড হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন। কখন পূর্ব্বকল্পীয় ভাস্কর বর্ত্তমান কল্পে ব্রহ্মা হইয়া থাকেন। কখন বরুণ ব্রহ্মপদ লাভ করেন। কখন বায়ু ব্রহ্মা হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! ঈদৃশ বিচিত্র সৃষ্টি প্রত্যগাত্মায় অসৎস্বরূপ; ইহাতে পূর্ব্বোল্লিখিতরূপে বহু ব্রহ্মার বহু বিচিত্র উৎপত্তি হইয়া গিয়াছে। নিদর্শন-রূপে তোমার নিকট আমি একটী মাত্র প্রজাপতির উৎপত্তিবার্ত্তা ব্যক্ত করিলাম। বস্তুতঃ সৃষ্টিসম্বন্ধে কোনই একটা নিয়ম-নির্দ্দেশ নাই। এই সংসার যে কেবল মনেরই বিলসিত এবং ইহাই যে মনীষিগণের স্থির সিদ্ধান্ত, তাহাই মাত্র বুঝাইবার নিমিত্ত তোমার নিকট এই সৃষ্টিক্রম বর্ণন করিলাম। পূর্ব্বে যে সাত্ত্বিক ও রাজসিক প্রভৃতি জাতিভেদের উৎপত্তিবার্ত্তা ব্যক্ত করিয়াছি, তাহাও এইরূপেই বিদিত হইবে। তোমায় এ বিষয় বিশুদ্ধভাবে বুঝাইবার নিমিত্তও অধুনা এই সৃষ্টিক্রম কথিত হইল। জানিও—মন যত কালে না সমূলে বিলয় পাইবে, তত কাল এই সৃষ্টি বারম্বার আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতে থাকিবে। কেবল সৃষ্টি বলিয়া কথা কি, সৃষ্টি, প্রলয়, সুখ, দুঃখ, অজ্ঞত্ব, তত্ত্বজ্ঞত্ব, বন্ধ, মোক্ষ, প্রভৃতি সকলই পুনঃ পুনঃ ঘটিতেছে। প্রদীপ যেমন প্রদীপ্ত ও নির্ব্বাপিত হয়, তেমনি ভূত, ভাবী ও

বর্ত্তমান সৃষ্টিব্যাপারে ব্রহ্মার বাৎসল্য বা উন্মুখীভাব বারম্বার উদ্ভূত ও প্রশান্ত হইয়া যাইতেছে। বলিতে পার, প্রদীপের উৎপত্তি ও বিনাশের সহিত ব্রহ্মাদির দেহোৎপত্তি ও দেহ নাশ উপমিত হয় কিরূপে? প্রদীপ অল্প-কালস্থায়ী, আর ব্রহ্মাদির জীবন দ্বিপরার্দ্ধ-কালব্যাপী; সুতরাং প্রদীপ ও ব্রহ্মাদি এ উভয়ের ত কালগত পার্থক্য বিস্তর বিদ্যমান? এ ক্ষেত্রে বক্তব্য এই যে, উল্লিখিত উপমাস্থলে কালগত পার্থক্য ধর্ত্তব্য মধ্যেই নয়; পরন্তু প্রদীপ ও ব্রহ্মাদি এই উভয়ের বিনাশ ও উৎপত্তি ব্যাপারে কোনই ভেদ নাই; তাই এ উপমা সুসঙ্গতরূপেই প্রতিভাত। এই জগৎ যেন চক্রাবর্ত্তরূপে বারম্বার ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে; এইরূপে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ পুনঃ পুনঃ ঘুরিয়া আসিতেছে। যেমন প্রতি প্রভাতেই গত দিবসের ন্যায় কার্য্য সকল নিষ্পন্ন হয়, তেমনি মন্বন্তরের আরম্ভ ও কল্পপ্রবাহও পুনঃ-পুনঃ হইতেছে। পদার্থপুঞ্জ—দিন, রাত্রি, কলা, ত্রিংশৎকাষ্ঠা ও মুহূর্ত্ত প্রভৃতি দ্বারা সুঘটিত যে জৈবিক আয়ুষ্কাল, সে কালের কলনায় পরিচ্ছিন্ন হইয়া যদভ্যন্তরে অবস্থিত, তাদৃশ জগৎ ভূয়োভূয়ঃ উত্থিত হইতেছে অথচ পুনঃপুনঃ কিছুরই উত্থান হইতেছে না। মনে কর, প্রতপ্ত অয়ঃপিণ্ডে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ থাকে; ঐ অয়ঃপিণ্ড যদি শিলাদি দ্বারা আহত হয়, তাহা হইলে উহা নির্গত হইতে থাকে, এইরূপ পদার্থপুঞ্জ সতত চিদাকাশে বিদ্যমান; পরন্তু মায়াবীজের স্বভাব বশতঃ কখন উহারা প্রকট এবং কখন বা অপ্রকট হইয়া থাকে। যেমন একই তরুর অভ্যন্তরে বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন ফল পুষ্পাদি বিরাজিত, তেমনি একাদ্বয় পরমতত্ত্ব বা ব্রহ্মেই এই সমস্ত অবস্থিত। চিৎস্পন্দ সকলেরই আত্মস্বরূপ; সেই চিৎস্পন্দ বা চিৎপরিণামই এবম্বিধ বিবিধ আকার ধারণ করিয়া থাকে। যেমন নয়ন হইতে দ্বিচন্দ্রোদয় হয়, তেমনি ঐ চিৎস্পন্দ বা চিদ্‌বিবর্ত্ত হইতেই সৃষ্টির আবির্ভাব হয়। এই সৃষ্টিপ্রবাহ একমাত্র চিৎ হইতেই সমাগত হইতেছে। চন্দ্র হইতে সমুৎপন্ন মরীচিপটল যেমন চন্দ্রস্থ হইলেও চন্দ্রস্থ বলিয়া বোধ হয় না, তেমনি এই যে জগৎ-প্রপঞ্চ, ইহা সেই চৈতন্যস্থ হইলেও তাহাতে যেন অনবস্থিত বলিয়াই প্রতীত হয়।

রামচন্দ্র! এ সংসার কখনই সদাখ্যায় অভিহিত হইবার নহে; কেন না

সর্ব্বশক্তিশালী ব্রহ্মে উহা প্রতিভাত হইলেও বস্তুতঃ তাহাতে অসংসারশক্তিই বিদ্যমান। অন্যদিকে আবার সংসারকে কখনই অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না; কেন না ব্রহ্মা সর্ব্বশক্তিমান্, তাই তাঁহাতে সংসারশক্তির অসদ্ভাবও নাই। যত দিনে না মোক্ষাভিধেয় বৈজ্ঞানিক প্রলয় হয়, তত দিনই অধিষ্ঠান-চৈতন্যে সমুদ্দীপ্ত সংসারিতা ও কাল দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া এ সংসার বিদ্যমান রহিবে, তদগ্রে আর থাকিবে না। অতএব ইদানীং ইহার ব্যবহার অসঙ্গত নহে। হে মতিমন্! তত্ত্ববেদিগণের দৃষ্টিতে সমস্তই ব্রহ্মময়; সুতরাং তাহাদের নিকট সংসার যে অসৎ, ইহা ত সুসঙ্গতই বটে। পরন্তু যাহারা অজ্ঞ লোক, তাহারা ইহাকে নিরন্তর সত্য বলিয়াই মনে করে; কাজেই তাহাদের নিকট এ সংসারমায়া প্রকৃত পক্ষে মিথ্যা হইলেও নিত্যা, এরূপ বলা অসঙ্গত হইতে পারে না। তাই বলি—হে রঘুনাথ! কর্ম্মমীমাংসকেরা যে এ জগৎ পুনঃ-পুনঃ হইতেছে বলিয়া ইহাকে কদাপি অসৎ বলিয়া বোধ করেন না, তাঁহা-দের ঐ প্রকার বোধও মিথ্যা বলা যায় না। কেন না, সৃষ্টিভেদে এ জগৎ সৎ ও অসৎ উভয়রূপেই নির্দ্দিষ্ট হয়। দেখ, দিঙ্মণ্ডলে যে ক্ষণপ্রভার ক্ষণিক প্রভা-পাত পরিদৃষ্ট হয়, তাহাকে কি নিত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিব? না—তাহা নিত্য নহে—নশ্বর। এইরূপ কল্পনায় এই সমগ্র জগৎই যে নশ্বর, ইহাই কি উপপন্ন হয় না? অন্য দিকে দেখ, দিঙ্মণ্ডলে নিত্যই নিশাকর ও দিবাকরের উদয় দেখা যায় এবং অবিচল অচল প্রভৃতিও পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এইরূপ ভাবে দেখিলে সমস্ত জগৎটাই কি অবিনশ্বর বলা অসঙ্গত হয়? কখনই না। ব্রহ্মা বিরাটবপুঃ, তাঁহাতে যাহা নাই, তেমন কিছুরই অস্তিত্ব দেখা য়ায় না; সুতরাং এমন কোনও কল্পনা বা আরোপবুদ্ধিও নাই, যাহা সেই অনাখ্য ব্রহ্মে অনুপপন্ন বা অসম্ভব হইতে পারে। এই জগৎ এবং এই জগদন্তর্গত জনন, মরণ, সুখ, দুঃখ, কর্ত্তা কর্ম্ম, করণ, দিক্, ব্যোম, সাগর ও শৈলাদি সৃষ্টিপরম্পরা আকাশে অর্কপ্রভার ন্যায় পুনঃপুনঃ উৎপন্ন ও পুনঃপুনঃ বিলীন হইতেছে। পুনরায় দৈত্য, পুনরায় দেব, পুনরায় লোকান্তর, পুনরায় স্বর্গ ও অপবর্গচেষ্টা, পুনরায় ইন্দ্র, পুনরায় চন্দ্র, পুনরায় নারায়ণ, পুনরায় দানবাদি, পুনরায় চন্দ্র, সূর্য্য, বরুণ, অনল ও অনিল, এইরূপে সমস্তই পুনঃ-পুনঃ আবির্ভূত হইতেছে। উহারা কতবার যে হইয়াছে ও হইবে এবং

তিরোধান করিয়াছে ও করিবে, তাহার আর সীমা সংখ্যা নাই। এই রোদসীরূপিণী নলিনী পূর্ণ ও স্ফীতোদর হইয়া বারম্বার সমুদিত হইতেছে; সুমেরু উহার কর্ণিকা এবং সহ্যাদ্রি উহার কেশর; রবিরূপ কেশরী তাহার কিরণরূপ নখরনিকর দ্বারা তিমিররূপ করিযূথকে নিহত করিবার নিমিত্ত ব্যোমরূপ বনপ্রদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়; সুধাকর বারম্বার বায়ু-বিচালিত বিমল মঞ্জরীবৎ সুন্দর কর দ্বারা দিগঙ্গনাগণের আহ্লাদপ্রদ মুখমণ্ডলের মণ্ডনক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন। পুণ্যফল-ভাজন স্বর্গবাসীরা যেন স্বর্গীয় তরুস্বরূপ; পুণ্যক্ষয়রূপ সমীরবেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সকল তরুর ফল-কুসুমরাশি পুনঃপুনঃ পতিত হইতেছে। সৃষ্টি-কাল যেন কপিঞ্জল পক্ষী, সে তাহার কার্য্য ও ক্রিয়ারূপ পক্ষ দ্বারা সংসার রচনা আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পটপটধ্বনি করত কত কতবার চলিয়া যাইতেছে। স্বর্গধাম যেন একটা শতদল; ইন্দ্ররূপ মধুকর উহা হইতে চলিয়া যায়, আবার অপরাপর ইন্দ্ররূপ ভ্রমর আসিয়া কখন দলবলসহ এবং কখন বা একাকী স্বর্গ-শতদলে বাস করে। বিষ্ণু সাগরে শয়ন করেন; প্রলয়ের প্রভঞ্জন যেমন ধূলিপটলে সেই শয়ান বিষ্ণু সহ সাগরকে আবিল করিয়া তুলে, তেমনি এই কলি যে বারবার কতকাল সত্যপূত কালকে কলুষীকৃত করিতেছে, তাহার কোনই সংখ্যা করা যায় না। কাল যেন কুম্ভকার; সে সতত সবেগে কল্পাখ্য চক্র ভ্রামিত করিয়া বারবার তাহাতে ভূতগণরূপ শরাব সকল প্রস্তুত করিতেছে। এ জগতের শুভস্থিতি নাই; ইহা পূর্ব্বাভ্যাসের অনুগুণ সঙ্কল্পরাশি ধারণ করিয়া সংশুষ্ক কাননের ন্যায় পুনঃপুনঃ নীরসভাব প্রাপ্ত হইতেছে। পুনঃপুনঃ প্রলয়-সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহাতে এককালীন দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত হওয়ায়, ভূতবৃন্দের দেহরাশি দহনতাপে দগ্ধ হইতেছে; এই জগৎ প্রলয়প্রনষ্ট ভূতবর্গের অস্থিস্তূপে কতবার যে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভব নহে। এ জগৎ কতবার কত কুলাচলপ্রতিম পুষ্করাবর্ত্তকাদি বারিদ-বৃন্দের বারিবর্ষণে নর্ত্তন-নিরত ভব-রুদ্ররূপ ফেনপুঞ্জময় একার্ণবতা উপ-গত হইয়াছে এবং কতবার প্রশান্ত-পবন-জল ও নিখিল বস্তু-বিরহিত হইয়া এ জগৎ যে অপূর্ব্ব আকাশনিভ শূন্য হইয়া গিয়াছে, তাহারও গণনা হয় না।

এই যে দৃশ্যমান জীবনিবহ, ইহারা কতিপয় বর্ষমাত্র জীবন ধারণ করে; অনন্তর জীর্ণকলেবরে বারম্বার আত্মাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে কালান্তরে শূন্যে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মন আবার বারম্বার জগদ্বৃন্দ বিরচন করিতে থাকে। একবার সৃষ্টি, পুনরায় প্রলয়, আবার সৃষ্টি, আবার প্রলয়,—রামচন্দ্র! এইরূপেই চক্রের ন্যায় এই বিপুল বিশ্ব বিবর্ত্তিত হইতেছে। মায়ার এই মহাড়ম্বরময় দীর্ঘ ভ্রমে পতিত হইয়া বিচার দ্বারা ইহা সত্য বা ইহা অসত্য, এরূপ কিছুই নিশ্চয় করা যায় না। হে রাম! পূর্ব্বে দাশূরনামে এক মুনি ছিলেন, আমার বিবেচনায় এই সংসারচক্র তদীয় আখ্যায়িকার ন্যায় কল্পনাজালে কলিত। ফলতঃ ইহা বস্তুবর্জ্জিত; ইহাতে বাস্তব কিছুই নাই।

হে রাম! এ জগৎ, অজ্ঞান হইতে সমুদিত দ্বিচন্দ্রাকার বিবিধ বিকল্পজালে অবিরলভাবে বিস্তৃত, অসৎ কর্তৃক বিরচিত এবং অধিষ্ঠান ব্রহ্মসত্তার অনুগত; সুতরাং তোমার বিমূঢ়তা কি নিমিত্ত সমুত্থিত? ফলতঃ তুমি যে নিমিত্ত দেখিতেছ, তাহা একেবারেই নাই; যাহা আছে তাহা পরমর্থতঃ অভয় ব্রহ্মপদ বৈ আর কিছুই নয়; অতএব এই নির্নিমিত্ত মোহ কখনই সঙ্গত হয় না।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! কথা হইতে পারে, এই সংসারচক্র যদি কেবলই কল্পনামাত্র এবং একাদ্বয় ব্রহ্মই যদি বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহা হইলে যাঁহারা মেধা, প্রতিভা ও কৌশলবলে জনসমাজে মহাজনপদবী লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কৈ কেহই ত সত্য-দর্শনে সক্ষম হয়েন না, ইহার কারণ কি? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঠ লোকেরা ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগ, সুখ ও ঐশ্বর্য্য-লাভের উপায়ভুত লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া অনবরত কেবল কামই সঞ্চয় করে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতীক্ষা

তিরোধান করিয়াছে ও করিবে, তাহার আর সীমা সংখ্যা নাই। এই রোদসীরূপিণী নলিনী পূর্ণ ও স্ফীতোদর হইয়া বারম্বার সমুদিত হইতেছে; সুমেরু উহার কর্ণিকা এবং সহ্যাদ্রি উহার কেশর; রবিরূপ কেশরী তাহার কিরণরূপ নখরনিকর দ্বারা তিমিররূপ করিযূথকে নিহত করিবার নিমিত্ত ব্যোমরূপ বনপ্রদেশ আক্রমণ করিতে উদ্যত হয়; সুধাকর বারম্বার বায়ু-বিচালিত বিমল মঞ্জরীবৎ সুন্দর কর দ্বারা দিগঙ্গনাগণের আহ্লাদপ্রদ মুখমণ্ডলের মণ্ডনক্রিয়া সমাধা করিয়া থাকেন। পুণ্যফল-ভাজন স্বর্গবাসীরা যেন স্বর্গীয় তরুস্বরূপ; পুণ্যক্ষয়রূপ সমীরবেগে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঐ সকল তরুর ফল-কুসুমরাশি পুনঃপুনঃ পতিত হইতেছে। সৃষ্টি-কাল যেন কপিঞ্জল পক্ষী, সে তাহার কার্য্য ও ক্রিয়ারূপ পক্ষ দ্বারা সংসার রচনা আরম্ভ করিয়া কিঞ্চিৎ কাল পটপটধ্বনি করত কত কতবার চলিয়া যাইতেছে। স্বর্গধাম যেন একটা শতদল; ইন্দ্ররূপ মধুকর উহা হইতে চলিয়া যায়, আবার অপরাপর ইন্দ্ররূপ ভ্রমর আসিয়া কখন দলবলসহ এবং কখন বা একাকী স্বর্গ-শতদলে বাস করে। বিষ্ণু সাগরে শয়ন করেন; প্রলয়ের প্রভঞ্জন যেমন ধূলিপটলে সেই শয়ান বিষ্ণু সহ সাগরকে আবিল করিয়া তুলে, তেমনি এই কলি যে বারবার কতকাল সত্যপূত কালকে কলুষীকৃত করিতেছে, তাহার কোনই সংখ্যা করা যায় না। কাল যেন কুম্ভকার; সে সতত সবেগে কল্পাখ্য চক্র ভ্রামিত করিয়া বারবার তাহাতে ভূতগণরূপ শরাব সকল প্রস্তুত করিতেছে। এ জগতের শুভস্থিতি নাই; ইহা পূর্ব্বাভ্যাসের অনুগুণ সঙ্কল্পরাশি ধারণ করিয়া সংশুষ্ক কাননের ন্যায় পুনঃপুনঃ নীরসভাব প্রাপ্ত হইতেছে। পুনঃপুনঃ প্রলয়-সঙ্ঘটন হইতেছে, তাহাতে এককালীন দ্বাদশ দিবাকর সমুদিত হওয়ায়, ভূতবৃন্দের দেহরাশি দহনতাপে দগ্ধ হইতেছে; এই জগৎ প্রলয়প্রনষ্ট ভূতবর্গের অস্থিস্তূপে কতবার যে শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা সম্ভব নহে। এ জগৎ কতবার কত কুলাচলপ্রতিম পুষ্করাবর্ত্তকাদি বারিদ-বৃন্দের বারিবর্ষণে নর্ত্তন-নিরত ভব-রুদ্ররূপ ফেনপুঞ্জময় একার্ণবতা উপ-গত হইয়াছে এবং কতবার প্রশান্ত-পবন-জল ও নিখিল বস্তু-বিরহিত হইয়া এ জগৎ যে অপূর্ব্ব আকাশনিভ শূন্য হইয়া গিয়াছে, তাহারও গণনা হয় না।

এই যে দৃশ্যমান জীবনিবহ, ইহারা কতিপয় বর্ষমাত্র জীবন ধারণ করে; অনন্তর জীর্ণকলেবরে বারম্বার আত্মাতে বিলয় প্রাপ্ত হয়। তৎপরে কালান্তরে শূন্যে গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় মন আবার বারম্বার জগদ্বৃন্দ বিরচন করিতে থাকে। একবার সৃষ্টি, পুনরায় প্রলয়, আবার সৃষ্টি, আবার প্রলয়,—রামচন্দ্র! এইরূপেই চক্রের ন্যায় এই বিপুল বিশ্ব বিবর্ত্তিত হইতেছে। মায়ার এই মহাড়ম্বরময় দীর্ঘ ভ্রমে পতিত হইয়া বিচার দ্বারা ইহা সত্য বা ইহা অসত্য, এরূপ কিছুই নিশ্চয় করা যায় না। হে রাম! পূর্ব্বে দাশূরনামে এক মুনি ছিলেন, আমার বিবেচনায় এই সংসারচক্র তদীয় আখ্যায়িকার ন্যায় কল্পনাজালে কলিত। ফলতঃ ইহা বস্তুবর্জ্জিত; ইহাতে বাস্তব কিছুই নাই।

হে রাম! এ জগৎ, অজ্ঞান হইতে সমুদিত দ্বিচন্দ্রাকার বিবিধ বিকল্পজালে অবিরলভাবে বিস্তৃত, অসৎ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং অধিষ্ঠান ব্রহ্মসত্তার অনুগত; সুতরাং তোমার বিমূঢ়তা কি নিমিত্ত সমুত্থিত? ফলতঃ তুমি যে নিমিত্ত দেখিতেছ, তাহা একেবারেই নাই; যাহা আছে তাহা পরমর্থতঃ অভয় ব্রহ্মপদ বৈ আর কিছুই নয়; অতএব এই নির্নিমিত্ত মোহ কখনই সঙ্গত হয় না।

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৭ ॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! কথা হইতে পারে, এই সংসারচক্র যদি কেবলই কল্পনামাত্র এবং একাদ্বয় ব্রহ্মই যদি বস্তুতঃ বিদ্যমান, তাহা হইলে যাঁহারা মেধা, প্রতিভা ও কৌশলবলে জনসমাজে মহাজনপদবী লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কৈ কেহই ত সত্য-দর্শনে সক্ষম হয়েন না, ইহার কারণ কি? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, শঠ লোকেরা ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগ, সুখ ও ঐশ্বর্য্য-লাভের উপায়ভূত লৌকিক ও বৈদিক কাম্য কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া অনবরত কেবল কামই সঞ্চয় করে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রতীক্ষা

তাহারা কিছুই করে না; এই কারণেই তাহাদের সত্য দর্শন ঘটিয়া উঠে না। যাঁহারা বুদ্ধির পরপার প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং ইন্দ্রিয়গ্রাম যাঁহাদিগকে বশীভূত করিতে পারে নাই, তাঁহারাই করগত বিল্বফলের ন্যায় এই জাগতী মায়ার তত্ত্ব দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকেন। জীব বিচারবান্ হইয়া ঐ জাগতী মায়াকে তুচ্ছরূপে দর্শন করেন এবং ভুজঙ্গ যেমন কঞ্চুক পরিহার করে, তেমনি তিনি ঐ অহঙ্কারময়ী মায়াকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! উল্লিখিত মায়া-পরিহারী জীব সংসারে থাকিয়াও অনন্তর অনাসক্তভাবে কালাতিপাত করেন; এই নিমিত্ত যেমন দগ্ধ বীজ আর জন্মে না, তেমনি তাঁহাকেও আর জন্ম লইতে হয় না। যাহারা চিরদিন অজ্ঞতা লইয়াই অবস্থান করে, এই যে আধি-ব্যাধি-সমাকুল অচির-বিনশ্বর শরীর, ইহারই নিমিত্ত তাহারা সমস্ত যত্ন নিয়োগ করে; পরন্তু আত্মার নিমিত্ত তাহাদের কিছুই যত্ন নাই। তোমায় বলি,—তুমি অজ্ঞের ন্যায় ঐ অজ্ঞ-শরীরের সমীহিত সাধনে প্রয়াস পাইও না; জানিবে—সে প্রয়াস দুঃখ-ভোগেরই নিমিত্ত। অতএব তুমি আত্মতৎপর বা আত্মনিষ্ঠ হইয়াই অবস্থান কর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! এই যে স্বখার্থ-রচিত সংসারচক্রিকা, ইহাকে আপনি দাশূরমুনির আখ্যায়িকার ন্যায় কাল্পনিক ও বস্তুশূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এক্ষণে বলুন—সেই আখ্যায়িকা কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! জাগতিক মায়ার স্বরূপ বর্ণন-ব্যপদেশে আমি তোমার নিকট দাশূরমুনির আখ্যায়িকা বর্ণন করিতেছি। তুমি ইহা শ্রবণ কর। এই মহীমণ্ডলে মগধনামে এক বিখ্যাত বিশাল জনপদ আছে। উহা নানাজাতীয় কুসুমসমূহে সমলঙ্কৃত, মহীরুহগণে পরিব্যাপ্ত এবং সমৃদ্ধিশোভায় সমুদ্ভাসিত। উহার জঙ্গলদেশে কত শত কদম্ব-কানন বিরাজমান। সে কানন বিচিত্র বিহগাবলীর নিকেতন। সুতরাং ঐ জনপদ যেন যাবতীয় চমৎকারিত্ব ও মনোহারিত্বের নিদর্শন। উহার সীমান্ত-দেশে স্তূপীকৃত শস্যসম্ভার বিদ্যমান এবং পুর ও নগরগুলি উপবনশোভায় সমুজ্জ্বল। ঐ জনপদের নদীতটগুলি কমল, উৎপল ও কহ্লারদলে সমাকুল। উহার উপবনমধ্যস্থ দোলাবিলাসিনী কামিনীকুলের কণ্ঠঝঙ্কার একান্তই

মনোহর। ঐ জনপদে নিশাকালে কত কুসুম উপভুক্ত হইয়া ম্লান হয় এবং সেই সকল কুসুমরাশি কন্দর্পের শরনিকরের ন্যায় পৃথ্বীতল সমাকীর্ণ করিয়া বিরাজ করিতে থাকে। ঐ জনপদের এক দিকে এক গিরিতট বিদ্যমান। উহা কার্ণিকার-কুসুমময় ঘন-সন্নিবিষ্ট কদলীবনে এবং কদম্ব-গুল্মাদি বিবিধ কাননে সুশোভন; উহার তলদেশ বাতাহত কুসুমসমূহের কেশরের পরাগ-পটলে অরুণিত ধূলিজালময়-রূপে প্রতিভাত। তথায় কত স্থানে কত কারণ্ডব ও সানুরাগ সারস-রব পরিশ্রুত। ঐ পবিত্র গিরিবর বিটপিকুলে সমাকুল। সেই সকল বিটপী বিবিধ বিচিত্র বিহগ-শ্রেণীর আশ্রয়স্থল। তত্রত্য গিরিতটস্থ কোন এক কদম্বতরুর স্কন্ধোপরি পূর্ব্বে দাশূরনামে জনৈক মহামতি মুনি বাস করিতেন। তাঁহার বিষয়ানু-রাগ ছিল না; তিনি পরম ধর্ম্মাত্মা ও মহাতপা ছিলেন। তপস্যা ও যোগা-বলম্বনে তাঁহার কালাতিপাত হইত।

রামচন্দ্র এই সময় জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! কি নিমিত্ত ঐ তপস্বী বিপিনে বাস করিতেন? আর তিনি একটা বৃহৎ কদম্বতরুর পৃষ্ঠেই বা বাস করিতেন কেন?

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রাম! সুপ্রসিদ্ধ শরলোমা ঋষি, দাশূরমুনির পিতা ছিলেন। তিনি যেন দ্বিতীয় ব্রহ্মারই ন্যায় ঐ গিরিতেই বাস করিতেন। সুর-গুরু বৃহস্পতির যেমন একমাত্র পুত্র কচ, তেমনি ঐ ঋষি-শরলোমারও এক-মাত্র সন্তান দাশূর। ঋষি শরলোমা তাঁহার এই একমাত্র পুত্র দাশূরকে লইয়া স্বীয় জীবিতকাল অরণ্যবাসেই অতিপাতিত করেন। তিনি জাগতিক সুখদুঃখ-ভোগে বহুকাল অতিবাহিত করিয়া অনন্তর দেহ-ত্যাগান্তে সুরসদনে সমুপনীত হইলেন। মনে হইল, পক্ষী যেন একটা কুলায় ছাড়িয়া কুলায়ান্তরে প্রস্থান করিল।

পিতার পরলোক-প্রাপ্তির পর দাশূর তখন একাকী সেই কাননমধ্যে কুররের ন্যায় করুণকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন। মাতা এবং পিতা উভয়েই পরলোকে উপনীত হইয়াছেন; কাজেই তাঁহাদের বিয়োগদুঃখে দাশূরের হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি হৈমন্তিক কমলের ন্যায় শোক-সন্তাপে ম্লানকান্তি ধারণ করিলেন।

এইরূপই চঞ্চল।

হয়। হে মুনে! ব্যবহার-দৃষ্টিতে দেখিলে ...

বস্তু, এমন কি ব্রহ্মাদি দেহীদিগকেও বিনাশদশায় পা...

এ বিষয়ে সংশয়ের অবসর কিছুমাত্র নাই। তাই বলিতেছি, তুমি তো...

পিতার মৃত্যুতে বৃথা বিষাদভার বহন করিও না। ভাবিয়া দেখ, যেমন উদয়ের পর সূর্য্যদেবের অস্তগমন, তেমনি জন্মিবার পর জীবদিগের অবশ্যই মরণ-সঙ্ঘটন; সুতরাং ইহাতে বিষাদের বিষয় কি?

ঋষিকুমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। অনব[illegible]ক নেত্র তাঁহার রক্তাভ হইয়াছিল। তিনি ঐ বিদেহ-বাণী শ্রব[illegible]-নাদে ময়ূরের ন্যায় ধৈর্য্য ধারণ করিলেন। তাঁহার মনের অবসাদ অপগত হইল। তিনি গাত্রোত্থান করিয়া সাদরে পুত্রের অবশ্যকর্ত্তব্য পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিলেন এবং তদনন্তর পরমপদ-লাভলালসায় তপস্যাচরণে মনকে স্থিরভাবে নিবিষ্ট করিয়া রাখিলেন। ঋষিকুমার ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানে বা বেদার্থ-বিচারে ব্যাপৃত হইয়া বিপিনবাসে বহুদিন বহু তপস্যা করিলেন। ক্রমে তাঁহার এবম্বিধ শ্রোত্রিয়তা-প্রাপ্তি ঘটিল যে, ইহা শুদ্ধ, ইহা অশুদ্ধ, ইত্যাদি প্রচুরতর কল্পনাজালে তাহা জড়িত হইয়া পড়িল। শ্রোত্রিয়তায় পবিত্রতা জন্মিলেও ঋষিপুত্র ব্রহ্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ছিলেন; এই জন্য কেবলই শুদ্ধি ও অশুদ্ধির কল্পনা লইয়া কালাতিপাত করায় এই পবিত্র ধরিত্রীতলে তাঁহার চিত্ত বিশ্রান্তিলাভে সক্ষম হইল না। বসুধাপৃষ্ঠে [illegible] করা তাঁহার রুচিবিরুদ্ধ হইয়া উঠিল। বস্তুত বসুধা বিশুদ্ধ হইলেও তিনি উহাকে অবিশুদ্ধ বলিয়াই বুঝিলেন; তাই বসুধার কুত্রাপি তাঁহার প্রীতিবোধ হইল না। অবশেষে তিনি আপনার সংকল্পবলে স্থির করিয়া লইলেন যে, এই বৃক্ষাগ্রই বিলক্ষণ বিশুদ্ধ এবং এখানে থাকাই আমার পক্ষে যোগ্য; সুতরাং

ঞ্জলের কলালাপ, কোকিলকুলের কলকূজন এবং চকোরের উচ্চরব-চ্ছলে ঐ তরু যেন গীতালাপ করিতেছে। উহার কুলায়দেশে কেলি-নিরত কলহংসকুল বিচরণ করায় উহা যেন স্বর্গকোটরবাসী সিদ্ধগণ-সমাকুল দ্বিতীয় জগতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। চঞ্চলপল্লব-করশালিনী মধু-কর-নয়ন-শোভিনী কত শত কুসুমমঞ্জরী স্বর্গকামিনী সুরবিলাসিনীগণের ন্যায় ঐ কদম্বতরুর চারিদিক্ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। কুমুদ, নীলোৎ-পল ও কোকনদনিভ কত নানাবর্ণযুত লতাপুষ্পের পরাগপুঞ্জে ইন্দ্রচাপবৎ বঞ্জিত, স্বীয় মঞ্জরীদলে পিঞ্জরিত এবং আপনার পত্রপ্রভায় শ্যামলিত ঐ তরু যেন বিদ্যুদ্বিরাজিত বারিধরের ন্যায় বিভাত হইতেছে। সূর্য্য যেন ঐ কদম্বপাদপের কুণ্ডলদ্বয়; উহার সহস্র সহস্র শাখা-ন বাহুবৃন্দের ন্যায় আকাশকুহরে প্রসারিত; অতএব মনে হয়—ঐ বিশ্বরূপ-দর্শয়িতা বিরাটবপুঃ বিষ্ণুর ন্যায় সমুন্নত রহিয়াছে। অনন্তর অ... ...দকুল সন্নিবিষ্ট, ঊর্দ্ধে নক্ষত্ররাজি বিরাজিত এবং বর গ্রহণ কর। দেখ, ...রাং ঐ তরু যেন অপর লয়, হে সাধো! তুমিও তেমনি ... অশেষ শৈলকানন

তখন হুতাশন ঐ কথা কহিলে, বিপ্র ... ীতে যত কিছু ফল, দ্বারা তাঁহার অর্চ্চনাপুরঃসর স্তুতিবাদ করিয়া ... পাত্র কোষাগারবৎ এই ভূমণ্ডল পশ্বাদি অবিশুদ্ধ প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ; ... আছে। স্তরে আমি কোন বিশুদ্ধ ভূখণ্ড প্রাপ্ত হইতেছি না; ... য়ায় থাকিবারই আমার একান্ত ইচ্ছা। আমার এই ইচ্ছা পূর্ণ হউক

মুনিতনয় এইরূপ মনোগত ভাব ব্যক্ত করিলে সমুদায় ... স্বরূপ সেই ঐশী-শক্তিশালী হুতাশন 'তথাস্তু' বলিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। সন্ধ্যাকালীন সরোজের ন্যায় পাবকদেব তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলে, ঋষিনন্দন পূর্ণকাম হইয়া পূর্ণচন্দ্রবৎ প্রতিভাত হইলেন।

হে রাম! তখন অভিমত বর লাভ করিয়া দাশুর মুনি প্রীত হইলেন। তদীয় বদনমণ্ডলের প্রভাচ্ছটায় পূর্ণোদিত কলানিধিকে এবং স্মিত-শোভায় প্রফুল্ল পঙ্কজকে তিনি যেন উপহাস করিতে

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! অতঃপর দাশূর মুনি সেই কাননমধ্যে এক অত্যুচ্চ অম্বুদচুম্বী কদম্ববৃক্ষ দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন,—ঐ কদম্বতরুর উচ্চতা এত অধিক, যেন মনে হয়—দিবাকরের অশ্ব সকল মধ্যাহ্নকালে খিন্ন হইয়া উহার স্কন্ধদেশে বিশ্রাম লাভ করে। উহার শাখা-সকল বাহুবৃন্দের ন্যায় চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হওয়ায় মনে হয়, ঐ তরু যেন একটা দীর্ঘ বিতান বিস্তার করিয়াছে এবং কত শত বিকশিত কুসুমরূপ নয়ন উন্মীলন করিয়া যেন সদা দিগ্‌দিগন্ত দর্শন করিতেছে। উহার বিকশিত কুসুমকুলের উপরি উপরি কত অলি বিচরণ করিতেছে; উহারা উহার বায়ু-বিচালিত কুন্তলের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে। ঐ বৃক্ষ যেন পল্লবরূপ পাণি প্রসারণ করিয়া দিগ্বধূগণের মুখমণ্ডল মার্জ্জিত করিতেছে। ঐ কদম্বতরুর অঙ্গ হইতে গুলুচ্ছ নামে একপ্রকার লতা জন্মিয়াছে; শুভ্র স্বচ্ছ দশনের ন্যায় তদীয় মঞ্জরীপুঞ্জে উহার পল্লবদল সুশোভিত হইয়াছে; তাহাতে মনে হয়, ঐ তরু যেন আপনার পল্লবরূপ তাম্বূলাক্ত বদনশোভায় বনাবলীকে উপহাস করিতেছে। উহার কুসুমসমূহের কিঞ্জল্ক হইতে প্রতি শাখায় প্রচুরতর পরাগধূলি পতিত হইয়াছে, তাহাতে ঐ তরুর এমনি একরূপ মণ্ডলাকার শোভা সম্পাদিত হইয়াছে যে, মনে হয় উহা যেন একটী সম্পূর্ণ-মণ্ডল সুধাকর বিরাজ করিতেছে। ঐ কদম্বতরুর বিটপদলের নিবিড়িত কুঞ্জপুঞ্জে চকোরেরা কূজন করিতেছে; উহার উচ্চতা এত এবং শাখা-প্রশাখায় উহা এত বিস্তৃত যে, উহাকে যেন একটা দ্বিতীয় জগন্মণ্ডল বলিয়াই ভ্রম হয়। উহার স্কন্ধপীঠে ময়ূরেরা উপবিষ্ট আছে; তাহাদের লম্বমান বর্হবিস্তারে উহা যেন ইন্দ্রচাপময় মেঘমণ্ডল-মণ্ডিত গগনমণ্ডলের শোভা ধারণ করিয়াছে। ঐ কদম্বপাদপের প্রত্যেক স্কন্ধকোটরে কত শ্বেতবর্ণ চামর মৃগ বাস করিতেছে; উহারা কখন কোটরে প্রবিষ্ট এবং কখন বা কোটর হইতে বহির্গত হওয়ায় মনে হয়, ঐ পাদপ একবার দৃষ্ট, একবার অদৃষ্ট—উদয়াস্তময় শশধরসমূহে সম্বৎসরবৎ সুশোভিত হইতেছে। কপি-

ঞ্জলের কলালাপ, কোকিলকুলের কলকূজন এবং চকোরের উচ্চরব-চ্ছলে ঐ তরু যেন গীতালাপ করিতেছে। উহার কুলায়দেশে কেলি-নিরত কলহংসকুল বিচরণ করায় উহা যেন স্বর্গকোটরবাসী সিদ্ধগণ-সমাকুল দ্বিতীয় জগতের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। চঞ্চলপল্লব-করশালিনী মধু-কর-নয়ন-শোভিনী কত শত কুসুমমঞ্জরী স্বর্গকামিনী সুরবিলাসিনীগণের ন্যায় ঐ কদম্বতরুর চারিদিক্ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। কুমুদ, নীলোৎ-পল ও কোকনদনিভ কত নানাবর্ণযুত লতাপুষ্পের পরাগপুঞ্জে ইন্দ্রচাপবৎ রঞ্জিত, স্বীয় মঞ্জরীদলে পিঞ্জরিত এবং আপনার পত্রপ্রভায় শ্যামলিত হইয়া ঐ তরু যেন বিদ্যুদ্বিরাজিত বারিধরের ন্যায় বিভাত হইতেছে। চন্দ্র ও সূর্য্য যেন ঐ কদম্বপাদপের কুণ্ডলদ্বয়; উহার সহস্র সহস্র শাখা-প্রশাখা যেন বাহুবৃন্দের ন্যায় আকাশকুহরে প্রসারিত; অতএব মনে হয়—ঐ পাদপ যেন বিশ্বরূপ-দর্শয়িতা বিরাটবপুঃ বিষ্ণুর ন্যায় সমুন্নত রহিয়াছে। উহার তলদেশে শৈলেন্দ্রকুল সন্নিবিষ্ট, ঊর্দ্ধে নক্ষত্ররাজি বিরাজিত এবং মধ্যে শাখা ও পত্রপুষ্পদল দেদীপ্যমান; সুতরাং ঐ তরু যেন অপর একটা ব্রহ্মাণ্ডের উদরাকাশবৎ প্রতীয়মান। ঐ কদম্ববৃক্ষ অশেষ শৈলকানন ও প্রাণি-পরিবৃত পিতামহের ন্যায় প্রতিভাত। পৃথিবীতে যত কিছু ফল, পল্লব ও পুষ্প আছে, ঐ বৃক্ষ যেন সেই সমুদায়ের একমাত্র কোষাগারবৎ বিরাজমান। ঐ পাদপের প্রতি পল্লবে পল্লবে কত শত কলিকা আছে। সেই কলিকাগুলি প্রস্ফুটিত পুষ্পাবলীর পরাগপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হওয়ায় মনে হয়—উহারা ত কলিকা নয়, উহারা যেন—সৌরকর-সমাবৃত অম্বরগত তারকাস্তবক বিদ্যমান। ঐ কদম্বতরুর স্কন্ধগুলির উপরি উপরি বিহগা-বলীর কত অসংখ্য কুলায়শ্রেণী বিরচিত রহিয়াছে; বিহগেরা দলে দলে চলাচল করিতেছে; তাহা দেখিলে মনে হয়, ঐ তরুবর যেন আপনার সুবিশাল স্কন্ধবৃন্দে পরিবৃত হইয়া বহুজনপূর্ণ জনপদযুত ভূতলবৎ বিরাজ-মান। আরও মনে হয়, ঐ তরুবর যেন সমুদায় বনদেবীদিগের সুন্দর একটী অন্তঃপুর। উহা নানাজাতীয় লতামণ্ডলে মণ্ডিত; উহার মঞ্জরীপুঞ্জ যেন উহার পতাকাসকল; প্রস্ফুটিত পুষ্পরূপ সুধালেপনে উহা ধবলিত ও অশেষ কুসুমসমূহে সদাই উহা সমুদ্ভাসিত। উহার স্থানে স্থানে চকোর, ভ্রমর, শুক,

সারিকা ও কোকিলকুল কূজন-পরায়ণ। উহার কুহরগুলি গবাক্ষের ন্যায় শোভিত এবং নিরন্তর কুসুমস্তবকে সমাবৃত। উহাতে বহু বিহঙ্গম বিচরণ করিতেছে এবং উহার তলদেশ ছায়ান্বেষী জনগণের আশ্রয় হইয়াছে। ঐ পাদপ হইতে কুসুমসমূহের কেশররাজি পতিত হইতেছে, উহাদের মধ্যে মধ্যে ভ্রমরেরা ঝঙ্কার করিয়া শ্রেণীবদ্ধ তরঙ্গের ন্যায় ধাবিত হইয়াছে; তাহাতে মনে হইতেছে, ঐ পাদপ যেন স-নিনাদে পতনশীল স-তরঙ্গ সরিৎসমূহের আধারস্থল শৈলের সাদৃশ্য ধারণ করিতেছে। মারুত-বেগে ঘূর্ণিত, পতিত ও প্রত্যহ উপচিত পুষ্প ও পত্রপুঞ্জে ঐ কদম্বতরুর স্কন্ধভাগ সমাবৃত হওয়ায় মনে হয়, যেন শুভ্র শুভ্র অভ্রখণ্ডে ভূধরদেশ পরি-বৃত হইয়াছে। উপত্যকায় উৎপন্ন হইয়া তরুনিচয় যেমন মহাশৈলের প্রায় সকল স্থান ব্যাপিয়া বিরাজ করে, তেমনি ঐ তরুর ঊর্দ্ধজানু-জনের জানুবৎ সমুন্নত ও সুবিশাল মূলভাগ, বহুস্থান বেষ্টন করিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ মূলভাগের উচ্চতা এত অধিক যে, গজগণ তাহাদের গণ্ডদেশ তাহাতে কণ্ডূয়ন করিতে পারে। ভগবান্ বিষ্ণুর বহুল পারিষদ তাঁহাকে যেমন বেষ্টন করিয়া থাকে,তেমনি ঐ বৃক্ষকে যেন বহু বিহঙ্গমেরা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। ঐ সকল বিহঙ্গম উহার স্কন্ধে ও কোটরে বিচরণশীল এবং উহারা বিচিত্রবর্ণ ও বিচিত্র পক্ষে সুশোভন। ঐ পাদপের বিলোল স্তবকগুলি যেন অঙ্গুলিদল; ঐ সকল অঙ্গুলির-পরিচালনায় পাদপ যেন বনবাত-নর্ত্তিত বল্লীদিগকে অভিনয়-ক্রিয়া উপদেশ দিতেছে। আমার কোন্ অঙ্গ না আর্থীদিগের আশ্রয়স্থল? যেন আপনার এইরূপ পরোপকারিতায় সর্ব্বাঙ্গের সাফল্য চিন্তা করিয়াই ঐ পাদপ প্রসন্নমনে স্বীয় বাহুবলয়ের ন্যায় শাখা ও লতা প্রভৃতি সঞ্চালন-পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছে। উহার অঙ্গসঙ্গিনী ব্রততিরাজি যেন কামিনী-রূপিণী ও পাদপ যেন উহাদের একমাত্র কান্ত-স্বরূপ; তাই যেন শৃঙ্গার-রসে মগ্ন হইয়া মদমত্ত মধুকরকুলের গুঞ্জনচ্ছলে ঐ পাদপ কলনাদে গান করিতেছে; যেন ব্যোমবিহারী সিদ্ধগণকে আপনার কুসুমরাশি শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিতেছে; অথবা যেন কোকিলকুলের কলকূজনচ্ছলে তাহা-দিগকে স্বাগত-সম্ভাষণে আপ্যায়িত করিতেছে। ঐ পাদপ স্বীয় নির্ম্মল কুসুম-কোরকের কান্তিচ্ছটার গৌরবভরে যেন সদা স্বর্গীয় মন্দার প্রভৃতি

পঞ্চপাদপের লতা, পুষ্প ও ফলাদির শোভাসম্পত্তির প্রতি উপহাস প্রকাশ করিতেছে। উহার উপরিভাগে বিহঙ্গমেরা অনবরত উড্ডীন হইতেছে; তাহাতে মনে হয়, ঐ কদম্বপাদপ যেন স্বর্গীয় পারিজাত-পাদপকে জয় করিবার নিমিত্তই মস্তক উন্নত করিয়া ক্রমশ আকাশোপরি ধাবিত হইতেছে। উহার ঘনরাজিত পুষ্পস্তবকাবলীর মধ্যে মধ্যে ভৃঙ্গপঙ্ক্তি সুশোভিত হওয়ায় মনে হয়, ঐ পাদপ যেন সহস্রনয়নত্ব প্রাপ্ত হইয়া সহস্রাক্ষ সুরপতি সহ সমকক্ষতা করিতে সমুদ্যত হইয়াছে। উহার ক্বচিৎ ক্বচিৎ কুসুমগুচ্ছ ফণি-ফণাস্থ স্বচ্ছ মণির ন্যায় প্রতিভাত; তাহাতে পরিবৃত হওয়ায় বোধ হয় ঐ পাদপ যেন ব্যোমদর্শনেচ্ছায় পাতাল হইতে সমুত্থিত অনন্ত নাগবৎ সুশোভিত। উহার সর্ব্বাঙ্গ পুষ্পরাশির পরাগপুঞ্জে ধূসরিত হওয়ায় ধারণা হয়, ঐ পাদপ যেন দ্বিতীয় বিভূতি-ভূষিত ভবানীপতি বিরাজমান। ফল ও ছায়া সম্পদে ঐ কদম্বতরু নিখিল প্রাণীরই কল্যাণ-কর।

হে রাম! ঐ কদম্ব-পাদপে বিভিন্নাকার বহুল দল নিবিড়ভাবে বিদ্যমান। ঐ দলগুলি প্রচুরতর পুষ্প-পরিশোভিত লতামণ্ডপে মণ্ডিত ও নানাজাতীয় বিহঙ্গমরূপ নাগরগণের নিবাসভূত হওয়ায় ঐ পাদপ একটী গগনগত নগরের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। দাশূরমুনি তৎকালে এতাদৃশ এক কদম্ব পাদপ অবলোকন করিলেন।

উনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! হরি যেমন একার্ণবস্থ বটপাদপে আরোহণ করেন, অতঃপর ঐ দাশূর মুনি তেমনি বসুধার অশুদ্ধি বুদ্ধি স্থির করত আনন্দভরে মন্থরচিত্ত হইয়া নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের স্তম্ভনিভ উল্লিখিত কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিলেন। ঐ বৃক্ষ পুষ্পময় পর্ব্বতপ্রতিম, ফল ও পল্লব-শোভিত এবং বনমধ্যে বিরাজিত। ঋষিকুমার উহার কোন

এক ব্যোমস্পর্শী উচ্চ শাখার প্রান্তস্থ পল্লবোপরি উপবেশন করিয়া নিঃশঙ্কভাবে একমনে তপস্যা করিতে লাগিলেন। তৎপরে তিনি নবীন কোমল কিশলয়াসনে উপবেশন করত কিঞ্চিৎকাল কৌতুকতরঙ্গে হৃষ্ট হইয়া সকল দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাঁহার নিকট বোধ হইল, ঐ দিক্-সকল যেন ত্রিভুবনের রমণীবৃন্দ, নদীনিচয় উহাদের একাবলী বা হারগুচ্ছ, শৈলেন্দ্রসকল কুচকোরক, নির্ম্মল আকাশ কেশকলাপ এবং বিলোল নীল নীরদাবলী উহার অলকারাজির ন্যায় বিরাজমান। ঐ দিগঙ্গনাগণ পল্লবরূপ নীলাম্বর ধারণ করিয়াছে; পুষ্পরাশি উহাদের শিরোভূষণ স্থান অধিকার করিয়াছে; উহারা সাগরাকার পূর্ণকুম্ভ সকল গ্রহণ করিয়াছে এবং বহুভূষণে বিভূষিত হইয়াছে। ঐ দিগ্বধূগণ প্রফুল্ল পদ্ম ধারণ করিয়াছে; তাই উহাদের মুখমারুত সুগন্ধি হইয়াছে, নীলকান্তি ভ্রমর ও কোকিলাদির কলকূজন উহাদের কাকলী হইয়াছে এবং নির্ঝরঝঙ্কার নূপুরনাদবৎ পরিশ্রুত হইতেছে। স্বর্গ উহাদের মস্তক, পৃথ্বী উহাদের পাদতল, বনাবলী উহাদের রোমরাজি, জঙ্গল উহাদের গুরু-নিতম্ব এবং রবি-শশী উহাদের কর্ণকুণ্ডল। বায়ু-বিলোড়িত শালিদল উহাদের অঙ্গভঙ্গী এবং চন্দনাশ্রিত মলয়াদি উহাদের ললাট-দেশ। শৈলশিখর ঐ দিগ্বধূ-গণের স্তনমণ্ডল; তাহাতে জলদখণ্ড-রূপ অংশুকরাজি বিরাজমান। মহার্ণবের জলপ্রবাহ উহাদের নবীন মণ্ডনদর্পণ; নক্ষত্রনিচয় উহাদের দেহস্থ ঘর্ম্মবিন্দু এবং এই সমগ্র জগৎটাই যেন ঐ দিগ্বধূগণের অন্তঃপুর। উহারা সৌরকররূপ কুঙ্কুম সকল আপন অঙ্গে লেপন করিয়াছে এবং বসন্তাদি ঋতুকালজাত কুসুম-সমূহ যেন উহাদের স্তনাবরণ কঞ্চুকের ন্যায় ব্যবহৃত হইতেছে। উহারা বিবিধ-বিচিত্র কুসুমসমূহে সুশোভিতা এবং শীতাংশুর অংশুরূপ শুভ্র-চন্দনে চর্চ্চিতা।

হে রাম! মুনিবর দাশূর ঐ গগনতলে সমুচ্ছ্রিত কদম্বপাদপের একটী শাখার একটী কিশলয়ে বসিয়া ত্রিভুবনের বনিতারূপিণী দশদিক্‌কে দেখিতে লাগিলেন। ঐ দিক্ সকল বনভূমি ও মেঘাদি বেশ ধারণ করিয়াছে এবং কুসুমসমূহে মণ্ডিত রহিয়াছে।

পঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫০ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! দাশূর সেই কদম্ব-কিসলয়ে কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন এবং তখন হইতে তাপসাশ্রমে তিনি কদম্ব-দাশূর নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। তখন সেই কদম্বলতিকার দলোপরি অবস্থান করিবার পর কিয়ৎকাল সেই দাশূরমুনি দৃঢ়ভাবে পদ্মাসন বন্ধন করিয়া পরমতত্ত্ব কি, সে বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানলাভ না করিয়াই কেবল ফলকামনায় ক্রিয়া-নিরত হইয়া আপন মনে এক যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেন। এইরূপে নভঃস্পর্শিনী উচ্চ শাখার পল্লবদলে সমাসীন হইয়া ক্রমে সেই কদম্বদাশূর সমুদায় যজ্ঞই মনে মনে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তখন তিনি মনে মনে বিপুল দক্ষিণা দিয়া দশবর্ষ যাবৎ গোমেধ, অশ্বমেধ ও নরমেধাদি বহু যজ্ঞ করিলেন; ঐ সকল যজ্ঞে দেবগণ তাঁহার মনোদ্বারাই পূজিত হইলেন। এই প্রকারে কিয়ৎকাল অতীত হইলে পর তাঁহার চিত্ত বিমল ও বিতত হইল। তৎ-কালে যেন বলপূর্ব্বক তদীয় হৃদয়ে আত্মপ্রসাদ-জনিত জ্ঞান আবির্ভূত হইল। অনন্তর দাশূরমুনির অজ্ঞানাবরণ বিশীর্ণ হইল এবং সমস্ত বাসনা-মল বিগলিত হইয়া গেল।

একদা দাশূরমুনি এক কামিনীকে দেখিতে পাইলেন। ঐ কামিনী তথাকার বনদেবতা। উনি লতাগ্রভাগে অবস্থিতা; চঞ্চল পুষ্পাম্বর উহাঁর পরিধান, নয়ন মদাবেশে ঘূর্ণমান এবং বদনমণ্ডল কমনীয়তায় পরিপূর্ণ। উহাঁর অঙ্গ হইতে নীলোৎপলগন্ধ বিচ্ছুরিত হইতেছে। উনি যেন কোকিল ও কুসুম-ভরে অবনতা বনলতার ন্যায় বিরাজমানা।

দাশূরমুনি ঐ বিনতবদনা, সুমনোহরা বরাঙ্গনাকে দেখিয়া বলিলেন,—অয়ি নলিননয়নে! কে তুমি আপনার কমনীয়তায় কামদেবকেও বিক্ষোভিত করিতেছ? তুমি এই বয়স্যাবৎ পুষ্পময়ী লতার উপর বসিয়া আছ কেন?

মুনিবর এই কথা কহিলে সেই হরিণশাবাক্ষী গৌরাঙ্গী পীনস্তনী রমণী মনোহর মধুরাক্ষর বচন বিন্যাস করিয়া প্রত্যুত্তরে তাঁহাকে বলিল,—হে ব্রহ্মন্! এ মহীমণ্ডলে যে কিছু দুর্লভ বাঞ্ছিত বস্তু আছে, মহাপুরুষের

নিকট প্রার্থনা জানাইলে তৎসমস্ত অচিরে অনায়াসেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই আমার পরিচয়ে জানাইতেছি,—ভগবন্! আমি এ বনের বনদেবতা। আপনি যথায় বাস করিতেছেন, এই সেই কদম্বলতার কুঞ্জোপরি আমিও লীলাক্রমে বাস করিয়া থাকি। একদা মধুমাসের শুক্লপক্ষীয় ত্রয়োদশী দিনে মদনোৎসবের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নন্দনবনে বনদেবীগণের এক সভাধিবেশন হইয়াছিল। হে প্রভো! আমি সেই ত্রিলোক-ললনাদিগের সভাধিবেশনে তৎকালে উপস্থিত ছিলাম। আমার যে সকল বয়স্যা সেই সভায় আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন, দেখিলাম—তাঁহারা সকলেই পুত্রবতী। একমাত্র আমিই তথায় পুত্রহীনা; এইজন্যই তখন হইতে আমি অতি দুঃখিতা। ভবাদৃশ পুরুষার্থ-সম্পাদক সাক্ষাৎ কল্পতরুর ন্যায় মহৎ ব্যক্তি বিদ্যমান থাকিতে কেনই বা পুত্রাভাবে অনাথার ন্যায় আমি শোক করিতেছি? ভগবন্! আমার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা,—আপনি আমায় একটী পুত্র প্রদান করুন। আর যদি আমার প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন, তাহা হইলে আর কি করিব? পুত্রাভাব-জনিত দুঃখদাহ প্রশমন করিবার জন্য হুতাশনেই আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিব।

তৎকালে সেই তন্বঙ্গী বনদেবী এই কথা কহিলে, মুনিপ্রবর দাশূর দয়ান্বিত হইয়া স্বীয় হস্তস্থিত একটী পুষ্প তাহাকে প্রদানপূর্ব্বক সহাস্য-আস্যে বলিলেন,—যাও, কৃশোদরি! লতাকর্ত্তৃক পুষ্প প্রসবের ন্যায় মাস মধ্যেই তুমি একটী কমনীয় পূজার্হ পুত্র প্রসব করিবে। তুমি পুত্রলাভ করিতে পার নাই বলিয়া মনের দুঃখে আত্মহত্যা করিতেও প্রস্তুত ছিলে এবং আমার নিকট সে সম্বন্ধে এখন প্রার্থনা করিলে; এই কারণ তোমার এক তত্ত্বজ্ঞানী পুত্র উৎপন্ন হইবে, সে পুত্র কখনই বিষয়লম্পট হইবে না।

মুনিবর এই কথা কহিলে সেই তন্বঙ্গীর মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং সে মুনিকে পরিচর্য্যা করিবার অভিপ্রায় জানাইল; কিন্তু মুনি তাঁহাকে বিদায় দিলেন। তখন সেই বালা নিজালয়ে প্রস্থান করিল। সেই মুনিও একাকী অবস্থানপূর্ব্বক ক্রমশঃ ঋতু, মাস ও বৎসর এইরূপে বহুকাল যাপন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘকাল অতীত হইলে পর, সেই রাজীব-নয়না বন-বালা একদা একটী দ্বাদশবর্ষ-বয়স্ক পুত্রে সমভিব্যাহারে মুনিসমীপে

আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে প্রণিপাত পুরঃসর উপবেশনান্তে মধুকরীকৃত চূতসম্ভাষণের ন্যায় সেই ইন্দুবদন মুনিকে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিল,—ভগবন্! এই সেই আমাদিগের পুত্র; ইহাকে আমি বেদাদি নিখিল বিদ্যায় কোবিদ করিয়াছি; পরন্তু হে প্রভো! এই সংসার-চক্রে নিপতিত হইয়া যাহার প্রভাবে আর পরিপীড়িত হইতে হয় না, কেবল সেই সকল মঙ্গলাবহ জ্ঞান ইহার অধিগত হয় নাই। অতএব কৃপা করিয়া আপনিই অধুনা সেই ব্রহ্মজ্ঞান ইহাকে উপদেশ প্রদান করুন। বস্তুতঃ কে বলুন,—সৎকুল-সমুৎপন্ন সন্তানকে মূর্খ করিয়া রাখে? সেই বালা এই কথা কহিলে, মুনিবর দাশূর বলিলেন,—অয়ি অবলে! এই পুত্রটী উত্তম গুণসম্পন্ন শিষ্য হইবার যোগ্য; অতএব ইহাকে এইখানেই রাখিয়া যাও। এই বলিয়া সেই রমণীকে মুনি বিদায় করিলেন। রমণী চলিয়া যাইবার পর সেই বুদ্ধিমান্ বালক পিতার শিষ্য হইয়া সংযতভাবে অবস্থান করিতে লাগিল; মনে হইল অরুণ যেন সূর্য্যসমীপে বসতি করিতে লাগিল।

অনন্তর সেই বালক কিয়ৎকাল গুরুশুশ্রূষা ও ব্রতচর্য্যাদি কঠোর সাধনার অনুষ্ঠান করিয়া পরোক্ষ বিজ্ঞান প্রাপ্ত হইল। মুনি তখন বহুকাল যাবৎ নানাযুক্তি ও উক্তি দ্বারা পুত্রকে অপরোক্ষ জ্ঞান সম্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। তদীয় তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে অনুভূতিপথে দৃঢ়তা লাভ করে, অর্থাৎ প্রত্যগাত্মায় তাহার ব্যুৎপত্তি যাহাতে সুদৃঢ় হইয়া উঠে, সেই নিমিত্ত মুনি তাহাকে নিত্যই যত্নের সহিত বিবিধ দৃষ্টান্ত, আখ্যায়িকা, ঐতিহাসিক-বৃত্তান্ত, বেদান্তাদির সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য বহুবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশা-বলী প্রদান করিতে লাগিলেন। তাঁহার আপনার যেমন দৃঢ় বা অটল ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মিয়াছিল, পুত্রেরও তেমনি সুদৃঢ় বা অবিচল ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হউক, মুনি যেন এই অভিপ্রায়েই তাহাকে বহুতর কথাপ্রস্তাবে বিশদভাবে ব্রহ্ম-তত্ত্ব বুঝাইতে লাগিলেন। শ্রবণমাত্রেই শিখণ্ডীর প্রীতিজনক বলিয়া জলদ যেমন তদীয় নৃত্যোপযোগী গর্জ্জন দ্বারা তাহাকে প্রবুদ্ধ বা হৃষ্ট করিয়া তুলে, সেই মহাত্মা মুনিও তেমনি বৃক্ষাগ্রে থাকিয়া আত্মবোধ-চমৎকারিত্ব-নিবন্ধন সর্ব্বরসাতিশায়ী পরম পুরুষার্থরূপে অবশ্যবোধ্য ও যুক্তিগর্ভ বাক্যবিন্যাস-পুরঃসর সম্মুখস্থ পুত্রকে প্রবোধিত করিতে লাগিলেন।

একপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে সুমতে! আমি একদা কৈলাসবাসিনী মন্দাকিনীর জলে স্নান করিবার আকাঙ্ক্ষায় সেই দাশূর মুনির আবাসস্থান কদম্বকাণ্ডের উপরিতন আকাশপথে অদৃশ্যভাবে যাইতেছিলাম। অনন্তর সপ্তর্ষিমণ্ডল অতিক্রম করিয়া নভোদেশ হইতে নির্গত হইলাম এবং তৎপরেই সেই দাশূরাধিষ্ঠিত উন্নত কদম্ব-পাদপের সমীপে আসিলাম। এই সময় রাত্রিকাল উপস্থিত হইয়াছিল। কিঞ্চিৎ পরেই মুকুলিত কমল-কোষস্থিত মধুকরোচ্চারিত মধুর ধ্বনির ন্যায় সেই কাননস্থ কদম্বকুহর হইতে জনৈক অদৃশ্য ব্যক্তির কণ্ঠস্বর আমি শ্রবণ করিলাম। শুনিলাম,—মুনি বলিতেছেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ পুত্র! শ্রবণ কর, আমি এই সংসারের উপমাস্বরূপ একটী অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা তোমায় বলিতেছি।

এই মহীমণ্ডলে খোত্থ অর্থাৎ আকাশজ নামে এক রাজা আছেন। তিনি ত্রিভুবনে অসাধারণ বীর্য্যবান্ ও শ্রীমান্ বলিয়া বিখ্যাত। এই নিখিল জগৎই আক্রমণ করিবার শক্তি তাঁহার বিদ্যমান। মহার্ঘ চূড়ামণি যদি প্রার্থিগণের হস্তগত হয়, তাহা হইলে তাহারা যেমন তাহাকে অতিযত্নে মস্তকোপরি ধারণ করে, তেমনি এই ত্রিভুবনের যাঁহারা নেতৃপদে প্রতিষ্ঠিত, তাঁহারা সকলেই সেই রাজার শাসন সম্ভ্রমের সহিত মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন। যিনি সাহসে অদ্বিতীয় পুরুষ, যাঁহার বিহারব্যাপার নানাশ্চর্য্যময়; যে মহাত্মাকে বশীভূত করিবার ক্ষমতা ত্রিজগতে কাহারও নাই, যদীয় সুখ-দুঃখ-জনক সহস্র সহস্র কার্য্যারম্ভ সাগর-কল্লোলের ন্যায় কেহই সংখ্যা করিয়া উঠিতে পারে না, মুষ্টি দ্বারা আকাশ আক্রমণে অক্ষমতার ন্যায় যে মহাবীর্য্যশালী পুরুষের শক্তি এ জগতে শস্ত্র কিম্বা অগ্নি কোন কিছু দ্বারা কেহই অভিভূত করিতে সক্ষম নহে দীবাংযষ, এ নির্ম্মাণোজ্জ্বল বিপুলারম্ভ লীলার অনুসরণ করিবার শক্তি শক্র, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতিরও নাই। হে মহাভুজ! সেই মহাত্মা রাজার নিখিল

ব্যবহারক্রীড়ায় সমর্থ উত্তম, অধম ও মধ্যম এই ত্রিবিধ দেহ জগৎ আক্রমণ করিয়া বিদ্যমান। বিহঙ্গম যেমন অণ্ডময়, পিণ্ডময় ও পক্ষময়, এই ত্রিবিধ দেহ ধারণ করিয়া আকাশে জন্ম গ্রহণ করে, পরে সর্ব্বত্র পরিভব-শঙ্কায় অসার পিপ্পলাদি ফলের আস্বাদনে লোলুপ হইয়া আকাশেই বিচরণ করিতে থাকে এবং শব্দ মাত্রেই উৎপতিত হয়; পরন্তু তাহার অর্থতত্ত্ব বিচার করে না, তেমনি এই রাজাও স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণাত্মক শরীরত্রয় ধারণপূর্ব্বক ব্রহ্মাকাশে জন্ম গ্রহণ করিয়া সর্ব্বত্র ভীতভাবে তুচ্ছবিষয়ে সমাসক্ত ও বিধি-নিষেধ-বাণীর অনুগত হইয়া ব্রহ্মাকাশেই পরিভ্রমণ করিতেছেন। ইনি স্বীয় উৎপত্তি ও স্থিতি-স্থান অপার আকাশদেশেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ নগর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ নগরে চতুর্দ্দশ মহারথ্যা বিদ্যমান। ঐ নগর তিন ভাগে বিভক্ত। কত বন, উপবন ও ক্রীড়াশৈলে ঐ নগর সুশোভন। উহাতে কত মুক্তালতা বিলম্বিত আছে এবং সাতটী বাপিকায় বা সাতটী সরোবরে উহা বিভূষিত রহিয়াছে। দুইটী শীত ও উষ্ণাত্মক প্রদীপ উহাতে প্রজ্বলিত। ঐ প্রদীপদ্বয়ের ক্ষয় কখনই নাই। উহার ঊর্দ্ধ ও অধোদিক দিয়া দুইটী মাত্র বাণিজ্যপথ বিদ্যমান।

ঐ ভূপতি এবম্প্রকার অতি বিশাল নগর মধ্যে কতকগুলি বিষয়বিমূঢ় জঙ্গম দেহগৃহ বিরচন করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কতকগুলি ঊর্দ্ধে, কতকগুলি অধোদেশে এবং কতকগুলি বা মধ্যভাগে নিয়োজিত হইয়াছে। কতকগুলি বহুকালের পর ধ্বংসমুখে নিপতিত হয় এবং কতকগুলি বা সত্বরই বিধ্বস্ত হইয়া যায়। সকলেই উহারা কেশতৃণে সমাচ্ছন্ন এবং নবদ্বারে বিরাজিত। ঐ সকলে বহু বাতায়ন বিদ্যমান। সেই সমস্ত বাতায়ন দ্বারা অনবরত মারুত প্রবাহিত হয়। পাঁচটী প্রদীপে উহারা আলোকিত হইয়া থাকে। উহাদের তিন তিনটী স্তম্ভ [স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল] আছে এবং শুক্লবর্ণ প্রচুর কাষ্ঠখণ্ড ঐ সকল দেহগৃহে বিরাজ করিতেছে। উহাদের উপর স্নিগ্ধ মসৃণ প্রলেপ আছে এবং বহুল প্রতোলী দ্বারা উহারা সমাকুল রহিয়াছে। মহাত্মা রাজা মায়াবলে উহাদিগকে নির্ম্মাণ করিতেছেন। উহাদিগের রক্ষার জন্য কতিপয় আলোকভীরু মহাযক্ষ নিত্যই নিযুক্ত আছে। অনন্তর সেই মহীপতি সেই গৃহের মধ্যে থাকিয়া কুলায়স্থ বিহঙ্গমের ন্যায়

বিবিধ ব্যবহার ও ক্রীড়া করিতে থাকেন। হে পুত্র! উল্লিখিতরূপ শত শত ত্রিবিধ দেহের অভ্যন্তরে মহীপতি সেই যক্ষগণ সমভিব্যাহারে ক্রীড়া করত বাস করেন এবং এক একবার তাহা হইতে নির্গত হইয়া পুনরায় তাহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন।

বৎস! এই প্রকারে সেই চলচিত্ত রাজা উল্লিখিত মহানগরে বাস করত কোন কোন সময় একান্ত অভিলাষ করিয়া থাকেন যে, আমি কোন ভবিষ্যৎ-নির্ম্মিত নগরমধ্যে প্রবেশ করিব। এইরূপ অভিলাষ হইবার পর তিনি ভূতাবিষ্টের ন্যায় আবেগভরে উঠিয়া তদভিমুখে ধাবিত হয়েন। অনন্তর গন্ধর্ব্ব নির্ম্মিত নগরের ন্যায় সহসা সেই পূর্ব্বাভীষ্ট নগর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে পুত্র! কোন কোন সময়ে তাঁহার এইরূপ ইচ্ছা হয় যে, আমি বিনাশ প্রাপ্ত হই। এইরূপ ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি অমনি বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন জল হইতে তরঙ্গ আপনা হইতেই উত্থিত হয়, তেমনি তিনি বিনাশের পর আপন ইচ্ছায় আপনা হইতেই উৎপন্ন হইয়া পুনরায় আরম্ভময় ব্যবহার সত্বর বিস্তার করিতে থাকেন। কখন তিনি এরূপ ব্যবহার করেন যে, আপনার সেই ব্যবহারের নিকট আপনিই পরাভূত হইয়া পড়েন। কখন 'আমি কি করিব? আমি অজ্ঞ, আমি দুঃখী' এইরূপে শোক প্রকাশ করিতে থাকেন। যেমন বর্ষার বারি-প্রবাহে নদীবেগ পরিবর্দ্ধিত হইয়া ক্রমশ অল্পতা প্রাপ্ত হইতে থাকে, তেমনি সেই মহীপতি কদাচিৎ প্রহর্ষ প্রাপ্ত হইয়া অনন্তর আপনা হইতেই ক্রমে ক্রমে দীনদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে পুত্র! পূর্ব্বোক্ত পৃথ্বীপতি কদাচিৎ পরকে পরিভাবক সামর্থ্য সত্ত্বে পরাভিমুখে গমন করিয়া জয়ী হইয়া থাকেন; কখন সম্পত্তি-লাভে স্ফীতি বা স্ফূর্ত্তি লাভ করেন, কখন চঞ্চলিত হয়েন, কখন প্রকাশ এবং কখন বা অপ্রকাশরূপে বিরাজ করেন। তিনি আপন অন্তর্গত আত্মজ্যোতি দ্বারা সর্ব্বদাই সমুদ্দীপ্ত; অতএব অম্বুনিধির ন্যায় সেই মহীপতি মহা-মহিমায় অন্বিত হইয়াই বিদ্যমান।

দ্বিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫২ ॥

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! অনন্তর সেই ঘোর নিশাকালে সেই জম্বুদ্বীপস্থ কদম্বতরুর কিশলয়োপরি সমাসীন পবিত্রচেতা পিতা দাশূরকে পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন,—গুরো! আপনি যে এই উত্তমাকৃতি ভূপতির বিষয় ব্যাখ্যা করিলেন, এই নৃপতি কে? ইহাঁর ঐ উপাখ্যান-বর্ণন প্রসঙ্গে, আপনি আমাকে কি উপদেশ প্রদান করিলেন? তাহা যথাযথ প্রকাশ করিয়া বলুন। ভবিষ্যতে যাহার নির্ম্মাণ হইবে, বর্ত্তমানে তাহার প্রাপ্তি হয় কিরূপে? আপনার এই উভয়ার্থ-বিরোধী বাক্যে বস্তুতঃ আমি মোহমগ্ন হইয়াই পড়িতেছি।

পিতা বলিলেন,—পুত্র! শ্রবণ কর, আমি তোমার নিকট ইহার প্রকৃত তত্ত্ব প্রকাশ করিতেছি। তুমি ইহা বুঝিতে পারিলে এই সংসার-চক্রের প্রকৃত রহস্য তোমার হৃদয়ঙ্গম হইবে। আমি তোমায় যে উপাখ্যান বলিয়াছি, তাহা দ্বারা ইহাই বুঝিবে যে, এই সংসারসংস্থান অসৎ; ইহাতে পরমার্থসত্তা কিছুই নাই। তথাপি কেবল অজ্ঞানবশেই ইহার আরম্ভ অভ্যুদ্যত হইয়া থাকে; সুতরাং ইহা মায়াময়, তাই বিততাকারে প্রতিভাত। পূর্ব্বে যে খোত্থ নাম নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহাতে পরমাকাশ হইতে যে সঙ্কল্প সমুৎপন্ন হয়, তাহাই বলা হইয়াছে। এই সঙ্কল্প আপনা হইতেই উৎপন্ন এবং আপনা হইতেই বিলীন হয়। এই যে একটা বিশাল বিস্তৃত জগৎ, ইহা সেই সঙ্কল্পেরই স্বরূপ। সঙ্কল্প জন্মিলেই জগৎ জন্মে এবং সঙ্কল্প বিলুপ্ত হইলেই জগতের বিলোপ ঘটিয়া থাকে। বলিতে পার, শুনা আছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবাদি হইতেই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে; সুতরাং এখানে তাহার বিপরীত বলা অসঙ্গত নহে কি? ইহার উত্তরে বলিব, যেমন বিটপীর অঙ্গ বিটপ এবং শিখরীর অঙ্গ শিখর, তেমনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব প্রভৃতিও এই সঙ্কল্পেরই অবয়ব। এই সঙ্কল্প অচেতনস্বভাব হইলেও অধিষ্ঠানচৈতন্যের অনুগ্রহ-গুণে বিরিঞ্চি-রূপ ধারণপূর্ব্বক ত্রৈকালিক জগদভাবযুত ব্যোমদেশে এই ত্রিজগৎ-

নগর নির্ম্মাণ করিয়াছে। এই সঙ্কল্প-নির্ম্মিত মহাপুর বা ব্রহ্মাণ্ডে যে চতুর্দ্দশটী মহারথ্যা ও বন উপবন প্রভৃতি আছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে চতুর্দ্দশলোক ও নন্দনাদি উদ্যান-পরম্পরার কথাই বলা হইয়াছে। উহারা সৌরলোকে আলোকিত হইয়া বিরাজ করিতেছে। তথাবর্ণিত ক্রীড়াশৈল সকল—সহ্য, মন্দর ও মেরু প্রভৃতি। পূর্ব্বে যে উষ্ণ ও শীতস্পর্শময় দুইটী দীপের কথা কহিয়াছি, উহারা যথাক্রমে রবি ও শশী বলিয়াই বিজ্ঞেয়। নদীগত তরঙ্গনিচয় দিনমণি-কিরণের প্রতিফলনে মুক্তামালার অনুরূপ বলিয়া বোধ হয়; এইজন্যই তাহাদিগকে মুক্তালতা বলিয়া উল্লিখিত করিয়াছি। পূর্ব্ব-বর্ণিত সপ্ত সরোবর বা সপ্ত বাপিকা এই ত্রিজগৎ-নগরের সপ্ত সমুদ্র। বাড়বাগ্নি ইহার পদ্মাকারে সুশোভন। অন্তর্নিহত মণিরত্নাদি এই পদ্মের মৃণালাঙ্কুর। পূর্ব্বে যে উর্দ্ধ ও অধোগতিরূপ বণিক্‌পথ দ্বারা ঐনগর সঙ্কুল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে এই ত্রিজগতের অধোভাগ পৃথ্বী ও উর্দ্ধভাগ অন্তরীক্ষ বা স্বর্গের কথাই বলা হইয়াছে। ঐ দুই পথে পুণ্য ও পাপরূপ সম্পত্তিশালী নর, অমর এবং পুণ্যহীন চণ্ডাল ও ম্লেচ্ছ প্রভৃতি অন্ত্যজ বণিকেরা পরস্পর পুণ্য ও পাপফলের বাণিজ্য বা ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে। এই জগৎ-নগরে সঙ্কল্প-ভূপ কর্ত্তৃক পূর্ব্বে যে ক্রীড়ার্থ বিচিত্র দেহ-গৃহ নির্ম্মাণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, উহাতে গৃহপদ আরোপমাত্র; বস্তুতঃ উহা দেহ বৈ আর কিছুই নয়। এই সকল দেহ অসংখ্য; তন্মধ্যে দেবনামক কোন কোন দেহ উর্দ্ধদেশে এবং নর ও গজাদি-নামধেয় কোন কোন দেহ অধোদেশে নিয়োজিত হইয়াছে। ঐ মাংসরূপ মৃত্তিকাময় বিচিত্র দেহরূপ ক্রীড়াগৃহগুলি প্রাণবায়ুরূপ বাতযন্ত্র দ্বারা সঞ্চালিত হইয়া থাকে। শুভ্রবর্ণ অস্থিপুঞ্জই পূর্ব্ববর্ণিত দেহগৃহের কাষ্ঠখণ্ড সকল। চর্ম্মোপরি লেপন দ্রব্য তৈলাদিরূপ প্রলেপ দ্বারা ঐ দেহগৃহগুলি মসৃণ ও বিমল। উহাদের কতকগুলি শীঘ্র শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং কতকগুলি কিছু দিন বিলম্বে বিনাশমুখে পতিত হইয়া থাকে। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি ঐ সকল গৃহ তৃণরাজি দ্বারা আচ্ছন্ন; বস্তুত তাহারা তৃণ নয়,—তাহারা ঐ দেহের লোম ও কেশগুচ্ছ। নয়টী দ্বারের বিষয় বলা হইয়াছে; বুঝিতে হইবে,

ঐ দ্বারগুলি প্রত্যেক দেহের চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা প্রভৃতি নব দ্বার। ঐ নব-দ্বার দিয়া অনবরত প্রবাহিত প্রাণ ও অপান প্রভৃতি পবন উষ্ণ এবং শীতল। [প্রাণের উষ্ণত্ব ও অপানের শীতত্ব এ উভয় প্রয়োগ-সিদ্ধরূপেই ব্যবহৃত] পূর্ব্বে যে বহুল বাতায়নের কথা উল্লেখ করিয়াছি, দেহের কর্ণ, নাসা, মুখ ও তালু প্রভৃতিই ঐ সকল বাতায়ন বা বায়ু প্রবেশের পথ। দেহসমূহের ভুজাদি অবয়বই পূর্ব্বোক্ত প্রতোলী বা দীর্ঘ রথ্যা। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ই ঐ দেহ-গৃহের অভ্যন্তরস্থ সদা প্রদীপ্ত পঞ্চ প্রদীপ।

হে মহামতে! পূর্ব্বে বলিয়াছি, রাজা খোত্থ স্বীয় মায়াবলে মহাযক্ষ সকল সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে রাজপুরী রক্ষায় নিযুক্ত করিয়াছেন এবং ঐ যক্ষগণ পরম আলোক হইতে ভীত হয়। ইহা দ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, ঐ যক্ষগণ 'অহং' 'মম ইদং' ইত্যাকার অভিমান বা অহঙ্কার এবং পরমালোক আর কিছুই নহে, ইহা কেবল তত্ত্বজ্ঞান; এই তত্ত্বজ্ঞানের উদয়েই তাহাদের বিনাশ ঘটিয়া থাকে। এইজন্য ইহা হইতে তাহারা ভীত হয়। অর্থাৎ অহঙ্কারই শরীর ধারণ করিয়া রাখে, মৃত্যুসময়ে অহং অভিমান পরিত্যক্ত হয়; সে চলিয়া যাইবার পর দেহ আর থাকে না, তাহা বিনাশ প্রাপ্ত হয়। এই সময় ঐ অহঙ্কার সেই দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর এক ভাবময় দেহ কল্পনা করিয়া লইয়া তাহার আশ্রয়ে অবস্থান করিয়া থাকে। পরন্তু পরমালোকরূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয় হইলে উহা যেন তিমিরবৎ ভীত হইয়াই পলায়ন করে। ঐ সঙ্কল্প-ভূপ দেহরূপে ক্রীড়াগৃহের অভ্যন্তরে মিথ্যাসমুত্থিত অহঙ্কাররূপ মহাযক্ষগণের সমভিব্যাহারে সর্ব্বদাই ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যেমন কুশূলমধ্যে মার্জ্জার, ভস্ত্রামধ্যে ভুজঙ্গ এবং বেণু মধ্যে মুক্তাফল অবস্থান করে, শরীর মধ্যে অহঙ্কার তেমনি অবস্থিত হইয়া থাকে। সাগরের লহরীগুলি যেমন ক্ষণেকের মধ্যে উঠে, উঠিয়া আবার সাগরেই মিলাইয়া যায়, তেমনি সঙ্কল্পাবলীও কিঞ্চিৎকাল দেহগৃহে উত্থিত হয়, আবার ক্ষণেকের মধ্যেই প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ঐ সঙ্কল্প-ভূপ যে কালে ক্ষণকাল মধ্যেই সঙ্কল্পিত বস্তু অবলোকন করেন, বুঝিতে হইবে—তখনই তিনি ভাবী নবনির্ম্মিত নগরে উপনীত হইলেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে

বলা হইয়াছে যে, যখন সেই রাজার ইচ্ছা হয়, তখন তিনি ভাবী নবনগর প্রস্তুত করিয়া থাকেন। এ কথার অর্থ এই যে, সাঙ্কল্পিক বস্তুই ভাবী বস্তু বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যখন তিনি কোন বস্তুর সঙ্কল্প করেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার তাহা প্রাপ্তি ঘটে। তিনি জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় ভ্রমণজনিত বহু আয়াস স্বীকার করিয়া পরিশ্রান্তি বোধে যৎকালে শ্রম-শান্তি লাভ করিবার জন্য সুষুপ্তি অবস্থায় অবস্থান করেন, তখন সর্ব্ববিধ সঙ্কল্পের অভাবনিবন্ধন বুঝা যায়, তিনি সত্বর বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন; কিন্তু নাশ ধর্ম্মের বিদ্যমানতায় কারণীভূত অবিদ্যা-মাত্ররূপে তাঁহার সত্তা থাকিয়া যায়। অথবা কোটি কোটি জন্মপরম্পরায় পরিভ্রমণ-জনিত বহু আয়াস-ভোগের পর দৈবক্রমে কদাচিৎ নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা, আচার্য্য-সেবা ও সমাধি অভ্যাসাদি-বলে আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎকার ঘটিলে সঙ্কল্পের মূলোচ্ছেদ হইবামাত্র মোক্ষ নিমিত্ত নির্বৃতি ঘটিয়া থাকে। বালকের সঙ্কল্পমাত্রেই যক্ষ উৎপন্ন হয়; উৎপন্ন হইয়া ঐ যক্ষ বালককে অনন্ত দুঃখ দান করে; পরন্তু সুখ কখনই দেয় না, তেমনি ঐ রাজা আপন কল্পনামাত্র-রূপেই উৎপন্ন। তাঁহার এ উৎপত্তি অনন্ত আত্মদুঃখের নিদান। ইহাতে তাঁহার আনন্দানুভব কিছুমাত্র নাই। সঙ্কল্প-রাজ আত্মসত্তাতেই এই বিশাল জগদ্দুঃখ বিস্তার করেন, আর অসত্তায় অন্ধতাদোষের ঘোরান্ধকার অপহরণ করিবার ন্যায় ঐ দুঃখ নাশ করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে যে 'আমি কি করিব' ইত্যাদিরূপ শোকোক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝিতে হইবে, ঐ সঙ্কল্প-ভূপ স্বীয় দুঃখদায়িনী চেষ্টা দ্বারাই বিপন্ন হইয়া রোদন করিতে থাকেন। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে স্বীয় চেষ্টায় কীলোৎপাটনে অণ্ডকোষ কাষ্ঠ-পিষ্ট হওয়ায় আর্ত্তস্বরে চিৎকারকারী সেই এক প্রসিদ্ধ কপির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। যেমন একদা এক গর্দ্দভ ঊর্দ্ধমুখে ছিল, দৈবক্রমে একবিন্দু মধু উহার মুখে পড়িল, সে তাহা পান করিয়া আনন্দভরে সর্ব্বদাই উদ্‌গ্রীব হইয়াছিল, তেমনি ঐ সঙ্কল্প-ভূপ কোন সময়ে লেশমাত্র বিষয়ানন্দ কল্পনা করিয়া পরে তাহারই সন্ধানে সতত সমুৎসুক রহিয়াছেন। চপল-স্বভাব বালকের কোন কার্য্যেই স্থৈর্য্য নাই, তাহার যেমন ক্ষণকাল কার্য্যাসক্তি, ক্ষণেক তাহাতে অনাসক্তি আবার কখন বা তাহাতে বিরতি ঘটিয়া থাকে,—

তেমনি সঙ্কল্প-ভূপও কিঞ্চিৎকাল বিষয় বিরতি, আবার কখন বিষয়াসক্তি এবং কখন বা বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে তাত! তোমার মতি যাহাতে ঐ সঙ্কল্পকে নিখিল বাহ্য বস্তু হইতে নিবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ সমাধি অভ্যাস ও তত্ত্বজ্ঞানবলে নির্ম্মূল বা বাসনাবিহীন করিয়া প্রত্যগ্‌ভূত ব্রহ্মপদ অবলম্বনপূর্ব্বক বিশ্রাম লাভ করে, সে বিষয়ে চেষ্টা কর। সেই যে বলিয়াছি, সঙ্কল্প-ভূপতির উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ দেহ বিদ্যমান। ইহা দ্বারা মনেরই সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই ত্রিবিধ দেহের উল্লেখ করা হইয়াছে; বলা বাহুল্য এই ত্রিবিধ দেহই জগৎস্থিতির হেতু। উল্লিখিত দেহত্রয়ের মধ্যে তামসদেহ সঙ্কল্প নিত্যই স্বাভাবিক চেষ্টা-পরম্পরায় অতীব দীনতা প্রাপ্ত হইয়া কৃমিকীটাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। সাত্ত্বিকদেহ সতত ধর্ম্মজ্ঞানে তৎপর হইয়া মুক্তিমার্গের নিকটবর্ত্তী স্বর্গরাজ্য লাভ করে। এতদ্ভিন্ন রাজস-দেহ লৌকিক ব্যবহারপরম্পরায় নিরত হইয়া পুত্র-কলত্রাদি দ্বারা অনুরঞ্জিতচিত্তে প্রতিনিয়ত সংসারেই বাস করিয়া থাকে।

হে মহামতে! যখন ঐ সঙ্কল্পদেহ রাজা উল্লিখিত ত্রিবিধ রূপই পরিত্যাগ করেন, তখন তিনি আপনার ঐকান্তিক উচ্ছেদে মোক্ষের পথেই অগ্রসর হইয়া থাকেন। এখন কথা এই যে, ঐ সঙ্কল্প ক্ষয় করিবার উপায় কি? উপায় এই যে, যাবতীয় বাহ্য দৃষ্টির পরিহার এবং মন দ্বারাই মনের নিরোধন; এই দুইটী বিষয়ই সঙ্কল্পক্ষয়ের প্রধান উপাদান। তোমায় বলি, বৎস! তুমিও এই উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক বাহ্য এবং আভ্যন্তর এই উভয়বিধ সঙ্কল্পেরই ক্ষয় সাধন কর। এইরূপে সঙ্কল্প ক্ষয় না করিয়া যদি তুমি সহস্র সহস্র বর্ষও কঠোর তপস্যা কর, যদি বিনশ্বর দেহকে শিলাতলে নিক্ষেপ করিয়া চূর্ণ বিচূর্ণ কর, যদি প্রদীপ্ত পাবক মধ্যে অথবা বাড়বানলে প্রবেশ কর, যদি সঙ্কট-সঙ্কুল গর্ত্ত মধ্যেও নিপতিত হও এবং যদি বা বেগ-বিঘূর্ণিত খড়্গধারাতেও স্বদেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়া ফেলো, তথাপি কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে না। অপিচ যদি তোমায় সাক্ষাৎ হর, হরি, কিম্বা বিরিঞ্চি আসিয়াও উপদেশ দান করেন, কিম্বা যদি শ্রীদত্তাত্রেয় বা দুর্ব্বাসা ঋষিও নিতান্ত করুণাক্রান্ত হইয়া আগমনপূর্ব্বক

তোমার উপদেশক হয়েন, তথাপি ঐ সঙ্কল্পক্ষয়-উপায় ভিন্ন তোমার পরিত্রাণ নাই। তুমি স্বর্গেই থাক, আর পাতালেই যাও, অথবা এইখানেই অবস্থান কর, একমাত্র সঙ্কল্পক্ষয় ব্যতীত শ্রেয়োলাভের আর উপায়ান্তর কিছুই নাই। সঙ্কল্পের উপশমই ব্রহ্মস্বরূপ, তাহাতে বাধা নাই, বিকার নাই। তুমি এহেন সঙ্কল্প-উপশম বিষয়ে পুরুষকারের সহিত একান্ত যত্ন প্রকাশ কর। হে অনঘ! যে কিছু ভাবপরম্পরা আছে, সকলই সঙ্কল্পসূত্রে গ্রথিত রহিয়াছে। যখন ঐ সঙ্কল্প-সূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে, জানি না,—তখন উহারা কোথায় গিয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে! সৎ, অসৎ ও সদসৎ এ সকল বিকল্প কেবল সঙ্কল্প হইতেই সমুৎপন্ন হয়। উহারা সঙ্কল্পকেই সৎ ও অসৎ ইত্যাদি রূপ বিকল্পের বিষয়ীভূত করিতে পারে না, তাহাতে পরমার্থ সত্যসঙ্কল্প ব্রহ্মকে যে স্পর্শ করিতেও উহারা অক্ষম, ইহা কি আর বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে? অর্থাৎ সত্তা, অসত্তা বা সত্তাসত্তা ইহাদের কোন ধর্ম্মই সঙ্কল্পে নাই। এতাবতা বুঝিতে হইবে, যেখানে স্ব-সঙ্গী কারণেও কার্য্যসমূহের কুণ্ঠীভাব, তথায় অসঙ্গ পরমাত্মায় যে সে ভাব অনিবার্য্য, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। যখন যে যে বিষয়ের যে যে রূপ সঙ্কল্পিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহা সেইরূপেই প্রতীত হইয়া থাকে। তাই বলি, হে তত্ত্বজ্ঞ! তুমি কদাচ কোন বিষয়ের সঙ্কল্প করিও না, তুমি সংঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ কর এবং যথাপ্রাপ্ত ব্যবহারের অনুবর্ত্তী হইয়া অবস্থান কর। সঙ্কল্প যখন ক্ষয় হয়, তখন চিত্তের চেত্যোন্মুখীভাব বা বিষয়োন্মুখতা বিদূরিত হইয়া যায়।

হে পবিত্র! ব্রহ্ম একমাত্র সত্যস্বভাব। তিনিই অসত্য মায়ার আবরণে সুর-নর তির্য্যগাদি চতুরশীতিযোনিপথে সেই সেই ভিন্ন ভিন্ন প্রাণিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া অনবরত কেবল অনর্থক সংসার-দুঃখ-পরম্পরা অনুভব করিয়া থাকেন। বাস্তব পক্ষে তাঁহার ইহা আত্মসদৃশ নহে। অতএব যে মরণে নানাবিধ যোনিপরম্পরায় ভ্রমণ-জনিত দুঃখভোগই ঘটিবে, তাদৃশ পুনঃপুন মরণে তোমার কোন্ ফল হইবে বলিতে পার কি? প্রকৃত কথা এই, যাহাতে কোনওরূপ দুঃখসঙ্কল্প নাই, প্রাজ্ঞ পুরুষেরা তাহারই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন; কদাচ দুঃখময় সংসারের আশ্রয় গ্রহণ করেন না।

বৎস! তুমি সহসা পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া বিপুল বিকল্পজাল পরিহার কর, নিত্য নিরতিশয়ানন্দ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদ অধিগত হও এবং তোমার চিত্তবৃত্তিকে তুমি সুষুপ্তি-অবস্থায় আনয়ন কর।

ত্রিপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥৫৩॥

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ।

দাশূর-নন্দন জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে তাত! হে প্রভো! সঙ্কল্প কিরূপ? কেন তাহা উৎপন্ন হয়? আর কেনই বা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে? আবার কিরূপেই বা তাহার বিনাশ ঘটিয়া থাকে?

দাশূর বলিলেন,—বৎস! আত্মতত্ত্ব অসীম; তাহার স্বরূপ সত্তা-সামান্য বা চিৎতত্ত্ব। এই চিৎ বা চৈতন্যের যে চেত্য বিষয়ে উন্মুখীভাব হয়, সেই উন্মুখীভাবকেই বিশেষজ্ঞগণ উল্লিখিত সঙ্কল্প-তরুর অবিদ্যা-বীজ-জাত প্রথম অঙ্কুররূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ঐ সঙ্কল্পাঙ্কুর লেশমাত্র সত্তা প্রাপ্ত হইয়া অধিষ্ঠান চৈতন্যের চিৎস্বভাবের তিরোধানে জড় প্রপঞ্চাকার সম্পাদনার্থ মেঘবৎ সর্ব্বতোভাবে সমগ্র চিত্তাকাশ পরিপূরিত করত ধীরে ধীরে ঘনীভাব উপগত হইতে থাকে। বীজ যেমন অঙ্কুরতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি আত্মশক্তিও স্বীয় স্বরূপাতিরিক্ত চেত্য ভাবনা করত সুস্পষ্ট সঙ্কল্পভাব ধারণ করিয়া থাকে। ক্রমশঃ এক সঙ্কল্প হইতে আপনা হইতেই অপর সঙ্কল্প আবির্ভূত হয় এবং দুঃখভোগের নিমিত্তই স্বয়ং শীঘ্র সম্বর্দ্ধিত হইতে থাকে; দুঃখ ভিন্ন সুখের নিমিত্ত ইহা কদাচ হয় না। অর্ণব যেমন জলময়,—তাহা জল ভিন্ন আর কিছুই নয়, তেমনি এই জগৎও শুধুই সঙ্কল্পময়; ফলতঃ এ জগৎ সঙ্কল্প বৈ আর কিছুই নয়। বৎস! তোমারও এই সঙ্কল্প ভিন্ন অন্য কোনই সংসারদুঃখ নাই। এই সঙ্কল্প কাকতালীয় ন্যায়ে বৃথাই জন্মিয়া থাকে; ইহা মৃগতৃষ্ণায় জল ও দ্বিতীয় চন্দ্র এই উভয়ের ন্যায় প্রকৃত পক্ষে অসত্য হইলেও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

মাতুলিঙ্গ নামে এক প্রকার ফল আছে। সেই ফল ভোজন করিলে শুভ্রবর্ণ কাচ প্রভৃতিতে যেমন অসত্য স্বর্ণজ্ঞান হয়, তেমনি তোমার হৃদয়েও কোথা হইতে ঐ অসত্য সঙ্কল্প স্বয়ং সমুত্থিত হইয়া সত্যাকারে প্রতিভাত হইতেছে! তুমি জন্মিয়াছ, ইহা মিথ্যা এবং তুমি যে রহিয়াছ, ইহাও অসত্য; এই তত্ত্ব-জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, তখন ঐ মিথ্যা বিষয়ও আপনা হইতেই বিলয় পাইয়া যায়। যিনি বেদান্ত-প্রতিপাদ্য পূর্ণাত্মা, তিনি আমিই বৈ আর কেহই নহেন এবং আমার এই যে সুখদুঃখময় জন্মাদি ভাব, ইহাও মিথ্যা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ বিশ্বাস তোমার যে অজ্ঞানহেতু এখনও হয় নাই, সেই অজ্ঞানের জন্যই তুমি অন্তরে অন্তরে পরিতপ্ত হইতেছ। তুমি আপনার সঙ্কল্প বশতই 'আমি জন্মিয়াছি' এইরূপ ভ্রান্তিভাবে বৃথা বিমোহিত হইতেছ। ফলতঃ পূর্ণতারূপ ব্রহ্মের বিলাসে তোমার আবার জন্ম কি? যাহা হউক, যে সঙ্কল্প করিয়াছ—করিয়াছ; আর ঐরূপ মিথ্যা সঙ্কল্প তুমি কদাচ করিও না। পূর্ব্বে যে সকল সুখ-দুঃখভাব অনুভূত হইয়াছে, অধুনা আর সে সমুদায়ের ভাবনা বা স্মরণ করিও না। সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাবনা করিতে থাক, এইরূপ ভাবনায় বিভোর হইয়া রহিলেই ভব্য বা কল্যাণ-লাভে কৃতার্থ হওয়া যায়। সর্ব্ব সঙ্কল্প উচ্ছেদ করিতে যত্ন প্রকাশ করিলেই আর কোন ভয়ের সম্ভাবনা থাকে না। পূর্ব্বভাবের ভাবনার অভাবেই সঙ্কল্প আপনা হইতে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। পুষ্পপল্লব মর্দ্দিত করিতে কিঞ্চিৎ কায়িক ক্রিয়ার প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই সঙ্কল্প ক্ষয় করিবার পক্ষে তাহারও আবশ্যক নাই। হে পুত্র! ভাবিয়া দেখ, পুষ্প মর্দ্দন করিতে হইলে অন্ততঃ কর-প্রযত্নেরও প্রয়োজন হয়; কিন্তু এই সঙ্কল্প ক্ষয় করিতে হইলে তাহারও প্রয়োজন নাই। যিনি সঙ্কল্প ক্ষয় করিতে চাহেন, তাঁহার পূর্ব্বানুভূতের অস্মরণ হওয়া আবশ্যক। এইরূপ হইলে অর্দ্ধনিমেষ মধ্যেই সঙ্কল্পক্ষয় করিতে পারা যায়। আপনাকে পূর্ণানন্দময় ব্রহ্মরূপে প্রতিনিয়ত ভাবনা করায় স্বীয় আত্মা যখন স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন, তখন যাহা অসাধ্য, তাহাও সুসাধ্য হইয়া থাকে। হে পুত্র! তোমার আত্মা আর কাহার হইবে? তিনি ত এক এবং অদ্বিতীয়।

হে মুনে! তুমি সঙ্কল্পের সাহায্যে সঙ্কল্পের এবং মনের সাহায্যে মনের

উচ্ছেদ করিয়া কেবল আপন আত্মাতেই অবস্থান কর। মাত্র এই কার্য্যটুকু করিতে আর কস্ট কি? ফল কথা, 'সঙ্কল্প আর করিব না' এই সঙ্কল্প দ্বারা সমস্ত সঙ্কল্পের এবং নির্ব্বিকল্প মনোদ্বারা সবিকল্প মনের সংহার সাধন করিয়া আত্মস্থ হও। হে মহামতে! তোমার ঐ সঙ্কল্প যখন প্রশমিত হইয়া যাইবে, তখন এই নিখিল সংসারদুঃখ সমূলে উন্মুলিত হইবে। সঙ্কল্প, মন, জীব, চিত্ত, বুদ্ধি ও বাসনা, এই সকল শব্দ কেবল নামতই ভিন্ন; পরন্তু উহাদের অর্থগত কোনই পার্থক্য নাই। এই সঙ্কল্প ভিন্ন আর যখন কুত্রাপি কিছুই নাই, তখন তুমি উহাকে হৃদয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলো। ইহার নিমিত্ত আর শোক করিবার কি আছে? বুঝিয়া দেখ—এই আকাশ যেমন শূন্য, এই জগৎও তেমনি শূন্য মাত্র; কেননা এই আকাশ এবং জগৎ উভয়ই মিথ্যা বিকল্প হইতে উত্থিত। অর্থাৎ এক একটা বস্তুর এক একটা নাম আছে; কিন্তু সে নামের বস্তু কিছুই নাই। বস্তু যদিও নাই, তথাপি সেই নাম শুনিবামাত্র একপ্রকার জ্ঞানোদয় হয়; বস্তুর অভাবে সে জ্ঞান মিথ্যা, অসৎ বা ভ্রমবিশেষ। দৃষ্টান্তস্থলে আকাশ-কুসুমাদির নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। ফলে আকাশ-কুসুমাদি নামে বস্তু নাই; কাজেই তাদৃশ নামনিচয়ের শ্রবণে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা বিকল্প-সম্ভূত ও অসৎ। এইরূপ এই জগৎও নাই, অথচ তাহার নাম আছে ও নাম শ্রবণে একটা জ্ঞানও হইয়া থাকে। সুতরাং এই জগৎও বিকল্প কল্পিত ও অসত্য। এই সমস্ত দৃশ্য শূন্য সত্য; পরন্তু যিনি দৃক্‌স্বরূপ আত্মা, তিনি কখন শূন্য নহেন। সুতরাং সঙ্কল্প ক্ষয় হইলে জগতেরই ক্ষয় হইয়া থাকে; জগতের ক্ষয় হয় বলিয়া আত্মক্ষয় হয় না। সর্ব্ববিধ অসিদ্ধ সঙ্কল্প দ্বারাই এই অসিদ্ধ বিষয় সাধিত হয়; কাজেই যদি নিখিল পদার্থেই বাধা বিদ্যমান রহিল, তখন আর ভাবনা থাকিবে কোথায়? যাহার উপর সত্য বলিয়া আস্থা থাকে, সে যদি অসত্য বলিয়া নির্ণীত হয়, তাহা হইলে তখন আর তাহাতে বাসনা থাকে কিরূপে? ভাবনার ক্ষয় হইয়া গেলেই আত্মলাভ-সিদ্ধি সঙ্ঘটিত হয় এবং এই সিদ্ধি সঙ্ঘটিত হইলে তখন আর কোন প্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি অবশিষ্ট থাকে না। অতএব যখন অভ্যাস করিতে করিতে দৃশ্য বস্তুর প্রতি একান্ত অবজ্ঞা জন্মিবে এবং ঐ অবজ্ঞা

যখন দৃঢ়তর হইয়া উঠিবে, তখনই বুঝিতে পারিবে যে, এ সমস্ত কিছুই সৎ নহে—সকলই অসৎ। যদি দৃশ্য পদার্থকে অপদার্থজ্ঞানে অবজ্ঞা করা যায়, তাহা হইলে সংসারের কোনরূপ সুখ-দুঃখাদিতেই আর কখন লিপ্ত হইতে হয় না। পুত্র, মিত্র, কলত্র, ইত্যাদি সমস্তই অবস্তুমাত্র; এইরূপ জ্ঞান যখন দৃঢ় হইয়া উঠে, তখন আর তাহাতে স্নেহাস্থা কিছুই থাকে না। যখন স্নেহাস্থা ক্ষয় হয়, তখন হর্ষ, অমর্ষ, ভাব, অভাব কিছুই জন্মে না; সুতরাং তখন সংসারিক সুখ-দুঃখাদি যে কেবল বিভ্রমমূলক এবং এই জগৎ যে একান্তই অসৎ, ইহাই নিঃসন্দেহে ধারণা হইয়া থাকে। মনই চিৎপ্রতিবিম্বে জীব হইয়া এই ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান জগদাকার মানস নগর পরিবর্ত্তিত, বিরচিত, পরিণামিত ও বিনাশিত করত বিলসিত হইতেছে। ইহার মন বিষয়সম্পর্কে সেই সেই বিষয়-বাসনায় আবলিত এবং অধিষ্ঠান চৈতন্যের সম্বন্ধ বশতঃ স্ফুরণশক্তি-যুক্ত হইয়া অবস্থিত; এইজন্য এই জীব মলিন ও চঞ্চল হইয়া আপনার ইচ্ছামতই প্রাগ্‌বর্ণিতরূপে পরিবর্ত্তন ও বিরচন প্রভৃতি ব্যবস্থা-সংস্থা করিয়া থাকে। জীব যেন হৃদয়-কাননের মর্কট। সে আপনারই অনুরূপ ক্রীড়ায় নিরত হইয়া থাকে। এই ক্রীড়াবস্থায় কখন সে দীর্ঘ এবং কখন বা হ্রস্বাকার ধারণ করে। সঙ্কল্প যেন জলতরঙ্গ; কেহই ইহাকে ধরিয়া রাখিতে পারে না। যখন বিষয় দর্শন ঘটে, তখনই উদ্বুদ্ধ হয় এবং তখনই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আবার যখন বিষয় দর্শনের স্মৃতি পরিহৃত হয়, তখন হ্রস্ব হইয়া থাকে। বহ্নির একটুকুমাত্র কণা যেমন তৃণ সহযোগে প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, তেমনি কিঞ্চিৎমাত্র বিষয়-তৃণের যোগ ঘটিলেই সঙ্কল্পাগ্নি সমুদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক বহ্নির ন্যায় এ জগতে সঙ্কল্পের একটা কোন আকারই প্রকট নাই; অথচ উহা প্রদীপ্ত, ক্ষণ-বিনশ্বর, জড়াবস্থ এবং ভ্রান্তিজনক।

হে পুত্র! এই সঙ্কল্প অসত্য অজ্ঞানের বিকারভূত; সুতরাং যাহা অসৎ, তাহার চিকিৎসা সহজেই করিতে পারা যায়। এ ব্যাপারে সন্দেহ কিছুই নাই; কেন না, অসৎ কখনই সৎ হয় না, অসৎ—অসৎই থাকিয়া যায়। সঙ্কল্প যদি পরমার্থভূত বা সত্য হইত, তাহা হইলে উহার চিকিৎসা দুঃসাধ্য হইয়া দাঁড়াইত; কিন্তু উহা যখন একান্তই অসৎ, তখন উহার

শুচিকিৎসা করিতে কোনই ত কষ্ট নাই। যদি আত্মার সংসার-মালিন্য অঙ্গারকালিমার ন্যায় অকৃত্রিম হইত, তাহা হইলে—হে সাধো! কোন্ দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি পৌরুষবলে উহাকে বিধৌত করিতে প্রবৃত্ত হইত? দেখ, তণ্ডুলে যেমন তুষাবরণ আছে, সত্য পরম ব্রহ্মেও তেমনি সংসারাবরণ অবস্থিত রহিয়াছে, পরন্তু তণ্ডুলের ঐ তুষাবরণ যেমন পুরুষপ্রযত্নে অপসারিত হয়, তেমনি ঐ সংসারাবরণও পৌরুষচেষ্টায় সহজেই বিনষ্ট হইয়া যায়। এই বিশাল সংসারমল তত্ত্বজ্ঞগণের অনায়াসেই অপনেয়। তণ্ডুলের তুষাবরণ ও তাম্রের কালিমা যেমন ক্রিয়াভেদে বিনষ্ট হয়, হে তাত! ঐ সংসারমলও তেমনি ক্রিয়াগুণে বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রযত্ন প্রকাশ করিলে উহার নাশ নিশ্চয়ই হইবে; সে পক্ষে সন্দেহমাত্র নাই। তাই বলিতেছি, তুমি উহার উচ্ছেদ সাধনে উদ্যম প্রকাশ কর। এতদিন যে তুমি এই বৃথা বিকল্পময় সংসারকে জয় করিতে পার নাই, তাহার কারণ কেবল উপায়ের অপরিজ্ঞান। প্রকৃষ্ট উপায় অবলম্বিত হইলে উহা সহজেই লয় পাইয়া যায়। ভাবিয়া দেখ, কোন্ অসদ্বস্তু কবে কোথায় চিরস্থির হইয়া রহিয়াছে। যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে, যেমন দীপালোকে অন্ধকার ও তত্ত্বদর্শীর নিকট দ্বিতীয় চন্দ্র, তেমনি এই সংসারভাবও অসৎ বৈ আর কিছুই হয় না।

হে পুত্র! এ সংসার তোমার নয় এবং সংসারেরও তুমি কেহই নহ। এই জন্যই বলিতেছি, তুমি ভ্রম পরিহার কর। যাহা অসত্য, তাহাকে সত্যবৎ সন্দর্শন করিয়া এরূপ ভাবনা করা কোনক্রমেই বিধেয় নহে। 'আমি সংসারিস্বভাব; আমার এই মহাসমৃদ্ধিসমুজ্জ্বল ভোগবিলাস সকল সত্য এবং নিত্যকাল অবস্থিত' এহেন বিভ্রম যেন তোমার কদাপি হয় না। জানিও—তুমি, তোমার ঐ সকল ভোগবিলাস এবং জননমরণাদি যাবতীয় দৃশ্যমাত্রই একমাত্র আত্মতত্ত্বের বিলাস ব্যতীত আর কিছুই নহে।

চতুঃপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুকুলাকাশের শশধর! আমি সেই দিন সেই নিশাকালে কদম্বকিশলয়স্থ দাশূর ও তদীয় তনয়ের তথাবিধ কথোপকথন শ্রবণ করিয়া গগন হইতে অবতরণ করিলাম। বৃষ্টিবিরহিত জীমূত যেমন নিঃশব্দভাবে গিরিশিখরে আরোহণ করে, আমিও তেমনি সেই গগনতল হইতে অবতরণ করত তূষ্ণীম্ভাবে তত্রত্য পত্র, পুষ্প ও ফল-সমন্বিত কদম্ব-তরুর অগ্রদেশে উপস্থিত হইলাম; দেখিতে পাইলাম,—তথায় ইন্দ্রিয়জয়ী দাশূর মুনি সমাসীন রহিয়াছেন। তিনি পরম তপস্যায় অন্বিত এবং আপনার তেজঃপ্রকর্ষে প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় প্রতিভাত। আরও দেখিলাম—তিনি যেন স্বীয় দেহ-বহির্গত তেজঃপুঞ্জে তথাকার ভূমিতল কাঞ্চনীকৃত করিয়া তুলিয়াছেন এবং দিনমণি যেমন ভুবনমণ্ডল তাপিত করিয়া তুলেন, তেমনি তিনিও যেন আপনার দেহপ্রভায় সেই সমগ্র প্রদেশ উত্তা-পিত করিতেছেন। সেই দাশূরমুনি আমাকে দেখিবামাত্র পাদ্য, অর্ঘ্য ও আসন প্রদানপূর্ব্বক. আমার অর্চ্চনা করিলেন।

অনন্তর সেই তেজস্বী দাশূরমুনি তদীয় তনয়কে সম্বোধন করিয়া পূর্ব্বে যে সকল সংসার-তারণক্ষম তত্ত্বকথার অবতারণা করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমিও তাঁহার সহিত কিয়ৎকাল আলোচনা করিলাম। তৎপরে আমি সেই বিশাল বৃক্ষের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম,—সেই কদম্ব-পাদপে দাশূরমুনির ইচ্ছানুসারে মৃগদল অব্যাকুলভাবে বিচরণ করিতেছে। ঐ পাদপের শাখা-প্রশাখা ও লতাজাল এতদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত যে, তাহা দেখিলেই উহা যেন একটা বহুবিস্তৃত বন বলিয়া বোধ হয়। দেখিলাম,—ঐ কদম্ববৃক্ষ কত শত-শত কুসুম কলিকায় সমলঙ্কৃত রহিয়াছে, বায়ু-বশে বিকম্পিত হইতেছে এবং পল্লবদল-মণ্ডিত লতাজালে ভূষিত আছে। দেখিয়া মনে হইল যেন তদীয় নিশ্বাসকম্পিত ওষ্ঠাধরে ঈষৎ একটী হাস্য-রেখা দেখা যাইতেছে। যেমন শুভ্র শুভ্র অভ্রখণ্ড শারদীয় নির্ম্মল নভোমণ্ডল ঢাকিয়া রাখে, তেমনি ঐ কদম্বতরুর কোটী কোটী কাণ্ডসমূহের উপরি

উপরি কত ইন্দুসুন্দর চামরনিকর নিয়ত ভ্রমণ করত উহাকে আবৃত করিয়াছে। উহার পত্রে পত্রে হিমবিন্দু সকল পতিত রহিয়াছে, তাহাতে বোধ হইল, যেন মুক্তা-ফলমালায় উহা সদা সমলঙ্কৃত হইতেছে। ঐ তরুর সর্ব্বাঙ্গই শুদ্ধ স্বচ্ছ কুসুমসমূহে সমাচ্ছন্ন। উহার সর্ব্বাবয়বে কত পুঞ্জীভূত পুষ্পপরাগ পতিত আছে, তাহাতে মনে হইল ঐ তরু যেন চন্দনচয়ে চর্চ্চিত রহিয়াছে। ঐ কদম্বতরুর কোথাও কোন অঙ্গবৈকল্য নাই। রক্তাম্বর-পরিচ্ছদের ন্যায় সর্ব্বাঙ্গে উহার নবোদিত কিশলয়দল সুশোভিত হইতেছে। লতারূপিণী রমণী উহার অঙ্গসঙ্গিনী হইয়া বিরাজ করিতেছে; সুতরাং ঐ তরু যেন বৈবাহিকবেশে কুসুমমাল্যমণ্ডিত বর পাত্রের ন্যায় বিভাত হইতেছে। মুনিবর দাশূর ঐ কদম্বতরুর শাখার উপরি পর্ণশালাপ্রতিম একটী লতামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। উৎসব উপলক্ষে রাজপুরী যেমন ধ্বজ-পতাকা দ্বারা সুশোভিত হয়, ঐ বিশাল কদম্ববৃক্ষটী তেমনি পুষ্প-মঞ্জরী-রূপ পতাকাপুঞ্জে সমলঙ্কৃত হইয়াছে। মৃগগণ ঐ বৃক্ষগাত্রে গাত্রকণ্ডূয়ন করায় উহার পুষ্পপরাগ পতিত হইয়া উহাকে ধূসরশ্রী অর্পণ করিয়াছে। ঐ অত্যুচ্ছ্রিত কদম্বতরুর চতুষ্পার্শ্বে যে সকল বন আছে, উহা যেন সে সমুদায়কে অতিক্রম করিয়া ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়াছে, তদ্দর্শনে মনে হইল যেন একটা বৃহদাকার বৃষ সদম্ভে স্ফীত হইয়া আছে। ঐ বৃক্ষোপরি যে সকল বিচিত্রপুচ্ছ ময়ূর আছে, তাহারা কুসুমচ্যুত পরাগপটলে পাটলাভা ধারণ করায় বোধ হইল যেন ঐ কদম্বপাদপ শৈলস্থাপিত সান্ধ্য অভ্রখণ্ডগুলিকে কেশপাশবৎ ধারণ করিতেছে। পিকনাদিনী বনদেবীরা পুষ্পপরাগরূপ কুঙ্কুম-রাগ-রঞ্জিত রুচির বসন পরিধান করিয়া ঐ কদম্বতরুর মূলভাগ হইতে মস্তক ও পার্শ্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই স্ব স্ব নিবাস-নিলয় নির্ম্মাণপুরঃসর বাস করিতেছেন। ঐ বনদেবীরা সকলেই কিশলয়ারুণ-করশালিনী, পুষ্পহাস্য-বিকাসিনী, মধু-মদাবেশে ঘূর্ণিতাঙ্গী, পুলকোদ্গমে পূর্ণগাত্রী, কুসুমসমূহে সুশোভিনী, মন্দ মন্দ মারুতভরে স্পন্দনবতী এবং স্তবকস্তন-শালিনী। ঐ কদম্বপাদপে যে সকল লতামণ্ডপ আছে, ঐ বনদেবীগণ কখন কখন তদীয় বাতায়নবিবরে বিরাজ করেন এবং কখন বা নীলবর্ণ কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত বল্লীদোলায় লীলা-

সহকৃত নর্ত্তনবিলাস করিতে থাকেন। ঐ পাদপে কত লতাজাল জড়িত আছে, ঐ সকল লতায় এবং মঞ্জরীপুঞ্জে পর্য্যায়ক্রমে নীলকান্তি ভ্রমরেরা বসিয়া থাকায় এইরূপ এক একবার সন্দেহ হয় যে, ঐ ভ্রমরেরা কি লতাদিগের চক্ষু, কিম্বা ঐ কদম্বতরুরই চক্ষু? ঐ বৃক্ষের সতত-পতিত পুষ্পপরাগে অলি-দম্পতিদিগের সর্ব্বাবয়ব লিপ্ত হইয়াছে; ভ্রমর-ভ্রমরীরা উহার পুষ্পমধ্য-রূপ অন্তঃপুরে অবস্থান করিয়া পরস্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ হইতেছে এবং মদালসভাবে গুন্‌গুন্ রবে সহবাস-কালোচিত প্রণয়ালাপ করত নিপতিত নৈশ হিমকণায় স্ব স্ব রতিখেদ অপনয়নপূর্ব্বক ঐ কদম্বপাদপের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নানাদিকে নীলবর্ণ মক্ষিকাকুল গুন্‌গুন্ ধ্বনি করিতেছে; তাহাতে বোধ হয়, ঐ কদম্ব-পাদপের চতুষ্পার্শে যে সকল কানন আছে, ঐ কাননরূপ নিজ নগরের মধ্যবর্ত্তী মৃগ ও পক্ষীদিগের কোলাহলধ্বনি শুনিবার জন্যই যেন ঐ পাদপ ঊর্দ্ধোন্নত হইয়া উৎকর্ণ-ভাবে অবস্থান করিতেছে। নিশাকালে কত প্রাণী নিদ্রাবেশে ঐ কদম্বতরুর দলাগ্রদেশে স্বীয় স্বীয় সুন্দর সুন্দর শিরোভাগ স্থাপন করিয়া সুধাকর-করোল্লাসিত জলধি-মেখলা-মালিত মেদিনীর প্রতি ক্ষণে ক্ষণে নেত্রপাত করিতেছে। অর্থাৎ রজনীর কখন অবসান ঘটিবে, তাহারা যেন মধ্যে মধ্যে তাহাই তাকাইয়া দেখিতেছে। ঐ প্রাণিগণ যেন বনভূমির সন্তানসমূহের ন্যায় বিরাজমান। উহাদের প্রত্যেকেই মূর্ত্তিমান্ বিনয়বৎ বিরাজ করিতেছে। ঐ প্রাণিগণ পত্রগুচ্ছের অভ্যন্তরে বিলীন হইয়া রহিয়াছে। উহাদের অবস্থান-হেতু ঐ পাদপের শাখাদি অবয়ব যেন সুশোভিত ও সার্থকীভূত হইয়াছে। উহার কুলায়কুলের মধ্যে মধ্যে কত অগণিত পক্ষিদল বিশ্বস্তভাবে নিদ্রা যাইতেছে। ঐ বৃক্ষ হইতে অনবরত যে সকল পক্ক ফল পতিত হইতেছে, উহাদের উপরিভাগে ভ্রমরনিকর নীরবে অবস্থান করিতেছে; উহাদিগকে অনেক সময় প্রান্তচারী জন্তুগণের কৃষ্ণবর্ণ কঞ্চুকাবলী বলিয়া ভ্রম হয়। পক্ষীগণের পল্লবোল্লাসিত কুলায়কুলে কদম্বতরুর পর্য্যন্তদেশ শ্যামীকৃত হইয়াছে। কত কুসুমময় লতাগুচ্ছ অক্ষসূত্রের ন্যায় লম্বিত রহিয়াছে, তাহাতে সমগ্র কানন সুরভিত হইয়া উঠিয়াছে। ঐ কদম্বতরু হইতে প্রতিনিয়ত এত কুসুমপুঞ্জ পতিত হইতেছে যে, তাহা দেখিলে এক একবার

মনে হয় যেন নভোদেশে পুষ্পবর্ষী জলদজাল সমাগত হইয়াছে। ঐ তরু-বরের তলদেশে পুঞ্জীভূত পরাগ এবং রাশি রাশি পুষ্প-ফল পতিত রহিয়াছে। অধিক বলিব কি। ঐ তরুর এমনতর একটী পত্রও নাই, যথায় না প্রাণি-গণ বাস করিতেছে বা যাহা না তাহাদের উপযুক্ত হইতেছে। উহার অধোদিকে কত অসংখ্য পত্র পতিত রহিয়াছে ; ঐ সকল পত্রের উপরিভাগে মৃগগণ শয়ন করিয়া শ্রমশান্তি অনুভব করিতেছে এবং অধঃপতিত প্রতি-পত্রের মধ্যে মধ্যে পক্ষিবৃন্দ নিলীন রহিয়াছে।

রামচন্দ্র ! আমি তখন এবম্বিধ গুণশালী বিশাল বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে সমস্ত রাত্রি যাপন করিলাম। বলিতে কি, সেই রাত্রি যেন আমার পক্ষে একটা মহোৎসবের ন্যায় বোধ হইল।

অনন্তর আমিও সেই দাশূরমুনির তনয়কে বিজ্ঞানালোক-রমণীয় অপূর্ব্ব উপদেশবাক্যে পরম প্রবোধ প্রদান করিলাম। তৎপরে প্রণয়ী পতি-পত্নীর নিকট রাত্রি যেমন মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইয়া যায়, তেমনি আমাদেরও পরস্পর আলাপ-ব্যবহারে সেই শর্ব্বরী মুহূর্ত্তবৎ চলিয়া গেল। রাত্রি প্রভাতে স্বর্গীয় অঙ্গনাগণের অঙ্গরাগের ন্যায় তারকা-স্তবক ক্রমশঃ ক্ষীণাভ হইয়া অদৃশ্য হইল। তখন আমিও সেই স্থান হইতে নির্গত হইলাম। আমি প্রস্থান করিলে মুনিবর দাশূর তদীয় তনয় সমভি-ব্যাহারে সেই কদম্বকাননের সীমান্ত পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে সঙ্গে আগমন করি-লেন। আমি সে স্থান হইতে তাঁহাকে বিদায় দিয়া স্বর-শৈবলিনীর তীর-দেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। অনন্তর সেই মনোমত স্থানে কিয়ৎকাল অবস্থান করিয়া পরে নভোমণ্ডলে উত্থিত হইলাম এবং সেখান হইতে ক্রমশ সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে গিয়া স্বস্থচিত্তে অবস্থান করিলাম।

হে রঘুনন্দন। তোমার নিকট এই দাশূরাখ্যায়িকা কথিত হইল। মুনিবর দাশূর যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা অতি সত্য কথা। এ জগৎ প্রতি-বিম্বপ্রায়, সত্যাকারে প্রতীয়মান হইলেও অসত্য ও অসন্ময়। হে রাঘব ! জগতের প্রকৃত রহস্য কি, তাহা তোমাকে বুঝাইবার নিমিত্তই এই দাশূরা-খ্যায়িকা বর্ণন করিলাম। অতএব এই যে বাস্তবীরূপে প্রতীয়মানা সংসার-রঞ্জনা, ইহাকে তুমি দাশূরমুনির উপদিষ্ট সিদ্ধান্ত অনুসারে অবাস্তবী জ্ঞানে

পরিহার কর এবং সর্ব্বদা আত্মজ্ঞানময় উদারহৃদয় হইয়া অবস্থান করিতে থাক।

হে রাম! তোমায় আবার বলি, তুমি আত্মার বিকল্পমল বিধৌত করিয়া বিমল আত্মতত্ত্ব সন্দর্শন কর, ইহাতে অচিরে তোমার পরম পদ প্রাপ্তি ঘটিবে এবং তুমি নিখিল ভুবনে পূজনীয় হইতে পারিবে।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এ জড় জগৎ বাস্তব নহে; ইহার অস্তিত্ব একেবারেই নাই, এইরূপ নির্ণয় করিয়া 'অহং' 'মম' ইত্যাকার সংসাররঞ্জনা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ কর। বস্তুতঃ যাহা নাই, তাহার প্রতি বিচারবান্ বিজ্ঞ জনগণের আবার আস্থা হইতে পারে কি? তুমি যদি এরূপ মনে কর' যে, এই দৃশ্যমান দেহাদি তোমার সত্তা-সাপেক্ষ না হইয়া পৃথক্ সত্তা প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলে তুমিও সেই দেহাদি সত্তার সাপেক্ষতাহীন আপনার অসঙ্গ উদাসীন চিদাত্মাতেই অবস্থান কর; অসাপেক্ষ দেহাদিতে আত্মতাবন্ধন কর কেন? স্থূল কথা,—এই দেহাদি দেখা যায় বলিয়া তাহার যদি কোন সত্তা থাকে, তবে সে সত্তা তুমি বৈ আর কেহই নয়; কেন না, তোমার অস্তিত্ব আছে বলিয়াই তোমার নিকট তৎসমস্তের অস্তিত্ব। অতএব তুমি আত্মাতে ভাবনাবিরহিত হও; পরন্তু এই জড় জগতের ভাবনায় আত্মাকে অনর্থক আবদ্ধ করিও না। এরূপ করা তোমার পক্ষে সমুচিত হয় না। দৃশ্যমান দেহাদির অস্তিত্ব অঙ্গীকার ও তাহাতে আস্থা সংস্থাপন একেবারেই অকর্ত্তব্য। অথবা ইহাতে যদি তুমি অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব এই উভয়ই আছে বলিয়া নিশ্চয় করিয়া থাক, তাহা হইলে বলিব, এ প্রকারে ভাবনাসঙ্গ হওয়াও সঙ্গত নহে; কেন না, যাহা চলাচল অর্থাৎ অস্তিত্ব এবং নাস্তিত্ব এই উভয় ধর্ম্মের পরস্পর বিরোধ-

হেতু যাহার স্বভাব অনিয়ত, তাহাতে আত্মাধ্যাসের সঙ্গতি হয় কিরূপে ?

হে মহামতে ! যদি এই জড় জগতের পৃথক্ অস্তিত্ব না রহে, তবে তোমার বন্ধনও থাকে না ; তখন বুঝা যাইবে—কেবল শুদ্ধ স্বচ্ছ আত্মতত্ত্বই এবম্প্রকারে সর্ব্বত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। ফলতঃ আত্মতত্ত্ব ব্যতীত অন্য রঞ্জনার অবকাশ মাত্র নাই। এই জগতের কেহই কর্ত্তা নাই, অথচ ইহাতে যে কর্ত্তৃব্যাপার নাই, এমনও বলা যায় না। বস্তুতঃ কর্ত্তৃত্ব এবং অকর্ত্তৃত্ব এই উভয় ব্যাপার লইয়াই এ জগৎ আপনা হইতেই প্রকাশমান। এখন কথা এই, এ জগৎ অকর্ত্তৃক হয় হউক আর সকর্ত্তৃকই হয় হউক, তুমি কিন্তু ইহাতে দেহাত্মভাবনা করিও না ; চিত্তাতীত হইয়া অবস্থান কর। বলিতে পার, কেন—শ্রুতিবাক্যে ত আত্মাকেই জগতের কর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে ; সুতরাং জগৎ অকর্ত্তৃক বলিব কিরূপে ? তদুত্তরে বক্তব্য,—শ্রুতি যে আত্মার কর্ত্তৃত্ব ঘোষণা করিয়াছেন, সে কর্ত্তৃত্ব ঔপচারিক মাত্র ; কেন না আত্মা নিরিন্দ্রিয়। নিরিন্দ্রিয় আত্মা জগতের কর্ত্তা হইলে বুঝিতে হইবে—তাঁহার সে কর্ত্তৃত্ব জড়ের কর্ত্তৃত্বেরই তুল্য। যেমন লৌকিক বাক্যে প্রচলিত আছে—'মঞ্চ শব্দ করিতেছে'। বস্তুতঃ সে ত শব্দ করে না ; তাহার সে শব্দকর্ত্তৃত্ব একটা উপচার বৈ আর কিছুই নহে। এইরূপে ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে আত্মার ঔপচারিক জগৎকর্ত্তৃত্ব ব্যতীত জগতের উপর অন্য কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয় না। কাজেই তিনি উহার কর্ত্তা হইবেন কিরূপে ? এখন কথা এই, যদি কোন কর্ত্তাই নাই, তবে জগৎ জন্মিল কিরূপে ? আমার ধারণা—এ জগৎ কাকতালীয়-ন্যায়ে কর্ত্তৃহীন হইয়া আপনা হইতেই জন্মিয়াছে। সুতরাং জন্ম একটা আকস্মিক ঘটনা ; প্রকৃত কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব ইহাতে কিছুই নাই। এখন বুঝিয়া দেখ, যাহার জন্ম কাকতালীয়যোগে নিষ্পন্ন, তাহা ত অনুল্লেখ্য তুচ্ছ বস্তু বলিয়াই গণ্য ; সুতরাং তাহাতে ভাবানুবন্ধন বা মমত্ব স্থাপন একমাত্র নিতান্ত অজ্ঞ বালক ব্যতীত আর কেহই করে না।

রামচন্দ্র ! এ জগৎ নিরন্তর দেখা যাইতেছে এবং পুনঃপুন ইহা উৎপন্ন হইতেছে, এইজন্য ইহাকে কখন শান্ত অর্থাৎ অত্যন্তাভাবাত্মক শূন্যস্বভাব বলিয়া ব্যাখ্যাত করা যায় না এবং ইহা ক্ষয়ী অর্থাৎ প্রধ্বংস-

প্রযুক্ত শূন্যস্বভাব বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট করিতে পারি না; অপিচ এ জগৎ অজস্রই ক্ষয় পাইতেছে বলিয়া কদাপি ইহার অস্তিত্ব অঙ্গীকার করা যায় না এবং অনুমানতঃ নাস্তিত্বনিবন্ধন ক্ষয়ী বলিয়াও নির্দ্দেশ করিতে পারি না। কেন ক্ষয়ী বলা যায় না? তাহার কারণ এই যে, যাহা ক্ষয়ী হইবে, পূর্ব্বে তাহার অস্তিত্ব থাকা প্রয়োজন; পরন্তু একেবারেই যাহার অসদ্ভাব, তাহার আবার ক্ষয় হইবে কি? স্থূল কথা, এ জগৎ আত্মার ন্যায় সর্ব্বথা সৎস্বভাবও নহে এবং ইহা ক্ষণিক-সত্তাস্বভাব বলিয়াও ব্যাখ্যাত হইবার নহে। প্রথম উক্তির বাধক—প্রতিক্ষণে ইহার পরিণামভেদে ক্ষীয়মাণত্ব-অনুভব এবং দ্বিতীয় উক্তির বাধক—অনাদি অনন্ত পূর্ব্বোত্তর কালে এবং এই বর্ত্তমানরূপে নির্দ্দিষ্ট ক্ষণেও ইহার অসত্তানুমান। যিনি অনাদি, অনন্ত ও নিখিল ইন্দ্রিয়পদের অতীত, সেই পরমাত্মা কর্ত্তা হইলেও সর্ব্বদাই যখন বিজ্বর, তখন নিয়তি প্রযুক্ত সৃষ্টিব্যাপারে তদীয় সন্নিধি-মাত্রে কর্ত্তৃত্ব থাকিলেও সৃজ্যাভিমানে তাঁহার তাহাতে খেদপ্রাপ্তি কদাপি সম্ভাবিত নহে। এই ভাব ও অভাবদশাময়ী নিয়তি যতই কেন প্রৌঢ়, দীর্ঘ বা স্থির হউক না, ইহা মিথ্যা হইতেই জন্মিয়াছে এবং তাঁহারই সন্নিধানমাত্রে ইহার তদনুরূপ সত্তা অনুভূত হইতেছে। আত্মা কর্ত্তা হয়েন, হউন; কিন্তু এরূপ ধারণা করা কখনই উচিত নহে যে, তিনি তাহার সহিত একলোল হইয়া দুঃখানুভব করেন। মনুষ্যের জীবনকালের পরিমাণ শত বৎসর মাত্র। এই যে শত বর্ষকাল, ইহা অসীম অনন্ত কালের এক অতি ক্ষুদ্রতম অংশবিশেষ। যিনি অনাদি অমধ্য ইন্দ্রিয়াতীত পরমাত্মা, তিনি কি নিমিত্ত সেই সামান্য শত বৎসরের জন্য মনুষ্য-দেহাত্মভাব প্রাপ্ত হইয়া বিষয়ের দিকে ধাবিত হইবেন? যদি এ জগতের সকল ভাবও স্থিরস্বভাব হয়, তথাপি চৈতন্যস্বভাব আত্মার ইহাতে আস্থাস্থাপন করা সুসঙ্গত হয় না। ইহার কারণ এই যে, জগদ্ভাব—জড়, আত্মা—চেতন; জড় ও চেতন এই দুই বিসদৃশ ভাবের পরস্পর সম্বন্ধ অসঙ্গত হইয়া পড়ে না কি? আর যদি ইহাই নিশ্চয় হয় যে, জগদ্ভাব অস্থির বা চঞ্চল, তাহা হইলে ত ইহার উপর আস্থা স্থাপন করিতে যাওয়াই অন্যায়; কেন না, জলফেনার ন্যায় অস্থিরভাবে আস্থা স্থাপন করিলে সেইভাব যখন অপগত হইবে, তখন পূর্ব্বে আস্থা বা মমতা স্থাপন

করা হইয়াছিল বলিয়া সে জন্য শেষে কষ্ট বোধ অনিবার্য্য হইয়াই উঠিবে।

হে মহাবাহো! এ জগৎ স্থির বা অস্থির যাহা হয় হউক, ফেন-শৈলবৎ ইহাতে আস্থা স্থাপন কোন ক্রমেই শোভন হয় না। কেন না, কে জানে—কখন ভাঙ্গিয়া যাইবে? আত্মা সকলেরই কর্ত্তা, এ কথা সত্য; কিন্তু কর্ত্তা হইয়াও অকর্ত্তার ন্যায় তিনি কিছুই করেন না। দীপ হইতে আলোক হয় বটে; কিন্তু সে যেমন আলোক-দানের কর্ত্তা নহে—উদাসীন; আত্মাও তেমনি জগৎকার্য্যের কারণ হইলেও অকর্ত্তা—উদাসীন। দিবাকর হইতে প্রাণিগণের দিবাকার্য্য সমাহিত হইতেছে, এইরূপই বটে বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি যেমন নিষ্ক্রিয়, আত্মাও তেমনি কর্ত্তৃরূপে ভাসমান হইলেও কর্ত্তা নহেন। লোকে মনে করে বটে যে, সূর্য্য গমনাগমন করিতেছেন; কিন্তু বাস্তব পক্ষে ঐরূপ ধারণা যেমন সত্য নহে, তিনি সদা আপন আস্পদেই অবস্থান করেন, তেমনি আত্মাকে গমনশীল বলিয়া বোধ হইলেও এ কথা নিশ্চিতই যে, তিনি কোথাও গমন করেন না। অরুণানদীর জলাবর্ত্তের ন্যায় এই জগতের স্থিতি ও বিস্তৃতি কি যেন কোথা হইতে কি একটা আশ্চর্য্য-ব্যাপারের ন্যায় সম্পন্ন বলিয়া লক্ষিত হইতেছে। অর্থাৎ অরুণা নাম্নী নদীর তীরদেশ স্বভাবতই শিলাসমূহে বৈষম্যযুক্ত। পরন্তু এই শিলাবৈষম্য বিষয়ে সে সম্পূর্ণ উদাসীন; এ কথার অর্থ—সে সেই বৈষম্য ঘটায় নাই। তাহার গর্ভে যে জল আছে, সে জলের পরিমাণাদিও নিম্নানুসারী। প্রবাহবৈষম্যে ইহারও কোনই কর্ত্তৃত্ব নাই; পরন্তু ঐ নদীর তাদৃশ শিলাসঙ্কুল তীর ও জলের পূর্ণতা এই উভয়ের সান্নিধ্য বশতঃ ঘোরতর আবর্ত্ত জন্মিয়া থাকে। এখন বলিতে হইবে কি যে ঐ নদী উহার কর্ত্রী? বস্তুতঃ কোন এক আকস্মিক কারণে ঐ আবর্ত্ত উৎপন্ন হইয়াছে; তাহার তাহাতে কর্ত্তৃত্ব নাই। এইরূপ ধারণাই এ ক্ষেত্রে সুসঙ্গত। এইরূপে চিৎ ও জড় এই উভয়ের সান্নিধ্য বশতঃ এই অসত্য আশ্চর্য্য দৃশ্য বিশ্ব জন্ম লইয়াছে; কিন্তু আত্মা ইহার কর্ত্তা নহেন। আত্মার উপর ঐ কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব নিক্ষেপ করা একান্তই অযৌক্তিক।

হে রাম! তুমি যদি নিপুণতার সহিত প্রমাণ-পরিশুদ্ধ-চিত্তে ঐরূপ বিচারালোচনা করিয়া অবধারণও করিয়া থাক, তাহা হইলেও তোমায় বলিব—হে

সাধো! তুমি আর পদার্থ ভাবনা করিও না। কে আছে বল, অলাতচক্র, স্বপ্ন ও ভ্রান্তির ভাবনা করিয়া ক্লেশানুভব করে? জীব অকস্মাৎ সমাগত হইয়াছে; সে জন্য সে মৈত্রীর ভাজন নহে। এই দৃশ্য বিশ্বটাই ভ্রান্তি-বিলসিত ও অকস্মাৎ আগত; সুতরাং ইহাও কাহারও বিশ্বাসের পাত্র হইতে পারে না। যেমন শীতার্ত্ত হইয়া উষ্ণ ভ্রমময় নিশাকরে তাপার্ত্ত হইয়া ভ্রান্তিজনিত শৈত্যময় দিবাকরে এবং তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া মৃগতৃষ্ণাজলে কখনই তুমি আস্থা স্থাপন কর না, তেমনি এই জগৎস্থিতি বিষয়েও কিছুমাত্র প্রত্যয় করিও না; কেন না, ইহাতে আস্থা-স্থাপনে সুখ কিছুই ঘটে না। মনঃকল্পিত পুরুষকে যেমন প্রত্যক্ষ কর, স্বপ্নদৃষ্ট লোককে যেমন দেখিয়া থাক এবং যেরূপ ভাবে দুইটী চন্দ্রের উদয় লক্ষ্য কর, এই যে জাগতিক পদার্থ-পরম্পরা, ইহাকেও সেইরূপে সেই ভাবে অবলোকন কর। ফলে, উল্লিখিত মনঃকল্পিত পুরুষ প্রভৃতিতে সত্য ধারণায় আস্থাবান্ না হইবার ন্যায় এই দৃশ্য ভব-ভাবেও আস্থাবান্ হইও না। তুমি বস্তু-সৌন্দর্য্যের অনন্ত চিন্তাময়ী ভাবনাকে অন্তরে আর স্থান দিও না। অকর্ত্তৃত্বপদ ও কর্ত্তৃত্বপদ এবং সেই সেই পদের ইচ্ছা বা অনিচ্ছা সকলই বিসর্জ্জন দিয়া পরে যে ভাবে তুমি পরিশিষ্ট হইবে, সেই ভাবেই এ জগতে তুমি বিহার করিতে থাক। যিনি নিখিল বস্তুর অন্তঃস্থ সর্ব্বাতীত আত্মা, তিনি তুমিই বৈ আর কেহই নহেন। তুমিই যদি উদাসীনভাবে ব্যবহার-পরায়ণ হও, তাহা হইলে তোমারই সান্নিধ্যমাত্রে নিরিচ্ছ হইয়া নিয়তি বিকাশ পাইবে অর্থাৎ তোমার ইচ্ছা থাকিবে না, তুমি আর জগদ্ভাবে ভাবিত হইবে না। ইহার দৃষ্টান্ত-স্বরূপ প্রদীপপ্রভার উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রদীপের সান্নিধি হেতু প্রভা প্রকাশিত হইয়া থাকে; পদার্থ প্রকাশের ইচ্ছা তাহার না থাকিলেও স্বতই তাহাতে পদার্থ প্রকাশ পায়। এইরূপ তোমারও সান্নিধ্যে নিয়তি তখন নিরিচ্ছ হইয়া ব্যবহারাকারে প্রথিত হইতে থাকিবে। বর্ষায় বারিধরের সন্নিধিমাত্রে নিরিচ্ছ কুটজকুসুমকুল যেমন স্বয়ংই প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে, তেমনি ইচ্ছাহীন পরমাত্মার সন্নিধানমাত্রেই এই ত্রিজগৎ আপনা হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। দিবাকরের ইচ্ছা কিছুই নাই; আকাশে তাঁহার অবস্থান মাত্রেই লোক-ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়; এইরূপ-

পরমাত্মার সত্তাতেই জাগতিক ক্রিয়াকলাপ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অপিচ কোন নিরিচ্ছ রত্ন কোথাও অবস্থিত রহিলে তাহা হইতে যেমন স্বতই আলোক প্রবর্ত্তিত হয়, তেমনি পরমাত্মসত্তার সামীপ্যমাত্রেই এই নিখিল জগজ্জাল প্রকট হইয়া উঠে। অতএব বুঝিতে হইবে, আত্মাতে কর্ত্তৃত্ব এবং অকর্ত্তৃত্ব, উভয়ই অবস্থিত। তাঁহার কোনই ইচ্ছা নাই; এইজন্য তিনি অকর্ত্তা এবং তাঁহার সন্নিধ্যযোগে এ জগৎ উৎপন্ন হয়, এইজন্য তিনি কর্ত্তা। বাস্তবিক পক্ষে তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়পদের অতীত; তাই তাঁহাকে কর্ত্তা বা ভোক্তা কিছুই বলা চলে না। তিনি সৎস্বরূপ, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অন্তরেই তাঁহার অবস্থিতি; এই জন্য তিনি আবার কর্ত্তা ও ভোক্তা উভয় নামেই নির্দ্দিষ্ট।

হে অনঘ! পরমাত্মায় কর্ত্তৃত্ব এবং অকর্ত্তৃত্ব উভয়ই উল্লিখিতরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। এখন বুঝিয়া দেখ, উক্ত উভয়ের মধ্যে যাহা দ্বারা তোমার শ্রেয়োলাভ হইতে পারে, তাহাকে আশ্রয় করিয়াই তুমি স্থির হইয়া অবস্থান কর। 'সর্ব্বত্রই আমি অবস্থান করিতেছি, আমি কিছুরই কর্ত্তা নহি' এইরূপ ভাবনাকে যদি দৃঢ় করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে প্রবাহ-পতিত কার্য্য-পরম্পরার অনুষ্ঠান করিলেও তাহাতে লিপ্ত হইতে হয় না; যিনি মনে করেন, 'আমি কিছুই করি না; আমি কর্ত্তা নহি' তাঁহার চিত্তের অপ্রবৃত্তি নিবন্ধন তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিয়া থাকে। তিনি আর কখন বিষয়ের প্রতি আসক্তি করেন না। পরন্তু ভোগসমূহে যাহার স্পৃহা রহিয়াছে, তথাবিধ জন উক্তরূপ নিশ্চয় করিবে কিরূপে? এবং কিরূপেই বা তাহার ভোগরাশি পরিত্যক্ত হইবে? ফল কথা এই যে, ভোগলিপ্সা যত কাল থাকিবে, সে কালের মধ্যে কৃতকার্য্যতা লাভ কোনরূপেই হইবে না। এই জন্যই বলিতেছি যে, 'আমি কর্ত্তা নহি, অকর্ত্তা' নিত্য এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে চিত্ত যখন রাগহীন হইয়া উঠে, তখনই সর্ব্বত্র সমত্তারূপ এক পরমামৃত অবশিষ্ট থাকে। পক্ষান্তরে হে রাম! যদিই বা 'আমিই সকল করিতেছি' এইরূপ একটা মহাকর্ত্তৃত্ব অবলম্বন করিয়া থাকিতে চাও' তাহা হইলে বলিব—সে ইচ্ছাও অশুভ নহে; তত্ত্বজ্ঞগণের মতে তাহাও উত্তম কল্প। 'অহো! আমি এই নিখিল জাগতিক ভ্রমের কিছুই করিতেছি না' ইত্যাকার অকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিলে বিষয়ানুরক্তি বা বিষয়-

বিদ্বেষ কিছুই থাকে না। পক্ষান্তরে 'আমিই জগতের একমাত্র কর্ত্তৃপদ-বাচ্য, ইহাতে অন্যের কর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। অন্তরে যখন এইরূপ দৃঢ় ধারণা বদ্ধ-মূল হয়, তখনই বা রাগ-দ্বেষাদি থাকিবার সম্ভাবনা কি? অন্যদিকে 'এ জগতের আমি কেহই নহি, আমি যে এরূপ হইয়াছি, সে কেবল স্বাভাবিকী নিয়তিরই মহিমা। এই যে আমার দেহ রহিয়াছে' ইহার উৎপাদন, লালন, পালন কিম্বা দাহন, ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়াই অন্য কর্ত্তৃক সমাহিত হয়' অন্তরে যখন এরূপ অকর্ত্তৃকত্ব দৃঢ় হইয়া উঠে, তখনও রাগ-দ্বেষাদি-ক্রম থাকিবার নয়। একমাত্র আমারই সুখ কিম্বা দুঃখভোগার্থ এ জগতের ক্ষয়োদয় আমিই বিধান করিতেছি; ঐ কার্য্য একমাত্র আমারই আয়ত্ত। এই প্রকার এককর্ত্তৃকভাব যদি সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তাহা হইলেও হর্ষামর্ষ বিদূরিত হইয়া যায়। আমিই একমাত্র কর্ত্তা, এইরূপ এক-কর্ত্তৃকতায় খেদোল্লাসাদি নিখিল সুখ-দুঃখ-ভাব বিলয় পাইয়া গেলে যাহা অবশিষ্ট থাকে' তাহা একমাত্র সমত্ব। সর্ব্বভূতে যে সমত্ব, তাহাই পরম সত্য-স্থিতি। এই সত্যস্থিতিতে যাহার চিত্ত অবস্থিত, তাদৃশ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কদাপি জনন-মরণ-জনিত দুঃখদৈন্য ভোগ করেন না।

হে রাঘব! তোমায় বলি, তুমি এই সমস্ত কর্ত্তৃত্ব এবং অকর্ত্তৃত্ব পরি-ত্যাগপূর্ব্বক মনোনাশ করিয়া যেরূপ হও, সেইরূপেই অবস্থান কর। জনগণ নিজ নিজ দুঃখের নিমিত্তই 'এই আমি, আমি উহা নহি, ইহা আমি করি এবং উহা আমি করিতেছি না' এ হেন ভাবময়ী দৃষ্টির অনুসন্ধানে লিপ্ত থাকে। বস্তুতঃ এইরূপ ভাবানুসন্ধান একান্তই অনিষ্টের মূল। 'এই দেহই আমি' এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া যাহারা অবস্থিত, তাহাদের ঐ অবস্থিতিই কালসূত্র নরকে গমন করিবার পন্থা, মহাবীচিনামক নরকে গিয়া আবদ্ধ হইবার বন্ধনী এবং অসিপত্রনামীয় নরকের সংস্থানভূমি। ফলকথা এই যে, ঐ রূপে দেহাদিতে 'অহং' বুদ্ধি স্থাপন করিলে উল্লিখিত নরকনিচয়েই নিপতিত হইতে হয়। যদি এমনও ঘটে যে, সর্ব্বস্বনাশ করিতে হয় তবে তাহাও করিও, তথাপি দেহাদিতে যে ঐরূপ 'অহং' বুদ্ধি, তাহা সর্ব্বথা সর্ব্বযত্নে বিসর্জ্জন করাই বিধেয়। যিনি কল্যাণ কামনা করেন, তাদৃশ ভব্য জনের পক্ষে ঐ দেহাদিগত আত্মবুদ্ধিকে, করে কুক্কুরমাংস-ধারিনী

চাণ্ডালীর ন্যায় স্পর্শমাত্র করাও অবৈধ। ঐরূপ বুদ্ধি অধিষ্ঠানভূত বিশুদ্ধ আত্মদৃষ্টির আবরণ-বিক্ষেপের হেতুভূত; উহাকে দূরে পরিহার করিতে পারিলে তখন মেঘমুক্ত নির্ম্মল জ্যোৎস্নার ন্যায় পরম নির্ম্মল আত্ম-দৃষ্টি আবির্ভূত হইবে। হে রাম! তৎকালে তাদৃশ দৃষ্টিলাভে সংসার-সাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যাইবে।

হে পূত-চরিত্র! আমি কর্ত্তা নহি, এই যে কর্ত্তৃতাপ্রয়োজক দেহাদি—ইহাও আমি নহি, এইরূপ ধারণা স্থির করিয়া কিম্বা 'আমিই সকলের কর্ত্তা, এই নিখিল সমষ্টিভূত ব্রহ্মাণ্ডও আমি' এবম্প্রকার নিশ্চয়ের পর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে প্রতিষ্ঠিত হও। অথবা 'কে আমি! আমি ত কেহই নহি, আমিই পূর্ণানন্দ চিদাত্মা' এইরূপ জ্ঞান অন্তরে অর্জ্জন করিয়া পদাভিজ্ঞ উত্তম সাধুগণ যথায় অবস্থান করেন, তুমিও সেই স্বপদে অবস্থিতি কর।

ষট্‌পঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত॥৫৬॥

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আপনার উপদেশাবলী বড়ই সুন্দর বলিয়া বোধ হইল। আপনি যে আত্মাকে কর্ত্তা, অকর্ত্তা, ভোক্তা, অভোক্তা এবং সর্ব্বভূত-কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন, আপনার এই নির্দ্দেশ যে সম্পূর্ণই সত্য এবং যুক্তিযুক্ত, তাহা এক্ষণে বিলক্ষণই বুঝিতে পারিলাম। অপিচ আত্মাই যে সর্ব্বেশ ও সর্ব্বগ, এ কথাও এখন বুঝিলাম এবং তিনিই যে নির্ম্মল পদ, তিনিই যে সর্ব্বভূতের কলেবরস্বরূপ এবং তিনিই যে সর্ব্ব-প্রাণীর অন্তরে বিরাজমান। হে বিভো! অধুনা তাহাও আমার বিশেষ-রূপ হৃদয়ঙ্গম হইল এবং ব্রহ্ম যে কি পদার্থ, তাহাও আমি অন্তরে অন্তরে বুঝিতে পারিলাম। যেমন নবোদিত জলধরের বারিবর্ষণে ভূধরের নিদাঘ-তাপ অপনীত হয়, ভবন্মুখ-নিঃসৃত উপদেশ বচনে আমারও তেমনি হৃদয়ের জ্বালা জুড়াইল। পরমাত্মা উদাসীন; তাঁহার কোনই ইচ্ছা নাই। নিরিচ্ছ

বলিয়াই কিছুই তিনি ভোগ করেন না এবং কিছুই তিনি করেনও না। পক্ষান্তরে তাঁহারই সত্তায় সকল লোক সত্তালাভ করে বা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনিই সকলের প্রকাশক, এইজন্য ভোগও করেন এবং ক্রিয়াও করিয়া থাকেন। পরন্তু হে ভগবন্! এখনও আমার একটী বিষয়ে এক গুরুতর সংশয় আছে; অতএব হে ব্রহ্মন্! স্বীয় প্রভাপটলে তিমিরাপসারী সুধাকরের ন্যায় আপনি আমায় উপদেশ দানে আমার সেই সংশয়ের অপনোদন করিয়া দিন। আমার সংশয় এই যে, এই জগৎ সৎ বা অসৎ যাহাই হউক, ইহা সৎ, ইহা অসৎ, এই সেই আমি, উহা আমি নহি, এবম্বিধ বহুল অজ্ঞাননিদান কল্পনাজাল—যিনি নিয়ত একস্বভাব, স্বপ্রকাশতা নিবন্ধন যদীয় মোহান্ধকারের লেশমাত্র নাই, সেই স্বচ্ছ শুদ্ধ পরমাত্মায় ভাস্করে নীহারবৎ সম্পূর্ণ যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া প্রতিভাত হইলেও কিরূপে এক্ষণে স্থান প্রাপ্ত হইল? যদি বলেন, উহা প্রথমে মায়াশবল ব্রহ্মের উদরে প্রচ্ছন্ন-ভাবে অবস্থিত ছিল, অধুনা অভিব্যক্ত হইয়াছে; এইরূপ উত্তরবাক্যেও আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, আত্মা নির্ম্মল, তাঁহাতে উহা কিরূপে প্রথম অবস্থিত ছিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সিদ্ধান্তকালেই আমি তোমায় এই প্রশ্নের এক অখণ্ডনীয় উত্তর প্রদান করিব। তুমি তাহাতে ঐ বিষয় যথাযথ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। হে রাঘব! যত কালে না মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত প্রাপ্ত হও, ততদিন এই প্রশ্নের উত্তরশ্রবণের অধিকারই হইবে না; অর্থাৎ মোক্ষোপায়ের সিদ্ধান্ত লাভের পূর্ব্বে এই প্রশ্নোত্তর শ্রবণ করিলেও কিছুই বোধগম্য করিতে পারিবে না। হে রাম! যেমন যুবক জনই যুবতীকণ্ঠের গীতালাপ শ্রবণের যোগ্য পাত্র, তেমনি পুণ্যকর্ত্তা পুরুষই সাধু প্রশ্নাবলীর সদুত্তর-গ্রহণের সুভাজন। যুবতী যদি বালকের প্রতি প্রণয় বাক্য প্রয়োগ করে, তবে তাহা যেমন বৃথা হইয়া যায়, তেমনি যাহারা অল্পবোধ-বিশিষ্ট ব্যক্তি, তাহাদের নিকটে এই মোক্ষকরী কথা নিরর্থক হইয়া পড়ে। তুমি যে প্রশ্ন করিলে, এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর কোন একটা সময়বিশেষেই শোভা পায়; দৃষ্টান্ত দেখ, নাগরঙ্গাদি ফল শরৎকালেই ফলিয়া থাকে; বসন্তকালে তাহা হয় না। ফলতঃ এ সময়ে

এরূপ প্রশ্ন করা সমীচীন হয় নাই। যেমন বর্ণান্তরের রঞ্জনা নির্ম্মল পটেই স্পষ্টরূপে লাগিয়া থাকে, তেমনি যিনি জ্ঞানবৃদ্ধ ব্যক্তি—তাহাঁতেই বৈরাগ্যোপদেশ সুসংলগ্ন হইয়া থাকে। যাঁহার আত্মাধিগম ঘটিয়াছে, উদার বিজ্ঞানবাণী তাঁহারই বিশুদ্ধ বুদ্ধিতে প্রতিফলিত হয়। আমি পূর্ব্বেই তোমাকে এই প্রশ্নের উত্তরসম্বন্ধে কিছু কিছু আভাস দিয়াছি; তখন অবশ্য বিস্তৃতরূপে কিছুই বলি নাই; সেই জন্যই তুমিও তাহা স্পষ্টরূপে পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই। যদি তুমি আত্মাকে আপনা হইতেই অধিগত হইতে পার, তাহা হইলে এই প্রশ্নের উত্তর নিজ হইতেই নিশ্চয় সম্যক্ জানিতে পরিবে।

হে সাধো! যখন সিদ্ধান্ত কালে তুমি বোধ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করিবে, তখন তোমার নিকট এই প্রশ্নোত্তর আমি ক্রমশ বিস্তৃতরূপে ব্যক্ত করিব। সংসারী আত্মাকে আত্মাই জানিতে পারেন; কেন না, আত্মাই আত্মাকে সংসারী বা মলিন করিয়াছেন। সেই মলিন আত্মা যখন আত্মবোধে সুপ্রসন্ন হইয়া উঠেন, তখনই তিনি বস্তুতঃ পূর্ণ আত্মাকে প্রাপ্ত হয়েন। ফল কথা, মদীয় উপদেশ কেবল পথ-প্রদর্শনের কার্য্য করিবে; পরন্তু তুমিই আত্মা দ্বারা আত্মাকে প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিবে।

রামচন্দ্র! অখণ্ড ব্রহ্মতত্ত্ব কি, তাহা তোমাকে বুঝাইবার জন্যই আত্মার এই কর্ত্তৃত্ব অকর্ত্তৃত্ব বিচারপূর্ব্বক তোমার নিকট বলিয়াছি; আমি তাহা বলিলেও তুমি বোধ হয় আত্মার অখণ্ড-স্বভাবতা পরিজ্ঞাত হইতে পার নাই। পার নাই বলিয়াই নিশ্চয় তোমার বাসনা এখনও ক্ষীণ হয় নাই। বুঝিও—বাসনাবদ্ধ ব্যক্তিই প্রকৃত বদ্ধ, আর বাসনার ক্ষয়ই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত। তোমায় বলি, তুমি অগ্রে বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া পরে মোক্ষাকাঙ্ক্ষাও পরিত্যাগ কর। বিষয়-বাসিত তামসী বাসনাগুলিকে সর্ব্বাগ্রে পরিহারপূর্ব্বক মৈত্রী, করুণা ও মুদিতা প্রভৃতি যোগশাস্ত্রোক্ত ভাবনানাম্নী বিষয়-বাসনাগুলিকে গ্রহণ কর। অনন্তর বাহিরে মৈত্রী প্রভৃতি দ্বারা ব্যবহার-পরায়ণ হইয়া অন্তর হইতে সে বাসনাও পরিহার কর এবং সমস্ত বাহ্য চেষ্টা হইতে বিরত হইয়া অন্তরে একমাত্র চৈতন্যেরই বাসনা দৃঢ় করিয়া লইতে থাক। পরে তুমি মন ও বুদ্ধিসমন্বিত তথাবিধ

চিদ্বাসনাকেও বিদূরিত করত অবশেষে একমাত্র আত্মতত্ত্বে স্থির সমাধি লাভ করিয়া বিশ্রান্তিপদে প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যাহার সাহায্যে পূর্ব্বোক্ত নিখিল বাসনা পরিহার্য্য হইবে, তাহাকে শেষে পরিত্যাগ করিবে। তুমি কাল, কলনা, আলোক, অন্ধকারাদি বাসনা, যে কিছু বাসিত-বিষয়, বিষয়-দ্বার ইন্দ্রিয়বর্গ ও অহঙ্কার, ইহাদিগকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া—যিনি আকাশবৎ নির্ম্মল ও বিক্ষেপ-শক্তিহীন, তথাভূত আত্মার অখণ্ডাকারত্ব-বুদ্ধি অবলম্বন কর। এইরূপ করিলে, তুমি যে তখন চিন্ময়রূপে পরিণত হইতে পারিবে,—হে সদ্‌বুদ্ধে! সেই সর্ব্বপূজিত চিন্ময়ই তুমি হও। যে প্রশস্তবুদ্ধি পুরুষ হৃদয় হইতে যাবতীয় ভাব ও অভাবাদি উন্মূলিত করত সর্ব্ব-বিক্ষেপের হেতুভূত অভিমান বর্জ্জন করিয়া অবস্থিত হয়েন, তিনিই মুক্ত পুরুষ এবং তিনিই পরমেশ্বর। যাঁহার হৃদয় হইতে সমস্ত আস্থা নিরস্ত হইয়াছে, তিনি সমাধিই করুন কিম্বা অন্যান্য কর্ম্মানুষ্ঠানই করুন অথবা এতদুভয়ের কিছু নাই করুন, তথাবিধ উত্তমাশয় ব্যক্তি যে মুক্ত হইয়াছেন, তাহা নিশ্চিতই। মনে যাঁহার বাসনার লেশ-মাত্রও নাই, কি নিষ্কর্ম্ম, কি কর্ম্মসমাধি, কি জপ-তপ, এতৎসমস্তের একটীরও তাঁহার প্রয়োজন নাই। বুধগণ বহুদিন ধরিয়া অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের বিচারালোচনার পর এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, বাসনাসমূহের বিসর্জ্জন-পূর্ব্বক মৌন ব্রত গ্রহণ করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন আর নাই। বারম্বার দিগ্‌দিগন্ত পরিভ্রমণ করিয়া অনেকেই অনেক দ্রষ্টব্য বস্তু দেখিয়া থাকেন বটে; কিন্তু যাহা সত্য বস্তু, তাঁহার সহিত চাক্ষুষ সম্বন্ধ কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? যাহা যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কোনটীই ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত হইতে ভিন্নরূপে বিদ্যমান নাই; কিন্তু যাহা ইচ্ছা বা অনিচ্ছা এতদুভয়ের বিষয়ীভূত নহে, তথাবিধ আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকারার্থ কাহারই যত্ন নাই। পরন্তু কেবল ঈপ্সিত বা অনীপ্সিত বস্তুর দর্শনেই সাধারণতঃ সকলের যত্ন প্রকাশ পায়। গৃহ ও অট্টালিকাদি যে কিছু লৌকিক বিষয় এবং যাগ-যজ্ঞাদি যে কিছু বৈদিক ক্রিয়াকলাপ, সকলই একমাত্র দেহের নিমিত্ত। ঐ সমুদায়ের মধ্যে আত্মার প্রয়োজনীয় বলিয়া কোন কিছুকেই নির্দ্দেশ করা যায় না। কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল, কি ব্রহ্মলোক, কি গগণতল,

যাঁহারা তত্ত্ব দর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের সংখ্যা ঐ সকল লোকের কচিৎ কোথাও অতি অল্পই দেখা যায়। ইহা হেয়, ইহা উপাদেয়, ইত্যাকার নিশ্চয় আত্মার অজ্ঞানজন্যই হয়। এই নিশ্চয় যাঁহার বিগলিত হইয়া যায়, তথাবিধ তত্ত্বজ্ঞ জগতে অতি দুর্লভ জন। লোক, ভুবন-রাজ্যের আধিপত্যেই প্রতিষ্ঠিত হউক, ইন্দ্রপদ প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় প্রভাবে মেঘমণ্ডলেই প্রবেশ করুক, কিম্বা বরুণপদে বিরাজিত হইয়া জলমধ্যেই লব্ধপ্রবেশ হউক, আত্মলাভ ব্যতীত প্রকৃত বিশ্রান্তি তাহার কিছুতেই ঘটিবার নয়। একমাত্র আত্মসাক্ষাৎকারেই নিরবচ্ছিন্ন সুখ-শান্তি সঙ্ঘটিত হয়; তদ্ব্যতীত জগতে এমন একটা কোন সুখই নাই, যাহাতে দুঃখ একেবারেই নাই। যে সকল মহামতি মহাপুরুষ ইন্দ্রিয়-শত্রুদিগকে জয় করিতে পারিয়াছেন, ভব-রোগ প্রশমন করিবার নিমিত্ত সেই সকল উদারধী সুধীগণই উপাসনার যোগ্য। স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল সর্ব্বত্রই পঞ্চভূত বিরাজমান। পঞ্চভূতাতিরিক্ত ষষ্ঠভূত আর কুত্রাপি কিছুই নাই। সুতরাং ধীরধী ব্যক্তি কোথায় গিয়া রতি প্রাপ্ত হইবেন? ফলতঃ তথাবিধ পুরুষ ঐ সমুদায়কে তুচ্ছ বা মিথ্যা বলিয়া মনে করেন, তাই তাহাতে তাঁহা-দের আসক্তি থাকে না। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ যুক্তির সহিত সমস্ত বিষয় বিচার করেন। বিচারে তাঁহাদের নিকট এ সংসার গোষ্পদবৎ সহজেই তরণীয় বলিয়া প্রমাণিত হয়। তত্ত্বজ্ঞগণের সেই যুক্তি এই যে, সর্ব্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মচৈতন্যমাত্রের সাক্ষাৎকার এবং অন্যান্য যত কিছু বস্তু, তৎসমস্তের মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়। এতাদৃশ যুক্তি যাঁহার দূরে পরিহৃত হয়, এ সংসার তাঁহার নিকট প্রলয়োদ্বেল মহাব্ধির ন্যায় অসীম অনন্তাকারে প্রতীত হইয়া থাকে; কাজেই তথাবিধ অগৃহীতযুক্তি অতত্ত্বজ্ঞ লোকের পক্ষে এ সংসারের পর-পারে উপনীত হওয়া কদাপি সম্ভাব্য হইতে পারে না। যাঁহার চিত্ত অখণ্ড ব্রহ্মানন্দ লাভে বিস্ফারিত হইয়াছে, কিছুমাত্র চিত্তমালিন্য যাঁহার নাই, তাঁহার নিকট এই ব্রহ্মাণ্ড কদম্ব-গোলকবৎ অতীব ক্ষুদ্ররূপে প্রতিভাত; সুতরাং তাঁহার অপ্রাপ্য কিছুই থাকে না, সকলই তিনি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই নিমিত্ত অতি তুচ্ছ ধন-দারাদি বিষয়ে তিনি আর তখন দান বা ভোগাদি বাঞ্ছা একেবারেই রাখেন না। মানবেরা দুর্ব্বুদ্ধি বা দুরাকাঙ্ক্ষায়

প্রণোদিত হইয়া রাজ্যসুখ-লাভ-লালসায় মহা-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয় এবং লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ সংহার করে। রাম! যাহার জন্য এইরূপ প্রাণিহত্যা সঙ্ঘটিত হয়, সেই রাজ্যসুখকে আমি ধিক্কারযোগ্য বলিয়াই মনে করি। তত্ত্বজ্ঞ জনের বিধাতৃ-পদ-লাভেও রতি নাই; কেন না, তাঁহারা জানেন, সে পদও চিরস্থির নহে। যত দিনে না মহাপ্রলয় সঙ্ঘটিত হয়, ঐ পদ ততদিনই স্থির থাকে; কিন্তু তাহার পরেই সেই সর্ব্বপ্রাণীর আধি-বিধায়ক বিনাশ-বিধি নিশ্চয়ই আসিয়া উপস্থিত হয়। যাহাদের বুদ্ধি-শুদ্ধি নাই; যাহা আছে, তাহাও মোহাচ্ছন্ন, তাদৃশ লোকেরাই উল্লিখিত বিধাতৃ-পদের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া থাকে; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ জন, তিনি উহার অস্থায়িতা-নিবন্ধন উহাকে তুচ্ছ বলিয়াই মনে করেন। তত্ত্বজ্ঞ জনের দৃষ্টিতে ইহা স্পষ্টতই দৃষ্ট হইয়া থাকে যে, এই ত্রিজগতের উৎপত্তি, সৃষ্টি-প্রভৃতি উপায় দ্বারা একটুকু মাত্রও সঙ্ঘটিত হয় নাই। বাস্তব পক্ষে ইহা একটা ভ্রান্তিরই খেলা; সুতরাং এ হেন ভ্রান্তিময় ত্রিজগৎকে প্রাপ্ত হইলে চিন্ময় আত্মার এমন কি বলসঞ্চয় হয় যে, তাহাতে তাঁহার অবশ্যই অনুরাগ জন্মিবে? এই পৃথিবীর এক দিক্ শত শত শৈলে এবং অপর দিক্ অগাধ জলধিজলে পরিপূর্ণ; সুতরাং যিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া বিপুলাশয় হইয়াছেন, তাঁহার অবস্থানযোগ্য স্থান এ পৃথিবীতে কতটুকু বিদ্যমান আছে? অপিচ কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল, কুত্রাপি এমন কোনই কার্য্য নাই, যাহা তত্ত্বদর্শী সুধীজনের পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে।

হে রাঘব! যাঁহার মন বিগলিত হইয়াছে, এবং যিনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়া ব্যোমবৎ বিস্তৃত, একত্বপ্রাপ্ত ও স্বস্থ বা পরমাত্মপদে অবস্থিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট নিত্য-দীপ্ত নির্ম্মল ব্রহ্মই অপার অপর্য্যন্ত ও অতি বিস্তৃত অম্বোধিরূপে প্রতিভাত। কুলাচলকুল এই অম্ভোধির ফেনপুঞ্জবৎ সুশোভিত। ত্রিলোকী উহার বিপুল তট; এই তট নিখিল সংসারের প্রশমনে ব্যোম-মধ্যবৎ মূর্ত্তিবিরহিত বা শূন্যতায় পরিপূরিত। তবে কথা এই, যত কালে না প্রারব্ধ ক্ষীণ হইয়া যায়, ততকাল এই ত্রিলোকী-তটী দেহ-পরম্পরায় তুষার-জনিত ধূসর-শ্রীযুত বলিয়াই লক্ষিত হয়; ফলতঃ তাত্ত্বিক আকার উহার কিছুই দৃষ্ট হয় না। সমস্ত সৃষ্টিপরম্পরা ঐ ব্রহ্মরূপ

অম্ভোনিধির তরঙ্গরাজি এবং শাস্ত্রদৃষ্টি-সমষ্টিই এই অনুত্তম পদ হইতে সমুত্থিত বারিধরের বারিবৃষ্টি। চিদাদিত্যের মহাপ্রভা হইতেই ঐ অম্ভোধির বিপুল-তটগত জগৎ-সমৃদ্ধিরূপিণী মৃগতৃষ্ণা-নদী আবির্ভূত হইয়া মহাড়ম্বর সহকারে প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহাতে প্রতারিত হইয়া দেহ-পরিচ্ছিন্ন সুরাসুর-নরগণ কামভোগরূপ তৃণরাশি-গ্রাসী সংসারবনচারী মৃগরাজিরূপে বিরাজ করিতেছে। চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি, ইহারা সেই চিন্ময়েরই প্রভাপাতে আলোকিত হইতেছে; ফলতঃ নির্ম্মল আদিত্য প্রভৃতিও যখন তাঁহারই প্রকাশের অপেক্ষক, তখন অত্যন্ত মালিন্য হেতু মলিনপ্রায় পার্থিবাদি ধাতু-সমষ্টি যে তাঁহারই আলোক অপেক্ষা করে, এ কথা আর বলিতে হইবে কি? দেখ, অরণ্যস্থ মৃগগণ স্বেচ্ছায় বিচরণ করে; পরন্তু এই সংসারবনে যে সকল মৃগ বিচরণশীল, তাহাদের স্বাধীনতা কিছুমাত্র নাই; তাহারা দেহ-পিঞ্জরে আবদ্ধ। অনন্ত সংসার-কান্তারে পড়িয়া জীবগণ জীর্ণ হইতেছে; বিধাতা তাহাদের বন্ধনার্থই রক্তমাংসময় দেহ-পিঞ্জর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অস্থিখণ্ড ঐ দেহ-পিঞ্জরের অর্গলস্থানীয়, মস্তক উহার আচ্ছাদন এবং স্নায়ুরূপ শৃঙ্খলে উহা আবদ্ধ। ঐ দেহ-পিঞ্জরে যে সকল জীব আছে, তাহারা যেন চর্ম্মপুত্তলিকা। এই পুত্তলিকাগুলি সংসার-বনরাজির মুগ্ধ মৃগবৎ বিরাজিত। বিধাতা ঐ সকল মৃগের মুগ্ধ বুদ্ধির বিনোদন করিবার জন্যই যেন উহাদিগকে ভোগরূপ তৃণরাজি প্রদান করিয়া ভোগভূমিরূপ পুরের অভ্যন্তরে সঞ্চরণার্থ নিযুক্ত করিয়াছেন। যেমন মন্দ মারুতের বেগভরে অচলের চলন কখনই সম্ভব হয় না, তেমনি যিনি সর্ব্বত্যাগী, তত্ত্বজ্ঞ, মহামতি, মহাপুরুষ, তিনিও কদাপি উল্লিখিত ভোগনিবহে ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয়েন না।

রামচন্দ্র! যথায় চন্দ্র-সূর্য্য সঞ্চরণ করেন, সেই অপরিচ্ছিন্ন গগন-দেশও যে পদের নিকট পাতাল অপেক্ষাও নিম্ন, তত্ত্বজ্ঞগণ তথাবিধ অত্যুচ্চ পদে অবস্থান করিয়া থাকেন। তত্ত্ববিদের চিৎপ্রকাশ হইতেই ব্রহ্মাদি লোকপালগণ সমগ্র বিশ্ব সহ লব্ধপ্রকাশ হইয়া চক্ষুরাদি দ্বারা বাহিরে ও বুদ্ধি দ্বারা অন্তরে যথাযথ ব্যবহারোচিত বোধশালী হয়েন এবং তথাবিধভাবে অজ্ঞানসাগরে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। এই অবস্থায় তাঁহারা আত্মাকে শরীর

হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া জানিতে পারিলেও মোহাক্রান্ত হইয়া অজ্ঞ জনের ন্যায় শরীরে আত্মভাব পোষণ করত শরীরকেই রক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহাদের ভোগবাসনার সুদৃঢ় অভ্যাস নিবন্ধন প্রারব্ধের প্রাবল্যই এইরূপে শরীর রক্ষার প্রতি কারণ হইয়া থাকে। আকাশে মেঘোদয় হয়; কিন্তু সে মেঘ আকাশকে রঞ্জিত করিতে পারে না। এইরূপ এই জগদ্ভাবনিবহ বারম্বার পরিশীলিত হইলেও তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিকে কদাচ রঞ্জিত করিতে সমর্থ হয় না। যিনি ভগবতী গৌরীর নৃত্য দর্শনে অভিলাষী, তাদৃশ হরের যেমন মর্কট নর্ত্তনে চিত্তরঞ্জন হওয়া একান্তই অসম্ভব, তেমনি এই জাগতিক ভাবনিবহে তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির মনোরঞ্জন একেবারেই সম্ভাবিত নহে। স্তম্ভাদির প্রতিবিম্বসম্পদ্ যেমন কুম্ভের বহিঃস্থিত রত্নের অভ্যন্তরে অবলোকিত হয়, পরন্তু সেই রত্ন কুম্ভমধ্যে থাকিলে তাহাতে যেমন প্রতিবিম্বপাত হয় না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞজন কোনরূপ জগদ্ভাবেই রঞ্জিত হইবার নহেন।

রাম! অজ্ঞ জনের দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মলোকান্ত বিশ্ববৈভব বজ্রপ্রতিম দুর্ভেদ্যরূপে প্রতিভাত; কিন্তু যাঁহারা বিবেকী ব্যক্তি, তাঁহাদের নিকট উহা জলতরঙ্গের ন্যায় ক্ষণবিনশ্বর। যেমন রাজহংস কুৎসিত শৈবালদলে প্রীতিবন্ধন করে না, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিও সমস্ত বিশ্ববৈভব জলবিম্ববৎ বুঝিতে পারিয়া তদ্গত সুখসমূহে বিলোল রতি প্রাপ্ত হয়েন না।

সপ্তপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত। ৫৭।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! পুরাকালে বৃহস্পতিনন্দন কচ এই বিষয়ে এক পবিত্র গাথা গান করিয়াছিলেন; আমি তোমার নিকট তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

একদা মেরু-পর্ব্বতের কোন এক নিবিড় বনে থাকিয়া সুরগুরু-সুত কচ ব্রহ্মবিদ্যা অভ্যাস করিতেছিলেন। অনন্তর যখন তাঁহার তাদৃশ অভ্যাসের

পরিণতি ঘটিল, তখন তিনি একদিন আত্মপদে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন। তদীয় মতি তখন জ্ঞানামৃতে পরিপ্লাবিত হওয়ায় এই পাঞ্চভৌতিক অশ্রদ্ধেয় দৃশ্য বিশ্বে আর প্রীতি প্রাপ্ত হইল না। তিনি দৃশ্য বস্তুনিচয় ভুলিয়া গেলেন। এই জন্য সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আত্মবস্তু ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই আর তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল না। তখন যেন তিনি নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াই একাকী আপনা আপনি গদ্গদকণ্ঠে এইরূপ বলিতে লাগিলেন যে, আহা! আমি কি করি, কোথায় যাই, কোন্ বস্তুই বা গ্রহণ করি এবং কিই বা পরিত্যাগ করি? যেমন মহাকল্পকালে জলধিজলে সর্ব্ববিশ্ব পরিপ্লাবিত হইয়া যায়, এই বিশাল দৃশ্য বিশ্বও তেমনি একমাত্র আত্মাতেই পরিপূর্ণ দেখিতেছি। কেহ কেহ বলিতে পারে বটে যে, জীবাত্মার যে সকল সুখসাধন, তুমি তৎসমস্তই করিতে থাক, যে যেখানে সুখসমূহের উপকরণ আছে, তুমি সেই সেইখানে গমন কর; যে কিছু সুখ বা সুখসাধন বস্তু, তৎসমস্ত গ্রহণ কর এবং যাহা দুঃখ বা যে কিছু দুঃখজনক বস্তু, সে সকল তুমি একেবারেই ত্যাগ কর। কিন্তু হায়! আমি এ সকল কথায় আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছি না; কেন না, যদি জগতের মূল তত্ত্ব অন্বেষণ করিতে যাই, তাহা হইলে, দুঃখ, দুঃখ-ভোগকর্ত্তা জীব বা জীবের প্রার্থনীয় সুখ, ইত্যাদি সমস্তই ত আকাশ বা শূন্যমাত্রেই পরিণত হইয়া দিক্ সকল ও মনোরথসমূহ হইতেও অতি মহৎ বলিয়া আত্মময় হইয়া পড়ে; সুতরাং বুঝিলাম,—সমস্ত বস্তুই আত্মময় এবং আত্মা দ্বারাই আমার সমস্ত কষ্ট বিনষ্ট হইল। কি বাহ্য দেহ, কি আন্তর দেহ, কি উর্দ্ধদেশ, কি অধোদেশ, কি দিক্চক্রবাল, সর্ব্বত্র একই আত্মা বিদ্যমান। আত্মা যথায় নাই, এমন কিছুই কোথাও নাই। এক আত্মা সর্ব্বত্রেই আছেন। সমস্তই আত্মময়রূপে অবস্থিত। এই সমস্তই আত্মা; আত্মাতেই আমি বিদ্যমান। যাহা কিছু চেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং যাহা কিছু অচেতন নামে নিরূপিত, তৎসমস্তের অন্তরে আমিই কেবল বিরাজিত এবং অপার অনন্ত নভোমণ্ডল আপূরিত করত আমিই সর্ব্বত্র সন্ময়রূপে অবস্থিত। আমি আনন্দাত্মা; কেবল সুখই আমার স্বরূপ। আমিই সতত একার্ণবের ন্যায় পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান।

এইরূপে সেই সুরগুরুসুত কচ, সেই কনকাচলের কাননকুঞ্জে থাকিয়া

ভাবিতে ভাবিতে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় এক ওঙ্কারনাদ উচ্চারণ করিলেন। ক্রমশঃ ঐ ওঙ্কারের অকারাদি মাত্রাত্মক দৃশ্য বিসর্জ্জন করিলেন এবং তৎপরে হৃদাকাশে উহার কেশবৎ সূক্ষ্ম অথচ কোমল অর্দ্ধমাত্রাখ্য কলামাত্র তুরীয়াত্মরূপেই ভাবনা করিতে করিতে তুরীয়াত্মভাব প্রাপ্ত হইলেন এবং এই অবস্থায় না আন্তর কারণস্থ—না বাহ্য কার্য্যস্থ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র! পূর্ব্বোক্ত গাথাগায়ী কচ ক্রমশঃ সঙ্কল্প-কলঙ্ক মার্জ্জনা করিয়া বিশুদ্ধ হইলেন। সঙ্কল্প নিরুদ্ধ হইলে তদীয় প্রাণস্পন্দ আপনা হইতেই হৃদয়ে লীন হইল। তিনি তখন বারিদ-বিহীন শরদাকাশের ন্যায় স্বচ্ছভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অষ্টপঞ্চাশত্তম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তির্য্যক্‌জাতিগণ, পশুগণ এবং মূঢ় অসাধু-[গ]ণের ধারণা এই যে, অন্ন, পান ও অঙ্গনাসঙ্গ ব্যতীত শ্রেয়স্কর আর কিছুই [না]ই। এইরূপ স্থির ধারণা করিয়া তাহারা যাহাতে প্রীতি প্রাপ্ত হয়, যিনি [প]রমপদে অধিরূঢ় হইয়াছেন, তথাবিধ মহাপুরুষের তাহাতে বাঞ্ছা হইবে [ক]েন? কৃপণস্বভাব ভোগরাশি আদি, মধ্য এবং অন্ত, সর্ব্বত্রই বিনশ্বর; [সু]তরাং জগতে সেই সমুদায়ের প্রতি যাহারা বিশ্বাস স্থাপন করে, সেই [স]কল নরগর্দ্দভেরা সর্ব্বথা ধিক্কারেরই পাত্র। এক দিকে কেশপাশ, এক [দি]কে রক্ত, ইত্যাদি বস্তুসমষ্টি লইয়াই ত প্রমদাতনু গঠিত! এ হেন তনুর [আ]বার মাধুর্য্য কি? ফলে কুক্কুরেরাই ঈদৃশ প্রমদাতনু লইয়া পরিতুষ্ট [হই]তে পারে; পরন্তু মানবদিগের ইহাতে পরিতোষের বিষয় নাই। সমস্ত [ভূম]িই মৃত্তিকা, সমস্ত তরুই দারুকাষ্ঠ এবং সমস্ত দেহই মাংসময়। আর [অ]ধোভাগে ভূমি এবং ঊর্দ্ধে আকাশ, এতদুভয়ের মধ্যেই বা এমন কি আছে,

যাহাতে একটা অপূর্ব্ব সুখ উদ্ভাবন করিতে পারে? ইন্দ্রিয়ের স্পর্শানুসারে সমস্ত লোকব্যবহারই অবিবেকবশে রম্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে দেখা যাইবে—ঐ সকল কেবল মোহেরই নিমিত্ত মাত্র; পরন্তু বিবেকোদয়ে ঐ সকলের ক্ষণভঙ্গুরত্বই নিশ্চিত। যেমন বহ্নিশিখার সর্ব্বস্থল সমুজ্জ্বল হইলেও প্রান্তে তাহার কজ্জল-কালিমা বিরাজিত, তেমনি যত কিছু সুখাশা আছে, বিষয়ের লাভ বা অলাভ নিবন্ধন তৎসমস্তের পর্য্যন্তেও দুঃখমালিন্য অবস্থিত। মনঃপ্রমুখ ষড়িন্দ্রিয়ের ক্রিয়াকলাপ আগমাপায়ী; সুতরাং তাহারা অনিত্য। বস্তুতঃ নাগেন্দ্র-দলিত লতার ন্যায় বিষয়সম্পৎ সকল নিত্য উপভুক্ত হইয়া ক্ষয়ই প্রাপ্ত হয়। কান্তাদি ভোগ্য বস্তু যে কেবল অনিত্য, তাহা নহে; উহা এক প্রকার অশুচি নরকবিশেষ বলিয়াও বর্ণিত। পুরুষ অস্থি-মাংসে স্বদেহাভিমান পোষণ করে এবং একটা রক্ত ও মাংসময়ী পুত্তলিকাকে 'এই আমার কান্তা' এইরূপ জ্ঞান করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করিয়া থাকে। এই আলিঙ্গন-ব্যাপারে মোহজনক মদনেরই পূর্ণ কৃতিত্ব পরিলক্ষিত।

রামচন্দ্র! অজ্ঞ লোক মনে করে, এই সমস্ত জগৎটাই সত্য এবং চিরস্থিত। তাই ইহাতে তাহার পরিতোষ জন্মে; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি দেখেন—সমস্তই অসত্য এবং অচিরস্থির। এই নিমিত্ত তাঁহার তুষ্টি কিম্বা তৃপ্তি ইহাতে নাই। ভোগ না করা হইলেও অন্তরে যদি বিষয়-বাসনা বা বিষয়তৃষ্ণা থাকে, তাহা হইলে উহা বিষের ন্যায় হইয়া বিষক্রিয়া মূর্চ্ছাই উৎপাদন করে। তাই বলিতেছি, তুমি ভোগবিষয়ক বাসনাকে বর্জ্জনপূর্ব্বক একমাত্র আত্মারই একত্ব অবধারণ করিয়া তাহাতেই একনিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করিতে থাক। চিত্ত যখন অনাত্ম-দেহাদিতে আত্ম-ভাবনা করিতে থাকে, এই মিথ্যাময় জগজ্জাল তখনই আবির্ভূত হইয়া উঠে। অন্যের কথা কি, যিনি ব্রহ্মা, তিনিও অনাত্মভাবনায় কল্পিত বিরাট বপু অধিগত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ আমাদের বাসনা ও কর্ম্মাদিবশেই বিরিঞ্চির মন সঙ্কল্পবলে এই জগদ্বপুঃ কল্পনা করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে স্বর্ণ, রজত বা ইন্দ্রনীল প্রভৃতি মণিময় ভিত্তিভূমিতে পতিত সৌরকিরণের তদাকারেই আত্মপ্রকাশের বিষয় উল্লেখ্য করা যাইতে পারে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহামতে, ব্রহ্মন্! মন বিরিঞ্চিপদ প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বনপূর্ব্বক এই জগৎকে চতুর্ব্বিধ ভূতজাতির সৃষ্টি-বিস্তারে ঘনীভূত করিয়াছিলেন? আপনি অধুনা সে বিবরণ আমার নিকট বিশদভাবে ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুরাজ! কমলযোনি গর্ভশয্যা হইতে সমুত্থিত হইয়া সর্ব্বাগ্রে শৈশব অবস্থায় 'ব্রহ্ম' এইরূপ শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। এইজন্য তিনি ব্রহ্মা নামে অভিহিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার আকৃতি ছিল—অনন্ত সঙ্কল্পময় মনের সমষ্টিমাত্র। অনন্তর তিনি আপনারই কল্পনায় আপনাকে চতুর্ম্মুখাকারে কল্পনা করিয়া লয়েন। অতঃপর তিনি ভাবী সৃষ্টি বিস্তারের নিমিত্ত সঙ্কল্প করিতে থাকেন। এই সময় তিনি সর্ব্বাগ্রেই সঙ্কল্পবলে মহাপ্রভ তেজের কল্পনা করেন। শরতের অবসানে তুষারশুভ্র লতাচক্রে দিগন্তরাল যেমন চক্রীকৃত হয়, প্রথমদর্শনে ঐ তেজও তেমনি বলিয়া বোধ হয়। ঐ তেজঃপুঞ্জের পক্ষিপক্ষনিভ পার্শ্বদ্বয় হইতে যেন শ্বেত সূত্রমালা নিঃসৃত হইতে লাগিল এবং সন্নিহিত অক্ষয় অনন্ত আকাশকে যেন বহুল সূত্রে সমাকীর্ণ করিয়া তুলিল। ঐ তেজ হইতে আরও কত তেজঃপুঞ্জ নির্গত হইলে, চারি দিক্ যেন পিঙ্গলবর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল এবং মনে হইল, অম্বর যেন সুবর্ণময় হইয়া উঠিল। বিরিঞ্চি-নিলয় কমলের প্রত্যেক দল-কোটরে ঐ তেজের কিরণ-পটল প্রবিষ্ট হইলে মনে হইল, যেন বাতায়নসমূহে কল্পিত হেমলতাজালবৎ ভাস্বর কেসরনিকরে উহা জটিল হইয়া পড়িল। অনন্তর ঐ তেজঃপুঞ্জ একার্ণবে প্রতিফলিত হইয়া উদ্যান-বনবৎ কিরণাবর্ত্তে মণ্ডিত হইল। তদনন্তর চতুর্ম্মুখদেহে বিরাজমান মন ঐ তেজঃপটলে আত্মাকারনিভ ভাস্বরাকার কল্পনা করিলেন। তৎপরে সেই হিরণ্যগর্ভ তথাবিধ পিণ্ডাকার তেজঃপুঞ্জ হইতে প্রভামণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী প্রোজ্জ্বল কনক-কুণ্ডলধারী দিবাকরদেব অভ্যুদিত হইলেন। তদীয় পার্শ্ব-দেশে শিখাপটল-সুশোভিত প্রজ্বলিত পাবকনিচয় প্রস্ফুরিত হইতে লাগিল। দিবাকর তখন জ্বালামালাময়ী বিশাল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করত গগনমণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। দিবাকর সমুদিত হইবার পর সর্ব্বজ্ঞ পদ্মজন্মা তখন অবশিষ্ট তেজঃপুঞ্জ বিভাগ করত জলধিকৃত ঊর্ম্মিনিক্ষেপের ন্যায়

চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলেন। সেই নিক্ষিপ্ত তেজঃপুঞ্জগুলি সঙ্কল্পবলে সর্ব্বসিদ্ধি-সমধিগত এক একজন সম-শক্তিসম্পন্ন প্রজাপতিরূপে আবির্ভূত হইয়া সঙ্কল্পানুরূপ বস্তুনিচয় সম্মুখে দেখিলেন এবং ক্ষণমধ্যেই তৎসমস্ত প্রাপ্ত হইলেন। ঐ প্রজাপতি সকল পুত্রপৌত্রাদি বংশপরম্পরায় দেব-দানবাদি জাতিভেদে যে যে বহুল বিচিত্র ভূতবৃন্দের সৃষ্টি কল্পনা করিলেন, তৎক্ষণমাত্রেই তাহারা তাঁহাদের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইল এবং সেই সেই ভূতজাতি হইতে ক্রমশঃ আবার অপরাপর বহুল ভূত-সৃষ্টি হইতে লাগিল। অর্থাৎ প্রথমতঃ প্রলয়কালে জীব সকল ব্রহ্মে বিলীন হইয়াছিল। অনন্তর পুনরায় যখন কল্পারম্ভ হয়,তখন কতিপয় জীব ব্রহ্মার মানস পুত্র ও পুত্রীরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। কতিপয় জীব ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইল এবং কিয়ৎকাল ভূতাকাশে অবস্থানপূর্ব্বক স্থূল ভূতসৃষ্টি হইবার পর সর্ব্ব-সমবায়ে রক্ত-মাংসাদি দেহ ধারণ করিয়া জন্মিয়াছিল; এইজন্য সেই সকল সৃষ্ট জীব হইতেই মৈথুনধর্ম্মে পুত্র-পুত্রীর সৃষ্টি হইতে লাগিল। অতঃপর ব্রহ্মা বহুল প্রজা-সৃষ্টি দেখিয়া চতুর্ব্বেদ স্মরণ করিলেন এবং তৎসমুদায়েরই সহায়তায় এই ভুবনভবনে যাগযজ্ঞাদি বিবিধ ক্রিয়াকলাপ বিধিবদ্ধ করত লোকমর্য্যাদা স্থাপন করিলেন।

রামচন্দ্র! বিরাটদেহ মন ব্রাহ্ম রূপ ধারণপূর্ব্বক এইরূপে নিখিল ভূতসমাবৃত দৃশ্য বিশ্ব বিস্তার করিয়াছেন। ক্রমশঃ সমুদ্র, পর্ব্বত ও পাদপ-নিচয়ে জগৎ সমাকীর্ণ হইয়াছিল। লোকসকল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে-ছিল। সুমেরু শৈলে, মহীমণ্ডলে ও দিঙ্মণ্ডলে জগতের মধ্যভাগ পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। অনন্তর সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণময় জগন্মণ্ডল দৈহিক দুঃখ, সুখ, জনন, জরা, মরণ ও আধিব্যাধি প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ হইয়া সংসারাকারে পরিণত হইল এবং বিষয়ানুরাগে ও দ্বেষভাবে আকুল হইয়া পড়িল।

এইরূপে বিরিঞ্চি আদিকালে আপনা হইতে সমুত্থিত কল্পনাবলে যেরূপে যে বস্তুর সৃষ্টি বিস্তার করিয়াছিলেন, মায়াজালে অদ্যাপি সেই বস্তুর সেইরূপই সৃষ্টি ব্যবস্থা দৃষ্ট হইতেছে। মন এই প্রকারে সমষ্টিজ্ঞানে সর্ব্বভূতে এবং ব্যষ্টিজ্ঞানে কোন কোন ভূতে বিরাজমান হইয়া চৈতন্যস্ব-রূপে বস্তুনিচয়ের সঙ্কলনপূর্ব্বক তৎসমস্তের দ্রষ্টৃপদে অবস্থান করেন।

মনই অচিরকালমধ্যে সঙ্কল্পবলে এবম্বিধ জগন্মোহ কল্পনা করিয়া থাকেন। পরে ক্রমশঃ ঐ মোহ স্থিরতা লাভ করে। যে কিছু জাগতিক ক্রিয়া, এক মাত্র সঙ্কল্পবশতই সেই সকল সমুৎপন্ন হয় এবং নিয়তির নির্দ্দেশস্থ দেবগণ সঙ্কল্প বশতই নির্গত হইয়া থাকেন। ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ইন্দ্র ও বিরোচনাদি দেব ও দানবাধিপতিগণ নিজ নিজ গৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত, যৎকালে মনুষ্যাদি প্রজাবৃন্দে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রযত্ন প্রকাশ করত সবলে সাত্ত্বিক, রাজস ও তামসবৃত্তির প্রবর্ত্তনায় বধ, বন্ধ, জন্ম ও জরামরণাদি সহস্র সহস্র ক্লেশ-পরম্পরায় জগৎসৃষ্টিকে নিতান্ত নিপীড়িত করিয়া তুলেন, তখন নিখিল প্রজার উদ্ভাবয়িতা বিভু ব্রহ্মা তাহাতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া পদ্মাসনে উপ-বেশনপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন যে, মনের স্পন্দনমাত্রেই এই যে বিচিত্র ব্যষ্টি-জীবোপাধিভূত চিত্ত উত্থিত হইয়াছে এবং মনের উপভোগ নিমিত্ত এই যে পৃথ্বী, পাতাল, আকাশ, দিক্, স্বর্গ এবং রুদ্র, উপেন্দ্র, মহেন্দ্র, শৈল ও সাগরসমাকুল বিবিধ ব্যবহারময় বিস্তৃত সৃষ্টি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এ সকল ত আমারই সঙ্কল্পজাল; আমিই এ সকল সর্ব্বদিকে বিস্তার করিয়াছি। অধুনা আমি এই বিকল্পকল্পনা হইতে নিবৃত্ত হই।

পদ্মযোনি ব্রহ্মা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তৎকালে শান্তিলাভান্তে অনর্থ-সঙ্কুল কল্পনাজাল হইতে বিরত হয়েন এবং আপন আত্মা দ্বারা অনাদিমৎ পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্মরণ করিতে থাকেন। স্মরণমাত্রেই তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া শান্তিলাভ করেন। তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইয়া যায়। যেমন পরিশ্রান্ত ব্যক্তি পরিষ্কৃত নির্জ্জন দেশে সুখে বিশ্রাম লাভ করে, ব্রহ্মাও তেমনি তৎকালে আত্মাকারে ভাসমান ব্রহ্মপদে পরম সুখে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার তখন মমতা বা অহঙ্কার কিছুই থাকে না; তিনি তখন পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া অক্ষুব্ধ অম্ভোধির ন্যায় আত্মা দ্বারা আত্মাতেই অবস্থান করিতে থাকেন। সাগর যেমন সৌম্যত্ব হেতু কখন কখন জলোর্ম্মি-গতি হইতে বিরত হয়, ভগবান্ ব্রহ্মাও তেমনি পুনরায় পরমাত্মায় একাকার বৃত্তির ধারণারূপ ধ্যান হইতে আপনা আপনিই কদাচিৎ বিরত হইয়া থাকেন। তিনি তখন এইরূপ বিচার করিয়া দেখেন যে, এ সংসার শত শত আশাপাশে আবদ্ধ; রাগ, দ্বেষ ও ভয়বশতঃ বিহ্বল এবং সতত

সুখ ও দুঃখভরে সমাকুল। এইরূপ বিবেচনার পর ব্রহ্মা করুণাক্রান্তমনে প্রাণীদিগের সুখসম্বিধানের জন্য অধ্যাত্ম-জ্ঞানগর্ভ মহার্থযুক্ত বিবিধ শাস্ত্র প্রণয়ন করেন। ইহা ভিন্ন দেহীদিগের মুক্তির নিমিত্ত বেদ, বেদাঙ্গ ও অন্যান্য বহুল পুরাণগ্রন্থও তৎকর্ত্তৃক সংগৃহীত ও সঙ্কলিত হয়। অনন্তর তিনি পুনর্ব্বার প্রাগুক্ত পরম পদ অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি-বিক্ষেপরূপ পরমাপদ্ হইতে উত্তীর্ণ, শান্ত ও স্বচ্ছ হইয়া অবস্থান করেন। তাঁহার তাৎকালিক স্থৈর্য্য মন্দার উত্তোলিত হইবার পর সাগরের স্থিরত্বের সহিত উপমিত।

কমলদল-সমাসীন ব্রহ্মা এইরূপে এক একবার জাগতিক চেষ্টা দেখিয়া জগতে মর্য্যাদা স্থাপন করেন এবং পুনর্ব্বার কেবল স্বীয় আত্মায় অবস্থিত হয়েন। তিনি সর্ব্বপ্রকার সঙ্কল্প হইতে মুক্ত হইলেও কেবল অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই কখন কখন যদৃচ্ছাক্রমে লৌকিক ব্যবহারের অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন। তবে কি বলিতে হইবে, তাঁহার সমাধিকালে আর্জ্জব এবং সৃষ্টি ও সংহারকালে সেই আর্জ্জবের পারিহার, ইত্যাদি নানাভাবাক্রান্ত চিত্তবৃত্তিসমূহে অজ্ঞের ন্যায় বৈষম্য উপস্থিত হয়? বলিব—না; তাঁহার সে সকল ভাব নাই। তাঁহার আর্জ্জব, অনার্জ্জব, দেহপরিগ্রহ, নানাত্ব, চেতন, স্থিতি বা অস্থিতি, এ সমুদায়ের কিছুই নাই। যে কিছু ভাব, সর্ব্বত্রই তাঁহার সমান আরম্ভ; সমস্ত বৃত্তিতেই তিনি তুল্য এবং পরিপূর্ণ অর্ণবাকারে অবস্থিত। তিনি যে কখন কখন জাগরিত হয়েন, তাহা কেবল তাঁহার জীবানুগ্রহার্থই বুঝিতে হইবে।

হে মহামতে! এই যে পবিত্র ব্রাহ্মী স্থিতি তোমায় কহিলাম, ইহা সত্ত্বিকী স্থিতি; প্রজাপতিগণ ও সুরগণ, এই দুই অনীকই এই স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিধি, সুর ও মনুষ্যভেদে ত্রিবিধ অনীক উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রথম অনীক বিধি বা প্রজাপতিগণ সমস্ত সৃষ্টির উপরমরূপ চিদাকার ব্রহ্মাকাশে ব্রহ্মার মনঃকল্পিত ফলস্বরূপেই সম্ভূত। তাঁহারা স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানৈশ্বর্য্যের প্রসাদেই ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকেন। প্রজাপতিগণ ও ওষধিগণের সৃষ্টি সুস্থির হইবার পর সুরানীকরূপ অপর কল্পনার অভ্যুদয় হয়। এই কল্পনা অগ্রে চন্দ্রকলাকারে গগনে ও পবনে আশ্রয় লইয়া পরে ওষধি-পল্লবে প্রবেশ করত সোমলতা, আজ্য ও পয়ো-

রূপে পরিণতি লাভ করে। অনন্তর উহা হুতাশনে আহুত হইয়া সৌরমণ্ডলে সুধাকারে পরিণত হইয়া থাকে। প্রজাপতিগণ সেই সুধা ভক্ষণ করেন,—সেই উপভুক্ত সুধা শুক্রাকারে পরিণত হইয়া পরে মৈথুনধর্ম্মে দেব ও যক্ষাদি যোনি প্রাপ্ত হয়। এই দ্বিতীয় কল্পনা সত্ত্বগুণবহুলা; এইজন্য মনুষ্যাদি অপেক্ষা অগ্রেই ঐ দেব-যক্ষ-প্রভৃতিরা প্রজাপতিগণের সানুগ্রহ উপদেশ মাত্রে জ্ঞান ও ঐশ্বর্য্যসম্পদ লইয়া সমুদিত হয়েন এবং অগ্রেই তাঁহাদের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তবে কি বলিব, সমস্ত দেবেরই মুক্তি হইয়া থাকে? না—তাহা নহে। প্রকৃত কথা এই যে, দেব ও মানবদিগের মধ্যে যে কোন ব্যক্তি যাদৃশ সত্ত্বগুণ অবলম্বন করে অর্থাৎ জ্ঞানবৈরাগ্য বা ভোগলাম্পট্য এতদুভয়ের যাহারই অনুসরণ করে, সেই ব্যক্তি তাহার সঙ্গগুণে সত্বর তাদৃশ গুণসম্পন্নই হইয়া থাকে। ফলতঃ দেব ও মানব মধ্যে যাহার যেমন সংসর্গ; তাহাকে তদনুসারেই জ্ঞানবৈরাগ্য-সম্পন্ন অথবা ভোগলম্পট হইতে হয়, তাহাদের সেই জন্মে কেহ বদ্ধ এবং কেহ বা মুক্ত হইয়া থাকে। বন্ধন কিম্বা মোচন, এ উভয় তাহাদের সঙ্গগুণেরই ফল; সুতরাং যাবৎ না সুফলোদয় হয়, ততকাল পর্য্যন্ত স্বয়ংই পৌরুষ প্রযত্ন-সহকারে সাধুসঙ্গ, সৎশাস্ত্রসেবা, শ্রবণ-মননাদি এবং ইন্দ্রিয় ও মনোজয়রূপ উপায় সকলেরই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য।

হে রামভদ্র! এই জগৎস্থিতিকে তুমি স্ফুট, প্রকট ও সঙ্কট এই ত্রিবিধ কর্ম্ম দ্বারা লব্ধ বলিয়া বিদিত হইবে। তন্মধ্যে স্ফুট—জ্ঞানবহুল উপাসনাদি; প্রকট—শাস্ত্রসিদ্ধ যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি এবং সঙ্কট—অধোগতির মূলীভূত অবৈধ কর্ম্ম। এই সকল কর্ম্মের অনুধাবন, কর্ম্মজনিত বিবিধ প্রারব্ধের উদ্ভব, তৎসমুদায়ের বেগ, তদনুগত আহার-বিহার, ক্রীড়া-কৌতুক ও ক্রোধ-লোভাদির আবির্ভাব এবং তদনুরূপ ব্যবহারপরম্পরা, এইরূপ ক্রমেই পূর্ব্বোক্ত অনীকত্রয়ময়ী সৃষ্টি ব্রহ্মার কল্পনাবলেই পরব্রহ্মে আবির্ভূত হয় এবং তাঁহাতেই স্থিতি লাভ করে।

ঊনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫৯॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! কল্পান্তে যে সকল জীব ব্রহ্মলীন হয়, পরে পুনরায় তাহারা ব্রহ্ম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যেরূপে দেহ-ধারণ করে, তাহা কহিতেছি। লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা সমাধি হইতে উত্থিত হইয়া পুনর্ব্বার সৃষ্টি ব্যবস্থা করেন। অর্থাৎ ব্রহ্মা তাঁহার আসনপদ্মে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ কল্পান্তরের উপক্রম হয়। এই জীবজগৎ যেন একটা বিস্তীর্ণ জীর্ণ ঘটীযন্ত্র। ইহা আপন ব্যবস্থায় বহমান হয়। কল্পান্ত-মৃত জীবনিবহ ইহার ঘটমালা; জীবনতৃষ্ণা অর্থাৎ পুনরায় দেহধারণের অভিলাষ ইহার রজ্জু এবং দেহে জীবনস্থিতি ইহার জল। অর্থাৎ কূপ হইতে জল তুলিবার জন্য ঘটীযন্ত্র যেমন অনবরত উত্থিত হয় ও নিম্নে অবতরণ করে এবং ঘটীযন্ত্রের উঠিবার ও নামিবার জন্যও সুন্দর ব্যবস্থা থাকে, তেমনি এই জীবনিবহও স্ব স্ব কর্ম্মের ব্যবস্থানুসারে মরিয়া পুনরায় জীবিতাশায় উত্থিত হয় বা গতাসু হইয়া পুনর্জীবিতাশায় অবরোহণ করে। এইরূপ ক্রমে জীববৃন্দের পুনঃপুন আরোহ-অবরোহ অর্থাৎ জন্ম-নাশ বা ঊর্দ্ধাধোগতি আরব্ধ হয়। এই নিখিল ভূতবৃন্দ ব্রহ্ম হইতে উত্থিত হইয়া সংসারপঞ্জরে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। অন্যান্য মনঃসমষ্টি মায়া-শবল ব্রহ্মের প্রথমোৎপন্ন পুত্রভূত আকাশের মধ্যবর্ত্তী হইয়া বায়ু-বিচালিত ধূলিকণার ন্যায় ভ্রমণ করে।

রামচন্দ্র! যেমন জলনিধি হইতে তরঙ্গরাজি সমুদ্ভূত হয় এবং সেই সকল তরঙ্গের কোন কোন তরঙ্গ সেই জলধিতেই লীন হইয়া থাকে, তেমনি কতকগুলি জীব অগ্নিস্ফুলিঙ্গবৎ ব্রহ্ম হইতেই অনবরত চারিদিকে বিনিঃসৃত হয়, আর কতকগুলি জীব ব্রহ্মেতেই বিলীন হইয়া থাকে। ধূম যেমন জলধরে প্রবেশ করে, এই জীবগণ তেমনি অনাদি অনন্ত ব্রহ্মপদ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া ভূতাকাশে প্রবেশ করিয়া থাকে। অনন্তর ব্যোম ও বায়ু সহ পরব্রহ্মে তাহারা মিশিয়া যায়। যেমন প্রচণ্ডবিক্রম দৈত্যগণ দেবগণকে আক্রমণ করে, সেইরূপ তেজ, জল ও ক্ষিতির আবির্ভাব হইলে জীবনিবহের

প্রকাশ প্রাপ্তির পর শব্দ ও স্পর্শাদি তন্মাত্র সহ বায়ু তাহাদিগকে আয়ত্ত করিয়া লয়। অর্থাৎ বায়ুই তাহাদিগের প্রাণস্বরূপ হয়। বায়ুর ন্যায় তেজঃপ্রভৃতি অপরাপর ভূতবর্গও চক্ষুরাদি অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থান অধিকার করিয়া লয়। জীবগণ এইরূপে লিঙ্গদেহ লাভ করে। পরে তাহারা সেই প্রাণভূত বায়ু ও ভূততন্মাত্র-সমভিব্যাহারী বায়ু সহযোগে অন্ন ও জলাদি দ্বারা চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রামের প্রাণ-পবনরূপ অপানাদি বৃত্তিভেদ প্রাপ্ত হয়, স্থুল দেহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া থাকে এবং রেতোভাব লাভ করে। অনন্তর ঐ জীবগণ জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রাণিসংজ্ঞায় অভিহিত হয়। এই সময় উহাদের জ্ঞানৈশ্বর্য্য অনভিব্যক্ত অবস্থায় থাকে।

হে রাম! এই তোমায় তৃতীয় নরানীকের উৎপত্তি-ক্রম কহিলাম; এক্ষণে দ্বিতীয় সুরানীকের উৎপত্তি-বিবরণ বলিতেছি। এই দ্বিতীয় অনীকের লিঙ্গদেহোৎপত্তি পূর্ব্বোক্ত ক্রমেই হইয়া থাকে। এই অনীকস্থ জীবনিবহ স্ব স্ব অদৃষ্টগুণে ধূমাদি-পথে চন্দ্রমণ্ডলে অনুপ্রবিষ্ট হয়। চন্দ্রমণ্ডলগত জীবগণই দেব বা দ্বিতীয় অনীক। তাহাদের গমনের ক্রম যথা—তাহারা অগ্রে ওষধি ও বনস্পতি মধ্যে প্রবেশ করে,পরে ক্ষীর ও ঘৃতাদিরূপে পরিণত হইয়া যজমান কর্ত্তৃক অগ্নিতে আহুত হয়; শেষে সেই আহুতি ধূম-যোগে সৌরমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পরে তথা হইতে চন্দ্ররশ্মিতে নিপতিত হয়। পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমা যতকাল সমুজ্জ্বল রশ্মিজালে জগৎ উদ্ভাসিত করিয়া সমুদিত হয়েন, সেই পাণ্ডুবর্ণ রশ্মিনিকরময় আকাশকোটরে ততকাল তন্মাত্রাত্মক লিঙ্গ-শরীরধারী জীবসমূহ অবস্থান করে। অনন্তর সেই অতিরম্য চন্দ্ররশ্মিগুলি নন্দনাদি কাননে নিপতিত হয়। সেই রশ্মি-পথের অনুসরণ করিয়া তন্মধ্যস্থ লিঙ্গদেহ-বিশিষ্ট সুরানীক জীব-পরম্পরা গৃহকর্ম্ম-ব্যগ্রা দাসী বা চঞ্চল পক্ষিণীর ন্যায় সেই কাননে প্রবেশ করে; পরে সেই কাননমধ্যে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহারা চন্দ্রকিরণে পরি-পুষ্ট ও সরস হইয়া উঠে। তখন চন্দ্রকর হইতে বিভক্ত হইয়া শিশু কর্ত্তৃক জননীর স্তন্যপূর্ণ স্তনভার আশ্রয়ের ন্যায় ঐ জীবনিবহ সেই সকল ফলে আশ্রয় লয়। অনন্তর সৌরতাপে সেই ফল সকল পরিপক্ক হইলে কদাচিৎ কশ্যপাদি প্রজাপতিবর্গের উদরসাৎ হইয়া থাকে। তাঁহারা সেই সকল ফল

ভক্ষণ করিলে তদ্‌গত জীবগণ তাঁহাদের দেহাভ্যন্তরে বীর্য্যরূপে পরিণত হইয়া যেন মূর্চ্ছিতবৎ অবস্থান করে। পরে গর্ভকোষে অবস্থানকালীন তাহাদের বাসনাসমূহ প্রসুপ্ত বা অন্তর্লীন থাকে। ইহার দৃষ্টান্তস্থলে অন্তর্লীনপত্র বটবৃক্ষে বটবীজের অবস্থানের কথা উল্লেখ্য। যেমন বিশিষ্ট কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি ও মৃত্তিকামধ্যে ঘটভাব অন্তর্লীন অবস্থায় থাকে, পরে তাহারা ক্রম-বিশেষে বহিরাগত হয়, তেমনি মহেশ্বর হইতে জীবনিবহ নানাক্রমে বহিরাগত হইয়া থাকে। যে জন প্রাক্তন জন্মে সমস্ত জীবনকাল তীব্র বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক স্ত্রীপুত্রাদির মুখাবলোকনও করে নাই, এবং যাহার বিষয়া-সক্তি একেবারেই ছিল না বা কর্ম্মকাণ্ডীয় শাস্ত্রানুসারে ঐহিক ও পারলৌ-কিক ভোগসাধন কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেও তাহাতে যাহার প্রবৃত্তি হয় নাই, তথাবিধ ব্যক্তিই দেবগর্ভোৎপন্ন ও অতীব সাত্ত্বিকজাতীয় হয় এবং জ্ঞানবান্ হইয়া জীবন্মুক্ত-জনোচিত ব্যবহার-পরম্পরায় নিরত হইয়া থাকে। এইরূপে জাত ব্যক্তিই প্রকৃত মোক্ষভাগী ও সাত্ত্বিকজন্মা বলিয়া অভিহিত হয়। পরন্তু উল্লিখিতরূপে দেবযোনি লাভ করিয়া যে ব্যক্তি ছেদন করিবার ক্ষমতা সত্ত্বেও ভোগলাম্পট্য বশতঃ জন্মপরম্পরার উচ্ছেদ সাধন করে না, কেবল স্ব স্ব অধিকার ভোগ রক্ষায় জন্যই জন্মগ্রহণ করে; জানিবে—তথাবিধ জন রাজস-সাত্ত্বিক বলিয়াই অভিহিত।

রামচন্দ্র! যাঁহারা প্রথমে নরানীক ও সুরানীক অপেক্ষা প্রাধান্য ক্রমে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রাজাপত্য অধিকারে সংসারী হইয়া কেবল সাত্ত্বিকতায় পরিপূর্ণ থাকেন, তথাবিধ বিধ্যনীক বা ব্রহ্মসৃষ্ট প্রজাপতিগণের বিবরণ অধুনা বলিতেছি। হে পবিত্রাকার! এই প্রথমানীক-জন্মা পুরুষেরা কদাচ পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করেন না। ইঁহারা চিরকাল মুক্তভাবেই বিচরণ করেন। তবে কাহারা জন্মগ্রহণ করে? উত্তর—রাজস সাত্ত্বিক পুরুষেরাই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। আর এক কথা—কেবল সাত্ত্বিক ব্যক্তিরই যে পুনর্জ্জন্ম হয় না, তাহার প্রতিই বা কারণ কি? কারণ এই যে, তাঁহারা শ্রবণ-মননাদি উপায় দ্বারা পূর্ব্বজন্মেও আত্মতত্ত্বের সম্যক্ বিচার করত প্রতিবন্ধ মাত্র ক্ষয়ের নিমিত্ত তদুপযোগী সাত্ত্বিক জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহজন্মেও মনন দ্বারা সর্ব্বদাই তাঁহাদের আত্মতত্ত্বই

পরিশীলনীয় হয়; সুতরাং হে রাম! তথাবিধ উত্তম গুণশালী পুরুষ জগতে দুর্লভ। তাঁহারা জীবন্মুক্ত হইয়া সতত পরমাত্মাতেই অবস্থিত। কাজেই তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম ঘটে না।

হে রাঘব! বিধি, সুর ও নরানীক হইতে ভিন্ন অন্যান্য যে সকল তামসজাতি অর্থাৎ রাক্ষস, পিশাচ এবং তির্য্যগ্‌জাতি আছে; তাহারা মূঢ়, মূক এবং স্থাবরতুল্য। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, জ্ঞানাধিকার-কথায় তথা-ভূত বিবিধ জীবগণের কোন বিচারযোগ্যতাই নাই। দেখ, উত্তম জন্ম প্রাপ্ত হইয়াও নর ও সুরগণ মধ্যে ভব-ভাবনায় জড়িত হয়েন নাই, এমন কয় জন আছেন? ফলতঃ সাংসারিক ভোগরুচির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া নিরন্তর পরম তত্ত্বেরই পরিশীলন করেন, এমন জন প্রায় মিলে না; সুতরাং বলিতে হইবে,—বৈরাগ্য-বস্তুটা অতি দুর্লভ। আমার কথা কহিবে? কিন্তু কৈ আমিও ত শুদ্ধ-সাত্ত্বিক নহি। সত্য বটে, আমি জন্মাবধি শম-দমাদি নিখিল গুণসম্পদে উত্তমরূপে আত্মবিচারের যোগ্যতা লাভ করিয়াছি; কিন্তু নিরন্তর আমার সমাধিসুখের বিঘ্নভূত রাজকুলের পৌরোহিত্যাদি অধিকাররূপ প্রারব্ধ যোগ বিদ্যমান। সুতরাং আমিও রাজস-সাত্ত্বিক পুরুষ অর্থাৎ আমার সাত্ত্বিকতায় ঈষৎ রাজসভাবই বিরাজমান। তোমার কথা বলি, তুমিও আমারই ন্যায় বৈরাগ্য ও শম-দমাদি সম্পত্তি-শালী হইয়াছ সত্য; কিন্তু তাহা হইলেও পরমাত্মপদের সম্যক্ বিচার-ক্ষমতা এখনও তোমার হয় নাই। এই জন্য অদ্যাপি তোমার সংসারভ্রান্তি বিস্তৃতরূপে বিদ্যমান। তাই বলিতেছি;—তুমি সত্বর সেই পরমাত্মপদের বিচরণায় নিরত হও; এইরূপ হইলেই তুমি সেই একাদ্বয় পরমপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬০॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ভূতলে যাঁহারা রাজস-সাত্ত্বিক উপাদানে লব্ধজন্ম হইয়া তত্ত্ব-বিচারের যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাবিধ পুরুষেরা সর্ব্বদাই আনন্দময় এবং গগন-গত সুধাকরের ন্যায় সততই প্রকাশমান। গগনে যেমন মলসম্পর্ক থাকে না, তাঁহাদের অন্তরেও তেমনি দুঃখ-মালিন্য স্থান প্রাপ্ত হয় না এবং কনকময় কমল যেমন রাত্রিকালেও পরিম্লান হইবার নহে, তেমনি আপৎকালেও তাঁহারা ম্লান বা বিষণ্ণ হইবার নহেন। বৃক্ষাদি স্থাবর পদার্থ যেমন প্রারব্ধ ভোগ ব্যতীত অন্য কিছুই চাহে না, তাঁহারাও তেমনি জ্ঞান এবং জ্ঞানসাধন সমৃদ্ধি ভিন্ন অন্য কিছুরই জন্য কোনই চেষ্টা করেন না। যেমন পাদপেরা আপনাদের ফলে-ফুলেই সুশোভিত থাকে, এই সকল রাজস-সাত্ত্বিক পুরুষেরাও তেমনি স্ব স্ব সদাচারেই শ্রীতিমান্ হইয়া থাকেন।

হে রাঘব! তাঁহাদের মতি ইন্দুলেখার ন্যায় সুন্দরী, উহা যাহাতে মোক্ষোপযোগিনী হইতে পারে, সে জন্য সতত উপচিত শান্ত্যাদি গুণসুধায় উহা মগ্ন রহিয়া পরিপুষ্ট হইতেছে। চন্দ্রমার শৈত্যগুণ যেমন কিছুতেই অপগত হয় না, তেমনি আপৎকালেও তাঁহাদের সৌম্যভাব বিদূরিত হয় না। রাজস-সাত্ত্বিক পুরুষদিগের প্রকৃতি সতত মৈত্রী-করুণা প্রভৃতি গুণগণে মনোহারিণী। বনস্থলীস্থ লতামণ্ডলী নবোদ্ভিন্ন স্তনাকার কুসুমস্তবকে সমুল্লসিত হইলে, বনপাদপ যেমন তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া সুশোভিত হয়, তাঁহারাও তেমনি মনোহারিণী প্রকৃতিকে লইয়া সর্ব্বদা বিরাজ করিয়া থাকেন। ঐ সকল মহাত্মা পুরুষেরা অতীব সাধুস্বভাব; উহাঁরা সর্ব্বদাই সমভাবশালী, সম-রস ও সৌম্যাকারে সুশোভন।

হে মহাভুজ! তোমারই ন্যায় সেই সকল মহাপুরুষেরাও সমুদ্র-সদৃশ মর্য্যাদাশালী। অপিচ, যে পদ আপদের আস্পদ নয়, তাঁহাদের সেই পরমপদই আশ্রয়। অতএব সতত সকলেরই সেই পদ অনুসরণীয়। কেন না, তাহাকে পাইলে ভবার্ণবে আর পতন হয় না। সুতরাং যেরূপে সে পদে

উপনীত হওয়া যায়, এ জগতে অখিন্নমনে সেইরূপেই ব্যবহার-নিরত হওয়া উচিত। মহাত্মাগণ রজোগুণের ক্ষয়-নিবন্ধন কেবলই সত্ত্বগুণ আশ্রয় করিয়া যেমন যেমন আত্মানন্দ-লাভে উন্নতির পথে অগ্রসর হইবেন, তেমনি তেমনি তাঁহারা মূঢ়জনের চিন্তার বিষয়ীভূত গতি পরিত্যাগ করিয়া বারম্বার সৎশাস্ত্রের সমালোচনা করিবেন। 'কিছুই নিত্য নয়; সকলই অনিত্য' এইরূপ ভাবনায় বিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তি অগ্রে ঐহিক উপভোগের উপযুক্ত লৌকিকী ক্রিয়া এবং মরণোত্তর কালের উপযুক্ত পারলৌকিক ক্রিয়া ও ক্রিয়াফলভূত পশু, পুত্র, ধন, স্বর্গ, বিমান ও অপ্সরা প্রভৃতি পদার্থপুঞ্জকে আপদ্ বলিয়াই ভাবনা করিবেন; কদাচ উহাদিগকে সম্পদ বলিয়া জ্ঞান করিবেন না। যাহা অজ্ঞানসমষ্টি, যাহাতে ফলপ্রত্যাশা নাই, ঈদৃশ অসম্যক্ দৃষ্টি পরিহারপূর্ব্বক যাহাতে অনন্ত ফলের সম্ভাবনা আছে, তাহারই জন্য এই বক্ষ্যমাণরূপে ভাবনা করিতে হইবে,—'কে আমি? এই সংসার-প্রপঞ্চ কিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল?' এইরূপ বিচার সাধুগণের সহিতই সযত্নে প্রাজ্ঞ জনের করা কর্ত্তব্য। ঈদৃশ বিচার করিয়া প্রাজ্ঞ জন কদাচ কর্ম্মসূত্রে জড়িত হইবেন না এবং যাহা অনর্থ, তাহার সহিত সহবাস করিবেন না। তিনি দেখিবেন,—সংসারসম্পর্কীয় যে কিছু প্রিয় বস্তু আছে, তৎসমস্তেরই বিচ্ছেদ অবশ্যই ঘটিবে। এইরূপ দর্শনান্তে তথাবিধ জন সাধু পুরুষের অনুগামী হইবেন। অন্তরের অহঙ্কার এবং বাহিরের দেহ ও পুত্র-কলত্র-মিত্রাদিময় এই যে বিশাল সংসার-সাগর, একমাত্র আত্মবিচারই ইহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার ভেলাস্বরূপ। প্রাজ্ঞ জন এই আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইয়াই যাহা সত্য, কেবল তাহাই দর্শন করিবেন। তিনি যখন চঞ্চল দেহাহঙ্কারাদি পরিহার করিবেন, তখন মুক্তাবলীর মধ্যগত তন্তুল তুল্য সেই একান্ত শুভ সাক্ষি-চিন্মাত্রকে দেখিতে পাইবেন। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি যাহা নিত্য বিতত, সর্ব্বগত, সর্ব্বভাবিত শিবপদ, তাহাতেই এই সমস্ত প্রপঞ্চ প্রোত রহিয়াছে। যে চৈতন্য এই বিশাল বিশ্বে, ব্যোমমণ্ডলে, ভাস্করে ও ভূগর্ভমধ্যে বিদ্যমান, সামান্য কীটাণুর অভ্যন্তরেও সেই চৈতন্যের অধিষ্ঠান। যেমন ভিন্ন ভিন্ন বহুল ঘটাকাশের সহিত মহাকাশের পরমার্থতঃ কোনই ভেদ নাই, তেমনি হে অনঘ! প্রত্যেক শরীরাবচ্ছিন্ন চিতের সহিত অনব-

চিচ্ছিন্ন চিতের কোনই ভেদ-ভিন্নতা নাই। যেমন এক ব্যক্তির আস্বাদনীয় তিক্ত, কটু ও কষায়াদি রসের পার্থক্য থাকিলেও তদ্গত যে অনুভব, তাহা একই, তেমনি দেহপরম্পরায় পরস্পর ভেদ-ভিন্নতা সত্ত্বেও তদন্তর্গত চিদংশ অভিন্নই; তাহাতে ভেদ কিছুই নাই। যখন একমাত্র সদ্বস্তুই সর্ব্বত্র অবস্থিত, তখন 'ইহা জাত বা ইহা বিনষ্ট' এবম্প্রকার ধারণা করা তোমার পক্ষে উচিত নহে। যাহারা মূঢ় জন, বস্তু সম্বন্ধে ঐরূপ ভ্রান্ত ধারণা তাহাদেরই হয়। যাহা উৎপন্ন হইয়া বিলয় পায়, তাহা কখন বস্তু হইতে পারে না। তবে এই যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা আভাসমাত্র; ইহা সৎ বা অসৎ; কিছুই নহে। হে রাঘব! যত কালে না মোক্ষ লাভ ঘটে, ততকাল অভিব্যক্ত ও অপ্রশান্ত চিত্ত কর্ত্তৃক সুস্পষ্ট গৃহীত হয় বলিয়াই উহা সৎ; আবার যখন মোহাপগম ঘটে, তখন উহার অস্তিত্বের অভাব হয় বলিয়াই উহা অসৎ।

হে রাম! মোহজাল একান্তই অসৎ; সুতরাং জ্ঞানযোগে আর কি তাহার নিরাস হইবে? ফলতঃ নিরস্যের অভাবনিবন্ধন নিরাসকের সাফল্য-যোগ নাই। কাজেই যে কোন সঙ্গ-সঙ্গতি বা অনির্ব্বচনীয় অধ্যাসক্রমেই রজ্জুতে সর্পাদিবৎ এই দৃশ্যসমূহ মোহের কারণ হইতেছে। এখন ভাবিয়া দেখ, এই জগৎও প্রকৃতই অসৎ; ইহাতে আবার মোহ কি? থাকিলেই বা মোহের কারণ কি? এই জন্য তোমায় বলি, তুমি জনন, মরণ ও স্থিতিব্যাপারে সতত বিরতি প্রাপ্ত হইয়া ব্যোমবৎ সর্ব্বত্র সম ও স্বচ্ছভাবে অবস্থান করিতে থাক।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ধীর ব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে বিচারবান্ হইয়া আপনার মহতী বুদ্ধিযোগে যথাশাস্ত্র শাস্ত্র-জ্ঞানবান্ মহাপুরুষের সমীপে গমনপূর্ব্বক তদীয় সাহায্যে শাস্ত্র বিচার করিবেন। যাঁহার সহায়তায় শাস্ত্রার্থ বিচার করা যাইবে, তাঁহার সৌজন্য অর্থাৎ শিষ্যাপরাধে সহিষ্ণুতা থাকা চাই। যাঁহার বিষয়তৃষ্ণা নাই, উত্তম আভিজাত্য আছে এবং যাঁহাতে পাণ্ডিত্য এবং মহত্ত্ব এ উভয়ই বিদ্যমান রহিয়াছে, এতাদৃশ সদ্‌গুরুর সহিত শাস্ত্রার্থ বিচার করিয়া মনোবিনাশান্ত সমাধি অবলম্বন করিলেই পরমপদ অধিগত হওয়া যায়। বেদান্তোপযোগী বিভিন্ন শাস্ত্র, সৎকর্ম্ম ও সদাচারাদি, সাধুসঙ্গ এবং বৈরাগ্যাদি, এই সকলের নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা যে পুরুষ সুসংস্কৃত হইয়াছেন, তোমার ন্যায় তিনিই প্রকৃত আত্মবিজ্ঞানের ভাজন হইয়া থাকেন।

হে রাম! তুমি অধুনা উদার আচার আশ্রয় করিয়াছ; ধীর তুমি নিখিল সদ্‌গুণের আকর হইয়াছ। তোমার সমস্ত মনোমল বা ভ্রান্তিজাল বিদূরিত হইয়াছে এবং সর্ব্বদুঃখ ঘুচিয়া গিয়াছে। তুমি স্বস্থ হইয়া আত্মাতে অবস্থান করিতেছ। তোমার আর ভব-ভাবনা কিছুমাত্র নাই। তুমি মেঘমুক্ত শরদম্বরের ন্যায় স্বচ্ছভাব ধারণ করিয়াছ; বাস্তবিকই তোমার উত্তম জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে। তোমার মনে এক্ষণে বাহ্যার্থের চিন্তা নাই, কল্পনা নাই, বিভাগ নাই, উহা অন্তরে পরমাত্মার সহিত একীভাব লাভ করায় ব্রহ্মাকারে পরিণতিরূপ কৌশলবতী কল্পনায় অবস্থিত ও মুক্ত হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়েই বলিতে পারা যায়। অপিচ তুমি মুক্তমনা, মহানুভব মনুষ্য; তোমার কল্পনায় রাগদ্বেষের লেশমাত্র নাই। পূর্ব্বোল্লিখিত জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণ তোমারই চেষ্টার অনুসরণ করিবেন; অর্থাৎ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের তুমিই এখন আদর্শ। যাঁহারা বাহিরে লোকোচিত আচারের অনুবর্ত্তন করেন এবং সংসার-সাগর হইতে পার পাইবার উপায়ভূত জ্ঞানতরী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাবিধ ধীশক্তিশালী পুরুষেরাই ভবার্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইবেন।

যিনি ভবাদৃশ মতিমান্, সুজন ও সমদর্শন হইবেন, তাদৃশ জনই মদুক্ত জ্ঞান-দর্শনের প্রকৃষ্ট পাত্র হইবেন।

হে রঘুকুলানন্দ! যত দিন তোমার এই দেহ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত যাহাতে বিষয়াসক্তি বা বিষয়বিদ্বেষ নাই, এবম্বিধ বুদ্ধি অবলম্বন করত সর্ব্ব-বাসনা পরিহারপূর্ব্বক মাত্র বাহ্যিক লোকাচারে নিরত হইয়া অবস্থান করিতে থাক। অন্যান্য গুণসম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেমন পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তুমিও তেমনি পরম শান্তি লাভ কর। যাহারা জম্বুকধর্ম্মী কিম্বা যাহারা শিশুধর্ম্মী, অর্থাৎ স্বার্থের জন্য যাহারা পরবঞ্চক ও জ্ঞানাভাবে যাহারা যথেচ্ছাচারী, তাহারা কখনই আলোচ্য বিষয় নহে অর্থাৎ তাহাদের দৃষ্টান্ত মনে পর্য্যন্ত স্মরণ করিতে নাই। শুদ্ধ সাত্ত্বিকজন্মা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের যে স্বাভাবিক মহাসত্য শমদমাদি গুণগণ থাকে, সেই সকল গুণরাশি অর্জ্জন করিয়া একজন সাধারণ লোকও চরম পরম জীবন্মুক্ত-দেহ প্রাপ্ত হয়। জীব এই জন্মে যেরূপ জাতি-গুণশালী হয়, জন্মান্তরেও তাহারা তাদৃশ জাতি-গুণ অত্যল্প কাল মধ্যেই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। জীব সকল কর্ম্মপাশে আবদ্ধ থাকিয়া জন্মান্তরীয় নিখিল ভাব লাভ করে; পরন্তু মোক্ষ লাভের জন্য অতি ক্ষুদ্রতম ব্যক্তিরও যত্ন করা কর্ত্তব্য। এই ব্যাপারে একমাত্র পুরুষকারেরই প্রয়োজন; পুরুষকার প্রভাবে সর্ব্বত্রেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। মনে করিয়া দেখ, পরাক্রান্ত রাজসেনাদলও নৈতিক পুরুষকার বলে পরাভূত হইয়া থাকে। লোক,—তামসী, রাজসী বা মিশ্র, ইহাদের যে কোন জাতিই আশ্রয় করুক, এক মাত্র ধৈর্য্যবলেই স্বীয় বুদ্ধিকে পঙ্ক হইতে মুগ্ধ ধেনুর ন্যায় উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিবে। সাধু-গণ যে সাত্ত্বিক জাতি লাভ করেন, তাহার কারণ কেবল তাঁহাদের স্ব স্ব বিবেক; বিবেকবশেই তাঁহারা ঐ উৎকৃষ্ট জাতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব হে রাঘব! নির্ম্মল চিত্ত-মণিতে যাহা নিযুক্ত করাইবে, চিত্ত তখনই তন্ময় হইয়া উঠিবে; পুরুষকারও তাহা হইতেই জন্মিবে। মুমুক্ষুগণ পৌরুষ প্রযত্ন বলে ইহজন্মেই পরমোত্তম গুণ-গৌরব-মণ্ডিত ও পশ্চাৎ পবিত্র জন্ম-প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মর্ত্ত্য বল, স্বর্গ বল, আর দেবসমাজ বল, কোথাও এমন কিছুই দেখি না, যাহা পুরুষকারবলে গুণবানের না লভ্য হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! ব্রহ্মচর্য্য, ধৈর্য্য, বীর্য্য, বৈরাগ্য ও যুক্তিযুক্ত পৌরুষ ব্যতীত কিছুতেই অভীষ্ট ফললাভে সক্ষম হইবে না। অর্থাৎ ঐ সকল অবলম্বন করিতে না পারিলে আত্ম-তত্ত্বলাভ সুদুর্ঘট হইবে। ফল কথা, আমি যে এই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ও নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ অতি হিতকর আত্ম-তত্ত্বের বিষয় উপদেশ প্রদান করিলাম, তুমি বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ বর্দ্ধিত করিয়া ঐ আত্মতত্ত্বকে আত্মভাবে স্থির করত বীতশোক হও। অনন্তর তোমার দৃষ্টান্তে অপর ব্যক্তিও বীতশোক হইয়া মুক্ত হইতে পারিবে।

হে রাঘব! তুমি অধুনা বিবেকের মহামহিমায় মণ্ডিত হইয়াছ। ভবদীয় শমদমাদি গুণগ্রামও সম্প্রতি পল্লবিত হইয়াছে এবং বিশুদ্ধ সাত্ত্বিক জন্মও তুমি লাভ করিয়াছ। তাই আশীর্ব্বাদ করি, হে রামভদ্র! তুমি এক্ষণে সত্ত্বস্থ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের অনুষ্ঠেয় সপ্তভূমিকারূপ কর্ম্মক্ষেত্রে স্থান করিয়া লও। সংসার-সঙ্গরূপ মোহ-চিন্তা যেন তোমার অন্তরে স্থান পাইতে পারে না।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

স্থিতি-প্রকরণ সমাপ্ত।

যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

উপশম-প্রকরণ।

স্বর্গীয় চন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক

মুল সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালাভাষায় অনুবাদিত।

প্রকাশক।

জি, পি, বসু।

২ নং অভয়চরণ ঘোষের লেন,—শ্যামপুকুর, কলিকাতা।

মহাভারত কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

নুতন সংস্করণ।

এল, এন, প্রেস,—৪৩, গ্রে-ষ্ট্রীট কলিকাতা।

শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৬ সাল।

ভূমিকা।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণের অন্তর্গত উপশমপ্রকরণের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইল। এই প্রকরণে আত্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের উপযোগী যে সকল বিষয় বর্ণিত হইয়াছে, অভিনিবিষ্ট-ভাবে সে সমুদায় পাঠ করিলে পাঠকের দিব্য জ্ঞানপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবিনী। এই প্রকরণের পর নির্ব্বাণ প্রকরণ। নির্ব্বাণ-প্রকরণের অনুবাদ সম্পূর্ণ হইলেই সম্পূর্ণ যোগবাশিষ্ঠ রাময়েণের অনুবাদ-কার্য্য সমাপ্ত হইবে। এই সারগর্ভ-গ্রন্থের প্রতি পাঠকগণ যেরূপ আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন,—ধৈর্য্য সহকারে এই বৃহৎগ্রন্থ-সমাপ্তির জন্য যে আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা আমাদের বড়ই উৎসাহ ও আনন্দের বিষয়, সন্দেহ নাই।

আশা করি, পাঠক মহোদয়গণের এই প্রকার ধৈর্য্য ও আগ্রহ গ্রন্থ সমাপ্তি পর্য্যন্ত আমাদিগকে এমনই আনন্দ বিতরণ করিবে। ইতি

কলিকাতা;
মহাভারত কার্য্যালয়,
পৌষ, বঙ্গাব্দ ১৩১৬।

জি, পি, বসু এণ্ড ব্রাদার্স।

উপশম-প্রকরণের সূচীপত্র।

উপশম-প্রকরণ সূচীপত্র সমাপ্ত।

—০•—

ওঁ তৎসৎ

শ্রীশ্রীরামচন্দ্রায় নমঃ।

যোগবাশিষ্ঠ-রামায়ণ।

উপশম-প্রকরণ।

প্রথম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! নিখিল প্রপঞ্চ-স্থিতি মনের স্থিতিরই অধীন; ইহাই পূর্ব্ব-প্রকরণে প্রদর্শিত হইয়াছে। স্থিতি-প্রকরণ পরিসমাপ্তির পর অধুনা এই উপশম-প্রকরণ শ্রবণ কর। ইহা শ্রবণ করিয়া ইহার তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিলে, অধিকারী জন নির্ব্বাণ-পদের নিকটবর্ত্তী হইতে পারেন।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ! বশিষ্ঠ ও বহু রাজগণাধ্যুষিত সেই সভাক্ষেত্র নক্ষত্র-নিচয়-খচিত শরদাকাশের ন্যায় স্তিমিত-ভাব ধারণ করিয়াছিল। ভগবান্ বশিষ্ঠ তথায় সমাসীন হইয়া এহেন আনন্দজনক পরম পবিত্র বাক্যাবলী বলিতে লাগিলে, সেই সভা-সমাসীন নরপতিবৃন্দ উৎকট শ্রবণানন্দের বশীভূত হইয়া এরূপ ধীর ও স্থিরভাবে বিরাজ করিতেছিলেন যে, তাঁহাদের অধ্যুষিত সেই সভাক্ষেত্র দেখিয়া মনে হইল যেন একটা নিবাত নিস্পন্দ কমলকুল-সমাকুল কমলাকর সুশোভিত হইতেছে। দেখিলাম,—সেই সভাসমীপে যে সকল বিলাসিনী ললনাকুল বিরাজ করিতেছিল, বশিষ্ঠ-বাক্য শ্রবণমাত্র তাহাদেরও হৃদয় হইতে মদ-মোহাদি বিগলিত হইয়া গেল। তাহারা যেন চির-সন্ন্যাসিনী যোগাবলম্বিনী রমণীগণের ন্যায় অন্তরে অন্তরে অনন্ত শান্তি অনুভব করিতে লাগিল। বিলাসিনীগণের কঙ্কণ ও কিঙ্কিণীজাল নীরব হইল; তাহাদের করকমলস্থ মরালসন্নিভ চামরদল নিশ্চল হইয়া

রহিল; মনে হইল যেন বশিষ্ঠ-বাক্য শ্রবণে সমাধিলীনবৎ অবস্থান করিল। আরও মনে হইল যেন বিস্ময়ে নীরব বায়সদল বৃক্ষশাখায় বিরাজ করিতে লাগিল। তখন বিচারজ্ঞ রাজগণ নাসিকার নিম্নদেশে তর্জ্জনীর অগ্রভাগ বিন্যাস-পুরঃসর ধীরভাবে মনে মনে বশিষ্ঠ-ভাষিত বিজ্ঞানবাণীর বিচার করিতে লাগিলে প্রভাতকালীন পঙ্কজের ন্যায় রামের হৃদয় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। যেমন অম্বরে অংশুমালীর অভ্যুদয়ে তিমির-পরিবৃত পীঠস্থান পরিত্যক্ত হয়, তেমনি রামহৃদয়ে বোধ্র-বিকাশে তদীয় তমঃস্তোম অপসারিত হইয়া গেল। ময়ূর যেমন অবিশ্রান্তবর্ষী নব নীরধরের গভীর গর্জ্জন শ্রবণে উন্মুখ হইয়া থাকে, মহারাজ দশরথও তেমনি বশিষ্ঠ-বাক্য শুনিবার জন্য সমুৎসুক হইয়া রহিলেন। মন্ত্রিমুখ্য সারণ মর্কটবৎ নিসর্গ-চঞ্চল স্বীয় মনকে সর্ব্ববিধ ভোগ-চিন্তা হইতে নিবারিত করিয়া একাগ্রতার সহিত বশিষ্ঠের সেই উদার বচনাবলী শ্রবণ করিতে লাগিলেন। শিক্ষা এবং শারীরিক সামর্থ্যশালী বিচক্ষণ লক্ষ্মণ তখন বশিষ্ঠের বচনবৈভবে সুধাকর-কলাপ্রতিম অমল আত্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইলেন। তদীয় হৃদয় মধ্যে পরম ব্রহ্মজ্যোতিঃ বিলসিত হইতে লাগিল। সেই পবিত্র বচন-শ্রবণে শত্রুসূদন শত্রুঘ্নের চিত্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল। আনন্দের আতিশয্যে তদীয় বদনমণ্ডল পূর্ণচন্দ্র-প্রতিম বিমলশ্রী ধারণ করিল। মন্ত্রী সুমিত্রের দুঃখপূর্ণ অন্তঃকরণ তখন বিমল মৈত্রী সুখভোগ প্রাপ্ত হইল। মিত্র-লাভে পঙ্কজের ন্যায় তদীয় হৃদয় বিকসিত হইয়া উঠিল। সেই সভা-ক্ষেত্রে যে সকল মুনিবর ও অন্যান্য ভূপালবর বিরাজিত ছিলেন, তৎকালে তাঁহাদের বিমল মানসরত্ন যেন অমল শান্তিসলিলে বিধৌত হইয়া গেল এবং তাঁহাদের মানস উল্লাস ক্রমশঃ বিকাশ পাইতে লাগিল।

এই সময় মেঘধ্বনির ন্যায় এক অতি গম্ভীর শঙ্খধ্বনি সমুত্থিত হইয়া সহসা দিঙ্মণ্ডল পরিপূরিত করিল। ঐ ধ্বনি তখন মধ্যাহ্ন-কালের সূচনা করিয়া দিল। সেই শঙ্খধ্বনি যেন জলধি-নির্ঘোষের ন্যায় পরিশ্রুত হইতে লাগিল। জলদনাদে কোকিলের কলালাপ যেমন তিরোহিত হইয়া যায়, তেমনি সেই মধ্যাহ্নকালের প্রচণ্ড শঙ্খস্বনে মুনিবর বশিষ্ঠের বাণী অন্তর্হিত হইয়া গেল।

এক্ষণে মুনিবর বশিষ্ঠ নিজ বাক্যের উপসংহার করিলেন। বস্তুতঃ

মহাপুরুষদিগের স্বভাবই এই যে, তাঁহাদের গুণের উৎকর্ষ যদি অপর কর্তৃক অভিভূত হয়, তবে তাঁহারা আর সে গুণের প্রকাশ করেন না। যাহা হউক, মধ্যাহ্নের সেই বিষম শঙ্খস্বন শ্রবণ করিয়া মুনিবর মুহূর্ত্ত কাল বিশ্রাম করিলেন। পরে সেই তুমুল কোলাহলের অবসান হইলে, তিনি রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—অয়ি বৎস অরিন্দম রামচন্দ্র! মদীয় অদ্যতন বক্তব্য আমি এইখানেই সমাপ্ত করিতেছি; আগামী কল্য প্রভাতে পুনর্ব্বার আমার বক্তব্যের অবশিষ্টাংশ ব্যক্ত করিব। নিয়তির বশে এই এখন মধ্যাহ্নকাল উপস্থিত হইল। এ সময়ে ব্রাহ্মণগণের মধ্যাহ্নকৃত্য সম্পাদন করিতে হয়। বলা বাহুল্য, আমারও এক্ষণে সে কর্ত্তব্য উপস্থিত; সুতরাং কর্ত্তব্যকার্য্যে অবহেলা করা অনুচিত। অয়ি সুন্দর! তুমিও গাত্রোত্থান কর, যাও—এই সময়ে গিয়া বিহিত সদাচার ও সৎক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে থাক। ওহে আচার-চতুর! কর্ত্তব্যে ঔদাস্য করা তোমারও সম্ভবপর নহে; অতএব যাও, গিয়া স্নান, দান ও দেবার্চ্চনাদি সৎক্রিয়া সকল আচরণ কর।

বশিষ্ঠ মুনি এই কথা কহিয়া নরপতি দশরথ সহ সভা হইতে সমুত্থিত হইলেন। তখন মনে হইল, তাঁহারা যেন উদয়াচলের শিখরদেশ হইতে যুগপৎ অভ্যুদিত দিবাকর ও নিশাকরের সাধর্ম্ম্য ধারণ করিলেন। তাঁহারা গাত্রোত্থান করিবামাত্র সভাস্থ অন্যান্য সভ্যবৃন্দ সকলেই এককালে গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহাদের উত্থানে সমস্ত সভা মন্দ-মারুত-চালিতা অলি-নয়না নলিনীর ন্যায় কম্পিত হইয়া উঠিল। সেই সভা তখন সমুত্থিত সভ্য-গণের সম্ভ্রম-চালিত কর্ণাবতংস হইতে সমুড্ডীন ভৃঙ্গমণ্ডলে মণ্ডিত হইয়া সন্ধ্যা-সমাগমে বিলোল-কর-পুষ্করা করিঘটার ন্যায় উত্থিত হইল। সম্ভ্রম-চলিত নরপতিগণের পরস্পর অঙ্গসঙ্ঘর্ষে তাঁহাদের হস্তস্থ পদ্মরাগাদি মণি-মাণিক্য-খচিত অঙ্গদ সকল চূর্ণিত হইয়া পতিত হইল; তাহাতে সেই সভা যেন তখন অরুণাভ বারিদ-বেষ্টিত সন্ধ্যাকালের শোভা সকলকে স্মরণ করাইয়া দিল; সম্ভ্রম-বশে সভ্যগণের মস্তক হইতে মাল্যদাম পতিত হইলে তত্রত্য মধুকরনিকর মধুর ঝঙ্কার করত সমুত্থিত হইল। নরপতিগণের কম্পনযুক্ত মস্তকস্থ মুকুটাবলীর নানাবিধ মণিরত্নপ্রভা প্রসারিত হওয়ায় মনে হইল,

সভামণ্ডল যেন শত শত ইন্দ্রচাপে আবৃত হইয়া উঠিল। সেই সভা যেন তখন মদমত্ত বারণ-বিদলিত বনলেখার ন্যায় বিরাজ করিল; তত্রত্য ললনা সকল উহার লতিকাবলী; উহাদের হস্ত-সমস্ত দলরাজি এবং হস্তস্থিত সুচারু চামরনিচয় ঐ বনলেখার মঞ্জরী। রাজন্যগণের পরস্পর অঙ্গসঙ্ঘর্ষবশতঃ বলয়সকলের সমুল্লসিত প্রভাপুঞ্জে তথাকার ললনাগণের পরিধান-বসন রঞ্জিত হইল; তখন মনে হইল, সেই সভা যেন বাত-ব্যাহৃত-কুসুমা মন্দার-বনমালার শোভা ধারণ করিল। সভাভূমির মধ্যে মধ্যে কর্পূরখণ্ডনিভ শুভ্রকান্তি নীহারকণা সকল সমুজ্জ্বল হওয়ায় সভা যেন শারদীয় শুভ্র অভ্র-পরিবৃত দিক্-তটমালার ন্যায় সর্ব্বতঃ প্রসৃত হইয়া বিরাজিত হইল। নরপালগণের বিলোল মৌলিমণির প্রভাপাতে সভার প্রান্তস্থ অম্বর-বিবর পাটলাভা ধারণ করিল, তাহাতে ঐ সভা যেন নিখিল দিনকৃত্য-সংহারিণী প্রফুল্ল-নীলনলিনীশালিনী সন্ধ্যার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। সভাশোভিনী সুন্দরীদিগের আভরণাবলীর প্রভাপুঞ্জ জলরাশির ন্যায় প্রতিভাত হইল। তদুপরি তাহাদের সুন্দর বদনাবলী অলিমালিনী রাজীবরাজির ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল এবং চরণস্থিত নূপুররব হংসনাদবৎ পরিশ্রুত হইতে লাগিল। শত শত ভূপাল-পরিবৃতা সেই সভা যেন অগণিত প্রাণি-পরিপূর্ণ অভিনব সৃষ্টির ন্যায় প্রতীত হইল। রাজগণ তাহা হইতে এককালে সমুত্থিত হইলেন।

অনন্তর অম্বুধির অভ্যন্তর হইতে সমুত্থিত রত্নপ্রভায় ইন্দ্রচাপীকৃত তদীয় বীচিনিচয়ের ন্যায় মনোহর-দর্শন নরপালগণ মহীপতি দশরথকে অভি-বাদনপূর্ব্বক রাজসভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রসবিজ্ঞানবিজ্ঞ সুমন্ত্র ও অন্যান্য মন্ত্রিগণ, মুনিবর বশিষ্ঠ ও নৃপবর দশরথকে প্রণাম করিয়া মধ্যাহ্ন-স্নানকৃত্য নির্ব্বাহার্থ প্রস্থান করিলেন। বামদেব ও বিশ্বামিত্র-প্রমুখ মহর্ষিগণ বশিষ্ঠদেবকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া গমনার্থ রাজসম্মতির প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাজা দশরথ মুনিগণকে সৎকৃত করিয়া বিদায় দিলেন। তাঁহারা স্ব স্ব কার্য্য সাধন করিবার জন্য নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বনবাসী ছিলেন, তাঁহারা বনাভিমুখে, গগনচারিগণ গগনে এবং নাগরিকেরা নগরমধ্যে গমন করিলেন। সভ্য-

গণের মধ্যে সকলেরই মনে প্রভাতে আসিয়া পুনরায় সভায় যোগদান করিবার অভিপ্রায় রহিল। নরনাথ দশরথ ও মুনিবর বশিষ্ঠের একান্ত অনুরোধে মহামুনি বিশ্বামিত্র সে দিন আর স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন না, সে রাত্রি তিনি বশিষ্ঠমুনির গৃহেই আতিথ্য স্বীকার করিলেন। বিপ্রবৃন্দগণ, মুনিগণ, অন্যান্য রাজন্যগণ এবং রামচন্দ্রপ্রমুখ দশরথসুতগণের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া শ্রীমান্ ধীমান্ বশিষ্ঠ সমস্ত লোকের নমস্কার গ্রহণ করত স্বীয় আশ্রমে গমন করিলেন। তখন বোধ হইল, দেবগণ কর্তৃক অনুগম্যমান হইয়া ব্রহ্মা যেন ব্রহ্মলোকে উপনীত হইলেন। বশিষ্ঠমুনি স্বীয় আশ্রমপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া তদীয় পাদোপান্তে প্রণত রামচন্দ্রাদি দশরথসুতগণকে তথা হইতে পুনরায় নিজ নিজ নিলয়ে প্রতিগমন করিতে আদেশ করিলেন।

অনন্তর মুনিবর বশিষ্ঠ বিশিষ্ট গুণ-গণ-মণ্ডিত নভশ্চর, ভূচর ও অধশ্চরদিগের সকলকেই যথাক্রমে স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য অনুমতি দিয়া আপন আশ্রমাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক দ্বিজ-জনোচিত দিবস-ক্রিয়া সমাধা করিলেন।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় সর্গ।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! শশধর-সদৃশ সুন্দরাকার রাজকুমারগণ স্ব স্ব বাসভবনে উপস্থিত হইয়া সমস্ত দিবাকৃত্য নির্ব্বাহ করিলেন। বশিষ্ঠ, রামচন্দ্র, রাজন্যবৃন্দ, মুনিগণ ও ব্রাহ্মণগণ, ইঁহারাও সকলে স্ব স্ব গৃহে গমন করিয়া আপন আপন আহ্নিক কৃত্য সম্পাদন করিলেন। তাঁহারা স্বচ্ছ সলিলময় জলাশয় সমূহে স্নান করিলেন। ঐ সকল জলাশয় কমল, কহ্লার, কুমুদ ও উৎপলাবলীর পরাগপ্রসঙ্গে সুগন্ধশালী এবং চক্রবাক, মরাল ও সারস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণের বিহারভূমি। তাঁহারা তথায় স্নানান্তে ব্রাহ্মণদিগকে গাভী, ভূমি, তিল, স্বর্ণ, শয্যা, আসন, রজতাদি পাত্র ও নানাবিধ

প্রচুর বস্ত্র দান করিলেন; অনন্তর দানক্রিয়া সম্পাদন করিয়া স্বর্ণ ও রত্ন-খচিত স্ব স্ব দেবমন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক নারায়ণ, মহেশ্বর, হুতাশন ও সূর্য্যাদি দেবগণকে পূজা করিলেন। পূজান্তে স্ব স্ব পুত্র, পৌত্র, সুহৃৎ, বন্ধু, মিত্র ও ভৃত্যবর্গের সহিত মিলিতভাবে যথোচিত সুভোজ্য বস্তু সকল আহার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

অনন্তর তাঁহাদের আহারক্রিয়া সুসম্পন্ন হইবার পর ঐ সময় দিনমান অবসান হইতে লাগিল। দিবসের অষ্টমভাগও ক্রমশঃ শেষ হইল। তখন দিবসের সৌন্দর্য্য আর কিছুই দৃষ্ট হইল না। ক্রমশঃ সন্ধ্যাকাল আসিল। তাঁহারা সায়ংকালোচিত বৈধ ক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিলেন। সন্ধ্যাবন্দনা সমাহিত হইল এবং অঘমর্ষণ মন্ত্র ও পবিত্র স্তোত্র সকল পঠিত হইল। অবশেষে তাঁহারা মনোহর গাথাবলী গান করিতে লাগিলেন। ক্রমে কামিনী-কুলের বিরহ-ব্যথা অপনয়ন করিয়া—সুধাকর-সম্পর্কে নীহারজাল বর্ষণ করিয়া এবং সমস্ত দিক্‌বিভাগ আচ্ছাদিত করিয়া ক্ষীরাব্ধি হইতে মাহেন্দ্রীর ন্যায় বিভাবরী সমুদিত হইল। রাত্রি-সমাগমে রামচন্দ্র ব্যতীত দশরথ ভূপতির অপরাপর পুত্রগণ সকলেই তল্পতলে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের সেই শয্যাসম্ভার পরিপূর্ণ-চন্দ্র-বিম্বের ন্যায় রমণীয়; উহার স্থানে স্থানে কুসুমসমূহ সুশোভিত এবং তদুপরি কর্পূর চূর্ণ সকল সমাকীর্ণ। রঘুনন্দনেরা তাদৃশ রম্য শয্যাতলে শয়ন করিয়া সত্বরই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। তখন একমাত্র রামচন্দ্র জাগরিত রহিলেন।

অতঃপর সেই সুন্দরী বিভাবরী তৎকালোচিত বিষয় ভোগ ও নিদ্রাদি ব্যবহারবতী হইয়া ক্রমশঃ মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত হইল। রামচন্দ্র সে রাত্রি অনিদ্রাতেই কাটাইলেন। করি-যুবক যেমন যুবতী করিণীকেই সদা চিন্তা করে, তিনিও তেমনি সেই সমস্ত রাত্রি, গত দিন বশিষ্ঠ যে গভীর ভাবময়, উদার মনোহর, বাক্যাবলী বলিয়াছিলেন, তাহারই বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবনার বিষয় এইরূপ হইল যে, এই ত সংসার,—সদাই সুখ, দুঃখ ও মোহজালে জড়িত। কি জন্য কেন ইহাতে জীবগণ পরিভ্রমণ করিতেছে? এই সংসার-ভ্রমণ কি? জীবগণের প্রকৃত স্বরূপই বা কি? কেন এই সকল বিচিত্র ভূতবৃন্দ একবার আসিতেছে

আবার চলিয়া যাইতেছে? ইহাদের জনন-মরণের প্রকৃত রহস্য কি? মন সদাই চঞ্চল—সদাই বিকারময়; তাহারই বা স্বরূপ কি? কি উপায় অবলম্বন করিলেই বা এই মন প্রশান্ত হইতে পারে? শাস্ত্রের নির্দ্দেশ—এই সকলই মায়া; কিন্তু সেই মায়া কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া আবির্ভূত হইল? যদি তাহার আবির্ভাবই ঘটিল, তবে তাহার নিবৃত্তির উপায়ই বা কি হইতে পারে? যদি অকস্মাৎই ইহার আবির্ভাব, তবে ত নিবৃত্ত হইয়াও আবার অকস্মাৎই ইহা আবির্ভূত হইতে পারে? এই মায়া যদি একেবারেই নিবৃত্ত হইয়া যায়, তবে তাহাতেই বা গুণ, দোষ বা লাভালাভের সম্ভাবনা কি? আত্মা আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ; তাঁহাতে কিরূপে এরূপ পরিচ্ছিন্নভাব সমাগত হইল? মনের ক্ষয় বিষয়ে ভগবান্ বশিষ্ঠ মুনির নিকটই বা কি উপদিষ্ট হইলাম? ইন্দ্রিয়-জয় ও আত্মবিজ্ঞান, এই দুই বিষয়েই বা তিনি কি উপদেশ প্রদান করিলেন? শাস্ত্রবাক্যে বুঝিয়াছি, আত্মাই জীব, চিত্ত, মন ও মায়া প্রভৃতি প্রপঞ্চিত রূপের সহযোগে এই অসৎ দৃশ্য বিশ্বসংসার বিরচন ও বিস্তার করিতেছেন। এই সমস্তই মনোমাত্র সূত্রজালে পরস্পর গ্রথিত রহিয়াই দুঃখের হেতুভূত হইয়া থাকে; সুতরাং যখন এ সকলের সহিত মনঃসূত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখনই দুঃখশান্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব এই মনঃসূত্র ছিন্ন করিয়া আমাদের দুঃখময় ব্যাধির সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায় কিরূপে? মরাল যেমন দুগ্ধমিশ্রিত জল হইতে দুগ্ধভাগ পৃথক্ করিয়া লয়, তেমনি কি করিয়া কি উপায়ে আমি এই বুদ্ধিরূপিণী বলাকাকে ভোগরূপ অভ্রমালা হইতে পৃথক্ করিয়া লইব! আমরা ভোগ ত্যাগ করিতে পারিতেছি না, অথচ ভোগ ত্যাগ না করিলে বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করিতেও পারিব না। অহো! এ যে দেখিতেছি, বিষম সঙ্কটেই পড়িলাম। অর্থাৎ যদি সর্ব্বথা ভোগ ত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে ত জীবনধারণই অসম্ভব হইয়া উঠিবে, আর সেই জন্য যদি অল্পমাত্র ভোগও উপাদেয় হয়, তবে তাহাতেও তো বাসনার বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবিনী; সুতরাং ইহা যে একটা বিষম সঙ্কট উপস্থিত, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র। এদিকে আর এক সঙ্কট এই যে, যাহা পরম প্রাপ্তব্য আত্মতত্ত্ব, তাহা তো মনোমাত্র; অথচ সেই মনই আমাদিগের এই সকল বাহ্য বিষয় নিষ্পত্তির হেতুভূত। মূঢ়তা

বশতঃ উহা গিরি অপেক্ষা গুরুত্ব-বিশিষ্ট; কাজেই আমাদের নিকট উহা একান্তই দুরুদ্ধর। ফল কথা, মন বিশুদ্ধ না হইলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় সম্ভাবনা নাই, অথচ মনেরও বিষয়-বিরতি ঘটিবার নয়। অধুনা কোন উপায় অবলম্বন করিলে ঈদৃশ মলিন মনকে নির্ম্মল করা যায়? ইহা ত দেখিতেছি একান্তই অসাধ্য ব্যাপার। বালক স্বীয় মূর্খতায় ভূত-কল্পনা করিয়া লইয়া পরে যেমন তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় অন্বেষণ করিয়া পায় না, তেমনি দুর্ভাগ্য জীবনিবহও স্বকল্পিত মনোমল হইতে উদ্ধারের পথ নির্ণয় করিতে অক্ষম। নব-যৌবনশালিনী রমণী যেমন পতিকে পাইলে সাংসারিক সকল ব্যাকুলতা ভুলিয়া গিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়, তেমনি আমাদের মতি কি এক দিন সংসারের সমস্ত সম্ভ্রম অতিক্রম করিয়া কোন এক চিরস্থির বস্তু লাভে পরম শান্তি পাইবে না? কবে আমার মন হইতে সমস্ত সংকল্প চলিয়া যাইবে ও অশেষ কাম অপগত হইবে এবং কত দিনেই বা মদীয় মন নিষ্পাপ হইয়া পবিত্রভাব ধারণ করত আত্মপদে বিশ্রান্তি লাভ করিবে? কবে আমি পরিপূর্ণ সুধাকর অপেক্ষাও সুশীতল পদে সমারূঢ় হইয়া অনাসক্ত জীবন্মুক্তভাবে এ জগতে পরিভ্রমণ করিব? জলতরঙ্গ যেমন জলেতেই বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি আমার এই কল্পনাকোমল মন কত দিনে আপন প্রপঞ্চময় রূপ পরিহার করিয়া আত্মাতে বিলয় প্রাপ্ত হইবে এবং কবেই বা অবিনশ্বর শান্তিসুখ লাভ করিতে পারিবে? এই বিশাল সংসার অপার সাগরের ন্যায় প্রতীয়মান। বহুল বিষয়তৃষ্ণা ইহার তরঙ্গমালা এবং আশানিচয়রূপ হিংস্র জলজন্তুগণে ইহা সমাকুল। এ সাগর পার হইয়া কবে আমি ত্রিতাপ হইতে অব্যাহতি লাভ করিব? কবে—কতদিনে আমরা সর্ব্বত্র সমদর্শী ও বিচক্ষণ হইয়া মুমুক্ষুগণের উপশমশুদ্ধ পদবী প্রাপ্ত হইব এবং সমস্ত শোক হইতে মুক্ত হইয়া তাহাতে বাস করিব? যাহার প্রভাবে সর্ব্বাঙ্গ সন্তাপিত ও যাহা দেহধাতুর পক্ষে ভয়াবহ হইয়াছে, সেই এই সুদীর্ঘ সংসারতাপ কবে—কত দিনে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? হায় জীব! কতদিনে তোমার চিত্ত ব্যথা-বিরহিত হইবে এবং কবেই বা তুমি নির্ব্বাত দীপলেখার ন্যায় শান্তভাব প্রাপ্ত হইবে? তোমার অন্তরাকাশ হইতে কবে সমস্ত মালিন্য-মেঘ কাটিয়া

যাইবে এবং পরমাত্মার নির্ম্মল আলোকে কবে তুমি তোমার মানসকে সদা উল্লাসময় দেখিবে? বিষয়াভিমুখে আকর্ষণরূপ দুষ্ট চেষ্টায় সদাই যাহারা এই দেহকে দগ্ধ করিতেছে, সেই এই ইন্দ্রিয়গ্রাম কবে বিশালপক্ষ বিহঙ্গমগণের সাগর সমুত্তীর্ণ হইবার ন্যায় অবলীলাক্রমে দুঃখরাশির পর-পারে গমন করিবে? আমি যে পুত্র-কলত্র বা ধনাদির অলাভে কিম্বা অভাবে রোদন করিয়া থাকি, তাহার কারণ কেবল দেহের প্রতি অনর্থক আত্মভ্রম। কবে আমার এই ভ্রম শরতের অসিত মেঘের ন্যায় বিলয় পাইবে? যে পদের নিকট স্বর্গীয় মন্দার পাদপের রম্য উদ্যানে-বাস-জনিত সুখানুভবও তৃণের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া বোধ হয়, আমি সেই আত্মীয় পদ প্রার্থনা করি; কিন্তু জানি না, কবে কিরূপে আমি সে পদ প্রাপ্ত হইতে পারিব? রে আমার মন! বল্ দেখি, বীতরাগ পুরুষেরা যে নির্ম্মল জ্ঞানদৃষ্টির বিষয় বলিয়া থাকেন, তোর ভাগ্যে তাহা কখন ঘটিয়া উঠিবে কি? রে চিত্ত! দুঃখরূপ অজগরের ভক্ষ্য হইয়া পুনরায় কখন যেন আমাকে 'হা তাতঃ! হা মাতঃ! হা পুত্র!' ইত্যাদিরূপ সংসারিক বাক্যাবলী উচ্চারণ করিতে হয় না। হে বুদ্ধে, ভগিনি! তোমার আমি ভ্রাতা, তুমি এই ভ্রাতার প্রার্থনা সত্বর পূর্ণ করিয়া দাও। এস, ভগিনি! আমাদের উভয়ের দুঃখ মুক্তির নিমিত্ত মুনিবর বশিষ্ঠের বাক্যাবলীর বিচার করিতে প্রবৃত্ত হই। হে সতি মতি! তুমি আমার সুতা হইলেও তোমার পায়ে পড়িয়া প্রীতিভরে প্রার্থনা জানাইতেছি, তুমি ভবোচ্ছেদকরী ভূতি লাভার্থ স্থিরভাব অবলম্বন কর। হে মতি! বশিষ্ঠমুনি প্রথমে বৈরাগ্যোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অনন্তর তিনি মুমুক্ষু-ব্যবহার উৎপত্তিক্রম ও স্থিতি-প্রকরণও ব্যক্ত করিয়াছেন। তাঁহার সমস্ত উপদেশবাক্যই দৃষ্টান্ত দ্বারা সুন্দর, বিজ্ঞানগর্ভ ও সহজলভ্য; অতএব তুমি যথাযথ সে সকলের অর্থ স্মরণ কর। এস্থলে এ কথা বক্তব্য হইতে পারে বটে যে, মনকেই প্রথম প্রার্থনা করা হইয়াছে, সুতরাং তাহারই ত সাহায্যে উক্ত প্রকরণ-চতুষ্টয়ের অবধারণ হইতে পারে; তবে কেন তাহাকে ছাড়িয়া পুনরায় মতির নিকট প্রার্থনা করা হয়? এ কথার উত্তর এই যে, কোন সার বস্তু মনের সাহায্যে শতবার বিচার করিয়া স্থির করিলেও যত দিনে না সেই বিষয়ে সুদৃঢ় নিশ্চয়াত্মিকা মতি জন্মিবে, ততকাল তাহা কোন-

রূপেই ফলপ্রসূ হইবে না। সুতরাং শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বগুলি কেবল বুঝিলেই ফল হয় না; পরন্তু সেই সমুদায় তত্ত্বে মতি যাহাতে দৃঢ়রূপে নিবিষ্ট হইয়া সতত কর্ত্তব্যার্থ বিষয়ে মুখ্য পদ লাভ করিতে পারে, সে জন্য মতির নিকট প্রার্থনা করা সঙ্গতই বটে।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত। ॥ ২ ॥

তৃতীয় সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ! দিনমণির উদয়কামনায় পদ্ম যেমন রাত্রি যাপন করে, প্রভাত-সমাগমে বশিষ্ঠের বিশিষ্ট বাক্য শ্রবণ করিবার লালসা পোষণ করিয়া রামচন্দ্রও তেমনি উক্তরূপে উদার অনন্ত চিন্তা করিতে করিতেই সেই রাত্রি অতিবাহিত করিলেন। তখন দিঙ্মণ্ডল অন্ধকারে কপিশবর্ণ হইয়া আসিল। ধীরে ধীরে নক্ষত্রনিচয় গগন-গাত্রে বিলীন হইতে লাগিল। দিঙ্মণ্ডল ক্রমেই কিঞ্চিৎ অরুণাভা ধারণ করিল। তখন বোধ হইল, দিক্‌সকল যেন সহসা সম্মার্জ্জিত হইয়া উঠিল। এইবার চন্দ্রানন শ্রীমান্ রামচন্দ্র প্রভাতকালীন তূর্য্যধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন বোধ হইল, যেন কমলাকর হইতে সুন্দর কমল প্রফুল্লভাবে উত্থিত হইল।

অতঃপর রঘুবর প্রাতঃস্নান করিয়া ভ্রাতৃগণসহ বশিষ্ঠ মুনির গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। তখন মাত্র কতিপয় অল্পসংখ্যক পরিজন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল। রামচন্দ্র তথায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন,—মুনিবর নির্জ্জন দেশে সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতেছেন এবং তিনি আত্মধ্যানে নিরত রহিয়াছেন। তদ্দর্শনে রাম আনতকন্ধরে দূর হইতে মুনিকে প্রণাম করিলেন। প্রণামান্তে রাজকুমারগণ সকলে বিনীতভাবে তদীয় গৃহাঙ্গনে অবস্থান করিলেন। তাঁহাদের অভিপ্রায়—যতক্ষণে না মুনির ধ্যানভঙ্গ হয়, তাঁহারা তাবৎ পর্য্যন্ত তদীয় প্রতীক্ষায় রহিবেন।

এদিকে এতক্ষণে নৈশ অন্ধকারপুঞ্জ একেবারেই বিদূরিত হইল এবং

দিঙ্মণ্ডল সুস্পষ্ট আলোকিত হইয়া উঠিল। তখন রাজন্যগণ, রাজকুমার-গণ, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মলোকযাত্রী দেবগণের ন্যায় সকলেই বশিষ্ঠ-সদনে আগমন করিলেন। এই ব্যাপারে বশিষ্ঠের ভবন হস্তী, অশ্ব, রথ ও মনুষ্য-সমাগমে সমাকুল হইল; সুতরাং সে ভবন মুনির বাসস্থান হইলেও তৎকালে তাহা রাজভবনের ন্যায় সুশোভিত হইয়া উঠিল।

অনন্তর ক্ষণকাল মধ্যেই ভগবান্ বশিষ্ঠের সমাধি ভঙ্গ হইল। তিনি যথাযোগ্য বিনয়াচার ও প্রিয় বচনাদি উপচার দ্বারা সেই সমাগত প্রণত জন-মণ্ডলীকে আপ্যায়িত করিলেন। তারপর ভগবান্ কমলযোনি যেমন স্বীয় পদ্মাসনে আরোহণ করেন, তেমনি ভগবান্ বশিষ্ঠও সভাগৃহে যাইবার জন্য দিব্য রথে আরোহণ করিলেন। বিশ্বামিত্রপ্রমুখ অন্যান্য বহু মুনিই তখন তাঁহার অনুগমন করিলেন। তিনি বহু সৈন্যে পরিবৃত হইয়া দশরথ নর-পতির ভবনাভিমুখে প্রস্থানোদ্যত হইলে, মনে হইল, সুরগণ-সমন্বিত ব্রহ্মা যেন ইন্দ্রালয়ে গমন করিতে লাগিলেন। অনন্তর হংসগণ-বেষ্টিত রাজহংস যেমন সরোজিনীসদনে প্রবেশ করে, ভগবান্ বশিষ্ঠও তেমনি সেই বিনীত-জনশালিনী সুরম্যা দাশরথী সভায় প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া স্বয়ং মহারাজ দশরথ সিংহাসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া সত্বর তিন পদ অগ্রগমনপূর্ব্বক সসম্ভ্রমে তদীয় অভ্যর্থনা করিলেন। তখন মহীপতি দশরথপ্রমুখ রাজন্যগণ, বশিষ্ঠপ্রভৃতি মুনিগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, সুমন্ত্রাদি মন্ত্রিগণ, সৌম্যপ্রমুখ বুধগণ, রামচন্দ্র প্রভৃতি রাজপুত্রগণ, শুভ প্রভৃতি মন্ত্রিপুত্রগণ, অন্যান্য অমাত্যবর্গ, প্রকৃতিপুঞ্জ, সুহোত্র প্রভৃতি নাগরিকবৃন্দ, মালযাদি ভৃত্যবর্গ এবং পৌর-প্রমুখ মালিগণ, সকলেই পরস্পর সভামধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

তখন বশিষ্ঠ-মুনির মুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সভ্যগণ সকলেই স্ব স্ব আসনে উপববিষ্ট হইলে সভার সকল কোলাহল প্রশান্ত হইয়া গেল। বন্দিগণ মৌনাবলম্বন করিল। গত রাত্রিযোগে সকলের পরস্পর সুখাবস্থানের প্রশ্ন ও প্রশ্নোত্তর নিবৃত্ত হইল। সভামধ্যে সম্পূর্ণ নীরবতা বিরাজিত হইল। প্রস্ফুটিত পঙ্কজ-কোষ হইতে নির্গত হইয়া মৃদু মন্দ গন্ধবহ সভা মধ্যে বহিতে লাগিল; তাহাতে পরাগপুঞ্জ ও রাজন্যগণের কণ্ঠগত মুক্তাফল

সকল দুলিতে লাগিল। সভামণ্ডপের চারিদিকে দোলাকারে অসংখ্য কুসুমমালা লম্বিত ছিল, সেই সমীরণ তৎসংসর্গে আরও অধিক আমোদ-ময় হইয়া মধুরভাবে বহিতে লাগিল। সভাগৃহ বহু বাতায়নে বিরাজিত ছিল; সেই সকল বাতায়ন-পার্শ্বস্থ ভূমিভাগ কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ ও কোমল পর্য্যঙ্কনিচয়ে সমলঙ্কৃত হইল। পুরকামিনীগণ সেই সকল পর্য্যঙ্কে উপবেশন-পূর্ব্বক সভার কার্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্বেত চামরধারিণী রমণীরাও স্ব স্ব যৌবনসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া আপন আপন স্থানে মৌনভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। গবাক্ষপথে সমাগত সৌরকরে তাহা-দের চঞ্চল দৃষ্টি প্রতিহত হওয়ায় তাহা যেন আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং তাহাদের কোমল কলেবরকান্তি রত্নালঙ্কারের প্রভাপুঞ্জে পিঙ্গলাভা ধারণ করিল। সভার সমস্ত প্রাঙ্গণভূমি নানারত্নে খচিত ও নানাজাতীয় কুসুম-রূপ চিত্ররচনায় সুশোভিত ছিল। স্ফাফলের প্রতিচ্ছায়ার ন্যায় সৌর-কর-নিকর তাহার মধ্যে মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ায় ভ্রমরেরা মনে করিল, এ সকল কুসুম নহে, ইহারা অভিনব আতপবিম্ব; এই মনে করিয়া তাহারা ভ্রম-ক্রমে সভা প্রাঙ্গণের সেই বিকীর্ণ কুসুমসমূহে আর পতিত হইল না; তাহারা শূন্যেই ভ্রমণ করিতে লাগিল। মনে হইল, নীল মেঘে আকাশ যেন ছাইয়া ফেলিল। সেই সভাগৃহ সাধুসম্প্রদায়ের এক মহাসম্মিলন স্থান হইয়াছিল। বহুজন-সম্মানিত বহু লোক সে সভায় আসিয়া যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরস্পর বিস্ময়ভরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—অহো! আমরা নিশ্চয়ই বহু পুণ্য করিয়াছিলাম; তাহারই ফলে ভগবান্ বশিষ্ঠের বদন-বিনির্গত এমন মধুর উপদেশ অধুনা শ্রবণ করিতেছি। নানাদিক্, নানা নগর এবং গগন ও বনাদি নানাস্থান হইতে বিদ্যাধর, আর্য্য ও বিপ্র প্রভৃতি যে সকল সভ্য আসিয়া সভামধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিলেন, তাঁহারা সকলেই মৌনভাবে বশিষ্ঠদেবকে প্রণাম করিয়া নীরবে স্ব স্ব স্থান অধিকার করিলেন এবং স্ব স্ব পরিচিত অবশ্যসম্ভাষ্য সভ্যদিগের সহিত কাণে কাণে কথা কহিতে লাগিলেন। তখন সভাগৃহের অদূরস্থিত জলাশয়ের প্রস্ফুটিত কোকনদাবলীর কোমল কোশ হইতে সমাকৃষ্ট অলিকুলের, মকরন্দ-সম্ভারের এবং সুন্দরবর্ণ পরাগপুঞ্জের রঞ্জনায় ঈষৎ পিঙ্গলাভ সমীরণ প্রবাহিত হইতে

লাগিল; তাহাতে দোলায়িত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা হইতে মধুরধ্বনি উত্থিত হওয়ায় অন্যান্য গৃহ-গীতিধ্বনি অভিভূত হইয়া পড়িল।

ভরদ্বাজ! সেই সভাপ্রাঙ্গণে রাশি রাশি সরস কুসুমদাম বিকীর্ণ ছিল। তৎকালে তৎসমুদায়ের উদ্দাম গন্ধ ও বিতানবদ্ধ অম্ভোরুহদলের সৌরভের সহিত অগুরু-চন্দনাদির আমোদময় ধূমরাশি ঊর্দ্ধদেশে প্রবাহিত হইলে অভ্রবৃন্দ সুরভিত হইয়া উঠিল; তখন ধূমনীলিমায় ভৃঙ্গসমূহের দেহ-কান্তি তিরোহিত হওয়ায় তাহারা কেবল ঝঙ্কার-রবেই অনুমিত হইতে লাগিল।

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩॥

চতুর্থ সর্গ।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ! মহারাজ দশরথ তখন সুন্দর সুস্পষ্ট পদ বিন্যাস-পুরঃসর মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ দেবকে জলদগম্ভীর-স্বরে বলিলেন,—ভগবন্! গত দিবস আপনি বহু সারগর্ভ দীর্ঘ বাক্যসন্দর্ভ প্রয়োগ করিয়াছিলেন। অতি তীব্র তপস্যাচরণে আপনার শরীর স্বভাবতই কৃশ; তাহাতে কল্য বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রমাগত উপদেশ দিয়াছিলেন; সুতরাং নিশ্চয়ই আপনার ক্লান্তি হইয়াছিল। আপনি সেই ক্লান্তি হইতে অধুনা মুক্ত হইয়াছেন তো? ব্রহ্মন্! গত দিন আপনি যে আনন্দজনক বিশদ বাক্যসকল বলিয়াছেন, তাহাতে আমরা পীযূষরস-বর্ষণবৎ সমাশ্বাসিত হইয়াছি। এ কথা যথার্থই বটে যে, সুধাংশুর সুধাসুন্দর অংশুজাল যেমন তমোরাশি নিরাস করিয়া শৈত্যসুখ বিস্তার করে, মহাত্মাদিগের বিমল বাণীও তেমনি মোহান্ধকার বিদূরিত-করিয়া অন্তরে সংসার-তাপ-হর অপার শ্রমশীতলতা উৎপাদন করিয়া থাকে। বস্তুতই মহাত্মাগণের বাণী অতি আনন্দদায়িনী; উহা উন্নতপদে উপনীত হইবার মূল এবং অতি বড় মোহনাশেও সক্ষম। আত্মরূপ রত্ন-দর্শনের একমাত্র দীপিকা-রূপিণী যুক্তিলতা যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া

উদয় প্রাপ্ত হয়, সেই সজ্জনরূপ পাদপ এ জগতে সকলেরই বন্দনীয়। যেমন শীতাংশুর অংশুনিচয়ে তমস্তোম অপসারিত হয়, তেমনি সাধুজনের সুযুক্তি বহুল বচন-বিন্যাসে জগতের সর্ব্ববিধ দুরীহিত ও দুর্ব্বিহিতই বিদূরিত হইয়া যায়। হে মুনে! আমাদের তৃষ্ণা ও লোভ প্রভৃতি সংসারের নিগড়-গুলি ভবদীয় উক্তিপরম্পরায় শারদীয় নীলাম্বুদমালার ন্যায় ক্রমশই ক্ষীণ হইতেছে। হে ভগবন্! যেমন জন্মান্ধ জন রসাঞ্জনবলে দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া কাঞ্চন দর্শন করে, আমরাও তেমনি ভবদীয় উপদেশ-বচনে ব্রহ্মরসরূপ অভ্যঞ্জনগুণে প্রত্যক্ দৃষ্টি লাভ করিয়া নির্ম্মল পরমাত্মাকে সাক্ষাৎ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ভবদীয় উক্তিগুলি যেন শরৎকালের ন্যায় প্রকটিত হইতেছে, তাহাতে আমাদের হৃদাকাশের চিরসঞ্চিত ভব-বাসনারূপিণী জলদাবলী যেন ক্রমশই বিলয় পাইতেছে। হে মুনে! উদারবুদ্ধি সাধুগণের বচনাবলী যেমন অন্তঃকরণকে আহ্লাদিত করিয়া থাকে, আমি মনে করি, পারিজাত-পুষ্পের মঞ্জরী বা সুধাম্বুধির তরঙ্গাবলীও অন্তরে সেরূপ আহ্লাদ উৎপাদন করিতে পারে না।

বৎস রাঘব! জানিয়া রাখ, মহাপুরুষের সেবা-সপর্য্যায় যে যে দিন যাপিত হয়, সেই সেই দিনই যথার্থ আলোকময়; তদ্ব্যতীত অপর যত কিছু দিন,—সে সমুদায়ই অন্ধকারময় বৈ আর কিছুই নয়। হে রাম, পদ্মপলাশলোচন! মুনিবর বশিষ্ঠ অধুনা প্রসন্নমনে অবস্থান করিতেছেন, তুমি আবার উঁহার নিকট সেই নিত্যসিদ্ধ পরমাত্মার বিষয় জিজ্ঞাসা কর।

মহীপতি দশরথ এই কথা কহিলে উদারহৃদয় বশিষ্ঠ মুনি তৎকালে রামচন্দ্রের অভিমুখীন হইয়া বক্ষ্যমাণ বাক্য সকল বলিতে লাগিলেন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুকুলচন্দ্র, মহাপ্রাজ্ঞ রামচন্দ্র! আমি পূর্ব্বে তোমায় যে সকল বাক্য বলিয়াছি, পূর্ব্বাপর বিচার-আলোচনায় তৎসমস্ত বাক্যার্থ কি তোমার স্মৃতিপথে সমুদিত হইতেছে? হে অরিন্দম! সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণভেদে পূর্ব্বে আমি বহু বিচিত্র উৎপত্তি-বিভাগ তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, সে সকল বিবরণ তোমার স্মরণ আছে কি? এই সমস্তই যাঁহার রূপ, অথচ যিনি সর্ব্বাতীত, যিনি সৎ, অথচ অসৎ এবং যিনি সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই বিরাজিত, সেই পরমাত্মার স্বরূপ তুমি বুঝিতে পারিয়াছ

কি? আমার পরমাত্মবিষয়িণী উক্তিগুলি তোমার স্মরণ আছে ত? তুমি নিজ বুদ্ধিবলে সেই পরমাত্মাকে সমস্ত দৃশ্য হইতে নির্ম্মুক্ত বলিয়া বুঝিয়াছ তো? হে সাধো, সাধুবাদের একমাত্র যোগ্য পাত্র! এই বিশ্ব যেরূপে সেই বিশ্বেশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহা কি তোমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত আছে? হে সন্মতে। অবিদ্যার বহু বিস্তৃতরূপ জ্ঞানীর জ্ঞানপ্রভাবে ক্ষণভঙ্গুর হইলেও যাহারা অজ্ঞানী, তাহাদের নিকট উহা অনন্ত ও অপরিচ্ছিন্ন বলিয়াই প্রতীত হয়। যাহা হউক, তোমায় জিজ্ঞাসিতেছি, আমি সেই অবিদ্যার অকিঞ্চন রূপের বিষয় যাহা তোমায় বলিয়াছি, তাহা তোমার স্মরণ আছে কি? মনুষ্য যে মনোময় ভিন্ন অন্য কিছুই নহে, লক্ষণাদি বিচার দ্বারা পূর্ব্বেই ইহা মৎকর্ত্তৃক প্রতিপাদিত হইয়াছে। তোমার কি ইহা সম্যক্ স্মরণ আছে? হে রাম! তুমি গত রাত্রে যে সমস্ত বাক্যার্থ বিচার করিয়াছ, তাহা তোমার হৃদয়ে সম্যক্ সন্নিবেশিত হইয়াছে কি? দেখ, পবিত্র শাস্ত্রীয় কথাগুলি বারম্বার বিচার করিয়া হৃদয়ে বিনিবেশিত করিতে পারিলে, অতি সত্বরই শুভ ফল প্রদান করে; পরন্তু যদি হেলাক্রমে উপদিষ্টার্থ নষ্ট করা হয়, তাহা হইলে আর কোনই ফল-সম্ভাবনা থাকে না। হে রঘুনন্দন! কণ্ঠই যেমন মুক্তামালার যোগ্য স্থান, তুমি বিবিক্তাশয়—তুমিই তেমনি বিবিক্ত বিশুদ্ধ উপদেশবাণীর উপযুক্ত আধার।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! ব্রহ্মনন্দন মহাতেজা বশিষ্ঠমুনির বাক্যাবসানে বলিবার অবসর পাইয়া রামচন্দ্র তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আমি যে পরম উদারভাবে ভবদীয় বাক্যার্থ বুঝিতে পারিয়াছি, ইহা আপনারই মাহাত্ম্য বৈ আর কিছুই নহে। আপনি আমায় যাহা যাহা উপদেশ দিয়াছেন, তৎসমস্তই সত্য; আপনার উপদিষ্ট বিষয় কদাচ অন্যথা হইবার নহে। গত রাত্রে আমার নিদ্রা হয় নাই, আমি সমস্ত রাত্রি জাগিয়া আপনার উপদিষ্ট বাক্যার্থসম্বন্ধে বিশেষ চিন্তা করিয়াই দেখিয়াছি। হে প্রভো! জানিয়াছি, মদীয় ভবান্ধকার বিদূরিত করিবার নিমিত্তই ভবদীয় মুখরূপ মরীচিমালী দ্বারা আপনি রশ্মিপুঞ্জরূপ সদর্থশালী বাক্য সকল বর্ষণ করিয়াছেন। হে অদীনহৃদয়! গত দিবসে আপনি যাহা যাহা বর্ণন করিয়াছেন, সে সকলই আমি

দিব্য, পূত ও দুর্লভ রত্নরাজির ন্যায় মানসমন্দিরে সযত্নে রক্ষা করিয়াছি। আপনার প্রদত্ত উপদেশ হিতানুবন্ধী, মনোহর, পবিত্র ও আনন্দজনক; সুতরাং সিদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যেই বা কে না তাহা মস্তক দ্বারা বহন করিয়া থাকেন? বস্তুতঃ আপনার উপদেশে আমরা এখন সংসারের মোহ-মিহিকার আবরণ প্রতিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়াছি। ভবদীয় প্রসাদে বর্ষার অবসানদিনের ন্যায় আমরা প্রসন্নভাব লাভ করিয়াছি।

হে ভগবন্! আপনার উপদেশ আপাতশ্রবণে মধুর, মধ্যে অর্থাৎ মনন ও নিদিধ্যাসন-কালে সৌভাগ্য-সম্বর্দ্ধক এবং অন্তে পরম ফল-জনক। ঐ পবিত্র উপদেশ-কল্পতরু-কুসুম মনের বিকাশ বিধান করে; উহাতে কোন মালিন্যই নাই, উহা কি দেব, কি সর্পাদি, সকলেরই সমানভাবে আহ্লাদ-জনক হয়। আমাদেরও উহা শুভফলপ্রদ হউক। হে সমস্ত শাস্ত্রবিচারে বিশারদ! হে প্রসৃত পুণ্য-জলের একমাত্র মহাহ্রদ! হে বিততব্রত! আপনি সম্প্রতি আমাদের প্রতি কৃপাকুল হইয়া ভবদীয় পবিত্র উপদেশরূপ বিমল জলপ্রবাহে আমাদের কলুষমল অপনীত করিয়া দিউন।

চতুর্থ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

পঞ্চম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে সুন্দরাকার! অধুনা অবহিত হইয়া এই উপশম-প্রকরণ শ্রবণ কর। এই প্রকরণ শাস্ত্রীয় উত্তম উত্তম সিদ্ধান্ত দ্বারা সমলঙ্কৃত হইয়াছে, ইহা শ্রবণে মানবের মঙ্গল লাভ হইয়া থাকে। রাম! সুদৃঢ় স্তম্ভসমূহ যেমন মণ্ডপ ধারণ করে, তেমনি রাজস ও তামসস্বভাবের জীবনিবহই এই সুদীর্ঘ সংসার-মায়াকে নিয়ত ধারণ করিয়া রহিয়াছে। ভুজঙ্গ যেমন অনায়াসে স্বীয় ত্বক্ পরিহার করে, তেমনি ভবাদৃশ সাত্ত্বিক-স্বভাব ধীর ব্যক্তিগণই এই সংসার-মায়াকে হেলায় পরিত্যাগ করিতে পারেন। যাঁহারা সাত্ত্বিকপ্রকৃতি প্রাজ্ঞ জন,

অথবা যাঁহাদের আংশিকভাবে সাত্ত্বিক বা রাজসিক প্রকৃতি বর্ত্তমান,—হে সাধো! জগতের পূর্ব্বে কি ছিল, না ছিল এবং এই জগৎ কোথা হইতে আসিল, এরূপ বিচার করিবার জন্য তাঁহারাই প্রযত্ন প্রকাশ করেন। শাস্ত্র-চর্চ্চা, সাধুসঙ্গ এবং সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান, এই সকল ব্যাপারে যাঁহাদের পাপ প্রনষ্ট হইয়া গিয়াছে, প্রকৃত পক্ষে তাঁহাদের বুদ্ধিই দীপকলিকার ন্যায় সারবস্তু সন্দর্শনে সক্ষম হইয়া থাকে। কেবল শাস্ত্রোপদেশ প্রাপ্ত হইলেই যে কৃতকার্য্য হওয়া যাইবে, এরূপ অবশ্য বলা যাইতে পারে না। কেন না, যত দিনে না শাস্ত্রোপদেশ প্রাপ্ত হইয়া একাগ্রতার সহিত আপনা হইতেই সুচারুরূপে বিচার করিয়া প্রকৃততত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাবৎ কাল প্রকৃত জ্ঞান প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই।

হে রঘুনন্দন! রাজস এবং সাত্ত্বিক, এই উভয় প্রকৃতি দ্বারাই ক্ষত্রিয়-গণ গঠিত; তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ধৈর্য্যশীল, প্রজ্ঞাবান্, নীতিমান্ ও সৎকুলসম্পন্ন, তুমি সেই সকল ক্ষত্রিয়মধ্যেও প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছ; এই জন্য দুরবগাহ আত্মতত্ত্ব লাভের তুমিই সম্পূর্ণ অধিকারী। হে প্রাজ্ঞ! এই সংসারমধ্যে সৎ কি, আর অসৎই বা কি, তুমি আপনার অলোকসামান্য প্রজ্ঞাবলে নিজেই তাহা বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখ এবং যাহা সত্য, তাহাতেই নিরত হইয়া থাক। যাহা পূর্ব্বে কখনই ছিল না এবং পরেও যাহা থাকিবার নয়, বল দেখি, তাদৃশ বস্তুর সত্যতা সিদ্ধি হয় কিরূপে? ফল কথা, যাহা সত্য, তাহা আদি, অন্ত ও মধ্য, এই কাল-ত্রয়েই সত্য; সত্যের কখনই অসদ্ভাব ঘটে না। যে বস্তু আদি এবং অন্ত, এই উভত্রই অসম্ময়, তাহাতে যাহার মন সত্যজ্ঞানে অনুরক্ত হয়, তথাবিধ মুগ্ধ পশুস্থানীয় জীবের বিবেক জন্মিবে কিরূপে? এ সংসারে একমাত্র মনই জন্মে এবং মনই বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যদি সম্যক্‌রূপে আলোচনা করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে, বুঝা যাইবে,—মনই মুক্ত হইয়া থাকে অর্থাৎ মোক্ষও মনেরই ঘটে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি ইহা বুঝিতে পারিয়াছি যে, এই ত্রিভুবন মধ্যে মনই একমাত্র সংসার ভোগ করে এবং জরা মরণ প্রভৃতি যত কিছু অবস্থা, তৎসমস্ত কেবল মনেরই ঘটিয়া থাকে। পরন্তু হে

গুরো! উহার বন্ধন-মোচনের পক্ষে যাহা প্রকৃষ্ট উপায় হইতে পারে, আপনি এক্ষণে তাহাই নিশ্চয় করিয়া বলুন। বস্তুতঃ হে মুনিবর! রঘু-বংশীয়দিগের হৃদয়ের অন্ধকাররাশি অপসারিত করিবার জন্য আপনিই প্রকৃত প্রভাকররূপে দেদীপ্যমান।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! অগ্রে শাস্ত্রানুশীলন, পরম বৈরাগ্যা-ভ্যাস ও সাধুসঙ্গ দ্বারা মনকে পবিত্রতায় উপনীত করিতে হয়, অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানোদয়ের যোগ্যতা জন্মাইতে পারে, প্রথমে মনের ঈদৃশ বিশুদ্ধি বিধান করা কর্ত্তব্য। পরে মন যখন নিরভিমান হইয়া বৈরাগ্য লাভ করিবে, তখন গভীর জ্ঞানশালী গুরুজনের অন্বেষণ করিয়া বিধিমত তদীয় উপদেশা-ধীন হইতে হইবে। অনন্তর গুরুর উপদেশ মত ধ্যান, ধারণা ও অর্চ্চনাদি করিলে ক্রমশঃ পরমপাবন ব্রহ্মপদ অধিগত হওয়া যাইবে। যদি বিচারবলে অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলে যেমন মেঘাবরণ-হীন সমস্ত আকাশ শীতল সুধাকর-করে পরিপূর্ণাকারে পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি আত্মা দ্বারাই পূর্ণ আত্মস্বরূপ অবলোকন করা যায়। জীব যত দিনে না চিত্তের সহায়তায় বিচারতটে বিশ্রাম লাভ করিতে পারে, এই সংসাররূপ মহার্ণবে ততদিনই তাহাকে তৃণের ন্যায় নানাস্থানে বাহিত হইতে হয়। জল যখন সৌম্যভাব অবলম্বন করিয়া স্থির হয়, তখন সে যেমন তৎসংসৃষ্ট সমস্ত বালুকাবলীকে অধঃপাতিত করে, তেমনি বিচারবলে বুদ্ধি যাহার স্থিরত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই ব্যক্তিই সমস্ত মানস দুঃখ নিরস্ত করিয়া থাকে। সুবর্ণ যদি ভস্মাচ্ছাদিত থাকে, তবে অন্যে তাহা ভস্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে জানিতে না পারিলেও সুবর্ণতত্ত্বে অভিজ্ঞ স্বর্ণকারের নিকট যেমন সুবর্ণ ও ভস্মের পার্থক্য-পরিজ্ঞান পরিস্ফুটভাবেই হয়, তেমনি যে ব্যক্তি বহু বিচার করিয়া আত্মার অবিনশ্বরত্ব ও বিশুদ্ধভাব বুঝিতে পারিয়াছে, সংসারে দুরপনেয় মোহ বিদূরিত করা তাহার পক্ষে বড় একটা কষ্টসাধ্য হয় না। সংসারে সার-বস্তু কি? তাহা জানিতে না পারিয়া মানুষের মন যদি মোহমগ্ন হয়,—হউক; কিন্তু এ কথা নিঃসংশয়রূপেই বলিতে পারা যায় যে, যদি সংসারের সার পদার্থ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা হইলে, মূঢ়তার লেশমাত্রও থাকে না।

হে শ্রোতৃবর্গ! আপনারা জানিয়া রাখিবেন, আপনাদের যে কিছু দুঃখ, আত্মতত্ত্বের অপরিজ্ঞানই তাহার একমাত্র কারণ। পরন্তু আত্মা যখন পরিজ্ঞাত হয়েন, তখন তিনি অনন্ত সুখ ও অপার শান্তিরই কারণ হইয়া থাকেন। এই দেহ আত্মার প্রকৃত স্বরূপের আবরক; অধ্যাস-বশতই ইহার সহিত আত্মার স্বরূপ যেন পার্থিব সুখ-দুঃখে মিশ্রীভূত বলিয়া মনে হয়। পরন্তু তোমরা যদি স্বীয় আত্মাকে পঞ্চকোষ বিবেক দ্বারা বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে অচিরকাল মধ্যেই স্বস্থ হইতে পার এবং তোমাদের সর্ব্ববিধ কল্পিত দুঃখও নিরস্ত হইতে পারে। জানিবে—আত্মা যিনি, তিনি—নির্ম্মলস্বভাব; সুতরাং দেহের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই। হে সভাস্থ মানবগণ! যেমন সুবর্ণ পঙ্ক-লিপ্ত হইলে পঙ্কধর্ম্ম মালিন্য-কেও সুবর্ণের ধর্ম্ম বলিয়া প্রতীত হয়, তেমনি দুঃখময় দেহ সহ আত্মার কল্পিত সম্বন্ধ বশতঃ আত্মাতেও দেহধর্ম্ম দুঃখাদি আরোপিত হইয়া থাকে। পদ্মের আধার মহাজল ও পদ্মপত্র-স্থিত জলবিন্দু, এই উভয় [illegible] অভিন্ন হইলেও পদ্মপত্ররূপ উপাধি যেমন উহাদের ভিন্নতা বোধ [illegible] করিয়া দেয়, তেমনি ব্রহ্ম ও জীব পরস্পর অভিন্ন হইলেও অন্তঃকরণরূপ উপাধিই উহাদের ভেদ-ভ্রম আপাদিত করিয়া 'তিনি ব্রহ্ম, আমি জীব' এবম্প্রকার ভেদানুভূতি জন্মাইয়া থাকে। আমি ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তোমাদের নিকট এই কথা ঘোষণা করিতেছি; কিন্তু দুঃখের বিষয়, সংসারের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া কেহই আমার কথায় কর্ণপাত করিতেছে না। আমি পুনরপি এই এক কথা বলিতেছি, যতকাল পর্য্যন্ত জড়ধর্ম্মী মন কূপ-কচ্ছপের ন্যায় আত্মবিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া প্রবৃত্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া রহিবে, যদি ততকালের মধ্যে ইন্দু ও বহ্নি প্রভৃতি তেজোরাশির সহিত দ্বাদশ দিবাকরও এককালে অভ্যুদিত হইয়া প্রকাশিত হইতে থাকেন, তথাপি এই সংসার-তিমির অপাকৃত করিবার সামর্থ্য তাঁহাদের হইবে না। মন যখন প্রবুদ্ধ হইবে এবং সমস্ত চঞ্চলতা পরিহার করিয়া স্বীয় পারমার্থিকী স্থিতি বিচার করিয়া দেখিবে, তখন দিনেশোদয়ে নৈশ অন্ধকারের ন্যায় হৃদয়ের চিরসম্ভৃত মোহান্ধকার বিদূরিত হইয়া যাইবে। মন দেহের সহিত আত্মার তাদাত্ম্য অধ্যাসরূপ শয্যায় শয়ান; এই মন যাহাতে

ভব-ধ্বংসী উত্তম বোধ প্রাপ্ত হইতে পারে, সে জন্য ইহাকে প্রত্যহ প্রবুদ্ধ করিতে প্রযত্ন প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। কেন না, এই ভব-বিস্তার অতীব দুঃখপ্রদ; বোধ বা জ্ঞান ব্যতীত ইহার উচ্ছেদ সাধন কিছুতেই হইবে না। যেমন ধূলিজালে গগন ও জল-সংস্পর্শে কমল লিপ্ত হয় না, তেমনি জড় দেহের সহিত সম্পর্ক বা সংস্পর্শ ঘটিলেও আত্মা তাহাতে সংশ্লিষ্ট নহেন। সুবর্ণোপরি কর্দ্দম লেপিয়া দাও, তাহাতে যেমন উপরে মলিন বলিয়া বোধ হইলেও প্রকৃত পক্ষে সুবর্ণ কখন কর্দ্দমধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পড়ে না, তেমনি ঘটুক না—আত্মার জড়দেহের সহিত সম্পর্ক, আত্মা তাহাতে কখনই জড়-ধর্ম্মাক্রান্ত হয়েন না। আত্মাতেই সুখদুঃখের অনুভূতি হইয়া থাকে, এইরূপ অববোধ একান্তই অসত্য। গগনে যেমন চিত্রাবলী বা মালিন্য সম্ভাবনা নাই, তেমনি নিত্য নির্লিপ্ত আত্মাতেও কোন বৈষয়িক সুখ-দুঃখ সম্পর্ক অসম্ভব। সুখ ও দুঃখ এই দুইটী ধর্ম্ম দেহের নহে এবং আত্মা সর্ব্বাতীত, তাঁহাতেও সুখ-দুঃখের সম্পর্ক ঘটিতেই পারে না। সুখ-দুঃখ অজ্ঞানেরই ধর্ম্ম; অজ্ঞানবশতই জীব আত্মাকে সুখী ও দুঃখী বলিয়া বোধ করিয়া থাকে। পরন্তু অজ্ঞান যদি নষ্ট হইয়া যায়, তখন আর কাহারও সুখ-দুঃখ বোধ হয় না। ফলে সুখ ও দুঃখ আত্মার বা দেহের কাহারই নহে।

হে রাঘব! সুখ বা দুঃখ কাহারও কিছুই নাই। এ জগতে যাহা কিছু বিদ্যমান, সমস্তই আত্মবিবর্ত্ত, শান্ত ও অনন্তরূপেই অবলোকন কর। ভাবিয়া দেখ, জলে যেমন তরঙ্গরাজি ও আকাশে যেমন পিচ্ছ-স্থিতি, তেমনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চও আত্মাতে ভ্রান্তি মাত্র দ্বারাই পরিদৃশ্যমান হইতেছে। যেমন ভাস্বরমণি নিজে কোনরূপ বিকারাশ্রয় না হইয়াই আপনার বিমল বিভায় অন্য বস্তুকে প্রভাময় করিয়া তুলে, তেমনি নিত্য বিজ্ঞানময় আত্মাও নিজে কোনরূপ বিকার প্রাপ্ত না হইয়া স্বীয় প্রভাবে এই দৃশ্যমান বিশাল বিশ্ব বিরচণ করিয়া থাকেন।

হে সুমতে! আত্মা ও জগৎ এই উভয়কে একই বস্তু বলিয়া ব্যাখ্যা করা যায় না, আবার আত্মা হইতে জগৎ যে ভিন্ন বস্তু, তাহাও বলা সমীচীন নহে। ইহা আত্মার আভাসমাত্ররূপেই সম্প্রতি প্রতিভাত

হইতেছে। প্রকৃত পক্ষে জগতের একটা পারমার্থিক সত্তা নাই। এই যাহা কিছু দৃষ্ট বা জ্ঞানগম্য হইতেছে, সমস্তই একমাত্র ব্রহ্ম; ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। সেই পরমব্রহ্ম বা পরমাত্মাই নিজ প্রভাবে এই জগদাকারে বিরাজ করিতেছেন। অতএব হে অনঘ! আমি এবং জগৎ পরস্পর ভিন্ন পদার্থ, এইরূপ ভ্রম যদি তুমি আশ্রয় করিয়া থাক, তবে তাহা পরিত্যাগ কর। অতি বিস্তৃত মহার্ণবে তরঙ্গরাজি প্রাদুর্ভূত হয়; কিন্তু সমুদ্র হইতে তাহাদের যেমন পৃথক্ সত্তা স্বীকার করা যায় না, তেমনি সর্ব্বগত অবিনাশী ব্রহ্মেই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উদ্ভূত বটে; কিন্তু তাহা হইলেও সেই ব্রহ্ম হইতে ইহার পার্থক্য কল্পনা স্বীকার্য্য হইতে পারে না। পরমাত্ম বস্তু একমাত্র; তিনি সর্ব্বস্বরূপ। বহ্নিতে যেমন হিম-জলকণার সম্ভাবনা নাই, তেমনি তাঁহাতেও দ্বিতীয় বস্তু কল্পনা সম্পূর্ণই অসম্ভব। আত্মাই চিন্ময় আত্মা দ্বারা চিন্ময় আত্মাকে ভাবনা করেন। আত্মাই সরল সমুজ্জ্বল স্বীয় স্বরূপে বিরাজ করত স্বশক্তিবশতঃ আপনাকেই দৃশ্যাকারে ভাবিত করিয়া থাকেন।

হে রঘুনন্দন! আত্মাতে শোক নাই, মোহ নাই বা জন্ম নাই। তিনি যেমন আছেন, তেমনি নিত্য বিরাজমান। এই সকল অবধারণ করিয়া তুমিও বিজ্বর হইয়া বিরাজ কর; বৃথা শোক-সন্তাপের বশীভূত হইও না। হে রাঘব! তুমি নির্দ্বন্দ্ব অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি শারীর বিক্ষেপ হইতে নির্ম্মুক্ত এবং নিত্য সত্ত্বস্থ অর্থাৎ রজঃ ও তমো দ্বারা মানস-বিক্ষেপ-বিরহিত হও। তোমার যোগক্ষেম অর্থাৎ লাভালাভ চিন্তা বিদূরিত হউক। তুমি আত্মবান্, বিশোক ও বিজ্বর হইয়া অবস্থান কর। অর্থাৎ তুমি ব্রহ্মাকার মনোবৃত্তিসম্পন্ন;—সুতরাং শোকাদি দুর্দ্দশা হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়া জীবন্মুক্তিপদে বিশ্রান্তি লাভ কর। হে রঘুনন্দন! তুমি সম হও, স্বস্থ হও, তোমার মতি স্থির হউক; মন হইতে সমস্ত শোক শান্ত হইয়া যাউক। তুমি মুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া মৌনী হও; উত্তম উজ্জ্বল মণির ন্যায় তোমার স্বচ্ছতা হউক। তুমি বিজ্বর হইয়া অবস্থান কর। হে রাঘব! তুমি বিবিক্ত হও, তোমার সর্ব্বসঙ্কল্প শান্ত হউক। তুমি ধীরধী ও স্বাধীনচিত্ত হইয়া যথাপ্রাপ্তের অনুবর্ত্তনপূর্ব্বক বিজ্বর হইয়া থাক। হে রঘুবংশসম্ভব!

তুমি বীতরাগ, নিরায়াস, বিমল ও বীতপাপ হইয়া দান, আদান বা গ্রহণ-বর্জ্জন-বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক বিজ্বর হইয়া বিরাজ কর। হে রাঘব! তুমি বিশ্বাতীত পরমপদ প্রাপ্ত হও। নিখিল প্রাপ্তব্যের প্রাপ্তিতে তোমার পূর্ণতা হউক। তুমি পরিপূর্ণ অর্ণবের ন্যায় অক্ষুব্ধ হইয়া বিজ্বর হও। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তুমি নিখিল বিকল্পজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হও। মায়াঞ্জনের মালিন্য যেন তোমায় স্পর্শও করে না। তুমি আত্মা দ্বারা আত্মাতে পরিতৃপ্ত হইয়া বিজ্বর হও।

হে আত্মবিদ্‌গণের অগ্রণী! তুমি অপার অনন্ত পরমাত্মার প্রকৃতস্বরূপে পর্য্যবসিত হও। ধরাধরের শিখরের ন্যায় তোমার অটল ধৈর্য্য প্রতিষ্ঠিত হউক। তুমি সংসারের সর্ব্ব সন্তাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অবস্থান কর। হে রাঘব! যথাপ্রাপ্তের অনুবর্ত্তন, সর্ব্ববস্তুতে অস্পৃহা ও দানাদি পরিহার, এই সকল কারণে তুমি বিজ্বর হইয়া বিরাজ কর। হে রাম! জলধি যেমন আপন জলেই আপনাকে পূর্ণ করিয়া থাকে, তুমিও তেমনি আত্মা দ্বারাই আত্মাতে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ ইন্দুবিম্বের ন্যায় বিমলভাবে নিরন্তর নিতান্ত আহ্লাদময় হইয়া অবস্থান কর।

হে রঘুবংশধুরন্ধর! এই যে কিছু বিশ্বপ্রপঞ্চ-রচনা, সকলই মিথ্যা। হে রাম! যিনি প্রকৃত আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তিনি কদাচ এই মিথ্যা বিশ্বপ্রপঞ্চের অনুধাবন করেন না। তুমি আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াছ। তোমার সকল কলনা তিরোহিত হইয়াছে। তুমি নিরাময় ও নিত্যোদিত হইয়াছ। হে সুন্দর! তুমি এক্ষণে শোকশূন্য হইয়া অবস্থান কর।

রামচন্দ্র! তুমি পিতার আদিষ্ট এই একচ্ছত্র রাজ্যের অধিপতি হইয়া স্বীয় গুণগণ দ্বারা সমদর্শিতার সহিত অধীনস্থ সমস্ত রাজা ও প্রজাবর্গকে রঞ্জিত করত চিরকাল প্রতিপালন কর। তোমার পক্ষে রাজ্যপরিত্যাগ বিধেয় নহে এবং রাজকার্য্যে একান্ত আসক্তিও সমুচিত নহে। ফলে অনাসক্ত হইয়া, মাত্র লোকহিতৈষণার জন্যই এই রাজ্য তুমি পালন করিতে থাক।

পঞ্চম সর্গ সমাপ্ত॥ ৫ ॥

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনন্দন! শ্রুতি, স্মৃতি ও সদাচার-সঙ্গত এই নিখিল সংসার-ব্যবহার আমি অয়স্কান্তবৎ সান্নিধ্যমাত্রেই করিতেছি, এই রূপে বাসনা-বিরহিতভাবে যিনি সমস্ত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, অর্থাৎ যিনি অজ্ঞ-জনোচিত কর্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে থাকেন, আমার ধারণা—তিনি মুক্ত পুরুষ। এ সংসারে কেহ কেহ মানুষী তনু আশ্রয় করিয়াও মোহ বশতঃ নিরাসঙ্গ বা নিষ্কাম কর্ম্মে নিরত হয় না; তাহারা কামাসক্ত হইয়া কাম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। তাহার ফলে এক একবার স্বর্গ গমন এবং তথা হইতে পুনরায় নরকে নিপতন, এইরূপই বারম্বার ঘটিয়া থাকে; কেহ কেহ বা বৈধ কর্ম্ম পরিহার-পূর্ব্বক রাগভরে অবৈধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া বারম্বার নরক হইতে নরকান্তরে নিপতিত হইয়া থাকে। কোন কোন ব্যক্তি বা স্ব স্ব বাসনাসূত্রে বদ্ধ হইয়া মোহজনক কর্ম্মানুষ্ঠান করে; পরে সেই অনুষ্ঠিত কর্ম্মের পরিপাক-দশায় কখন তির্য্যক্‌জাতি হইতে বৃক্ষাদি স্থাবর-তনু এবং কখন বা স্থাবর-তনু হইতে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কোন কোন ধন্য পুরুষ আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া দিব্যদৃষ্টি লাভ করেন। তাঁহাদের তৃষ্ণা-শৃঙ্খল বিচ্ছিন্ন হয়; তাঁহারা নিষ্ফল ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে রঘুবর! যিনি প্রথমতঃ কতিপয় জন্ম ভোগ করিয়া এই মনুষ্য-জন্মেই মুক্তিপদ লাভ করেন, জানিতে হইবে,—তিনিই প্রকৃত রাজস ও সাত্ত্বিকপ্রকৃতির পুরুষ। রাজস ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির পুরুষ জন্মলাভ করিবার পর হইতেই পরিপূর্ণ সুধাকরের ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকেন এবং বর্ষাকালীন কুটজকুসুমের ন্যায় সম্পুষ্ট সৌভাগ্য-সম্পদ্ সদাই তাঁহার অনুগামিনী হয়। হে মহামতে! সাত্ত্বিক ও রাজস প্রকৃতির পুরুষ এবম্বিধ মোক্ষোপযোগ্য জন্মগ্রহণের পর উত্তম বেণু মধ্যে যেমন বিশুদ্ধ মুক্তা প্রবেশ করে, তদীয় অন্তঃকরণেও তেমনি জন্মান্তরীয় বিমল বিদ্যা সকল অতর্কিতভাবে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে। যেমন কুলাঙ্গনাগণ অন্তঃপুরকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, তেমনি তখন আর্য্যতা, হৃদ্যতা, মৈত্রী, সৌম্যতা,

করুণা ও বিদ্যাবত্তা প্রভৃতি সদ্‌গুণরাজি আসিয়া তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া রহে। এতাদৃশ পুরুষ যে কিছু কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করুন, সেই সেই কার্য্যের ফল নষ্টই হউক, আর পুষ্টই হউক, তাহাতে তাঁহার কোনই হর্ষ বা বিষাদ-লেশ নাই ; তিনি সমস্ত কার্য্যেই সমভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। যেমন দিবালোকে অন্ধকারপুঞ্জ বিনষ্ট হইয়া যায়, তেমনি সেই পুরুষের নিকট শীতোষ্ণাদি সর্ব্ব দ্বন্দ্ব বিলয় পাইয়া থাকে। শরদাগমে মেঘবৃন্দ যেমন শুভ্রতা সমুপাগত হয়, তেমনি নিখিল গুণরাশিই সেই রাজস-সাত্ত্বিক পুরুষের আশ্রয়ে বিশুদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বনে বনমৃগগণ যেমন মধুরধ্বনি বেণুকে প্রিয় মনে করে, তেমনি সমস্ত জনই সেই সদাচার-সম্পন্ন মধুরপ্রকৃতি পুরুষকে ভালবাসিয়া থাকে। যেমন বলাকা সকল বারিধরের অনুধাবন করে, তেমনি তথাবিধ মোক্ষোপযোগী জন্ম-ভাগী পুরুষকে আসিয়া এইরূপে নানাগুণশ্রেণী আশ্রয় করিয়া থাকে।

অনন্তর এইরূপে সেই পুরুষে সমস্ত গুণ উপস্থিত হইলে তিনি যথাকালে অনেক সদ্‌গুণ-সম্পন্ন গুরুর অনুসরণ করেন এবং সেই গুরুই তাঁহাকে উপদেশ দ্বারা পবিত্র বিবেকপথে প্রেরণ করিয়া থাকেন। তৎপরে ঐ পুরুষ বিচার ও বৈরাগ্যযুক্ত চিত্তের সহায়তায় ক্রমশঃ সেই অনাময় একরূপ আত্মদেবের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া থাকেন। মোক্ষোপযোগ্য গুণসম্পন্ন জীব আত্মবোধ প্রাপ্ত হইবার নিমিত্ত প্রথমেই পবিত্র মনে তদীয় গুরূপদিষ্ট বস্তুসমূহের সম্যক্ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা মোক্ষোপযোগী জন্ম গ্রহণ করিয়া এইরূপে মহাগুণরাশির আশ্রয় হয়েন, সেই সকল মহাপুরুষেরাই তাঁহাদের অজ্ঞাননিদ্রায় নিমগ্ন মনো-মৃগকে বিচার দ্বারা সর্ব্বাগ্রে ব্রহ্মাকারে প্রবোধিত করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! বিশিষ্টজন্মা গুণী ব্যক্তিগণ প্রখ্যাত-গুণ গুরুসম্প্রদায়ের সেবায় তৎপর হইয়া আপনার বিমল বুদ্ধি-বলে অতি যত্নে চিত্তান্তর্গত রত্ন-স্থানীয় প্রত্যাগাত্মাদির বিষয় বিচার করত অন্তরে চিরপ্রকাশমান সেই পর-ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া পরমা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

ষষ্ঠ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৬ ॥

সপ্তম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে নলিন-নয়ন রাম! সমস্ত জীবের মোক্ষ-লাভের পক্ষে তোমার নিকট একটা সাধারণ ক্রম-মাত্র কীর্ত্তিত হইল। অধুনা এই বিষয়ে অন্য যে বিশেষ বক্তব্য আছে, তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর।

রামচন্দ্র! এই সংসারপ্রপঞ্চে যে সকল দেহী জন্মিয়াছে, তাহাদের মোক্ষফল উৎপাদক দুইটী মাত্র উত্তম ক্রম নির্দ্দিষ্ট আছে। তন্মধ্যে প্রথম ক্রম এই যে, গুরুসন্নিধানে সদুপদেশ লাভ করিয়া তদনুসারে শনৈঃ শনৈঃ সাধনার পথে অগ্রসর হইতে হইতে ইহ জন্মে কিম্বা জন্ম-জন্মান্তরে মোক্ষ-পদ লাভ। এতদ্ভিন্ন দ্বিতীয় ক্রম এই যে, যেমন দৈবাৎ কাহারও ভাগ্যে আকাশ হইতে ইষ্ট ফল-পাত ঘটিয়া থাকে, তেমনি কোন গুরুজনের সহায়তা না লইয়াই নিজেই নিজের কিঞ্চিৎব্যুৎপন্ন চিত্তের সহায়তায় সত্বর আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি ও তৎপরে মুক্তি। আকাশ হইতে অকস্মাৎ ফলপতনবৎ সহসা আত্মজ্ঞান-প্রাপ্তি বিষয়ে একটী পূর্ব্ববৃত্ত বিবরণ আছে, তোমায় তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর।

হে সুন্দর! আবার বলি, তুমি সে কথা শ্রবণ কর! পূর্ব্বতন মহাত্ম-গণ আকাশপতিত ফল-লাভের ন্যায় দৈবাৎ প্রাপ্ত বিবেক-ফল অধিগত হইবার পর জন্ম জন্মান্তরের শুভাশুভ কর্ম্মরূপ অর্গল সকল অপগত হইয়া গেলে অবশেষে বিমল ব্রহ্মপদ পাইয়া থাকেন।

সপ্তম সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৭ ॥

অষ্টম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জনক নামে জনৈক মহীপাল, বিদেহ-জনপদের অধিপতি আছেন। তাঁহার সমস্ত আপদ অস্তমিত ও সমস্ত সম্পদ সমুদিত। তিনি উদার ধীশক্তিশালী পুরুষ। তাঁহার গুণরাশির ইয়ত্তা নাই। তিনি

প্রার্থিবর্গের কল্পতরু, সুহৃৎরূপ সরোজসমূহের দিবাকর, বন্ধুরূপ কুসুমরাশির বসন্ত, কামিনীবৃন্দের মীনকেতন, দ্বিজরূপ কুমুদকুলের শশধর, রিপুরূপ তিমিরস্তোমের বিভাকর এবং সৌজন্যরূপ রত্নরাজির পয়োধিস্বরূপে বিরাজমান। তাঁহার ক্ষমতা অসাধারণ। তিনি প্রজা-পালনার্থ ভগবান্ বিষ্ণুর ন্যায় পৃথিবী ব্যাপিয়া বিরাজিত।

একদা নব বসন্তের সমাগমে নবীনা লতিকা সকল প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। বিকসিত কুসুমসমূহের মঞ্জরীপুঞ্জে সর্ব্বত্র পিঞ্জরাভা বিচ্ছুরিত হইল, এবং কোকিলকুলের অনর্গল কলকলালাপে ঋতুরাজ মধু যেন মদমত্ত হইয়া উল্লাসভরে নৃত্য করিতে লাগিল। এই সময়ে এক দিবস রাজা জনক লীলা-বিলাস অনুভব করিবার জন্য স্বীয় কমনীয় উপবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সেই উপবন বিলাসবতী লতাবধূগণে সুশোভিত এবং প্রস্ফুটিত কুসুমসমূহে সদাই সমুদ্ভাসিত থাকিত। তিনি তথায় প্রবেশ করিলে মনে হইল, দেবেন্দ্র যেন নন্দনবনে প্রবেশ করিলেন। তখন সেই মনোহর সুন্দর বনের মধ্য দিয়া—কুসুমরাজির কেশরসকল আমোদিত করিয়া আমোদময় মধুরানিল প্রবাহিত হইতে লাগিল। জনকরাজের অনুচরবর্গ উপবনের কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত রহিল। তিনি একাকী তাহার মধ্যস্থ কল্পিত শৈল-সানুর কুঞ্জপুঞ্জের মধ্যে মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

রাজা জনক এইরূপে সেই বনবিহার-সুখ অনুভব করিতে করিতে এক তমালবন-কুঞ্জের সন্নিকটে গিয়া সহসা শৈলকন্দরচারী সিদ্ধসম্প্রদায়ের কণ্ঠোচ্চারিত কতিপয় গীতিগাথা শুনিতে পাইলেন। হে কমলদলাক্ষ! ঐ গানগুলি আত্ম-প্রসঙ্গে গীত হইতেছিল। বিবিক্তবাসী সিদ্ধগণ অদৃশ্যভাবে থাকিয়া নিত্যই ঐ আত্মভাবনাময়ী গীতিগুলি একাগ্রমনে গান করিতেন। তাঁহাদের এই সেই গীতিগুলি শ্রবণ কর;

তৎকালে কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—যখন দ্রষ্টার সহিত দৃশ্য-সংযোগ ঘটে, বুদ্ধি তখন দৃশ্যাকারে পরিণত হইয়া থাকে। তখনকার সেই বুদ্ধিবৃত্তিতে যে আনন্দস্বরূপ আত্মতত্ত্ব প্রতিফলিত বা প্রতিবিম্বিত হয়, আমরা সমাহিতভাবে অন্তঃকরণের সর্ব্ববিধ চাঞ্চল্য পরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বদা সেই আত্মতত্ত্বের উপাসনা বা ভূমাত্মানন্দের অনুভব করি; অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের

সহিত বিষয়ের সম্মিলনে যিনি আনন্দস্বরূপে ভাসমান হয়েন, যাঁহার কখন স্পন্দ নাই বা রূপ নাই, সেই আত্মতত্ত্বরূপকে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণিপাত করি।

তখন অন্যান্য সিদ্ধগণ গাইতে লাগিলেন,—দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন এই ত্রিপুটীকে বাসনার সহিত সম্পূর্ণরূপে পরিহারপূর্ব্বক উল্লিখিত সমুদায়ের সাক্ষীভূত যে আত্মা, তাঁহাকেই আমরা উপাসনা করি অর্থাৎ সমাধিযোগে সতত তাঁহাকে অনুভব করি, অথবা অনাদি বাসনাবশে কল্পিত যে দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া—যিনি সর্ব্বদা সকল দর্শনের মূলে বিরাজমান, আমরা নিয়ত সেই পরমোত্তম পরমাত্ম দেবকে প্রণিপাত করি।

অপর কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—অস্তি ও নাস্তি এই দুই পক্ষ মধ্যে যাহা বর্ত্তমান, বা ঐ উভয় পক্ষের সাক্ষিস্বরূপ, যাহা নিখিল প্রকাশ্য পদার্থেরই প্রকাশকর্ত্তা, আমরা সেই আত্মবস্তুর উপাসনা করি। অর্থাৎ আছে কিম্বা নাই, এই সংশয়ের মধ্যে সতত যিনি বিশিষ্টরূপে বিরাজ করেন এবং যাঁহাতে সমগ্র প্রকাশ্যবস্তু প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেই অপক্ষয়-হীন আত্মাই আমাদের উপাস্য।

অন্যান্য কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—যাঁহাতে সকল, যাঁহার সকল, যিনি সকলের অপাদান, সম্প্রদান ও করণ এবং যিনিই এই সর্ব্বস্বরূপ, সেই সত্য বস্তুকে আমরা উপাসনা করি।

অপরাপর কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—যিনি 'অহং' শব্দের লক্ষ্য স্থান, ও অনন্ত আকারে বিরাজমান এবং অজস্র ক্রিয়মাণ প্রত্যেক ব্যবহারেই যিনি উচ্চারিত বা প্রকটিত হইয়া থাকেন, সেই 'অ'কারাদি 'হ'কারান্ত অর্থাৎ 'অহং' যাঁহার উপাধি, আমরা সেই নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মকে নিরুপাধিরূপে উপাসনা করি।

অন্যান্য সিদ্ধগণ গাইতে লাগিলেন,—যাহারা হৃদয়াধিদেবকে পরিত্যাগ করিয়া দেবতান্তরের শরণ গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই তাহারা হস্তস্থ কৌস্তুভ ফেলিয়া দিয়া রত্নান্তরের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

অপর কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,—সমস্ত আশা পরিত্যাগ করিয়া হৃদয়স্থ জ্ঞানফল ব্রহ্মকে লাভ করা যায় এবং ব্রহ্মবস্তু লব্ধ হইলে

আশারূপিণী বিষবল্লীর মূলমালাও বিলূন হয়, অর্থাৎ বাসনাজাল-জটিল হৃদয়গ্রন্থিও ছিন্ন হইয়া থাকে।

অন্যান্য কতিপয় সিদ্ধ গাইতে লাগিলেন,— যে দুর্ম্মতি ব্যক্তি বিষয়ের একান্ত বৈরস্য বুঝিতে পারিয়াও পুনরপি তাহা লাভ করিবার জন্য ভাবনা বন্ধন করে, সে জন নরনামের যোগ্য নয়; তাহাকে একরূপ গর্দ্দভ বলিয়াই অভিহিত করা যায়।

অপর সিদ্ধবৃন্দ গাইতে লাগিলেন,—এই ইন্দ্রিয়রূপ ভুজঙ্গদল বারম্বার উত্থিত হইতেছে। ইন্দ্র যেমন বজ্রদ্বারা গিরি বিদারণ করেন, তেমনি বিবেকরূপ দণ্ডদ্বারা উহাদিগকে নিগৃহীত করা কর্ত্তব্য। ফল কথা, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহই প্রধান সাধন বলিয়া নিরূপিত।

তখন অন্যান্য সিদ্ধগণ গাইতে লাগিলেন,—বাহ্য ও আভ্যন্তর ইন্দ্রিয়-ব্যাপারের উপরতি দ্বারা বিক্ষেপ দুঃখের উপশম বশতঃ আবির্ভূত পরম পবিত্র আত্মসুখ আহরণ করাই একান্ত কর্ত্তব্য। কেন না, তথাবিধ উপশম-সুখ প্রাপ্ত হইতে পারিলে মন প্রশান্ত হইয়া যায়। মন প্রশান্ত হইয়া গেলে জীব অচিরকাল মধ্যেই আপনার পারমার্থিক পরমোত্তম স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

অষ্টম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮ ॥

নবম সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যেমন রণ-রব শ্রবণে ভীরু জন বিষাদ-ময় হইয়া উঠে, তেমনি তখন সিদ্ধগণের কণ্ঠোত্থিত ঐ সকল গান শ্রবণে মহীপতি জনক সহসা বিষাদরসে আপ্লুত হইয়া গেলেন। নদীর প্রবাহ যেমন জল-পতিত তীরতরুর সহিত অর্ণবাভিমুখে ধাবিত হয়, তখন তিনিও তেমনি স্বীয় পরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া আপন ভবনে গমন করিলেন।

অনন্তর জনক-রাজ স্বীয় পরিবারবর্গকে তাহাদের স্ব স্ব গৃহে স্থাপন-পূর্ব্বক একাকী এক অত্যুচ্চ প্রাসাদমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তদ্দর্শনে মনে হইল, দিনমণি যেন গিরিশিখরে আরোহণ করিলেন।

রাজা জনক সেই জনশূন্য বিপুল প্রাসাদ মধ্যে একাকী বসিয়া—গগনোড্ডীন বিলোল বিহগাবলীর পঙ্ক্তির ন্যায় চঞ্চল সংসারগতি অবলোকনপূর্ব্বক আকুলভাবে এইরূপে বিলাপ করিতে লাগিলেন,—হায় কি কষ্ট! কঠোর পাষাণে যেমন পাষাণ লুঠিত হয়, আমিও তেমনি এই অতি কষ্টজনক চঞ্চল সংসারদশায় পতিত হইয়া লুণ্ঠিত হইতেছি! অপার অনন্ত কাল; সে কালের অতি ক্ষুদ্রতম অংশ আমার জীবন; আমি এই এতটুকু কাল বাঁচিবার জন্য আশাপাশে জড়িত হইতেছি—সংসারে এত আসক্ত হইয়া পড়িতেছি! ধিক্ আমায়!—ধিক্ আমার অধম-চিত্ততায়! এই আমার রাজ্য—এ রাজ্য কতটুকু বা কয় দিনের জন্য? কয় দিন বা বাঁচিয়া থাকিয়া আমি এ রাজ্য ভোগ করিব? আমি কি এই রাজ্যটুকু লইয়াই সন্তুষ্ট রহিব—মূর্খের ন্যায় ভাবী দুঃখের প্রতীকার-চিন্তায় পরাঙ্মুখ হইয়া কাল কাটাইব? ভাবিব কি, এই দেহই আত্মা; দেহের নাশে তৎসঙ্গে সর্ব্বদুঃখ বিদূরিত হইবে? না,—তাহাও নহে! কেন না, আমি ত দেহমাত্র নহি। আমি অনাদি এবং অনন্ত; মধ্যে মাত্র কিছু দিনের জন্য এই ভঙ্গুর দেহকে আমিত্বে বরিয়া লইয়া, হায়—বালক যেমন চিত্রিত চন্দ্রমায় আস্থা স্থাপন করে, তেমনি বৃথাই আমি ইহাতে আস্থাবান্ হইতেছি কেন? হা কষ্ট! আমি নিশ্চয়ই কোন নিষ্প্রপঞ্চ ঐন্দ্রজালিকের ইন্দ্রজালরচনায় পরিমোহিত হইয়াছি; তাই এ সংসারে আমার এত অধিক মুগ্ধতা হইয়াছে! কিন্তু বলিতে কি, কৈ, এ সংসারে এমন তো কিছুই নাই—যাহা সত্য, যাহা রম্য, যাহা উদার বা যাহা অকৃত্রিম; ফলে দেখিতেছি; এ সংসারের সমস্ত বস্তুই অসত্য, অরম্য, অনুদার ও কৃত্রিম। কাজেই কেমনে বলিব, কোথায় গিয়া কিসে আমার মতি বিশ্রান্তি লাভ করিবে কিম্বা কোন্ সারবস্তু প্রাপ্ত হইয়া উপশান্ত হইবে? তবে কি তেমন বস্তু দূর দেশে আছে? না—তাহাও সম্ভব নহে! কেন না, যে কোন বস্তু দূরস্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও তাহা তো অদূরস্থরূপেই প্রতিভাত;

যেহেতু সমস্ত বাহ্য বস্তু-বোধই আমার মনোমধ্যে অনুভূত। সুতরাং দূর বা অদূরাদি কল্পনাজালও অন্তঃস্থিত এবং তৎসমস্তই অসত্য। আমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সমস্ত বাহ্যবিষয়ক ভাবনাই পরিত্যাগ করি। সংসারের জীবগণ জলাবর্ত্তের ন্যায় ক্ষণভঙ্গুর ; ভোগ সুখের জন্য তাহাদের যে অর্থা-র্জ্জনের প্রবৃত্তি, তাহাও তো অকিঞ্চিৎকর ; পরন্তু দুঃখেরই কারণ। ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াও সংসারে আবার সুখের প্রত্যাশা কেন? প্রতিবর্ষ, প্রতিমাস, প্রতিদিবস ও প্রতিক্ষণ যে সুখ অনুভূত হয়, ভাবিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, তাহা তো প্রকৃত সুখ নয় ; সে সুখ নিবিড় দুঃখময় ; ফলতঃ বারম্বার ঘুরিয়া ফিরিয়া অজস্র দুঃখই কেবল অনুভূত হয়। সুতরাং বুঝা গেল, জগতের সুখ ক্ষণস্থায়ী। তবে কি ভাবিব, স্বর্গীয় সুখ চিরস্থির? না—তাহাও হইতে পারে না ; স্বর্গসুখেরও স্থিরত্ব কিছুই নাই। কেন না, শাস্ত্রবাক্যে বুঝিয়াছি—প্রসিদ্ধ ঐন্দ্র, এমন কি প্রাজাপত্য প্রভৃতি পদও স্থায়ী নহে ; তাহাদেরও বিনাশ আছে। অতএব যথায় বিবেকী জনের ঐকান্তিক বিশ্রান্তি হইতে পারে, সেরূপ স্থান এখনে কোথাও নাই। অদ্য যাহারা পুণ্যপ্রভাবে অতি বড় মহান্ ব্যক্তিদিগেরও উপরি বিরাজিত, কতিপয় দিবসের পরে দেখা যাইবে, তাঁহারাই আবার অধঃপতিত। রে মোহহত মদীয় মন! এ হেন মহত্ত্বের উপর তোর বিশ্বস্ততা কি? রজ্জু নাই, অথচ আমি বদ্ধ হইয়া রহিয়াছি ; কোন পাপ করি নাই, অথচ সংসারে আমি কলঙ্কিত হইয়াছি। সকলের উপরিস্থ হইয়াও আমি অধুনা পতিত। হায় আমার আত্মা! আমি এমন কলঙ্কিত যে, সৎস্বভাব হইতেও পরিচ্যুত হইয়াছি। হায়! আমি মনে করি, আমার বুদ্ধি আছে, অথচ সহসা আমার এই মহামোহ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে? কৈ আমি তো মোহের তত্ত্ব কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। যেমন কৃষ্ণবর্ণ বারিদ-খণ্ড কখন কখন দিবাকরের সম্মুখভাগ ঢাকিয়া রাখে, তেমনি এই বিষম মোহ আমার বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করিয়াছে। কে আমার এ সকল বন্ধুবান্ধব এবং কেই বা এ সকল মহাভোগ? হায়! বালক যেমন ভূতময় সংস্কার কল্পনা করিয়া অকুল হইয়া থাকে, আমিও তেমনি এই সকল কল্পিত বিষয় লইয়া ব্যাকুল হইয়াছি। নিজেই আমি এই সকলের উপর জরা-

মরণের সহচরী উদ্বেগকরী মদীয় উল্লিখিত দৃঢ় প্রতীতি বাঁধিয়া রাখিয়াছি। কেন রাখিয়াছি, কিছুই বুঝি না। এ সংসারে ভোগসুখ বা বন্ধুবান্ধবাদি সম্পৎসমৃদ্ধি যায়—যাউক, থাকে—থাকুক, আমার ইহার প্রতি আগ্রহ কি? আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিতেছি, এ সকল কেবল জলবুদ্বুদের শোভার ন্যায় মিথ্যাই বটে সমুত্থিত। এ সংসারে পৃথু, মরুত্ত প্রভৃতি কত শত মহামহিমান্বিত মহীপতি রাজত্ব করিয়াছেন। সেই সকল সার্ব্বভৌম ভূপতিবৃন্দের সেই সেই মহৈশ্বর্য্য, সেই সেই মহাভোগ অথবা সেই সেই স্নিগ্ধস্বভাব বন্ধুবর্গ আজ কোথায়? হায়! সে সকলই এখন স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত; সুতরাং এই যে বর্ত্তমান ভোগসুখ বা বন্ধুবান্ধব, এ সকলেরও ত পরিণাম ঐরূপই হইবে? অতএব এ সকলের স্থিরত্বের প্রতিই বা আস্থা কি? এ মহীমণ্ডলে কত অসংখ্য মহীপতি ছিলেন; তাঁহাদের ধন জন এখন কোথায় আর ব্রহ্মা যে কত অতীত কাল হইতে কত অনন্ত জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার সেই জগদ্বৃন্দই বা কৈ? যাহারা পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান ছিল, তাহাদের এখন কেহই নাই। এইরূপ এখন যাহারা বর্ত্তমান, তাহারাও পরে থাকিবার নয়; সুতরাং আমার এই ধন-জনের স্থায়িত্ব-সম্বন্ধেই বা কিরূপে আমি বিশ্বাস করিতে পারি? জলে যেমন অনন্ত বুদ্বুদ সমুদ্গত হয়, আবার তাহারা বিলয় পাইয়া যায়, তেমনি কত লক্ষ লক্ষ ইন্দ্র আবির্ভূত হইয়া কালের কবলে বিলীন হইয়াছে! অহো! আমি কি না আমার জীবনের স্থায়িত্বে আস্থাবান্ হইয়া রহিব? আমার এরূপ অনুচিত আস্থা অবলোকন করিয়া সাধুগণ আমায় উপহাস করিবেন।

হায়! কি আর বলিব? কত কোটি কোটি ব্রহ্মা কালসাগরের প্রবাহে পড়িয়া ভাসিয়া গিয়াছেন; কত অনন্ত অসংখ্য স্বর্গ ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছে এবং ধূলিপটলের ন্যায় কত সহস্র সহস্র প্রভাব ও প্রতি-পত্তিযুক্ত ভূপতিবৃন্দ শূন্যগর্ভে মিশিয়া গিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? অহো! এত জানিয়া শুনিয়াও আমার জীবনে আমি এত প্রীতিমান্ কেন? এই সংসাররূপ নিশাযোগে এই দুঃস্বপ্নস্বরূপ দেহময় 'অহং' 'মম' ইত্যাকার ভ্রমের প্রতি আমাকে যদি আস্থা স্থাপন করিতে হয়, তবে আমার এই

অবিবেকিতা সর্ব্বথা ধিক্কারেরই যোগ্য; সন্দেহ কি? 'ইনি' 'তিনি' 'আমি' ইত্যাদি কল্পনাজাল ব্যর্থ; সুতরাং অসৎস্বরূপ। এহেন অহঙ্কার-রূপ পিশাচ কর্ত্তৃক কবলিত হইয়া কেন আমি অজ্ঞজনবৎ বিচার না করিয়া বৃথা মুগ্ধভাবে কাল কাটাইতেছি! ক্ষণ-লবাদিরূপে কালের বশে ক্রমশই আয়ুঃক্ষয় সঙ্ঘটিত হইতেছে; অহো! আমি ইহা দেখিয়াও কেন দেখিতেছি না। হায়! আমরা কালরূপ কাপালিকের করায়ত্ত হইয়া ঈশানমূর্ত্তিকে পাদতলে পাতিত করিয়াছি; শালগ্রাম শিলাসকল কন্দুক-বৎ ক্রীড়ার সামগ্রী করিয়া লইয়াছি। হে জীবনাশা! আমার উপর তোমার কেন এত নৃত্য? অজস্র অগণিত অনন্ত দিন চলিয়া গিয়াছে এবং এই বর্ত্তমান দিনগুলিও চলিয়া যাইতেছে; কিন্তু কৈ, এই এতদিনের মধ্যে এমন তো একটীও দিন দেখা দিল না, যে দিনে আমার এক আনন্দময় নিত্য বস্তু লব্ধ হইল? সরোবরে সারসসমূহের ন্যায় নিত্য নিত্য এ চিত্তে কেবল ভোগবিলাসই নৃত্য করিতেছে; কৈ এক দিনের জন্য একবারও ত পরম বস্তুর সহিত আমার সাক্ষাৎকার ঘটিল না। দেখিতেছি, ক্রমশই এ জগতে কষ্ট হইতে কষ্টতর এবং দুঃখ হইতে দুঃখতর দশাই উপস্থিত হইতেছে। হায়! এখনও আমি সংসারের প্রতি বিরক্ত হইতেছি না, প্রকৃতই আমি অধমচিত্ত; ধিক্ আমায়। ভব্য বা রম্য ভাবিয়া যে যে বস্তুর প্রতিই প্রবল অনুরাগ বন্ধন করিতেছি, দেখিতেছি, এক একটী করিয়া সে সকলই বিনষ্ট বা অদৃষ্ট হইয়া যাইতেছে; সুতরাং এ জগতে কাহাকে আমি উত্তম বলিয়া বুঝিব? যাহা আপাত-মনোরম, যাহা মধ্যে মনোরম এবং যাহা অন্তে মনোরম, অর্থাৎ বিষয়, বয়স ও ধর্ম্ম—এ সকলের একটীও উক্ত অবস্থাত্রয়ে একপ্রকার নহে; অথচ সকলেরই বিনাশ আছে; সুতরাং বলিব—সকল বস্তুই অমেধ্য এবং দূষিত। মানব যে যে বস্তুর প্রতিই প্রীতিবন্ধন করে, দেখিতেছি, সেই সেই বস্তুই ক্ষয়োদয়-দোষে দুষ্ট। তাহাদের একটীও অনুৎপন্ন বা অবিনশ্বর নহে। এ সংসারে মূঢ় নর লোভাদির আধিক্য-নিবন্ধন দিন দিন পাপীয়সী, হিংসাদি-প্রবৃত্তি নিমিত্ত ক্রূরতরা এবং তত্তৎফল-কালে খেদকরী দশাই প্রাপ্ত হইতেছে। ফল কথা, অজ্ঞতাপূর্ণ মানবের উত্তর-কালেও বিশ্রান্তি প্রত্যাশা নাই। সংসারের লোক বাল্যকালে অজ্ঞানে

উপহত, যৌবনাগমে মদনতাপে জর্জ্জরিত এবং বার্দ্ধক্যে কলত্র-পুত্রাদির চিন্তায় ব্যাকুলিত হইয়া থাকে; এই জন্য সে তাহার সারা জীবনে কখনও কোনও একটা একান্ত কুশলকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া উঠিতে পারে না। যে সংসারের আদি-অন্ত অসৎ,—যাহা ভোগ কালেও বিরস,—দারিদ্র, রোগ ও বার্দ্ধক্য প্রভৃতি দশা-বৈগুণ্যে যাহা দূষিত, এবং যাহা অসার হইলেও সার বলিয়া গৃহীত, দুর্ম্মতি মানব কেন তাহার প্রতি আসক্ত? সংসারের মানব রাজসূয় ও অশ্বমেধ প্রভৃতি শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া সুকৃত-সঞ্চয়ের ফলে মহাকল্পান্ত পর্য্যন্ত স্বর্গ ভোগ লাভ করিয়া থাকে; স্বর্গ আকল্প কাল ব্রহ্মাদির ভোগ্য হইলেও মহাকালের চক্ষে উহা ক্ষণভোগ্য-প্রায়; সুতরাং অল্পই বলা যায়। মানব যজ্ঞাদি করিয়া এই অল্প ভোগটুকু মাত্রই লাভ করে; পরন্তু ইহা অপেক্ষা অধিক কিছুই পাইতে পারে না। সুতরাং অসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে, শ্রুতি-প্রতিপাদিত অদুঃখ-সম্ভিন্ন স্বর্গও প্রকৃত সারভূত নহে। বিশেষতঃ স্বর্গবাসীদিগেরও যখন অসুরাদি-কৃত উপদ্রবের কথা শ্রুতি-প্রসিদ্ধ, তখন স্বর্গের অদুঃখসম্ভিন্নতাও তো অসম্ভাবিত। স্বর্গ কি? ভূতল, পাতাল বা নভোমণ্ডলের প্রদেশবিশেষই স্বর্গ; এই স্বর্গে গিয়াও কি দুষ্ট ভ্রমরীর ন্যায় আপদের হস্ত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়? ফলে তাহা কখনই সম্ভব নহে। যত কিছু মনোব্যথা, সে সকল নিজের চিত্তরূপ গর্ত্তমধ্যস্থ ক্রূর সর্প এবং ব্যাধি সকল নিজেরই দেহস্থলীর পল্লবরাজির ন্যায় প্রতিভাত; এ সকল নিবারিত হইতে পারে, এরূপ কোন উপায় আছে কি? যাহাকে আমরা সৎ বলিয়া অভিমান করি, দেখিতে পাই—তাহার মস্তকোপরি অসদ্ভাব চিরস্থিতর, যাহা রমণীয় বলিয়া মনে করি, তাহার উপর অরম্যতার অধিষ্ঠান এবং যাহা সুখ বলিয়া ধারণা করি, তাহারও মাথার উপর দুঃখ-রাশি বিরাজমান; সুতরাং এ ক্ষেত্রে আমি কোন্ একটী বস্তুকে মঙ্গলময় বলিয়া আশ্রয় করি? ফলতঃ আমার মতে সকলই ভঙ্গুর—সকলই দুঃখময়; সুতরাং অমঙ্গলেরই আলয়। অনবরত কত অগণিত প্রাকৃত ক্ষুদ্র জীব জন্মিতেছে, মরিতেছে, এই ভূতধাত্রী ধরিত্রী তাহাদেরই জনন-মরণে নীরন্ধ্র হইয়া উঠিয়াছে। ফলে এখানে প্রকৃত সাধুসজ্জন একান্তই দুর্লভ দেখিতেছি। এখানে আছে

বটে অনেক নীলোৎপল-নয়না পরমপ্রেমভূষণা বিলাসিনী ললনা; কিন্তু জগতে তাহারা কয় দিনের জন্য আসিয়াছে? তাহাদের বিলাসদর্শনে লোকে মোহমগ্ন হয় বটে; কিন্তু আমার ধারণায় তাহাতে মোহমগ্ন না হইয়া বরং উপেক্ষায় হাস্য করাই সমুচিত। এখানে রাজা আমি;— সুতরাং সর্ব্বনিয়ামক উত্তম পুরুষ; এরূপ মনে করিয়া সমাশ্বস্ত হওয়াও আমার পক্ষে বাতুলতা; কেন না, যাঁহাদের নিমেষোন্মেষে জগতের প্রলয় কিম্বা উদয় ঘটিতে পারে, তাদৃশ অনেক মহাপুরুষ জগতে বিরাজ করিতেছেন; সুতরাং আমাদের তো গণনাই হইতে পারে না। সত্য বটে লোকে বলিয়া থাকে যে, এ জগতে রম্য হইতেও রম্যতর এবং সুস্থির হইতেও সুস্থিরতর বস্তু বিদ্যমান; কিন্তু আমি ভাবিয়া দেখিয়াছি, চিন্তামাত্রেই ঐ রম্যতা বা সুস্থিরতার পর্য্যবসান। অতএব এবম্বিধ পদার্থ-শ্রীর প্রতি বাসনা করিবার প্রয়োজন কি? এ সংসারে গজ, বাজী, ধন ও দারাদি বিচিত্র সম্পদ্গুলি যদি মনের মত হয়, তাহা হইলে ঐ সকল বহু প্রযত্নে লভ্য, বহু দুঃখে সংরক্ষ্য এবং অবশ্যই বিনাশ্য হয় বলিয়া আমি উহাদিগকে মহতী আপদ বলিয়াই মনে করিতেছি। অপি চ দারিদ্র্য, বন্ধুবিয়োগ এবং রাজ্যাদি ধ্বংসরূপ বিবিধ বিপদগুলি যদি সাধুসঙ্গ, তীর্থ-পর্য্যটন, তপশ্চরণ ও প্রবোধ প্রভৃতির প্রাপক হইয়া শ্রেয়স্কররূপে মনের অভিমত হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে আমি বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতি মহারম্ভশালী সম্পদ বলিয়াই বা মনে করিতেছি না কেন? এই তুচ্ছ জগৎ সাগরতরঙ্গে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রবিম্ববৎ ক্ষণভঙ্গুর ও মনোমাত্রেরই বিবর্ত্ত; ইহাতে 'ইদং মম' এই অভিমানব্যঞ্জক অক্ষর কয়েকটী কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হইল? বস্তুতঃ ইহা অপূর্ব্বই বটে। ফল কথা, অসত্য জগতে মমতার অভিবৃদ্ধিই বিপদ এবং বিবেকবশে উহার যে পরি-ক্ষয়, তাহাই বটে সম্পদ। এই জগৎস্থিতি কাকতালীয়বৎ অকস্মাৎ সম্পন্ন হইয়াছে। ইহাতে 'ইহা হেয় বা ইহা উপাদেয়' এইরূপ ভাবনা নিশ্চয়ই কোন ভোগলম্পট ধূর্ত্ত কর্ত্তৃক বৃথাই কল্পিত হইয়াছে। পতঙ্গ যেমন অগ্নিশিখার ভাবনায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তেমনি ত্রিতাপ-তপ্ত সুপরি-চ্ছিন্ন সুখরূপ মিথ্যা বস্তুর ভাবনায় আমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছি। আমি

মনে করি, জীব যদি অতিতীব্র রৌরব-নরকানলে নিপতিত হইয়া ভস্মীভূত হইতে থাকে, তাহাও তাহার পক্ষে বরং মঙ্গলকর, তথাপি পরিবর্ত্তনশীল সুখ-দুঃখময় ভীষণ সংসারবিবর্ত্তে পড়িয়া দগ্ধ হওয়া কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। বিবেকিগণ বলিয়া থাকেন, সংসারই দুঃখসমূহের সীমান্তস্বরূপ। হায়! লোক এই দুঃখপূর্ণ সংসারে পড়িয়া কিরূপে সুখাস্বাদন করে? এ সংসার স্বভাবতঃই মহাদুঃখময়; এখানে যাঁহারা অবস্থান করিতেছে, তাহারাই আবার অপরাপর দুঃখপরম্পরাকে একান্ত মধুর বলিয়া মনে করিয়া থাকে। অহো! যাহারা কাষ্ঠ লোষ্ট্রাদির ন্যায় জড় পদার্থ, তাহাদের ন্যায় আচরণ করিয়া আমাকেও দেখিতেছি নিতান্ত অধম হইয়া পড়িতে হইল।

এই সংসাররূপ মহামহীরুহ সহস্র সহস্র শাখা, অঙ্কুর ও ফল-পল্লব-সমূহে সুশোভিত; এই সংসার-মহীরুহের আদি অঙ্কুর, মনোরূপ মহামূল হইতেই আবির্ভূত। এই মনও আবার সঙ্কল্পময়; সুতরাং আমি সঙ্কল্প-সমূহের উচ্ছেদ সাধন করিয়া মনকে উন্মুলিত করিয়া ফেলিব। এইরূপ হইলেই এই যে সংসাররূপ মহামহীরুহ, ইহা নিশ্চয় বিনষ্ট হইয়া যাইবে। এই মনোরূপ মর্কটের বৃত্তিসকল আকারমাত্রেই রমণীয়; আমি ইহা-দিগকে বিলক্ষণ চিনিতে পারিয়াছি। অতএব অদ্য হইতে আমি এই আত্মনাশিনী মনোবৃত্তিগুলির প্রতি কিছুতেই আর আসক্তি স্থাপন করিব না। যাহা শত শত আশাপাশে নিবদ্ধ এবং পতন, উৎপতন ও উপতাপের মূলীভূত, আমি এই সেই সংসারবৃত্তি সকল সবিশেষ ভোগ করিয়া দেখি-য়াছি; আর না,—যথেষ্ট হইয়াছে; এখন আমি ইহা হইতে বিরত হইব। 'হা! হত হইলাম, নষ্ট হইলাম, মরিলাম!' ইত্যাদি বৃথা শোক আমি বহুবার করিয়াছি, যাহা করা হইয়াছে, তাহা চলিয়া গিয়াছে। অধুনা আমি আর বৃথা রোদন করিব না। আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি, প্রহৃষ্ট হইয়াছি; আমার আত্মচোরকে আমি দেখিয়াছি। এই আত্মচোর বা আত্মাপহর্ত্তার নাম—মন; ইহাকে আমি বিনষ্ট করিব। কেন না, এই মন চিরকাল হইতেই আমার সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে। এতকাল আমার মনোরূপ মুক্তাফল অবিদ্ধ অবস্থায় ছিল; অধুনা বিদ্ধ হইয়া গুণযুক্ত

হইল। মদীয় মনোরূপ তুষারকণিকা বিবেকরূপ বিভাকরের আতপতাপে তাপিত হইয়া অবশ্যই চিরদিনের তরে অচিরেই বিলয় পাইয়া যাইবে। বিবিধ সিদ্ধ সাধুগণ আমায় গীত-ব্যপদেশে বিশেষরূপ প্রবোধ প্রদান করিয়াছেন; সুতরাং আমি পরমানন্দ-সন্দোহ-জনক পরমাত্মারই এখন শরণাপন্ন হই। শরতের বারিদবৃন্দ যেমন বারি-বর্ষণাদি হইতে বিরত হইয়া শৈলগাত্রে লীন হইয়া থাকে, আমিও তেমনি সমস্ত চেষ্টা পরিহার-পূর্ব্বক আত্মরূপ মহামূল্য মণি লাভ করিয়া—বিজনে বসিয়া, তাঁহারই প্রতি দৃষ্টিপাত করত মহাসুখে অবস্থান করিতে থাকি। 'এই দেহ আমি, এই ধন-রাজ্যাদি আমার' ইত্যাদিরূপে বহু বিস্তৃত অসত্য জ্ঞানকে আমি সবলে নিরস্ত করিয়া সমাধি অভ্যাস দ্বারা মনোরূপ প্রবল শত্রুকে সমূলে উন্মূলিত করত পরম প্রশম প্রাপ্ত হইব। হে বিবেক! তোমার চরণে আমার নমস্কার।

নবম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

দশম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বিদেহরাজ জনক এই প্রকার চিন্তা করিতেছিলেন, ইতিমধ্যে জনৈক প্রধান প্রতিহারী আসিয়া তাঁহার সমীপে সমুপস্থিত হইল। তদ্দর্শনে মনে পড়িল, যেন রবির রথপ্রান্তে অরুণ আসিয়া দাঁড়াইল। প্রতীহারী নিবেদন করিল,—হে দেব! হে বাহু-স্তম্ভোপরি বিধৃত-বিপুল-বসুধাভর! আপনি গাত্রোত্থান করুন এবং নরপতি-জনোচিত সমস্ত দিবস-ব্যাপার সমাধা করুন। ঐ দেখুন, কামিনীগণ কুসুম, কর্পূর ও কুঙ্কুম-বাসিত জলকুম্ভ লইয়া মূর্ত্তিমতী নদীনিচয়ের ন্যায় ভবদীয় স্নানভূমিতে অবস্থান করিতেছে। ঐ স্নানভূমি কমলিনীদল-কৃত পটমণ্ডপে মণ্ডিত রহিয়াছে; তত্রত্য কমল ও কহ্লার কাননের মধ্যে মধ্যে মধুপনিকর ভ্রমণ করিতেছে। রাজগণ ভবদীয় স্নানাবসরের প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহাদের হস্তী, অশ্ব, রথ, ছত্র ও চামর দ্বারা ঐ

স্নানভূমির সমীপস্থ সরোবরের তীরদেশ পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। বিবিধ পুষ্প, অন্ন ও ওষধি-পরিপূর্ণ পাত্রসমূহ দ্বারা দেব, ব্রাহ্মণ ও অতিথি সেবার গৃহসকল সজ্জিকৃত হইয়াছে। হে দেব! দক্ষিণা-দানযোগ্য দ্বিজবর্গ স্নানান্তে পবিত্রহস্তে পবিত্র লইয়া অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করত আপনার প্রতীক্ষায় অবস্থান করিতেছেন। হে রাজরাজেশ্বর! আপনার প্রণয়িনী কামিনীগণ হস্তে চামর লইয়া সুসজ্জিত ভোজনভূমি শীতল করত ভবদাগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। রাজন্! আপনি সত্বর গাত্রোত্থান করুন; আপনার মঙ্গল হউক। আসুন, আসিয়া নিত্য কর্ম্ম সমাধা করুন। বলা বাহুল্য, মহৎ লোকেরা কদাচ স্ব স্ব কর্ত্তব্য কর্ম্মে কালাতিক্রম করেন না।

প্রধান প্রতীহারী রাজাকে এইরূপ নিবেদন করিল; কিন্তু রাজা পূর্ব্বের ন্যায় বিচিত্র সংসার-স্থিতির বিষয়ই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—এই ত আমার রাজ্য; এ রাজ্য কতটুকু, বা কয় দিনের জন্য? ইহাতে সুখই বা কি আছে? এই ক্ষণভঙ্গুর সংসারে এখন আমার আর কোনই প্রয়োজন নাই। দেখিতেছি, এ সমস্তই মিথ্যা মায়ার আড়ম্বর-মাত্র; আমি এ সকল পরিত্যাগ করি,—করিয়া প্রশান্ত বারিধির ন্যায় একান্তে অবস্থান করিতে থাকি। এই সকল ভোগবিলাস অসৎস্বরূপ; এ সকল দ্বারা আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখস্বরূপেই অবস্থান করি। হে চিত্ত! যদি জন্ম, জরা, বা জড়তা প্রভৃতি শৈবালদল অপসারিত করিবার আকাঙ্ক্ষা তোমার থাকে, তাহা হইলে এই ভোগাভ্যাসের কুপ্রবৃত্তি হইতে চাতুর্য্য পরিত্যাগ কর। ওরে চিত্ত! তুই তোর যে যে দশায় সুখলবাস্বাদের সম্ভ্রম অবলোকন করিবি, নিশ্চয়ই তোকে সেই সেই দশা হইতে পরম দুঃখ প্রাপ্ত হইতে হইবে। যত প্রকার ভোগসামগ্রী আছে, চিত্ত সে সমুদায়ে কখন প্রবৃত্তিশীল হয়, আবার কখন কখন তৎসমস্ত হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকে। চিরকাল বহুবার এই ভাবে অবস্থান করাই চিত্তের স্বভাব; কিন্তু এইরূপে একবার প্রবৃত্তি ও একবার নিবৃত্তি হইতে থাকিলে চিত্তের তাহাতে কদাচ তৃপ্তি প্রাপ্তি ঘটে না। তাই বলিতেছি,—রে পাপ চিত্ত! এই ত তুচ্ছ ভোগচিন্তা, ইহা দ্বারা আর কোনই প্রয়োজন দেখি না এখন তোর

এই একমাত্র কর্ত্তব্য যে, যাহার অনুবর্ত্তন করিলে অকৃত্রিম প্রীতি প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই লাভ করিয়া তুই কৃতার্থ হ'।

বিদেহরাজ জনক এইরূপ চিন্তা করিয়া তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন। তাঁহার চিত্তচাপল্য শান্ত হইয়া গেল। তিনি তখন চিত্র-লিখিতের ন্যায় নিষ্পান্দভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহীপতিগণের মনের ভাব কখন কিরূপ থাকে, প্রতীহারী সে সম্বন্ধে সুশিক্ষিত ছিল; সুতরাং গৌরব বশতই হউক; আর ভয় বশতই হউক, প্রতীহারী রাজার নিকট পুনর্ব্বার আর কিছুই বলিতে পারিল না।

অনন্তর জনকরাজ ক্ষণকাল মৌনভাবে রহিয়া জাগতিক জীবগণের জীব-নিদান কি, তৎসম্বন্ধে পুনরায় প্রশান্তমনে আলোচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, এ জগতে এমন কোন্ উপাদেয় বিষয় আছে, যাহা আমি যত্নের সহিত সুসম্পাদিত করিব? অথবা আছে কি এমন কোন অবিনশ্বর বস্তু, যাহাতে আমি অনুরক্ত হইয়া রহিব? আমি কর্ম্মনিষ্ঠ হইলেই বা কি হইবে, আর নিক্রিয় হইয়াই বা কি করিব? যাহা জন্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহার কিছুই ত বিনাশবিহীন নয়। অর্থাৎ কার্য্যমাত্রই বিনশ্বর; বিনশ্বর কার্য্য দিয়া' আমার প্রয়োজন কি আছে? এই ত আমার দেহ, ইহা অসৎস্বরূপেই সমুৎপন্ন; এই দেহ ক্রিয়াবান্ হয় হউক, আর অক্রিয় হয় হউক, আমি সমাধিনিষ্ঠ শুদ্ধ চিৎ; আমার ইহাতে ক্ষতি কি? যাহা অসম্প্রাপ্ত, তাহা পাইবার বাঞ্ছা আমি করি না; যাহা সম্প্রাপ্ত, তাহাও আমি ত্যাগ করিতে চাহি না। আমি স্বস্থ আত্মায় অবস্থিত হই, তাহাতে আমার প্রারব্ধোপনীত যাহা আছে, হউক। কর্ম্ম করিলেই আমার কোন ইষ্ট সিদ্ধি নাই, আর কর্ম্ম না করিলেও আমার কোন অনর্থ নাই। ক্রিয়া কিম্বা অক্রিয়া হইতে যাহা লব্ধ হয়, তাহা অসন্ময় বা মিথ্যা। আমি যোগ্য বা অযোগ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি কিম্বা নাই করি, তাহাতে লাভ কিছুই নাই। কেন না, জগতে এমন কোনও উপাদেয় বস্তু নাই, যাহা আমার বাঞ্ছিত হইতে পারে? অতএব বসিয়া থাকিয়া কি হইবে? আমি এখন গাত্রোত্থান করি; আমার এই দেহ ক্রমপ্রাপ্ত ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠান করিয়া যাউক। ক্রিয়াহীন হইয়া দেহ শুষ্ক হইয়া

গেলেই যে শুভ ফল ফলিবে, ইহা অবশ্য কখনই নহে। মন যদি নিষ্কাম ও বাসনাবিহীন হইয়া সমভাব অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থিত হয়, তাহা হইলে দেহাবয়ব-জাত স্পন্দ ও অস্পন্দকার্য্য, ফলের বেলায় সমান হইয়াই থাকে। কর্ম্ম জন্য ফল-সম্পদে কর্তৃত্ব এবং ভোক্তৃত্ব মনেরই হইয়া থাকে; পরন্তু মন যখন প্রশান্ত হইয়া যায়, মানবের কর্ম্মও তখন অকর্ম্ম মধ্যেই গণনীয় হইয়া থাকে। কর্ম্মের মূল, পুরুষের অন্তরেই দৃঢ়ভাবে নিবিষ্ট; এইজন্য পুরুষ কর্ম্মপরম্পরায় তন্ময় হইয়া থাকে। মদীয় বুদ্ধি কিন্তু অধুনা অনাময় পদে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছে। আমি এখন কৃতাকৃত কর্ম্মফলের মূলস্বরূপ অন্তরের অধীরতা দূরে পরিত্যাগ করি।

দশম সর্গ সমাপ্ত ॥ ১০ ॥

একাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! দিনপতি যেমন দিনকর্ম্ম সম্পাদন করিতে সমুদিত হয়েন, রাজা জনকও তেমনি ঐরূপ অনেক চিন্তা করিয়া অসক্তভাবে যথাপ্রাপ্ত ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার জন্য গাত্রোত্থান করিলেন। 'ইহা আমার ইষ্ট, আর ইহা আমার অনিষ্ট' ইত্যাদি কল্পনার নিমিত্তভূত বাসনা-সমষ্টিকে তিনি আপনা হইতেই পরিত্যাগ করিলেন এবং তিনি জাগ্রদবস্থাতেই সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় যথাপ্রাপ্ত কার্য্য সকল করিয়া যাইতে লাগিলেন। পূজনীয় দেব ও ব্রাহ্মণাদির পূজা-পরিচর্য্যাদি সমস্ত দৈনিক কার্য্য তখন তৎকর্ত্তৃক নির্ব্বাহিত হইল। পরে তিনি পূর্ব্ববৎ ধ্যানযোগে একাকী সমস্ত রাত্রি যাপন করিলেন। তদীয় মন তখন সমতায় উপনীত হইল এবং তাহা হইতে বিষয়-বিভ্রম চলিয়া গেল। ক্রমে রাত্রি অবসান হইয়া আসিলে তিনি আপনার মনকে তখন এইরূপ প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন যে, ওরে আমার মন! তুমি কি ভাবিয়াছ—এই সংসার তোমার সুখের জন্য? না—এ চঞ্চল সংসার তোমার সুখের নহে। তুমি সমভাব অবলম্বন কর; শম হইতেই তোমার সার শান্তিসুখ লব্ধ হইবে। তুমি

বিকল্পবশে হেলাক্রমে মনে মনে যতই সঙ্কল্প করিতেছ, তোমার সেই সতত চিন্তাবশতঃ এ সংসার তোমার পক্ষে ততই বিশালতা প্রাপ্ত হইতেছে। সলিল-সেকে বৃক্ষ বর্দ্ধিত হয়; বর্দ্ধিত হইয়া যেমন শত শত শাখা প্রশাখা ধারণ করে, রে শঠ! তেমনি ভোগাভিলাষ-বশে তুমিও অসীম অনন্ত বেদনা প্রাপ্ত হইতেছ। এই জন্ম ও সংসারসৃষ্টি কেবল চিন্তাজালেরই বিলাস হইতে সমুৎপন্ন; সুতরাং তোমায় বলি, তুমি বিচিত্র চিন্তাপরম্পরা পরিত্যাগ করিয়াই উপশম প্রাপ্ত হও। হে বিবেকিন্! এই সংসার-সৃষ্টি আর সেই সমসুখ, এ উভয়ের তুমি তুলনা করিয়া, কি সার, তাহা বুদ্ধিবলে পরীক্ষা করিয়া দেখ। যদি এই সংসারসৃষ্টিতে তুমি সার প্রাপ্ত হও, তবে ইহাকেই আশ্রয় করিয়া থাক। বস্তুতঃ এই সংসারসৃষ্টি অসার; সুতরাং ইহাতে তুমি কিছুমাত্র আস্থা রাখিও না। এই অসার দৃশ্যকে দর্শনযোগ্য ভাবিয়া দর্শনলালসায় ইহাকে তুমি প্রিয় বলিয়া গ্রহণ করিও না এবং ইহা অপ্রিয়,—সুতরাং ইহা দর্শনযোগ্য নহে, এইরূপ ভাবিয়া দ্বেষবশতঃ ইহাকে তুমি পরিত্যাগও করিও না; পরন্তু আত্মকাম হইয়া স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাক। হে সাধো! এই দৃশ্য প্রপঞ্চ সৎ হউক বা অসৎ হউক, অথবা উদিত হউক বা অস্তমিত হইয়াই যাউক, উহার গুণাগুণে তুমি কদাচ সমভাব হইতে বিচ্যুত হইও না। তুমি কি মনে কর যে, দৃশ্য বস্তুর সহিত তোমার সম্বন্ধ আছে? বস্তুতঃ তাহার সহিত তোমার একটুকু মাত্র সম্বন্ধও নাই। আর থাকিবেই বা কেন? যাহার কোনই রূপ নাই,—যাহা অলীক, তাহার সহিত সম্বন্ধই বা কিরূপ? হে মনঃ! তুমি অসৎ, এই দৃশ্যও অসৎ; সুতরাং বন্ধ্যাপুত্র ও আকাশ-কুসুমের ন্যায় অসতে অসতে সম্বন্ধ সম্ভব হয় কি? ফলতঃ সেরূপ সম্বন্ধের কথা কেবল কতকগুলি অক্ষরসমষ্টি মাত্র। হে সুন্দর! যদি এই দৃশ্য সংসার অসত্য হয়, আর তুমি সত্য হও, তাহা হইলেই বা বল দেখি,—অসৎ ও সতের মৃত এবং জীবিতের সম্বন্ধ হইবে কিরূপে? হে চিত্ত! যদি তুমি এবং এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ, এই উভয়েরই সত্যতা হয়, তাহা হইলেও তো কদাপি হর্ষ বা বিষাদপ্রসক্তির সম্ভাবনা নাই। কেন নাই? তাহার কারণ এই যে, যাহা সত্য, তাহার তো কখনই পরিবর্ত্তন ঘটে না; পরিবর্ত্তন না হইলেই

বা হর্ষ-বিষাদের সম্ভাবনা কোথায়? অতএব তোমায় বলি, তুমি তোমার বিষম বিষাদ পরিত্যাগ কর, সতত তুষ্ণীভাবে থ কিয়া আত্মস্বরূপে অবস্থানার্থ উৎসাহিত হও। বিক্ষেপরূপ অব্ধিজলে আবিষ্ট এই সংসারস্থিতিকে তুমি দূরে পরিহার কর। হে সন্মতে! কন্দুকাকার অলাতযন্ত্রের ন্যায় অনর্থক আপনা হইতে জ্বলিত ও পুনঃপুন উৎপতিত হইয়া কি হইবে? তুমি মোহপ্রাপ্ত হইয়া একান্ত মন্দভাব আশ্রয় করিও না। দেখ, যাহা প্রাপ্ত হইলে পরম পরিপূর্ণতায় উপনীত হওয়া যায়, এই জাগতিক দৃশ্যসমুহ মধ্যে তাদৃশ কোনই উন্নত বা উত্তম বস্তু নাই। অতএব রে শঠ মন! তুই একান্ত অভ্যাস ও বৈরাগ্য বলে অতি ধীরতা অবলম্বন করিয়া চঞ্চলতা পরিহার কর্।

একাদশ সর্গ সমাপ্ত ॥১১

দ্বাদ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! রাজা জনক মনে মনে এইরূপ বিচার করিয়া স্বীয় রাজ্যে অবস্থিত থাকিয়াই সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি ধীরধী হইয়াছিলেন, তাই কোন কিছুতেই মুগ্ধ হইতেন না। কোনরূপ আনন্দ-ব্যাপারেই তাঁহার মন উল্লসিত হইত না বা কোনরূপ নিরানন্দ ব্যাপারেও তদীয় মন বিষাদমগ্ন হইত না। তিনি সর্ব্বদা কেবল সুষুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেন। সেই সময় হইতে কোনরূপ বাহ্য বিষয় তৎকর্ত্তৃক আহৃত বা পরিত্যক্ত হইত না, তিনি কেবল নিঃশঙ্কভাবে বর্ত্তমান ব্যাপারেই ব্যাপৃত থাকিতেন।

ভূপতি জনক অনবরত বিচার-পরায়ণ ছিলেন; এই জন্য স্বচ্ছাম্বরে রজোরাশির ন্যায় তদীয় হৃদয়ে তখন হইতে কদাপি রজোগুণ-জন্য মমতাদিরূপ মালিন্য স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। কেবল তাঁহার বিবেক-বিচারের পরিপাকে সম্যক্ ব্রহ্মজ্ঞানই নিতান্ত নির্ম্মলতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। নির্ম্মল

নভোমণ্ডলে সম্যক্ সমুদিত দিবাকরের ন্যায় তদীয় হৃদাকাশে সতত শোক-দুঃখাদি-বিরহিত চিন্ময় ব্রহ্মই বিকাশ পাইয়াছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তস্তত্ত্ব অবগত হইয়া ছিলেন; তাই তিনি অনন্তাকারে আপনার চিৎশক্তি মধ্যেই স্বস্বরূপে সমস্ত ভাব অবলোকন করিতেন। কদাচ কোন বিষয় কোনরূপ আনন্দ বা দুঃখোদয় তাঁহার হইত না। প্রকৃতির ব্যবহার-বশতঃ সদাই তিনি প্রশান্তমনে অবস্থান করিতেন।

হে রাঘব! তদবধি সেই রাজর্ষি জনক জ্ঞানবৃদ্ধ ও ইহ-পর-কালের প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া জীবন্মুক্ত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি বিদেহরাজ্যের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রকৃতিপুঞ্জের জীবনস্বরূপ হইয়াছিলেন। হর্ষ কিম্বা বিষাদভয়ে অভিভূত হইয়া কদাপি তিনি পরি-তাপ ভোগ করিতেন না; মানসিক গুণ-দোষাদি চেষ্টায় কখনই তাঁহার স্বরূপ বিকৃতি ঘটিত না। বাহ্যিক রাজকার্য্যজনিত ইচ্ছা বা অনিষ্ট-ঘটনায় কখন তিনি গ্লানি বা হর্ষ প্রাপ্ত হইতেন না। তাঁহার আত্মা নিষ্ক্রিয় হইয়া ছিল; তাই তিনি বাহ্যতঃ কার্য্যলিপ্ত রহিলেও বস্তুতঃ কুত্রাপি কিছুই করিতেন না, সর্ব্বদা স্থিরচিত্তেই অবস্থান করিতেন এবং সুষুপ্ত অবস্থায় উপনীত ব্যক্তির ন্যায় তদীয় সর্ব্ববাসনা সর্ব্বথা সর্ব্ব ভাব হইতে বিদূরিত হইয়াছিল; তাই তিনি কদাচ ভবিষ্যৎ-চিন্তা করিতেন না, অতীত বিষয়ের জন্যও তাঁহার ভাবনা ছিল না; তিনি কেবল সদানন্দভাবে বর্ত্তমানেরই অনুবর্ত্তন করিতেন।

হে নলিননেত্র! রাজা জনক স্বীয় বিচারবলেই নিঃশেষ প্রাপ্য প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। অর্থাৎ কণ্ঠাগত বিস্মৃত চামীকরবৎ একমাত্র জ্ঞান-প্রভাবেই তিনি পরম তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তত্ত্বদর্শী সাধুগণের মত এই যে, যত কালে না বিচার ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাবৎ পর্য্যন্তই স্বীয় চিত্তে সদসৎ বিচার করা কর্ত্তব্য। হে রাঘব! সেই ব্রহ্মপদ কেবল গুরুর সন্নিধানেই মিলিবার নহে, কেবল সৎশাস্ত্রের অনুশীলন করিলেই পাওয়া যাইবে না অথবা পুণ্যপ্রভাবেও লব্ধ হইবার নহে; যদি সাধুসঙ্গ লাভে হৃদয় নিতান্ত নির্ম্মল হয় এবং বিচার সহযোগে তাহা হইতে সন্দেহাদি সর্ব্ব উপ-দ্রব চলিয়া যায়, তাহা হইলে তথাবিধ হৃদয়মধ্যেই উহা লব্ধ হইয়া থাকে।

হে রাম! সুচতুরা সহচরীর ন্যায় স্বীয় বিচারাবতী বুদ্ধির সাহায্যেই ঐ ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তৎপদ-প্রাপ্তি-বিষয়ে আর উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্বাপর-বিচারকারিণী যদীয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দীপশিখার ন্যায় হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইতে থাকে, জড়তারূপ অন্ধকার কখনই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না।

হে মতিমন্! বিপদ-সাগর দুঃখরূপ কল্লোলমালায় সমাকুল; সহজে তাহার পরপারে যাওয়া যায় না। তবে যদি একমাত্র প্রজ্ঞারূপিণী নৌকার সাহায্য লওয়া হয়, তাহা হইলেই সেই বিপদসাগর হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়; নতুবা অপর সহায় নাই। ভাবিয়া দেখ, যেমন সাধারণ একটুকু বাতাস বহিলেই অসার তৃণ তাহার আয়ত্ত হইয়া পড়ে, তেমনি যাহার প্রজ্ঞা নাই, তাদৃশ ব্যক্তি নিতান্ত লঘু বিপদেও অনায়াসে অভিভূত হইয়া থাকে। হে বীর! বুঝিবে,—যাঁহার প্রজ্ঞা আছে, তাঁহার শাস্ত্রজ্ঞান বা সহায়ান্তর না থাকিলেও তিনি এই সংসারসাগরকে গোষ্পদবৎ একান্ত লঘু বলিয়া জ্ঞান করেন এবং তাহা হইতে অনায়াসেই সমুত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যিনি প্রজ্ঞাবান্, তিনি অপরের সাহায্য না লইয়াও অবশ্যকর্ত্তব্য সমস্ত পুরুষার্থের অন্তঃসীমায় উপনীত হইতে পারেন। পরন্তু যাহার প্রজ্ঞা নাই, তাদৃশ জন সহায়বান্ হইয়া কার্য্যনিষ্পত্তি করিতে সমুদ্যত হইলেও সে কার্য্য তো পণ্ড হইয়া যায়ই; অধিকন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও বিনাশ-দশায় উপনীত করিয়া লয়। কৃষকেরা যেমন ফল-প্রাপ্তির প্রত্যাশায় জল-সেকাদি বিবিধ উপায় দ্বারা লতা-সন্ততির বৃদ্ধি বিধান করে, তেমনি জ্ঞান-পিপাসু মানব প্রথমতঃ শাস্ত্রালোচনা,অনন্তর সাধুজনসেবা, ইত্যাদিরূপ উপায় অবলম্বনে তদীয় প্রজ্ঞার পুষ্টি সাধন করিয়া লইবেন। ইন্দুবিম্ব যেমন প্রভাপটল বিস্তার করে, তেমনি জন্মান্তরীয় ভাগ্য-তরুই যথাকালে জ্ঞানরূপ সুমিষ্ট ফল প্রসব করিয়া থাকে। লোক সকল বাহ্য বিষয় উপার্জ্জন করিবার জন্য যেরূপ যত্ন করে, আপনার প্রজ্ঞা বৃদ্ধির জন্য তাদৃশ যত্ন তাহাদের পূর্ব্বেই করা কর্ত্তব্য। কেন না, প্রজ্ঞাবলেই দুঃখ শান্তি ঘটে; প্রজ্ঞার অভাবেই সর্ব্ববিধ দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাহারই জন্য সংসার-তরুর অঙ্কুরোদ্গম হয়। যাহার প্রজ্ঞা নাই, বিপদ্‌রাশি সহজেই আসিয়া

তাহাকে আক্রমণ করে। একমাত্র প্রজ্ঞার অভাবেই এই সকল অনর্থ ঘটে; অতএব প্রজ্ঞা-মান্দ্য অপনীত করা কর্ত্তব্য। প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ সর্ব্বসুখের অধিকারী হইয়া থাকে। কি স্বর্গরাজ্য, কি পাতাল-রাজ্য, যেখান হইতে যেরূপ সুখই লব্ধ হউক, একমাত্র প্রজ্ঞাই তাহার মূল; মহাত্মা ব্যক্তি প্রজ্ঞাবলেই তাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

হে রাঘব! এই যে ভীষণ সংসার-সাগর প্রবহমাণ, একমাত্র প্রজ্ঞা-বলেই ইহা হইতে সমুত্তীর্ণ হওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত দান বল,—তীর্থ-পর্য্যটন বল,—তপস্যা বল, কোন কিছুতেই এই সংসার-সাগরের পরপারে উপনীত হওয়া যায় না। নরগণ ভূতলে বাস করিয়াও যে স্বর্গীয় সম্পদ লাভ করে, জানিবে—তাহা একমাত্র প্রজ্ঞারূপিণী পুণ্যলতিকারই সুমিষ্ট ফল বৈ আর কিছুই নহে। লৌকিক দৃষ্টান্তেও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা প্রখর নখরাঘাতে মদমত্ত করিকুলের বিনাশ সাধন করে, তাদৃশ পশুশ্রেষ্ঠ সিংহগণও সামান্য একটা জম্বুকের প্রজ্ঞাবলে পরাজিত হইয়াছে। তাহাদের সে পরাজয়,—সিংহ-সন্নিধানে হরিণ-শাবকের পরাজয়েরই অনু-রূপ। এমনও দেখা যায়, অতি সামান্য লোকেও প্রজ্ঞাবলে রাজত্ব লাভ করে; অধিক কি, স্বর্গ ও অপবর্গ লাভেরও যোগ্যতা প্রাজ্ঞ জনেই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বাদিগণের মধ্যে অনেকে অতি ভীরুস্বভাব আছে; কিন্তু তাহারা স্ব স্ব সুতর্ক উত্থাপনপূর্ব্বক স্বীয় প্রজ্ঞাপ্রভাবেই নির্ভীক ও সুবক্তা হইয়া প্রতিবাদিগণকে পরাস্ত করিয়া থাকে। প্রজ্ঞা যেন বিবেকীর হৃদ-য়ের চিন্তামণি; সে তথায় অবস্থান করিয়া কল্পলতিকার ন্যায় চিন্তিত-মাত্রেই অভীষ্ট ফল অর্পণ করিয়া থাকে। নিপুণ নাবিক-জনের ন্যায় সুশিক্ষিত ব্যক্তিই প্রজ্ঞাবলে ভবার্ণবের পরপারে গমন করিতে পারে; তদ্ভিন্ন যাহার প্রজ্ঞা নাই, তাদৃশ মূঢ়বুদ্ধি অধম জন অপটু নাবিকের ন্যায় কিছুতেই ভবার্ণবের পরপার-গমনে সক্ষম হয় না।

হে রাম! প্রজ্ঞা যদি বিবেক-বৈরাগ্য প্রভৃতি সৎপথে পরিচালিতা হয়েন, তাহা হইলে জলধিবক্ষে ভাসমানা নৌকার ন্যায় মনুষ্যকে তিনি সংসারের পারে উপনীত করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে লোভ, মোহ, ক্রোধ ও চিন্তা প্রভৃতি হইতে অশেষ দোষ উত্থিত হয়। প্রজ্ঞাকে যদি ঐ সকল

দোষের পথে নিযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে অনভিজ্ঞ নাবিক-চালিতা নৌকার ন্যায় উহা সংসার-সাগর-বক্ষে ঘূর্ণিত হইয়া জীবকে বিপদ্‌গ্রস্ত করিয়া ফেলে। বর্ম্মাবৃত দেহ যেমন বাণাঘাতে ভিন্ন হয় না, তেমনি যে পুরুষ বিবেকী, অমুগ্ধ ও প্রজ্ঞাবান্, লোভ-মোহাদি কখনই তাহাকে পীড়া প্রদান করিতে পারে না।

হে রাঘব! একমাত্র প্রজ্ঞাবলেই সমগ্র জগৎ সম্যক্ অবলোকন করা যায়। প্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তির নিকট আপদ-সম্পদ উভয়ই তুল্য। অহ-ঙ্কাররূপ মেঘজাল ব্রহ্ম-সূর্য্যের আবরক; উহা জড় এবং অতীব বিস্তৃত। যদি প্রজ্ঞারূপ পবন প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে আর ঐ অহঙ্কারমেঘ থাকে না। প্রজ্ঞাবলেই অহঙ্কারমেঘ অভিহত হইয়া যায়। হে রাম! যিনি অতুলনীয় উচ্চ পদ পাইবার অভিলাষ করেন, তাঁহার পক্ষে প্রথমতঃ ক্রমশ বিবেক শিক্ষা দ্বারা প্রজ্ঞা-শোধন করা কর্ত্তব্য। দেখ, কৃষীবলেরা ফল পাইবার প্রত্যাশা করিয়া সর্ব্বাগ্রে ধরাকেই কর্ষণ করে।

দ্বাদশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ১২ ॥

ত্রয়োদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! জনকরাজ যেরূপে আত্মবিচার করিয়াছিলেন, তুমিও যদি ঐরূপে আত্মা দ্বারা আত্মাকে বিচার করিয়া দেখিতে পার, তাহা হইলে বিদিতবেদ্য মহাপুরুষগণের প্রাপ্য পদ তোমারও বিনা বিঘ্নে অধিগত হইতে পারে। যাঁহাদের প্রজ্ঞা আছে এবং যাঁহারা রাজস-সাত্ত্বিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, রাজা জনকের ন্যায় তাঁহারা আপনা আপনি আত্মবিচার করিয়া প্রাপ্য পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের পরমপদ প্রাপ্তির উপায় এই যে, যত দিনে না আত্মা আপনা হইতে আপনাতে প্রসন্ন হইয়া উঠেন, ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহারা ইন্দ্রিয়াখ্য শত্রুদিগকে বারম্বার বিজিত করিয়া থাকেন। যিনি সর্ব্বগামী—যিনি

দেবগণেরও অধিপতি, সেই পরমাত্ম-দেব যখন আপনা হইতে প্রসন্ন হইয়া প্রকাশমান হয়েন, তখন জীবের সমস্ত কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়,—তাহার আর কোনই দুঃখদৃষ্টি থাকে না। মোহের বীজভূত দুর্ব্বাসনা যতই থাকুক,—আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিকাদি বিভিন্ন দুঃখরাশি যতই বর্ষিত হউক আর 'অহং' 'মম' ইত্যাদি প্রত্যয়-লক্ষণ হৃদয়গ্রন্থি সকল যতই দৃঢ় হউক, সেই পরাপর পরমাত্মার সাক্ষাৎকার ঘটিলে কিছুই থাকে না—সমস্তই ক্ষয় পাইয়া যায়।

হে রাম! তুমি সর্ব্বদা জনক রাজার ন্যায় বিবেক-বুদ্ধিবলে আত্মাকে নিখিল বিশ্বাধিষ্ঠান ব্রহ্মাকারে সাক্ষাৎ অনুভব করত পরম পুরুষার্থশ্রী প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপে বিরাজ কর। যিনি নিয়ত আধ্যাত্মিক বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া এই নিখিল জগতের অনিত্যতা অবলোকন করেন, রাজা জনকের ন্যায় তাঁহার আত্মা যথাকালে আপনা হইতেই প্রসন্ন হইয়া উঠে। দৈব বল,—কর্ম্ম বল,—ধন বল, আর বান্ধব বল, ইহাদের কেহই ভবভীত জনগণের সম্বল নহে; পরন্তু তাঁহাদের স্বস্ব-প্রযত্নই এ পক্ষে প্রকৃষ্ট সম্বল। হে বৎস! বিবেক ও বৈরাগ্য প্রভৃতির উপর বীতশ্রদ্ধ হইয়া যাহারা একমাত্র স্ব স্ব অদৃষ্টের উপরই নির্ভর করে, জানিবে—তাহাদের মতি বড়ই মন্দ, সে মতি আত্মবিনাশেরই হেতুভূত; সুতরাং তাদৃশ মতির অনুসরণ করা একান্ত অকর্ত্তব্য। যিনি বুদ্ধিমান্, তিনি পরম বিবেক আশ্রয় করেন,—আপনিই আপনাকে নিপুণভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং বৈরাগ্য-শালিনী বুদ্ধির সাহায্য লইয়া সংসার-সাগরের পরপারে গমন করিয়া থাকেন।

হে রঘুবংশাবতংস রামচন্দ্র! এই আমি দৃষ্টান্তরূপে জনকাখ্যা-য়িকার উল্লেখ করিলাম। ইহা আকাশ হইতে ফলপ্রাপ্তির ন্যায় জ্ঞান-লাভের উপায়-স্বরূপ; অপিচ ইহা সুখসাধনের নিদান এবং অজ্ঞান-তরুর অন্তক। যিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় সদ্বুদ্ধি ও সম্যগ্দর্শী হইতে পারেন, প্রভাতকালীন পঙ্কজের ন্যায় তদীয় দেহান্তর-বিহারী পরমাত্ম-দেব প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যেমন আতপ-তাপে হিমরাশি বিগলিত হইয়া যায়, তেমনি এই বিচিত্র সংসারমনন বিচারবলেই বিলীন হইয়া

থাকে। 'এই দেহই আমি' এই অজ্ঞান-নিশার যখন অবসান হয়, তখন সর্ব্বব্যাপী সুপ্রসৃত আত্মালোক আপনা হইতেই প্রকাশ পাইতে থাকে। অপিচ 'এই দেহই আমি' এইরূপ সঙ্কোচ বা পরিচ্ছিন্নভাব যখন বিলয় পায়, তখন অসীম অনন্ত ভুবনব্যাপী অসঙ্কোচ বা অপরিচ্ছিন্নভাব আপনা হইতেই প্রকাশিত হয়।

হে সদ্‌বুদ্ধে! মহাত্মা জনক যেমন অহঙ্কার-বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তুমিও তেমনি অন্তরে বিচার করিয়া তাহা পরিত্যাগ কর। যখন অহঙ্কারমেঘ বিলীন হইয়া যায় এবং চিদাকাশ বিতত ও বিমল হইয়া উঠে, তখন নিশ্চয়ই তাহাতে স্বপ্রকাশ আত্ম-ভাস্কর স্পষ্টরূপে প্রকাশমান হয়েন। অহম্ভাবের ভাবনাই ঘোর অন্ধকার; এই অন্ধকার যখন প্রশমিত হইয়া যাইবে, তখন আত্মপ্রকাশ অবশ্যই ঘটিবে। আমি নাই, অন্য কেহই নাই, অথচ সকলই আছে; এইরূপে ভাবিত হইয়া মন যখন প্রশান্তি প্রাপ্ত হয়, তখন আর সে বাহ্য উপাদেয় বিষয়ে নিমগ্ন হয় না।

রামচন্দ্র! জানিবে—যাহা উপাদেয় বিষয়, তাহাতে একান্ত অনুরাগ, আর যাহা হেয় বস্তু, তাহাতে একান্ত অননুরাগ, ইহাই মনের বন্ধন; এতদ্ভিন্ন মনের আর কোনই বন্ধন নাই। অতএব বৎস! বলিয়া রাখি, তুমি কখনই হেয় বস্তুতে উৎকট উপেক্ষা প্রদর্শন করিও না এবং যাহা উপাদেয় বস্তু, তাহাতেও অতি বড় অনুরাগ অর্পণ করিও না। ফলে হেয় এবং উপাদেয়-বুদ্ধি বিসর্জ্জন করিয়া তাহার সাক্ষিরূপে অবস্থান করত স্বচ্ছভাবে বিরাজ করিতে থাক। 'ইহা হেয়, আর উহা উপাদেয়' এইরূপ ব্যবস্থা যাঁহাদের নাই, সেই সকল পুরুষ কিছুই কামনা করেন না এবং তাঁহাদের ত্যাজ্যও কিছুই নাই। যেমন মেঘাবৃত ব্যোমদেশে কৌমুদী-বিকাশ হয় না, তেমনি যতদিনে না 'ইহা হেয় আর উহা উপাদেয়' এইরূপ কল্পনা ক্ষীণ হইয়া যায়, ততদিনের মধ্যে চিত্তের সমতা কিছুতেই প্রতিভাত হইতে পারে না। 'এইটা বস্তু, আর ঐটা অবস্তু' এইরূপ ধারণার বশবর্ত্তিতায় মন যাহার চঞ্চল, শাখোট পাদপের মঞ্জরীর ন্যায় সে মনে কখনই সমতা সমুদিত হয় না। 'ইহা আমার অনুকূল আর উহা আমার প্রতিকূল' এইরূপে লাভালাভ-বিলাসিনী ইচ্ছা যে পুরুষে বিদ্যমান, তাহাতে বৈরাগ্য-

বিকাশিনী স্বচ্ছ সমতার সম্ভাবনা কোথায় ? যাঁহার অন্তরে একমাত্র অনাময় ব্রহ্মতত্ত্ব পূর্ণরূপে বিরাজিত, তাঁহারও নানা বা অনানারূপে যুক্ত বা অযুক্ত বিচারণা কোথায় ? অপিচ যাহার চিত্ত-পাদপে 'ইহা আমার প্রতিকূল আর উহা আমার অনুকূল' ইত্যাদি বিচারণারূপিণী দুইটী মর্কটী বাস করে, সে চিত্তের কখন শান্তি হইতে পারে কি ?

রামচন্দ্র ! যাঁহার হেয় বা উপাদেয়ভাব নাই, তথাবিধ প্রাজ্ঞ পুরুষে বিতৃষ্ণতা, নির্ভীকতা, নিত্যতা, নিরীহতা, নিষ্ক্রিয়তা, সমতা, সৌম্যতা, বিজ্ঞতা, নির্ব্বিকল্পতা, মৃদুভাষিতা, ধৃতি, মৈত্রী, মতি, মৃদুতা, ও তুষ্টি প্রভৃতি উত্তম গুণ সকল বীজবিহীনভাবে বিরাজ করিতে থাকে। জল যদি প্রবাহবেগে নিম্নাভিমুখে ধাবিত হয়, তাহা হইলে লোকে যেমন তাহাকে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নিরোধ করে, তেমনি চিত্ত যদি নিকৃষ্ট বিষয়ে ধাবমান হয়, তাহা হইলে বহিরিন্দ্রিয়ের সম্পর্ক পরিহারপূর্ব্বক সবলে তাহাকে সংযত করিয়া রাখিবে। তুমি উপবেশন কর, গমন কর, নিদ্রা যাও বা শ্বাস পরিত্যাগ কর, সর্ব্বভাবে সর্ব্বদা বাহ্য বিষয় সকল পরিহার করিয়া কেবল অন্তরের বিষয়-বিচারেই প্রবৃত্ত হও। বৎস ! বাসনা যেন এক বৃহৎ জাল, উহা চিন্তারূপিণী সূত্রসন্ততি দ্বারা গ্রথিত হইয়া এই সংসারসলিলে প্রসারিত রহিয়াছে এবং তৃষ্ণারূপিণী শফরীকে অন্তরে ধরিয়া জীব-জলকে আবিল করিতেছে। বিশাল আকাশে প্রবল প্রভঞ্জন প্রবাহিত হইয়া সম্বর্ত্তাদি বারিদবৃন্দকে যেমন দূরে অপসারিত করিয়া দেয়, তুমিও তেমনি এই মদুপদিষ্ট প্রজ্ঞারূপিণী তীক্ষ্ণ কর্ত্তরী দিয়া ঐ বাসনাজাল ছিন্ন করিয়া ফেলো।

হে কৃতিকুশল ! এই সংসারতরুর মূল অজ্ঞান বৈ আর কিছুই নয়। ঐ মূল হইতে দোষাঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। তুমি ইহা বিশেষরূপে বিদিত হইয়া যাহাতে উদ্ধার হইতে পারে, এতাদৃশ বুদ্ধিযোগে ধৈর্য্য সহকারে ঐ মূল উৎপাটিত কর। যেমন কুঠার দিয়া তরুমূল কর্ত্তন করে, তুমিও তেমনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকারী মনের সাহায্যে রাগ-দ্বেষাদি কলুষিত মনের উচ্ছেদ সাধন কর এবং পরম পাবন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে থাক। এইরূপে ভাবী ও বর্ত্তমান-

কালীন মনকে বাসনাবিহীন মনের সাহায্যে নিরস্ত করত এই সংসার-ভাবের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক বিহার করিতে থাক। সংসারবাসনা ক্ষয়রূপ বিস্মরণ ঘটিলে পুনরায় আর মোহ জন্মিতে পারে না; তবে কি আপনা হইতে সেই মোহক্ষেত্রে সংসার উৎপন্ন হয়? না—তাহাও নহে। চিত্তসংস্কারের উচ্ছেদরূপ চিত্ত বিস্মরণ ঘটিলে তখন আর চেত্য সংসার সমুৎপন্ন হইতে পারে না। চিত্ত এবং চেত্য এই উভয়কে বিস্মৃত হইবার পক্ষে তদ্বিষয়ক আস্থা পরিত্যাগই প্রকৃষ্ট উপায়। তুমি বসিয়া থাক, বিচরণ কর, নিদ্রা যাও, জাগিয়া থাক, উত্থিত হও, আর পতিত হও, সর্ব্বদা সমস্ত অবস্থাতেই সংসারের অনিত্যতা অন্তরে নিশ্চয় করিয়া তদুপরি আস্থা স্থাপন করিও না। হে রাঘব! তুমি উপস্থিত কার্য্য সম্পাদন কর এবং অনুপস্থিত কার্য্যের চিন্তা পরিত্যাগ কর, এইরূপ করিয়া সর্ব্বত্র সমদর্শিতা অবলম্বনপূর্ব্বক বিচরণ করিতে থাক। দেবদেব ভবানীপতি যেমন এই মায়াময় জগতে বিভিন্ন নামে ক্ষিতি প্রভৃতি বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করিয়াও চিন্ময় দৃষ্টিতে কিছুই ধারণ করেন না, অর্থাৎ ক্ষিতি, জল, বায়ু, আকাশ, যজমান, চন্দ্র ও সূর্য্য, এই অষ্টবিধ মূর্ত্তিতে তিনি শর্ব্ব, ভব, রুদ্র, উগ্র, ভীম, পশুপতি, মহাদেব ও ঈশান নামে বিভিন্নরূপে অবস্থিত হইলেও মহাপ্রলয়ে তাঁহার ঐ সকল রূপ থাকে না, তিনি তৎসমস্ত সংহারপূর্ব্বক বিশুদ্ধ চিন্মাত্রতায় শিবস্বরূপেই বিরাজ করিতে থাকেন, তুমিও তেমনি সন্নিধিমাত্রে সমস্ত রাজকার্য্য সম্পাদন করত নিজে নির্লিপ্ত অকর্ত্তৃরূপে অবস্থান করিতে থাক।

হে নিষ্পাপ রামচন্দ্র! তুমি শুদ্ধ চৈতন্যদৃষ্টি লাভ করিয়া দেখিবে—তুমিই বেত্তা, তুমিই জন্মাদি বিক্রিয়াবিহীন; তুমিই মহেশ্বর এবং তুমিই পরমাত্মা। তুমিই ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র না হইয়াও সর্ব্বত্র মোহক্রমে সংসার-ভাবের বিস্তার করিতেছ। যিনি রাগদ্বেষ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সমস্ত সংসারবাসনা ত্যাগ করিয়াছেন, লোষ্ট প্রস্তর কাঞ্চন, সর্ব্বত্রই যাঁহার সমান জ্ঞান জন্মিয়াছে, জানিবে,—তাঁহাকেই মুক্ত যোগী নামে নির্দ্দেশ করা হয়। তিনি যেরূপ কর্ম্মই করেন, যাহা কিছু ভোজন করেন, যে কিছু দান করেন কিম্বা যাহা কিছু নষ্ট করিয়া ফেলেন, সে মুক্ত পুরুষের সকল

কর্ম্মেই—সুখ-দুঃখ, সর্ব্বভাবেই সমতা বিরাজিত। যিনি ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট চিন্তা না করিয়া উপস্থিত কার্য্যমাত্রেই কর্ত্তব্যবোধে নিরত হইয়া থাকেন, অথচ কোন কিছুতেই আসক্ত হয়েন না,—হে মহামতে! তাঁহার চিত্তই এই বিশাল বিশ্বকে চিৎশক্তির সত্তাভিন্নরূপে বিদিত হয় এবং নিখিল ভোগ-বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

হে রঘুনন্দন! বনের মধ্যে মার্জ্জার যেমন মাংসলালসায় সিংহের অনুসরণ করে, মনও তেমনি স্বভাবতঃ জড় হইলেও যখন জ্ঞানোদয় হয়, তখন পারমার্থিক বস্তুর অনুধাবন করিয়া থাকে। মার্জ্জার যেমন সিংহের অনুসরণ করিয়া সিংহের বীর্য্যে সংগৃহীত মাংসই ভক্ষণ করে, চিত্তও সেইরূপ চিৎশক্তির প্রভাবে প্রতীত দৃশ্য বিষয় আশ্রয় করিয়া থাকে। বলিতে পার, এরূপ হইলেই বা কি হইল? বলিব—ইহাতে বুঝা গেল, মন অসৎকল্প বা মিথ্যা; পরন্তু চিতের প্রসাদে জীবিত থাকে; অপিচ একাদ্বয় আত্মাকে ভুলিয়া জগদাকার ভাবনা করত জগৎস্বরূপেই বিরাজ করিতে থাকে। মন চেষ্টাহীন জড়; সুতরাং উহা শবদেহেরই সমান। যদি চিৎস্বরূপ আলোক ও তদীয় শক্তির সাহায্য প্রাপ্তি ঘটে, তাহা হইলে উহা কখনই স্পন্দিত হইতে পারে না। এইজন্যই শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতেরা চিৎশক্তির মিথ্যাভূত স্পন্দ-কল্পনাকেই চিত্ত নাম প্রদান করিয়া থাকেন। যাহা চিত্ত-ফণীর ফুৎকার, তাহাই কল্পনা নামে নির্দ্দিষ্ট। এই কল্পনাই আপনাকে চিৎস্বরূপে বুঝিতে পারিয়া শুদ্ধ-চিন্মাত্রতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই চিৎ যখন অচেত্য বা বিষয়বিরহিত হয়, তখনই উহা সনাতন ব্রহ্মরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, আবার ঐ চিৎ যখন চেত্য বা বিষয় সহ মিলিত হয়, তখন উহা কল্পনা বা কলনা নামে নির্দ্দিস্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্মই কিঞ্চিৎ রূপ-পরামর্শে কলনা বা কল্পনা হইয়া হৃদয়ে সদাকারে সমুপস্থিত সঙ্কল্প-বিকল্প-কল্পনায় পর্য্যবসিত হয়েন এবং ঐ আকারেই মনোরূপে পরিণত হইয়া থাকেন। কলনা যখন চিত্তকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হয়, তখন উহা স্বীয় চিৎস্বরূপতা ভুলিয়া যায় এবং জড়তা আসিয়া উহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। উল্লিখিত কলনাই হেয় এবং উপাদেয়রূপে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া সঙ্কল্পের অনুধাবন করে এবং উহা চিৎস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া আপনিই আপনার শক্তিবলে

এই জগৎস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়; পরন্তু গুরূপদেশাদি দ্বারা যত দিনে না ঐ চিৎশক্তি সম্যক্ সম্প্রবোধিত হয়, তাবৎকালের মধ্যে সেই পূর্ণানন্দময় অদ্বয় ব্রহ্ম-স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবার সুযোগ কিছুতেই ঘটে না। সুতরাং শাস্ত্রালোচনা, বৈরাগ্যাভ্যাস ও ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, এই সকল উপায় দ্বারা সর্ব্বাগ্রে স্বয়ং কলনা বা কল্পনাকে বোধিত করিয়া লইবে। ঐ কলনাই জীবনিবহের অন্তরে বিজ্ঞান এবং শমদমাদি সাধন সহ মনন ও নিদিধ্যাসনের সহায়তায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে এবং তখনই সে ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকে; অন্যথা কেবলই জগৎসংসারে ঘুরিয়া বেড়াইতে হয়। যখন ঐ কল্পনাদেবী ব্যামোহ-মদিরায় মত্ত হইয়া বিষয়বৃক্ষের তলদেশে লুঠিত হইতে থাকেন, তখনই তিনি অজ্ঞাননিদ্রায় নিদ্রিত হইয়া পড়েন; অতএব সর্ব্বচেষ্টায় তাঁহাকে প্রবোধিত করিয়া রাখিবে। এখন কথা এই, কলনা যদি সুপ্ত বা অপ্রবুদ্ধ থাকে, তাহা হইলে জগৎ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা হয় কিরূপে? উত্তরে বলিতে হইবে, কলনা অপ্রবুদ্ধ রহিলে জগতের অববোধ কোনরূপেই হই-বার নহে, এ কথা সত্য বটে; কিন্তু ইহাও সত্য যে, এই জগৎসংসারকে যে প্রবুদ্ধ বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বাস্তবিকই কিছুই নয়। বলিতে কি, সাঙ্কল্পিক প্রাসাদের ন্যায় উহা অসন্ময় বা মিথ্যাভূত কল্পনামাত্র। উল্লি-খিত চিত্ত-বৃত্তিরূপিণী কল্পনা যখন সর্ব্বসাক্ষিণী হইয়া হৃদভ্যন্তরবর্ত্তিনী পরম দৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে, তখন সে পুষ্পপুঞ্জে গন্ধশক্তির ন্যায় সর্ব্ব-পদার্থেই বিরাজ করিতে থাকে।

রামচন্দ্র! পদ্মিনী যেমন আতপ-সম্পর্কে প্রবোধিত হয়, তেমনি ঐ কল্পনা জড়স্বভাবা,—সুতরাং পাষাণরূপিণী হইলেও চৈতন্যের সম্পর্ক-মাত্রেই প্রবোধ প্রাপ্ত হয়। শিলা দিয়া নর্ত্তকীমূর্ত্তি গঠিত কর, কিন্তু তাহাকে চালিত না করিলে সে যেমন আপনা হইতে নৃত্য করিবে না, তেমনি ঐ কল্পনাদেবীও দেহের মধ্যে আছেন সত্য; কিন্তু থাকিয়াও স্বয়ং কিছুই গ্রহণ করিতে সক্ষম হয়েন না। রঘুবর! ভাবিয়া দেখ, চিত্রলিখিত রাজমূর্ত্তি কখন কি ভীষণ রণ-হুঙ্কার সহ কোথাও যুদ্ধ করিয়া থাকে? মনঃকল্পিত নিশাকর-কর-স্পর্শে ওষধিসকল কোথাও কখন প্রবোধিত হয় কি? রক্তাক্ত মৃতদেহ কোথাও ধাবিত হয়

কি? অরণ্য-পতিত শিলাখণ্ড কখন মধুর গান করিতে পারে কি? কৃত্রিম রবি-কর-যোগে কখন কোথাও নৈশ অন্ধকার অপাকৃত হইয়াছে কি? অথবা সঙ্কল্পময় ব্যোমকানন হইতে কদাচ কোথাও ছায়াপাত হয় কি? ফলতঃ এ সকলের যেমন কোন কিছুই সম্ভব নহে, তেমনি এই অলীক ভ্রম হইতে সমুৎপন্ন, উপলবৎ জড় ও মিথ্যা কল্পনাময় মনেরও কোনই কার্য্য করিবার সামর্থ্য নাই। যেমন তীব্রতর রবিরশ্মি বিকীর্ণ হইলে মরুমরীচিকায় জলভ্রম হয়, এই মিথ্যাভূত কল্পনাও তেমনি আত্মাতে স্ফুরিত হইয়া থাকে। যাহারা আত্মবঞ্চক অজ্ঞ লোক, তাহারাই স্পন্দশক্তিকে মন বলিয়া অঙ্গীকার করে; বস্তুতঃ উহা প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের ক্রিয়ামাত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। সম্বিৎ যাহাদের সঙ্কল্প-কল্পনায় অনাক্রান্ত এবং কল্পিত বিষয়াকারে অনাকারিত হয়, জানিবে—তাহাদের ঐ সম্বিৎই পারমার্থিকী প্রজ্ঞা। যে কল্পনা 'এই সেই আমি, ইহা আমার' ইত্যাদি ভাবনায় আবিল হয়, তাহারই জীবসংজ্ঞা নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। হে রাম! এইরূপে অসৎ-সঙ্কল্পেরই বুদ্ধি, চিত্ত ও জীব এই সংজ্ঞাত্রয় নিরূপিত হয়। পরন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, এ সকল সংজ্ঞা তাঁহাদের কাহারই কর্ত্তৃকই কল্পিত হইতে পারে না। তাঁহাদের মতে বুদ্ধি, মন, ধী ও শরীর, ইহাদের মধ্যে এমন কিছুই বাস্তবিক নাই, যাহা আমার বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। কেবল আত্মাই আছেন, তিনি সদা অবিনাশী। এই পরিদৃশ্যমান নিখিল বিশ্বই আত্মা; আত্মা ব্যতীত কিছুই নাই। আত্মাই সমস্ত কালক্রম; তিনি আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল। আত্মার ন্যায় নির্ম্মল কিছুই নাই। তিনি অত্যন্ত অচ্ছ বলিয়া অসদাভাস এবং সম্বিৎস্বরূপ বলিয়া সৎ। তিনি এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুর অতীত; সুতরাং তিনি কেবল স্বীয় অনুভূতি দ্বারাই গম্য।

হে রঘুবর! যেমন অন্ধকারময় ক্ষেত্রে আলোকের আবির্ভাব ঘটিলেই অন্ধকার অপগত হয়, তেমনি পরমাত্মার সহিত যখন সাক্ষাৎকার ঘটে, তখনই মনের অস্তিত্ব বিলয় পাইয়া যায়; সুতরাং মনের স্বতন্ত্র প্রকাশ সেখানে হয় না। তবে কথা এই যে, মনের প্রবৃত্তিশক্তি কোথায় হইয়া থাকে? উত্তরে বলা যায়, সুনির্ম্মল আত্মজ্ঞান যখন সঙ্কল্পবশতঃ বাহ্য বিষয়ের স্বরূপেই বিরাজমান হয়, তখনই পারমার্থিক আত্মার বিস্মরণ ঘটে

এবং তৎকালেই মনঃসম্ভূত অলীক পদার্থপুঞ্জ পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। পরম পুরুষ আত্মার সঙ্কল্পময়ত্বই চিত্ত আখ্যায় অভিহিত। যখন সঙ্কল্পের অভাব ঘটে, তখনই চিত্তেরও অভাব হইয়া থাকে এবং এই চিত্তের অভাব হইলেই মোক্ষ আসিয়া উপস্থিত হয়। জানিবে—সঙ্কল্পাভিমুখে ধাবমান আত্মার অস্বাভাবিক জ্ঞান হইতেই চিত্তের আবির্ভাব ঘটে। চিত্তের উৎপত্তি এইরূপই ; এই চিত্তই সংসারপ্রবাহের আদ্য কারণ বলিয়া নির্ণীত হইয়া থাকে। নির্ব্বিকল্প চিৎশক্তি হইতে সমুৎপন্ন সঙ্কল্পময়ী সত্তা কলনা নামে অভিহিত এবং এই চিৎসত্তাই মনঃসংজ্ঞায় বিদিত। রাম! মনে কর, দর্পণের সম্মুখে একটা দ্রব্য আছে ; সেই দ্রব্যের যদি অপসারণ করা যায়, তাহা হইলে যেমন দর্পণমধ্যগত দ্রব্যচ্ছায়ারও অপগম ঘটে, তেমনি প্রাণশক্তি যদি নিরুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনও নিরুদ্ধ হইয়া বিলীন হয় ; কেন হয়? তাহার কারণ এই যে, মন ও প্রাণ মূলতঃ একই পদার্থ বৈ আর কিছুই নয়। প্রাণই আপনার স্পন্দশক্তির সহায়তায় দেশান্তরীয় অনুভবকেও স্বীয় হৃদয়মধ্যস্থ করিয়া অনুভব করে ; এইজন্য সে মন আখ্যায় অভিহিত হয়। কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যে প্রাণ-নিরোধের কথা কহিলাম, উহা বৈরাগ্য ও প্রাণায়ামাভ্যাস এবং বাসনার বিলয়, সমাধি ও তত্ত্বজ্ঞান প্রভৃতি উপায় দ্বারাই হইয়া থাকে। বরং কখন কখন শিলারও চলন কিম্বা জ্বলনশক্তি সম্ভব হইতে পারে ; পরন্তু স্পন্দ এবং অববোধ এই দুই বিষয়ে মনের শক্তি কখনই হইতে পারে না। এখন জিজ্ঞাস্য,— উক্ত উভয় শক্তি তবে কাহাদের? উত্তরে বক্তব্য, স্পন্দশক্তি—প্রাণবায়ুর ; উহা চলস্বরূপিণী হইলেও জড়াকৃতি এবং চিৎশক্তি—আত্মার ; উহা সদা স্বচ্ছ ও সর্ব্বগামিনী। উল্লিখিত প্রাণবায়ু ও আত্মার ঐ উভয়বিধ শক্তির যে সমাবেশ, তাহারই নাম মন। এই মনের উৎপত্তি এবং জ্ঞান উভয়ই মিথ্যা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। ইহাই অবিদ্যা এবং ইহাই মায়া নামে অভিহিত। এই মনই সংসার-গরলের উৎপাদক এবং ইহাই পরম অজ্ঞান।

রামচন্দ্র! যদি চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি, এই দুই শক্তির সঙ্গবশতঃ সঙ্কল্পময় মনের কল্পনা করা না হয়, তাহা হইলেই এই সকল ভবভীতি পরিক্ষীণ হইয়া যায়। প্রাণবায়ুর যে স্পন্দশক্তি,তাহা যখন চিৎকর্তৃক চেতনা-

কারে উপনীত হয়, তখন সেই চেত্য চিৎই অন্তরের সঙ্কল্প-সাহায্যে চিত্ততা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব একমাত্র অখণ্ড চিৎই যখন ঐ চিত্ততার প্রকৃতপক্ষে মূল, তখন বাল-কল্পিত যক্ষের ন্যায় ঐ চিতের চিত্ততা মিথ্যা বৈ আর কি? আর ঐ অখণ্ড চিৎস্বরূপতাকে কেই বা বাধা প্রদান করিতে পারে? ফলে, উহার বাধক কেহই নাই। ভাবিয়া দেখ দেখি, যিনি অখণ্ডশক্তি ইন্দ্র, কাহার সহিত তাঁহার সঙ্ঘর্ষ ঘটিতে পারে? আর এক কথা, চিৎশক্তি ও স্পন্দশক্তি, এই উভয় শক্তির সম্বন্ধকে মন বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; পরন্তু ঐ কথিত সম্বন্ধের সম্বন্ধীরই যখন অভাব, তখন সম্বন্ধও নাই বলিতে হইবে; অতএব সম্বন্ধ ব্যতীত ঐ মন কাহার কিরূপে সিদ্ধ হইবে? চিৎ এবং স্পন্দ এই উভয়ের একতা ব্যাপারেই বা কীদৃশ পদার্থকে মন নামে অভিহিত করা যাইবে? বল দেখি, গজ ও তুরগাদি ব্যতীত সেনাসমাবেশ কিরূপ? ফলতঃ তাহার অসম্ভাবনার ন্যায় মনেরও সংস্থান অসম্ভব।

হে রাম! জানিবে—এ ত্রিজগতে যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া সুবিদিত, তাঁহাদের নিকট মনের অস্তিত্ব একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার; কেন না, তাঁহাদের অন্তরে পরমার্থ জ্ঞানের উদয় হয়। সেই জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই চিত্ত লয় পাইয়া যায়। তাই বলিতেছি, বৎস! তুমি অনর্থ ঘটাইবার নিমিত্ত বৃথা মনঃসঙ্কল্প করিও না। জানিও—মন মিথ্যাসমুৎপন্ন, ইহাতে বাস্তবিকতা কিছুই নাই।

হে মহামতে! তুমি কদাচ অন্তরে কিছুই সঙ্কল্প করিও না। কেন না, মন অবাস্তবিক; সুতরাং তাহার সঙ্কল্প হইতে সমুৎপন্ন বস্তু কুত্রাপি কিছুই বিদ্যমান নাই। হে মুনিবৃত্তে! অসম্যক্ জ্ঞান হইতে আবির্ভূত কল্পনা—তোমার হৃদয়-মরুর মরীচিকা; তুমি সম্যক্ দৃষ্টি লাভ করিয়াছ বলিয়া অধুনা তোমার ঐ মরীচিকা শান্ত হইয়া গিয়াছে। মন জড় এবং স্বরূপ্যহীন বলিয়া সর্ব্বদাই মৃতস্বরূপ; কিন্তু মূর্খতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! যে মন মৃত বলিয়া নির্দ্ধারিত, সেই মনই কি না মনুষ্যদিগকে মারিয়া ফেলে! ফল কথা, যদি চৈতন্যনিবৃত্তি অথবা নিঃস্বরূপতা প্রাপ্তিকেই মরণ বলা হয়, তাহা হইলে দেখা যায়, উল্লিখিত উভয়ই মনে বিদ্যমান; সুতরাং তাহাকে তো

নিত্য মৃত বলিয়াই নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। হায় রে! মূর্খলোক ইহা বুঝিয়াও বুঝে না; তাহারা এই মৃত মন হইতেই মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

রামচন্দ্র! মনের আত্মা নাই, দেহ নাই, আধার নাই, আকৃতি নাই, অথচ এইরূপ মনই সমস্ত জীবজগৎকে ভক্ষণ করিয়া ফেলে; সুতরাং ইহা যে একটা প্রকৃতই বিচিত্র বাগুরাবন্ধন, এইরূপ বলা অসঙ্গত হয় কি? মনের কোনই সামর্থ্য নাই, মারণোপযোগী সামগ্রীসম্ভারেও সে অন্বিত নহে, অথচ সেই মনই জীবজগৎকে নিগৃহীত বা নিহত করিতেছে; সুতরাং এই মনঃ কর্ত্তৃক নিগ্রহকে নীল-কমলদলের আঘাতে মস্তক-মর্দ্দন বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারি না কি? মন—জড়, অন্ধ ও মূক; সে এরূপ হইয়াও যাহাকে আহত করিয়া ফেলে, আমার মনে হয়, সে লোক সুধাকরের করস্পর্শমাত্রেও দগ্ধ হইয়া যায়। মনের বিদ্যমানতা নাই অথচ সে, বলবান্ ব্যক্তিকেও অভিভূত করিয়া ফেলে; কিন্তু বিবেকীর নিকট মন তাহার তাদৃশ প্রভুত্ব-প্রতিপত্তি বিস্তার করিতে পারে না। বিবেকী জন মহাযত্নে বৈরাগ্যাদি সাধন এবং উত্তম উত্তম যোগ, ধ্যান, সমাধি-অভ্যাস ও তত্ত্ব-সাক্ষাৎকার প্রভৃতি উপায় দ্বারা ঐ মন অবিদ্যমান হইলেও উহাকে নিহত করিয়া থাকেন।

হে রাম! যাহা মিথ্যা কল্পনায় কল্পিত, যাহার অবস্থান একেবারেই মিথ্যা এবং যাহাকে অন্বেষণ করিয়াও খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তথাবিধ মনের লোকাভিভবকারিণী শক্তির সম্ভাবনা কি? অহো! এই অতিলোল চিত্তও যে লোকদিগকে অভিভূত করিয়া ফেলে, ইহা বস্তুতই ময়-দানবের উৎপদায়িত্রী বিচিত্র মায়া বলিয়াই মনে হয় না কি? ফলতঃ যত কাল মূর্খতা প্রভাব থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত পুরুষকে সমস্ত আপদেরই অন্বেষণীয় হইতে হয়। ফলে অজ্ঞ লোক কোন্ আপদেরই বা না আশ্রয় হইয়া থাকে এই দেখ, এই সর্ব্বাপদের নিধানভূতা সৃষ্টি অজ্ঞানব্যক্তির মূর্খতাবশতঃ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। হায়! ইহাতে আরও কষ্ট এই যে, মন ও দেহাদির সৃষ্টি মূর্খতাবশতই কল্পিত; তাহাতে আবার সুপ্রসিদ্ধ জীব নিজে অসৎপথের অনুধাবন করিয়াই উত্তরোত্তর দুঃখের নিমিত্তই সৃষ্টিকে উৎপাদিত করিতেছে। আমি মনে করি, এই মৌর্খ্যময়ী সৃষ্টি অবিচারসিদ্ধা;—

সুতরাং বিচারমাত্রেই ক্ষণভঙ্গুরা। এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দেখ, জলের তরঙ্গ জল হইতে উঠে, জলই তাহাতে পিষ্যমাণ হয়, পরে ক্রমে ক্রমে কণায় কণায় ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া সে তরঙ্গ বিশীর্ণ হইয়া যায়। ফল কথা, এই সৃষ্টি একটা মূর্খতাময়ী ভ্রান্তিমাত্র; এই ভ্রান্তি-কল্পনাতেই জীব বিবিধ আপদে পিষ্ট হয়। পরন্তু যদি বিচার করিয়া দেখা যায়, তাহা হইলে ইহার নিরোধ-ঘটনা হয়। যথায় জলাবর্ত্ত বর্ত্তমান, মনে হয়—সে স্থান যেন নীলাঞ্জননিভ পেষণ-যন্ত্রে বিচূর্ণ্যমান হয় এবং যথায় জলকম্পন দেখা যায়, তথাকার জল যেন পূর্ণচন্দ্রের করস্পর্শে সমুল্লসিত বলিয়া ধারণা হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে তাহা যেমন ভ্রান্তি বৈ আর কিছুই নয়, তেমনি এই যে সংসার ইহাও ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ব্যতীত কিছুই বলা যায় না। অপিচ শত্রুর দৃষ্টি-পথে পতিত হইলে পুরুষ যেন তাহার নয়নসূত্রে আবদ্ধ হয়, এবং প্রবল পরাক্রান্ত বীর যেন স্বীয় সঙ্কল্প-কল্পিত সৈন্যগণের হস্তে পরাজিত হয়, ফলতঃ এ সকলই যেমন ভ্রান্তির খেলা, তেমনি এই যে সংসারসৃষ্টি, ইহাও ভ্রান্তিমাত্র বৈ আর কি? সুতরাং এই যে বিচার-বিনশ্বর অজ্ঞান-বহুলা সংসারসৃষ্টি, ইহা কল্পিত মন হইতে উদ্ভূত হইয়াও উল্লিখিতরূপে ভ্রান্তি বলিয়াই প্রতিপন্ন; মন মিথ্যাকল্পিত ও কুত্রাপি অনবস্থিত হইলেও তাহারই দ্বারা ইহাকে নিহত করা যাইতে পারে এবং এইরূপ হত্যা হইয়াও থাকে। ফল কথা, উহা মিথ্যা মনের কল্পনায় হয় এবং ঐ কল্পনার অবসানেই বিলয় পাইয়া যায়।

রামচন্দ্র! যে ব্যক্তি এই অসৎ-সমুৎপন্ন মনকে কিছুতেই বশীকৃত করিতে পারে না, সে কখনই উপদেশের যোগ্য পাত্র নহে। কেন না, তথাবিধ জনের মতি বাহ্য বিষয় লইয়াই তন্ময় হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাতে আর অবকাশমাত্র থাকে না। কাজেই মনের নিগ্রহ বিষয়ে তাদৃশ মতি কদাচ যত্ন প্রকাশ করে না; ফল কথা, তাহার প্রত্যক্-প্রবণতা হইতে পারে না। এই কারণেই সে মতি সূক্ষ্মবিচারে সক্ষম নহে। যাহার বিচার-ক্ষমতা থাকে না, তাদৃশ পুরুষ উপদেশবাণীর অযোগ্য। তদীয় মতি সততই শঙ্কান্বিত; এমন কি, বীণাযন্ত্রের অতি সূক্ষ্ম নিক্কণেও সে অতি ভীত-চকিত হইয়া পড়ে এবং নিজ নিদ্রিত

বন্ধুবরের বদনকান্তি-বিলোকনেও ভীতিগ্রস্ত হয়। ফলতঃ তাহার এতদূর সশঙ্ক অবস্থা হইয়া উঠে যে, শত্রু নিকটে নাই, অথচ যদি কেহ চীৎকার করিয়া বলে যে, ঐ শত্রু আসিল, তাহা হইলে সে ঈদৃশ মিথ্যা বাক্যেও ভীতিযুক্ত হইয়া পলায়ন করে। বলা বাহুল্য, তদীয় মোহমগ্ন মতি আপনার মন কর্ত্তৃকই ভয়বিহ্বলতায় অভিভূত হইয়া পড়ে।

হে রঘুনন্দন! ঐ যে মনোজয়ে অপটু পুরুষের দুর্ম্মতির কথা কহিলাম, উহা কিঞ্চিন্মাত্র বিষয়সুখেই বিভোর হইয়া পড়ে এবং হৃদয়গত মিত্র-মন শত্রুর ন্যায় তাহাকে নির্য্যাতিত করিয়া সন্তাপিত করে। বিবেক কাহাকে বলে, ঐ মতি তাহা জানে না; সুতরাং সত্য বস্তু বিদিত হইবার উপায় তাহার নাই। অবশ্য তদবস্থায় তাহা অবগত হওয়াও তাহার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু তথাপি পুরুষ কেন যে বৃথা উল্লিখিত দুর্ম্মতির আক্রমণে মোহমগ্ন হয়, তাহা আমি বুঝি না।

ত্রয়োদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৩ ॥

চতুর্দ্দশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুনাথ! যাহারা সংসার-সাগরের বিষয়-বাসনা-রূপ কল্লোলমালায় আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভাসাইয়া দিয়া মনোজয়, বিবেক ও বৈরাগ্যাদি বিষয়ের অপেক্ষা না রাখিয়া—সাধুজনের সঙ্গলাভেও তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন-প্রার্থনাদি না করিয়া—স্ব স্ব মতির মূকতা বা জড়তা বিধান করে, আমি এ শাস্ত্রে আত্মলাভের উপায়স্বরূপ বিচারবাণী দ্বারা তাদৃশ মানবদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করি না। কেন না, যাহার চক্ষু আছে অথচ অদৃষ্টবৈগুণ্যে কোন কিছুই দেখিতে ইচ্ছা করে না, বল দেখি, কেহ কি তাহাকে বিবিধ কুসুমমঞ্জরী-সমুদ্ভাসিত কাননভূমি দেখাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করে? আরও দেখ, যে জন কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া অনবরত নাসারন্ধ্র যোগে ঘর্ঘর রব উদ্গিরণ করিতেছে, তথাবিধ বিকলেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেই

বা কোন্ মূর্খ সুগন্ধ বস্তুর গুণাগুণ বিচারে আপনার উপদেষ্টৃ-পদে বরিয়া লয়? আর এমন মূর্খই বা কে আছে যে,—যাহার ইন্দ্রিয় সকল শিথিল হইয়াছে এবং অনবরত মদ্যপানে নয়নযুগল ঘূর্ণিত হইতেছে, এ হেন মত্ত ব্যক্তিকে ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্মমীমাংসার সাক্ষিরূপে মানিয়া লইয়া থাকে? কোন্ ভ্রান্তজনই বা শ্মশান-পতিত গলিত শবের সহিত আলাপ পরিচয় করিতে প্রস্তুত হয় এবং কোন্ ব্যক্তিই বা এরূপ আছে যে, আপনার সন্দেহ-স্থলে মূর্খ জনকে জিজ্ঞাসা করিয়া লয়? আর কোন্ অভিজ্ঞ জনই বা মূর্খ ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়া থাকেন?

রামচন্দ্র! যে জন তাহার হৃদয়গুহাগত মূক ও অন্ধ মনো-ভুজঙ্গকে বশীভূত করিতে পারে না, বল দেখি, এ হেন হতমতি মানবকে আমি কিরূপে উপদেশ প্রদান করিব? জানিবে—যাহার নিকট মনের অস্তিত্ব আদৌ নাই, তাহারই প্রকৃত মনোজয় হইয়াছে। দৃষ্টান্ত দেখ, যে প্রস্তরের অস্তিত্ব কোনকালেই নাই, তাহা তো চিরতরে বহুদূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। রঘুনাথ! যাহা চিরদিন অবিদ্যমান, এ হেন মনকে যে জন আপন বুদ্ধিদোষে বশ করিতে অক্ষম, সে প্রকৃত বিষ ভক্ষণ না করিলেও সংসার-বিষে বিবশ হইয়া চিরকালই মৃত হইয়া থাকে। এ দিকে দেখ, সর্ব্বজ্ঞ আত্মা সদাই সন্দর্শন করিতেছেন, প্রাণ প্রভৃতি বায়ু সকল স্পন্দন-ব্যাপারে শক্তিযুক্ত রহিয়াছে এবং ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয় সংগ্রহে ব্যাপৃত আছে। অতএব রামচন্দ্র! ইহা তো স্পষ্টতই দেখিতে পাওয়া যায় যে, মনের কোনই কার্য্য নাই। প্রাণসমূহের স্পন্দনী শক্তি, পরমাত্মার জ্ঞানশক্তি এবং ইন্দ্রিয়বৃন্দের স্ব স্ব বিষয়বোধিনী শক্তি, এই সকল শক্তিরই অস্তিত্ব আছে; পরন্তু বুঝিয়া দেখ, মনের শক্তি কোথাও কোনওরূপ সম্ভব নহে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়, আত্মা, প্রাণ, এই তিনের সম্মিলিত শক্তিই নিখিল ব্যবহারের নিষ্পাদক। সুতরাং 'মন আছে' এ কথা বলিবার ও ভাবিবার আবশ্যক কি? বস্তুতঃ সমস্ত শক্তিই সেই সর্ব্বশক্তিযুক্ত পরমাত্মার অংশ-বিশেষ বৈ আর কিছুই নয়; সুতরাং তোমার আর মনঃপ্রভৃতি শব্দে বাহ্য-বিষয়ের স্বতন্ত্র জ্ঞান সমুত্থিত হয় কেন? ভাবিও না যে, মন নাই তো, না থাকুক, জীব তো রহিয়াছে? বস্তুতঃ বিবেকী জনের দৃষ্টিতে তাহাও নাই।

এ জগৎ যাহাতে অঙ্গীকৃত হইয়াছে, সেই জীবাখ্য বস্তু কাহাকে বলা যায়? জানিবে—তাহা আত্মাতিরিক্ত নহে এবং আরও জানিয়া রাখিবে যে, চিত্ত নামে কোনই বস্তু নাই; কাজেই তদীয় শক্তির সম্ভাবনা হইবে কিরূপে?

রামচন্দ্র! স্ব-কল্পিত মন যাহাদের পরমার্থদৃষ্টি দগ্ধ করিয়াছে, সেই সকল মূঢ় মানবের দুঃখ-পরম্পরা দর্শনে মদীয় মতি কারণ্যপূর্ণ হইয়া মুগ্ধ অবলাজনের ন্যায় অনবরত পরিতাপানলে জ্বালা ভোগ করে। দেখিতেছি এ সংসারে মূর্খ লোকেরা পরিতপ্ত হইতেছে; কিন্তু তাহারা বুঝে না, এ সংসারে তাহাদের খেদ কি? বা সে খেদ তাহাদের কিসের জন্য ও কিরূপ? আমি মনে করি, তাহাদের সে খেদ বৃথা; কেন না, তাহারা ত এ সংসারে গর্দ্দভের ন্যায় কেবল দুঃখভার বহিবার জন্যই আসিয়াছে। দেহাত্মবাদীরা প্রকৃত আত্মোন্নতি করিতে পারে না, তাহারা কেবল পাপাচরণেই নিরত থাকে। এই অবস্থায় সাগরের বুদ্বুদাবলীর ন্যায় বিলয় পাইবার জন্যই বারবার তাহাদের জন্ম হয়।

রঘুনাথ! দেখিতে পাও না কি, প্রতি দেশে প্রতিদিন কত শত গৃহস্থ সূনাব্যাপারে কত শত শত প্রাণীর হত্যা সাধন করিতেছে? এ বিষয়ে কাহারও কোন পরিদেবনা আছে কি? মর্ত্ত্যে কত অসংখ্য জীব জন্ম লয়, পবন তাহাদের মধ্য হইতে প্রত্যহ কত সহস্র সহস্র দংশ-মশকাদি জীব-নিবহের নিধন করিতেছে; এই নিধন কার্য্যে কেহ কি কোথাও দুঃখ প্রকাশ করে? গিরীন্দ্রকুলের কন্দরে কন্দরে এবং তত্রত্য বনে বনে বিচরণ করিয়া পুলিন্দপ্রভৃতি ব্যাধজাতীয় লোকেরা প্রত্যহ কত লক্ষ লক্ষ মৃগ নিহত করিতেছে, এই নিধন কার্য্যে কি কাহারও কোন দুঃখ আছে? অন্য দিকে দেখ, জল মধ্যে কত অসংখ্য প্রাণী বিচরণ করে; তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা প্রবল, তাহারা কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলচরকে প্রতিদিন নির্দ্দয়ভাবে গ্রাস করিয়া থাকে। কে বল, তাহাদের জন্য পরিদেবনা করে? মক্ষিকা ক্ষুধাতুর হইয়া অণুকণার ন্যায় সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম লিক্ষাদিগকে ভক্ষণ করে, ক্ষুধিত কোশকার কীট আবার ঐ মক্ষিকাকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ঐ কীট আবার দংশ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। দংশ ভেকের হস্তে নিহত হইয়া থাকে। ভেক সর্প কর্ত্তৃক কবলিত হয়। গরুড়াদি বিহঙ্গম ও

নকুলাদি বন্য জন্তুগণ আবার ঐ ভীষণ সর্পকে বিনষ্ট করিয়া থাকে। নকুল মার্জ্জার-কবলে পতিত হয়। মার্জ্জার কুক্কুর কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইয়া থাকে। কুক্কুর আবার ভল্লুকের করে ভবলীলার অবসান করে। ভল্লুক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হয়। সিংহ ব্যাঘ্রকে সংহার করিয়া থাকে। সিংহ শরভ কর্ত্তৃক কবলিত হয়। সেই শরভ আবার মেঘ লঙ্ঘন করিতে গিয়া শিলা-তলপতনে নিষ্পিষ্ট হইয়া থাকে। শরভমৃত্যুর মূলীভূত মেঘবৃন্দও পবন-তাড়নায় অপসারিত হয়। পবনবেগ পর্ব্বতে প্রতিহত হইয়া থাকে। ইন্দ্রের অশনি প্রহারে পর্ব্বতবৃন্দ চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যায়। ঐ অশনিকেও ইন্দ্রেরই অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। ইন্দ্রও আবার ভগবান্ বিষ্ণু কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছেন। বিষ্ণু নিখিল জন্তুর শরীরী হইয়া বাস করেন; সুতরাং তাঁহাকেও জরা-মরণময়ী সুখ-দুঃখ-সমাকুলা জীব-দশা ভোগ করিতে হয়।

রঘুবর! এই সকল জীব মহাকায় ও বিদ্যারূপ আয়ুধধারী হইলেও মশকাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিপুঞ্জ ইহাদের দেহেই আশ্রয় লইয়া জীবনধারণ করে। এইরূপে নিখিল প্রাণীই আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক ও আধিদৈবিক ভেদে ত্রিবিধ দুঃখে অজস্র বিহত ও বিশীর্ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে মোহক্রমে ভক্ষণ করিতেছে এবং ভাবী কালে ভক্ষণ করিবার জন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিতেছে। দেখিতেছ না কি, অনবরত অগণিত ভূতবৃন্দ বিনাশ-দশায় উপনীত হইতেছে? আবার দেখ, অনবরত অসংখ্য লিক্ষা, যূকা ও পিপীলিকা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণিপুঞ্জ প্রাদুর্ভূত হইতেছে। জলাশয়-সমূহে মৎস্য-মকরাদি জীবজাতি জন্মিতেছে এবং ভূগর্ভে বৃশ্চিকাদি কীট-কুল জন্ম লইতেছে। এই ভাবে আকাশে আকাশবিহারী জীবগণ জন্মি-তেছে, বনে বনে সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুবর্গ উৎপন্ন হইতেছে, প্রাণিগণের দেহ মধ্যেও কৃমিকীটাদি কত কত জীব জন্ম গ্রহণ করিতেছে! দিকে দিকে, কত স্থাবর বস্তুর অভ্যন্তরে, কত শত শত শিলান্তরে এবং অন্যান্য নানাস্থানে ঘুণাদি অসংখ্য কাষ্ঠকীট উৎপন্ন হইতেছে। এমন কি, অতি অপবিত্র বিষ্ঠারাশির অভ্যন্তরেও নানা কীট উদ্ভূত হইতেছে। এইরূপে কত অসংখ্য অসংখ্য জন্ম হইতেছে এবং অপচয় ঘটিতেছে। এই সকল দেখিয়া

শুনিয়া লোকসকল করুণাপরবশ-ভাবে অজস্র রোদনই করিতে থাকুক অথবা আনন্দিতই হউক, সকলই বিফল বলিয়া গণ্য। এই সংসারসম্ভ্রমে সততই মৃত্যু ঘটিতেছে এবং সততই উৎপত্তি হইতেছে, ইহাতে কাহারই তুষ্টি বা অতুষ্টি কিছুই করা কর্ত্তব্য নহে। যেমন তরু, পত্র ও লতাদি উৎপন্ন হইতেছে ও বারবার বিচ্যুত হইতেছে, তেমনি এই জীবজাতি প্রতিনিয়ত নানা যোনিতে নানাকারে জন্ম লইতেছে; জন্মিয়া কেহই দীর্ঘ দিন থাকিতে পারিতেছে না, অচিরেই আবার মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছে। যিনি করুণাক্রান্ত হইয়া কুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের দুঃখাপনয়নে বৃথা প্রয়াস স্বীকার করেন, ক্ষুদ্র-পরিসর ছত্রের সহায়তায় অসীম আকাশের আতপ-নিবারণে প্রয়াসী ব্যক্তির ন্যায় বৃথাই তাঁহাকে দুর্ভোগ ভুগিতে হয়।

রামচন্দ্র! এ সংসারে যাহারা তির্য্যগ্জাতির তুল্যধর্ম্মী নর, তাহাদিগকে উপদেশ প্রদান করিতে নাই; বল দেখি বনমধ্যে স্থাণুর নিকটে যদি কোন কথা কহা যায়, তবে তাহাতে কোন প্রয়োজন বা ফল ফলে কি? যে সকল ব্যক্তি বিষয়াসক্ত হইয়া বাস করিতেছে, তাহারা এবং বনবিহারী পশুপাল, ইহাদের মধ্যে পার্থক্য বড় একটা দেখি না। পশুপাল রজ্জুবন্ধনে আকৃষ্ট হয় এবং যাহারা মূঢ় নর, তাহাদিগকে তাহাদের বিবশ চিত্তই আকর্ষণ করিতে থাকে। মূঢ় লোকেরা আপনার চিত্তপঙ্কে সদাই মগ্ন হইয়া রহে। তাহারা যে কোন কর্ম্ম করুক, তৎসমস্তই তাহাদের ধ্বংসের কারণ হয়; সুতরাং মূর্খদিগের তাদৃশ দুঃখদশা দেখিয়া অচেতন পাষাণেরাও যে অশ্রু বর্ষণ করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

হে রঘুশ্রেষ্ঠ! যাহারা আত্মা এবং চিত্ত জয় করিতে পারে না, তাহাদের দুঃখদশা কোথায় না ঘটিয়া থাকে? অতএব লোকে যেমন নিখিল ভূতলের ধূলিজাল নিরাকৃত করিতে পারগ হয় না, তেমনি তাহাদেরও দুঃখ দূর করিতে কোন মহাপুরুষই সহজে পারিয়া উঠেন না; পরন্তু হে রঘুনন্দন! আত্মা এবং চিত্ত যাহাদের নির্জ্জিত হইয়াছে, তাহাদের সর্ব্ব দুঃখই অনায়াসে অপনীত করা যায়; সুতরাং এ ক্ষেত্রে জ্ঞানী মাত্রেরই প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়।

হে মহাভুজ! মন আদৌ নাই; উহার অলীক কল্পনা তুমি করিও না;

আর যদিই এমন বৃথা মনঃকল্পনা কর, তাহা হইলে ঐ কল্পিত মনই বেতালবৎ তোমাকেই নিহত করিবে। যত কাল তুমি মূঢ়ভাবে আত্মতত্ত্ব ভুলিয়া রহিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত তোমার হৃদয় মধ্যে মনোরূপ ক্রূর জন্তু উপদ্রব করিতে থাকিবে। হে অরাতিঘাতন ! তুমি অধুনা প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয় বিদিত হইয়াছ ; সুতরাং চিত্তকে তুমি দূরে পরিহার কর। জানিবে,—স্বীয় সঙ্কল্প হইতেই উহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তুমি যদি এই দৃশ্য বিশ্বকে আশ্রয় করিয়া থাক, তাহা হইলেই চিত্তবান্ হইবে এবং চিত্তবান্ হইলেই বন্ধবান্ হইতে হইবে ; আর এই দৃশ্যকে যদি বিসর্জ্জন করিতে পার, তাহা হইলে তুমি অচিত্ত হইবে এবং অচিত্ত হইলেই মোক্ষভাগী হইতে পারিবে। দেখ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সমাহার বন্ধনের জন্যই আশ্রিত হইয়া থাকে। তুমি মোক্ষ লাভের নিমিত্ত উহাদিগকে ত্যাগ কর, অথবা তোমার যেরূপ ইচ্ছা, করিতে পার। আমি নাই বা কোন বাহ্য দৃশ্যও নাই, এইরূপে ধ্যান করিয়া তুমি অচলের ন্যায় অচলভাবে অবস্থান করিতে থাক। এইরূপ ভাবে থাকিলে, তুমি স্বীয় হৃদয় মধ্যে সেই আকাশবৎ অনন্তাকার আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে।

রামচন্দ্র ! আত্মা এবং জগৎ এই দ্বিত্বময়ী কলনাকে তুমি সর্ব্বথা পরিহার করিয়া সুস্থিরভাবে চরম পদে অবস্থান কর। বলিতে পার, উক্ত উভয় কলনা পরিত্যাগ করিলে এমন কি অবশিষ্ট থাকে, যাহাতে আমি অবস্থিতি করিবার জন্য উপদিষ্ট হইতে পারি ? এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, দ্রষ্টৃ, দৃশ্য ও দর্শন এই তিনের অন্তরালে যিনি সন্মাত্র সাক্ষিরূপে অবস্থিত, তুমি সেই আত্মাকে সর্ব্বদা ভাবনা করত বিরাজমান হও। স্বাদ্য নাই, স্বাদকও নাই, স্বাদ্য-স্বাদকের মধ্যবর্ত্তী স্বাদকেই তুমি কেবল প্রতিনিয়ত ধ্যান করত আত্মময় হও। হে রাম ! যাহা অনুভবনীয় ও অনুভাবকেরও নিরালম্ব মধ্যাংশ, তাহাকে তুমি হৃদয় মধ্যে অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান কর। যাহাতে ভবভাবনা নাই, যাহা ভাবাভাব-দশা-বিরহিত, ঈদৃশ আত্মাকে তুমি আত্মসংস্থ হইয়া ভাবনা করত স্বয়ং আত্মস্বরূপ হও। যৎকালে তুমি আত্মসত্তা ভুলিয়া গিয়া এই দৃশ্য বিশ্বের ভাবনায় বিভোর হইয়া পড়িবে, তখন সেই অতি দুঃখদায়িনী চিত্ততা আসিয়া তোমায় আশ্রয় করিবে।

হে মহাভুজ! এই জন্যই তোমায় বলিতেছি, তুমি আত্মস্বরূপতার জ্ঞানযুক্তি-বলে এই চিত্ততারূপিণী শৃঙ্খলাকে ভাঙ্গিয়া ফেলো এবং চিত্তরূপ মহাবিল হইতে আত্মরূপ সিংহকে মোচন করিয়া দাও। যখন তুমি পরমাত্মদশা পরিহারপূর্ব্বক সংসারদশায় উপনীত হইয়া সঙ্কল্পের আশ্রয় লইবে, তখন এই সংসার ব্যতীত আর কিছুই তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইবে না। হে রাম! চিৎশক্তি যখন আত্মা হইতে পৃথক্ হইয়া চিত্ততা লাভ করে, তখনই পুনঃ-পুন মননক্রমে দ্রেঢ়ীভূত হইয়া মন উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর যদি তথাবিধ পার্থক্য জ্ঞান পরিত্যক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ দুঃখময় মন ক্ষয় পাইয়া যায়। এই নিখিল জগৎ আত্মাই; তদ্ব্যতিরিক্ত কিছুই নাই, অন্তরে যখন এইরূপ জ্ঞানের উদয় হয়, তখন চেতিতা, চিত্ত, চে[illegible] চেতন, কোথাও কিছুই থাকে না। আত্মা আমি, অনুভূয়মান দেহেন্দ্রিয়শালী জীব আমি, এই প্রকার জ্ঞানই চিত্তনামে নিরূপিত। হে রাঘব! উল্লিখিত চিত্তই অনাদি অনন্ত দুঃখ বিস্তার করে। আত্মাই আমি, জীবাখ্য ইতর সত্তা কদাচ কিছুই নাই, এইরূপ জ্ঞানে চিত্তের যে উপশম ঘটে, তাহাই পরম সুখ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

হে রাঘব! এই সমস্ত জগৎ আত্মব্যতিরিক্ত কিছুই নাই, এইরূপ নিশ্চয় যখন হয়, তখনই চিত্তের অসত্তা ঘটিয়া থাকে; এই ব্যাপারে সংশয় কিছুই নাই। এই যে কিছু দৃশ্য সমস্তই আত্মা, এইরূপ সত্যাববোধ যখন দৃঢ়ীকৃত হয়, জানিবে—তখন সৌর করে তিমিরের ন্যায় মন বিগলিত হইয়া যায়। যত দিন এই মনোরূপ সর্প দেহাভ্যন্তরে অবস্থান করিবে, ততদিন মহাভয়েরই সম্ভাবনা, আর যখন যোগপ্রভাবে উহা উৎসারিত হইয়া যাইবে, তখন আর সে ভয়ের অবসর কোথায়? বাস্তবিক তখন আর কোন ভয়েরই সম্ভাবনা থাকে না।

হে অনঘ! তোমার হৃদয়ে অতি বড় একটা বেতাল বাস করিতেছে, ঐ বেতাল ভ্রান্তিমাত্রেই সমুত্থিত। তুমি তত্ত্বজ্ঞানরূপ মন্ত্রের প্রভাবে যত সত্বর পার, উহাকে পরাভূত করিয়া ফেলো। তোমার দেহগৃহ হইতে যদি সেই অতি প্রবল চিত্তযক্ষ চলিয়া যায়, তাহা হইলে আর কখন কোন আধিই তোমাকে আশ্রয় করিবে না। তুমি নিরুদ্বেগ হইবে,

তোমার কোন ভয়ই থাকিবে না; তুমি নিরাপদে অবস্থান করিতে পারিবে।

রামচন্দ্র! যখন দেখিবে—তুমি নীরোগ হইয়াছ, বাহ্য সুখসাধন কর্ম্মোপার্জ্জনে তোমার প্রবৃত্তি নাই, তখন তথাবিধ অবস্থাতেই বুঝিবে—তোমার চিত্তসত্তা গলিত হইয়াছে এবং তুমি নিরাময় পরম পদ প্রাপ্ত হইয়াছ। তৎকালে তোমার অন্তর হইতে পরম পদ পাইবার বাসনারও বিরাম ঘটিবে; তুমি নিজেই আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইবে।

চতুর্দ্দশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

পঞ্চদশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন—রঘুরাজ! যাহা সংসারবীজের কণিকা ও জীব-কুলের বন্ধনবাগুরা, আত্মা যখন তথাবিধ অপাবনী চিত্ত-সত্তার অনুসরণ করেন, তখন তিনি নিজস্বরূপ পরিহার করিয়া অবিদ্যাবৃত অতি মলিন জ্ঞান উপগত হয়েন এবং চিত্ত-পরি-কল্পিত দেহ প্রভৃতিতে অহম্ভাব স্থাপন-পূর্ব্বক চিত্তস্থিত রাগ-দ্বেষাদি মলিনিমায় মালিন্যসম্পন্ন হইয়া উঠেন। এই জন্যই ভয়জননী বিষবল্লীরূপিণী তৃষ্ণা আসিয়া তখন তাঁহার প্রবলতর মহামোহের বৃদ্ধি বিধান করে—এমন কি, মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত আনয়ন করিয়া থাকে। বর্ষার তিমিরময়ী যামিনী যেমন অনন্ত আকাশে মেঘ, বিদ্যুত ও বৃষ্টি প্রভৃতি বিবিধ বিকারময়ী হয়, তেমনি ঐ মলিনা তৃষ্ণা যখন যখন সমুদিত হয়, তখন তখনই অনন্ত আত্মায় অশেষ বিকারে স্ফুরিত হইয়া মহামোহের সৃষ্টি করিতে থাকে। দেখ, হরিহরাদি সুরগণ প্রলয়ের প্রচণ্ড পাবকশিখার প্রখরতাপও সহ্য করিতে পারেন, কিন্তু ঐ তৃষ্ণারূপিণী অনলশিখার দারুণ দাহ-যন্ত্রণা সহ্য করিবার শক্তি কুত্রাপি কাহারও নাই। ঐ তৃষ্ণা যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণ তীক্ষ্ণ কৃপাণধারা, ইহা আপাতত শীতল হইলেও পরিণামে অতি দুঃখকরী হইয়া আপন আশ্রয়কেই কর্ত্তন করিয়া থাকে।

হে রাঘব! এ সংসারে যাহা কিছু দুরন্ত দুর্জ্জয় দুঃখ দেখা যায়, তৎসমস্তই তৃষ্ণাবল্লীর ভীষণ ফল ভিন্ন অন্য কিছুই নয়। এই [illegible] রূপিণী বনকুক্কুরী নরগণের মনোময় বিলে বাস করিয়া অনু[illegible] অস্থি ও শোণিত প্রভৃতি অজস্র ভক্ষণ করিতেছে। বর্ষাকালের [illegible] ন্যায় ঐ তৃষ্ণা কখন উল্লসিত, কখন শূন্যতায় উপনীত এবং কখন কখন বা কঙ্কর-কণ্টকময় অরণ্যদেশে লইয়া গিয়া দলিত ও চূর্ণিত করে। তৃষ্ণার আক্রমণে মানব দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, অন্তঃসার-শূন্য হয় এবং একান্ত দীনদশায় উপগত হইয়া থাকে। সে, সেই অবস্থায় নীচতা প্রাপ্ত হয়, কখন কখন ক্রন্দন করে এবং কখন কখন মুগ্ধ হইয়া পতিত হইয়া থাকে। যদীয় হৃদয়-কোটরে তৃষ্ণারূপিণী কৃষ্ণা সর্পী বাস করে না, তাহারই হৃদয়স্থ প্রাণ প্রভৃতি মারুতগণ সুস্থ হইয়া থাকে। যথায় তৃষ্ণারূপিণী কৃষ্ণপক্ষীয় রজনীর অবসান ঘটিয়াছে, তথায় শুক্লপক্ষীয় শশিকলার ন্যায় পুণ্যপুঞ্জ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। যে পুরুষ-পাদপ তৃষ্ণাঘুণে বিক্ষত হয় নাই, পুণ্যরূপ প্রসূনপুঞ্জে সদাই সে প্রফুল্ল হইয়া থাকে। যাহাদের বিবেকলেশ নাই, তথাবিধ মানবগণেরই চিত্তরূপ কাননের মধ্য দিয়া তৃষ্ণাতটিনী প্রবাহিত হয়। ঐ তৃষ্ণাতটিনী অপার অনন্ত ভবভাবময় তরঙ্গভঙ্গিমায় ভীষণ এবং বিবর্ত্ত-আবর্ত্তে সমাকুল। সূত্র-যন্ত্রিত পক্ষিণীর ন্যায় তৃষ্ণা আপনা আপনিই ঘুরিতেছে, অন্যান্যকে ঘুরাইতেছে, জীর্ণ শীর্ণ করিয়া তুলিতেছে ও বারবার বিনাশদশায় উপনীত করিতেছে। তৃষ্ণা কঠিন আশয়ে কর্কশ হইয়া কুঠারধারার ন্যায় নিপতিত হয় এবং ধর্ম্মজ্ঞানের দয়া-বিবেকাদি ঈষদঙ্কুরিত মূলগুলিকে কর্ত্তন করিয়া থাকে। হরিণ যেমন কূপসমীপস্থ তৃণশাখার লালসায় ছুটিয়া গিয়া কূপমধ্যে পড়িয়া যায়, মূঢ় জন তেমনি তৃষ্ণার অনু-ধাবন করিয়া নরকরূপ অন্ধকূপে নিপতিত হইয়া থাকে।

হে রাঘব! হৃদয়ে তৃষ্ণাপিশাচী বাস করে; ঐ পিশাচী ক্ষীণ হইয়াও মানুষকে যেমন অন্ধ করিয়া ফেলে, অতি জর্জ্জর জরার আক্রমণেও চক্ষু সেরূপ বিকল হয় না। মনে করিয়া দেখ, এই অমঙ্গলকরী তৃষ্ণা-পিশাচিকা একদা ভগবান্ বিষ্ণুর হৃদয়ে আশ্রয় লইয়াছিল, তাই তিনি বামনরূপ ধরিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ঐ দেখ, কোন একটা অনির্ব্বচনীয়

স্বর্গীয় সুখ-তৃষ্ণাই প্রতিদিন ঐ দিবাকর দেবকে আকাশপথে ভ্রমণ করাই-তেছে। অতএব এই যে সর্ব্ব দুঃখজননী যাবতীয় জীবজগতের সংহারিণী তৃষ্ণা, ইহাকে ক্রূরস্বভাবা উরগীর ন্যায় মনে করিয়া বহু দূরে পরিহার করাই কর্ত্তব্য। এই দেখ, এই সকল বায়ু তৃষ্ণাবেগেই বহিতেছে, শৈলকুল তৃষ্ণাভরেই দাঁড়াইয়া আছে, ভূতধাত্রী ধরিত্রী তৃষ্ণাকুল হইয়াই ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছে, অধিক কি, সমগ্র লোকযাত্রাই তৃষ্ণারূপ কঠিন চর্ম্ম-রজ্জু দ্বারা গ্রথিত রহিয়াছে। লোক রজ্জুবদ্ধ হইয়া রহিলেও কালক্রমে বন্ধনমুক্ত হইতে পারে, কিন্তু তৃষ্ণারূপ বন্ধনে লোকে যদি একবার বদ্ধ হয়, তাহা হইলে সে বন্ধন হইতে তাহার মুক্তিলাভ বড়ই কঠিন হইয়া উঠে। তাই বলিতেছি, হে রাঘব! তুমি সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্ব্বক তৃষ্ণাকে বিদূরিত কর। যুক্তিবলে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, মন যদি সঙ্কল্পশূন্য হয়, তাহা হইলে সে কখনই তিষ্ঠিতে পারে না।

হে মহাবাহো! প্রথমতঃ 'এই দেহ' 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি তমোময়ী দুরাশাকে তুমি কখনই হৃদয়ে কল্পনা করিবে না। অর্থাৎ উল্লিখিত নিখিল দুরাশা নিমিত্ত অভিমানকে কদাচ তুমি আশ্রয় করিও না। কেন না, এই প্রকার অভিমান হইতেই মনের আবির্ভাব হয়। হে রাম! অনাত্মায় যে আত্মভাবনা, তাহাই দুঃখের উৎপাদিকা; তুমি যদি তাদৃশ ভাবনার প্রশ্রয় প্রদান না কর, অর্থাৎ অনাত্মায় আত্মভাবনা না কর, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞজনমধ্যে তোমার নাম উল্লেখ্য হইতে পারে। অতএব তোমায় আবার বলি, তুমি এই অহম্ভাবময়ী অপাবনী তৃষ্ণাকে অনহম্ভাবময়ী কর্ত্তরী দ্বারা ছেদন করিয়া ফেলো; তোমার নিখিল ভবভীতি অপগত হউক। হে ভব্য! তুমি ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ কর।

পঞ্চদশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! আপনি যে আমায় অহম্ভাবময়ী তৃষ্ণাকে আশ্রয় দিয়া রাখিতে নিষেধ করিলেন, এই জন্য আপনার বাক্য অধুনা আমার নিকট স্বভাবতই গম্ভীর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। পরন্তু হে প্রভো! যদি এই অহম্ভাব আমি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে ইহার সঙ্গে সঙ্গে তো এই অহঙ্কারনিলয় দেহকেও আমার পরিত্যাগ করিতে হয়। কেন না, জাম্বুবৎ বিপুল মূলদেশ যেমন বৃহৎ পাদপকে ধারণ করিয়া থাকে, তেমনি অহঙ্কারের আশ্রয়েই এই দেহ অবস্থিত রহিয়াছে। সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই বুঝা যায় যে, যদি অহঙ্কারের ক্ষয় হয়, তাহা হইলে এই দেহও অবশ্যই বিনাশপথে উপনীত হইবে। বুঝিয়া দেখুন, যদি ক্রকচ দিয়া মূলোচ্ছেদ করা হয়, তাহা হইলেই অতি বড় বৃক্ষও বিনষ্ট হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে মুনে! আমি ইহাকে কেমন করিয়া ত্যাগ করিব এবং ত্যাগ করিয়াই বা কিরূপে জীবন ধারণ করিব? হে বাগ্মিবর! আমার এই সন্দিগ্ধ বিষয় আপনি বিশেষরূপ বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন, হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তত্ত্বজ্ঞগণ বাসনাত্যাগকে সর্ব্বত্রই জ্ঞেয় ও ধ্যেয় এই দ্বিবিধ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে 'আমি এই সকল পদার্থের, ইহারা আমার, ইহা আমার জীবন, এ সকল ব্যতীত আমি কেহই নহি এবং আমা বিনাও ইহারা কেহই নহে।' অন্তরে এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পরে যখন মনের সহিত বিচার করত 'আমি কাহারও নহি, আমারও কেহ নহে' এই প্রকার দৃঢ় ভাবনা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং তাদৃশ ভাবনানুসারে শমশীতল বুদ্ধি দ্বারা ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হয়, তখনই বুঝিতে হইবে যে, তোমার 'ধ্যেয়' সংজ্ঞক দ্বিতীয় বাসনাত্যাগ সিদ্ধ হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন 'এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম' এইরূপ অবধারণ করিয়া জীব

যখন স্বীয় প্রারব্ধের ক্ষয় নিবন্ধন নির্ম্মম হইয়া দেহ ত্যাগ করে, জানিবে—তখনই 'জ্ঞেয়' নামক দ্বিতীয় বাসনাক্ষয় সিদ্ধ হইল। যিনি পূর্ব্বোল্লিখিত অহম্ভাবময়ী 'ধ্যেয়' বাসনাকে বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তিনিই জীবন্মুক্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন।

হে রঘুনন্দন! যিনি কলনাময়ী বাসনাকে সমূলে বিসর্জ্জন দিয়া অন্তরে শান্তিসুখ লাভ করেন, তাঁহাকেই 'জ্ঞেয়' বাসনাত্যাগী মুক্ত পুরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়। জনকাদি সাধুচেতা মহাত্মগণ পূর্ব্বোক্ত 'ধ্যেয়' বাসনাকে হেলাক্রমে পরিত্যাগ করিয়া জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক মহাপুরুষ আছেন, যাঁহারা 'জ্ঞেয়' বাসনাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্তরে অপার শান্তি লাভ করিয়া পরব্রহ্মে অবস্থান করিতেছেন। হে রাঘব! এই দ্বিবিধ বাসনার বিসর্জ্জনই তুল্যাকারে মুক্তির কারণ হয় এবং ঐ দ্বিবিধ বাসনা-বিসর্জ্জনকারী পুরুষেরাই জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত যুক্ত ও অযুক্ত মতিসম্পন্ন উভয় সম্প্রদায়ের সাধু পুরুষেরাই কেবল অবিদ্যা সম্পর্কশূন্য নির্ম্মল ব্রহ্মে বিরাজ করিয়া থাকেন। উঁহাদের মধ্যে প্রথমোক্ত যুক্তমতি ব্যক্তি উজ্জ্বলদেহে অবস্থান করেন এবং দ্বিতীয় অযুক্তমতি ব্যক্তি শান্তিময় দেহে বিরাজ করিতে থাকেন। যিনি ধ্যেয় বাসনা পরিহার করেন, তিনি শোক-রোগাদির অপরামৃষ্ট হইয়া সদেহ অবস্থাতেই মুক্ত হইয়া থাকেন আর যাঁহার জ্ঞেয় বাসনা নাই, তিনি দেহ ত্যাগের পর বিমুক্ত হইয়া থাকেন। যিনি যথাকালোপনত সুখে কিম্বা দুঃখে আনন্দ বা ক্লেশানুভব করেন না, তিনিই মুক্ত পুরুষ নামে অভিহিত। প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় বস্তুতে যাঁহার স্পৃহা বা দ্বেষ নাই, যিনি অনাসক্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তাঁহাকেও মুক্ত পুরুষ নামে নির্দ্দেশ করা হয়। 'আমি এই দেহে আছি, এই দেহ সম্বন্ধে আমার হেয় এবং উপাদেয়বুদ্ধি আছে,' এই জ্ঞান যাঁহার অন্তর হইতে বিলুপ্ত হইয়া যায়, তিনিই জীবন্মুক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, ক্রোধ, কাম ও কার্পণ্যদৃষ্টি, এই সকল যাঁহার হৃদয়কে কদাচ স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না, তিনি জীবন্মুক্ত আখ্যা ধারণ করিয়া থাকেন। সুষুপ্ত ব্যক্তির চিত্তবৃত্তির ন্যায়

যদীয় অন্তঃকরণবৃত্তির কিছু মাত্র ক্রিয়া থাকে না, যিনি আপন অন্তরে সদাই জাগ্রত থাকেন, এবং পরিপূর্ণ কলানিধির ন্যায় নৈসর্গিক হর্ষোদয়ে যদীয় হৃদয়ে সদাই চিত্তপ্রসাদ অনুভূত হয়, এ সংসারে তাদৃশ পুরুষই মুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট।

বাল্মীকি কহিলেন,—ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এই সকল কথা কহিলে দিবা অবসান হইল। সায়ংকালীন বিধি সমাধার জন্য দিনমণি অস্তমিত হইলেন। সভ্যমণ্ডলী পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিয়া সায়ংস্নান সম্পাদন করিবার জন্য সভা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইল। পরে যথাকালে রাত্রি প্রভাত হইবামাত্র দিনকর-কিরণপাতের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যবৃন্দ আসিয়া সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন।

ষোড়শ সর্গ সমাপ্ত॥ ১৬॥

সপ্তদশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! পূর্ব্বে যে দ্বিবিধ মুক্ত পুরুষের কথা কহিয়াছি, তন্মধ্যে যাঁহারা বিদেহমুক্ত, তাঁহাদের অবস্থা বাক্যাতীত। বিশদ কথা এই যে, বিদেহমুক্ত ব্যক্তিগণ সতত একরূপ, একরস, নিরতিশয় স্বপ্রকাশ এবং ভূমানন্দমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া থাকেন। তাঁহাদের গুণগুণি-ভাব থাকে না; সুতরাং তথাবিধ মুক্ত অবস্থা বর্ণনা করা অসাধ্য; অতএব অধুনা তুমি সদেহ বা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের অবস্থার বিষয় শ্রবণ কর। যাহাতে বাসনার লেশ নাই, এ হেন যাদৃশ তৃষ্ণা জীবকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপযোগী কর্ম্মমাত্র করাইয়া থাকে, তথাবিধ তৃষ্ণাই জীবন্মুক্তের অবস্থা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যে তৃষ্ণা জীবকে সংসারের সত্যতাবোধে সংসারভোগের জন্য সমুৎসাহিত করিয়া বাহ্য বিষয়ে আসক্ত করাইয়া থাকে, সম্যক্‌দর্শী সাধুগণ বলেন, তাদৃশ তৃষ্ণাব্যাপারই বন্ধন এবং সেই বন্ধনই সুদৃঢ় সংসার-

শৃঙ্খল। তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলা যায় যে, জীবন্মুক্ত ব্যক্তির হৃদয়ে যে তৃষ্ণার উদয় হয়, তাহাতে ভোগসঙ্কল্প থাকে না, তাহা কেবল লৌকিক প্রয়োজন সম্পাদন করিবার জন্যই বাহিরে বিহার করিতে থাকে।

হে রাঘব! বাহ্য বিষয়ের অনুরাগভরে যে তৃষ্ণা বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহাকে 'বদ্ধা' নামে অভিহিত করা হয়; আর যাহার প্রভাবে যাবতীয় বিষয়ানুরাগ বিলয় পাইয়া যায়, এবং যাহা ত্রিকালসিদ্ধ ও দুঃখসম্পর্ক হইতে বিচ্যুত, বিবুধগণ তাদৃশ তৃষ্ণাকে 'মুক্তা' নামে নির্দ্দেশ করেন। হে প্রশস্তমতে! 'ইহা আমার হউক' এইরূপ যে আন্তরিক ভাবনা, জানিবে—তাহাই ভববন্ধনের শৃঙ্খলরূপিণী তৃষ্ণা এবং তাহারই নাম কলনা বা কল্পনা। উদারমতি পুরুষ কি সৎ, কি অসৎ, সকল ভাবে সর্ব্বদাই ঐ ভাবনাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। রাম: তুমি বন্ধনাশা, মোচনাশা, 'সমস্ত সুখ-দুঃখ-দশা ও যাবতীয় সৎ ও অসদাশা পরিত্যাগ করিয়া অক্ষুব্ধ অব্ধির ন্যায় স্থির ও গম্ভীরভাবে অবস্থান কর। হে মতিমান্‌গণের অগ্রণী! তুমি আত্মাকে অজর ও অমররূপে বুঝিতে পারিয়া বৃথা জরামরণের আশঙ্কায় আপন মন কলুষিত করিও না।

হে রাম! এই দৃশ্যমান পদার্থভিত্ত তোমার নয়; তুমিও কাহারও নও। তুমিই পরমার্থ সত্য; তোমা ভিন্ন অন্য সমস্তই তুচ্ছ বৈ আর কিছুই নহে। এই অসদুৎপন্ন বিশ্ব অসৎ হইয়াও সতের ন্যায় অবস্থিত; তুমি যদি এই সকল অবগত হইয়া দৃশ্যাতীত হও, তাহা হইলে আর তৃষ্ণার সম্ভব হইবে কিরূপে? আর এক কথা, পুরুষ যখন বিচারে প্রবৃত্ত হয়, তখন তাহার সুবিস্তৃত চতুর্ব্বিধ সিদ্ধান্ত সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই আপাদ-মস্তক শরীরময় আমি; এই আমি পিতা ও মাতা কর্ত্তৃকই উৎপাদিত হইয়াছি। এই প্রকার প্রাথমিক নিশ্চয় অতত্ত্বদর্শীদিগের বন্ধনের নিমিত্ত হয়। যত কিছু ভাব পদার্থ আছে, আমি সে সকল হইতে অতীত ও কেশের অগ্রভাগ অপেক্ষাও আমার সূক্ষ্মত্ব সুনিশ্চিত; এইরূপ যে দ্বিতীয় নিশ্চয়, তাহা সাধুগণের মোক্ষের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন জাগতিক সমস্ত দৃশ্য পদার্থই আমি, এই প্রকার তৃতীয় নিশ্চয়ও মোক্ষের নিমিত্ত হয়। আমি বা জগৎ সকলই শূন্য, এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়েই নভোনিভ;

এই প্রকার চতুর্থ নিশ্চয়কেও মোক্ষসাধনের নিমিত্ত বলা যায়। এই চতুর্ব্বিধ নিশ্চয়ের মধ্যে প্রথম নিশ্চয়টাকে বন্ধের কারণ বলিয়া নিরূপিত করা হয়। এতদ্ভিন্ন অপর নিশ্চয়ত্রয় বিশুদ্ধ ভাবনা হইতে সমুৎপন্ন বলিয়া মোক্ষেরই সাধন হইয়া থাকে। অতএব বুঝা যায়, উল্লিখিত চারি প্রকার নিশ্চয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত নিশ্চয়ে তৃষ্ণার বন্ধনযোগ্যতা আছে বলিয়া বন্ধেরই কারণ হয় এবং অন্যান্য নিশ্চয়ত্রয় বিশুদ্ধ তৃষ্ণার আধার বলিয়া নির্ম্মল জীবন্মুক্ততারই হেতুভূত হইয়া থাকে।

হে প্রশস্ত-মতে! এই যে কিছু বস্তুনিচয় আছে, তৎসমস্তই আমি, এইরূপ যে তৃতীয় নিশ্চয়ের কথা কহিয়াছি, মদীয় মতি তাহাকেই আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে বলিয়া পুনরায় আর বিষাদের দিকে ধাবিত হয় না। কি ঊর্দ্ধ, কি অধঃ, কি তির্য্যক্, সর্ব্বত্রই আত্মার মাহাত্ম্য পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। এই যে কিছু দেখিতে পাইতেছি, সকলই সেই আত্মা; আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই, আমার অন্তরে এইরূপই নিশ্চয় বদ্ধমূল হইয়াছে; তাই আমার বন্ধন নাই; আমি বন্ধনমুক্ত হইয়া রহিয়াছি।

হে রাঘব! শূন্যবাদীরা যাহাকে শূন্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, অন্যান্য মতবাদীরা তাহাকেই প্রকৃতি, মায়া, বিজ্ঞান, ব্রহ্ম, শিব, পুরুষ ও আত্মা, ইত্যাদি নানা নামে উল্লিখিত করিয়া থাকেন। যখন পরমার্থজ্ঞানে দেখা যায়, তখন এই সকলই সতত সৎ বলিয়া অবধারিত হয়। পরমাত্মাই সদা সৎ; পরমাত্মায় কখনই কোন দ্বিত্বাদি কল্পনা নাই এবং তাঁহাতে ভেদাভেদ ঘটনাও কিছুই নাই। পরমার্থ-স্বরূপ দৃষ্টিতেই এই জগৎ পরিব্যাপ্ত; পূর্ব্ববৎ ভ্রান্তিজ্ঞানে সেরূপ দৃষ্টি কখনই হয় না। যেমন অপার অনন্ত অম্বুধি আ-পাতলতল কেবল জল দ্বারাই পরিপূর্ণ, তেমনি আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত নিখিল জগৎ আত্মা দ্বারাই আপূরিত; সুতরাং, সমস্তই নিত্য সত্য; মিথ্যা কোথাও কিছুই নাই। দৃষ্টান্ত দেখ, সমুদ্রের সমস্তই জল, জল ভিন্ন তরঙ্গাদি অন্য কিছুই নহে। আরও দেখ, সুবর্ণময় বলয় ও নূপুর প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার অলঙ্কার যেমন সুবর্ণ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, এবং তরু-তৃণ-লতা প্রভৃতি কোটি কোটি বিভিন্ন বস্তুও যেমন পৃথিবীস্বরূপ হইতে অভিন্ন, তেমনি সমস্ত বস্তুই আত্মা; আত্মা ব্যতীত আর কিছুই নাই। এখন কথা

এই যে, তবে জল ও সমুদ্রাদি পদার্থপরম্পরার ভেদাভেদ প্রতীতি হয় কেন? তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, পরমাত্মময়ী শক্তি—ব্রহ্মসত্তা প্রকৃত পক্ষে দ্বৈতবিরহিতা হইলেও অজ্ঞ জনগণের নিকট জগৎ-নির্ম্মাণ-লীলায় দ্বৈত ও অদ্বৈতভাবেই প্রকট হইয়া থাকেন। আপনার হউক বা পরেরই হউক, পুত্র-মিত্রাদির উপচয় বা অপচয় প্রভৃতি জাগতিক যাবতীয় ব্যাপারেই সুখ বা দুঃখ কিছুই অনুভব করিও না। বলিতে পার, তবে আমি কিরূপ ব্যবহারে নিরত থাকিব? তদুত্তরে বক্তব্য—নিজে তুমি ব্রহ্মবৎ অদ্বৈতভাবময় হইয়া, ব্যবহার কালেও ভাবনায় অদ্বৈত-ভাবই অবলম্বন কর; পরন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের স্থাপনাদি ব্যবহারকর্ম্মে উক্ত অদ্বৈতভাবে হতাদর হইয়া দ্বৈতভাব অবলম্বন করিও। এইরূপে তুমি দ্বৈতা-দ্বৈত-ময় হইয়া থাকো। এই ভবভূমি ভব-ভাবনারূপ বাত্যাচক্রে অতীব ভীষণা; ইহা সর্ব্বদাই পাত ও উৎপাতসমূহে পরিপূর্ণা। দরীর অভ্যন্তরে করীর ন্যায় তুমি উহার অভ্যন্তরে পতিত হইয়া কদাচ দুঃখদশা প্রাপ্ত হইও না।

হে মহাত্মন্! দ্বৈতের পরমার্থসত্তা সম্ভব নহে; কেন না, তাহা চিত্তময় বা চিত্তকল্পিত। এইরূপ আত্মাতে একত্বযোগও নাই। অর্থাৎ আত্মায় একত্বনামক সংখ্যাগুণও অসম্ভব। তাহার কারণ এই যে, দ্বিত্বাদির ব্যাবর্ত্তকরূপে কল্পিত বলিয়া দ্বৈত হইতেই উহার স্বরূপ সমুদিত। অতএব উহা অদ্বৈত ও ঐক্যবিরহিত এবং সর্ব্বদাই সমুদিত ও সন্মাত্র ব্রহ্ম বলিয়া নিরূপিত। উহাতে ঐক্য নাই বা কোন দ্বৈত নাই; সুতরাং উহা দ্বৈত ও অদ্বৈত কিছুই নহে। পণ্ডিতগণ উহার স্বরূপ এইরূপই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি নাই, জগৎও নাই, এই দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই নির্ব্বিকারভাবে বিদ্যমান। এ সকল কেবল শান্ত বিজ্ঞানমাত্রেই অবভাসমান। জানিবে—এই জগৎ সতত বিকৃতরূপে অসৎ এবং অবিকৃত বিজ্ঞানরূপে সৎ বলিয়াই প্রতিভাত। ব্রহ্মবস্তু পরম পীযূষস্বরূপ; তাঁহার আদি নাই, তিনি সকল প্রকাশের প্রকাশ, অজর, অমর, অচিন্ত্য, নিষ্কল ও নির্ব্বিকার। তাঁহার কোনই ইন্দ্রিয় নাই; তিনি জীবশক্তির জীবন। তাঁহাতে কোনই কলনা নাই। তিনি সকল কারণেরই কারণ। তুমি এবং নিখিল জগৎই সেই সদা

সমুদিত ঈশ, সুপ্রসারিত চিৎপ্রকাশেই বিরাজিত, সর্ব্ব অনুভবের কারণ-ভূত, স্বস্বরূপে অবস্থিত, চিৎশক্তির আশ্রয়ীভূত এবং কূটস্থ ব্রহ্মরূপেই প্রতিভাত। হে রাম! তোমার অন্তরে এইরূপ নিশ্চয়ই সর্ব্বথা বদ্ধমূল হউক।

সপ্তদশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৭ ॥

অষ্টাদশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! যাঁহাদের চিত্ত সুসংযত, যাঁহারা কাম ও লোভাদি কুদৃষ্টিসমূহে অদূষিত, তাঁহারা যেরূপ স্বভাবে অবস্থান করিয়া ইহ সংসারে বিচরণ করিয়া থাকেন, আমি তোমার নিকট তাহা কহিতেছি, শ্রবণ কর। জীবন্মুক্ত মুনি সংসারে প্রবেশ করিয়া দেখেন, এ জগতের সমস্ত অবস্থা—আদি, মধ্য ও অন্ত, এই কালত্রয়েই জন্ম, জরা ও মরণাদি বিবিধ দুঃখে সমাকুল। জগতের এ হেন অবস্থা দর্শনে তিনি ইহাকে উপহাসযোগ্য মনে করিয়া উপেক্ষা করেন; সমস্ত কালোচিত কার্য্যে আস্থা রাখেন, শত্রু মিত্রাদি ব্যবহারে মধ্যস্থ বা সমভাব অবলম্বন করেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত দ্বিবিধ বাসনার মধ্যে যে 'ধ্যেয়' বাসনা, তাহাই পরিত্যাগ করিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার আত্মা বিবেক-বিভায় বিভাসিত হইয়া উঠে; তিনি প্রবোধরূপ উপবনে বিচরণ করিয়া সর্ব্বত্র সকল বিষয়েই নিরুদ্বেগ ও সমস্ত অভিমত কার্য্যের পরিপোষক হইয়া থাকেন। হৃদয় তাঁহার সর্ব্বাতীত পদ অবলম্বন করিয়া পরিপূর্ণ সুধাকরের ন্যায় সুশীতল হইয়া উঠে। তিনি কোন বিষয়েই উদ্বেগ ভোগ করেন না বা আহ্লাদ প্রাপ্ত হয়েন না। মূঢ়ের ন্যায় সংসারে তাঁহার কোন একটা অবসাদও নাই। তিনি কি শত্রু, কি মিত্র, সর্ব্বত্রই সমদর্শী; দয়াদাক্ষিণ্যাদি গুণগণের তিনি আধারস্থল। গুরুজনে তাঁহার অবিচল অনুরাগ। তিনি যথাপ্রাপ্ত কর্ম্ম করিতে থাকেন; সংসারে তাঁহার অবসাদ আসিতে পারে

না। তিনি কোন প্রিয় বিষয়ের অভিনন্দন করেন না, কোন অপ্রিয় বস্তুতেও তাঁহার দ্বেষ প্রকাশ নাই। তিনি কাহারও বিরহে শোকগ্রস্ত হয়েন না, এবং কোনরূপ ইষ্ট বস্তু লাভ করিবার জন্যও তাঁহার আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তিনি কেবল মৌনভাবে অবস্থান করেন এবং অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন; কদাচ সংসারে অবসন্ন হয়েন না। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসিলে তিনি তাহার প্রকৃত উত্তর মাত্র প্রদান করেন; পরন্তু বিনা প্রশ্নে কাহাকেও কিছুই বলেন না, কেবল স্থাণুর ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার কোন ঈহিত বা অনীহিত থাকে না; তিনি কখনই সংসারে অবসাদগ্রস্ত হয়েন না। কেহ কিছু জিজ্ঞাসিলে, তিনি তাহাকে মিষ্টবাক্যে উত্তর প্রদান করেন; তদীয় বিদগ্ধতায় প্রশ্ন-কর্ত্তার জ্ঞাতব্য বিষয় অতি সুন্দররূপে সুমীমাংসিত হয়। তিনি সর্ব্বভূতের মনোভাব বুঝিতে পারেন। সংসারে তাঁহার অবসাদ কদাচ ঘটে না। 'ইহা যুক্ত, ইহা অযুক্ত' এইরূপ বৈষম্য দশায় উপগত, আশার আবেশে উপহত-চেষ্টিত যাবতীয় লোকব্যবহার তিনি আপনার করতলগত বিল্ব-ফলের ন্যায় বিলক্ষণই বিদিত থাকেন। পরম পদে তাঁহার প্রতিষ্ঠা হয়। তিনি তখন আপনার অন্তঃশীতল বুদ্ধিবলে এই বিনশ্বর জাগতী স্থিতির প্রতি যেন উপহাসের সহিতই দৃষ্টিপাত করেন।

রামচন্দ্র! যে সকল মহাত্মা চিত্ত জয় করিয়া পরাবর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া থাকেন, হে রাঘব! তাঁহাদের স্বভাবসম্বন্ধে এই আমি তোমায় বলিলাম। পক্ষান্তরে যাহারা আপনার চিত্তকে জয় করিতে পারে না, পরন্তু নিরন্তর ভোগপঙ্কেই মগ্ন হইয়া থাকে, তথাবিধ মূর্খদিগের অভিমত বিষয় কি, তাহা অবশ্য আমরা জানি না; সুতরাং বলিতেও পারি না। দেখ, বিবেকবুদ্ধির একান্ত অভাবই যাহাদের ভূষণস্থানীয়; যাহারা নর-কাগ্নির কনকপ্রভ জ্বালার ন্যায় দেদীপ্যমান, ঐ সকল মূর্খলোকেরা তথাবিধ কামিনীদিগকেই একমাত্র প্রিয় বলিয়া মনে করে এবং যাহা হইতে নানা অনর্থ-কদর্থনা ব্যর্থ হইলেও যাহা কেবল অর্জ্জনে, পালনে, ব্যয়ে এবং বিনাশাদি ব্যাপারে বহুবিধ অনর্থেরই আকর হইয়া থাকে, সেই সকল মূর্খ লোকেরা সর্ব্বদা সেই অর্থকেই সার বলিয়া ধারণা করিয়া থাকে। তাহারা সেই

সকল অর্থ দ্বারা যাগ-যজ্ঞাদি যে কিছু কর্ম্ম করে, তৎসমস্ত—হয় দম্ভ, না হয় মাৎসর্য্য, ইত্যাদি বিবিধ অভিসন্ধি লইয়াই সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ কর্ম্মপরম্পরা কেবল পুনর্জ্জন্মাদি সুখ-দুঃখসমূহেই পরিপূর্ণ; কাজেই ঐ সকল কর্ম্মসম্বন্ধে আমরা কিছুই বলিতে পারিতেছি না।

হে রঘুনন্দন! তোমায় এখন বলি, তুমি পূর্ব্বোক্ত 'ধ্যেয়' বাসনা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ দৃষ্টি অবলম্বন করত জীবন্মুক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাক। তোমার অন্তর হইতে আশা-বাসনা ও অনুরাগাদি পরিত্যক্ত হউক। বাহিরে তুমি যথাপ্রাপ্ত সমস্ত কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করত সংসারে বিচরণ কর। অন্তরে তুমি সর্ব্বত্যাগী হও, বাহিরে তুমি সর্ব্ববিধ ব্যবহারের অনুবর্ত্তন কর। তুমি উদার হও, কোমলাচার পরিগ্রহ কর। এই ভাবে তোমার লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইতে থাকুক।

হে রাঘব! অতি সূক্ষ্মভাবে সমস্ত সংসারভাব বিচার করিয়া দেখ। বিচারে যাহা অতুচ্ছ বা পরমোত্তম বলিয়া নির্ণীত হইবে, তাহাকেই তুমি দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করিয়া সংসারে বিহার করিতে থাক। অন্তরে তোমার নৈরাশ্য গৃহীত হউক, বাহিরে তুমি আশার উন্মেষণে চেষ্টা করিয়া যাও। ধন, মিত্র, পুত্র কিম্বা কলত্রাদির বিনাশ ব্যাপারে তোমার অন্তর সন্তপ্ত না হইয়া শীতল হইয়া থাকুক, আর বাহিরে তুমি সন্তপ্তের ন্যায় আচরণ করিয়া লোকব্যবহার নিষ্পাদন করিতে থাক। হে রাঘব! অন্তরে তুমি নিরুদ্যোগ হও; বাহিরে কৃত্রিম উদ্যোগ প্রকাশ কর। অপিচ অন্তরে কোন কিছুই করিও না; বাহিরেই যে কিছু কর্ত্তব্য নির্ব্বাহ করত বিচরণ করিতে থাক। হে রাঘব! সমস্ত ভাবের অন্তস্তত্ত্ব তুমি সম্যক্‌রূপে জানিতে পারিয়াছ; অধুনা সেই অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা তোমার ইচ্ছানুরূপ লোকব্যবহার করিয়া যাও। হে রঘুবর! যে কার্য্যে বা যেরূপ বস্তুতে তোমার প্রহর্ষ বা উল্লাস হইবে, তাহা যেন তোমার আন্তরিক অকৃত্রিম না হইয়া বাহ্যিক ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ হয় এবং যাদৃশ অপ্রিয় কার্য্যে কিম্বা যেরূপ বস্তুতে তোমার উদ্বেগ বা ধিক্কার হইতে পারে, তাহাতে তুমি কৃত্রিম উদ্বেগ ও নিন্দা প্রকাশ করত সংসারে যথেচ্ছ বিহার করিয়া বেড়াও। হে বৎস! তুমি অহঙ্কার পরিহার কর; বিমল বুদ্ধির আশ্রয় করিয়া চিদাকাশে বিরাজ

করিতে থাক। তুমি কোনরূপ কলঙ্ককালিমা ধারণ করিও না। এই অবস্থায় তোমার নিখিল লোকব্যবহার নিষ্পন্ন হউক। হে রাঘব! তুমি শত শত আশাপাশের বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া সুখ-দুঃখাদি সমস্ত ব্যবহারেই সমদর্শিতা অবলম্বন কর এবং বাহিরে বর্ণাশ্রমোচিত নিখিল কার্য্যের অনুষ্ঠান করত লোকব্যবহারে নিরত হও।

রামচন্দ্র! যিনি দেহী, পরমার্থতঃ তাঁহার বন্ধ বা মোক্ষ বলিয়া একটা কিছুই নাই। তবে এই সংসার-ব্যাপার কি? জানিবে—ইহা একটা ঐন্দ্রজালিক কাণ্ডের ন্যায় আদি অন্তই মিথ্যা। যেমন ভ্রমবশতঃ তীব্রাতপে বিপুল জল প্রতীতি হয়, তেমনি এই ভ্রান্তিমাত্র বিশাল বিশ্বও মোহক্রমেই দেখিতে পাওয়া যায়। বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ইহাতে সত্য কিছুই নাই। অপিচ আত্মা যিনি, তিনি সদা একরূপ, অবদ্ধ ও সর্ব্বগ; তাঁহার বন্ধন হইবে কিরূপে? যদি বন্ধন বলিয়া কিছুই একটা না রহিল, তাহা হইলে মোক্ষই বা আবার কিরূপে কাহার বিহিত হইবে? তবে কথা হইতে পারে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন কি? তাহার প্রয়োজন এই যে, অতত্ত্ব-জ্ঞানেই এই সংসারভ্রান্তি বিস্তার পাইয়া থাকে। যদি তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাহা হইলে রজ্জুগত ভুজঙ্গবুদ্ধির ন্যায় ঐ সংসার-ভ্রান্তি ক্ষীণ হইয়া যায়।

হে রঘুরাজ! তুমি যখন একমাত্র সূক্ষ্ম বুদ্ধির সহায়তায় তত্ত্ব-বস্তু বিদিত হইবে এবং তোমার সমস্ত অহঙ্কার যখন চলিয়া যাইবে, তখন তুমি ব্যোম-বৎ বিমলভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে। তুমি এ সংসারের সাক্ষী মাত্র; সুতরাং তোমায় বলি, তুমি এই বিনশ্বর বন্ধুবান্ধবাদি-বিষয়িণী মমতা বিসর্জ্জন কর। বস্তুতঃ যাহা অসৎস্বভাব, তাহার জন্য আবার ভাবনাই বা কি? আমি তোমায় যে উপায় বলিলাম, এই উপায়ে তুমি বাসনা ত্যাগ করিতে পারিলে পরিশেষে তোমার প্রতীতি হইবে যে, তুমি এ সকল হইতে সম্পূর্ণই ভিন্ন, পরমার্থ-সত্ত্ববান্ সাক্ষিমাত্রেই পর্য্যবসিত। বাসনা ত্যাগের পূর্ব্বে তুমি যাহা কিছু দেখিবে, তাহা পরম কারণ ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত হইলেও তাহাতে পরমার্থসত্যতা কিছুমাত্র নাই। প্রকৃতপক্ষে তৎসমস্তই পরি-চ্ছিন্ন অসত্যস্বরূপ। মোট কথা, পরমার্থ-সত্যতা পাইবার পক্ষে বাসনা

ত্যাগ ব্যতীত কারণান্তর নাই। এই যে কিছু ভোগসামগ্রী, যে সকল বন্ধু-বান্ধব, এবং যত কিছু জাগতিক ভাব বা শুভাশুভ কর্ম্ম, এ সকলে আত্মার কোনই সম্পর্ক নাই; সুতরাং অকারণে ইহাদের জন্য অনুশোচনা করিবার প্রয়োজন কি? 'আত্মতত্ত্বই একমাত্র সার, আমি এই সারেই সারবান্ ও আনন্দময় হইয়া রহিয়াছি' এই প্রকার বুদ্ধি যখন তোমার উৎপন্ন হইয়াছে, তখন হে রামচন্দ্র! ভয়ের সহিত তো তোমার কোনই সম্বন্ধ নাই; সুতরাং কেন তুমি বৃথা জগদ্ভ্রমে ভীত হইতেছ? বলিতে পার, আমি তত্ত্ববিদ্—আমার না হয় দুঃখ নাই হইল; কিন্তু আমার যে সকল বন্ধু-বান্ধব আছে, তাহাদের অজ্ঞতাজনিত দুঃখে আমারও তো দুঃখভোগ দুর্নিবার। এ কথার উত্তর এই যে, এ সংসারে কে তোমার আপনার বন্ধু-বান্ধব? তোমার তো প্রকৃতপক্ষে পুত্র-কলত্র, সুহৃৎ-মিত্র কেহই এখানে নাই; সুতরাং ভাবিয়া দেখ, তুমি যাহাদের জন্য শোক প্রকাশ করিবে, সেই সকল মিথ্যা পুত্র-মিত্রাদির দুঃখে তোমার দুঃখসম্বন্ধ আছে কি? পূর্ব্ব পূর্ব্বকালে তোমার বহু-জন্ম হইয়াছিল, সেই সকল জন্মে তুমি যেমন ছিলে, পরবর্ত্তী জন্মপরম্পরায়ও তুমি সেইরূপ হইবে এবং এই অদ্যতন কালেও তুমি সেইরূপই রহিয়াছ। আত্মপক্ষে তুমি যদি এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয়বান্ হইয়া থাক, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই বর্ত্তমানকালীন বন্ধু-বান্ধবাদির ন্যায় তোমার সেই বহু শত অতীত প্রাণাদি ও বন্ধু-বান্ধবাদির জন্য কেন তুমি শোক করিতেছ না? আর এক কথা, তুমি পূর্ব্বে অন্য ছিলে, পরে অন্য হইবে এবং বর্ত্তমানেও তুমি অন্য রহিয়াছ, এইরূপে আত্মার ক্ষণিকত্ব যদি তোমার অবধারিত থাকে, তাহা হইলেই বা সংস্কারূপ্য অবলম্বন করিয়া কেন তুমি বৃথা মুগ্ধ হইতেছ? আর যদি এমন ধারণা থাকে যে, তুমি পূর্ব্বে ছিলে, এখন আছ, ভবিষ্যতে তোমায় আর থাকিতে হইবে না, তথাপি তোমায় বলি, তুমি এরূপ ক্ষীণসংসার হইয়া কেন অনর্থক শোক করিতেছ? অতএব আবার বলি, এই প্রাকৃত জাগতিক ব্যবহারে তোমার দুঃখিত হওয়া কদাচ সমুচিত নহে। পরন্তু সর্ব্বত্র সর্ব্বথা সসন্তোষে কার্য্যানুবর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য।

হে রাম! তুমি অনবরত দুঃখভোগী হও, অথবা সতত সুখাসক্ত হইয়াই

থাক, এমন উপদেশ আমি প্রদান করি না। আমি এই মাত্র বলি, পরমাত্মা সর্ব্বত্রেই বিদ্যমান, তিনি না আছেন এমন স্থান নাই; তুমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বভাবে সমতাকেই আশ্রয় কর। তুমি অনন্ত সৎস্বরূপ হইয়া আকাশবৎ স্বচ্ছাশয়ে বিরাজ কর; দেখিবে যেমন বহ্নিব্যাপ্ত স্থানে তমোরাশি তিষ্ঠিতে পারে না, তেমনি তোমার নিত্যশুদ্ধ স্বপ্রকাশ আত্মাতেও তমোগুণজনিত শোকদুঃখাদি কিছুই কোনরূপে স্থান পাইবে না। তোমার সূক্ষ্ম আত্মস্বরূপ দৃষ্টিগোচর হইবার নহে। তুমিই এই জাগতিক পদার্থপুঞ্জের অন্তরে বিরাজ করিতেছ; সূত্রে যেমন মুক্তামালা গ্রথিত, তেমনি তোমাতে এই সমস্ত জগৎপদার্থ নিবদ্ধ রহিয়াছে। অজ্ঞ লোকেরাই দেখিয়া থাকে যে, এই সংসারস্থিতি এইরূপই আছে; ইহা একবার হইতেছে, হইয়া ধ্বংস পাইতেছে এবং ধ্বংস পাইয়া পুনরায় আবির্ভূত হইতেছে; কিন্তু যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞ, তাঁহাদের দৃষ্টি এরূপ নহে। হে রাম! তুমিও তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছ; তাই তোমায় বলি, তুমি সমস্ত দুর্ভাবনা পরিত্যাগ করিয়া সুখী হও। হে সদ্বুদ্ধিশালিন্! এই সংসারের স্বরূপ এই যে, ইহা সর্ব্বদাই আধিময়। অজ্ঞানবশেই ইহার বিস্তৃতি ঘটিয়া থাকে; কিন্তু তুমি ত অজ্ঞ নহ। তুমি অধুনা প্রকৃত জ্ঞানী হইয়াছ। দেখ, যাহা বাস্তবিকই ভ্রম, তাহাতে ভ্রম মাত্র ব্যতীত রূপান্তর আর কি হইতে পারে? বল দেখি— যাহা স্বপ্ন, তাহাতে স্বপ্ন মাত্র ভিন্ন অন্য কোন ক্রম হইতে পারে কি? হে রাম! এ জগৎ নিস্তত্ত্ব বটে, কিন্তু ইহার মূলে ব্রহ্মতত্ত্ব নিহিত আছে; তাই ইহাকে সৎ বলিয়া ধারণা হয়। জগতের যে ঈদৃশ ভাবে প্রকাশ, বলিতে হইবে,—তাহাও সেই সর্ব্বশক্তি পরমাত্মার অন্যতম শক্তি। অতএব এখন ভাবিয়া দেখ, কে কাহার বান্ধব? আর কেই বা কাহার অরি? ফলে সকলেই সকল সময় সকলের হয়; সমস্তই সর্ব্বেশ্বরের ইচ্ছাধীন। হে রাম! জল তরঙ্গ যেমন পরস্পরের আশ্রয়ে আসিতেছে, যাইতেছে, তেমনি এই সমগ্র জগৎও সদাই অবিশ্রান্তভাবে একবার আসিতেছে, আবার চলিয়া যাইতেছে। এই চঞ্চল সংসারের অধোদেশ ঘূর্ণিত চক্রের অগ্রভাগের ন্যায় একবার ঊর্দ্ধগামী হইতেছে, এবং ঊর্দ্ধদেশ আবার অধোদিকে যাইতেছে। কখন কখন স্বর্গবাসীরা নরকে নিপতিত হইতেছে এবং কখন কখন বা নরক-

বাসীরাও স্বর্গধামে গমন করিতেছে। জীবগণ এক যোনি হইতে অপর যোনিতে প্রবিষ্ট হইতেছে এবং এক দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে চলিয়া যাইতেছে। কোথাও উদারচেতা ধীরগণ কৃপণতা প্রকাশ করিতেছে এবং কোথাও বা কৃপণস্বভাব জীবগণ ধীরতা অবলম্বন করিতেছে। এইরূপে জীবগণ কখন পতন, কখন উৎপতন এবং কখন বা প্রতিনিয়ত বহুধা ভ্রমণ করিয়াই কাল কাটাইতেছে।

রামচন্দ্র! এই ত বিশ্ব এমনি ভাবে রহিয়াছে, ইহাতে এমন পদার্থপুঞ্জ মিলে না, যাহা সর্ব্বদা একরূপ, স্থির, স্বচ্ছ ও সন্তাপহীন। বস্তুতঃ বহ্নিতে যেমন হিমকণার প্রাপ্তি অসম্ভব, তেমনি এ বিশ্বে তাদৃশ সার পদার্থ সুদুর্ল্লভ। কিঞ্চিৎ নিবিষ্টচিত্তে বুঝিয়া দেখ, অদ্য তোমার যে সকল বন্ধুবান্ধবকে তুমি মহাভাগ্যশালী বলিয়া মনে করিতেছ, কতিপয় দিনের মধ্যেই দেখিবে, তাহারা কেহই জীবিত নাই; সকলেই বিনষ্ট হইয়াছে। হে মহাভুজ! এ সংসারে আপন, পর, আত্মীয়, অনাত্মীয়, তোমার, আমার, ইত্যাদি রূপে যে সকল ভাবনার বিষয়ীভূত হইতেছে, পরমার্থ-নেত্রে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়, তৎসমস্তই দ্বিচন্দ্র দর্শনের ন্যায় সম্পূর্ণই মিথ্যা। "এ আমার মিত্র, এ আমার শত্রু, এই আমি, ঐ তুমি," ইত্যাদি যত কিছু মিথ্যা দৃষ্টি আছে,—হে রাম! এখন সে সকল তোমার বিগলিত হইয়া যাউক। তুমি ব্যবহারে নিরত হইয়া থাকিতে হয়, থাক, কিন্তু তোমার যেন তাদৃশ দৃষ্টি ছিন্নমূল হইয়া রহে। হে সুব্রত! তুমি এই সংসারপদবীতে ভ্রমণ করিতে হয়, কর, কিন্তু দেখিও যেন বাসনাভারে শ্রম-শ্রান্ত হইয়া পড়িও না। বলিবে—কবে তবে আমার ব্যবহারের উপরম ঘটিবে? উত্তরে বলিব—যেমন যেমন তোমার বাসনাবিনাশিনী বিচারণা উদিত হইবে, তেমনি তেমনি তোমার ব্যবহারপরম্পরা প্রশমিত হইতে থাকিবে। "ইনি বন্ধু, আর ইনি বন্ধু নহেন," ঈদৃশ গণনা লঘুচেতা লোকেরাই করিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহারা উদারচরিত, তাঁহাদের ধারণা সেরূপ নহে। কেন না তাঁহারা মনে করেন, এমন কিছুই নাই, যাহাতে আমি থাকি না, এবং এমন কিছুরই অস্তিত্ব নাই, যাহা আমার নহে; এইরূপ নির্ণয় করিয়াই ধীরগণের বুদ্ধি অসদ্বিচারণার আবরণ হইতে মুক্ত হইয়া থাকে। যিনি চিদাকাশবৎ

মহান্, তাঁহার উর্দ্ধে অস্ত কিছুই নাই; কাজেই যেমন প্রকৃতিস্থ ব্যক্তি ভূতলস্থ সমস্ত বস্তু দর্শন করিতে পারে, তিনিও তেমনি বিক্ষেপ-দুঃখের উপরতিরূপ স্বাস্থ্য লাভ করিয়া সমস্ত বিষয় প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

রামচন্দ্র! সমস্ত ভূতজাতিই তোমার বন্ধু; কেন না কিঞ্চিৎ বিচার করিয়া দেখিলেই দেখা যাইবে, ঐ ভূতপরম্পরার মধ্যে বন্ধুত্ব ব্যাপারে কেহই তোমার সহিত একান্ত অসংযুক্ত নহে। ফল কথা, এই অনাদি সংসারে সকল যোনিতেই তোমার নিজের বহুধা জন্মানুভব ঘটিয়াছে; সুতরাং পর্য্যায় ক্রমে সকলের সহিতই তোমার বন্ধুত্ব সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

রঘুনাথ! এ জগৎ বহুবিধ বহুসংখ্যক জন্মপরম্পরায় একান্ত ভ্রম-সঙ্কুল হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে "ইনি বন্ধু, আর উনি বন্ধু নহেন" এরূপ ভেদদর্শন ভ্রমের ব্যাপার বলিয়াই বিলসিত; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এই ত্রিভুবনস্থ জীবগণ অবন্ধু হইলেও চিরবন্ধুরূপে বিরাজমান। অর্থাৎ ব্রহ্ম-ভাব-দর্শনে স্বয়ংই সর্ব্ব-জীবরূপে প্রতিভাত; সুতরাং অবন্ধু হইলেও বন্ধু বলিয়াই বিদিত।

অষ্টাদশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ১৮ ॥

ঊনবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! এ বিষয়ে গঙ্গাতীরস্থ দুইটী সহোদর মুনিকুমারের সংবাদ-সম্বলিত এই এক প্রাচীন ইতিহাস উদাহরণ-স্বরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। 'ইনি আমার বন্ধু, আর ইনি আমার বন্ধু নহেন' এইরূপ কথার প্রসঙ্গক্রমেই এই পুণ্য ইতিহাস প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। হে রাঘব! তুমি অধুনা ইহা শ্রবণ কর।

এই জম্বুদ্বীপের অন্তঃপাতী কোন এক স্থানে মহেন্দ্র নামে এক পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বত বনব্যূহে সমুন্নত এবং উহার অধিষ্ঠানস্থান অন্যান্য পর্ব্বতমালায় পরিশোভিত। ঐ মহেন্দ্রাচলের কত স্থানে কত কল্পতরু কানন বিরাজমান; সেই সকল তরুর ছায়ায় মুনি ও কিন্নরগণ বিশ্রাম

করিয়া থাকেন, উহার সমুন্নত শিখর সকল আকাশকেও জয় করিয়া উত্থিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতিপয় শৃঙ্গ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত প্রসর্পিত আছে। তত্রত্য গুহামধ্যবাসী ঋষি-মুনিগণের কণ্ঠোত্থিত বেদ-পাঠ-ধ্বনির ব্যপদেশে ঐ মহেন্দ্রগিরি যেন নিজে নিজেই বেদগান করিতেছে। উহার শৃঙ্গাগ্র ভাগে সজল সুনীল জলদমণ্ডল বিদ্যুদ্বিজড়িত হইয়া বিরাজিত হওয়ায় কুসুমলতায় গ্রথিত কেশপাশের ন্যায় সুশোভিত হয়। ঐ গিরি স্বীয় তটপ্রান্তে উল্লম্ফনার্থ উৎকণ্ঠিত শরভদিগের বিজৃম্ভনচ্ছলে গুহা-মুখ বিবৃত করিয়া যেন কল্পান্ত কালের অভ্রবৃন্দকে উপহাস করত গর্জ্জন করিতেছে। উহার মধ্যে মধ্যে যে সকল গুহা আছে, সেই গুহাবলীর অভ্যন্তর হইতে কত শত নির্ঝরের নাদ উত্থিত হইতেছে, সে নাদে সাগর-সলিলের ভীষণ কল্লোলধ্বনিও পরাভূত হইতেছে। তত্রত্য কোন এক সুবিশাল মণিময় মনোরম তটদেশে মুনি ও ঋষিগণ আপনাদিগেরই স্নান-পান নিমিত্ত স্বর্গগঙ্গাকে আনয়ন করিয়াছেন। তথাগত ত্রিপথ-গামিনীর তটদেশ কুসুমিত তরুরাজি দ্বারা বিরাজিত, রত্নমণ্ডিত গিরি-তটপ্রভায় বিদ্যোতিত ও সুবর্ণপ্রভায় পিঞ্জরিত। সেখানে দীর্ঘ-তপা নামে জনৈক ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন উদারধী তপোনিধি মুনি বাস করিতেন। বৃহস্পতি-সুত কচের ন্যায় সেই মুনির দুইটী চন্দ্রোপম সুন্দর পুত্র ছিল। সেই পুত্রদ্বয়ের মধ্যে একের নাম পুণ্য এবং অপরের নাম পাবন। মুনিবর দীর্ঘতপা পতিতপাবনী সুরধুনীর যে তীরে বাস করিতেন, ঐ তীরভূমি প্রচুরতর ফলবান্ পাদপে সুশোভিত ছিল। তিনি তথায় ভার্য্যা ও পুত্রদ্বয় সহ বাস করিতেন।

হে রাঘব! কালক্রমে সেই দুই মুনিপুত্রের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ গুণ-শ্রেষ্ঠ পুণ্যই জ্ঞানবান্ হইয়া উঠিলেন। কনিষ্ঠ পুত্র পাবন প্রভাত-পঙ্কজের ন্যায় অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ হইলেন। তাঁহার তখন মূর্খতা মাত্র অপগত হইল। পরন্তু তিনি পরম পদ পাইবার অধিকারী হইলেন না; সুতরাং তদবস্থায় তাঁহাকে দোলায়িত-চিত্তে অবস্থান করিতে হইল। ক্রমে অজ্ঞাতসারে জীবদিগের দেহ ও আয়ুর ক্ষয়সাধক শত বর্ষকাল চলিয়া গেলে মহামুনি দীর্ঘতপা জরাজীর্ণ হইয়া পড়িলেন। তখন এই বিনশ্বর ভূতবৃন্দময়, জনন-মরণাদি

শত শত ব্যাপারপরম্পরায় একান্ত ভীষণ সংসারের প্রতি তাঁহার অনুরাগ রহিল না; তিনি কল্পনারূপিণী পক্ষিণীর চির-নিবাস-নিলয় নিজ দেহ পরিত্যাগ করিলেন। যেমন ভারবাহী ব্যক্তি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিয়া স্বীয় ভার রাখিয়া দেয়, তেমনি তিনিও সেই গিরিগুহামধ্যে স্বকীয় দেহ-ভার মাত্র রক্ষা করিলেন। যেমন পুষ্প প্রনষ্ট হইলে তদীয় গন্ধ অকাশদেশ আশ্রয় করে, তেমনি তিনিও স্বদেহ বিনষ্ট হইবার পর যথায় কোনই কলনা-রস্ত নাই এবং যাহা চেত্যবর্জ্জিত কেবলই চিদাস্পদ, তথাবিধ পরম পদ অবলম্বন করিলেন। তাঁহার সমস্ত সংসার-ভাবের শান্তি হইয়া গেল।

তখন পতিপ্রাণা মুনিপত্নী দেখিলেন—স্বামীর দেহে প্রাণাপানাদি বায়ু-পঞ্চক নাই, তদীয় দেহ নালহীন কমলের ন্যায় ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তাহা দেখিয়া তিনিও যোগাবলম্বন করিলেন। স্বামীর নিকটেই তাঁহার যোগ শিক্ষা হইয়াছিল, তিনি সেই চিরাভ্যস্ত শিক্ষাগুণেই তৎকালে যোগাব-লম্বনে তদীয় সুন্দর কলেবর পরিত্যাগ করিলেন। তখন মনে হইল, ভ্রমরী যেন অম্লানকান্তি কমলিনীকে পরিত্যাগ করিল। হে রাঘব! যেমন ব্যোম-বিহারী সুধাকরকে অস্তোন্মুখ দেখিয়া তদীয় প্রভাও তাঁহার অনুগমন করিয়া থাকে, তেমনি সেই মুনিপত্নীও লোকলোচনের অগোচরে পতি-দেবতার অনুগমন করিলেন। তখন পিতা মাতা উভয়েই পরলোকে উপনীত হইলেন দেখিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্য কিছু মাত্র শোক প্রকাশ করিলেন না, তিনি নির্ব্বিকারচিত্তে তাঁহাদের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিলেন। কিন্তু কনিষ্ঠ পুত্র পাবন পিতামাতার বিরহে একান্তই দুঃখিত হইলেন, তিনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিলেন না; তাঁহার চিত্ত একান্ত শোকাকুল হইল। তিনি একাকী বন মধ্যে গিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

এ দিকে উদারবুদ্ধি জ্যেষ্ঠ পুত্র পুণ্য পিতামাতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিলেন। পরে কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাবন যে বিপিনে গিয়া পিতা মাতার শোকে আকুল হইয়া বিলাপ করিতে ছিলেন, অবিলম্বে তিনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পুণ্য পাবনকে দেখিয়া বলিলেন,—বৎস! কেন তুমি বৃথা অজ্ঞানকারণ শোকভারকে বর্দ্ধিত করিতেছ? কেনই

থা তুমি নিরন্তর অশ্রুজল বর্ষণ করিতেছ? বর্ষার বর্ষণ যেমন পদ্মবিকাশের প্রতিবন্ধক, দেখিতেছি, তোমারও এই বাষ্পরাশি তেমনি দর্শন-ব্যাপারের ব্যাঘাত-জনক। হে সুবুদ্ধে! তুমি বুঝিতেছ না কি, তোমার পিতা মাতা সম্প্রতি স্বীয় জ্ঞানার্জ্জিত মোক্ষনাম্নী পরমাত্মপদবী প্রাপ্ত হইয়াছেন? পিতা আমাদের তদীয় এমন এক স্বীয় স্বভাব লাভ করিয়াছেন যে, তাহা সমস্ত প্রাণীরই উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারকালে আধারভূত এবং বিজিতাত্মা ব্রহ্মবাদীদিগের স্ব-স্বরূপ। অতএব সে পিতার জন্য কেন অনুশোচনা কর? তুমি মোহজনিত বৃথা ভাবনায় নিশ্চয়ই বদ্ধ হইয়াছ; কেন না, পিতা আমাদের সংসারে অশোচ্য দশায় উপনীত হইয়াছেন, তথাপি তুমি তাঁহারই জন্য অনুশোচনা করিতেছ। ভাই, তুমি মনে মনে বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই মাতাও তোমার মাতা নহেন, সেই পিতাও তোমার পিতা নহেন। আর তুমিই যে কেবল তাঁহাদের পুত্র, তাহাও নহ। পরন্তু তোমার ন্যায় তাঁহাদের অসংখ্য পুত্র অতীত হইয়াছে। হে বৎস! যেমন বনে বনে বহু জলপ্রবাহ নিম্নস্থান বহিয়া চলিয়া যায়, তেমনি তাঁহাদের ন্যায় তোমারও বহু শত সহস্র পিতা মাতা অতীত হইয়াছেন। তাঁহাদের কত পুত্র ছিল, তাহার সংখ্যা করা যায় না; সুতরাং তুমিই যে তাঁহাদের একমাত্র পুত্র, এরূপ নিশ্চয় করিয়া লওয়া কোন ক্রমেই উচিত নহে। কেবল কি আমাদেরই পিতা মাতা সম্বন্ধে এই কথা? নদীর তরঙ্গাবলীর ন্যায় অন্যান্য নরগণেরও কত যে পুত্র অতীত হইয়াছে, তাহারও তো ইয়ত্তা হয় না। লতা এবং বিটপের যেমন কত অনন্ত পত্র, কোরক ও বৃন্তসমূহ নিপতিত হয়, তেমনি আমাদেরও ঐ পিতা মাতার কত লক্ষ লক্ষ পুত্র অতীত হইয়াছে। যেমন প্রত্যেক ঋতুতে ঋতুতে মহাতরুর ফলরাশি অতিক্রান্ত হইয়া যায়, তেমনি প্রতি জন্মে জন্মে জীবগণের অসংখ্য মিত্র ও বন্ধুবর্গ অতীত হইয়া থাকে। আরও বলি, হে বৎস! যদি স্নেহভরে একান্তই তুমি পিতামাতার নিমিত্ত শোক করিতে চাও, তাহা হইলে আমার কথা এই যে, তুমি তোমার অতীত সহস্র সহস্র পিতামাতা প্রভৃতির জন্য শোক প্রকাশ করিতেছ না কেন?

হে মহাভাগ! এই যে জগৎপ্রপঞ্চ দেখা যাইতেছে, এ প্রপঞ্চ-

দর্শন কেবলই একটা মোহের খেলা। হে প্রাজ্ঞ! যদি বাস্তবিকতার দিক্ দিয়া বিচার করিয়া দেখ, তাহা হইলে দেখিবে—তোমার মিত্র নাই বা বান্ধবও কেহই নাই। হে ভ্রাতঃ! যেমন চিরপ্রতপ্ত মহামরুতে জলবিন্দু-লাভের সম্ভাবনা নাই, তেমনি পরমার্থ-দৃষ্টিতে তাকাইয়া দেখ, দেখিবে, নাশ কাহারই নাই। হে মহাবুদ্ধে! নিশ্চয় জানিও, সংসারে সত্য কিছুই নাই। ঐ যে ছত্র-চামরাদি চিহ্নে চিহ্নিত রাজলক্ষ্মী দেখিতে পাইতেছ, উহা স্বপ্ন ব্যতীত আর কিছুই নহে; উহারও স্থায়িত্ব তিন দিন বা চারি দিন মাত্র। হে বৎস! পরমার্থ-দৃষ্টিতে সত্য বিচার কর, দেখিতে পাইবে,—না তুমি না আমরা, কেহই কিছু নহি; সুতরাং তোমায় বলি, তুমি অন্তর হইতে ভ্রান্তি পরিত্যাগ কর। 'এ গেল, সে মরিল' ইত্যাদি-রূপ মিথ্যা দৃষ্টি কেবল আপনারই সঙ্কল্পসম্ভূত ভ্রম হইতে সমুদিত হইতে দেখা যায়; পরন্তু ইহাতে সত্যসম্পর্ক কিছু মাত্র নাই। হে ভ্রাতঃ! এই অতি বিস্তীর্ণ আত্মরূপিণী মরুস্থলী অজ্ঞানরূপ আতপ-তাপে উত্তপ্ত, ইহাতে স্বীয় বাসনারূপ মরীচিকাজল শুভাশুভ প্রবাহময় তরঙ্গভঙ্গিমায় অনন্তাকারে নিয়তই পরিস্ফূরিত হইতেছে।

ঊনবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ১৯ ॥

বিংশ সর্গ।

পুণ্য পুনরায় কহিলেন,—বৎস! সংসারে সকলই মিথ্যা; সুতরাং কে পিতা? কে মাতা? কে মিত্র? আর কেই বা কাহার বন্ধু? যেমন বাত্যা-বেগে ধূলিজাল সমুৎক্ষিপ্ত হয়, তেমনি এ সকল কেবল আপনারই ভ্রান্ত বুদ্ধি হইতে উত্থিত হইয়া থাকে। এই যে বন্ধু, পুত্র, মিত্র, স্নেহ, দ্বেষ ও মোহদশাদি-ময় সংসারপ্রপঞ্চ, ইহাকে জীবগণ কেবল স্ব স্ব কল্পিত সঙ্কেতমাত্রেই বিস্তার করিতেছে। বিষকীটেরা বিষকে আপনাদের হিতকর জ্ঞানে অমৃত বলিয়া মনে করিয়া থাকে; কিন্তু অপরের নিকট বিষ

যেমন বিষ বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়, তেমনি যাহারা মুগ্ধ জীব, তাহারাই কাহাকে বন্ধু বলিয়া ভাবনা করিয়া বন্ধুত্বে বরিয়া লয়, আর কাহাকেও বা শত্রু বলিয়া ভাবনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়া থাকে। ফলে কিন্তু এ সংসারে শত্রু-মিত্র সমস্তই সমান; অতএব ইহা স্পষ্টতই বুঝা যাইতেছে যে, এই সংসার-স্থিতি বিষামৃত-দশার ন্যায়ই ভাব-বন্ধনী। যিনি সকল দেহে অভিন্নভাবে বিরাজিত, সেই সর্ব্বগামী আত্মার আবার 'ইনি বন্ধু ইনি শত্রু' এরূপ কল্পনা কি? যদি বল, আমি কিরূপে সকল দেহে একইরূপে অবস্থিত? তাহার উত্তরে বলি,—তুমি আপন মনোমধ্যে ইহাই অগ্রে বিচার করিয়া দেখ যে, এই রক্ত-মাংস ও অস্থিময় দেহপঞ্জর হইতে পৃথক্‌ভূত আমি কে? এইরূপ বিচার করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, আমি এক ও সর্ব্বগামী। অপিচ তুমি যদি পার-মার্থিক দৃষ্টি অর্পণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয়ই দেখিবে, পাবনাখ্যাধারী তুমিও কেহ নহ এবং পুণ্য-আখ্যাধারী আমিও কেহই নহি। তবে যে পাবন ও পুণ্য নামে আমরা দুইজন রহিয়াছি, ইহাকে কেবল মিথ্যাজ্ঞান ভিন্ন অপর কিছুই বলা যায় না। সংসারে তোমার মাতা কে? পিতা কে? সুহৃৎ কে? এবং শত্রুই বা কে? ফলতঃ তোমার আপনার এ সকলের কেহই নয়। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিলে এ সকল সেই অপরিচ্ছিন্ন চিদাকাশেরই লীলাবিলাস; সুতরাং বল দেখি, যাহা কেবল অনন্ত অপার আকাশ, তাহার আবার আত্মীয়, পর কি? যদি বল, আমি এবং আমার বান্ধবকুল, সকলেই আমরা বর্ত্তমান শরীরের লিঙ্গশরীরী; তাহা হইলে আমার বক্তব্য এই যে, তোমার তো অতীত জন্মপরম্পরায় বহু বান্ধব ছিল এবং ধনরত্নাদিও প্রচুর ছিল, এই বর্ত্তমান জন্মে সে সকল হইতে তুমি এক্ষণে বিযুক্ত হইয়াছ, কৈ তাহাদের জন্য শোক করিতেছ না কেন? তুমি কোন অতীত কালে মৃগ-যোনি লাভ করিয়াছিলে, সেই জন্মে যে সকল কুসুমিত বনস্থলীর পথ-শ্রেণী তোমার চিরপরিচিত বন্ধুস্বরূপ হইয়াছিল, এই বর্ত্তমান জন্মে তুমি তাহাদের জন্যই বা শোক করিতেছ না কেন? তুমি এক সময় হংসযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলে; তৎকালে কত পদ্মবনে, কত তটিনীর তটে, কত শত হংসের সহিত তোমার বন্ধুত্ব হইয়াছিল, কৈ তাহাদের জন্যই বা তুমি এখন শোক করিতেছ না কেন? অন্য এক অতীত জন্মে তুমি বিচিত্র

বনরাজির অভ্যন্তরে জন্ম লইয়াছিলে; সেই জন্মে বহু বৃক্ষ তোমার বন্ধু হইয়াছিল, কৈ তাহাদের জন্যই বা তুমি এখন শোক করিতেছ না কেন? তুমি যখন মহীধরগণের সমুচ্চ শিখরসমূহে জন্ম লইয়াছিলে, তখন কত সিংহ তোমার বন্ধু ছিল, কৈ তাহাদের জন্যই বা শোক করিতেছ না কেন? পূর্ব্বে তুমি কত তটিনীর জলে এবং কত শত সরসিজশালিনী সরসীর সলিলে জন্মিয়াছিলে, সেই সকল জন্মে কত শত শত মৎস্যের সহিত তোমার বন্ধুত্ব স্থাপন হইয়াছিল, তুমি সম্প্রতি তাহাদের উদ্দেশেই বা শোক প্রকাশ করিতেছ না কেন? ভ্রাতঃ! আমি যোগপ্রভাবে স্পষ্টতই দেখিতে পাইতেছি, পূর্ব্বে তুমি দশার্ণদেশে কপিল নামে একটা বন-বানর হইয়া জন্মিয়াছিলে; অনন্তর তুষারদেশে তোমার জন্ম হয়; সে জন্মে তুমি এক রাজপুত্র হইয়াছিলে; পরে পুণ্ড্রদেশে তুমি এক বন-বায়স হইয়া জন্ম গ্রহণ কর; অতঃপর হৈহয় রাজ্যে তোমার জন্ম হয়, সে জন্মে তুমি এক হস্তী হইয়াছিলে; ত্রিগর্ত্ত-দেশে তোমার গর্দ্দভযোনি লাভ হয়; শাল্বদেশে তুমি এক সারমেয় হইয়া জন্ম গ্রহণ কর; সরলদ্রুমে তুমি এক পতত্রী হইয়া জন্মিয়াছিলে; তৎপরে বিন্ধ্যাচলে পিপ্পল বৃক্ষ হইয়া মহাবটে ঘুন হইয়াছিলে। অনন্তর মন্দরে কুক্কুট হইয়া কন্দরে এক বিপ্র হইয়া জন্মিয়াছিলে; অতঃপর কোশল দেশে ব্রাহ্মণ, বঙ্গদেশে তিত্তিরি, তুষারদেশে অশ্ব, এবং ব্রহ্ম-যজ্ঞে পশু হইয়াছিলে। যে তুমি পূর্ব্বে তালতরুর মূলমধ্যে কীট, উডুম্বরফলে মশক ও বিল্ববনে বক হইয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে আমার অনুজ হইয়া বর্ত্তমান। যে তুমি পূর্ব্বে হিমাচল-কন্দরে ভূর্জ্জতরুর ত্বকের অভ্যন্তরে ছয়মাস কাল যাবৎ কীট হইয়া অবস্থান করিয়াছিলে, সেই তুমিই এক্ষণে এই আমার অনুজ হইয়া রহিয়াছ। এক সময় যে তুমি আমাদের এই দেশের সীমান্তভাগে গোময়স্তূপের অভ্যন্তরে সার্দ্ধ এক বর্ষকাল বৃশ্চিক হইয়া বাস করিয়াছিলে, সেই তুমিই অদ্য আমার সহোদর হইয়াছ। কমলে বিলীন ভ্রমরের ন্যায় তুমিই এক সময় কাননমধ্যে পুলিন্দরমণীর গর্ভে জন্মিয়া তদীয় স্তনপীঠে সমাসক্ত হইয়াছিলে, সেই তুমি এক্ষণে আমার কনিষ্ঠ সহোদররূপে বর্ত্তমান। হে বৎস! তুমি এই জম্বুদ্বীপেই এইরূপ এবং আরও নানাবিধ বহু জীব-যোনিতে বহু সহস্র বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। তোমার যে কত জন্ম

অতীত হইয়াছে, তাহার এখন ইয়ত্তা করা অসাধ্য। আমার বুদ্ধি তত্ত্ব-দর্শনে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। আমি সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির সাহায্যেই তোমার এবং আমার এতাদৃশ প্রাক্তন বাসনাক্রম দেখিতে পাইতেছি। অতীত কালে তোমার যেমন নানা জন্ম ভোগ হইয়াছে, আমারও তেমনি মোহ-মন্থর বহুবিধ বহু জন্ম কাটিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে আমি যে যে যোনি লাভ করিয়াছিলাম, এক্ষণে জ্ঞান-দৃষ্টিবলে একে একে তৎসমস্তই আমার স্মৃতি-পথে সমুদিত হইতেছে। আমি পুরাকালে ত্রিগর্ত্তদেশে এক শুকপক্ষী হইয়া জন্মিয়াছিলাম, তৎপরে এক নদীর তটে আমার ভেক জন্ম লাভ হয়। এই যে বন দেখিতেছ, এই বনে আমি অনন্তর একটা ক্ষুদ্র পক্ষী হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। ইহার পর আমাকে বিন্ধ্যাচলস্থ শবরীদিগের মধ্যে জন্ম লইতে হয়। এই জন্মের পরে বঙ্গে আমি বৃক্ষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। পূর্ব্বোক্ত বিন্ধ্যাচলে পুনরায় আমি উষ্ট্রযোনি ভোগ করিয়াছি। অতঃপর হিমালয়ে আমি চাতক হইয়াছিলাম; পরে পৌণ্ড্রাজ্যের রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করি। সেই জন্মের পর সহ্যাদ্রির কুঞ্জমধ্যে আমাকে এক ব্যাঘ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। সেই আমিই অদ্য তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর হইয়া জন্মিয়াছি। পূর্ব্বে যে লোক দশবর্ষ কাল গৃধ্র এবং পরে পঞ্চ মাস গ্রাহ হইয়া জন্মিবার পর সাত বর্ষকাল সিংহ হইয়া জন্মিয়াছিল, এই সেই লোকই এক্ষণে তোমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। পূর্ব্বে আমি অন্ধ্রাজ্যে এক চকোর ছিলাম, পরে তুষারদেশে জনৈক মাণ্ডলিক হইয়া রাজার ন্যায় বিরাজ করিতাম। এক্ষণে আমি শ্রীশৈলাচার্য্যের পুত্র, আমার নাম পুণ্য। আমি অপুণ্য হইলেও লোকবঞ্চনের নিমিত্তই যেন পুণ্য নামে প্রখ্যাত হইয়া তোমার নিকট এই সকল কথা কহিতেছি। পূর্ব্ব-পূর্ব্বে আমার যে বিবিধাচারময় বিবিধ সংসারদশা ঘটিয়াছিল, সে সকলই আমি ভ্রান্তিরই বিলাসরূপে স্মরণ করিতেছি।

হে বৎস! এক্ষণে বুঝিয়া দেখ, এ হেন সংসারদশায় তোমার এবং আমার যে কত শত বন্ধু, কত অনন্ত পিতা মাতা, কত ভ্রাতা, কত শত সুহৃৎ জন্মিয়া তিরোহিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কাজেই কাহাদের জন্য শোক করিব? আর কাহাদের জন্যই বা শোক করিব না? যদি বা

শোক করি; তবে তাঁহাদের নিমিত্তই বা অধিক শোক করিব? এতাবতা আমি শোকের তো কোনই অবসর দেখি না; কেন না, এ জগতের গতি এইরূপই বটে। বন-পাদপের পত্রপুঞ্জের ন্যায় এ জগতে সংসারী লোকদিগের অনন্ত পিতা ও অনন্ত মাতা অতীত হয়; অতএব হে বৎস! এ জগতে দুঃখের সীমা কৈ? আর সুখেরই বা পর্য্যবসান কোথায়? অতএব আর কেন, এস ভাই! আমরা সকল পরিত্যাগ করিয়া বিমল-হৃদয়ে অবস্থান করি। আপনার মনে যে অহংজ্ঞানময়ী প্রপঞ্চভাবনা আছে, তাহা পরিহার কর, করিয়া সৎস্বরূপে বিরাজ কর। আত্মজ্ঞান-কুশল মহাত্মগণ যে পদে উপনীত হইয়া থাকেন, তোমার মঙ্গল হউক, তুমি সেই পদই প্রাপ্ত হও। প্রাজ্ঞ পুরুষেরা এ সংসারে ঊর্দ্ধ ও অধোগতিরূপ স্বর্গ ও নরকাদি গমনে আত্মার অবিশ্রান্ত ভ্রমণ দর্শন করেন, দেখিয়াও কিছুমাত্র শোকাকুল হয়েন না। তাঁহারা নিরভিমান হইয়া মাত্র কর্ত্তব্য বিষয়ের ব্যবহার করিতে থাকেন। অতএব যাঁহার ভাবাভাব-দশা নাই, যিনি জরা ও মরণ-পরিহীন, সেই আত্মাকে একাগ্রভাবে স্মরণ কর, করিয়া কস্মিন্ কালেও বিমূঢ়-চিত্ত হইও না। তোমার দুঃখ নাই, জন্ম নাই, পিতা নাই বা মাতাও নাই; হে সুবোধ! তুমি একমাত্র আত্মাই; আত্মা ব্যতীত তুমি আর কেহই নহ। যাহারা এই সংসারযাত্রায় নানা চেষ্টাভিনয় প্রদর্শন করিতেছে, সেই মূঢ়-লোকেরাই পুরুষার্থকে সার বলিয়া অবধারণ করে। যাঁহারা সৎ ও অসৎ এই উভয়দর্শী হয়েন, তথাবিধ মধ্যবিৎ লোকেরা যথাপ্রাপ্ত বস্তু দর্শন করিয়া প্রকৃতিস্থ ভাবে অবস্থান করেন; পরন্তু যাঁহারা তত্ত্বদর্শী পুরুষ, তাঁহারা উদাসীন-ভাবে সাক্ষী মাত্রে অবস্থিত হইয়া থাকেন। নৈশ দীপাবলী যেমন প্রকাশ-কার্য্যে কর্ত্রী হইয়াও অন্যের প্রেরণা বিনা অকর্ত্রী হইয়া পড়ে, তেমনি উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরাও সন্নিধি মাত্রেই কর্ত্তা হইয়া থাকেন; পরন্তু তাঁহারা স্বয়ং কিছুই করেন না। স্বচ্ছ দর্পণ কিম্বা কোন উজ্জ্বল মণিরত্ন যেমন আত্ম-গত প্রতিবিম্বকে প্রকাশ করে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে যেমন কোন বস্তুসত্তারই সম্পর্ক রাখে না, তেমনি যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানশালী মহাপুরুষ, তাঁহারা আত্মপ্রতিবিম্ব কার্য্যকলাপের বাহ্যতঃ কর্ত্তা হইলেও নিজেরা তৎ-সমুদায়ে যেন অনভিনিবিষ্ট-ভাবেই বিরাজ করেন।

বৎস! কোনই বাসনাকলঙ্ক নাই বলিয়া সতত যাহা মননশীলরূপে বিরাজমান, তুমি সেই আত্মার সাহায্যেই আপনার হৃৎ-পদ্ম মধ্য হইতে ভব-ভ্রম বিদূরিত করিয়া ফেলো এবং স্বস্বরূপে বিরাজ করিয়া আত্মাতেই সন্তোষ প্রাপ্ত হও।

বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২০ ॥

একবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! তৎকালে মহামতি পুণ্য পাবনকে এইরূপ প্রবোধ প্রদান করিলে, তিনি পরিনিষ্ঠিত আত্মনিশ্চয় পরিজ্ঞাত হইলেন। প্রবোধোদয় হইবামাত্র প্রভাতকালীন ভূতলের ন্যায় তদীয় সাতিশয় প্রকাশশ্রী প্রাদুর্ভূত হইল। তখন উভয় ভ্রাতাই সিদ্ধ হইলেন, জ্ঞান-বিজ্ঞানের পারদর্শী হইলেন এবং যতকালে না প্রারব্ধের ক্ষয় হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত সেই কাননাভ্যন্তরেই বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইল। অনন্তর উভয় ভ্রাতাই স্ব স্ব দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তৈল-পরিহীন প্রদীপের ন্যায় নির্ব্বাণপদবী প্রাপ্ত হইয়া পরম উপশম লাভ করিলেন।

হে রঘুপ্রবর! এইরূপে পূর্ব্বোপভুক্ত দেহসমূহের বন্ধু-বান্ধব অসংখ্য; কিন্তু বল দেখি, কে কবে তাহাদের কাহারও জন্য শোক প্রকাশ করে, কিম্বা কেই বা কাহাকে কখন পরিত্যাগ করিয়া থাকে? অতএব হে রঘুনন্দন! এই শোকাদির মূলীভূত অনন্ত বাসনার বিসর্জ্জনই একমাত্র কর্ত্তব্য; পরন্তু উহার বৃদ্ধি বিধান করা কোন ক্রমেই সমুচিত নহে। যেমন শুষ্ক ইন্ধন-রাশির সহিত যোগ করাইলে অনল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, তেমনি যত চিন্তা করা যায়, চিন্তার দেহ ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অন্য দিকে ইন্ধনের অভাব হইলে অনল যেমন আপনা হইতে প্রশমিত হইয়া যায়, তেমনি চিন্তার অভাব নিবন্ধনই চিন্তার মূলোচ্ছেদ হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, পূর্ব্বে যে 'ধ্যেয়' বাসনার বিষয় উল্লেখ করিয়াছি, তুমি তাহার পরিত্যাগরূপ রথারোহণ

করিয়া সর্ব্বভূতে সদয় ও উদার দৃষ্টি নিপাতিত করত দীন লোকদিগকে দেখিবার জন্য উত্থিত হও এবং প্রকৃত ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিতে থাক।

বৎস! ইহার নাম ব্রাহ্মী স্থিতি; ইহা শুদ্ধ, স্বচ্ছ ও বিগতাময়। হে মহাবাহো! এই ব্রাহ্মী স্থিতিকে একবার পাইলে অতি বড় বিমূঢ় লোকও কদাচ মোহগ্রস্ত হয় না। হে রাম! বিবেকরূপ বন্ধুকে ও পরমার্থ-বোধ-রূপিণী প্রিয়সখীকে সমভিব্যাহারে লইয়া যে ব্যক্তি সতত বিহারপরায়ণ হয়, বিবিধ বিপৎ পাতেও তাহার মোহ প্রাপ্তি হয় না। যে সঙ্কটে ধন কিম্বা বন্ধুজন সকলেই বিদূরিত হয়, একমাত্র স্বীয় ধৈর্য্য ব্যতীত সে সঙ্কট হইতে কেহই উদ্ধার পাইতে পারে না। সমস্ত বিঘ্ন বিপদ বিদূরিত করিবার নিমিত্ত বৈরাগ্যাভ্যাস, শাস্ত্রচর্চ্চা, ও মহত্ত্বাদি গুণসমূহ দ্বারা সর্ব্বাগ্রে মনকে স্বয়ং সমুন্মূলিত করা কর্ত্তব্য। চিত্ত যদি অকিঞ্চিৎকর বিষয়-নিষ্পৃহতায় উপচিত হয়, তাহা হইলে যাদৃশ অপূর্ব্ব ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, ত্রিভুবনের যাবতীয় ঐশ্বর্য্য বা রত্নরাশিময় ধনাগার হইতেও সেরূপ ফল সমধিগত হওয়া যায় না। যাহারা প্রতিনিয়ত অধঃপাতে বা নরকে যাই-তেছে, ঊর্দ্ধে প্রয়াণ করিতেছে, এবং কর্ম্মভূমিতে জন্মপরম্পরায় ভ্রমণ করি-তেছে, তাহাদের চিত্ত সদাই শোকতাপাদিতে পরিপূর্ণ থাকে বলিয়া কদাপি বিশ্রান্তি পাইতে পারে না। বলিতে পার, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধি-ভৌতিক ভেদে তাপত্রয় এবং রোগ, বর্ষা, আতপ, চোর ও সর্পাদি সন্তাপ হেতু সকল বিদ্যমানে কিরূপে মনের প্রশান্তিমাত্রেই সমস্ত তাপ নিবৃত্তি সংঘটিত হইবে? এ বিষয়ে বলা যায় যে, উক্ত ত্রিবিধ তাপই মনোদোষ-মূলক; সুতরাং মন যদি বিশুদ্ধ ব্রহ্মসুধারসে পরিপ্লুত হয়, তাহা হইলে সকল জগৎই আনন্দময়রূপে প্রতিভাত হয়। দৃষ্টান্ত দেখ, পাদদ্বয় যাহার মৃদুল উপানহযুগলে পরিবৃত, এই কুশকণ্টকাদিময়ী নিখিল ভূমিই তাহার নিকট মৃদুলতর চর্ম্মাস্তৃত বলিয়া বিভাত। যাহার মন আশাদেবীর চির দাস, সে মন তাহার বৈরাগ্যযোগেও পূর্ণতা লাভ করে না; পরন্তু শরদাগমে সরোবর যেমন পঙ্কাবশেষ হইয়া শূন্যতায় উপনীত হয়, চিত্তকেও তেমনি আশা আসিয়া তখন শূন্য করিয়া ফেলে। অগস্ত্যপীত সাগর যেমন শূন্য হওয়ায় তদন্তর্গত জলজন্তু প্রভৃতি প্রকাশ পায়, তেমনি

আশাবাহী ব্যক্তিবর্গের চিত্তও শূন্য হইয়া রাগাদি দোষরাশির প্রকাশক হইয়া থাকে। যে চিত্ত-পাদপে বৈরাগ্য ও শান্তি প্রভৃতি ফল-পুষ্প বিরাজিত, তাহাতে যদি তৃষ্ণারূপিণী চপলা বানরী বাস করে, তবে হউক না কাননবৎ বিস্তৃত, তথাপি সে চিত্তের শোভা কিছুতেই হয় না। চিত্ত যাঁহাদের স্পৃহারহিত, এই ত্রিভুবনকে তাঁহারা পদ্মবীজবৎ ক্ষুদ্র, যোজন-সমূহকে গোষ্পদ-গর্ত্তবৎ স্বল্পায়তন এবং একটা অতি বৃহৎ কালকেও অর্দ্ধ নিমিষবৎ অনুভব করিয়া থাকেন। স্পৃহাহীন মন যেরূপ শীতলতার আধার, সেরূপ শীতলতা সুধাকরে, হিমালয়-কন্দরে, কদলীস্তম্ভে কিম্বা চন্দনপঙ্কেও সম্ভব নহে। স্পৃহাহীন মন যেরূপ কমনীয় ও সৌম্য, মনে হয়, পূর্ণেন্দু, পূর্ণ ক্ষীরাব্ধি বা লক্ষ্মীদেবীর বদনপদ্মও সেরূপ কান্ত বা সৌম্য নহে। যেমন মেঘলেখা শশীকে এবং মসী সুধালেপকে দূষিত করিয়া দেয়, আশারূপিণী পিশাচিকা তেমনি মানুষের অন্তর কলুষিত করিয়া থাকে। চিত্ত পাদপের আশানাম্নী শাখাসকল নিখিল দিঙ্মণ্ডল ব্যাপিয়া বিরাজ করে, যদি ঐ সকল শাখা ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে চিত্তরূপ মহা মহীরুহও নীরূপতা প্রাপ্ত হয়। তৃষ্ণারূপিণী শাখারাজি ছিন্ন হইয়া গেলে, চিত্ত-পাদপ স্থাণুভাব লাভ করে এবং তদবস্থায় স্থাণুর অধোজাত তরুগুচ্ছের ন্যায় ধৈর্য্য-তরু তখন শত শত শাখায় সমন্বিত হইয়া উন্নতির উচ্চ সীমায় উপনীত হয়। ফল কথা, এই চিত্ত ক্ষয় প্রাপ্ত হইলেই ধৈর্য্য প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং যথায় গেলে আর নাশের সম্ভাবনা নাই, সেই ধৈর্য্যশালী লোক তথাবিধ পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। হে রাঘব! তুমি উত্তমাশয় হইয়া এই আশাময়ী চিত্তবৃত্তিগুলিকে যদি আর কখনই উদ্ভূত হইতে না দেও, তাহা হইলে নিশ্চয় বলিতে পারি, জনন-মরণাদি নিবন্ধন ভয় কিছুতেই তোমর হইবে না। চিত্ত তোমার বৃত্তিহীন হইয়া যখনই অচিত্ততায় পরিণত হইবে, দেখিবে—তখনই তোমার অন্তরে তুমি মোক্ষময়ী পূর্ণ ভাব লাভ করিতে পারিবে। তৃষ্ণারূপিণী পিশাচিকা প্রবেশ করিয়া যাহার অন্তর ক্ষুব্ধ করিয়া তুলে, নিখিল অমঙ্গল আসিয়া তাহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। বিষয়চিন্তাই চিত্তবৃত্তি আখ্যায় অভিহিত। তাদৃশ চিন্তা-ব্যাপারে চিত্ত আশার সহিতই প্রবৃত্ত হয়। অতএব হে রাম!

তুমি আশাময়ী চিত্তবৃত্তিকে বিসর্জ্জন করিয়া অচিত্ততা প্রাপ্ত হও। যে যেরূপ বৃত্তির সহিত অবস্থান করে, সে সেই বৃত্তির অভাব হইলেই ক্ষয় পাইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, যদি চিত্তোপশম করিতে চাও, তাহা হইলে চিত্তের বৃত্তিগুলিকে বিনাশ করিয়া ফেলো। বৃত্তি ক্ষয় হইলে চিত্তক্ষয় সহজেই সংঘটিত হইবে।

হে মহামতে! তুমি পুত্র, বিত্ত ও লোকাদি-সংক্রান্ত সমুদায় বাসনা বিসর্জ্জন করিয়া ভববন্ধন ছেদনপূর্ব্বক মুক্তচিত্ত হও। জানিবে—মনের যত কিছু কদাশা, তাহারাই জীবের বন্ধনসাধন রজ্জু। যদি ঐ সকল আশার অবসান হয়, তাহা হইলে আর কে না মুক্ত হয়?

একবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২১ ॥

দ্বাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন—হে রাম! হে রঘুবংশাখ্য আকাশের পূর্ণ সুধাকর! আমি তোমায় এ কথাও বলি, তুমি যদি মদুক্ত উপায় অবলম্বনে অপারগ হও, তাহা হইলে সহসা বিচারোদয়ে বলির ন্যায় বিমল জ্ঞানলাভ করাও তোমার পক্ষে অসম্ভব নহে। আমি আশীর্ব্বাদ করি, তুমি তাহারই ন্যায় অমল জ্ঞান লাভ কর।

রামচন্দ্র কহিলেন— হে ভগবন্! হে সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! আমি ভবদীয় প্রসাদে অখিলাত্মক ব্রহ্ম বস্তু প্রাপ্ত হইয়াছি এবং সেই বিমল ব্রহ্মপদেই বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছি। হে বিভো! শরদাগমে অদভ্র অভ্র যেমন অম্বর হইতে চলিয়া যায়, তেমনি মদীয় মানস হইতে তৃষ্ণাখ্য মহামোহ সকল অপগত হইয়াছে। অধুনা আমি সায়ং-সমুদিত পূর্ণ সুধাকরের ন্যায় শীতল সুধারসময়ী মহাদ্যুতি লাভ করিয়া অন্তরে অপার আনন্দ অনুভব করত অবস্থান করিতেছি। হে ভগবন্! আপনি আমার অশেষ সংশয়-মেঘের শরৎকালবৎ প্রকাশমান। ভবন্মুখ-নির্গত বচনাবলী আমি যতই

শুনি, শুনিবার সাধ আর মিটে না—পূর্ণ তৃপ্তি কিছুতেই আমার আর হয় না; অতএব পুনরায় আমার বোধ বৃদ্ধির নিমিত্ত সেই বিরোচননন্দন বলির বিজ্ঞানপ্রাপ্তির বিবরণ এখন প্রকাশ করিয়া বলুন। হে বিভো! সদাশয় পুরুষেরা বিনীত ভক্ত জনের বাঞ্ছা পূরণে কখনই খেদানুভব করেন না।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—হে রাঘব! শ্রবণ কর, অধুনা আমি বলির সেই উত্তম বৃত্তান্ত বলিতেছি। এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলে, তুমি শাশ্বত তত্ত্ববোধ প্রাপ্ত হইতে পারিবে!

এই ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলের কোন এক দিগ্‌বিভাগে ভূমির অধস্তলে পাতাল নামে এক বিখ্যাত লোক বিরাজমান। ঐ পাতালতলের কোথাও দানব-কন্যাগণ যেন ক্ষীরাব্ধিসম্ভূত সুধারসে লিপ্তাঙ্গ হইয়াই রম্যাকারে সুশোভিত হইতেছে। কোথাও ভীষণ নাগগণ স্বস্ব রসনাযুগলের পরিচালনায় উৎকট নাদ উত্থাপন করিতেছে। ঐ নাগমণ্ডলীর মধ্যে কতকগুলি বিলোল রসনাশালী, কতকগুলি শতশিরা এবং কতকগুলি সহস্রশিরা। কোথাও বা বিশালবপু দানবেরা স্বস্ব দেহবৈপুল্যে যেন সচল সুমেরুর ন্যায় জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে এবং উহারা সবলে যজ্ঞীয় হবি ভক্ষণ করিতে সমুদ্যত রহিয়াছে। কোথাও দিগ্‌গজগণ অবস্থান করিতেছে; তাহাদের গণ্ডস্থলরূপ প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গে এই ভূমণ্ডলের মধ্যভাগ অবস্থিত আছে। তাহারা স্বস্ব দশনরাজিরূপ দ্রুমশ্রেণীর আশ্রয়ীভূত পর্ব্বতবৎ বিরাজ করিতেছে। কোথাও ভীষণ কটকটা ধ্বনি উত্থিত হইতেছে, তৎশ্রবণে ভূতবৃন্দ অত্যন্ত ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছে। কোথাও অতি নিম্নস্থ নরকনিচয়ে দুর্গন্ধময় ভূতগণের স্বকৃত কর্ম্মজনিত প্রতিফল-প্রাপ্তি সংঘটিত হইতেছে। কোন স্থান অধস্তন নরক হইতে আরম্ভ করিয়া মানবাধিষ্ঠিত ভূতল পর্য্যন্ত সপ্ত আপূপ-প্রোত লোহশলাকার ন্যায় সপ্ত পাতালপ্রবিষ্ট রত্ননিধান সুমেরুপ্রভৃতি পর্ব্বতের পাদবৃন্দে এবং কোথাও বা কোন কোন স্থান বিবরবৎ পাতালাবয়বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে; কোথাও ভগবান্ কপিল দেব অবস্থিত হইয়া তথাকার প্রদেশ বিশেষ পবিত্র করিতেছেন; সুরাসুরগণের মস্তকোপরি তদীয় পাদপদ্ম-পরাগ পতিত হইতেছে। কোথাও শাস্ত্রসিদ্ধ

স্বর্ণময় শিবলিঙ্গ মূর্ত্তি অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার প্রসাদে সমগ্র পাতালবাসী সুরক্ষিত হইতেছে। এ হেন পাতালরাজ্যের বিপুল ভার অসুরগণের বাহুস্তম্ভেই সুরক্ষিত। বিরোচন-নন্দন মহাবল বলি এই পাতালরাজ্যের রাজা। সুররাজ ইন্দ্র, সুর-সিদ্ধ-বিদ্যাধর ও উরগগণ সহ তদীয় পাদ সম্বাহন করিবার বাসনা পোষণ করিতেন। যিনি ত্রৈলোক্যস্থ সমস্ত রত্নের আধার, সর্ব্বভূতের পালক এবং সমস্ত ভুবন-ধর্ত্তারও ধারক, সেই হরি স্বয়ং সেই বলির প্রতিপালক। যেমন ময়ূরধ্বনি শুনিয়া সর্পগণের হৃদয় ভয়ে জড়-প্রায় হইয়া যায়, তেমনি বলিরাজের নাম শ্রবণেই ইন্দ্রবাহন ঐরাবতের মদ-জলবর্ষী গণ্ডস্থল বিশুষ্ক হইয়া পড়িত। তিনি যখন ক্রুদ্ধ হইতেন, তখন তাঁহার প্রতাপের তীক্ষ্ণ স্পর্শে প্রলয়ানলের প্রদাহকালের ন্যায় সপ্ত সাগর শুষ্ক হইয়া সপ্ত গর্ত্তাকারে পরিণতি লাভ করিত। তদীয় যজ্ঞীয় ধূম হইতে অজস্র অনন্ত মেঘ উৎপন্ন হইত; সেই মেঘেরা জলাহরণার্থ সাগরে অবতীর্ণ হই-বার উপক্রম করিলে মনে হইত, তাহারা যেন সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড-কোটরের আবরক হইয়া উঠিয়াছে; তাঁহার কুটিল দৃষ্টিপাতে ধরার আধার কুলাচলকুল বিধূত হইলে দিক্ সকল ফলভারনম্র লতার ন্যায় নত হইয়া পড়িত। সেই শক্তিশালী অসুরাধিপতি বলি ত্রিভুবনস্থ যাবতীয় লোকের ভূষণ-স্বরূপ ইন্দ্রাদি সুরাধিপতিদিগকেও অনায়াসে পরাভূত করিয়া দশ কোটি বর্ষ যাবৎ রাজ্য পালন করেন।

অনন্তর জলাবর্ত্ত-স্বভাব বহু যুগ-যুগান্ত কাল কাটিয়া গেল। এই অতি দীর্ঘকাল মধ্যে কত কোটি কোটি দেব-দানব জন্মিল এবং ধ্বংস পাইল, তাহার ইয়ত্তা রহিল না। পরন্তু দানবনায়ক বলি এত কাল কেবল অভি-লাষানুরূপ পরমোত্তম ভোগ্য বস্তু সকল উপভোগ করিলেন। অনবরত বিষয় ভোগ করিয়া-করিয়া ক্রমশঃ তাহাতে তাঁহার বিরাগ জন্মিল।

একদা বলি রাজা সুমেরুশৈলের সর্ব্বোচ্চ শিখরস্থিত হৈম ভবনের রত্ন-খচিত বাতায়নপ্রান্তে উপবেশন করিয়া নিজে নিজেই এই সংসার-গতির বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, আমি আর এখন সংসারে থাকিয়া কত কাল অপ্রতিহত-প্রভাবে সাম্রাজ্য সংরক্ষণ করিব? এবং আর কত কালই বা আমি এমনি ভাবে এই ত্রিলোকমধ্যে

বিহার করিয়া বেড়াইব? এই ত্রিভুবনের মধ্যে স্বীয় সাম্রাজ্য [illegible] অপূর্ব্ব এবং অতি বৃহৎ। এ সাম্রাজ্যে কোন ভোগেরই অভাব নাই। সতত ভূরি ভোগে ইহা অতীব মনোহর। কিন্তু কি জানি, এ [illegible] করিয়া আমার কোন্ ফল সাধিত হইবে? এ ভোগের পরিণাম [illegible] মনোরম হইতে পারে না; কেন না, পৌরুষের নিখিল ভোগই আপাত-মধুর; পরন্তু পরিণামে সকলই বিনশ্বর। সুতরাং আমি যে এই ত্রৈলোক্য-রাজ্যের অশেষ ভোগ উপভোগ করিতেছি, আমার পক্ষে এই ভোগ-সেবা কদাচ মঙ্গলাবহ হইবে না। দিন যায়, রাত্রি আইসে; পুনরায় দিন, দিনের পর আবার রাত্রি; অনবরত এইরূপই ঘটিতেছে। স্নান, পান, ভোজন, শয়ন ইত্যাদি কর্ম্মগুলি সেই একইভাবে পরপর চলিয়া আসিতেছে। এ সকল কর্ম্মে নূতনত্ব কিছুই বিদ্যমান নাই। সুতরাং যাহা পুরাতন, বারম্বার তাহার অনুষ্ঠানে লজ্জাভয়েই আবর্জ্জিত হইতে হয়; প্রকৃত সন্তোষ তাহাতে জন্মে না। একবার কান্তাকে আলিঙ্গন করা, আবার সেই কান্তালিঙ্গন ও কান্তা-সম্ভোগেই নিরত হওয়া, এইরূপে বারবার একই ব্যাপারের অনুশীলন আমার নিকট শিশু-জনেরই ক্রীড়া বলিয়া মনে হয়; এ হেন ক্রীড়ায় কালাতিপাত করা মহৎ ব্যক্তিগণের লজ্জারই বিষয় বটে। বস্তুতঃ সেই সেই ভুক্ত-বিরস ব্যাপারপরম্পরা দিবসে দিবসে অনুষ্ঠান করিয়া প্রাজ্ঞ পুরুষ কেনই বা না লজ্জিত হইবেন? পুনরায় দিন, পুনরায় রাত্রি, পুনর্দিবা, পুনঃপুন কার্য্যপরম্পরা, এইরূপে পুনঃপুন এই প্রকার ক্রিয়াচরণ, প্রাজ্ঞজনের বিড়ম্বনার বিষয় বলিয়াই মনে হয়। জল যেমন একবার তরঙ্গত্ব পাইয়া আবার নিস্তরঙ্গতা প্রাপ্ত হয়, এই জনমণ্ডলীও তেমনি সেই সেই পূর্ব্বোপভুক্ত ক্রিয়াপরম্পরা উপগত হইতেছে। এই যে বারবার অনুষ্ঠিত স্নান-ভোজনাদি একই জাতীয় ক্রিয়াপরম্পরা, ইহা উন্মত্ত-চেষ্টা অথবা বাললীলার ন্যায়ই বারম্বার বিজ্ঞজনকে উপহাস করিতেছে। প্রতি-দিবসে এইরূপ ক্রিয়াপরম্পরা বারম্বার অনুষ্ঠান করিয়াও ইহাতে এমন কোন ফলই পাওয়া যায় না, যাহা পাইলে অপর কর্ত্তব্য অবশিষ্ট থাকে না। এখানে আর কত কাল আমরা এই বৃথা আড়ম্বরময় বিড়ম্বনা ভোগ করিব? এ সংসারে আমরা এই সকল অনুষ্ঠান করিতেছি, কিন্তু পরিণামে আমাদের

কি ফল পাইবার সম্ভাবনা আছে? সংসারের এ ক্রিয়া অনন্ত; বস্তুত ইহা বস্তুশূন্য শিশুর খেলা বলিয়াই প্রতীত। যাহারা অনন্ত দুঃখ পাইবার জন্য কর প্রসারণ করে, তাহারাই বারবার ইহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। এমন কোন একটা অতি বড় উদার ফল ইহাতে কিছুই দেখিতে পাই না, যাহা পাইলে অন্য কোনই কর্ত্তব্যশেষ থাকে না। এই ত আমার সংসার; এ সংসারদশায় ভোগ ভিন্ন অন্য ফল কৈ কিছুই তো পাই না,—যাহা অবিনশ্বর বা যাহা নিত্য। ফলে এ সংসারভাবে নিত্য ফল যে কিছুই নাই, ইহাই আমার বর্ত্তমান ভাবনার বিষয় হইয়াছে।

দানবরাজ বলি এই বলিয়া মনে মনে কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিলেন। পরে আবার তিনি ভ্রূভঙ্গী সহকারে মনে মনে কি এক বিষয় বিচার করিয়া বলিতে লাগিলেন,—অহো! আমার স্মরণ হইয়াছে। আমার পূজনীয় পিতৃদেব বিরোচন তত্ত্বদর্শী ছিলেন। আমি পূর্ব্বে এক দিন তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, হে মহামতে! এই সকল সাংসারিক সুখ-দুঃখ-পরম্পরার যাবতীয় ব্যাবহারিক ভ্রান্তি যথায় উপশান্ত হইয়াছে, প্রাজ্ঞ পুরুষেরা এই সেই সংসার-সীমার অন্ত বা অবধি বলিয়া কাহাকে নির্দ্দেশ করেন? মনের মোহ কোথায় উপশান্ত হয়, কোথায় বা সকল বাসনার অবসান ঘটিয়া থাকে? হে তাত! পুনরাবৃত্তি-রহিত চিরবিশ্রান্তিই বা কোথায় গিয়া প্রাপ্ত হওয়া যায়? এমন সুখই বা কি আছে, যাহা পাইয়া পুরুষ এই দেহেই ব্রহ্ম লোকান্ত যাবতীয় বিষয় ভোগ হইতে প্রাপ্য সুখে পরম তৃপ্তিমান্ হইয়া অবস্থান করে? এবং এমন কোন্ বিষয় আছে, যাহা দর্শন করিলে অপর দর্শনস্পৃহা থাকে না?

হে তাত! এই যত কিছু ভোগসামগ্রী দেখিতেছি, ইহাদিগকে তো কিছুতেই সুখাবহ বলা যায় না। কেন না, ইহারা অতি উদার সাধু পুরুষদিগেরও মন ক্ষোভিত ও মোহার্ণবে পাতিত করিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে পিতঃ! যেখানে থাকিয়া আমি চির বিশ্রাম লাভ করিতে পারি, আপনি সেই স্থিরানন্দ-সুন্দর বিষয়-বিশেষের বিবরণ আমায় বলুন।

আমি আমার পিতাকে যখন এইরূপ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তখন তিনি

একটী কল্প পাদপের তলদেশে বসিয়া মৎকৃত প্রশ্নাবলী শ্রবণ করেন। ঐ কল্পপাদপ পূর্ব্বকালে আমার পিতৃদেবই স্বর্গ হইতে আনয়ন করিয়া স্বীয় আবাস-ভবনের প্রাঙ্গণে রোপণ করিয়াছিলেন। সুধাংশুর অংশু-পুঞ্জবৎ ভূপতিত কুসুমস্তবকে ঐ পাদপের মূলদেশ সদাই সমাচ্ছন্ন থাকিত। ক্ষীরাব্ধি হইতে ঐ পাদপের উদ্ভব হইয়াছিল, পিতা আমার প্রশ্ন শুনিবার পর মদীয় অজ্ঞানভ্রম অপনীত করিবার নিমিত্ত অতি মনোরম বাক্য বলিয়াছিলেন; সে বাক্য—ঐ কল্পপাদপেরই মকরন্দবৎ সুন্দর, সুমধুর ও জন্ম-জরা-মরণাদি নিখিল দুঃখের বিনাশক। অহো! এখন সেই পিতৃবাক্যই আমার স্মৃতিপথে জাগরূক হইতেছে।

দ্বাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২২ ॥

ত্রয়োবিংশ সর্গ।

বিরোচন বলিলেন,—হে পুত্র! এমন এক বিশাল বিস্তীর্ণ দেশ আছে, যাহার অভ্যন্তরে বহুসহস্র ত্রৈলোক্যের স্থান সঙ্কুলন হইতে পারে। সে দেশে না মেঘ, না সাগর, না শৈল, না বন, না তীর্থ, না নদী, না সরোবর, না মহী, না আকাশ, না স্বর্গ, না পবন, না চন্দ্র, না সূর্য্য, না লোকপাল, না দেব, না দানব, কিছুরই অস্তিত্ব নাই। অপিচ, সে দেশে পিশাচ নাই, যক্ষ নাই, রক্ষ নাই, গুল্ম নাই, বনশ্রী নাই, কাষ্ঠ নাই, তৃণ নাই, চর বা অচর পদার্থ নাই, জল নাই, অগ্নি নাই, দিক্ নাই, ঊর্দ্ধ বা অধোদেশ নাই, কোন লোক নাই, আতপ নাই, আমি নাই, হরি, হর বা ইন্দ্রাদি দেবগণ কেহই নাই। সে দেশে একজন মাত্র মহাপুরুষ আছেন, তিনিই তথাকার মহামহিমান্বিত রাজা। সে রাজা সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বগামী ও সর্ব্বময়। তিনি কাহারও সহিত কথা কহেন না, সদাই মৌনী হইয়া অবস্থান করেন। তাঁহার একজন মাত্র মন্ত্রী; সে মন্ত্রী তাঁহারই সঙ্কল্পিত ব্যক্তি। মন্ত্রী মহাশয় সততই সমন্ত্রণায় তৎপর। তিনি অঘটন-ঘটনে পটীয়ান্ এবং যাহা সুঘটিত

সত্য, তিনি তাহারও অঘটন করাইতে সক্ষম। তাঁহার নিজের কোনই ভোগ-ক্ষমতা নাই এবং কি করিয়া যে ভোগ করিতে হয়, তাহা তিনি জানেনও না। তিনি নিজে অজ্ঞ বটেন; কিন্তু কেবল রাজারই নিমিত্ত নিয়ত তিনি না করেন হেন কার্য্য কিছুই নাই। সে দেশের মহারাজের যে কোন কার্য্যই হউক, একমাত্র সেই মন্ত্রী মহাশয়ই তাহা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। মহারাজ কেবল একান্তে স্বস্থভাবেই অবস্থান করেন।

বলি বলিলেন,—হে মহামতে! আপনি যে আধিব্যাধি-বর্জ্জিত দেশের কথা কহিলেন, সে দেশ কোন্ দেশ? সে দেশের নাম কি? হে প্রভো! ঐ দেশ কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়? কেই বা সেই দেশ প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইয়াছে? আপনি যে মন্ত্রীর বিষয় বলিলেন, সেই মন্ত্রীই বা কে? আর যিনি সে দেশের মহামহিম মহাবল রাজা, তিনিই বা কে? এই বিশাল জগজ্জাল আমরা হেলাক্রমে ছিন্ন করিয়াছি, কিন্তু কৈ সেই রাজাকে তো আমরা জয় করিতে পারি নাই? হে সুরসমূহের ভয়াবহ! আপনি এই অভূতপূর্ব্ব উপাখ্যান আমার নিকট বিবৃত করুন, মদীয় হৃদাকাশে যে সংশয়মেঘ আছে, তাহা আপনি অপনীত করিয়া দিন।

বিরোচন বলিলেন,—হে সুত! সেই যে মন্ত্রীর কথা কহিয়াছি, তিনি বড়ই বলবান্। বলিতে কি, যদি লক্ষ লক্ষ দেব দানব একযোগে তাঁহাকে আক্রমণ করেন, তথাপি বলে তাঁহাকে আঁটিয়া উঠা অসম্ভব। হে পুত্র! ঐ মন্ত্রী দেবেন্দ্র নহেন, যম নহেন, কুবের নহেন, অমর নহেন, বা কোন অসুর নহেন যে, তুমি তাঁহাকে জয় করিতে পারিবে? অসি বল, মুষল বল, প্রাস বল, বজ্র বল, চক্র বল, আর গদা বল, যে কোন অস্ত্রই হউক, পাষাণাহত কমলমালার ন্যায় সে সমুদায় সেই মন্ত্রীর গাত্রে কুণ্ঠিত হইয়া যায়; কোন অস্ত্র কিম্বা শস্ত্রের তিনি আয়ত্ত নহেন। প্রচণ্ডকর্ম্মা যোদ্ধৃপুরুষেরাও তাঁহার কিছু ক্ষতি করিতে পারে না। সমগ্র সুর ও অসুরদিগকে তিনিই বশে রাখিয়াছেন। প্রলয়ের প্রভঞ্জন যেমন সুমেরু ও কল্পদ্রুম-প্রভৃতিকে নিপাতিত করিয়া ফেলে, তেমনি ঐ মন্ত্রী নিজে বিষ্ণু না হইলেও হিরণ্যপ্রমুখ দানবেন্দ্রদিগকে নিহত করিয়াছেন। তাঁহার ক্ষমতা-অসাধারণ, কেন না যাঁহারা সকলের জ্ঞানদাতৃপদে বিরাজিত, সেই শ্রীমান্ নারায়ণ

প্রভৃতি দেবগণকেও তিনি অভিভূত করিয়া কখন কখন সবংশে গর্ত্তমধ্যে পাতিত করিয়া থাকেন। একমাত্র তাঁহারই প্রসাদে রতিপতি পাঁচটী মাত্র শরের সাহায্যে এই ত্রিভুবন সগর্ব্বে আক্রমণ করিয়া সম্রাটের ন্যায় মহোল্লাসে বিরাজ করিতেছে। যাহার গুণ নাই, যে সদাই দুর্ম্মতিগ্রস্ত ও দুরাকৃতি এবং সুরাসুরগণ যাহার বশতাপন্ন, সেই দুর্দ্ধর্ষ ক্রোধও তাঁহারই প্রসাদে বিলসিত হইতেছে। এই যে বারম্বার সুরাসুরগণের সংগ্রাম সংঘটিত হয়, এই সংগ্রামও সেই মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রী মহাশয়েরই খেলা। হে তাত! যদি সেই দেশের রাজা চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনিই কেবল সেই মন্ত্রী মহাশয়কে জয় করিতে পারেন; নতুবা তাঁহাকে জয় করিবার সামর্থ্য অন্য কাহারও নাই। বস্তুতঃ সেই মন্ত্রী অন্য লোকের নিকট পাষাণের ন্যায় অচল ও অটল; কিন্তু রাজার প্রভাবের নিকট মন্ত্রিবর সততই হতবল। সুতরাং কালক্রমে তিনি যদি কখন মন্ত্রীকে পরাজয় করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার সে ইচ্ছা অক্লেশেই পূর্ণ হয়।

রামচন্দ্র! এই ত্রিলোকে যে সকল বলিষ্ঠ ব্যক্তি আছে, তন্মধ্যে ঐ মন্ত্রীই একজন প্রধান মল্লস্বরূপ। এ জগৎ তাঁহারই প্রতাবে মুমূর্ষু প্রাণীর ন্যায় নিরন্তর ঊর্দ্ধশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছে। তোমার যদি ঐ মন্ত্রীকে জয় করিবার শক্তি থাকে, তাহা হইলে বলিব, তুমি একজন প্রকৃতই পরাক্রমশালী। সেই মন্ত্রিরূপ মার্ত্তণ্ডের অভ্যুদয়ে এই ত্রৈলোক্যরূপ কমলাকর সকল বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং তিনি অস্তমিত হইলে ইহাদেরও বিলয় ঘটিয়া থাকে। হে সুব্রত! যদি তুমি ব্যামোহ-বিহীন একাগ্র বুদ্ধির সহায়তায় ঐ মন্ত্রিবরকে জয় করিতে সমর্থ হও, তাহা হইলে বুঝিব,—তুমিই বটে বীর পুরুষ। তুমি তাঁহাকে জয় করিবার চেষ্টা কর, যদি কৃতকার্য্য হও, দেখিবে—যে সকল লোক তোমার কদাচ বিজিত হয় নাই, সে সমুদায়ও তোমার বিজিত হইয়া যাইবে। আর যদি তুমি ঐ মন্ত্রীকে জয় করিয়া উঠিতে না পার, তাহা হইলে নিশ্চয়ই জানিবে, এই সকল লোক তুমি চিরকাল বসিয়া জয় করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইহারা জিত হইবে না। তাই বলিতেছি, অক্ষয় সিদ্ধিলাভ ও শাশ্বত সুখ-সম্প্রাপ্তির নিমিত্ত অতি ক্লেশকর চেষ্টায় তৎপর হইয়াও তাঁহাকে জয় করিতে সমুদ্যত হও। আমি

যে তোমার নিকট এই মহাবল মন্ত্রীর পরিচয় প্রদান করিতেছি, সুর, অসুর, কিন্নর, নর, যক্ষ, উরগ ও নাগাদি-পরিবৃত এই সমস্ত জগৎ অনায়াসে তাঁহার বশে অবস্থান করিতেছে, তিনিই সবলে হেলাক্রমে যাবতীয় জগৎ বশীকৃত করিয়া রাখিয়াছেন।

ত্রয়োবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৩ ॥

চতুর্বিংশ সর্গ

বলি বলিলেন,—হে তাত! কি উপায়ে সেই বলবান্ ব্যক্তিকে জয় করা যায়? এবং ঐ মহাবীর্য্যশালী ব্যক্তি কে? এ সকল আমার নিকট সত্বর প্রকাশ করিয়া বলুন।

বিরোচন বলিলেন,—বৎস! ঐ মন্ত্রী যদিও সতত সকলেরই অজেয়, তথাপি উহঁাকে যাহাতে সহজে জয় করা যায়, সে উপায় তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে পুত্র! যদি ঐ মন্ত্রীকে যুক্তিবলে গ্রহণ করা যায়, তবেই তিনি ক্ষণমধ্যেই বশীভূত হইয়া থাকেন। যুক্তি ব্যতীত ঐ মন্ত্রী উদ্ধত আশীবিষবৎ সকলকে দগ্ধ করিয়া থাকেন। যুক্তিবলে বালকবৎ লালন করিয়া যাহারা উহঁাকে নিয়মিত করিয়া লয়, তাহারা সেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারে, এবং সেইরূপ সাক্ষাতের ফলে তাহাদিগের সেই রাজপদ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। সেই রাজার সহিত সাক্ষাৎ হইলে তদীয় মন্ত্রীও বশীভূত হইয়া থাকেন। রাজমন্ত্রীকে আক্রমণ করিয়া বশীভূত করিতে পারিলেই সেই রাজার দর্শন লাভ করা যায়, যত দিনে না রাজার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটে, তাবৎকালের মধ্যে ঐ মন্ত্রীকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করা যায় না। আবার ঐ মন্ত্রীও যত দিন না বিজিত হন, তাবৎ-কালের মধ্যে সম্যক্‌রূপে রাজসন্দর্শন হওয়া অসম্ভব। রাজার সহিত সাক্ষাৎকার না ঘটিলে সেই দুর্দ্দান্ত মন্ত্রী হইতে কেবল দুঃখ-লাভই হয়। মন্ত্রী অনির্জ্জিত রহিলে সেই মহারাজ একান্তই দুর্লভদর্শন হইয়া থাকেন। ফলে সেই রাজাকে না দেখিলে, মন্ত্রীকে জয় করা যায় না, আবার মন্ত্রীকে জয়

করিতে না পারিলেও রাজার দর্শন লাভ ঘটে না। অতএব এরূপ স্থলে যাহাতে এককালে সেই রাজসন্দর্শন ও মন্ত্রীর পরাজয় ঘটে, পুরুষকার-প্রযত্নে স্বীয় অভ্যাসক্রমে ধীরে ধীরে তাদৃশ উপায়ই অবলম্বন করিবে। যত্ন করিয়া অভ্যাসগুণে যুগপৎ যদি উক্ত উভয় কার্য্যই সম্পাদন করা যায়, তাহা হইলে সেই রাজার মঙ্গলময় দেশে অনায়াসে উপনীত হওয়া যায়। হে দৈত্যবর! তুমি যদি অভ্যাসের গুণে সেই রাজার শুভময় দেশে গিয়া উপস্থিত হইতে পার, তাহা হইলে আর কখনই তোমাকে কিঞ্চিন্মাত্র শোকানুভব করিতে হইবে না। সে দেশে যে সকল সাধু লোক বাস করেন, তাঁহাদের আর কোনই আয়াস নাই, তাঁহারা অশেষ সংশয় হইতে পরিমুক্ত ও সর্ব্বদাই আনন্দিতচিত্তে বিরাজিত রহিয়াছেন। হে পুত্র! সে দেশ কোন্ দেশ, তাহা তোমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি সকল দুঃখাপনোদক মোক্ষকেই ঐ দেশ নামে নিরূপিত করিয়াছি। যিনি সর্ব্ববিধ পদের অতীত, অবাঙ্মনস-গোচর ভগবান্ পরমাত্মা, তিনিই এই দেশের মহারাজা। হে মতিমন্! তিনি যাহাকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহার নাম মন। মৃৎপিণ্ডের অভ্যন্তরে ঘটত্ব সূক্ষ্মভাবে অবস্থান করে বলিয়া মৃৎপিণ্ড যেমন ঘটাকারে পরিণত হইয়া থাকে, এবং ধূমাভ্যন্তরে ধূমভাব সূক্ষ্মরূপে থাকে বলিয়া ধূম যেমন মেঘাকারে পরিণতি প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই বিশ্বপ্রপঞ্চ উল্লিখিত মনের অভ্যন্তরে বাসনাত্মক সূক্ষ্মভাবে বিরাজ করে বলিয়া ঐ মনই এই বিশ্বপ্রপঞ্চরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি ঐ মনকে জয় করা যায়, তাহা হইলে সকলই জিত ও সকলই আসাদিত হইয়া থাকে। কিন্তু জানিয়া রাখিবে, ঐ মন বড়ই দুর্জ্জয়; একমাত্র যুক্তিবলেই উহাকে জয় করা যায়।

বলি বলিলেন,—হে প্রভো! ঐ দারুণ মনকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় করিতে যেরূপ যুক্তির প্রয়োজন, আপনি আমার নিকট তাহা বিশদরূপে ব্যক্ত করুন।

বিরোচন বলিলেন,—হে পুত্র! যত কিছু বিষয় আছে, তৎপ্রতি একান্ত অনাস্থা স্থাপনই মনোজয়-ব্যাপারে প্রধান যুক্তি। ঈদৃশ পরম যুক্তির সহায়তা-গুণেই মহামত্ত নিজ চিত্তরূপ মত্ত মাতঙ্গকে দমিত করা যায়।

হে মহামতে! এ হেন যুক্তি একান্তই দুর্লভ অথচ ইহা সুলভও বটে; কেন না, অনভ্যস্ত হইলে অতীব দুর্লভ আর যদি সম্যক্ অভ্যস্ত হয়, তবে ইহা অতীব সুলভ। হে সুব্রত! এই বিষয়-বিরতি ক্রমশ অভ্যস্ত হইয়া সেক-সিক্তা লতার ন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। বৎস! যেমন সুক্ষেত্রে বপন না করিলে, ধান্যোৎপত্তি হয় না, তেমনি এই বিষয়-বিরতিও বিনা অভ্যাসে ভোগলম্পট মনের আকাঙ্ক্ষায় সুসম্পন্ন হইয়া উঠে না; সুতরাং তোমায় বলি, তুমি অভ্যাসগুণে উল্লিখিত বিষয়-বিরতিকে স্থিতিশীল করিয়া লও। দেহিগণ যত দিন না বিষয়-বিরতি লাভে সক্ষম হয়, ততদিন তাহারা সংসার-গহ্বরে পরিভ্রমণ করিয়া কেবলই দুঃখানুভব করে। যাহার গমন-ব্যাপার নাই, তথাবিধ ব্যক্তি যেমন দেশান্তর গমনে সক্ষম হয় না, তেমনি হউক না—অতি বলশালী, তথাপি কোন দেহীই অভ্যাস ব্যতীত বিষয়-বিরতি প্রাপ্ত হইতে পারে না। অতএব 'দেহী আমি, পূর্ব্বোল্লিখিত জীবন্মুক্তির হেতুভূত 'ধ্যেয়' বাসনা ত্যাগ আমার কর্ত্তব্য' এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিয়া অভ্যাসবলে লতার ন্যায় দেহী জনের বিষয়-বিরতি উপচিত করিয়া লওয়া বিধেয়। হে পুত্র! যাহাতে হর্ষ নাই, অমর্ষ নাই, বা অন্য কোন ভাবাভাব নাই, তাদৃশ ক্রিয়াফল যাদৃশ উপায়ে লাভ করা যায়, একমাত্র পুরুষকার ব্যতীত তথাবিধ শুভ উপায় কেহই পাইতে পারে না। বলিতে পার, দৈব হইতেই ত তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে? তদুত্তরে বলিব, লোকে যে দৈব নামে একটা কিছু নির্দ্দেশ করে, তাহার তো আকৃতি কিছুই নাই। অতত্ত্বদর্শী মানবেরা বলিয়া থাকে বটে যে, যাহা অবশ্যম্ভাবী এবং যাহা স্বীয় নিয়ন্তিপ্রযুক্ত শুভাশুভ ক্রিয়া, তাহারই নাম দৈব। পরন্তু যাঁহারা শাস্ত্রজল-প্রক্ষালিত বিমল দিব্য দৃষ্টিশালী লোক, তাঁহারা তাহাকে দৈব নামে নির্দ্দেশ করেন না। তাঁহারা বলিয়া থাকেন, হর্ষামর্ষাদির হেতু-ভূত কর্ম্মপরম্পরার ক্ষয় হইয়া গেলে, যাহা হর্ষামর্ষাদির বিনাশ নিমিত্ত হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাই দৈব নামে নির্দ্দিষ্ট। এই দৈবই নিয়তি-স্বরূপে নির্ণীত এবং ইহা পুরুষকারবলেই সম্পাদিত। ধারণার দৃঢ়তায় মৃগতৃষ্ণায় জলভ্রমের ন্যায় পুরুষ, পুরুষকারপ্রয়োগ সহকারে যে যে সঙ্কল্প করে, সঙ্কল্পের দৃঢ়তা জন্মিলে, প্রায়শঃ তাহা তাহাই হইয়া থাকে। 'অমুক

কর্ম্মের 'অমুক ফল ঘটে' এবম্বিধ নিয়মনিচয়ই নিয়তিনামে নির্দ্দিষ্ট; ইহাও আবার মন হইতেই জন্মে, কাজেই বলা যায়, মনই যাবতীয় বিষয়ের কর্ত্তা; মন সুদৃঢ় সঙ্কল্প সহকারে যাহা কল্পনা করে, তাহাই নিয়তি নামে পরিগণিত হইয়া যথাকালে ফলাকারে পরিগৃহীত হয়। মন যাদৃশ নিয়তির সঙ্কল্প করে, সে নিয়তি সেইরূপই হইয়া থাকে। মন হইতে কখন নিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি হয়, কখন বা অনিয়ত বিষয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকে; আবার কখন কখন মন নিয়ত অনিয়ত উভয় বিষয়েরই সৃষ্টিকর্ত্তা হয়। এতদনুসারে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, মনই কর্ম্ম-নিয়তি ও ফলনিয়তির যোজক। আমাদের মতে এই মনই জীব। এই জীব কদাচিৎ মোক্ষাধিকৃত জন্মে নিত্য নিয়ত একস্বভাব পরমাত্মায় প্রত্যক্ পরমাত্মার সাক্ষাৎকার-নামিকা নিয়তি লাভ করত গগনে পবনের ন্যায় এই জগৎকোশে অসঙ্গভাবে স্ফুরিত হইয়া থাকেন, আবার কদাচিৎ সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া শাস্ত্ররূপ নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব আশ্রমোচিত কর্ম্মানুষ্ঠান করত অজ্ঞদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত 'যাজ্ঞিক, শিষ্ট, সদাচার-প্রবর্ত্তক' ইত্যাদিরূপে নিয়তি শব্দকে লোক-প্রখ্যাত ও সার্থক করাইয়া স্ফুরিত হইতে থাকেন। যেমন গিরিপ্রস্থ নিজে অচলস্বভাব হইলেও বায়ুবেগে দ্রুমরাজি চালিত হইলে চলাকার এবং নির্ব্বাতে স্থির হইলে স্থিরাকারে স্ফুরিত হয়, তেমনি তাঁহারও এই স্ফুরণ যেন চলাচল উভয়স্বভাব। অতএব দেখা যায়, যত দিন মনের আধিপত্য আছে, ততদিন দৈবও নাই, নিয়তিও নাই। হে সাধো! মন অস্তমিত হইয়া গেলে যাহা হয়, হউক। জীব পুরুষাকারে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞানাধিকারী দেহ প্রাপ্ত হইয়া পুরুষকারপ্রভাবে যে যেরূপ সঙ্কল্প করিতে থাকে, তাহার সেই সেই সঙ্কল্পই সিদ্ধ হয়; তাহার অন্যথা কখন হয় না। হে পুত্র! পুরুষার্থ অর্থাৎ ব্রহ্মাহম্ভাব লাভ ব্যতীত এ সংসারে সার কিছুই নাই। অতএব পরম পুরুষকার অবলম্বন করিয়া বিষয়ভোগ-বিরতি আনয়ন করিবে। যত দিনে না ভোগব্যাপারে ভববন্ধনচ্ছেদিনী বিরতি আসিয়া উপস্থিত হয়, ততদিন যাবৎ জয়বিধায়িনী পরম নির্বৃতি কিছুতেই প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যতকাল পর্য্যন্ত মোহজনক বিষয়ানুরাগ রহিবে, ততকাল এই ভবদশারূপিণী দোলায় থাকিয়া অনবরতই দুলিতে হইবে।

ঐ ভবদোলা ভোগজালরূপ ভোগিবৃন্দে বেষ্টিত, অতীব ভয়াবহ ও দুঃখজনক কদাশার আকারে বিরাজিত; বৈরাগ্য, শ্রবণ ও মননাদির অভ্যাস অভাবে ঐ দোলার দোলন কদাচ নিবৃত্ত হইবার নহে।

বলি বলিলেন,— হে অখিল অসুরের অধিপতে! ভোগজালে অরাতি জীবের দীর্ঘজীবনদায়িনী; ইহা কিরূপে জীবের অন্তরে স্থিতি লাভ করে?

বিরোচন বলিলেন,—বৎস! আত্মদৃষ্টিরূপিণী লতা মোক্ষফলে বিভূষিতা; এই লতা শারদীয় মহালতার ন্যায় জীবগণের বিষয়ভোগে বিরাগরূপ অপর ফল প্রসব করিয়া থাকে। যদি আত্মদর্শন ঘটে, তাহা হইলেই পদ্মগর্ভে লক্ষ্মীর ন্যায় ঐ উত্তম বিষয়-বিরতি জীবহৃদয়ে স্থিতি লাভ করে। অতএব প্রজ্ঞা-মণির নিকষ-পাষাণবৎ সুচারু বিচারবলে এককালেই পরমাত্মদেবকে দর্শন করিবে, এবং বিষয়ভোগে বিরাগ আনয়ন করিবে। শাস্ত্র-বিহিত নিয়ম অনুসারে চিত্ত যত দিনে না সুচারু পরিনিষ্ঠতা-লাভে সক্ষম হইবে, ততদিন চিত্তকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার দুই ভাগ দেহধারণ-মাত্রের উপযোগী বিষয়ভোগে, এক ভাগ শাস্ত্রালোচনায় এবং অপর ভাগ গুরুশুশ্রূষায় পূর্ণ করিয়া লইবে। অনন্তর চিত্ত যখন অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিদধিক ব্যুৎপন্ন হইবে, তখন বিষয়ভোগে চিত্তের মাত্র একভাগ, গুরুশুশ্রূষায় দুই ভাগ এবং শাস্ত্রচর্চ্চার নিমিত্ত এক ভাগ পূর্ণ করিবে। যখন দেখা যাইবে, চিত্ত ক্রমে পূর্ণ ব্যুৎপন্ন হইয়া উঠিয়াছে, তখন উহার দুই ভাগ শাস্ত্রালোচনা ও বিষয়-বৈরাগ্যে পূরিত করিবে এবং অপর দুই ভাগকে ধ্যান ও গুরুসেবায় নিয়োগ করিবে। যেমন বিশুদ্ধ বসনে কুঙ্কুমাদির রঞ্জনা সম্যক্ সুস্ফুট হইয়া উঠে, তেমনি জ্ঞান-বাণী শ্রবণের যোগ্যপাত্র শুদ্ধচিত্ত জীবেরই অন্তরে এ হেন সাধুভাব সমুপাগত হইয়া থাকে। এই চিত্তকে শিশুজনের ন্যায় পূত বচনে উপদেশ দিবে এবং যুক্তিবলে ধীরে ধীরে লালন করিতে থাকিবে। ক্রমে চিত্তকে সম্পূর্ণরূপে সৎকর্ম্মে ও শাস্ত্রার্থের দিকে পরিণামিত করিয়া লইবে। এইরূপ করিলে চিত্ত সমস্ত দুরাগ্রহ পরিহার করিবে, পরম জ্ঞানে পরিণত হইবে এবং আত্মার সহিত একভাবাপন্ন হইয়া যাইবে। এই অবস্থায় চিত্ত তাপ-বিরহিত হইয়া জ্যোৎস্না-ধৌত স্বচ্ছ স্ফটিক মণির ন্যায়

অতীব সুন্দরভাবে বিরাজ করিতে থাকিবে। ভেদবুদ্ধি-বর্জ্জিত পরম প্রজ্ঞা-গুণে তখন দেখা যাইবে, এই ভোগসমূহ কি? ভোগ-ভোক্তা কে? দেহ কি? ফলতঃ ভোগ, ভোগভোক্তা জীব ও দেহ, ইহাদের প্রকৃত তত্ত্ব এক মাত্র সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম। এই ব্রহ্মতত্ত্বই তখন দৃষ্ট হইবে। হে সুত! তুমি সতত বুদ্ধির সাহায্যে বিচার কর, বিচারবলে এককালে আত্মদর্শন ও তৃষ্ণা-বিসর্জ্জন কর। যেমন দীপতেজ ও দীপাবস্থা এই উভয়ই যুগপৎ উভয়াশ্রিত, অর্থাৎ তেজে যেমন দীপ আছে এবং দীপে যেমন তেজ রহিয়াছে, তেমনি তৃষ্ণার অভাব ও আত্মদর্শন এই উভয় ব্যাপারও এককালে পরস্পরাশ্রিত; ফল কথা, আত্মদর্শনে তৃষ্ণাভাব এবং তৃষ্ণাভাবেই আত্মদর্শন। যখন বিষয়ভোগে কোনও একটা স্বাদবোধ থাকে না, একাদ্বয় পরব্রহ্মই মাত্র দৃষ্ট হইতে থাকেন, তখনই পরাৎপর ব্রহ্মপদে চির স্থির অনন্ত বিশ্রান্তি সমুদিত হয়; পরন্তু যাহারা ভোগাস্বাদে লম্পট, তাঁহাদের আত্মানন্দ প্রাপ্তি ঘটে না। অসীম অনন্ত শান্তিসুখ লাভ করিতে হইলে, আত্মসাক্ষাৎকারেরই প্রয়োজন; আত্মদর্শন ব্যতীত নিরবচ্ছিন্ন বিষয়ানন্দ হইতে কদাচ জীবের অনন্ত নির্ব্বৃতি ঘটে না। যজ্ঞ বল,—দান বল,—তপস্যা বল, কিম্বা তীর্থসেবাই বল, এ সকল দ্বারা সুখ হয়, এ কথা স্বীকার্য্য; কিন্তু এ কথাও সত্য যে, একমাত্র আত্মসাক্ষাৎকার ভিন্ন তপস্যা, দান বা তীর্থ-পর্য্যটন, এ সকলের কোন কিছুতেই জীবের বিষয়-বৈরাগ্য জন্মে না। আত্মদর্শন-বুদ্ধি শ্রেয়স্করী হইবার পক্ষে পুরুষের নিজ প্রযত্নেরই বিশেষ প্রয়োজন; নতুবা অন্য কোন যুক্তি দ্বারাই তাহার সে বুদ্ধি শ্রেয়স্করী হইবে না। হে বৎস! বিষয় বিসর্জ্জিয়া পরম বস্তু ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারিলে তাহাতে যে বিশ্রান্তিজনিত অপূর্ব্ব সুখ সমুৎপন্ন হয়, এই আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত জগতের কুত্রাপি কোন পুরুষই সেরূপ সুখ সমধিগত হইতে পারেন না। তাই বলিতেছি, যাহাতে আত্মস্বরূপ পরম কারণ পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ ঘটে, বুদ্ধিমান্ জন তথাবিধ উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক দৈবকে বিদূরিত করিবে এবং যাহা শ্রেয়ঃপ্রাপ্তি-পথের অর্গলস্বরূপ, তাদৃশ বিষয়ভোগের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিবে। যেমন বর্ষা উপস্থিত হইবার পর সৌম্য সুনির্ম্মল শরৎ-কাল আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি যৎকালে ভোগব্যাপারে প্রগাঢ় ঘৃণা বা

অবজ্ঞা জন্মিবে, তখন আপনা হইতেই বিচার আবির্ভূত হইবে। বিষয়-ভোগের প্রতি ঘৃণা হইলেই বিচার জন্মে, বিচার উপস্থিত হইলেই বিষয়ে বিরক্তি বা ঘৃণা জন্মিয়া থাকে। বিচার ও বিষয়ের প্রতি ঘৃণা, এই উভয় পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে সাগর ও মেঘের ন্যায় পূর্ণতা লাভ করে। সুস্নিগ্ধহৃদয় বন্ধুগণ যেমন পরস্পর সম্মিলিত হইয়া পরস্পরের কার্য্য সম্পাদন করে, তেমনি বিচার, ভোগগর্হা ও পরমাত্মদৃষ্টি, ইহারা পরস্পর মিলিয়া পরমার্থরূপ কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে দৈবকে অবজ্ঞাত ও প্রযত্নের সহিত পুরুষকারকে সমাদৃত করিয়া দন্ত দ্বারা যেন দন্ত চূর্ণন করিয়াই ভোগব্যাপারে বৈরাগ্য আনয়ন করিবে। যেরূপ পুরুষকার দেশাচারের অবিরোধী এবং বান্ধবগণ যাহা একবাক্যে অনুমোদন করেন, তাদৃশ পুরুষকার প্রয়োগে সর্ব্বাগ্রে ধনসংগ্রহ করিতে হইবে। অনন্তর সেই সংগৃহীত ধনরাশি দ্বারা গুণ-গৌরবশালী সাধু পুরুষদিগের সেবা করিয়া তাঁহাদিগকে আপনার করিয়া লইবে। পরে তথাবিধ সাধুজনের সঙ্গগুণে ভোগব্যাপারে অবজ্ঞা জন্মিবে। অনন্তর তত্ত্ববিচার উপস্থিত হইবে। বিচারানন্তর বিচারিত বাক্যার্থের জ্ঞান, পরে শাস্ত্রার্থ-সংগ্রহ অর্থাৎ অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তাৎপর্য্য-নির্ণয় এবং তৎপরে ক্রমশঃ ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইবে। বিষয়কে যদি যৌবনে একান্তই পরিত্যাগ করিতে না পার, তাহা হইলে যৌবন চলিয়া গেলে যখন বিষয়বিরতি ঘটিবে, তখন তুমি বিচার দ্বারা পরম পদ লাভ করিবে। নিতান্ত পবিত্র পরমাত্মায় তোমার সম্যক্ বিশ্রান্তি লাভ হইবে, তাদৃশ বিশ্রান্তি লাভের পর কদাচ তোমাকে আর দুঃখভোগার্থ কল্পনা-পঙ্কে পতিত হইতে হইবে না। হে শুদ্ধ! ভোগব্যাপারে তোমার আস্থা রহিলেও আমার ধারণায় তোমাতে ভোগাদি কোন কিছুই নাই। তুমি সদাশিব-স্বরূপ; তোমাকে আমি ব্রহ্মজ্ঞানে নমস্কার করি।

হে তাত! তুমি অধুনা দেশাচার-সঙ্গত উপায় দ্বারা ধনার্জ্জন কর; তুচ্ছ ভোগের জন্য সেই অর্জ্জিত ধন তুমি ব্যয় করিও না; যত ব্রহ্মজ্ঞ সাধু পুরুষ আছেন, তোমার অর্জ্জিত ধনে তুমি তাঁহাদিগকে প্রণিপাত, সেবা ও গ্রাসাচ্ছাদনাদি দ্বারা সম্মানিত কর। সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সঙ্গ করিতে থাক। সৎসঙ্গগুণে বিষয়ে তোমার বিরাগ জন্মিবে; পারমার্থবিষয়ক

সুচারু বিচারশক্তি প্রকটিত হইবে; তাদৃশ বিচারবৈভবেই তোমার পরমপদ প্রাপ্তি ঘটিবে।

চতুর্বিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৪ ॥

পঞ্চবিংশ সর্গ।

বলি বলিলেন,—পিতা আমার সুচারু বিচারবান্ ছিলেন। তিনি পূর্ব্বে আমাকে এই যে কিছু উপদেশ দিয়াছিলেন, মদীয় সৌভাগ্যক্রমে তৎসমুদায়ই অধুনা আমার স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে স্পষ্টতই ভোগের প্রতি আমার বিষম বিরাগ জন্মিয়াছে। কি সৌভাগ্য! আমি অদ্য সুধাসম স্বচ্ছ শীতল শমসুখে মগ্ন হইয়াছি। অহো! আমি কতবার কত আশা—কত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিয়াছি; কতবার কত ধন অর্জ্জন করিয়াছি। কতবার কত শত অনুনয় বিনয় করিয়া কুপিত কান্তার কোপশান্তি করিয়াছি। বিষয়সম্পদ রক্ষা করা বড় কঠিন কার্য্য; আমি কতবার তাহা রক্ষা করিতে গিয়া যথেষ্ট কষ্ট পাইয়াছি। আহা! এই ত' এত দিনে—এতক্ষণে আমি শান্তিভূমে আসিয়া পৌঁছিয়াছি; অহো! কি বলিব, এ ভূমি কি সুন্দর, কি শীতল! কি বা মনোরম!! এই শান্তিগুণ অবলম্বন করিলে সমুদয় সুখ-দুঃখই প্রশমিত হইয়া যায়। অধুনা আমি সমতায় অবস্থিত হইয়াছি। আমার সর্ব্বতাপ প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে। আমি নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছি। এখন আমার পরম সুখেই অবস্থিতি হইয়াছে। অন্তরে আমি অসীম অপার আনন্দ অনুভব করিতেছি। মনে হয় কে যেন আমার হৃদভ্যন্তরে চন্দ্রবিম্ব আনিয়া অর্পণ করিয়াছে! আহা! তাহা যদি না হইবে—তবে এত আনন্দ আসিল কোথা হইতে? অহো! বিত্ত বা বিভবার্জ্জন বড়ই দুঃখাবহ; কেন না বিভব থাকিলে ভোগের উৎকণ্ঠায় মন সদাই নাচিয়া উঠে এবং অনবরত সেই বিভবের দিকেই ছুটিতে থাকে, সর্ব্বাঙ্গ যেন জ্বালায় জ্বলিয়া যায় এবং সর্ব্বদাই ক্ষুব্ধমনে কাল কাটাইতে হয়। পূর্ব্বে আমি অঙ্গনাজনের অঙ্গে অঙ্গে আমার অঙ্গ মর্দ্দন করিয়া কিম্বা মদীয় মাংসে তদীয় মাংস

নিপীড়িত করিয়া যে কিছু সুখ-সম্ভোগ করিয়াছি, আমার এখন মনে হয়, সে তো সুখ নয়--সে কেবল মোহেরই বিজৃম্ভণ। নিখিল বিভবের দৃষ্টান্তস্বরূপ কত কত মহাবিভব আমি দেখিয়াছি। যত কিছু ভোক্তব্য ভোগসামগ্রী আছে, তৎসমস্তই আমি অখণ্ডভাবে ভোগ করিয়াছি। নিখিল প্রাণীর উপরই আমার অক্ষুণ্ণ প্রভাব বিস্তার পাইয়াছে। এত বড় প্রভাব প্রতিপত্তি থাকিলেও কল্যাণই বা আমার কি হইয়াছে? কি স্বর্গ, কি মর্ত্ত্য, কি পাতাল, সর্ব্বত্রই আমি বারম্বার একইরূপ অবলোকন করিয়াছি। একবার যাহা, আবার তাহা, এইরূপে পুনঃপুন আমি ইতস্ততঃ একই বস্তু ভোগ করিয়াছি। কৈ কিছুই তো আমার নিকট অপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হয় নাই! অধুনা আমি নিজেই নিজ বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া সে সকল পরিত্যাগ করত পূর্ণ ও স্বচ্ছভাবে আত্মায় অবস্থান করিব। পাতাল, ভূতল, স্বর্গ—কুত্রাপি সারবৎ সুখ কিছুই বিদ্যমান নাই; স্ত্রী বল,—মণিমাণিক্যাদি বল, সকলই অসার এবং অকিঞ্চিৎকর; পরন্তু সকলই তুচ্ছ কালের কবলে কবলিত হইয়া থাকে। সুতরাং সে সমুদায়ে দুঃখ বৈ আর সুখ কখন আছে কি? অহো! এত কাল আমি তুচ্ছ জগৎরাজ্যের আকাঙ্ক্ষায় অমরগণের প্রতি বৈরাচরণ করিয়াছি; আমার এরূপ কার্য্য একান্তই বালকোচিত হইয়াছে। সুতরাং বলা যায়, পূর্ব্বে আমি অজ্ঞ শিশু অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ ছিলাম না। এই জগৎ মনেরই নির্ম্মাণমাত্র; ইহা মহান্ আধিস্বরূপ; ইহাতে এমন কি পুরুষার্থ আছে যে, ইহা ত্যাগ করিলে পাওয়া যাইবে না। মহাত্মাদিগের এ জগতে অনুরাগই বা কি? আহা! আমি এতকাল অজ্ঞান-মদেই মত্ত ছিলাম; তাই চিরদিন অর্থ বোধে অনর্থেরই সেবা করিয়া আসিয়াছি। আমার অন্তর তরল তৃষ্ণায় আকুল ছিল; তাই না জানিয়া না বুঝিয়া পশ্চাৎতাপ বৃদ্ধির জন্য এ জগতে কি না করিয়াছি! যাহা হউক, এখন আর এই তুচ্ছ অতীত চিন্তায় ফল কিছুই নাই। অধুনা বর্ত্তমান মোহ-ব্যাধির চিকিৎসায় যাহাতে পুরুষজন্ম সফল হয়, তাহারই উপায় চিন্তা করা যাউক। যিনি অপরিচ্ছিন্ন কারণস্বরূপ, সেই পরমাত্মা সহ অভিন্নতা উপ-গত হইয়া মন্থনান্তে ক্ষীরাব্ধিমধ্যে রসায়নবৎ অধুনা আত্মায় যাহাতে সর্ব্বথা পরম শান্তিসুখ লাভ করিতে পারি, যাহাতে এই প্রপঞ্চ কি? 'অহং'-

প্রত্যয়-বেদ্য জীবতত্ত্ব কি? আত্মদর্শনের উপায় কি? অজ্ঞানশান্তির নিমিত্ত নিশ্চয়ই এক্ষণে আমি তৎসমস্ত জানিবার বাসনায় অসুরাচার্য্য উশনার নিকট প্রশ্ন উত্থাপন করিব। শরণাগত প্রণত জনে অনুগ্রহ-বিতরণে সদাই যিনি সমুদ্যত এবং যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ বলিয়া যিনি সর্ব্ব জনের সর্ব্ববিধ কামনা পূরণে সক্ষম, সেই অসুরগুরু ভৃগুসুত শুক্রকে আমি অন্তরে অনবরত ধ্যান করি। অনন্তর তাঁহার উপদেশ অনুসারে সেই অনন্তবিভব পরমাত্মায় আমি অভিন্নভাবে অবস্থান করিতে থাকি। সেই মহাপুরুষের কথায় অনাশ্বাসের আশঙ্কা মাত্র নাই; কেন না, মহৎ ব্যক্তিবর্গের উপদেশবাণী অক্ষয় ফলই প্রসব করে, কদাচ তাহা বিফল হইবার নহে।

পঞ্চবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৫ ॥

ষড়্‌বিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বলবান্ বলি এইপ্রকার চিন্তা করিয়া নিমীলিত-নেত্রে আকাশবাসী কমলাক্ষ শুক্রাচার্য্যকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। ভৃগুনন্দন শুক্র সর্ব্বদাই ধ্যানাবস্থায় অবস্থিত। তিনি তখন সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী ব্রহ্মরূপতা হেতু আত্মাকে সর্ব্বস্বরূপে চিন্তাপরায়ণ স্বীয় চিত্তমধ্যগত শিষ্য বলিকে তত্ত্বজিজ্ঞাসায় গুরুদর্শনপ্রার্থী বলিয়া বুঝিতে পারিলেন। অনন্তর সর্ব্বগত অনন্ত চিদাত্মা ভগবান্ ভার্গব স্বয়ং সশরীরে বলির রত্নময় বাতায়নপথে উপনীত হইলেন। গুরুদেবের দেহপ্রভায় বলির দেহ মার্জ্জিত হইলে তিনি তখন প্রাতরুদিত দিনকর-করের স্পর্শ মাত্রে সমুদ্বোধিত অম্বুজবৎ বোধ লাভ করিলেন। গুরুদেব উপস্থিত হইবা মাত্র বলি তখন তদীয় পাদবন্দনা করিলেন। তাঁহাকে রত্নার্ঘ্য দান করিলেন এবং মন্দার কুসুমসমূহ সমর্পণ করিয়া তাঁহার অর্চ্চনা করিলেন।

অনন্তর গুরুবর শুক্র শিষ্যপ্রদত্ত মন্দারমালা মস্তকে ধারণপূর্ব্বক রত্নার্ঘ্য লইয়া বরাসনে উপবেশন করিলে, বলিরাজ গুরুকে সম্বোধন করিয়া

কহিলেন,—ভগবন্! যেমন দিবাকরবিভা বিকশিত হইয়া জনগণকে জগদ্ব্যাপারে প্রেরিত করে, তেমনি ভবদীয় প্রসাদ-জনিত মদীয় প্রতিভা আমাকে ভবৎসন্নিধানে প্রশ্ন করিতে নিযুক্ত করিতেছে। এ সংসারের ভোগ-রাশি মহান্ সম্মোহদায়ক; আমি অধুনা তৎসমুদায়ের প্রতি বিরক্ত হই-য়াছি। যাহাতে আমার ভোগ-জন্য মহামোহ সকল কাটিয়া যায়, আমি সেই তত্ত্ববার্ত্তা বিদিত হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। এই সকল ভোগের উৎকর্ষ-সীমা কি পরিমাণ? ভোগের স্বরূপ কি? আমি কে? আপনি কে? এই সকল লোকই বা কি? মৎকৃত এই সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর সত্বর আপনি প্রদান করুন।

শুক্র কহিলেন,—হে সমগ্র দানব-রাজেন্দ্র! আমি অধুনা আকাশ-পথে প্রস্থান করিয়াছি, অতএব এ সম্বন্ধে অধিক বলিবার অবসর নাই। যাহা হউক, সংক্ষেপে সার কথা বলি, শ্রবণ কর। এই জগতে এক মাত্র চিৎই আছেন, জগৎ চিন্মাত্র ও চিন্ময়। তুমি চিৎ, আমি চিৎ এবং এই যে কিছু লোক সকলই চিন্ময়। জানিও,—ইহাই একমাত্র সারসংগ্রহ। তুমি যদি সত্য সত্যই শ্রদ্ধাবান্ বিবেকী হইয়া থাক, তাহা হইলে ইহা নিশ্চয় করিয়া নিখিল লব্ধব্য বস্তুই লাভ করিতে পারিবে। অন্যথা তোমায় যদি অন্য প্রভূত উপদেশও প্রদান করা হয়, তবে তাহা ভস্মে ঘৃতাহুতি দানের ন্যায় বৃথা হইয়া যাইবে। যাহা চিৎ, তাহাকে চেত্যরূপে কল্পনা করাই বন্ধন এবং চেত্যনির্ম্মুক্ত চিৎ হওয়াই মুক্তি। কেন না, চেত্যাকার হইতে নির্ম্মুক্ত চিৎই পরিপূর্ণ আত্মা; ইহাই হইল নিখিল সার সিদ্ধান্ত। এক্ষণে আমার বক্তব্য এই যে, তুমি যদি এইরূপ নিশ্চয় অবলম্বন কর, তাহা হইলে আপনা হইতে অনায়াসেই আত্মপদবী দেখিতে পাইবে এবং সেই অনন্ত আত্মপদ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। আমি আর বিলম্ব করিতে পারিতেছি না, এই দণ্ডেই আমাকে আকাশপথে প্রস্থান করিতে হইবে। তথায় সপ্তর্ষিগণ আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছেন। দেবতাদিগের কোন বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে; এই জন্যই আমাকে এক্ষণে তথায় যাইতে হইল। রাজন্! যত দিন দেহ থাকিবে, ততদিনের মধ্যে মুক্তবুদ্ধি ব্যক্তিগণ স্বভাবতই যথাপ্রাপ্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না।

ফল কথা এই যে, আমি নিজে সর্ব্বত্যাগী মুক্ত ব্যক্তি হইলেও উপস্থিত দেব-কার্য্য আমার পরিত্যাজ্য নহে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ভৃগুনন্দন বলিকে এই কথা কহিয়া যাহা গ্রহকুল-সমাকুল—সুতরাং পুষ্পরেণু-রঞ্জিত অলিবৎ শবলাকার, তাদৃশ আকাশের মধ্য দিয়া মেঘ বা সাগরপথে তরল তরঙ্গের ন্যায় মহাবেগে প্রস্থান করিলেন।

ষড়্‌বিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ২৬॥

সপ্তবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সুরাসুরগণের বরেণ্য ভৃগুসুত আকাশ-পথে প্রস্থান করিলে, বিশিষ্ট বুদ্ধিশালী বলি চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হাঁ, ভগবান্ ভার্গব উপযুক্ত বাক্যই বলিয়াছেন। এই জগৎত্রয়ের স্বরূপ একমাত্র চিৎই বটে। আমি চিৎ এবং এই সকল লোকও চিন্মাত্র। এই যে দিঙ্মণ্ডল, এই ক্রিয়াকলাপ—অধিক কি, এই বাহ্য ও আভ্যন্তরিক নিখিল পদার্থই পরমার্থ পক্ষে চিৎস্বরূপ। চিদ্‌ব্যতীত এ সংসারের কুত্রাপি কিছুই বিদ্যমান নাই। ঐ ত আকাশে আদিত্য দেব আছেন, উনি যদি চিৎ-কর্ত্তৃক অর্করূপে প্রকাশিত না হয়েন, তাহা হইলে, অর্ক ও অন্ধকারের পার্থক্য উপলব্ধ হইবে কিরূপে? এই ত ভূমি, ইহা যদি চিৎকর্ত্তৃক ভূমিরূপে চেতিত না হয়, তাহা হইলে ইহার ভূমিত্ব উপলব্ধিই বা কিরূপে হইবে? এইরূপে এই দিক্‌সমূহ যদি দিগ্‌ভাবে, শৈলকুল যদি শৈলভাবে এবং আকাশ যদি আকাশভাবে চিৎকর্ত্তৃক চেতিত না হয়, তাহা হইলে দিকের দিকত্ব কি, শৈলের শৈলত্ব কি ও আকাশেরই বা আকাশত্ব কি? এই ত শৈলাকার বিশাল দেহ বিদ্যমান; এই দেহ যদি চিৎকর্ত্তৃক চেতিত না হয়, তাহা হইলে দেহীদিগের দেহত্ব অনুভব কিরূপ? সুতরাং এ কথা সত্যই বটে যে, এই ইন্দ্রিয়সমূহ চিৎ, দেহ চিৎ, মন চিৎ, মনীষা চিৎ, অধিক কি, এ সংসারের নিখিল পদার্থ চিৎসত্তায় অবস্থিত। অন্তর চিৎ, বহির্ভাগ

চিৎ, শূন্য চিৎ, যে কিছু ভাব পদার্থ, সকলই চিৎ এবং চিতেই সকলের অবস্থান। একমাত্র চিতের সাহায্যেই আমি ভোগেচ্ছাপূর্ব্বক এই শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ ভোগ করিতেছি; আমার এই শরীর দ্বারা আমি কিছুই করিতেছি না। এই ত দেহ, ইহা তো কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদির সহিতই উপমিত; ইহা দ্বারা আমার প্রয়োজন কি? এই যে কিছু জগৎ-প্রপঞ্চ, এ সকলই যখন একমাত্র চিন্ময় আত্মা, তখন আমিও তো চিন্ময় আত্মা বৈ আর কি? আকাশে যে চিতের বিদ্যমানতা, আমিও তো সেই চিৎস্বরূপ্ বৈ আর কিছুই নহি। সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক পদার্থে যে চিতের অধিষ্ঠান, আমিও সেই চিৎস্বরূপ। অনিল ও জলাদি ভূতবৃন্দ এবং নিখিল সুর, অসুর ও চরাচরাদি পদার্থপুঞ্জ,—যে যেখানে যে যে বস্তু বিদ্যমান,—সর্ব্বত্রই যে চিৎ বিরাজিত, আমিও সেই চিৎ হইতে অভিন্ন। এ জগতে থাকিবার মধ্যে একমাত্র চিৎই রহিয়াছেন, ইহাতে কল্পনান্তর কিছুরই অস্তিত্ব নাই। কাজেই বলিতে হইবে, দ্বৈত যখন একান্ত পক্ষেই নাই, তখন এ জগতে কেই বা কাহার শত্রু আর কেই বা কাহার মিত্র? এই ত শরীর,—এ শরীরের নাম বলি; এই বলি নাম-ধেয় শরীরের যদি শিরশ্ছেদ হইয়া যায়, তাহাতে চিতের কিছুই ছিন্ন হই-বার নহে। কেন না, চিৎ যিনি—তিনি এই নিখিল লোক ব্যাপিয়াই বিরাজমানা। যাহা দ্বেষধর্ম্ম, তাহা যদি চিৎকর্ত্তৃক চেতিত হয়, তাহা হইলেই দ্বেষপদ-বাচ্য হইয়া থাকে; অন্যথা সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব দ্বেষাদি ভাবাভাব যে কিছু ধর্ম্ম, সকলই চিদাত্মক। এই যে বিশাল-বিশ্বোদর, একটু নিপুণভাবে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, ইহার অভ্যন্তরে চিদ্ব্যতীত কিছুরই উপলব্ধি হইবে না। এই চিৎ সর্ব্বথা বিশুদ্ধ; ইহাঁর রাগ-দ্বেষ নাই, কিম্বা মন বা অন্য কোন বৃত্তিও ইহাঁর নাই। সুতরাং এই একান্ত বিশুদ্ধ চিতে বিকল্প-কল্পনার স্থান হইবে কোথা হইতে? চিৎ আমি—সর্ব্বগামী, সর্ব্বব্যাপী, নিত্যানন্দময়। আমি নিখিল বিকল্প-কল্পনার অতিবর্ত্তী। আমার আর দ্বিতীয় অংশ নাই। চিতের নাম নাই, রূপ নাই, তবে যে তাঁহার 'চিৎ' এই নাম নিরূপিত হয়, তাহা তাঁহার বাস্তবিক নাম নয়। এই চিৎশক্তিই সর্ব্ববিধ

নাম-রূপ কল্পনার অধিষ্ঠান; ইনি স্বীয় নামশব্দময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই যেন পরিস্ফুরিত হইতে থাকেন। আমি দৃশ্য-দর্শন হইতে নির্ম্মুক্ত,—কেবলমাত্র নির্ম্মলরূপেই অন্বিত। অপিচ আমিই নিত্যোদিত, নিরাভাস, দ্রষ্টা ও পরমেশ্বর। আমি এইরূপে চিৎপ্রকাশ-স্বরূপ; আমাতে যে নিত্য আত্মাবভাস-বিরহিত জলবিম্বিত চন্দ্রকলার ন্যায় কল্পনাময় পরিচ্ছিন্ন জীবভাব সমুদিত হয়, তাহা আভাস বা ভ্রান্তিমাত্র; বস্তুতঃ কিছুই নয়। সুতরাং অধুনা আপন পূর্ণস্বরূপতায় উল্লিখিত জীবভাবকে তুচ্ছ জ্ঞানে অভিভূত করিতেছি। আমি চেত্য-রূপ-রঞ্জনারহিত, প্রত্যক্-চৈতন্য-ময় বিমুক্ত মহাত্মা, হেন স্বরূপ আমি আমাকে [ব্রহ্মকে] নমস্কার করি। আমি—চিৎ চেত্যমুক্ত, সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত ও সকল অবভাসের দীপস্বরূপ; এ হেন আমি আপনাকে [ব্রহ্মকে] নমস্কার করি। আমার সকল চেত্যাংশ প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে; আমি সচ্চিদাকারে এই বিশাল বিশ্ব ব্যাপিয়া অবস্থিত; আমার সকল সংবেদ্য শান্ত হইয়াছে। আমি মহান্, আমি আকাশবৎ অনন্ত এবং আমি অণু হইতেও অণু। এই সকল সুখ-দুঃখ আমায় স্পর্শ করিতে পারে না। আমি সম্বেদন, অসম্বেদ্য, অচেত্য ও চেতন। এই জাগতিক ভাবাভাব দেশতঃ কালতঃ বা বস্তুতঃ আমার ইয়ত্তা করিতে পারে না। তবে যদি এই জগদ্ভাব সকল আমায় পরিচ্ছিন্ন কিম্বা ইয়ত্তায় ব্যবস্থাপিত করে—করুক, তাহাতে আমার অনভিমত নাই; কেন না আমি জানি—আমার স্বরূপ মাত্র পরিচ্ছিন্ন করিলেই যে উহারা আমা হইতে পৃথক্ হইয়া যাইবে, এরূপ কখনই সম্ভব নহে। ফল কথা, ঐ সকল জগ-দ্ভাবই আমি; আমাতেই উহাদের পর্য্যবসান। সুতরাং এরূপ পরিচ্ছেদে আমার ক্ষতি কিছুই নাই; বস্তুতঃ বাম-হস্তস্থিত ধন যদি দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করে, হরণ করিয়া লয় কিম্বা গ্রহণপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত হইয়া পুনরায় সেই হস্তেই প্রত্যর্পণ করে, তাহা হইলে সেই হস্তদ্বয় হইতে অভিন্ন দেহাত্মক ব্যক্তি সে ধনের কোন অপচয় বা অভাব বোধ করে কি? এই আমি সর্ব্বদা সর্ব্বস্বরূপ, সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বগন্তা; একমাত্র চিৎই আমার স্বরূপ। তত্ত্ব-বোধের পূর্ব্বে আমি চেত্য ভাবে সমাক্রান্ত ছিলাম সত্য, কিন্তু তাহাতে আমার ক্ষতি কি হইয়াছে? চিৎ যখন একাদ্বয়, তখন ভ্রমাত্মক সঙ্কল্প-

বিকল্প উদিত হয়,—হউক, তাহাতেই বা তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি কি? এতদিন অজ্ঞানে আমি আচ্ছন্ন ছিলাম; সুতরাং এযাবৎ আমাকে সংক্ষুব্ধভাবই বহন করিতে হইয়াছে। এক্ষণে তত্ত্ববোধের অভ্যুদয়ে আমি পূত আত্মায় উপশম প্রাপ্ত হই।

পরম পণ্ডিত বলি এইরূপে অনেক চিন্তা করিলেন, চিন্তা করিতে করিতে চৈতন্যবোধক ওঙ্কারের অকারাদি মাত্রাত্রয় পরিহারপূর্ব্বক অর্দ্ধমাত্রার্থ তুরীয় ব্রহ্ম ভাবনা করত মৌনাবলম্বনে অবস্থান করিলেন। তাঁহার নিখিল সঙ্কল্প শান্ত হইয়া গেল। সকল কল্পনার তিরোধান ঘটিল। তিনি সমস্ত চেত্য-চিন্তন নিরস্ত করত নিঃশঙ্ক হইয়া রহিলেন। তাঁহার অন্তর নির্ম্মল হইল। তিনি ধ্যাতৃ, ধ্যেয় ও ধ্যানভাব বিসর্জ্জন করিলেন। তাঁহার সকল বাসনার অবসান হইল। বলি এইরূপে মহৎ পদ লাভ করিয়া নির্ব্বাত নিষ্পন্দ প্রদীপবৎ নিশ্চলভাবে রহিলেন। তাঁহার মন উপশান্ত হইয়া রহিল। তিনি পাষাণ-সমুৎকীর্ণ পুত্তলিকার ন্যায় বহুকাল পর্য্যন্ত রত্নময় বাতায়ন-দেশে অবস্থান করিলেন। যাহাতে সকল বাসনার অবসান হয়, যাহা পরি-পূর্ণ বলিয়া বিষয়-মনন-জনিত নিখিল দোষদশা হইতে পরিমুক্ত, তথাবিধ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া বলিরাজ জলদজাল-বর্জ্জিত শারদাকাশবৎ নির্ম্মল-ভাবে বিরাজ করিতে লাগিলেন।

সপ্তবিংশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ২৭ ॥

অষ্টাবিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! তৎকালে বলির অনুচর দানবেরা তদীয় সুধাবিলিপ্ত স্ফটিকময় সমুচ্চ বাসভবনে প্রবেশ করিলেন। এই সময় যাঁহারা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে ডিম্ভ প্রভৃতি তদীয় ধীরপ্রকৃতি মন্ত্রীগণ, কুমুদাদি সামন্ত-নরপতিগণ, সুরাদি রাজন্যগণ, বৃত্ত প্রভৃতি সেনানায়কগণ, হয়গ্রীবাদি সৈন্যগণ, চাক্রজাদি বন্ধুবান্ধবগণ, লড্ডুকাদি বয়স্যবর্গ এবং বল্লুকাদি চিত্ত-বিনোদনকারী সহচরগণের নাম বিশেষ

উল্লেখযোগ্য। অনন্তর উপঢৌকন লইয়া কুবের, যম ও ইন্দ্রাদি দেবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যক্ষ, বিদ্যাধর ও নাগগণ আসিলেন। তাঁহারা আসিয়া বলিরাজের সেবাবসর প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। তখন রম্ভা আসিল, তিলোত্তমা আসিল। এইরূপে একে একে স্বর্গীয়া সুর-সুন্দরীরা সকলেই আসিয়া বলিকে চামর দ্বারা বীজন করিতে প্রবৃত্ত হইল। তৎকালে শৈল, সাগর, নদ, নদী, দিক্ ও বিদিক্ প্রভৃতির অধিদেবতাগণ একযোগে বলির সেবা করিবার জন্য সেই প্রদেশে আগমন করিলেন। এতদ্ব্যতীত ত্রিভুবনমধ্যবর্ত্তী অন্যান্য বহু দেবযোনিরও তথায় অধিষ্ঠান হইল। এইরূপে উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ সকলেই তখন নত-মস্তকে অতি সমাদরের সহিত বলিকে অবলোকন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা দেখি-লেন,—বলি রাজা ধ্যানাবলম্বনে মৌনী হইয়া সমাধিস্থ রহিয়াছেন। তাঁহাকে তথাবিধ ভাবে অবস্থিত দেখিয়া মনে হইল, যেন একটী চিত্রলিখিত অবি-কল অচল অবস্থান করিতেছে। সমাগত মহাসুরবর্গ নরপতি বলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যথারীতি প্রণামপূর্ব্বক আপনাদের কর্ত্তব্য পালন করি-লেন সত্য; কিন্তু তাঁহার তাৎকালিক সেই অবস্থা দর্শনে তাঁহাদের অন্তঃ-করণ বিষাদে, বিস্ময়ে, ভয়ে ও আনন্দাবেশে বিবশ হইয়া গেল। বলির মন্ত্রী দানবগণ তখন বলিলেন,—আমরা আর এ বিষয় ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন্ ফল প্রাপ্ত হইব? এই বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদের সেই সর্ব্ববিদ্গণের অগ্রণী গুরুবর ভৃগুনন্দনকে মনে মনে ধ্যান করিলেন এবং কিঞ্চিৎ কাল ধ্যান করিবার পরই দেখিলেন,—কল্পনাগত গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় গুরুবর ভার্গ-বের ভাস্বর দেহ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ভার্গব আসিবা মাত্র দৈত্য-গণ কর্ত্তৃক যথাবিধি পূজিত হইয়া বরাসনে উপবেশন করিলেন। অনন্তর তিনি দেখিলেন,—দানবরাজ বলি ধ্যানমৌনী হইয়া অবস্থান করিতেছেন। ভৃগুনন্দন শুক্র বলিরাজকে প্রীতি-পূর্ণনয়নে নিরীক্ষণ করিয়া ক্ষণকাল বিশ্রাম করিলেন এবং অন্তরে বিচার করিয়া দেখিলেন যে, হাঁ এইবার বটে বলির ভবভ্রম অপগত হইয়াছে।

অনন্তর অসুরগুরু শুক্র স্বীয় দীপ্ত দেহের প্রচুরতর প্রভাপাতে সেই সভাভবনে যেন ক্ষীরার্ণবের শোভা বিস্তার করিয়া সভাসদ্বর্গকে বলিলেন,

হে দৈত্যগণ! এই তোমাদের বলি রাজা এক্ষণে সম্যক্ আত্মবিচার করত সর্ব্বাধিষ্ঠান বিমল ব্রহ্ম লাভ করিয়া স্বয়ংসিদ্ধ ভগবান্ হইয়াছেন। এই জন্য ইহাঁর পরমানন্দে বিশ্রাম লাভ ঘটিয়াছে। হে দানবেন্দ্রগণ! ইনি অধুনা সমাধিলীন হইয়া আনন্দপ্রচুর আপন আত্মায় চিরতরে অবস্থান করত নিরাময় পরমাত্ম-পদ নিরীক্ষণ করিতে থাকুন। ইনি এত দিন ভববিভ্রমে শ্রান্ত ছিলেন; অধুনা বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছেন। ইহাঁর চিত্তে ভবভ্রম আর নাই; ইহাঁর সংসার-নীহার শান্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং হে দনুজ-গণ! অধুনা ইহাঁর সহিত কথা কহিবার প্রয়াস পাইও না। দেখ, নৈশ অন্ধকার নিরস্ত হইলে দিবা যেমন সৌরকরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে, তেমনি অজ্ঞান-সঙ্কট চলিয়া গিয়াছে বলিয়া অধুনা ইনি জ্ঞানালোকে আলোকিত হইয়া উঠিয়াছেন। এই যে এক্ষণে ইহাঁর সুপ্তভাব দেখিতেছ, এই ভাবটা চলিয়া গেলে বীজকোশ হইতে অঙ্কুরোৎপত্তির ন্যায় অহম্ভাব জাগিয়া উঠিবে; তখন ইনি আপনা হইতেই প্রবুদ্ধ হইবেন। হে দানবেন্দ্রগণ! উপস্থিত যে কিছু প্রভুকার্য্য আছে, তৎসমস্ত তোমরাই সম্পাদন কর। অদ্য হইতে সহস্র বর্ষ অতীত হইবার পর এই বলি রাজা সমাধি হইতে অভ্যুত্থান করিবেন।

ভৃগুনন্দন শুক্র এই কথা কহিলে, সমাগত দানবগণ বৃক্ষকৃত বিশুষ্ক মঞ্জরী-পরিহারের ন্যায় হর্ষ, অমর্ষ ও বিষাদ-জনিত ভাবনা সকল বিসর্জ্জন করিল এবং বৈরোচনি যেরূপ নিয়ম-পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, তাঁহারাও সেই নিয়মে রাজকার্য্যের সুব্যবস্থা করিয়া স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর বলি রাজার সভাক্ষেত্রে যাঁহারা যে যে স্থান হইতে আসিয়াছিলেন, সকলেই স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। মানবগণ মর্ত্ত্যভূমে, ভুজগরাজগণ রসাতলে, গ্রহকুল গগনপথে,দেবগণ স্বর্গমার্গে, শৈলাধিদেবীগণ কুলাচলসমূহে, দিক্‌পালগণ নিজ নিজ দিগ্‌বিভাগে, বনেচরগণ বনভূমিতে এবং গগনচরেরা গগনদেশে প্রয়াণ করিলেন।

অষ্টাবিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ২৮ ॥

উনত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর দিব্য সহস্র বর্ষ চলিয়া গেলে অসুরবর বলি দেবদুন্দুভি-নাদে সমাধি হইতে প্রবুদ্ধ হইলেন। গগনাঙ্গনে দিনকর সমুদিত হইলে কমলাকর যেমন বিকসিত হইয়া উঠে, তেমনি বলি প্রবোধ প্রাপ্ত হইলে বলির সেই রাজধানী সুশোভিত হইয়া উঠিল। বলি প্রবুদ্ধ হইয়া অন্যান্য দৈবগণের সমুপস্থিতি কাল পর্য্যন্ত সেই সমাধিগৃহে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই পরমার্থপথ কি রম্য! কি শীতল!! আমি এই পথে ক্ষণকাল অবস্থিত ছিলাম; থাকিয়া পরম বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইলাম। অতএব আমি এখন এই পরমার্থ-পথ অবলম্বন করিয়াই নিরন্তর বিশ্রান্তি লাভ করি। এই সকল বাহ্য বিভূতি উপভোগ করিয়া আমার ফল কি হইবে? অধুনা সমাধি-পরিপাকের ফলে আমার অন্তরে যে আনন্দলহরী উথলিয়া উঠিয়াছে, মনে হয়—সুধাংশুবিম্বেও বুঝি সেরূপ আনন্দরাশি নাই।

বলি রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া মনের অস্তিত্ব নাশ করিলেন; করিয়া পুনরপি বিশ্রান্তি-লাভার্থ সমাধি-লীন হইলেন। অনন্তর বারিদবৃন্দ যেমন চন্দ্রবিম্বকে ঘিরিয়া ফেলে, তেমনি তখন দৈত্যগণ বলিকে বেষ্টন করিয়া রহিল। কুলাচলতুল্য দানবদল বলিকে বেষ্টন করিলে বলি তাহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। দানবেরা তাঁহাকে প্রণাম করিল। বলি আকুলনয়নে আবার ভাবিতে লাগিলেন,—আমার বিকল্পকল্পনা ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে। আমি চিৎস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। আমার এ সংসারে উপাদেয় সামগ্রী কি আছে যে, মন আমার উপাদেয়-বোধে বাহ্য-বিষয়ের দিকে ছুটিয়া গিয়া তৎপ্রতি অনুরক্তিবশে মলাক্ত হইবে? আমি কেন—কিসের জন্য মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করি, কেই বা পূর্ব্বে আমায় বাঁধিয়া রাখিয়াছিল? আমি প্রকৃতপক্ষে অবদ্ধ অথচ আমি মোক্ষ অভিলাষ করি। অহো! এ কি বাল-বিড়ম্বনা! এখন সত্য সত্যই বুঝিতে পারিয়াছি, আমার বন্ধ নাই, মোক্ষ নাই, আমার যে মূর্খতা ছিল, তাহা এখন লয় পাইয়াছে। আমি

যদি ধ্যানমগ্ন হইয়া অবস্থান করি, তাহা হইলে আমার কি ফল হইবে? আর যদি ধ্যানাসক্ত না হই, তাহাতেই বা আমার কোন্ ইষ্ট সাধিত হইবে? ধ্যান ও ধ্যানাভাব-ভ্রম পরিহার করিয়া প্রত্যক্স্বরূপ আত্মতত্ত্ব ঔদাসীন্যের সহিত দর্শন করিতে করিতে যে যে বস্তুর অভিমুখে ধাবিত হইবার উপক্রম করেন—করিতে থাকুন, তাহাতে আমার ক্ষতি বৃদ্ধি কিছুই নাই। আমি ধ্যানাকাঙ্ক্ষা করি না বা ধ্যানের অভাবও আমার অভিপ্রেত নহে। অপিচ ভোগেও আমার স্পৃহা নাই এবং ভোগ-বিরহিত হইয়া থাকিতেও আমি ইচ্ছা করি না। আমি গতজ্বর হইয়া সর্ব্বত্র সমভাবেই অবস্থান করি। পরম তত্ত্বে আমি বাঞ্ছা রাখি না, বা এই জগদ্ব্যাপারেও আমার ঔৎসুক্য নাই। তবে কি ধ্যানাবস্থাতেই আমি রহিব?—না ধ্যানেও আমার কোনই কার্য্য নাই এবং বাহ্যিক বৈভবেও আমি প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে করি না। আমি মরি নাই, বা বাঁচিয়াও নাই। আমি সৎ, অসৎ বা সন্ময় কিছুই নহি। এ জগৎ আমার নহে, অথবা অন্য কোন কিছুও আমার নাই। আমি আমাকেই নমস্কার করি; কেন না আমিই অতি মহান্,—অতি বৃহৎ। এই জগৎরাজ্যের যদি অস্তিত্ব থাকে, তবে ইহাতেই আমি অবস্থান করি; আর যদি না থাকে, তবে তাহাতেও আমি ক্ষতির সম্ভাবনা দেখি না। কেন না, আমি আত্মাতেই শীতলভাবে বিরাজ করি। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ধ্যানমগ্ন হইয়াও আমার প্রয়োজন নাই; আর এ রাজ্যের যে কিছু বিভবসম্পদ্, তাহাতেও আমি কোন প্রয়োজন দেখি না। যাহা আইসে, আসিতে থাকুক; আমি কিছুই নহি, বা আমার কোথাও কিছুই নাই। অধুনা যদিও আমার কোনই কর্ত্তব্য নাই সত্য; কিন্তু আমার যে কিছু প্রারব্ধ কর্ম্ম আছে, তাহা আমি সম্পাদন করি না কেন?

জ্ঞানিজন-বরেণ্য পরিপূর্ণাত্মা দানবাধিপ বলি এইরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দৈত্যদিগের প্রতি দৃষ্টিদান করিলেন। মনে হইল, দিবাকর যেন পদ্মসমূহোপরি রশ্মি নিক্ষেপ করিলেন। পবন যেমন পুষ্পামোদ গ্রহণ করে, বলি তেমনি দনুজদিগের প্রত্যেকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করত একে একে তাহাদিগের প্রণাম গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর বিরোচননন্দন বলি, তখন 'ধ্যেয়' বাসনা বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অনাসক্ত-

মনে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তিনি দেব, দ্বিজ ও গুরু-বর্গকে বিবিধ পূজোপকরণে পূজা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধব, সুহৃৎ-সামন্ত ও সজ্জনদিগকে সম্মানিত করিলেন। যথাযোগ্য অর্থ বিতরণে ভৃত্যবর্গ ও প্রার্থীদিগের প্রার্থনা পূরণ করিতে লাগিলেন। বিচিত্র বিভবরাশি অর্পণ করিয়া ললনাকুলের লালন পালন করিতে লাগিলেন। বলি রাজা এইরূপে রাজ্যবাসী প্রকৃতিপুঞ্জের শাসন-সংরক্ষণ করিতে থাকিলে দিন দিন তদীয় রাজ্য সুসমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। অনন্তর এক সময়ে তাঁহার মনে যজ্ঞ করিবার বাসনা বলবতী হইল। বাসনার উদ্রেক হইবামাত্র তিনি এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। এই যজ্ঞে শুক্রাচার্য্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ব্রতী হইলেন। নিখিল জগদ্বাসী পরিতৃপ্ত হইল। দেব ও ঋষিগণ সেই যজ্ঞের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন।

অতঃপর সিদ্ধিদাতা বিষ্ণু স্থির করিলেন, বলি নিশ্চয়ই ভোগার্থী নহে। এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া তিনি তাঁহার ইষ্টসিদ্ধির নিমিত্ত তদীয় যজ্ঞে আগমন করিলেন। হরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ইন্দ্র সর্ব্বদাই ভোগলালসায় কাতর; সুতরাং তিনি শোচনীয় দশায় উপনীত। কার্য্যজ্ঞ হরি তাঁহার ঐ ভোগবাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য বলিকে ছলিয়া এই জগৎ-জঙ্গলখণ্ড তাঁহাকে অর্পণ করিতে উদ্‌যোগী হইলেন এবং সবলে আক্রমণ করিয়া বলিকে বঞ্চনাপূর্ব্বক পাতালতলে বন্ধন করিয়া রাখিলেন। রামচন্দ্র! বলিরাজ অদ্যাপি বাহ্য বুদ্ধি পরিহারপূর্ব্বক নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনে জীবন্মুক্ত ও স্বস্থ-দেহে অবস্থান করিতেছেন। এই অবস্থার পরেও তাঁহার ইন্দ্রত্ব-পদ প্রাপ্ত হইবার হেতু এখনও রহিয়াছে। তিনি জীবন্মুক্তভাবে পাতালতলে অবস্থান করিতেছেন। কি সম্পদ, কি বিপদ, উভয় অবস্থাতেই তাঁহার সমদৃষ্টি আছে। চিত্রার্পিত রবিরাজি যেমন স্থির-করশালিনী হইয়া সমভাবে বিরাজিতা, তেমনি তদীয় বুদ্ধিও সুখে দুঃখে সম-স্থিতা ও উদয়াস্ত-বিরহিতা। তাঁহার মন চিরকাল ধরিয়া জীবদিগের সহস্র সহস্র বার আবির্ভাব ও তিরোভাব দেখিয়া আসিতেছে; দেখিয়া দেখিয়া সে এক্ষণে ভোগব্যাপারে একেবারেই বিরত হইয়াছে। বলি রাজা দশ কোটি বৎসর ত্রৈলোক্য-রাজ্য শাসন করেন। অবশেষে তদীয় চিত্ত বিরক্ত হইয়া এইরূপে উপশম প্রাপ্ত হয়।

বলি দেখিয়াছিলেন, কত সহস্র সহস্র সুখ দুঃখ, কত সহস্র সহস্র বার আসিল এবং চলিয়া গেল। কত শত শত সম্পদ-বিপদের বার বার আবির্ভাব-তিরোভাব ঘটিল। তিনি বারম্বার ঐরূপ দেখিয়া দেখিয়া সকলই অসার ও অনিত্য বলিয়া স্থির করিলেন। কাজেই এখন আর তাঁহার আশ্বাস পাইবার স্থান রহিল কোথায়? অধুনা তিনি একেবারে ভোগ-লালসা বিসর্জ্জন করিলেন এবং সম্পূর্ণমনে আত্মারাম হইয়া নিত্য কাল পাতালতলে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

রামচন্দ্র! ঐ বলি পুনরায় ইন্দ্র হইয়া বহুবর্ষ যাবৎ এই ত্রৈলোক্য-রাজ্যের শাসন দণ্ড পরিচালন করিবেন। পরন্তু ইন্দ্রপদ-লাভে তাঁহার পরিতুষ্টি কিছুই নাই এবং স্বীয় পদ হইতে বিচ্যুত হইলেও তাঁহার উদ্বেগ বা বিষাদলেশ নাই। তিনি সকল ভাবেই সমান, সর্ব্ব কালেই সন্তুষ্টমনা; প্রারব্ধ কর্ম্মের বশবর্ত্তিতায় যে কোন বিষয় উপস্থিত হয়, তাহাই তিনি উপভোগ করিতে থাকেন। বলি এইরূপ ভাবে স্বস্থ হইয়া আকাশবৎ বিশদাকারে অবস্থিত রহিয়াছেন।

হে রাঘব! বলির এই বিজ্ঞানপ্রাপ্তির বিবরণ তোমার নিকট বলিলাম। তুমি ধীর ও স্থিরভাবে ঈদৃশ দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক সাধু অভ্যুদয় প্রাপ্ত হও। বলি যেমন বিবেকবলে 'আমিই নিত্য' এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়াছেন, তুমিও তেমনি পুরুষকারের প্রভাবে অদ্বৈত পদ লাভ কর। দানবরাজ বলি দশ কোটি বর্ষ পর্য্যন্ত ত্রৈলোক্যরাজ্যের সুখৈশ্বর্য্য ভোগ করিয়া পশ্চাৎ তাহাতে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব দেখা যায়, এই ভোগরাশি যখন কেবলই বিরাগাস্পদ, তখন ইহাদিগকে পরিহারপূর্ব্বক যাহাতে বিরক্ত হইতে হয় না, এবম্বিধ আনন্দময় সত্য পদ লাভ কর। এই সকল দৃশ্যদৃষ্টি বিবিধ আকার-বিকারের উৎপাদয়িত্রী; ইহাদিগকে দূর হইতে পর্ব্বতবৎ রমণীয় বলিয়া ধারণা হয় সত্য; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে উহারা রমণীয় নহে। তোমার মন ঐহিক পারলৌকিক ভোগের দিকে ধাবমান ও পামর চেষ্টায় লুণ্ঠমান; সুতরাং সম্প্রতি চিত্তকে সংযত করিয়া হৃদয়-কোটরেই রাখিয়া দাও। তুমিই চিদাদিত্য; জগতের সর্ব্বস্থান তোমাতেই পরিব্যাপ্ত। কে আছে বল, তোমার আর অপর আত্মীয়? সুতরাং কেন

তুমি বৃথা স্খলিত হইতেছ ? তুমি চিদাকার ; শত শত পদার্থাকারে তুমিই পরিস্ফুরিত হইতেছ। এই চরাচর সমগ্র জগৎ তোমাতেই প্রোত রহিয়াছে। তুমি নিত্যোদিত শুদ্ধ বোধস্বরূপ ; সূত্রে মণিগণের ন্যায় তোমাতেই জগতের অবস্থান। হে মহাভুজ! তুমি অনন্ত আদ্য চিদাকার পুরুষশ্রেষ্ঠ। তোমার জন্ম নাই, মরণ নাই, তুমি অজ বিরাট পুরুষ এবং তুমিই বিশুদ্ধ চিন্মূর্ত্তি ; তোমার যেন কখন জনন-মরণ ভ্রান্তি উপস্থিত হয় না। তুমি জননাদি বিবিধ ব্যাধির বলাবল সকল সম্যক্রূপে বিচার কর,—করিয়া তৃষ্ণাজাল দূরে পরিহার কর। বিশদ কথা এই যে, যদি তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয়,তাহা হইলেই জননাদি রোগের প্রাবল্য ঘটে, আর যদি তৃষ্ণা ক্ষয় হয়,তাহা হইলেই সে সমুদায়ের দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া থাকে। এই সকল সবিশেষ বিচার কর,—করিয়া সমস্ত অনর্থের মূলীভূত সেই তৃষ্ণাকেই দূর করিয়া দাও। তুমি তৃষ্ণা ত্যাগ কর,—করিয়া ভোগরাশি উপভোগ কর, তাহাতে তোমার অনিষ্ট সম্ভাবনা কিছুই থাকিবে না। তুমি সদাসমুদিত চিদাদিত্যস্বরূপ ; এ জগতের আধিপত্য তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। তুমি আছ ; তাই তোমাতেই এ সকল সংসারস্বপ্ন শোভা পাইতেছে। তুমি বৃথা বিষাদগ্রস্ত হইয়া রহিও না। তোমার কোনই সুখ-দুঃখাকাঙ্ক্ষা নাই, তুমি বিশুদ্ধচিত্ত হইয়া রহিয়াছ, তুমি সর্ব্বাত্মা ; তুমিই সর্ব্ববস্তুর আভাসক। যদি তুমি এখনও অশুদ্ধচিত্ত হইয়া থাক, তবে তোমার চিত্তশুদ্ধির উপায় ক্রমশঃ শ্রবণ কর। যাহা যাহা তোমার মনঃ প্রিয়, তত্তৎ বস্তুই তোমার অনিষ্টকর, আর যাহা যাহা,—অর্থাৎ তপঃক্লেশ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ ও প্রাণায়মাদি যে যে বিষয় তোমার মনের অপ্রিয়, তৎসমস্ত তোমার ইষ্টসাধক, এইরূপ কল্পনা করিয়া ক্রমে তাহার অভ্যাস হইয়া গেলে পর তাহাও পরিত্যাগ করিবে। ইষ্টানিষ্ট বা প্রিয়াপ্রিয় ধারণা পরিহার করিতে পারিলে শাশ্বতী সমতা সমুদিত হইয়া থাকে। হৃদয়ে সমতা বিরাজিত রহিলে পুনরায় জীবের জন্ম হয় না। বালকের ন্যায় মন যে যে বিষয়ে মগ্ন হইবে, সেই সেই বিষয় হইতে ফিরাইয়া তাহাকে পরম তত্ত্বে যোজিত করিয়া লইবে। এইরূপ অভ্যাস হইলেই সর্ব্ববিধ যত্নসহকারে মনোরূপ মত্ত মাতঙ্গকে সর্ব্বাত্মভাবে সংযত করা যায়। এইরূপ করিলেই পরম শ্রেয়োলাভ হইয়া থাকে। এই

দেহকেই যাহারা পরমার্থ বলিয়া জ্ঞান করে, অসত্যদৃষ্টিতে চিত্ত যাহাদের কলুষিত হইয়াছে, অজস্র সঙ্কল্প-কল্পনার নিকট যাহারা আত্মবিক্রয় করিয়াছে এবং বুদ্ধি যাহাদের মূঢ়তাপঙ্কে মগ্ন রহিয়াছে, তুমি তথাবিধ ধূর্ত্ত লোকদিগের সমত্ব প্রাপ্ত হইও না। বিবেক ও বৈরাগ্যাদি উপায় নাই বলিয়া আত্মতত্ত্ব নির্ণয়ে অক্ষমতানিবন্ধন অপর প্রতারকদিগের বাক্যে আস্থা স্থাপনই মূর্খতা; ঈদৃশ মূর্খতাদোষ অপেক্ষা অধিক দুঃখপ্রদ অনর্থ এ জগতে নাই।

হে মহামতে! ভবদীয় হৃদাকাশে যে অবিবেক-মেঘ আবির্ভূত হইয়াছে, তুমি বিবেকবায়ুর তাড়নায় সত্বর উহাকে অপসারিত করিয়া ফেলো। একমাত্র বিচারই মূর্খতা নিরাসের হেতু। বহু জন্মসঞ্চিত সুকৃতির পরিপাকজনিত আত্মানুগ্রহ হইতেই বিচার আবির্ভূত হয়। কিন্তু আত্মা যত দিনে না শ্রবণ-বৈরাগ্যাদি পুরুষকার প্রযত্নে আত্মদর্শন পক্ষে অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তত দিনের মধ্যে বিচারোদয়ের সম্ভাবনা নাই। বৈরাগ্য, বিচার ও শ্রবণাদি সত্ত্বেও বহির্মুখদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তির জ্ঞানোদয় হয় না; জ্ঞানবান্ হইতে হইলে প্রত্যক্দৃষ্টিও আবশ্যক হইয়া থাকে; যত দিনে না প্রত্যক্দৃষ্টির সাহায্যে আপনাকে অবলোকন করা যাইবে, তত দিন যাবৎ বেদ-বেদান্তাদির ব্যাখ্যাই শ্রবণ কর, আর নানাবিধ যুক্তি তর্ক করিয়াই দেখ, আত্মা কিছুতেই প্রকাশমান হইবেন না। ভাবিতে পার, একমাত্র প্রত্যক্দৃষ্টিই যদি জ্ঞান নিমিত্ত হয়, তাহা হইলে গুরূপদেশ দ্বারা আমার প্রয়োজন কি? আমি বলি, তাহাতে প্রয়োজন আছে; কেন না, প্রত্যক্দৃষ্টির সাহায্যে তুমি নিজে নিজেই নির্ম্মল আত্মায় অবস্থান করিলেও—বিতত বিমল বোধপ্রাপ্ত হইলেও আমার নিকট যে উপদেশ পাইবে, তাহাতেই তোমার অধুনা উল্লিখিত লব্ধ বোধ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া যাইবে। চিদাদিত্য পরমাত্মায় বিকল্পাংশ নাই; তুমি আমারই উপদেশবলে সেই পরমাত্মার অপরিচ্ছিন্ন ব্যাপ্তি গ্রহণ করিয়াছ। অধুনা তোমার সমগ্র সঙ্কল্প লয় পাইয়াছে, সকল সন্দেহবিভ্রম চলিয়া গিয়াছে, বাহ্য বিষয়ের প্রতি তোমার যে সকল কৌতূহল-হিম পতিত ছিল, সে সমুদয় গলিয়া গিয়াছে, তোমার কোন সন্তাপ নাই; তুমি সুস্থ ও শান্তিপ্রাপ্ত হইয়াছ।

হে মুনিবৃত্তিশালিন্ রামচন্দ্র! তুমি যে এখন মোক্ষলিপ্সায় বিচার, গুরুবাক্য ও শাস্ত্রব্যাখ্যার সহায়তা লইতেছ, যত্নের সহিত বিবেক ও বৈরাগ্যাদিকে রক্ষা করিতেছ, আলস্য ও প্রমাদাদি দোষরাশিকে বিনষ্ট করিতেছ, সমাধি-সুখরূপ সুধাপানে পরিতৃপ্ত হইতেছ, পর পর জ্ঞান-ভূমিকায় আরোহণপূর্ব্বক বিস্ময়রসে অবগাহন করিতেছ এবং সপ্তম ভূমি-কায় বিশ্রাম লাভের ফলে পূর্ব্বাবস্থা হইতে সমধিক সুখোৎকর্ষ নিবন্ধন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছ, তোমার যখন আত্ম-তত্ত্বের আবরণ ও বিক্ষেপ বিদূরিত হইয়া যাইবে, তখন ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত কোন ভাবই তোমার থাকিবে না।

ঊনত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ২৯॥

ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! অনন্তর অসুররাজ প্রহ্লাদ যেরূপ আত্ম-জ্ঞান লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন, এক্ষণে সে বিবরণ বলিতেছি; তুমি আত্মবিজ্ঞান লাভ করিবার পক্ষে এই এক পরম উপায় শ্রবণ কর।

পুরাকালে পাতালতলে হিরণ্যকশিপু নামে এক দানবাধিপ বাস করিত। কি সুর, কি অসুর, সকলেই তাহার নিকট পরাজিত হইয়াছিল। ভগবান্ নারায়ণের ন্যায় হিরণ্যকশিপুর পরাক্রম ছিল। এই ত্রিভুবনস্থ সমস্ত প্রদেশ তৎকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। রাজহংস যেমন ষট্পদের নিকট হইতে বিকশিতদল শতদল হরণ করিয়া লয়, ঐ অসুররাজ তেমনি সুরপতির নিকট হইতে এই ত্রৈলক্যরাজ্য কাড়িয়া লইয়াছিল। সুরা-সুরগণ তদীয় প্রভাবে হীনবীর্য্য হইলে হিরণ্যকশিপু নিষ্কণ্টকে এই সমগ্র জগৎরাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করিল। মনে হইল, করী যেন মরাল-কুল তাড়াইয়া দিয়া নলিনীবনে অলির আলয় আয়ত্ত করিয়া লইল।

এইরূপে সেই অসুরাধিপতি ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যসুখ ভোগ করত কালক্রমে কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিল। মনে হইল, বসন্ত যেন পুষ্পাঙ্কুর সকল প্রসব করিল। পুত্রগণ ভূমিষ্ঠ হইবার পর দশ দিবাকরের কিরণপুঞ্জের

ন্যায় অতীব তেজস্বী হইয়া উঠিল। তাহারা অচিরকাল মধ্যেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল এবং তাহাদের পরাক্রম এত অধিক হইয়া উঠিল যে, পরাক্রমে তাহারা দেব-নিকেতন পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সক্ষম হইল। যেমন মহামূল্য মণিগণ-মধ্যে কৌস্তুভমণিই শ্রেষ্ঠ, তেমনি সেই সকল পুত্রের মধ্যে প্রহ্লাদনামক পুত্রই প্রধান, বলবান্ ও সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। বসন্ত ঋতুর অভ্যুদয়ে সমগ্র বৎসর যেমন শোভা-সম্পদে সমৃদ্ধ হয়, তেমনি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পুত্র প্রহ্লাদ দ্বারাই হিরণ্যকশিপু সাতিশয় সুশোভিত হইয়াছিল।

অনন্তর কোশ-বল-সম্পন্ন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদের ন্যায় পুত্রের সহায়তা প্রাপ্ত হইয়া মদধারাবর্ষী মাতঙ্গের ন্যায় মদোদ্ধত হইয়া উঠিল তদীয় প্রবল প্রতাপ প্রহ্লাদের প্রতাপ-সহযোগে ঘনীভূত হইয়া জগত্রয় বিকসিত করিয়া তুলিল। প্রলয় সমাগমে যুগপদভ্যুদিত দ্বাদশ দিবাকরবৎ তদীয় অভিনব করপ্রকর্ষ-তাপ সুরগণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ যেমন দুর্ব্বিনীত বিলাস বিলোল বালকের দুষ্ট চেষ্টায় তদীয় বন্ধুগণ একান্ত উদ্বিগ্ন হয়, তেমনি রবিশশি-প্রমুখ সুরগণ তাহার এই নূতন কর-প্রতাপে অতীব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিলেন। দৈত্যের দৌরাত্ম্যে দেবগণ সর্ব্বদাই উদ্বেজিত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা সেই দৈত্যরূপ মত্ত মাতঙ্গরাজের বধ বিধানের নিমিত্ত পুনঃপুন সেই অনাদি পুরুষ নারায়ণ সমীপে আপনাদের সাগ্রহ প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। বস্তুতঃ বারম্বার যদি দুর্জ্জনের দুর্ব্ব্যবহার দেখা যায়, তাহা হইলে মহৎ ব্যক্তিরাও অধীর হইয়া উঠেন।

অনন্তর ভগবান্ নারায়ণ হিরণ্যকশিপুর অত্যাচারকাহিনী শ্রবণ করিয়া তাহাকে নিহত করিবার জন্য ভীষণ নরসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তখন প্রলয়-ধ্বস্ত জগন্মণ্ডলের ন্যায় তিনি ঘোর ঘর্ঘরধ্বনি করিতে লাগিলেন। দিগ্‌গজের দশনরাজির ন্যায় তদীয় নখরনিকর কঠিন কুলিশবৎ প্রতিভাত হইতে লাগিল। স্থির সৌদামিনীর প্রভার ন্যায় ধবলোজ্জ্বল দন্তকান্তি চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তাঁহার উজ্জ্বল জ্বলন-সন্নিভ কর্ণকুণ্ডলদ্বয় দশদিক্ দ্যোতিত করিয়া তুলিতে লাগিল। তদীয় উদর—সে এক উদ্ভটাকার! মনে হয় যেন একত্র পিণ্ডাকারে পরিণত কুলাচলকুল বিরাজিত। তাঁহার বিশাল বাহুবৃক্ষের বিধূননে ব্রহ্মাণ্ড-খর্পর কাঁপিতে লাগিল। তদীয়

বক্ত্র-বিনির্গত প্রশ্বাস-প্রভঞ্জনে শৈল সকল স্থানচ্যুত হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি ত্রিভুবন-দহনোদ্যত প্রলয়ানলোপম কোপানল সমুদ্দীপিত করিয়া অতীব গর্ব্বভরে বিচরণ করিতে লাগিলেন। তদীয় সটা-বিকট পীন-স্কন্ধের সজ্ঘর্ষণে যেন সৌরমণ্ডলও প্রচলিত হইতে লাগিল। তাঁহার রোমকূপসমূহের প্রোজ্জ্বল পাবকপুঞ্জে গিরিকুঞ্জ সকল পিঞ্জরাভা ধারণ করিল। তিনি মহাক্রোধে কুলাচলকুল সমুৎপাটিত করিয়া নানা দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। নিক্ষিপ্ত কুলাচলকুলে দিক্তটগুলি যেন উদ্ভট ভিত্তিভূমির ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে পট্টিশ, প্রাস ও তোমর প্রভৃতি নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র নিক্রান্ত হইতে লাগিল। মাধব এবম্বিধ নরসিংহ-দেহ ধারণপূর্ব্বক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুকে বিষম কটকটধ্বনি সহকারে নিহত করিলেন। মনে হইল, মহাগজ যেন তুরঙ্গমকে বিনষ্ট করিল। সর্ব্ব প্রাণীর প্রলয়-সঙ্ঘটনে কালানল যেমন জগৎকে দগ্ধ করিতে থাকে, তেমনি সেই নরসিংহ-রূপধারী হরির নয়ন-নিঃসৃত প্রচণ্ড বহ্নি তখন সমগ্র পুরবাসী অসুরদিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সেই নৃসিংহ-মারুত অত্যধিক ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলে তত্রত্য সমস্ত স্থান জলপ্রলয়ে বিস্ফূর্জ্জিত ঘনঘটাস্ফোটে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে দগ্ধা-বশিষ্ট দানবদল ভীতচিত্তে পলায়ন করিতে লাগিল। বহু দানব হতপ্রভ প্রদীপ অথবা দিগ্‌দাহ-জ্বলিত মশকপালের ন্যায় কোথায়—কোন্ অজ্ঞাত দেশে অদৃশ্য হইয়া গেল!

অনন্তর সমস্ত প্রধান প্রধান দৈত্য ইতস্ততঃ পলায়ন করিল; অন্তঃপুর সকল দগ্ধ হইয়া গেল। এই সকল ভীষণ লোমহর্ষণ ঘটনায় পাতালতল যেন প্রলয়-ধ্বস্ত জগতের আকার ধারণ করিল। সেই ভয়াবহ আকালিক মহাসমরে নরসিংহ দেব ক্রমে ক্রমে দৈত্যদল বিনাশ করিলেন। দৈত্যকুল নিহত হইলে দেবগণ সমাশ্বস্ত হইয়া মহাসমাদরে নরসিংহরূপী হরির অর্চ্চনা করিলেন। দেবগণ কর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়া হরি তখন অন্তর্হিত হইলেন।

তৎকালে যে সকল হতাবশিষ্ট দৈত্যদল ছিল, তাহারা প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া সেই দগ্ধ দেশে আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন মনে হইল, মীনগণ যেন শুষ্ক সরোবরে আগমন করিল। দৈত্যগণ স্বদেশে

ফিরিয়া আসিয়া প্রেত বন্ধুগণের উদ্দেশে বহু বিলাপ করিতে লাগিল এবং তৎকালোচিত ঔর্দ্ধদেহিক সৎকার সমাধা করিল। অনন্তর যাহাদের আত্মীয় স্বজন যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, কিম্বা অগ্নিতাপে দগ্ধ হইয়াছিল, হতাবশিষ্ট দানবেরা পুরপ্রবেশ করিয়া তাহাদিগকে ধীরে ধীরে সান্ত্বনা প্রদান করিতে লাগিল।

ঐ সময় প্রহ্লাদপ্রমুখ অসুরনেতৃগণ শোক-সন্তপ্ত-চিত্তে চিন্তামগ্ন ও নিশ্চেষ্ট হইয়া চিত্রার্পিতবৎ প্রতীত হইতে লাগিলেন। তাঁহারা তুষারতাড়িত পঙ্কজকুলের ন্যায় ম্লানকান্তি ধারণ করিলেন এবং অগ্নিদগ্ধ দ্রুমসমূহের ন্যায় নিষ্পন্দ বা নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিলেন।

ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩০॥

একত্রিংশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! অনন্তর ভগবান্ হরি কর্ত্তৃক দানবগণ বিনষ্টপ্রায় হইলে দুঃখাকুলচিত্ত প্রহ্লাদ সেই পাতালতলে মৌনভাবে থাকিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এক্ষণে আমাদের উপায় কি আছে? এই অসুরতরু হইতে যে কোন একটী তীক্ষ্ণাগ্র অঙ্কুর সমুৎপন্ন হইবে, শাখামৃগরূপী হরি তাহাকেই গ্রাস করিবেন। এই ত সেই পাতালতল! এখানে দোর্দ্দণ্ডশালী প্রবল প্রতাপান্বিত বহু দৈত্যভূপতি জন্ম গ্রহণ করিলেন; কিন্তু দুঃখের কথা বলিতে কি, হিমশৈল-জাত পঙ্কজবৎ কেহই হেথায় চিরস্থির হইয়া রহিতে পারিলেন না। এ স্থানে কত ভাস্বরাকৃতি গভীরগর্জ্জী দৈত্যসকল বারম্বার জন্ম লইতেছে; কিন্তু বিধাতার কি বিড়ম্বনা! ইহারা জন্মিবার পর যখন পরাক্রম প্রকাশের উপক্রম করে, তখনই তোয়নিধির তরঙ্গততির ন্যায় বিলয় পাইয়া যায়। আহা, বড় দুঃখের কথা! রিপুগণ কেবল যে আমাদের বাহ্য রাজ্য-সম্পদই অপহরণ করিয়াছে, তাহা নহে; তাহারা আমাদের আভ্যন্তরিক উৎসাহ, হর্ষ ও প্রসন্নতাদি সমগ্র সুখসমৃদ্ধিই হরণপূর্ব্বক দিন দিন বলীয়ান্ হইয়া উঠিতেছে।

যেমন নিশীথকালের কমলাকর সকল তমঃপূর্ণ-হৃদয়ে দলরাজি সঙ্কুচিত করত খেদ প্রাপ্ত হয়, তেমনি অদ্য আমার সুহৃদ্বর্গ গ্লানিপূর্ণ-মনে সর্ব্ব-সম্পদ হারাইয়া বিষম খেদানুভব করিতেছেন। সুরগণ পূর্ব্বে মদীয় পিতৃ-দেবের পাদপীঠ মর্দ্দন করিত, অধুনা তাহারা-দ্বেষবশে কলুষাশয় হইয়া আমার পৈতৃক রাজ্যই আক্রমণ করিয়া লইয়াছে। তাহাদের এই ব্যবহারে যেন হরিণ কর্ত্তৃক সিংহাধিষ্ঠিত মহারণ্য আক্রান্ত হইল বলিয়াই মনে হয়। আমার বন্ধুবান্ধবেরা আজ ভগ্নোৎসাহ; তাঁহারা দীনভাবে সর্ব্বত্র স্ব স্ব দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিয়া বিচরণ করিতেছেন। দগ্ধদল পুষ্মের ন্যায় তাঁহা-দের আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই। ধূপ-ধূমরাশির ন্যায় অধুনা অসুর-বীরগণের গৃহে গৃহে ধূসরাভ ভস্মরাশি অনবরত মারুতবেগে ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হই-তেছে। দৈত্যদিগের অন্তঃপুরস্থ প্রাচীরশ্রেণী দ্বার-কপাটহীন হইয়া রহিয়াছে; সম্প্রতি তাহাতে নবনবযবাঙ্কুর জন্মিয়া মরকতমণির প্রভার ন্যায় বিরাজ করিতেছে। পূর্ব্বে যাহারা সুমেরুগিরির পদ্মবন-বিমর্দ্দী প্রমত্ত মাতঙ্গদলের ন্যায় সগর্ব্বে—সগৌরবে সর্ব্বত্রে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, অদ্য তাহারা পূর্ব্বতন দেবগণের ন্যায় দীনদশায় উপনীত। অহো! বুঝিলাম, বিধাতার অসাধ্য কিছুই নাই। এখন আমাদের এতদূর শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে যে, যদি কোথাও একটা পতিত পত্রের স্পন্দন হয়, অমনি দৈত্যবধূগণ 'ঐ শত্রু আসিল' মনে করিয়া দৈবাৎ গ্রামাগত ভীতচকিত মৃগ-বধূর ন্যায় স্থানান্তরে পলাইবার প্রয়াস করে। অসুরাঙ্গনাগণের কর্ণভূষণার্থ রোপিত হইয়া যে সকল পাদপ রত্নস্তবকে প্রফুল্ল হইয়াছিল, অসুরপুরের সেই সুদৃশ্য পাদপশ্রেণী অধুনা নরসিংহের অত্যাচারে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া স্থাণু-বৎ বিরাজ করিতেছে। এক্ষণে সুরগণের সৌভাগ্যসূর্য্য প্রকাশমান হই-য়াছে; তাই তাহারা পুনরায় নন্দনকাননে কল্পতরুশ্রেণী রোপণ করি-তেছে। তাহাদের রোপিত তরুরাজি এক্ষণে দিব্য দিব্য বসন ও সুন্দর সুন্দর স্তবকে সুশোভিত হইয়া উঠিতেছে। পূর্ব্বে এমন দিন ছিল, যখন কেবল অসুরেন্দ্রগণই বন্দীকৃত দেববৃন্দের মুখাবলোকন করিত; কিন্তু এখন আর সে দিন নাই। এখন দেবগণই বন্দীকৃত অসুরবৃন্দের মুখ দর্শন করিতেছে। সুরগণের অদ্য কি অভাবনীয় ঐশ্বর্য্য উপস্থিত। তাহাদের

মাতঙ্গযূথের গণ্ডস্থল হইতে যে সকল মদধারা ক্ষরিত হইতেছে, তাহা একটা মহানদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। আমার এক এক বার মনে হয়, বুঝি বা ঐ সকল মদধারাই ভবিষ্যতে গিরিনদীরূপে পরিণত হইয়া প্রবাহিত হইতে থাকিবে। এক্ষণে আমাদের যে সকল হতাবশিষ্ট হস্তী আছে, তাহাদের গণ্ডস্থলবাহী মদধারা সকল শুষ্ক হইয়া বিশুষ্ক মরুখণ্ডস্থ ধূলিপটলবৎ সমুত্থিত হইতেছে। পূর্ব্বে শ্বেতবর্ণ মন্দারপুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইলে তাহাদের মকরন্দ-মিশ্র মন্দানিল-হিল্লোলে যাঁহারা তর্পিত হইতেন, সেই সুমেরু-শিখরোপম বীরেন্দ্রচূড়ামণি দৈত্যেন্দ্রগণ অদ্য কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছেন! মঞ্জরী যেমন পাদপে বিরাজ করে, দানবেন্দ্রগণের অন্তঃপুরোচিতা সুর-গন্ধর্ব্বরমণীরাও তেমনি অধুনা সুমেরুগিরির নানাস্থানে অবস্থান করিতেছে। মদীয় পিতার যে সকল অন্তঃপুরসুন্দরী ছিল, তাহাদের বিলাস-বৈভব অদ্য শুষ্ক পদ্মের ন্যায় নীরস হইয়া গিয়াছে এবং এখনকার সুর-সুন্দরীগণের লাস্যলীলার নিকট তাহার পরাজয় ঘটিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল চামরধারিণী আমার পিতার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে ব্যজন করিত, কি পরিতাপের বিষয়, তাহারাই অদ্য স্বর্গে থাকিয়া সহস্রাক্ষ সুরাধিপতিকে চামর দ্বারা ব্যজন করিতেছে। এই যে আমাদের দৈন্যদায়িনী বিপদ এখন উপস্থিত হইয়াছে, ইহার কারণ একমাত্র সেই জঘন্য পৌরুষশালী হরি। তাহারই চেষ্টায় আমাদের এই দুরাবস্থা উপস্থিত। সুরগণ সেই হরির বাহুবন-চ্ছায়ায় বিশ্রাম লাভ করে, তাই হিমাদ্রির সানুদেশের ন্যায় কখনই তাহারা কোনই সন্তাপ ভোগ করে না। শৌরির পরাক্রমরূপ তরুশিখরের অগ্রভাগে আশ্রয়-লাভে লব্ধসমৃদ্ধি হইয়া দেবগণরূপ মর্কটেরা, আমরা সবল হইলেও আমাদিগকে কুক্কুরবৎ অভিভূত করিতেছে। এই জন্যই অসুরপুরবাসিনী মহিলাবৃন্দের উত্তম মণ্ডনস্বরূপ মুখপদ্মে অদ্য তুষারবৎ বাষ্পবারি বিলগ্ন রহিয়াছে। এই জগৎরূপ জীর্ণমণ্ডপ অসুর-দিগের প্রতাপে শীর্ণপ্রায় হইয়াছিল, ইহার ভিত্তিভূমি বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এই সময় উহা সেই হরির নীলমণি-স্তম্ভনিভ বাহু-দণ্ডেই বিধৃত হইয়াছে। ক্ষীরাব্ধির মধ্যমগ্ন মন্দরগিরিকে হরি যেমন কূর্ম্মরূপে ধারণ করেন, তেমনি বিপদর্ণবে নিমগ্ন সুরসৈন্যগণকেও তিনিই ধারণ বা

সংরক্ষণ করিয়াছেন। প্রলয় বিক্ষুব্ধ বাত্যা যেমন কুলাচলদিগকে অধঃ-পাতিত করে, তেমনি সেই হরিই আমার পিতৃদেব প্রভৃতি প্রধান প্রধান অসুরবীরগণকে নিপাতিত করিয়াছেন। এই বিশাল বিশ্বকে তিনি একাকীই স্বীয় বাহুবহ্নির প্রভাবে ভস্মীভূত করিতে পারেন। সেই শ্রীমান্ মধুসূদন সুরসমূহের প্রধান। তাঁহাকে পরাভূত করিতে পারে, এ জগতে কেই বা সেরূপ শক্তি ধারণ করে? তিনিই দৈত্যদলের দোর্দণ্ডচ্ছেদী কুঠার-স্বরূপ; বাসব অদ্য তাঁহারই বীর্য্যে বীর্য্যবান্ হইয়া বানর-কৃত বালক-বিতাড়নের ন্যায় দানবদিগকে নিগৃহীত করিতেছে। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হরি যদি অস্ত্র পরিত্যাগ করিয়াও রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, তথাপি তিনি সমরে সকলেরই অজেয়। কেন না, যত বড় বলবান্ যোদ্ধা যতই অস্ত্রশস্ত্র বর্ষণ করুন, বজ্রাপেক্ষা কঠিনকলেবর হরি কিছুতেই কখন বিদীর্ণ হইবার নহেন। অস্মদীয় পিতা পিতামহাদি পূর্ব্ব পুরুষগণের সহিত হরি পরস্পর বহুবার বহু যুদ্ধ করিয়া শৈলক্ষেপণাদি নানাবিধ ভীষণ রণকৌশল অভ্যাস করিয়াছেন। সেই সেই অতি ভয়ঙ্কর সমরসংরম্ভেও যিনি বিন্দুমাত্র ভীতি-গ্রস্ত হন নাই, তাঁহার যে এক্ষণে ভয় হইবে, এরূপ একটা কথাই হইতে পারে না। তবে আমি অধুনা হরিকে বশীভূত করিবার একটী মাত্র সুন্দর উপায় স্থির করিয়াছি, সে উপায় ব্যতীত তাঁহাকে বশে আনিয়া তৎকৃত পীড়ার প্রতিক্রিয়া করিবার উপায়ান্তর নাই। এ জগতে সমস্ত বস্তুস্বরূপে —সমস্ত বুদ্ধিভেদে—সমস্ত কার্য্যারম্ভে একমাত্র সেই সুরবর হরিরই শরণ লইতে হইবে; তিনিই সকলের গতি। তিনি ভিন্ন অন্য কোনই উপায় নাই। এই ত্রিজগতের মধ্যে হরি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, —জগতের এই ত্রিবিধ অবস্থার সেই হরিই একমাত্র কারণ। আমি এই মুহূর্ত্ত হইতে সতত সেই অনাদি দেব নারায়ণেরই শরণাপন্ন হইলাম। সর্ব্বত্র সর্ব্বদা আমিই এখন হইতে নারায়ণময় হইয়া রহিলাম। আকাশকোশ হইতে মারুত যেমন কখন অপগত হয় না, তেমনি আমার অন্তর হইতে কদাচ 'নমো নারায়ণায়' এই সর্ব্বার্থসাধক মন্ত্র অপেত হইবে না। এ জগ-তের সকলই এখন আমার নিকট হরিরূপে প্রতিভাত হইতেছে। দিক্ হরি, আকাশ হরি, পৃথ্বী হরি, অধিক কি, এই জগৎই আমার হরিময়। আমিই

জন্মেয়াত্মা হরি; আমি বিষ্ণুময় হইয়াই জন্মিয়াছি। অবিষ্ণু হইয়া বিষ্ণু-পূজা করিলে সে পূজার ফলভাগী হওয়া যায় না; সুতরাং বিষ্ণু হইয়াই বিষ্ণুপূজা করিতে হয়। এই আমিও এখন বিষ্ণু হইয়াই অবস্থান করিতেছি। যিনি হরি—তিনিই প্রহ্লাদ; আমা ভিন্ন অন্য কেহই হরি নহেন। অন্তরে আমি এইরূপ নিশ্চয় করিয়াছি এবং সর্ব্বব্যাপী হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছি। এই অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া বিরাজিত স্বর্ণ-বর্ণ বৈনতেয় মদীয় অঙ্গের আসনস্বরূপ হইয়াছে। এই আমার বাহুচতুষ্টয়ের কর-শাখা-সমূহে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্মাদিরূপ বিহঙ্গমেরা নিয়ত বিশ্রাম লাভ করিতেছে। মদীয় নখকান্তিরূপ মঞ্জরীপুঞ্জে বাহুচতুষ্টয় আকীর্ণ হওয়ায় মহামারকত তরুবৎ প্রতিভাত হইতেছে। এই আমার বাহুচতুষ্টয় মৃদুল মন্দারমালায় মণ্ডিত রহিয়াছে। আমার এই বাহুচতুষ্টয়েই মন্দরাচল-ঘৃষ্ট কেয়ূরচতুষ্টয় সুশোভিত হইতেছে। এই সেই ক্ষীরাব্ধি-গর্ভোত্থিতা প্রিয়-তমা লক্ষ্মী দেবী উচ্ছলিত শশিকলাপ্রবাহের ন্যায় সুচারু চামর ধরিয়া মদীয় পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া রহিয়াছেন। যিনি ত্রিভুবনবাসী জনসাধারণের শ্রবণলালসার উৎপাদিকা এবং ত্রিলোকতরুর মঞ্জরীস্বরূপা, এই সেই অচলা অমলা কীর্ত্তিও আমার পার্শ্বদেশে বিরাজমানা। যিনি আপনার ইন্দ্রজালে বিলাসবতী হইয়া অনবরত জগৎসমূহের নব নব নির্ম্মাণকার্য্যে সমুদ্যতা, এই সেই মায়াদেবীও আমারই পার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া অবস্থিতা। কল্পদ্রুমের পার্শ্বে যেমন কল্পলতা শোভা পায়, তেমনি আমার প্রিয়তমা লক্ষ্মীর সখী,—হেলায় যিনি ত্রৈলোক্যতরুর আক্রমণকারিণী, সেই জয়া দেবীও আমারই পার্শ্বে বিরাজমানা। এই আমার নয়নদ্বয়—নিত্য শীতোষ্ণ সুধাকর ও দিবাকর বদনমধ্যে সমগ্র সংসার বিস্তার করিয়া অবস্থান করিতেছে। যাহা নব নীরদনিভ সুন্দরশ্রী—নীলোৎপলবৎ শ্যামবর্ণা, এই সেই আমার দেহপ্রভা দিঙ্মণ্ডল শ্যামীকৃত করিয়া সর্ব্বতঃ প্রসারিত হইতেছে। এই আমার করস্থিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ শব্দায়মান হইতেছে। এই শঙ্খ শব্দগুণে মূর্ত্তিমান্ আকাশবৎ শোভা পাইতেছে এবং স্বীয় শুভ্রতায় ক্ষীরাব্ধির ন্যায় বিরাজ করিতেছে। এই আমার নাভিনলিনী; ইহার কর্ণিকাকোটরে ব্রহ্মারূপ মকর নিলীন আছে। স্বীয় নাভিজাত সুন্দর পদ্ম আমি নিজ করে ধরিয়া

রাখিয়াছি। যাহা নানারত্নে রঞ্জিতা ও মেরুশিখরবৎ সমুন্নতা, এই আমার সেই দৈত্যদানব-মর্দ্দিনী গুর্ব্বী গদা। যাহা প্রখর কিরণমালায় সূর্য্যসন্নিভ সমুজ্জ্বল, এবং যাহার জ্বালামালায় দিগন্ত পর্য্যন্ত পাটলাভ, এই সেই আমার সুদর্শন চক্র। যাহা সধূম হুতাশনবৎ সমুজ্জ্বল এবং দৈত্যরূপ দ্রুমকুলের কুঠারস্বরূপ, এই সেই নিশিত শ্যামল নন্দকনামক খড়্গ আমার আনন্দ বিস্তার করত অবস্থিত। যাহা অনবরত শরধারাবর্ষণে পুষ্করাবর্ত্তকাদি মেঘ-বৃন্দের সমকক্ষ, এই সেই আমার ইন্দ্রচাপবৎ সুরঞ্জিত ফণীন্দ্রসন্নিভ শার্ঙ্গ-ধনু বিরাজমান। এই অনন্ত জগৎ বহুবার জন্মিয়াছে, নষ্ট হইয়াছে এবং এখন বিদ্যমান রহিয়াছে; এই আমিই ইহাদিগকে চিরকাল জঠরে ধারণ করিয়া রাখিয়াছি। এই মহী—আমার পাদদ্বয়, আকাশ—আমার মস্তক, এই ত্রিজগৎ—আমার কলেবর এবং দিকৃচক্রবাল—আমার কুক্ষি। আমিই সাক্ষাৎ নীলনীরদ-নিভ বিষ্ণু। সুপার্শ্বরূপ শৈলোপরি আমি বিরাজ করিতেছি এবং শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম, আমিই ধারণ করি। আমারই তাড়নায় সমস্ত দুর্ব্বৃত্তদল পলায়ন করিয়াছে। তাহাদের সেই পলায়ন পবনপ্রবাহে শুষ্ক-তৃণরাশির দূরোৎসারণেরই অনুরূপ। এই আমি নিজেই নীলোৎপল-দল-নিভ শ্যামকান্তি, পীত বসনধারী, লক্ষ্মীসহ বিহারী, গরুড়বাহন, গদাধর। আমি নিমিষে ত্রৈলোক্য-দহনে সক্ষম। কে আছে এমন আমার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করিবে? যদি কেহ করে, তাহা হইলে বিক্ষুব্ধ কালাগ্নি-প্রবিষ্ট শলভের ন্যায় সে নিজেই নিজের মৃত্যু ডাকিয়া আনিবে। এই আমার সম্মুখে সুরাসুরগণ রহিয়াছেন; ইঁহারা আমার তৈজসী সৃষ্টি নিরোধ করিতে একান্তই অক্ষম। বস্তুতঃ ক্ষীণ-দৃষ্টি-শক্তিশালী ব্যক্তিগণ কখন কি অপরের প্রভা-পাত নিরোধ করিতে পারে? এই আমি বিষ্ণু-স্বরূপ ঈশ্বর; ব্রহ্মা, ইন্দ্র, অগ্নি ও হর প্রভৃতি দেবগণ বহুবক্ত্র-বিনির্গত বহু বাক্যাবলী দ্বারা আমায় স্তব করিয়া থাকেন। সর্ব্বত্র আমার ঐশ্বর্য্য সমুল্লসিত হইয়াছে। আমি অজিতাকৃতি হইয়া জন্মিয়াছি এবং পরম মহি-মায় সর্ব্বদ্বন্দ্ব হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছি। একমাত্র আমারই দেহাভ্যন্তরে এই নিখিল জগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি সবলে সমগ্র দুষ্ট দলকে দলিত করিয়াছি। এই আমার দেহ অচল, অভ্র, তৃণ, কানন, সকলেরই

অভ্যন্তরে বিরাজিত, এইরূপে আমার এই দেহ সমস্ত ভয়েরই অপহারক; আমি আমার এ হেন দেহকে প্রণাম করি।

একত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩১ ॥

দ্বাত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! প্রহ্লাদ এইরূপে ভাবনাবলে স্বীয় দেহকে নারায়ণী-তনু হইতে অভিন্ন জ্ঞান করিয়া পুনরায় সেই অসুরারি হরির পূজার নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—মৎকল্পিত বিষ্ণুদৈবত মূর্ত্তি ব্যতীত অপর ব্যষ্টি বা সমষ্টি দৈবমূর্ত্তি নাই। কিন্তু আমার এই বিষ্ণু-স্বরূপ মূর্ত্তিকেই আমি প্রাণপ্রবাহে পুষ্পাঞ্জলি-দানে বাহিরে আবাহন করিয়া পূজাকাল পর্য্যন্ত পৃথক্‌স্বরূপে অবস্থিত বলিয়া কল্পনা করিলাম। আমার দেহ-বহির্ভাগে আমিই অপর বিষ্ণু হইয়া রহিলাম। সেই আমি বহিঃস্থিত বিষ্ণু—গরুড়বাহন, ক্রিয়া, জ্ঞান, ইচ্ছা ও অনুগ্রহাখ্য শক্তিচতুষ্টয়শালী, শঙ্খ-চক্র ও গদাপাণি, চন্দ্র ও সূর্য্য-নয়ন, শ্যামল-কলেবর, চতুর্ভুজ, শ্রীমান্, নন্দকখড়্গাধারী, পদ্মপাণি, বিশাললোচন, শার্ঙ্গধন্বা ও মহাদ্যুতি। এই বিষ্ণু-কেই আমি এক্ষণে সপরিবারে পূজা করি। মদীয় মনঃকল্পিত বিবিধ সামগ্রী-সম্ভারই এই পূজার বিশিষ্ট উপচার হউক। এইরূপে মানসিক পূজার পর পুনরায় বিবিধ রত্নময় বহুল বাহ্য পূজোপচারে আমি এই মহাদেবকে পূজা করিব।

প্রহ্লাদ এইরূপ স্থির করিয়া বিবিধ মণিময় সামগ্রী-সম্ভার দ্বারা মনে মনে কমলাপতির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। তিনি তাঁহার মানসিক হরি-পূজায় নানা রত্ন-খর্চিত পাত্র সকল, চন্দনাদি-লেপনবস্তু, ধূপ, দীপ, চিত্র-বিচিত্র নানা আভরণ, মন্দারমালা, হৈম কমলদল, কল্পতরুর লতাগুচ্ছ, নানাবিধ রত্নস্তবক, দিব্য দ্রুমরাজির পল্লব সকল ও নানাবিধ কুসুমদাম দিয়া বিষ্ণু পূজা করিলেন। কত কিঙ্কিরাত, কত কুন্দ, কত কহ্লার, কত কুমুদ, কত কাশকুসুম, কত চম্পক, কত বক, নীলোৎপল, খর্জ্জুরকুসুম,

কত চূত, কত কিংশুক, অশোক, মদন, বিল্ব, কর্ণিকার, কিরাত, কদম্ব, বকুল, নিম্ব, সিন্ধুবার, যূথিকা, পারিভাদ্র, গুগ্‌গুল, ইন্দুক, প্রিয়ঙ্গু, পাট, পাটল, ধাতুপাটল প্রভৃতি বিবিধ কুসুমসমূহ দ্বারা ; আম্র, আম্রাতক, হরীতকী, বিভীতক প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল সকল দ্বারা ; শাল, তাল, তমালাদি তরুনিকরের ফল, পুষ্প ও পল্লবাবলী দ্বারা; কুঙ্কুম সহ সহকার-তরুর কোমল কলিকাকুল দ্বারা এবং কেতক, শতপত্র ও এলাপুষ্পের মঞ্জরীপুঞ্জ দ্বারা হরির অর্চ্চনায় নিরত হইলেন। প্রহ্লাদ এইরূপে মনে মনে সমস্ত সৌন্দর্য্য-সম্মাননা, জাগতিক যাবতীয় বিভব-সম্ভার ও স্বীয় আত্মনিবেদন দ্বারা পরম ভক্তি সহকারে মানসপুরীর অভ্যন্তরে জগৎপতির পূজা করিলেন।

অনন্তর দানবাধিপতি প্রহ্লাদ বাহ্য পূজার বিবিধ উপচার সংগ্রহ করিলেন এবং দেবালয়ে বসিয়া মানস পূজার পদ্ধতি অনুসারে বাহ্য দ্রব্য-সম্ভার দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলেন। দানবনন্দন বার বার হরির পূজা করিলেন, পূজা করিয়া তাঁহার পরম পরিতোষ জন্মিল। তিনি সেই হইতে প্রত্যহ পরম ভক্তির সহিত পরমেশ হরির অর্চ্চনা করিতে লাগিলেন। অনন্তর কিয়ৎ কাল মধ্যেই সেই পুরবাসী সমস্ত দৈত্য পরম বিনীত ও বৈষ্ণব হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ রাজাই প্রজাপুঞ্জের আচার অনুষ্ঠানের কারণ; ফলে রাজা যেমন আচরণ করেন, প্রকৃতিপুঞ্জও অনেকাংশে তাঁহারই অনুসরণ করে।

হে অরিন্দম রাম! দৈত্যগণ বিষ্ণুর প্রতি আর বিদ্বেষী নাই, তাহারা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি পরম ভক্তিমান্ হইয়া উঠিয়াছে; এই সংবাদ দেবলোকে রাষ্ট হইয়া পড়িল। ইন্দ্রাদি সমগ্র সুরগণ এই সংবাদে বিস্ময়াপন্ন হইলেন। হে রাঘব! তাঁহারা তখন ভাবিতে লাগিলেন,—তাই ত, দৈত্যদল বৈষ্ণবী ভক্তি গ্রহণ করিল কেমন করিয়া? বিস্ময়াকুল বিবুধগণ এইরূপ ভাবিয়া পরস্পর মন্ত্রণাপূর্ব্বক ক্ষীরাব্ধি-মধ্যস্থ ভোগি-ভোগশায়ী ভগবান্ হরির নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে তৎসমীপে সমস্ত দৈত্য-বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। তখন সেই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা-শ্রবণে সবিস্ময়ে সমাসীন হরিকে বিবুধগণ জিজ্ঞাসিলেন,—ভগবন্! একি হইল! যে দৈত্যগণ সততই আপনার বিরোধী, তাহারা অধুনা হঠাৎ এরূপ ভবদেক-পরায়ণ ভক্ত হইয়া উঠিল

কেন? আমরা মনে করি, ইহা নিশ্চয়ই কোন মায়া বৈ আর কিছুই নয়। কোথায় সেই একান্ত দুর্ব্বৃত্ত গিরিবিদারী দানবদল? আর কোথায়ই বা সেই পাশ্চাত্য মহাজন্ম-লভ্য জনার্দ্দনে ভক্তি? ফল কথা, যাহারা বিদ্বেষ-বশে ভবদীয় ভক্ত দেব ও মুনিগণের আবাসস্থান পর্য্যন্ত ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করিত, তাহাদের স্বভাবপ্রকৃতি, আর পূতচরিত পুণ্যকর্ম্মাদিগেরই প্রাপ্য ভগবদ্ভক্তি, এই উভয় বিষয় বিবেচনা করিলে দৈত্যগণ যে ভবদীয় ভক্ত হইতে পারে, ইহা কিছুতেই সম্ভাব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। প্রভো! প্রাকৃত জাতি সদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিল, এ কথা 'অদ্য আকালিক কুসুমমালার ন্যায় আমাদের সুখের কারণও বটে এবং দুঃখের কারণও বটে; কেন না, যে স্থানে যাহা উপযুক্ত হয় না, তথায় তাহার সমাবেশ বড়ই বিসদৃশ হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত দেখাই—প্রভূত কাচরাশির মধ্যে মহামূল্য মণি কি কখন সুশোভিত হইতে পারে? যে ব্যক্তি যেমন গুণবান্, তাহার তদনুরূপ, অবস্থান-লাভই ঘটে। দেখুন, কুকুর ও ছাগ উভয়ের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকিলেও ছাগের মধ্যে মিলিয়া মিশিয়া কুকুর কখনই মনের সুখে বাস করে না। বস্তুতঃ দৈত্যগণে ভগবদ্ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, এই বিসদৃশ ব্যাপারে আমাদের অন্তরে যথেষ্ট ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছে। মনে হয়, আমাদের অঙ্গে যদি বজ্রসূচী বিদ্ধ হইত, তাহা হইলেও বুঝি বা আমরা এত ক্লেশ অনুভব করিতাম না। ফলে যাহা যেখানে যোগ্যতা প্রাপ্ত হইয়া সম্পন্ন হয়, তাহাই অনিন্দার্হ হইয়া থাকে এবং তাহাই তথায় প্রকৃত সুশোভিত হয়। দৃষ্টান্ত স্থলে বলা যাইতে পারে, জলোৎপন্ন পদ্ম জলেই শোভা পায়, পরন্তু স্থলে তাহার শোভা হয় না। যাহারা সতত হীনকর্ম্মে নিরত ও নীচাচারে নিযুক্ত, তথাবিধ তামসযোনি অধম দানব-জাতিই বা কোথায়? আর শান্ত দান্ত সজ্জন-লভ্য বৈষ্ণবী ভক্তিই বা কৈ? ফলে এ উভয়ের পার্থক্য অনেক। বলিতে কি, হে প্রভো! কমলিনী যদি কর্কশ ঊষরভূমিতে পতিত হইয়া দুরাশ্রয় হইয়া পড়ে, তাহা হইলে সে যেমন সুখাবহ হয় না, তেমনি অধুনা দৈত্যদল বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছে, এ কথাও আমাদের প্রীতিকরী হইতেছে না।

দ্বাত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩২ ॥

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অসুরগণের অনুচিত ব্যবহার-দর্শনে সুরগণ ক্রোধভরে কিঞ্চিৎ উচ্চকণ্ঠে এই সকল কথা জিজ্ঞাসা করিলে, শত্রুনাশন মাধব শিখিকুল-সমীপে জলধরের ন্যায় ধীর গম্ভীর স্বরে তাঁহাদিগকে কহিলেন,—হে বিবুধগণ! প্রহ্লাদ মৎপ্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছেন বলিয়া তোমরা বিষাদগ্রস্ত হইও না। তিনি রিপু দমনে সক্ষম; তাঁহার এই জন্মই পাশ্চাত্য জন্ম। এই জন্মেই তিনি মোক্ষলাভের যোগ্য। বীজ দগ্ধ হইয়া গেলে তাহা যেমন আর অঙ্কুরিত হয় না, তেমনি এই জন্মের অবসানে প্রহ্লাদকে আর গর্ভবাস-যাতনা ভোগ করিতে হইবে না। ভাবিয়া দেখ, যদি গুণী জন গুণবিহীন হইয়া পড়ে, তাহা হইলেই বিসদৃশ বা অনর্থের হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আর গুণহীন জন যদি গুণবান্ হইয়া উঠে, সে ত সুখের কথা,—তাহাতে তো বৈসাদৃশ্য কিছুই ঘটে না; বরং নির্গুণের গুণবত্তা ইষ্টসিদ্ধিরই হেতুভূত। হে সুরবরগণ! তোমরা স্ব স্ব সুরম্য ভবনে গমন কর। জানিও—প্রহ্লাদের এই গুণশালিতা তোমাদের কোনরূপ অনিষ্ট বা অমঙ্গলের হেতু হইবে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ভগবান্ বিষ্ণু বিবুধগণকে এই কথা কহিয়া ক্ষীরাব্ধির বীচিমালা-মধ্যে অন্তর্হিত হইলেন। মনে হইল, তটোৎপন্ন তমাল-বিটপীর গুচ্ছ যেন সাগরতরঙ্গে পড়িয়া বিলীন হইয়া গেল। সুরগণ হরিকে পূজা করিয়া অম্বরাবাসে প্রয়াণ করিলেন। তাঁহাদের গমনে মনে হইল, পুনর্ব্বার মন্দার-বিক্ষুব্ধ অর্ণব হইতে কণজাল যেন অম্বরে উৎপতিত হইল। তখন হইতে দেবগণ—প্রহ্লাদের প্রতি যে বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তাহা পরিত্যাগ করিলেন; অধিকন্তু দিন দিন তাঁহার প্রতি স্নেহবান্ হইয়া উঠিলেন। বস্তুতঃ ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যথায় মহাপুরুষগণেরও উদ্বেগ-আশঙ্কা নাই, তথাবিধ জনে বালকের মনও বিশ্বাসযুক্ত হয়। যাহা হউক, প্রহ্লাদ অতি ভক্তির সহিত কর্ম্ম, মন ও বাক্যে প্রত্যহ দেবদেব জনার্দ্দনকে পূজা করিতে লাগিলেন। তিনি এইরূপে হরিপূজায় নিরত রহিলে কালক্রমে তাঁহার বিবেক, বৈরাগ্য ও প্রমোদসম্পদ প্রভৃতি গুণরাশি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভোগ-ব্যাপারে তাঁহার আর অনুরক্তি রহিল না। যেমন শুষ্ক তরু

কাহারও অভিনন্দনার্হ নহে, তেমনি ভোগরাশি তাঁহার নিকট অভিনন্দিত হইল না; তিনি সে সকল তুচ্ছ জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলেন। জনাকীর্ণ মহী যেমন মৃগের প্রীতিকরী নহে বলিয়া, সে তথায় বিহার করে না, তেমনি রমণী-সম্ভোগে প্রীতি বা অনুরক্তি সঞ্চার ছিল না বলিয়া তিনি তাহাদের সংসর্গে আর রহিলেন না। শাস্ত্রীয় সদালাপ ভিন্ন তিনি কোন অশাস্ত্রীয় লোকাচারে প্রীতি প্রকাশ করিতে লাগিলেন না। জলপদ্মিনী যেমন জলে বৈ স্থলে থাকে না, তেমনি তিনিও কোনরূপ সামাজিক উৎসবেই যোগদান করিতে সমুদ্যত হইতেন না। বিমল মুক্তায় যেমন মুক্তাফল অসংশ্লিষ্ট হয়, তেমনি তাঁহার চিত্তও ভোগরোগের অনুরঞ্জনায় কিছু-তেই সংশ্লিষ্ট হইত না। তদীয় মন তখন ভোগাদি-সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তখনও পূর্ণ বিশ্রান্তি লাভ করে নাই; কাজেই অবিকল যেন দোলাধিরোহণ করিয়াই অবস্থিত ছিল। ফল কথা, প্রহ্লাদের চিত্ত ঐ সময় সম্পূর্ণ বিষয়ানুরক্ত ছিল না এবং একেবারেই যে ব্রহ্মভাবে পরিণত হইয়াছিল, তাহাও নহে। যাহা হউক, ভগবান্ হরি ক্ষীরাব্ধি-মন্দিরে থাকিয়াই বিশুদ্ধ সত্ত্বময়ী সর্ব্বতঃপ্রসারিণী বুদ্ধিবলে প্রহ্লাদের তাদৃশ অবস্থা পরিজ্ঞাত হইলেন।

অনন্তর ভক্তজনের আহ্লাদ-প্রদাতা ভগবান্ বিষ্ণু পাতালপথে প্রহ্লা-দের সেই দেব-পূজায়তনে আসিয়া উপনীত হইলেন। ভগবান্ অভ্যাগত হই-য়াছেন, জানিয়া দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ দ্বিগুণ উৎসাহ-সহকারে পরম শ্রদ্ধার সহিত সেই পরম পুরুষ পুণ্ডরীকাক্ষের পূজা করিলেন। হরি প্রহ্লাদের পূজা-গৃহে আসিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। পূজান্তে প্রহ্লাদ পরম প্রীতিভরে সুস্পষ্ট মধুরবাক্যে তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ কহিলেন,—এই ত্রিভুবনের যে সুরক্ষিত অবস্থান, তাহার যিনি সুদৃশ্য কোশাগারস্বরূপ, যিনি বাহ্য ও আভ্যন্তর নিখিল কলঙ্ক অপহরণ করেন, যিনি স্বয়ং পরম প্রকাশ ও অশরণ জনগণের যিনি শরণ্য, সেই অজ অচ্যুত ঈশ ঈশ্বর হরির আমি আশ্রয় গ্রহণ করি। যিনি নীলোৎপল ও নীলকান্তমণিবৎ নীলবর্ণ, শারদীয় নীল অমল অম্বর-কোশের ন্যায় যাঁহার দেহ নীলাভ; যিনি ভ্রমর, তিমির ও অঞ্জনতুল্য

শ্যাম-কলেবর, সেই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারী হরি আমার আশ্রয় হউন। যিনি অলিকুলের ন্যায় কোমলাঙ্গ, যদীয় হস্তস্থিত শঙ্খ শ্বেতবর্ণ সরোজ-কোরকবৎ শুভ্র সুন্দর, বিরিঞ্চিরূপ ভ্রমর যাঁহার নাভিকমলে শ্রুতি-ধ্বনিচ্ছলে গুনগুন গুঞ্জন করিতেছে; আমি আমার সেই হৃদয়পদ্মের দলাশ্রয় বিমল হরির শরণাপন্ন হইলাম। যদীয় শুভ্রবর্ণ নখরনিকর তারকারাজির ন্যায় আকীর্ণ, ঈষৎ হাস্যশোভায় ধবলবর্ণ বদন,—পূর্ণ ইন্দু-বিম্ববৎ বিরাজমান এবং বক্ষঃস্থলস্থিত কৌস্তুভমণির মরীচিমালা মন্দা-কিনীবৎ প্রসারিত, আমি সেই হরিরূপী বিশাল শারদাকাশের আশ্রয় গ্রহণ করি। যিনি অনবরত সৃষ্টি করেন, করিয়া পুনরায় সকল ধ্বংস করেন, যাঁহার জন্ম নাই, বৃদ্ধি নাই; যিনি বিরাটদেহে বিরাজমান, যাঁহার সত্ত্ব, রজ ও তমঃ প্রভৃতি মায়াগুণ প্রযুক্ত কত অনন্ত কল্যাণগুণ বিদ্যমান, যিনি সেই সকল গুণে অতি প্রাচীন সুন্দর দেহ ধারণ করেন; আমি সেই প্রলয়ে বটপত্রশায়ী বালকবপু হরিকে আশ্রয় করি। যদীয় নাভিদেশ নব-বিকসিত নলিনপরাগে গৌরবর্ণ, কমলার অধিষ্ঠানে যাঁহার বামাঙ্গ বিরাজিত এবং সান্ধ্যরাগবৎ অরুণবর্ণ অঙ্গরাগে যিনি রঞ্জিত, আমি সেই স্বর্ণাম্বর-সুন্দর-হরির শরণাপন্ন হই। নিখিল দিতিসুতরূপ নলিনদলের যিনি তুষারপাতবৎ বিরাজিত এবং সুরসমূহরূপ সরোজরাজির যিনি সৌর-মণ্ডলস্বরূপে সমুদিত, অপিচ ব্রহ্মাধিষ্ঠিত নলিনীর যিনি তড়াগস্বরূপ, আমি সেই হৃদয়-নলিন-নিলয় বিভু হরির শরণ গ্রহণ করি। যিনি ত্রিভুবন-সরসীর সিতারবিন্দ, যিনি মোহ-তিমিরের অপসার-কর সমুজ্জ্বল দীপস্বরূপ এবং সর্ব্বজগতের যিনি আর্ত্তিহর চিন্মাত্রমূর্ত্তি অজড় আত্মতত্ত্ব, আমি সেই হরির শরণাপন্ন হই।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—রামচন্দ্র! প্রহ্লাদ এইরূপ গুণ-গৌরবময়ী স্তুতি-বাণী দ্বারা অসুরসংহারী হরিকে অর্চ্চনা করিলেন। তখন সেই লক্ষ্মী-সমালিঙ্গিত-বক্ষঃস্থল নীলোৎপল-দল-নীল নারায়ণ প্রীতিমান্ হইয়া প্রীত-চিত্ত দানবেন্দ্রকে প্রত্যুত্তর-দানে কৃতার্থ করিলেন। মনে হইল, জলধর যেন ময়ূরকে গম্ভীর নাদে অভিভাষণ করিল।

ত্রয়স্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৩ ॥

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—হে গুণনিধে! হে দৈত্যকুলচূড়ার মহামণে! যাহাতে পুনরায় তোমাকে আর জন্ম-যন্ত্রণা ভোগ করিতে না হয়, তাদৃশ অভীষ্ট বর এক্ষণে গ্রহণ কর।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—হে বিভো, সর্ব্বসঙ্কল্পদায়িন্! সর্ব্বান্তর্যামিন্! আপনি যাহা উৎকৃষ্টতম বলিয়া বিবেচনা করেন, তাহাই আমায় আদেশ করুন।

ভগবান্ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! যতকালে না তোমার ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তি লাভ ঘটে, তাবৎ পর্য্যন্ত তুমি সর্ব্বার্থ-নিবৃত্তি ও পরমোত্তম ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হও।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! সমুদ্র-সমুদ্গত তরঙ্গ যেমন ঘর্ঘরধ্বনি করিয়া সমুদ্রেই আবার বিলয় পাইয়া যায়, সেই বিষ্ণুও তেমনি দানবকুল-ধুরন্ধর প্রহ্লাদকে ঐ কথা কহিয়া তখনই অন্তর্দ্ধান করিলেন। বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ দেবপূজা সমাধা করিলেন, তিনি দেবোদ্দেশে মণিরত্ন-পরিস্তৃত শেষ কুসুমাঞ্জলি সমর্পণান্তে অতি প্রীতিভরে বরাসনে বদ্ধপদ্মাসন হইয়া উপবেশনপূর্ব্বক স্তোত্র পাঠ করিতে করিতে অন্তরে চিন্তা করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ মনে মনে ভাবিলেন,—ভবদুঃখহর হরি আমায় এইরূপ উপদেশ দিয়া গেলেন যে, তুমি বিচারবান্ হও। আমি তাঁহার এই উপদেশ অনুসারে অধুনা আত্মবিচার করিতে প্রবৃত্ত হই। এই বিশ্বমণ্ডল,—এখানে এই যে আমি রহিয়াছি, কথা কহিতেছি, চলিতেছি, থাকিতেছি, কত শত যত্ন করিয়া বিষয় ভোগ করিতেছি, এই আমি কে? আমার প্রকৃত তত্ত্ব কি? এই যে তরুতৃণ-শিলা-সঙ্কুল জগৎ রহিয়াছে, এই জগৎ কি আমি? না—তাহাও নহে; তবে কেমনে বলিব—কে আমি? এই যে অনিত্য দেহ—যাহা কিছুকালের জন্য প্রাণপবনে সঞ্চালিত ও অল্পকাল মধ্যেই বিনশ্বর মূকস্বভাব হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে, এই দেহও আমি নহি। কেন না, এ দেহ—অচেতন, আর আমি হইলাম—চেতন। যাহা জড় কর্ণবিবরের কল্পিত, শূন্য হইতে যাহার উদ্ভব, আকৃতি যাহার শূন্য এবং

যাহা ক্ষণবিনাশশীল, সেই শব্দই যে আমি, তাহাও বলিতে পারি না; কেন না, শব্দও তো অচেতন। যাহা ক্ষণমধ্যেই বিনশ্বর, মাত্র ত্বকের সাহায্যেই যাহার কখন উপলব্ধি হয় এবং কখনও বা হয় না, যাহার স্বরূপোপলব্ধি একমাত্র চিতের প্রসাদেই ঘটিয়া থাকে, সেই চেতনা-বিহীন স্পর্শও তো আমি নহি। যাহা অনিত্য এবং চঞ্চলস্বভাব, সেই রসনেন্দ্রিয়ের সাহায্য মাত্রেই যদীয় স্বরূপোপলব্ধি হয় এবং রসনার অগ্রভাগ হইতে মাত্র কণ্ঠদেশ পর্য্যন্তই যাহার গতিবিধি হইয়া থাকে, সেই দ্রব্যনিষ্ঠ অচেতন রসও তো আমি হইতে পারি না। রূপের স্থায়িত্ব অল্প ক্ষণমাত্র; দৃশ্য ও দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিতই উহার সম্বন্ধ বা সত্তা। কেবল উপভোগ জন্মাইয়া একমাত্র দ্রষ্টাতেই উহা উপক্ষীণ হইয়া যায়, এই যে—রূপ, ইহাও আমি নহি; কেন না, ইহা অচেতন। ঘ্রাণেন্দ্রিয় অন্ধবৎ জড় বা অপ্রকাশ; তাহার সাহায্যে যাহা পরিকল্পিত হয়, যদীয় আকৃতির স্থৈর্য্য-নিয়ম কোন কিছুই নাই, সেই কোমলস্বভাব গন্ধরূপেও তো আমি নির্দ্দিষ্ট হইতে পারি না; কেন না, উহা অচেতন। আমি নির্ম্মম, নির্ম্মনন ও শান্ত; আমাতে পঞ্চেন্দ্রিয়-ভ্রম নাই। আমি নিখিল কলাকলন-বিরহিত শুদ্ধ চেতন বৈ আর কিছুই নহি। আমি চেত্য-বর্জ্জিত চিন্মাত্র এবং এই আমিই বাহ্য ও অভ্যন্তরব্যাপী বিভাগ-বিরহিত বিমল, সৎস্বরূপ। জগতে যে কিছু বস্তু আছে, একমাত্র আমিই তাহার অবভাসক। এই আমিই চেতনস্বরূপ; আমি আমা দ্বারাই উত্তম তেজঃসম্পন্ন প্রদীপের ন্যায় সূর্য্যদেব হইতে আরম্ভ করিয়া ঘটপটাদি যাবতীয় পদার্থ পর্য্যন্ত সমস্তই প্রকাশিত করিতেছি। এত দিনে এই নিখিল বিষয় মদীয় স্মৃতিপটে অঙ্কিত হইয়া উঠিল। আমাতে বিষয়াদি বিকল্প কিছুই নাই। আমিই চিন্ময় প্রকাশস্বরূপ সর্ব্বব্যাপী আত্মা। অন্তঃপ্রকাশমান তেজঃপুঞ্জে যেমন জ্বলন্ত অঙ্গারকণা সকল প্রকাশিত হয়, তেমনি এই আত্মস্বরূপ আমি—আমারই প্রভাবে এই বিচিত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতেছে। সর্ব্বতঃ প্রসারিত তীব্র নিদাঘে যেমন মরু-মরীচিকা প্রকাশিত হয়, তেমনি এই বিচিত্র ইন্দ্রিয়বৃত্তিগুলিও আত্মাতেই স্ফূর্ত্তিমতী হইতেছে। অন্ধকারে দীপালোকের সহায়তা প্রাপ্ত হইলেই যেমন বসনরাশির শুক্ল-কৃষ্ণাদি গুণ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তেমনি এই আত্মা আমি—

আমাতেই যাবতীয় বস্তুর বস্তুত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। স্বচ্ছ মুকুর যেমন সমগ্র বস্তুর প্রতিবিম্বের বিশ্রামভূমি, তেমনি যে কিছু জাগ্রৎ পদার্থ, তৎসমস্তেরই অনুভব ও বিশ্রান্তিস্থল—এই একমাত্র আত্মাই। আত্মা চিন্ময় দীপ-স্বরূপ, বিকল্পবিহীন ও একাদ্বয় বস্তু। তাঁহারই প্রসাদে সূর্য্য উষ্ণ হইয়াছে, চন্দ্র শীতল হইয়াছে, পর্ব্বত কঠিন হইয়াছে এবং জল দ্রবধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া রহিয়াছে। সাতত্য ক্রমে অর্থাৎ আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে জল, ইত্যাদি প্রকারে শ্রুতি-প্রত্যক্ষাদি দ্বারা এই যে সকল জাগতিক পদার্থ অনুভূত হইতেছে, ইহাদের উৎপত্তি, স্থিতি ও ধ্বংস-ব্যবস্থায় এই আত্মাই একমাত্র আদি কারণ। পরন্তু আত্মার কারণ কিছুই বিদ্যমান নাই। নিদাঘকালীন সৌরতাপে ভূমির তাপবত্তার ন্যায় পূর্ব্বোল্লিখিত সাতত্যক্রমে এই আত্মা দ্বারাই অনুভূয়মান সমস্ত পদার্থের পদার্থত্ব সমুদিত হইয়া থাকে। যেমন হিম হইতে শৈত্যের আবির্ভাব হয়, তেমনি প্রকৃত আকার না থাকিলেও অবিদ্যাহেতু কারণীভূত ব্রহ্মাদি সমগ্র কারণের কারণ এই প্রত্যক্ ব্রহ্ম হইতেই এ জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, ইহাঁরা—সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণীভূত। জগতের স্থিতিব্যাপারে এই আত্মাই ঐ ব্রহ্মাদিরও আদিকারণস্বরূপ; পরন্তু ইঁহার কারণ কিছুই বিদ্যমান নাই। এই চিৎ, চেত্য, দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি নাম-বিরহিত, স্বয়ম্প্রকাশ নিত্য, একাদ্বয় আত্মাই আমি; সুতরাং আমাকেই আমি নমস্কার করি। ঐ চিদাত্মা ভূত-পতি ও নির্ব্বিকল্প; নিখিল ভূতজাতি এই আত্মাতেই অবস্থিত এবং ইহাঁতেই প্রবিষ্ট। এই চিদাত্মা অন্তর্যামী [মন] হইয়া যাহাই যখন সঙ্কল্প করুন, তদাকারেই সর্ব্বত্র পরিণত হইয়া থাকেন; তাহার অন্যথা কখনই হয় না। চিৎ আপন সত্তাস্ফূর্ত্তি প্রদানে যে কোন বিষয় উজ্জীবিত করিয়া লয়েন, তাহা অচিরাৎ স্বপদ অর্থাৎ স্বৎস্বরূপতা লাভ করে। পরন্তু যাহা ঐ চিৎ কর্তৃক স্বীয় সত্তাস্ফূর্ত্তি-দানে উজ্জীবিত নহে, তাহা সৎ হইলেও নাশ প্রাপ্ত হয়। এই ব্রহ্মাকাশ একটা অতি বিপুল দর্পণাকার; ইহাতে যে কত শত শত ঘটপটাকার পদার্থপুঞ্জ প্রতিবিম্বিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। প্রতিবিম্ব-গত প্রভাকর যেমন আধার-পদার্থের ক্ষয় হইলে ক্ষয়শীল, আর বৃদ্ধি হইলে বৃদ্ধিশালী হন, তেমনি এই আত্মবিম্ব—আধার-

পদার্থ অর্থাৎ সঙ্কল্পময়ী বুদ্ধির ক্ষয় হইলে ক্ষয়-বিকারসম্পন্ন এবং বৃদ্ধি হইলে বৃদ্ধি-বিকার-যুক্ত হয়। প্রতিবিম্বিত অর্কের ন্যায় ইনি সৎ ও অসৎ উভয় ভাবেই অবস্থিত। এই অতি নির্ম্মল পরমাকাশ অজ্ঞ ভূতবৃন্দের অদৃশ্য; পরন্তু যাঁহাদিগের চিত্ত গলিত হইয়া যায়, তাঁহাদিগেরই ইহা প্রাপ্য। সাধুসজ্জনেরাই ঐ বিমল চিদাকাশ অবোলোকন করিয়া থাকেন। পাদপ হইতে মধুপ-সমাকুল মঞ্জরীপুঞ্জের উৎপত্তির ন্যায় এই পরমাকাশ হই-তেই বিবিধ লোকব্যবহারময়ী অশেষ দৃশ্য পদার্থরাজি প্রাদুর্ভূত হইতেছে। যেমন অচল হইতে তরুগুল্ম-রাজিত বিচিত্র বন সমুৎপন্ন হয়, এই পরিবর্ত্তনশীল চলপ্রকৃতি সংসার তেমনি আত্মাকাশ হইতেই সমুদিত হইয়া থাকে। এই ত্রৈলোক্যোদরে ব্রহ্মাদি তৃণ পর্য্যন্ত যে কিছু পদার্থ আছে, ঐ প্রকাশস্বভাব চিদাত্মা তৎসমস্ত হইতে অভিন্ন এবং সকলেরই আত্মা ও প্রকাশকর্ত্তা। আমিই একমাত্র আদি-অন্ত-বিরহিত সর্ব্বগামী আত্মা; আমিই স্বানুভবরূপে নিখিল চরাচর প্রাণি-বৃন্দের অন্তরে বিরাজমান। আমিই সেই চিদাত্মস্বরূপ; এই চরা-চরাত্মক বহু শরীর আমারই। এই সকল শরীরের সংখ্যা কত, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং ইহারা কবে হইয়াছে, কত কাল থাকিবে বা কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহারও ইয়ত্তা করা অসম্ভব। এই একাদ্বয় আত্মা আপন অনুভূতিবলে আপনা হইতেই স্বপ্রকাশ অনুভূতি-স্বরূপ; ইনি সর্ব্বদৃক্, সর্ব্বদ্রষ্টা ও সর্ব্বদৃশ্য বলিয়া সহস্রকর ও সহস্রলোচন। এই আত্মাই আমি, আমিই সুন্দর সূর্য্য-দেহ ধারণ করিয়া আকাশে বিহার করিতেছি এবং বায়ুদেহ ধারণান্তে বায়ু হইয়া বহিতেছি। আমার কলেবর শঙ্খ-চক্র-গদা-ধররূপে সর্ব্বসৌভাগ্যের সীমান্ত প্রদেশে উপনীত হইয়াছে। এ জগতে আমি প্রাদুর্ভূত হইয়াছি। আমি সতত পদ্মাসনে অবস্থান করিতেছি এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অবস্থিত হইয়া অধুনা পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমিই ত্রিনেত্র,—গৌরীর বদন-পদ্মের মধুকররূপে বিরাজ করিয়া থাকি। কূর্ম্ম-কৃত স্বীয় অঙ্গ-সঙ্কোচের ন্যায় সৃষ্টির অবসানে আমিই এই নিখিল বিশ্ব আপনাতে সঙ্কুচিত করিয়া লই। তাপস ব্যক্তি যেমন অনায়াসেই আপনার মঠায়তন রক্ষা করিয়া থাকেন,

তেমনি মন্বন্তর-পর্য্যায়ে-পরিপ্রাপ্ত এই নিখিল ত্রৈলোক্য আমিই ইন্দ্র-রূপে পালন করিয়া থাকি। স্ত্রী আমি, পুরুষ আমি, বালক আমি এবং বৃদ্ধ আমি; আমিই বিশ্বতোমুখ এবং আমিই দেহধারী বলিয়া 'জাত' নামে অভিহিত। জীর্ণ কূপের অভ্যন্তরে রস সঞ্চার থাকে বলিয়া তাহা হইতে যেমন তৃণ-লতাদি সমুৎপন্ন হয়, তেমনি তৃণলতাদির অভ্যন্তরে রসরূপে অবস্থান করিয়া আমিই তাহাদিগকে চিদ্ভূমি হইতে উদ্ভাবিত করিয়া থাকি। ক্রীড়নক-নির্ম্মাণ-নিপুণ বালক যেমন ক্রীড়া করিবার নিমিত্ত পঙ্ক দ্বারা নানাবিধ ক্রীড়ন দ্রব্য প্রস্তুত করে, আমিও তেমনি আপনার লীলা-খেলার নিমিত্ত এই বিশাল বিস্তৃত সুচারু জগদাড়ম্বর নির্ম্মাণ করিয়াছি। আমি কারণরূপে এই জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছি, আমার সত্তাতেই এ জগৎ সত্তা প্রাপ্ত হয় এবং আমিই আবার আপনাতে ইহাকে বিলয় করিয়া থাকি। এই জগৎ সৎ হইলেও আমি ইহাকে যদি পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আর ইহা কিছুই নহে। আমি বিশাল চিদাদর্শস্বরূপ; আমাতে যাহা প্রতিবিম্বিত, তাহারই প্রকৃত অস্তিত্ব; পরন্তু এতদ্ব্যতীত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। কেন নাই?—তাহার কারণ এই যে, আমা ভিন্ন আর কোন পদার্থই তো বিদ্যমান নাই। আমি কুসুমে আমোদ, পুষ্পপত্রে প্রভা, প্রভায় রূপ এবং রূপে অনুভব হইয়া বিরাজ করিতেছি। এই যে কিছু চরাচর জগৎ দৃশ্যাকারে পরিস্ফুরিত হইতেছে, এ সকলই সর্ব্ব সঙ্কল্প-বিরহিত পরম চৈতন্যস্বরূপ; এই চৈতন্য-স্বরূপতা আমারই। আমিই পরম চিৎতত্ত্ব। যদ্দারা সরিৎ-সাগরাদি সলিলপ্রবাহ বিস্তৃত ও প্রবাহিত হইতেছে, সেই রসময়ী আদ্যাশক্তি সলিলাকারে তরুলতা প্রভৃতি পদার্থ-সমূহে তাহাদের অঙ্কুর-জননের কারণ হইয়া যাদৃশরূপে বিস্তার প্রাপ্ত হইয়াছে, আমিও তেমনি এক হইয়াও যাবতীয় জীবনিবহে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছি। আমিই উল্লিখিতরূপে নিখিল পদার্থের অপূর্ব্ব অভ্যন্তরবর্ত্তিতা প্রাপ্ত হইয়া আপন ইচ্ছায় সম্বিদ্‌বৈচিত্র্য প্রকটিত করিতেছি। যেমন দুগ্ধাভ্যন্তরে ঘৃত ও জলাভ্যন্তরে রসশক্তি অবস্থান করে, আমিও তেমনি নিখিল পদার্থ-পরম্পরার অভ্যন্তরে চিৎশক্তি হইয়া অবস্থান করিতেছি। পৃথিবীর একাংশে যেমন তৃণকাষ্ঠাদি বস্তুসমূহ অবস্থান করে, তেমনি

চেত্যোপচার-হীন— ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান,—এই ত্রৈকালিক জগৎ, চিৎ-স্বরূপ আমি,—আমারই কোন এক অংশবিশেষে অবস্থিত রহিয়াছে, আমিই নিখিল দিগন্তরাল পরিপূর্ণ করিয়া সমস্ত সঙ্কোচ-বিভ্রম বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সর্ব্ব পদার্থে অবস্থান করিতেছি। আমিই সর্ব্বস্থ, সর্ব্বকর্ত্তা, বিরাট্ ও সম্রাট্ হইয়া অবস্থিত আছি। ইন্দ্রকে বন্ধন করিবার আমার প্রয়োজন হয় নাই, শস্ত্র-প্রহারে অপরাপর সুরবৃন্দকেও আমার সংহার করিতে হইল না এবং কাহারও নিকট প্রার্থনা করিবারও আমার প্রয়োজন হয় নাই; আমি এ সকল না করিয়াও অবাধে এই জগৎরাজ্য লাভ করিলাম। আমার মনে হয়, এই জগৎরাজ্য লাভ করিবার পন্থা সম্পূর্ণই নূতন। এমন ভাবে পূর্ব্বে কেহই কখন ইহা পাইয়াছেন বলিয়া আমি মনে করি না। অহো! আমার আত্মা এখন অতীব বিস্তৃত হইয়াছে। কল্পান্ত-কালীন পবন-পরিচালিত একার্ণবের স্থান যেমন স্বীয় আধারে সঙ্কুলন হয় না, তেমনি আমারও এখন আপন আত্মায় স্থান-সমাবেশ হইতেছে না, অর্থাৎ আত্মায় আমি অপরিমিত হইয়া উঠিয়াছি। পঙ্গু যেমন ক্ষীরাব্ধি মধ্যে পতিত হইয়া তাহার আর অন্তসীমা পায় না, পরন্তু সরীসৃপের ন্যায় তাঁহাতে সঞ্চরণ করিতে থাকে, আমিও তেমনি প্রচুরতর আনন্দময় আত্মরূপে স্বয়ং অন্তরনুভূত স্বীয় আত্মার অন্ত না পাইয়া নিরন্তর ভাসিয়া বেড়াইতেছি। এই ব্রহ্মাণ্ড-সংস্থান অতি ক্ষুদ্র এবং অতীব সঙ্কীর্ণ। বিল্বে যেমন গজাঙ্গ-সমাবেশ হয় না, এই ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডে আমারও বিশাল বর্পুর তেমনি স্থান-সঙ্কুলান হইতেছে না। বিরিঞ্চি-নিকেতন বা ব্রহ্ম-লোকেরও পরপারে এবং সাংখ্য-বৈষ্ণবাদি তন্ত্র-প্রসিদ্ধ চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অথবা শৈব-পাশুপত-নিরূপিত ষট্ত্রিংশৎ তত্ত্বেরও উপরি ভাগে আমার স্বরূপ বিরাজ করিতেছে; অদ্যাপি তাহার প্রত্যাবর্ত্তন ঘটে নাই। আমার আকৃতির অবধি নাই, আমি অসীম; অথচ 'এই দেহাদিই আমি' এরূপ ভিত্তিহীন কল্পনা এত দিন আমার কোথা হইতে কেন হইয়াছিল? বস্তুতঃ তখনকার ঐরূপ সঙ্কীর্ণ কল্পনা আমার ক্ষুদ্রতারই পরিচায়ক বৈ আর কিছুই নহে। 'এই তুমি' 'এই আমি' ইত্যাদি সকলকে মিথ্যা ভ্রম ব্যতীত আর কিছুই বলা চলে না। কি দেহ? কি অদেহ?

মৃতই বা কে ? আর জীবিতই বা কে ? ফলতঃ এ সকলের কিছুই কিছু নয়। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী পিতামহগণ নিশ্চয়ই অতি দীনস্বভাব ও লঘুমতি ছিলেন; নতুবা এমন সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এই তুচ্ছ ভবভূমিতে অনুরক্ত হইবেন কেন ? কোথায় এই পরিপূর্ণ ব্রাহ্মী মহাদৃষ্টি ? আর কোথাই বা এই ভুজঙ্গ-ভীষণা আশাময়ী ভয়াবহা ভবরাজ্য-বিভূতি ? ফল কথা, ব্রাহ্মী বিভূতির নিকট এ রাজ্যসম্পত্তি একান্তই অকিঞ্চিৎকরী। যত কিছু দৃষ্টি আছে, তন্মধ্যে এই অনন্ত আনন্দ-সম্ভোগ-জননী পরম শান্তিশালিনী বিশুদ্ধ চিন্ময়ী দৃষ্টিই সর্ব্বথা উৎকর্ষবতী। আমি সর্ব্বভাবের অন্তরস্থিত চেত্য-মুক্ত চিদাত্মা এবং আমিই প্রত্যক্ চেতনস্বরূপে বিরাজমান; এ হেন আমি আমাকেই বার বার নমস্কার করি। এ সংসারে আমিই সর্ব্বথা জয়যুক্ত হইয়াছি; কেন না, চিরভুক্ত অন্নের ন্যায় আমিই এ সংসারকে জীর্ণ করিয়াছি এবং স্বয়ং জন্মবর্জ্জিত হইয়াছি। আমি সমগ্র প্রাপ্তব্য সুখ প্রাপ্ত হইয়া জীবনসাফল্য লাভ করিয়াছি। আমি মহাত্মা; অতএব আমি সর্ব্বোৎকর্ষেই বর্ত্তমান রহিয়াছি। এই নিত্য বোধরূপ উত্তম সাম্রাজ্য আমি পরিত্যাগ করিয়া—যাহা দুঃখময়, বা যাহাতে রমণী-য়তার লেশমাত্র নাই, তথাবিধ রাজ্যসম্পদে আসক্ত হইবার আমার আর প্রয়োজন নাই। যাহাতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বনদুর্গ, জলদুর্গ বা গিরি-দুর্গের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়, তথাবিধ ধরাধিপত্য প্রাপ্ত হইয়া যে দানব হর্ষভরে চঞ্চলচিত্ত হইয়া উঠে, তাদৃশ দীনাত্মা অনাত্মজ্ঞ কুদানব-কীট সর্ব্বথা ধিক্কারেরই যোগ্য পাত্র। আমার অজ্ঞ পিতা হিরণ্যকশিপু অবিদ্যার সহিত একীভাবাপন্ন অন্নপানাদি বিষয়-সমূহ দ্বারা তদীয় অবি-দ্যাময় অঙ্গের তৃপ্তি উৎপাদন করিয়া এত কাল কি করিলেন ! তিনি কতিপয় বর্ষ যাবৎ এই ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী লাভ করিয়া পবিত্র কাশ্যপকুলে জন্ম গ্রহণের অনুরূপ কার্য্য কি করিলেন এবং কোন্ পুরুষার্থই বা প্রাপ্ত হইলেন ! এই পরমোত্তম ব্রহ্মানন্দের আস্বাদ না লইয়া শত শত জগৎরাজ্যের সম্ভোগসুখ আস্বাদন করিলেও—নিশ্চয় বলিব, কিছুরই আস্বাদন করা হইল না। যিনি এই পরমানন্দের স্বাদ একবার লইয়া-ছেন, তাঁহার নিকট অন্য কোন আনন্দই কিছু নহে। যিনি বহি-

রানন্দের কোনই আস্বাদ প্রাপ্ত হন নাই, অথচ অন্তরে এই পরমামৃত-পানে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আমি নিঃসন্দেহে বলিব,—তাদৃশ ব্যক্তি সমস্ত অখণ্ডিত সুখই লাভ করিয়াছেন। যাহার বুদ্ধি মূঢ়তায় সমাচ্ছন্ন, তাদৃশ জনই এই অপরিমেয় পরমানন্দ পদ পরিহারপূর্ব্বক—যাহা পরিমিত,—যাহা তুচ্ছ—তথাবিধ অপর বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়া থাকে; পরন্তু পণ্ডিত লোকেরা এ হেন ক্ষুদ্র বিষয়সুখের অন্বেষণ করেন না। দৃষ্টান্ত দেখাই—একমাত্র উষ্ট্রই সুকোমল লতা পরিত্যাগ করিয়া কণ্টক-ভক্ষণে উৎকণ্ঠিত হয়; পরন্তু অন্য কেহই সেরূপ ভক্ষণে স্পৃহান্বিত হয় না। এই তত্ত্বদৃষ্টিই পরম দৃষ্টি, এ দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া কে বল,—দগ্ধ রাজ্যের প্রতি অনুরক্তিযুক্ত হইবে? বস্তুতঃ কোন্ ধীমান্ ব্যক্তি সুমিষ্ট ইক্ষু-রস পরিহার করিয়া কটু-তিক্ত নিম্ব-রস পান করিয়া থাকে? আমার পূর্ব্বতন পিতৃপিতামহগণ নিশ্চয়ই মূর্খ ছিলেন; কেন না এইরূপ দৃষ্টি পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা কেবল রাজ্যসঙ্কটেই অনুরক্তি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। আহা! কোথায় বা ফুল্ল পুষ্পময়ী নন্দন-বনস্থালী? আর কোথায়ই বা তাপদগ্ধ মরুভূমি? কোথায় বা শমগুণময়ী তত্ত্ব-বোধ-দৃষ্টি? আর কোথায়ই বা ভোগায়তন দেহ প্রভৃতিতে আত্মবুদ্ধি? কিঞ্চিৎ নিবিষ্ট-চিত্তে বিচার করিয়া দেখিলে দেখা যাইবে, এ সকলের মধ্যে পরস্পর মহান্ প্রভেদ বিদ্যমান। এ ত্রৈলোক্যে এমন কোনই সুখ নাই, যাহাতে রাজ্য পাইয়াও বাঞ্ছা হইতে পারে; কিন্তু চিৎতত্ত্বে সকলই আছে; সুতরাং তাহা কেন লোকে অনুভব করে না? চিৎ—নির্ব্বিকার; সর্ব্বত্র সমভাবে তাঁহার অবস্থান; তিনি স্বচ্ছ ও সর্ব্বময়, তাঁহা হইতেই সেই সকল সুখ ও সুখসাধন যথাযথ লব্ধ হইয়া থাকে। কেন না, তেজের যাহা প্রকাশ-কারিণী—তৈজসী শক্তি, ইন্দুর যাহা সুধারসবর্ষিণী—ঐন্দবী শক্তি, ব্রহ্মার যাহা মহতী—ব্রাহ্মী শক্তি, ইন্দ্রের যাহা ত্রিলোকরাজতা—ঐন্দ্রী শক্তি, শিবের যাহা নিরতিশয় জ্ঞানৈশ্বর্য্য ও আনন্দপূর্ণতা—শৈবী শক্তি, বিষ্ণুর যাহা জয়লক্ষ্মী—বৈষ্ণবী শক্তি, মনের যাহা শীঘ্রগামিতারূপ—মানসী শক্তি, বায়ুর যাহা বলবত্তা ও বেগবত্তারূপ—বায়বী শক্তি, অগ্নির যাহা দাহ-কারিণী—আগ্নেয়ী শক্তি, জলের যাহা রসনির্ব্বৃতি—জলীয় শক্তি, মুনির

যাহা মহাতপঃসিদ্ধি—মৌনী শক্তি, বৃহস্পতির যাহা বিদ্যারূপিণী—বার্হস্পতী শক্তি, বিমানের যাহা ব্যোমগতিরূপ—বৈমানিকী শক্তি, পর্ব্বতের যাহা স্থিরতারূপ—পার্ব্বতী শক্তি, সমুদ্রের যাহা গম্ভীরতারূপ—সামুদ্রী শক্তি, সুমেরুর যাহা মহোন্নত্যরূপ—মৈরবী শক্তি, সুগতের যাহা শমশ্রী বা শূন্যতারূপ সর্ব্বোপপন্ন-শান্তি—সৌগতী শক্তি, মদিরার যাহা মদলোলতারূপিণী—মাদকতা শক্তি, বসন্তের যাহা কুসুমসমূহ-শোভিতা—বাসন্তী শক্তি, বর্ষার যাহা জলদ-নাদরূপ—বার্ষিকী শক্তি, হিমের যাহা শীততারূপ—হৈমী শক্তি, মায়ার যাহা মায়াপ্রচুরা—মায়ী শক্তি, নভোমণ্ডলের যাহা নিকলঙ্কতা বা নির্লেপতারূপ—নাভসী শক্তি ও নিদাঘের যাহা তাপ-তপ্ততা—নৈদাঘী শক্তি, এতৎসমুদায় এবং অন্যান্য বহুতর দেশ, কাল ও ক্রিয়ারূপিণী নানাকার-বিকারময়ী অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান,—এই ত্রিকালমধ্যবর্ত্তিনী যে কিছু বহু বিচিত্র শক্তিসমষ্টি, সমস্তই সেই বাস্তব নির্ব্বিকার স্বস্থ সম ও কলাকলন-যুক্ত চিদ্ব্রহ্ম হইতেই প্রাদুর্ভূত হয়। প্রভাকরের করপ্রভা যেমন সর্ব্বত্র সমানভাবে পতিত হইয়া থাকে, তেমনি নিখিল বিকল্প-বিরহিতা সর্ব্বময়ী চিৎ যাবতীয় পদার্থ-পরম্পরায় সমভাবে পতিত হইতেছেন ; বিশদার্থ এই যে, চিত্তের কোনই বিকল্প নাই। তিনি সমস্ত বৃত্তিবৃন্দেই প্রবিষ্ট, অথচ চিত্তবৃত্তি-গত সমস্ত বিকল্পবৈচিত্র্য তাঁহাতেই আসিয়া লিপ্ত হয় ; সর্ব্বত্রই তাঁহার একরূপতা বিরাজ করে। রবি-কর যেমন পুরুষদেহে পড়িয়া পুরুষাকৃতি হয় এবং স্থাণুতে পড়িয়া স্থাণুর আকার ধারণ করে, চিৎও তেমনি চিত্তবৃত্তির বৈচিত্র্যক্রমে বিচিত্রাকারতা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সমুদায় পদার্থরাশি যাহাতে ক্ষণেকের মধ্যে সমস্ত দিগন্তরালে গিয়া উপনীত হইতে পারে এবং যেরূপে তাহাদিগকে অতীত, অনাগত ও বর্ত্তমান, এই ত্রৈকালিক বিভাগে কল্পিত করিয়া প্রকাশিত করা যায়, বিমলা চিৎ—তৎস্বারূপ্য উপগত হইয়া এই দৃশ্য সমস্ত সংসারাবস্থাকে দিক্ ও কালত্রয়ে তাদৃশরূপে উপনীত করত চেত্যাকারে পরিণত করিয়া থাকেন। ফল কথা এই যে, যিনি সেই একমাত্র অখণ্ড চিৎ, তিনিই আপনা হইতে অভিন্ন কাল কর্ত্তৃক পরামৃষ্ট হইয়া উল্লিখিত ত্রিকাল-কলনায় যেন শতধা ভিন্ন হইয়াই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও উপমান

প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা যেন মেয় পুরুষ হইতে ভিন্নরূপেই পরিস্ফুরিত হইতে থাকেন। চিতের যে বিবিধ দৃষ্টি, তাহা কালত্রয়ের পরামর্শ বশতই হইয়া থাকে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র পূর্ণতা ব্যতীত চিতের অবশেষ অপর কিছুই থাকে না। যদি মধু ও নিম্ব এই দুইটী বস্তু একসঙ্গে আস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে আস্বাদ্যমান বস্তুর সংখ্যা দুইটী হইলেও উহাদের আস্বাদ-অনুভূতি যেমন একই, তেমনি বিষয় বহুবিধ হইলেও যিনি চিৎ—তিনি এক ব্যতীত বহু নহেন, নিশ্চয়ই। যাহাতে পরস্পরের ব্যাবর্ত্তক ভেদসঙ্কল্প নাই, যাহা সর্ব্ববিধ ভাবের অনুগত, সূক্ষ্ম, অদ্বৈত, সত্তা-স্বরূপ, তাদৃশ চিতি দ্বারা এই ঘট-পটাদি বিবিধ পদার্থপুঞ্জ এককালে অনুভূত হইলে অনুভব একইরূপ হইবে, তাহার বৈষম্য কিছুই ঘটিবে না এবং নাইও; অতএব বলা যায়, চিতেরও বৈষম্য ঘটনার কারণ কিছুই নাই। চিতের ভেদ-ভিন্নতাও বাস্তবিক কিছুই নাই; তাহার যে ভেদ, তাহা কেবল সঙ্কল্প-সিদ্ধ; ঐ ভেদ-সঙ্কল্প সর্ব্বথা পরিত্যাজ্য। উহা পরিত্যাগ করিবার প্রাথমিক উপায়,—গুরূপদেশ ও আত্মবিচার। কেন না, ঐ দুই উপায় অবলম্বনে দৃশ্যসমূহের অত্যন্তাভাব বাস্তবিকই ঘটে, এই ভাব আশ্রয় করিয়া চিত্ত-ভাব সদ্যই শোক-মোহাদির আক্রমণ হইতে অব্যাহতি লাভ করে। গুরূপদেশ শ্রবণ ও আত্মবিচার করিবার পর চিত্ত হইতে সমস্ত দৃশ্য-দর্শন ঘুচিয়া যায়। তখন চিত্ত অদ্বয় সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে অবলোকন করিয়া বিষয়ানুরাগাদি-জনিত পঙ্কিলতা পরিহার করে। এইরূপে চিৎ যখন অতীত দৃশ্যের বাসনাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বর্ত্তমান দৃশ্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে, তখন আর নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চের আধার কালত্রয়ের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি পতিত হইবে না; কাজেই ভাবী কালে দৃশ্যসহ চিতের আর সম্বন্ধ বন্ধন ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তৎকালে তাঁহার সর্ব্বত্র সমতাই অবশিষ্ট রহিবে; অতএব বীজাভাবে যে কিছু ভেদসঙ্কল্প তাহাতেই সকল পরিত্যক্ত হইয়া যাইবে। চিৎ—বাক্যের অগম্য; তাই তিনি নিত্যসিদ্ধা হইলেও ভেদ-সঙ্কল্পসম্পন্ন ভ্রান্তলোকদিগের দৃষ্টিতে তিনি যেন একেবারে নাই বলিয়াই প্রতীত হয়েন। বলিতে কি, তাহাদের সেই ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের ফলে সত্য সত্যই চিৎ যেন অস্তিত্বহীন হইয়া থাকেন প্রকৃত পক্ষে দেখিতে

গেলে তিনি নিত্য সৎস্বরূপেই বিরাজিত। শাস্ত্রীয় ব্যবহারদশায় তাঁহাকে আত্মা ও ব্রহ্ম-নামে নিরূপিত করা হয়। বস্তুতঃ তিনি বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া কিছুই নহেন; অথবা তিনিই সর্ব্বস্বরূপে বিরাজমান। সমস্ত দৃশ্য প্রপঞ্চ সম্পূর্ণরূপে উপশমিত হইয়া গেলে সর্ব্বত্র যে এক অখণ্ড সমতা বিরাজ করে, তাহাই মোক্ষনামে নিরূপিত হইয়া থাকে। সঙ্কল্প আসিয়া চিৎকে যখন আক্রমণ করে, তখন ইহাঁর প্রকাশ শক্তি হ্রাস পাইয়া যায়; এই জন্য ইনি পাটলবর্ণ আবরণবতী দৃষ্টির ন্যায় এই জগৎকে সচ্চিদাকারে অবলোকন করিতে সক্ষম হন না। জগৎ তখন ইহাঁর দৃষ্টিতে অন্য-আকারে প্রতিভাত হইতে থাকে। চিৎ যখন ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট-কল্পনায় পঙ্ক-পরিলিপ্ত হন, তখন তিনি পাশবদ্ধ বিহগীর ন্যায় কিছুতেই উৎপতনে সক্ষম হন না। এই সকল জগদ্বাসী লোক চক্ষুহীন পক্ষীর ন্যায় কেবল সঙ্কল্পবশেই মোহজালে জড়িত রহিয়াছে। আমার পিতা-পিতামহগণ নিশ্চয়ই মোহজালে জড়িত হইয়া বিষয়াবর্টে পতিত হইয়াছিলেন; সেই জন্যই তাঁহারা এই অবাধ সাধু আত্ম পদবী অবলোকন করিতে সক্ষম হন নাই। তাঁহাদের দর্শনপথে আত্মপদবী পতিত হয় নাই বলিয়াই তাঁহারা অতি শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়া—কিয়দ্দিনের জন্য বসুধা পৃষ্ঠে বিরাজ করিয়া—কুহরগত মশকবৃন্দের ন্যায় অতি শীঘ্র বিনাশদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিষয়-ভোগ বড়ই দুঃখজনক; আমার পিতামহগণ কেবল সেই দুঃখেরই আশায় কাল কাটাইয়া গিয়াছেন। সেই হতাশয় মৎ-পূর্ব্বপুরুষেরা যদি একবার এই আত্মতত্ত্ব বিদিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে কখন ভাবাভাব দশার অন্ধকূপে পতিত হইতে হইত না। সুখ-দুঃখ-ভোগ-মোহ,—ইচ্ছা ও দ্বেষ জন্য; জীবগণ তাহারই প্রভাবে ভূ-বিবরবাসী কীটকুলের সহিত সমতা উপগত হইয়া থাকে। আত্মতত্ত্ব সত্যস্বরূপ; সেই সত্য বস্তুর বোধরূপ জলধর যাঁহার ইষ্টানিষ্টরূপিণী সঙ্কল্প-মরীচিকা প্রশমিত করিয়া দেয়, তাঁহারই জীবন সার্থক হইয়া থাকে। যিনি নিতান্ত নির্ম্মল, অবিচ্ছিন্ন ও অতীব শুদ্ধ, তাঁহাতে আবার সঙ্কল্প-পঙ্ক আসিবে কোথা হইতে? বস্তুতঃ চন্দ্রিকার কি কখন উষ্ণতা সম্ভব হয়? আমিই ঐ অবিচ্ছিন্ন চিদাকার আত্মা; আমি নিজেকেই নিজে নমস্কার করি। হে অখিল লোকের জ্ঞানালোকমণে!

আত্ম-দেব! অদ্য আমি বহুকালের পর আপনাকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আহা! আজ আমি আপনাকে বহুদিনের পর স্পর্শ করিলাম, লাভ করিলাম এবং পরমার্থস্বরূপে সমুদিত হইতে দেখিলাম। আজ অনেক কালের পর আপনি বিকল্প জাল হইতে উদ্ধৃত হইলেন। আপনি যে কেহ হউন, আপনাকে আমার নমস্কার। হে দেব! তুমি অনন্ত-স্বরূপ; তুমিই আমি হইয়া বিরাজমান। অতএব শিবাত্মা তুমি,—তোমাকেই আমার নমস্কার। তুমি দেবাধিদেব পরম পুরুষ পরমাত্মা; তোমাকে আমি নমস্কার করি। মেঘাবরণ-হীন পূর্ণ সুধাংশু-মণ্ডলের ন্যায় যাহাতে কিছুমাত্র সঙ্কল্পাবরণ নাই, যাহা আধারান্তরের অভাবে আপনি আনন্দৈকরস আত্মাতেই স্বীয় পারমার্থিক-রূপে বিরাজিত এবং যাহা স্বপ্রকাশ, স্বাধীন ও আনন্দস্বরূপ, আমি তথাবিধ স্বীয় রূপকেই নমস্কার করি।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৩৪॥

পঞ্চত্রিংশ সর্গ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—এ জগতে যে কিছু বস্তু বিদ্যমান, সকলই এই অনুভূয়মান ওঙ্কারস্বরূপ নির্ব্বিকার আত্মা বৈ আর কিছুই নহে। এই চিদাত্মা—মেদ, অস্থি, মাংস, মজ্জা ও শোণিতাদির অতীত বস্তু। প্রদীপ যেমন গৃহমধ্যে থাকিয়া গৃহ ও গৃহস্থ সমস্ত বস্তু প্রকাশিত করে, তেমনি এই আত্মা সূর্য্যাদির অন্তরস্থ হইয়াও তাঁহাদিগকে প্রকাশিত করিতেছেন। এইরূপে ইনি স্বীয় স্বত্তা মাত্রেই দহনকে দাহিকাশক্তি-সম্পন্ন করিতেছেন, জলকে রসাকারে বিভাবিত করিতেছেন, এবং রাজার ন্যায় ইন্দ্রিয়ানুভব ভোগ সকল আপনিই উপভোগ করিতেছেন। এই আত্মা স্থিতিশীল হইলেও সমাসীন নহেন; ইনি গমন-পরায়ণ হইলেও গমন করেন না; সকল প্রকার ব্যবহার হইতে বিরত রহিলেও ইনি ব্যবহার-পরায়ণ হন এবং কোন কার্য্য বা চেষ্টা-তৎপর হইলেও ইনি তাহাতে লিপ্ত হন না। কি ইহলোক, কি পরলোক, কি ইহলোক হইতে লোকান্তর-গমন, সর্ব্বত্র

সকল কালেই ইনি শাস্ত্রীয় শুভ কর্ম্ম এবং অশাস্ত্রীয় অশুভ কর্ম্মের ফল-ভোক্তা হইয়াও সর্ব্ববিধ ভোগবৃত্তিতেই সমভাবে অবস্থান করেন। ইহাঁর ভয় নাই, বিকার নাই, ইনি সেই সেই বিহিত নিষিদ্ধ কর্ম্মানুসারে স্বয়ং সমুদ্ভূত হইয়া থাকেন এবং ব্রহ্মাদি তৃণস্তম্ব পর্য্যন্ত সমুদ্ভুত ভোক্তৃ-ভোগ্যভাব ও তদধিকরণ চতুর্দ্দশ ভুবন এই নিখিল জগৎ স্বীয় সন্নিধান-মাত্রেই পরিচালন করিয়া অবস্থান করেন। ইনি সদাগতি সমীরণ অপে-ক্ষাও নিত্য স্পন্দময়, স্থাণু অপেক্ষাও নিত্য নিষ্ক্রিয় এবং আকাশকোশ অপেক্ষাও নিত্য নির্লেপ। বিশদ কথা এই যে, সমীরণ কখন কখন স্পন্দন-বিহীন হইতে পারেন এবং তাঁহার যদি সেরূপ নিষ্পন্দতা কখন ঘটেও; কিন্তু এই আত্মা কদাচ স্পন্দনহীন হইবার নহেন; ইনি সদাই স্পন্দনবান্ থাকেন। যদি কখন কোন কারণে স্থাণুরও চলন সম্ভব হয়, তথাপি ইনি কিন্তু নিত্যই নিশ্চল থাকেন। যদি কখন কোনও কারণে আকাশেও কোন দ্রব্যের লেপ-সংক্রমণ ঘটে, তথাপি ইহাঁতে কোনওরূপ লেপ-সংক্রম ঘটিবার নহে; ইনি নিত্যকালই নিতান্তই নির্লেপ বা নির্ম্মল। মারুত যেমন পল্লব-দল কম্পিত করিয়া থাকে, ইনিওতেমনি সকলের মন ক্ষোভিত করিতেছেন। সারথি যেমন স্বীয় রথসংযুত অশ্বদল পরিচালিত করে, এই আত্মাও তেমনি ইন্দ্রিয়বৃন্দকে পরিচালিত করিতেছেন। ইনিই দেহগৃহে বাস করিতে ছেন,—করিয়া সর্ব্বদা দরিদ্রবৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে নিরত রহিয়াছেন। ইনিই আবার সর্ব্বজনপ্রভু সম্রাটের ন্যায় স্বস্থচিত্তে অবস্থানপূর্ব্বক বিষয় ভোগে ব্যাপৃত আছেন। আত্মাই সদা অন্বেষ্টব্য, স্তোতব্য এবং ধাতব্য। ইহাঁকে যদি অন্বেষণ করা যায়, তাহা হইলে জরা, মরণ ও সম্মোহ প্রভৃতির হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ ঘটে। জ্ঞান মাত্রেই এই আত্মা সুলভ হইয়া থাকেন এবং আপ্ত বন্ধুর ন্যায় স্মৃতিমাত্রেই ইঁহাকে বশীভুত করা যায়। ইনি সর্ব্বজীবের শরীর-সরোজে ষট্‌পদের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। দূরস্থ বন্ধুকে উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতে হয়;কিন্তু ইনি দূরস্থ নহেন,ইঁহাকে আহ্বান করিতে হইলে উচ্চ চীৎকারের প্রয়োজন নাই। কোন আহ্বানও ইহাঁকে করিতে হয় না, ইনি স্বীয় দেহমধ্যেই বিদ্যমান; সেইখানেই ইহাঁকে লাভ করা যায়। প্রণব মাত্রের উচ্চারণেই ইহাঁকে স্মরণ করিতে

হয়,—করিলে ক্ষণমধ্যেই ইনি সম্মুখে আসিয়া দেখা দেন। এই আত্মা সর্ব্বসম্পদের অধীশ্বর হইলেও অন্যান্য ধনাঢ্য ব্যক্তির ন্যায় ইহাঁতে কোন অভিমান বা পরাবহেলন নাই; সুতরাং ইহাঁকে সেবা করিলে ইনি কাহারও প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শন করেন না। যেমন কুসুমে সৌরভ, তিলে তৈল এবং সরস দ্রব্যে স্বাদ বিদ্যমান, এই আত্মাদেবও তেমনি দেহসমূহ মধ্যে বিরাজমান। বহুকালের পর পূর্ব্বদৃষ্ট বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে যেমন চিনিতে পারা যায় না, তেমনি ইনি হৃদস্থ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও অবিচার বশতই ইহাঁকে জানিতে পারা যায় না; কিন্তু যখন বিচার বলে এই পরমেশ আত্মাদেবকে অবগত হওয়া যায়, তখন প্রিয়জন লাভে যেমন আনন্দ উপস্থিত হয়, তেমনি আনন্দ সমুদিত হইয়া থাকে। এই আত্মা অপার আনন্দপ্রদ পরম বন্ধু; ইঁহাকে দেখিতে পাইলে—যাহাতে জরা-মরণাদি যাবতীয় দুঃখ বিলয় পাইয়া যায়, সমস্ত স্নেহাদি পাশ ছিন্ন হয়, সর্ব্বশত্রু ক্ষয় পায় ও দুষ্ট মূষিক-কৃত গৃহ-খননবৎ আশারাশি মনকে আর ছিন্ন ভিন্ন করিতে পারে না, তথাবিধ দিব্যদৃষ্টিই স্বয়ং সমুন্মীলিত হইয়া থাকে। এই আত্মার সহিত সাক্ষাৎকার ঘটিলেই নিখিল জগৎ দৃষ্টিগোচর হয়। ইহাঁর তত্ত্ব শ্রবণ করিলে কোন শ্রোতব্যই আর অবশিষ্ট থাকে না; ইহাঁকে স্পর্শ করিলে সমগ্র জগৎ স্পর্শ করা হয় এবং ইনি আছেন, তাই জগতের সত্তা বিদ্যমান আছে। ইনি সুপ্ত-দিগের সম্বন্ধে জাগ্রত থাকেন, অবিবেকীদিগকে প্রহার করেন, আর্ত্ত-জনগণের আপদ্ অপনয়ন করেন এবং পরিচ্ছিন্নাত্মক ঈশ্বরের যাহারা উপাসক, তাহাদিগকে ইনি অভীষ্ট ফলদান করিয়া থাকেন। এই আত্মাই জীব হইয়া জগতের স্থিতির নিমিত্ত সর্ব্বলোকে বিচরণ করেন, ভোগসমূহে বিলসিত হন এবং নিখিল পদার্থপুঞ্জে পরিস্ফুরিত হইতেছেন। ইনি প্রশান্ত আত্মা দ্বারা আপনি আপনাকে অনুভব করেন। যেমন সমস্ত মরীচেই একই প্রকার তীক্ষ্ণতা আছে, তেমনি ইনি সর্ব্বদেহেই সমভাবে অবস্থান করিতেছেন। ইনি চেতনা ও কল্পনাস্বরূপ; বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ যে কিছু চেতনোপাধিস্থিত জাগতিক পদার্থ আছে, তৎসমস্তেরই ইনি সামান্যতঃ অধিষ্ঠানস্বরূপেই অবস্থিত। এই আত্মাই আকাশে শূন্যত্ব, পবনে স্পন্দ, তেজে প্রকাশ, জলে রস, ভূমিতে কাঠিন্য, অনলে উষ্ণতা, নিশাকরে

শৈত্য, এবং জগৎসমূহে সত্তাস্বরূপে বিরাজমান; যেমন মসীপিণ্ডে কৃষ্ণতা, হিমকণায় শীতলতা এবং পুষ্পপুঞ্জে সৌগন্ধ্য বিদ্যমান, তেমনি দেহপতি আত্মাও দেহমধ্যে বিরাজমান। সত্তা যেমন সর্ব্বপদার্থেই বিরাজিত,কাল যেমন সর্ব্বত্র গতিশীল এবং সার্ব্বভৌমিক রাজার যেমন সর্ব্বদেশগামিনী প্রভুতা, তেমনি যথায় চক্ষুরাদি-ব্যাপার ও মানস-ব্যাপার বিরাজমান, সেই স্থানেই এই আত্মার সত্তা প্রকাশমান। এই নিত্য আত্মা উল্লিখিত গুণে গুণবান্; ইনি দেবগণেরও জ্ঞানপ্রদ মহাদেব। আমিই এই আত্মা, আমার কোন অপর কল্পনা নাই। আকাশে যেমন অণুমাত্র রেণু থাকিতে পারে না, পদ্মপত্রে যেমন জলাবস্থান অসম্ভব এবং পাষাণে যেমন ভয় কিম্বা ভয়-জনিত কম্পাদি সম্ভ্রম নাই, এই আমাতেও তেমনি উল্লিখিত আত্মা ব্যতিরিক্ত অন্য কিছুরই সম্বন্ধ ঘটনা নাই। এই আমার এবম্বিধ দেহ; ইহাতে সুখ কিম্বা দুঃখ আসিয়া উপস্থিত হয়—হউক, অথবা নাই উপস্থিত হউক, তাহাতে আমার ক্ষতি-বৃদ্ধি কিছুই নাই। বস্তুতঃ অলাবুর উপর জলধারা পড়িলে অলাবুর কোনও বিকার হয় কি? অপিচ দীপাধার হইতে দূরগত দীপালোক কি কখন বান্ধিয়া রাখা যায়? ফল কথা, এই কার্য্য যেমন অসম্ভব, তেমনি আমিও সর্ব্বভাবের অতীত;—আমাকেও কেহই বন্ধন করিয়া রাখিতে সক্ষম নহে। কি কাম, কি ভাবাভাব, কি ইন্দ্রিয়বর্গ, ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ কি? কে পারে আকাশ বাঁধিতে? এবং কেই বা মনকে অভিহত করিতে পারে? দেহ শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়, যাউক, দেহীর তাহাতে ক্ষতি কি আছে? কুম্ভ ভগ্ন হউক, ক্ষত হউক, বা নষ্ট হউক, তাহাতে কুম্ভাকাশের কোন ক্ষতি হয় কি? মন পিশাচের ন্যায় অদৃশ্য হইয়া বৃথাই সমুদিত হয় হউক। যদি তত্ত্বজ্ঞানের প্রভাবে এই জড় মন ক্ষয় পাইয়া যায়, তাহাতেই বা আমার ক্ষতির সম্ভাবনা কি? যাহার সুখ-দুঃখময়ী বাসনা বিদ্যমান, আমার মতে তাহারই নাম মন। এই মন পূর্ব্বে আমার ছিল; কিন্তু এক্ষণে আর উহার অস্তিত্ব নাই। কেন না, একমাত্র পরমানন্দই অধুনা আমার বিরাজমান। আমি অপরিচ্ছিন্ন সুখে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইয়াছি। অহো, কি বিষম মূর্খতা! একজনে ভোগ করে, অন্যে গ্রহণ করে,অপর তৃতীয় ব্যক্তির অনর্থ সঙ্কট উপস্থিত হয়, আর অন্য একজন তাহা দেখিতে থাকে!

এ কাহার চক্রান্ত? কোন্ ঐন্দ্রজালিকের এই চক্রবৎ পরিবর্ত্তন-চাতুরী? প্রকৃতি ভোগ করে, মন গ্রহণ করে, দেহের সঙ্কট-সঙ্ঘটন হয়, আর প্রকৃতি প্রভৃতি দ্বারা তুষ্ট আত্মা তাহা দর্শন করে। এইরূপ অপূর্ব্ব বিচার মূর্খতারই ফল; পরন্তু যদি প্রকৃত তত্ত্ব বিচার করিয়া কেবল একই অবধারিত হয়, তাহা হইলে আর কোনই ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না। আমার ভোগে বাঞ্ছা নাই, ভোগ-ত্যাগেও আমি অভিলাষী নহি, সুখ কিম্বা দুঃখ যাহাই উপস্থিত হয়—হউক, আর যাহা যাইতে হয়,—যাউক, আমি সুখের জন্যও লালায়িত নহি এবং দুঃখের প্রতিও উপেক্ষা প্রদর্শনে ইচ্ছা করি না। দেহ থাকিলেই বিবিধ বাসনার অস্তোদয় ঘটিয়া থাকে; যাহা ঘটে, ঘটুক;—আমি তাহাতে লিপ্ত হইতেছি না। আমি বাসনা-সমূহে নাই; বাসনারাশিও আমার কেহই নহে। অজ্ঞান আমার রিপু; এতকাল সেই রিপু আসিয়া আমায় প্রহার করিয়াছে; আমার বিবেক-সর্ব্বস্ব হরিয়া লইয়া একান্তই নষ্ট করিয়াছে। অধুনা আমি স্বয়ং-সমুৎপন্ন বিষ্ণুর প্রসাদ-মহিমায় মদীয় বিবেক-সর্ব্বস্ব সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছি এবং বুঝিয়া তাহাকে প্রত্যাহৃত করিয়াছি। আমার দেহরূপ তরুকোটরে এত কাল যে অহঙ্কারপিশাচ বাস করিতেছিল, তত্ত্বজ্ঞানরূপ মন্ত্রের প্রভাবে এক্ষণে তাহাকে আমি তথা হইতে অপসারিত করিয়া দিয়াছি। আমার দেহ-মহীরুহে এখন আর অহঙ্কার-পিশাচ বাস করে না; এখান হইতে সে চলিয়া গিয়াছে, তাই এই আমার দেহতরু সম্প্রতি অতি পবিত্র ও সুশোভন হইয়াছে। আমার দুরাশাদোষ ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে; সুতরাং এখন আমার মোহ-দারিদ্র্য ঘুচিয়াছে। বিবেকরূপ ধনরাশি আমার হস্তগত হইয়াছে; তাই আমি এক্ষণে পরমেশ্বর-পদে অবস্থান করিতেছি। কোন জ্ঞাতব্য বিষয়ই আমার অবিদিত নাই, সমস্তই আমি জ্ঞাত হইয়াছি। যে কিছু দ্রষ্টব্য বিষয়, তৎসমস্তই আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। অধুনা আমি এমন বস্তু পাইয়াছি, যাহা পাইলে অপর কিছুই অপ্রাপ্ত থাকে না। যাহাতে কোন অনর্থ বা সঙ্কট সম্ভাবনা নাই, যেখান হইতে বিষয়-বিষধর অপসৃত হইয়াছে, যথায় মোহনীহার বিগলিত হইয়া যায়, যেখানে আশারূপিণী মৃগতৃষ্ণার অবসান ঘটে, যথায় সর্ব্বদিক্ রজোরহিত হয় ও শীতল ছায়াময় শম-পাদপ বিরাজ করে, আমি অদ্য ভাগ্যগুণে সেই সমুন্নত

সুবিস্তৃত পরমার্থ-ভূমি প্রাপ্ত হইয়াছি। আমি স্তব করিয়াছি, প্রণাম করিয়াছি, প্রার্থনা জানাইয়াছি, শমগুণ আশ্রয় করিয়াছি, নিয়ম-পালনে নিরত রহিয়াছি, এই সকল সাধনার গুণেই অদ্য আমি ভগবান্ আত্মাকে লাভ করিয়াছি, দেখিয়াছি এবং সম্যক্ সম্পরিজ্ঞাত হইয়াছি। বিষ্ণুর প্রসন্নতা লাভ করিয়াছি; তাঁহারই ফলে বহুদিনের পর সেই 'অহং' পদাতীত ভগবান্ সনাতন ব্রহ্ম আমার স্মৃতিপথে সমাগত হইয়াছেন। অহংকারই আমার বিষম শত্রু ছিল। সে, এতদিন আমায় বাসনাবনে পাতিত করিয়াছে, কখন উৎপাতিত করিয়াছে, কখন মগ্ন করিয়াছে, কখন উন্মগ্ন করিয়াছে; কখন আমার আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটাইয়াছে, এবং প্রায়শই আশা-পাশে আমায় বাঁধিয়া রাখিয়া আমার উপর অকথ্য উৎপীড়ন ও অত্যাচার করিয়াছে। যে বাসনা-বনে আমি ঐ অহঙ্কার কর্ত্তৃক নিগৃহীত হইয়াছি, সে বন—অতি ভীষণ, অতীব সঙ্কট-সঙ্কুল। তথায় ইন্দ্রিয়গণ ভয়ঙ্কর ভুজঙ্গ-গর্ত্তবৎ বিরাজমান, মৃত্যু তথাকার কোটরভূমি, তৃষ্ণা সে বনের করঞ্জকুঞ্জ, কাম সেখানকার হিংস্র জন্তুগণের কোলাহল, জন্ম সেথায় কূপশ্রেণী, দুঃখ তথাকার দাবাগ্নি দাহ, এবং প্রাণ ও ধনাপহারী দুঃখ-তস্কর তথায় সতত চৌর্য্য-কার্য্যে তৎপর। নিশার অন্ধকারে পিশাচ যেমন দুর্ব্বল-প্রাণ ব্যক্তিকে উদ্বেজিত ও ভীত করিয়া তুলে, আমার বিষম রিপু অহঙ্কার আমায় তেমনি বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। অধুনা আমি নিজের ক্রিয়া শক্তিবলে প্রসাদ সুমুখ ভগবান্ বিষ্ণুর মাহাত্ম্য-ব্যপদেশে নিজ হইতেই বিবেকশ্রী উদ্ভাসিত করিয়া লইয়াছি। যেমন নভোদীপ জ্বালিয়া দিলে অন্ধকার আর দেখিতে পাওয়া যায় না, তেমনি আমার বিবেকশ্রী দ্বারা পরমেশ স্বীয় আত্মা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন বলিয়া আর সেই অহঙ্কার নিশাচরকে দেখিতে পাই না; সে এখন নষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমিই স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াছি, মদীয় আত্মা বিবেকবলে প্রবুদ্ধ ও প্রসন্ন হইয়াছেন, এখন আমার সেই মানস গুহাবাসী অহঙ্কার যক্ষ প্রশান্ত প্রদীপের ন্যায় কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না। হে ঈশ! তোমার দর্শন লাভ ঘটিয়াছে, তাই রবির উদয়ে তস্করের ন্যায় আমার অহঙ্কার এখন পলায়মান হইয়াছে। সর্প বৃক্ষকে বেষ্টন করিয়া থাকে;

সেই সর্প বৃক্ষ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে বৃক্ষ যেমন স্বাস্থ্য-সম্পন্ন বা নিরুপদ্রব হয়, তেমনি এতদিন ধরিয়া যে অহঙ্কার-পিশাচ আমারই অজ্ঞান হইতে জন্মিয়া আমাকেই বেষ্টনপূর্ব্বক কষ্ট দিতেছিল, সে এখন চলিয়া গিয়াছে। তাহার অনুপস্থিতিতে আমি যথেষ্ট স্বাস্থ্য শান্তি-লাভ করিয়া সুখে অবস্থান করিতেছি, আমি শান্তি লাভ করিয়াছি, নির্ব্বাণপদে উপনীত হইয়াছি, এ জগতে আমি প্রবোধবান্ হইয়া রহিয়াছি। এতদিনে চোরের উপদ্রব হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম সুতরাং ; চিরদিনের তরে আমি পরম নির্ব্বৃত হইয়াই রহিলাম। অন্তরে আমি শীতলতা লাভ করিয়াছি ; আমার আশা-মরীচিকা শান্ত হইয়া গিয়াছে। আমি অধুনা প্রাবৃট্‌পয়োধরের ধারা-পরিস্নাত শান্তদাবাগ্নি ধরাধরের ন্যায় সুস্থভাবে অবস্থান করিতেছি। যখন তত্ত্ব বিচারবলে 'অহং' পদ মার্জ্জিত হইয়া যায়, তখন মোহই বা কি ? দুঃখই বা কি ? কদাশাই বা কি ? আর মনস্তাপ বা মনোব্যথাই বা কি ? ফলে তখন এ সকলের কেহই কিছু নহে। যতক্ষণ অহঙ্কার আছে, স্বর্গ, নরক ও মোক্ষ প্রভৃতি ভ্রমসমূহের বিলাস ততক্ষণই বর্ত্তমান। চিত্র-রচনার আধারেই চিত্রাঙ্কনের চেষ্টা হয় ; পরন্তু শূন্যে যেমন তাহা সম্ভবে না, এবং ম্লান বসনে যেমন কুঙ্কুমরাগ সুস্ফুট হইয়া উঠে না, তেমনি 'অহং' ভাবরূপ পিত্তদোষের অস্তিত্ব থাকিতে চিত্তে কদাচ তত্ত্বজ্ঞান-চমৎকারিত্ব প্রকট হইবে না। চিত্তরূপ শরদাকাশ হইতে যদি 'অহং'মেঘ তিরোহিত হইয়া যায় এবং তৃষ্ণারূপ বারিধারা যদি একেবারেই রহিত হয়, তাহা হইলেই ঐ চিত্তাকাশে আত্মরূপ সুধাকরের সম্যক্ প্রকাশ-জনিত সমুজ্জ্বল স্বচ্ছ শোভা সমুদিত হইয়া থাকে। হে ভগবন্ আত্মন্! যাহাতে অহঙ্কার-পঙ্ক নাই, অন্তর স্বচ্ছতায় পরিপূর্ণ রহিয়াছে, আমিই তাদৃশ আনন্দ-সরোবর ; এই আমিই—তুমি, তোমায় আমার নমস্কার। ইন্দ্রিয়রূপ ভয়ঙ্কর জলজন্তুগণের উপদ্রব যাহাতে নাই, এবং চিত্তরূপ বাড়বানলের প্রকোপ যেখানে অন্তর্হিত হইয়াছে, তুমিই সেই আনন্দ-সাগর ; যে তুমি—সেই আমি ; অতএব হে আত্মন্! আমাকেই আমার নমস্কার। যাহা হইতে অহঙ্কার-মেঘ তিরোহিত হইয়াছে এবং দিক্‌দাবানল প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, তথাবিধ সুনিশ্চল আনন্দশৈল আমি,—আমাকেই আমি নমস্কার

করি। হে আত্মন্! যাহার আনন্দপঙ্কজ প্রফুল্ল হইয়াছে, এবং চিন্তাময়ী ঊর্ম্মিমালা প্রশান্ত হইয়া গিয়াছে, আমিই সেই মানস-সরোবর; সেই আমিই —তুমি, তোমাকে আমার অন্তরের সহিত বারম্বার নমস্কার। বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তি-বিম্বিত চৈতন্য যাহার দুইটী পক্ষ এবং হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে যাহার বাস, আমি সেই সমগ্র জীবের মানস-হংসরূপী স্বীয় আত্মাকে বারম্বার নমস্কার করি। হে পূর্ণস্বরূপ! তুমি কলাকলিত রূপ ধারণ কর, অথচ তুমি নিষ্কল-স্বরূপ, —তুমি অমৃতাত্মা,—তুমি সদা-সমুদিত শশ-ধর, তোমায় আমার বহুবার নমস্কার। যিনি সদা সমুদিত; সদা—প্রশান্ত, ও হৃদয়ের মহামোহ-তিমির-হর, সেই সর্ব্বগত অথচ অদৃশ্য চিদাদিত্যকে আমার অশেষবার নমস্কার। যাহা অস্নেহ হইয়াও প্রগাঢ় স্নেহপ্রকাশক, যাহার কোনই ব্যাপার নাই, যাহা স্বভাবের আধার ও ধীরস্বভাব, আমি সেই চিৎপ্রদীপকে বারম্বার নমস্কার করি। যেমন অনল-তপ্ত লৌহদ্বারা লৌহাগ্র ভাঙ্গিয়া ফেলা যায়, তেমনি আমি শমদমাদিগুণ-সম্পন্ন মনের সাহায্যে মদীয় কামাগ্নি-তপ্ত মনকে আমি ভগ্ন করিয়া ফেলিয়াছি। আমি ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় ইন্দ্রিয়কে দমন করিয়া,—মনের সাহায্যে মনের উচ্ছেদ সাধন করিয়া,—অহঙ্কার দ্বারা অহঙ্কারকে উন্মূলিত করিয়া,—অবশিষ্ট চিন্মাত্র আমি,—আমিই এক্ষণে সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করিতেছি। বিশদ কথা এই যে, আমি অন্তর্মুখ চক্ষুরাদি করণ দ্বারা বহির্ম্মুখ করণকে দমিত করিয়াছি, অন্তর্মুখী চিত্তবৃত্তি দ্বারা বহির্মুখী চিত্তবৃত্তিকে বিনষ্ট করিয়াছি এবং প্রত্যগাত্মরূপ অহঙ্কার দ্বারা দেহাদিবৃত্তি অহম্ভাবকে উন্মূলিত করিয়াছি; এই সকল করিয়া এক্ষণে থাকিবার মধ্যে আমি চিন্মাত্রই অবশিষ্ট রহিয়াছি। হে আত্মন্! তুমি শ্রদ্ধার সাহায্যে অশ্র-দ্ধাকে অপনীত করিয়া,—বিচারবতী বুদ্ধিযোগে অবিচারবুদ্ধিকে নিষ্পেষিত করিয়া এবং অতৃষ্ণা বা তৃষ্ণার অভাব দ্বারা তৃষ্ণাকে বিসর্জ্জন দিয়া,—যাহাতে জ্ঞাতৃত্ব-অভিমান নাই এবং যাহা জ্ঞপ্তিমাত্র-স্বভাব, সেই সত্যস্বরূপে প্রতিভাত হইতেছ, এ হেন সত্য বস্তু তুমি,—তোমাকে আমার পুনঃপুন নমস্কার। আমার মন দ্বারা মন ছিন্ন হইয়াছে, অহঙ্কার অপসৃত হই-য়াছে, এবং 'আমিই ব্রহ্ম' এই ভাবনায় 'এই দেহাদিই আমি' এরূপ ধারণা

চলিয়া গিয়াছে ; সুতরাং আমি এখন স্বচ্ছ, শুদ্ধ ও কেবলীভাবেই অবস্থান করিতেছি। আমার এই দেহ এখন কি হইয়াছে? ইহাতে ভাবনার হেতু বুদ্ধি বিরাজ করে না, ইহাতে অহঙ্কারের লেশ মাত্র নাই, এবং ইচ্ছা নাই বা মনও নাই। ইহা এখন কেবলস্বরূপ হইয়াছে,—হইয়া স্পন্দময় শুদ্ধ আত্মায় অবস্থান করিতেছে। যাঁহারা অবলীলাক্রমে স্বকীয় শত শত ভক্তবৃন্দকে অচিরাৎ ভোগৈশ্বর্য্য প্রদানে অনুগৃহীত করিতে পারেন, অদ্য আমার এমন দিন উপস্থিত,—আমি এখন সেই ব্রহ্ম-বিষ্ণু-প্রভৃতি জগদধিপতিগণ অপেক্ষাও সমধিক শান্তিময়ী পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়াছি। মদীয় মোহ-বেতাল শান্ত হইয়া গিয়াছে, অহঙ্কার-নিশাচর পলায়ন করিয়াছে, দুরাশারূপিণী পিশাচীর কবল হইতে আমি মুক্তি পাইয়াছি। আমার সমস্ত মনস্তাপ অপগত হইয়াছে, আমি বিগতজ্বর হইয়াছি। আমার দেহপঞ্জর হইতে দুরহঙ্কৃতিরূপিণী পক্ষিণী তৃষ্ণারূপ রজ্জুবন্ধন ছেদন করিয়া,—জানি না কোথায়,—কোন্ অজ্ঞাত দেশে উড়িয়া গিয়াছে! আমার ঘোর অজ্ঞানরূপ কুলায় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে ; কাজেই এখন আমার অহম্ভাবরূপ বিহঙ্গম,—জানি না এই দেহদ্রুম হইতে উড়িয়া গিয়া কোথায় বিশ্রাম করিতেছে! আমার রাশি রাশি বাসনা,—দুরাশা ও দেহাদিতে আত্মাভিমানে মলিনতা প্রাপ্ত হইয়া ভয়রূপ ভুজঙ্গাবলীর ইষ্টতম আবাসস্থল হইয়াছিল ; অধুনা আমার সৌভাগ্যক্রমে উহারা ভোগ-ভস্মকারী সমাধিসাধনায় উন্মূলিত হইয়াছে! অহো, কি বিচিত্র ব্যাপার! এতকাল আমি কি হইয়া ছিলাম যে, এই আমাকে অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা গাঢ় অহঙ্কারের আশ্রয় লইতে হইয়াছিল? আজ আমি সত্য সত্যই জন্মিলাম এবং অদ্য আমি প্রকৃতই মহাবুদ্ধিশালী হইলাম ; কেন না, এখন আমি অহম্ভাবরূপ ঘনকৃষ্ণ মহামেঘ হইতে সম্পূর্ণই মুক্ত হইতে পারিলাম। অদ্য এই ভগবান্ আত্মা আমার সাক্ষাৎকৃত হইয়াছেন ; শুধু সাক্ষাৎ নহে—তাঁহাকে আমি জানিতে পারিলাম,—প্রাপ্ত হইলাম,—অনুভব করিলাম ; বলা বাহুল্য আপন অঙ্গবিশেষের ন্যায় তাঁহাকে আমি স্বীয় অনুভূতিতে সতত নিযোজিত করিয়াছি। আমার মন অধুনা নির্ব্বিষয় ; ইহাতে মনন নাই, এষণা নাই ; ইহা অহম্ভাবরূপ ভ্রম হইতে সম্পূর্ণই

নির্ম্মুক্ত হইয়াছে; ইহাতে কোন চেষ্টা নাই, ভোগোৎকণ্ঠা নাই, বা বিষয়-রাগের রঞ্জনা নাই; সুতরাং আমার এই মন এখন প্রকৃতই পরম শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সকল আপদ বহুবার বহুযোনিতে বিবিধ জন্মপরম্পরা ও কাম, লোভ ও মোহাদির প্রদানকর্ত্তা, এবং যাহারা চিরকাল একই রূপ দুঃখময়, বিষম, দুঃসহ ও দুরুত্তর, তাদৃশ ভয়ঙ্কর আপদরাশি অদ্য ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে। অধুনা আমি চিদদ্বয় মহেশ্বরকে লাভ করিয়াছি; অতএব অন্তরের সমুদায় অজ্ঞান-জড়তা আমার সম্পূর্ণই তিরোহিত হইয়াছে।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৩৫ ॥

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ।

প্রহ্লাদ কহিলেন,—অদ্য বহুকালের পর মানবানন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া হৈরণ্যগর্ভ আনন্দ পর্য্যন্ত নিখিল পদের অতীত,—নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ আত্মা আমার স্মৃতিপথে সমাগত হইয়াছেন। হে ভগবন্! এক্ষণে আমার ভাগ্যগুণেই আপনি লব্ধ হইয়াছেন। আপনি মহাত্মা, আপনাকে আমি নমস্কার করি। আমি আপনাকে দেখিয়া,—অভিনন্দন করিয়া চিরকালের তরে আলিঙ্গন করিতেছি। হে প্রভো! আপনি ব্যতীত এই ত্রিভুবনে কে আর অপর বন্ধু আছে? যতকাল না আপনি প্রাপ্ত বা দৃষ্ট হন, ততদিন মৃত্যুরূপে অভক্তদিগকে সংহার করেন, রক্ষক হইয়া ভক্তবৃন্দকে পালন করেন, উপসনাক্রিয়ায় আরাধিত হইয়া অভীষ্ট বস্তু দান করেন, স্তাবকাদিরূপে স্তব করিয়া থাকেন, গমন-কর্ত্তৃরূপে গমন করেন এবং সর্ব্বরূপেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। এই অদ্য আপনাকে লাভ করিলাম,—আপনি আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। আপনি কি করিতেছেন? কোথায় চলিয়াছেন? হে বিভো! আপনি আপন সত্তায় সর্ব্ববিশ্ব ব্যাপিয়া আছেন। হে বিশ্বজনের হিতবিধায়ক! আপনি নিত্য বস্তু; এ বিশ্বসংসারের সর্ব্বত্রই আপনি লক্ষিত হইতেছেন;

এক্ষণে কোথায় পলায়ন করিতেছেন? পূর্ব্বে আপনাতে আমাতে জন্মানুসারে ব্যবধান-কর প্রভূত অজ্ঞান ছিল, অধুনা সে অজ্ঞান নাই; এক্ষণে আপনি আমার যথেষ্ট সন্নিহিত হইয়াছেন। হে বান্ধব! অদৃষ্ট-ক্রমে অদ্য আপনাকে দেখিতে পাইয়াছি। আপনি স্বয়ং কৃতকৃত্য; আপনাকে আমার নমস্কার। আপনি সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্বভর্ত্তা, আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি সংসারতরু-পর্ণের বৃন্তস্বরূপ। আপনি নিত্যোদিত নির্ম্মলাত্মা; আপনাকে আমার নমস্কার। আপনি শঙ্খ ও চক্রধারী; আপনাকে নমস্কার করি। আপনি চন্দ্রার্দ্ধমৌলি, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি বিবুধগণের নাথ; আপনাকে নমস্কার। আপনি পদ্মজন্মা ব্রহ্মা; আপনাকে নমস্কার। বাচ্য-বাচক বা ব্যবহার-দৃষ্টিতে আপনাতে আমাতে যে ভেদ কল্পনা, তাহা জল ও জলতরঙ্গের ভেদ-কল্পনার ন্যায় অসত্য; বস্তুতঃ পারমার্থিক ভেদ কিছুই নাই। আপনি অনন্ত, অনন্ত বস্তুবৈচিত্র্যরূপে প্রতিভাত এবং ভাব ও অভাবাকারে বিলসিত হইয়া অনন্ত কল্পনাপ্রবাহে অনাদিকাল হইতে বিজৃম্ভিত হইতেছেন। আপনি দ্রষ্টা, আপনি স্রষ্টা এবং আপনিই অনন্তাকারে বিকাশমান; আপনাকে আমি নমস্কার করি। আপনি সর্ব্বস্বভাব, সর্ব্বাধিষ্ঠান, সর্ব্বগামী আত্মা; আপনাকে আমি নমস্কার করি। এতকাল তুমি মন্ত্রাবাপন্ন বা জীবভূত হইয়া স্বীয় কামাদি-দোষের অনুসরণে মৎকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া অসৎপথে প্রবৃত্ত ও দগ্ধ হইয়াছ, তাই তোমার ঈশ্বরভাব তিরোহিত হইয়াছিল, তুমি বহু জন্মে বহু দুঃখ ভোগ করিয়া কত শত ঊর্দ্ধ অধঃ ও মধ্য-লোকগত বিহার-বিভ্রম ও সেই সেই লোকে কত কি বিবেকানুকূল দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়াছ। এই বহির্লোক-দর্শন-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিলে বলিয়াই তুমি তোমাকে প্রাপ্ত হও নাই, অর্থাৎ আমি তোমায় প্রাপ্ত হইতে পারি নাই এবং এই ত্রিলোক দর্শনের ফলে স্বল্প-মাত্র পুরুষার্থ-লাভও আমার ঘটে নাই। হে দেব! এই মৃৎ, কাষ্ঠ, পাষাণ ও জলময় জগতের কোন কিছুই তুমি ব্যতীত নাই। তোমাকে পাইলে আর কোন প্রাপ্য বস্তুরই আকাঙ্ক্ষা থাকে না। হে দেব! অদ্য তোমায় প্রাপ্ত হইয়াছি, দর্শন করিয়াছি, তোমার প্রকৃত তত্ত্ব বিদিত হইয়াছি, তুমি মৎকর্ত্তৃক

সম্প্রাপ্ত ও গৃহীত হইয়াছ এবং মোহ হইতে সমুত্তীর্ণ হইয়াছ। অধুনা এই আমার নমস্কার গ্রহণ কর। হে দেব! আমি তোমায় কেনই বা না দেখিতে পাইব? ফলে যিনি দর্শনাকারে নয়নযুগলের কনীনিকার রশ্মিজালে গ্রথিত-কলেবরে বিরাজ করিতেছেন; তিনি কি কখন কোনরূপে অদৃশ্যহইতেপারেন? তিলমধ্যস্থ তৈল যেমন তিলাক্ত পুষ্পগন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, তেমনি যিনি ত্বক্ ও উষ্ণতাদি স্পর্শেক স্পর্শন-ব্যাপারে ব্যাপিয়া রহিয়া অন্তরে সেই স্পর্শকে প্রকাশ করিতে থাকেন, তিনি কেনই বা না অনুভবগম্য হইবেন? যিনি শব্দশ্রবণের পরক্ষণেই অন্তঃকরণে শব্দের শক্তি প্রকাশিত করিয়া শ্রোতার অঙ্গে রোমাঞ্চ উদ্ভাবন করেন, কেমনে বলিব—তাদৃশ জন দূরস্থ হইবেন? মধুরাম্লাদি রস সকল জিহ্বাগ্রে সংলগ্ন হইবামাত্র অগ্রেই যাঁহার আস্বাদ-গোচর হয়, তিনি কাহার না সুখাস্বাদরূপে স্ফুরিত হইয়া থাকেন? যিনি ঘ্রাণরূপ করের সাহায্যে কুসুমমাল্যের গন্ধ গ্রহণ করিয়া প্রীতিভরে কণ্ঠধৃত মাল্য-মণ্ডিত স্বীয় দেহ সন্দর্শন করেন, তিনি কাহার না করস্থিতবৎ স্পষ্টতঃ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন? বেদ, বেদান্ত,মীমাংসা,তর্কশাস্ত্র ও পুরাণগাথা প্রভৃ-তিতে একমাত্র যিনিই গীত হইয়া থাকেন, সেই আত্মা একবার বিদিত হইলে আর কি কোনরূপে বিস্মৃতির পথে উপনীত হইতে পারেন? এই দেহসম্বন্ধীয় ভোগরাশি অগ্রে আমার নিকট সুভগ বলিয়া বোধ হইত বটে; কিন্তু হে দেব! অদ্য পরাবর স্বচ্ছ সুপুরুষ তোমার সাক্ষাৎ পাইয়াছি বলিয়া আর আমার নিকট সেই পূর্ব্বপ্রিয় ভোগরাশি প্রীতিকর হইতেছে না। তুমি বিমল দীপস্বরূপ; তোমা দ্বারা ভানুদেব প্রকাশমান। তুমিই সুশীতল তুষাররূপে চন্দ্রকে শীতল করিয়াছ, এই শৈল-সকলকে তুমিই গুরু করিয়া তুলিয়াছ, তুমিই এই নভশ্চর পবন প্রভৃতিকে ধরিয়া রহিয়াছ, তোমারই প্রভাবে এই ধরা ধীরপ্রকৃতি হইয়াছে এবং তোমারই মহিমায় এই আকাশ আকাশ হইয়া রহিয়াছে। হে দেব! অদ্য ভাগ্যবশতঃ আমি 'তুমি' হইয়াছি এবং তুমি 'আমি' হইয়াছ।অর্থাৎ আমি ত্বদ্ভাবাপন্ন হইয়াছি এবং তুমি মদ্ভাবাপন্ন হইয়াছ। এখন তোমাতে আমাতে প্রভেদ কিছুই নাই। তুমি মহাত্মা; 'তুমি' 'আমি'এই দুই শব্দ তোমারই পর্য্যায়মাত্র।'আমি' 'তুমি' এই দুইটী কার্য্যো-পাধিক আমার এবং কারণোপাধিক তোমার একাংশভূত সামানাধিকরণ্যে

সম্পন্ন উপাধিদ্বয়; এক্ষণে আমি এই 'আমি' ও 'তুমি' এই শব্দদ্বয়কে নমস্কার করিতেছি। আমি অনন্ত, আমি নিরহঙ্কারস্বরূপ; আমাকে আমি নমস্কার করি। আমি রূপ-বিরহিত ও নিতান্ত সমস্বরূপ, আমাকে আমি বারম্বার নমস্কার করিতেছি; আমি আত্মা,—সম, স্বচ্ছ, সাক্ষিভূত ও নিরাকার; দিক ও কালাদিরূপে আমার পরিচ্ছেদ নাই; এ হেন আমা-স্বরূপ আত্মাতেই তুমি অবস্থান করিতেছ। হে প্রভো! তোমারই কর্তৃত্বে মন ক্ষোভ প্রাপ্ত হয়, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বৃত্তিগুলি স্ফুরিত হইতে থাকে, প্রাণাপানবাহিনী সুবিশাল শক্তি সমুল্লসিত হয় এবং আশাপাশে আকৃষ্ট হইয়া এই চর্ম্ম, মাংস ও অস্থিময় দেহযন্ত্রগুলি মনোরূপ সারথির প্রেরণায় পরিচালিত হয়; পরন্তু ইহাদের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ ঘটনা নাই। এই আমি চিন্ময়-কায়; আমি কোন শক্তি নহি। এ দেহও আমার আস্পদ নহে। যদি বল, তবে তোমার দেহে প্রয়োজন কি? আমার বক্তব্য,—দেহে আমার কিছুই প্রয়োজন নাই। এ দেহ স্বেচ্ছায় পতিত হইতে হয়,—হউক আর উত্থিত হইতে হয়,—হউক, আমি তাহাতে কোনই ক্ষতি বৃদ্ধি বোধ করি না। অদ্য বহু দিনের পর আমি 'আমি' হইলাম। বহু কালের পর আমার আত্মলাভ সংঘটিত হইল। কল্পান্তকালে জগৎ যেমন লয় পাইয়া যায়, অদ্য বহু কালের পর তেমনি আমার ভ্রম উপশম প্রাপ্ত হইল। আমি বহুদিন ধরিয়া সংসারপথে পরিভ্রমণ করিয়াছিলাম, ঘুরিয়া ঘুরিয়া,—দীর্ঘ পথ পর্য্যটনে আমার অতীব শ্রান্তি বোধ হইয়াছিল। এখন আর আমার সে শ্রান্তি নাই, আমি কল্পশেষের হুতাশনের ন্যায় সম্প্রতি বিশ্রাম লাভ করিলাম। আমি সর্ব্বাতীত, সর্ব্বস্বরূপ; এই আমাস্বরূপ তুমি, তোমাকে আমি নমস্কার করি। যাঁহারা তোমাকে মৎস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমি সেই প্রাজ্ঞ পুরুষদিগকেও নমস্কার করি। সম্মুখে অখিল অপার সম্ভোগসমূহ প্রকাশ্য রহিলেও প্রকাশ্য দোষবৃত্তির স্পর্শ যাহাতে নাই, পরমাত্মার সেই নিরভিনিবেশ বা উদাসীন সাক্ষিরূপতাই জয়যুক্ত হউক। হে আত্মন্! পুষ্পে যেমন গন্ধ, ভস্ত্রায় যেমন পবন এবং তিলে যেমন তৈল, তুমি তেমনি সকল দেহে বিরাজমান। তুমি

নিরহঙ্কার ও নীরূপ; তথাপি তুমি সর্ব্বকর্ত্তা। তুমি হিংসা করিতেছ, পালন করিতেছ, প্রদান করিতেছ, স্পর্দ্ধিত হইতেছ ও বর্দ্ধিত হইতেছ। অহো! তোমার এ মায়া বড়ই বিচিত্র! হে প্রভো! সৃষ্টিকালে চিদাত্মা তুমি,—তোমারই সহায়তাগুণে আমি অন্তরে বাহিরে পদার্থ-প্রকাশনে উদ্দীপ্ত ও জীবভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া এই নামরূপাত্মক নিখিল জগৎ উন্মীলিত করত ত্বৎস্বরূপেই জয়ী হই, অর্থাৎ এ জগৎ বশীভূত করিয়া পালন করি; আবার যখন প্রলয় সূচনা হয়, তখন আমি নিখিল ব্যাপারের উপরমে পুনরপি এ জগৎ উপসংহৃত করিয়া তোমারই-স্বরূপে জয়যুক্ত হইয়া থাকি। ক্ষুদ্রায়তন বটবীজের অভ্যন্তরে যেমন বৃহৎ বটতরুর অস্তিত্ব আছে, তেমনি পরমাণুরূপী তুমি,—তোমার অন্তরেই সংসারমণ্ডল ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান,—এই কালত্রয়ে নিত্য বিদ্যমান। হে দেব! অম্বুদ যেমন হয়, হস্তী ও রথাকারে লক্ষিত হয়, তুমিও তেমনি ভ্রমকল্পিত শত শত পদার্থাকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাক। হে আত্মন্! তুমি বহুবিধ বিকারস্বভাব ভাবসমূহের অভাব ও নিরতিশয় আনন্দস্বরূপের আবির্ভাব নিমিত্ত অসঙ্গ আত্মদর্শনে সর্ব্ববিধ ভাবাভাব হইতে বহির্ভূত হইয়া তদ্ভাবেই সদা বিমুক্তাত্মা হও;—পুনরায় যেন আর বন্ধনদশায় পতিত হইতে না হয়। কে আমি? কি ছিলাম? বার বার এইরূপ বিচার করিয়া প্রাক্তনী দীর্ঘ মোহাচ্ছন্ন দশা স্মরণ কর,—করিয়া মুক্তাগুচ্ছবৎ বিমল হাস্যচ্ছটায় তুমি তোমার মান, মহাকোপ, কালুষ্য ও ক্রূরতাকে বিনাশ কর; দেখ, মহৎ ব্যক্তিরা কদাচ প্রাকৃত গুণ-সঙ্কটে নিমগ্ন হন না। পূর্ব্বে তুমি যে যে দিনে যে যে সকল কার্য্যের জন্য চিন্তানলের জ্বালামালায় আকীর্ণ হইয়া অহরহ সন্তাপ অনুভব করিতে, সেই সেই দগ্ধ দিন আর সেই সেই কার্য্য এখন আর তোমার নাই। আজ তুমি দেহরাজ্যের রাজা হইয়া বসিয়াছ, তোমার সর্ব্ব-মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে। আকাশ যেমন কাহারও কর-গ্রাহ্য হয় না, সম্প্রতি তুমিও তেমনি সুখ-দুঃখের গ্রহণীয় হইবার নহ। আজ তুমি কুমার্গগামী ইন্দ্রিয়াশ্বদিগকে ও মনোরূপ মাতঙ্গকে অভিভূত করিয়া,—ভোগরূপ রিপুকে দমিত করিয়া দেহসাম্রাজ্যের অধিকারিপদে অধিরোহণ করিয়াছ। তুমি অনবরত

উদরাস্তময়—অন্তরে বাহিরে সদাপ্রকাশ প্রভাকর-স্বরূপে ঐ অনন্ত অম্বরের পথিক। হে বিভো! সততই তুমি সংসুপ্ত; পরন্তু কামিনী যেমন সম্ভোগ-বাসনা চরিতার্থ করিবার জন্য সহ সুপ্ত কামুককে জাগরিত করিয়া লয়, তেমনি অদৃষ্ট শক্তিই তোমাকে ভোগলীলা-বিলাসের নিমিত্ত প্রবোধিত করিয়া থাকেন। চক্ষুরূপ গবাক্ষস্থ চিৎশক্তির সহায়তায় দৃষ্টিরূপিণী মধুমক্ষিকা দূর হইতে রূপমধু আনয়ন করে, তুমি সেই মধু পান করিয়া থাক। যোগীদিগের উৎক্রমণ কালে সুষুম্নাদি পথের যে প্রকাশ, তাহাও তোমারই অধীন। তুমিই প্রতিনিয়ত প্রাণ ও অপান বায়ুর গতাগতি নিবন্ধন ব্রহ্মপুরীর মধ্যস্থ ব্রহ্মাণ্ড-কোটরের পথ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাক। তুমিই শরীর-কুসুমের সৌরভ, দেহ-সুধাকরের সার-সুধা, দেহ-শাখার রস এবং দেহ-হিমের শীততা। হে দেব! সর্ব্বপ্রাণীর শরীর মধ্যে গর্ব্ব নিমিত্ত যে স্নেহরস রহিয়াছে, তাহা শরীর-ক্ষীরের সার-সর্পিঃস্বরূপ তোমারই রসরূপে প্রতিভাত হইতেছে। দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী অরণির তুমিই অগ্নিরূপে বিরাজমান। তুমিই অনুত্তম আস্বাদ, তুমিই তেজঃসমূহের প্রকাশক, তুমিই পদার্থ-পরম্পরার বোদ্ধা, তুমিই চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যনির্ব্বাহক, তুমিই সর্ব্ব বায়ুর স্পন্দ, তুমিই চিত্ত-মাতঙ্গের মদ, তুমিই বুদ্ধিরূপিণী বহ্নিশিখার বিকাশ এবং তুমিই উষ্ণতার নিদানস্বরূপ। তুমি উপসংহৃত করিয়া লও বলিয়া তোমার এই বাণী মরণে, মূর্চ্ছায় ও স্বপ্নে উপশান্ত হইয়া যায়, আবার তোমার সহায়তা পাইয়াই ঐ বাণী দেহান্তরে দীপবৎ পুনরায় সমুদিত হইয়া থাকে। কটক ও কেয়ূর প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার যেমন একমাত্র সুবর্ণ হইতেই সমুদ্ভুত হয়, এই সংসারস্থ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থপুঞ্জও তেমনি একাদ্বয় তোমা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে। সংসারের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক সমস্ত বস্তুই তোমাতে অবস্থিত। তুমি আপনা আপনিই লীলা কর; সেই লীলার জন্যই 'আপনি' 'ইনি' 'আমি' 'তুমি' ইত্যাদি নানা নামে নিজেই নিজেকে নির্দ্দেশ কর এবং স্তব করিয়া থাক। মন্দমারুত-বেগে পরিচালিত মেঘমালা যেমন গগনাঙ্গনে গজ, বাজী ও নরাদি নানাবিধরূপে পরিলক্ষিত হয়, তুমিও তেমনি অগণিত ভূতাকারে পরিদৃষ্ট হইতেছ।

বিস্তৃতভাবে বহ্নি প্রজ্বলিত হইতে থাকিলে, তাহার কোন কোন শিখা যেমন হয় ও হস্তীর আকারে স্ফুরিত হয়, এই সৃষ্টি-বিস্তার মধ্যে তুমিও তেমনি তোমা হইতে অভিন্ন অশেষরূপে প্রতিভাত হইতেছ। এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যেন অসংখ্য মুক্তাফল; তুমি এই ব্রহ্মাণ্ড-মুক্তাফলের অচ্ছিন্ন সূত্রবৎ সুবিস্তৃত রহিয়াছ। এই অগণিত ভূতবৃন্দরূপ শস্যশ্রেণীর তুমি চিৎ-রসায়ন-সেবিত ক্ষেত্র। মাংস আস্বাদ করিবার উপযুক্ত স্বাদুতা যেমন পাক দ্বারা প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি অনভিব্যক্ত অসৎপ্রায় পদার্থতত্ত্বও তোমা দ্বারাই প্রকাশমান হইতেছে। যাহার নেত্র নাই, তাহার নিকট যেমন কামিনীর রূপলাবণ্য-চ্ছটা থাকিলেও নাই বলিয়াই প্রতীত হয়, তেমনি তোমার অবিদ্যমানতায় এই সমস্ত বস্তুশ্রী থাকিলেও না থাকারই ন্যায় প্রতিপন্ন হয়। তুমি যদি অর্থক্রিয়াশক্তির সহায়তা বিতরণ করিয়া কোন বস্তুকে অনুগৃহীত না কর, তাহা হইলে সে বস্তু যদিও সৎ হয়, তথাপি সে অর্থক্রিয়া-সাধনে সমর্থ হয় না। বস্তুতঃ মুকুরে যে আপনার মুখলাবণ্য প্রতিবিম্বিত হয়, তাহা কি কখন চুম্বনাদি ক্রিয়ায় পরিতৃপ্তি জন্মাইতে পারে? তুমি ব্যতীত এই দেহ কাষ্ঠ-লোষ্টবৎ ভূলুণ্ঠিত হইতে থাকে। রবির উদয় বিনা মহীধরের উচ্ছ্রায় বিদ্যমান হইয়াও অন্ধকারবশে অবিদ্যমান বলিয়াই প্রতীত হয় না কি? দিনমণির আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ হইলে যেমন অন্ধকারের অস্তিত্ব থাকে না, দীপ হীনপ্রভ হয়, নক্ষত্রমালার শোভা কিছুই থাকে না ও হিমরাশি গলিয়া যায়, তেমনি যখন তোমাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তখন সুখ ও দুঃখের ক্রমও একেবারেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। যেমন প্রভাতে সৌরালোক-পাতে শুক্ল-কৃষ্ণাদি বর্ণ সকল স্পষ্টতঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি তোমার সাক্ষাৎ ঘটিলেই ঐ সকল সুখ-দুঃখাদি আবার স্থিতি প্রাপ্ত হয়। তোমার দর্শন ঘটনায় সুখ-দুঃখাদি আত্মলাভ করে, আবার তোমার সহিত সম্বন্ধ সঙ্ঘটন হইবার পরক্ষণেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তোমার দর্শনক্ষণে উহাদের আবির্ভাব; পরন্তু তোমার দর্শনানন্তর দীপদৃষ্ট অন্ধকাররাশির ন্যায় উহাদের একেবারেই তিরোভাব। যতক্ষণ দীপালোক না প্রকাশ পায়, ততক্ষণ অন্ধকারের অন্ধকারভাবই প্রস্ফুট হইয়া থাকে; পরন্তু যখন দীপদর্শন

ঘটে, তখন সে অন্ধকার যেমন উৎপন্ন হইয়াই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি এই সকল সুখ-দুঃখাদি—অনাময় তুমি, তোমার দর্শনমাত্রেই আবির্ভূত হয় এবং আবির্ভূত হইবামাত্রই সমূলে সমুচ্ছিন্ন হইয়া যায়। এক নিমেষের লক্ষাংশের একাংশ-পরিমিত অতীব সূক্ষ্ম কালকলা যেমন স্বতই বিনাশশীল হয়; তাহার সত্তা যেমন কাহারও লক্ষ্যীভূত হইতে পারে না, তেমনি এই সুখ-দুঃখাদি এতই ভঙ্গপ্রবণ যে, তুমি পরমানন্দময় স্বপ্রকাশ-স্বরূপ,—তোমাতে ইহারা অণুমাত্র কালও অবস্থান করিতে সক্ষম হয় না। এই সুখ-দুঃখাদির স্থিতিকাল অতি সূক্ষ্ম; তাই উহারা একান্তই অলক্ষ্য। এহেন সুখ-দুঃখাদি-ভাবনা গন্ধর্ব্বনগরীর ন্যায় অসত্য হইলেও তোমারই প্রসাদ-মহিমায় স্ফুরিত হয়; আবার তোমার যখন দর্শন পাওয়া যায়, তখনই উহা বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই সুখ-দুঃখাদি তোমার অবলোকনে ক্ষণমাত্রেই উৎপন্ন হয়, আবার তোমার অবলোকনমাত্র ক্ষণমধ্যেই ক্ষয় পাইয়া যায়। এইরূপে উহা মরিয়া যেন স্বপ্নে পুনরায় জন্ম লাভ করে; আবার জন্মিয়া যেন জাগ্রদবস্থায় মরিয়া যায়। কে বল, ইহাকে যথাযথ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হয়? অতি অল্পক্ষণমাত্রও যাহার স্থায়িত্ব নাই, বল দেখি, সে বস্তু কিরূপে কার্য্যকর হইতে পারে? উৎপলজ্ঞানে কল্পিতাকার তরঙ্গরাজি দ্বারা কখন কি প্রকৃত উৎপলমালা গ্রথিত করা যায়? যে বস্তু যেমন জন্মে, অমনি বিনষ্ট হয়, তাহার সাহায্যে যদি কোন কার্য্য সমাহিত হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই লোকে বিদ্যুদ্‌গুণ-যোগেও মালা গাঁথিয়া আমোদিত হইতে পারিত। উল্লিখিতরূপে সুখ-দুঃখাদি দুর্ঘট হইলেও উহার দুর্ঘটতা বিষয়ে অভিজ্ঞ বিবেকী লোকদিগেরও হৃদয়ে থাকিয়া তুমিই ঐ সুখ-দুঃখাদি গ্রহণ করিয়া থাক। তবে অবিবেকী জন হইতে বিবেকী জনের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে তুমি সম-স্থিতি পরিত্যাগ কর না। ফল কথা, যাঁহারা বিবেকী, তাঁহাদেরও সুখ-দুঃখাদির প্রতি লক্ষ্য আছে; কিন্তু সে লক্ষ্য সমভাবে,—অর্থাৎ সুখে-দুঃখে বিবেকীদিগের সম-অবস্থা, সম-বৃত্তি ও সম-জ্ঞান বিদ্যমান। বলিবে, তবে আমি অবিবেকী জনে কিরূপ? এরূপ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অসম্ভব; কেন না, হে সহজাত্মন্! হে অনন্ত নামরূপ-নিলয়! অবিবেকীদিগের

নিকটে যেরূপে তুমি প্রাদুর্ভূত হইয়া থাক, তোমার সেই রূপ যে কি, তাহা বর্ণন করিতে আমার বাণী অক্ষম; কেন না, তাহাতে আকস্মিক নানা বাসনার উদ্বোধ হইবারই সম্ভাবনা। নিরীহ তুমি, নিরবয়ব তুমি, নিরহঙ্কার তুমি; তুমি সৎ বা অসৎ, যাহাই কেন হও না, তুমিই সর্ব্ব-কর্ত্তৃত্ব অঙ্গীকার করিয়াছ। হে ব্রহ্মাণ্ডাদি অপেক্ষা অতি বিস্তৃতরূপ-ধারিন্! তোমার জয় হউক। হে শান্তিপরায়ণ! তুমি জয়যুক্ত হও। হে আগমের অতীত! তোমার জয় হউক। হে সমস্ত আগমের আধার! তুমি জয়যুক্ত হও। হে জাত! হে অজাত! তোমার জয় হউক। হে ক্ষত! হে অক্ষত! তুমি সর্ব্বথা সর্ব্বোৎকর্ষে বর্ত্তমান হও। হে ভাব! হে অভাব! তোমার জয় হউক। হে জেয়! হে অজেয়! তুমি জয়ান্বিত হও। আমি উল্লসিত হইয়াছি; উপশম লাভ করিয়াছি; স্থিতি প্রাপ্ত হইয়াছি এবং প্রকৃত তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। আমি জয়যুক্ত হইয়াছি; জয়ের জন্য জীবিত রহিয়াছি। আমাকে আমার নমস্কার এবং তোমাকে আমি নমস্কার করি। আমি আত্মা—নিরাময়; অতএব রাগরঞ্জনাহীন স্বয়ং আমি ভবৎস্বরূপে অবস্থিত হইয়া রহিলে বন্ধন কোথায়? বিপদ্-সম্পদ্ কোথায়? আর জনন-মরণের সম্ভাবনাই বা কোথায়? সুতরাং আমি শাশ্বত সুখ-বিশ্রান্তিই প্রাপ্ত হইলাম। অর্থাৎ অধুনা ভবৎস্বরূপে আমার অবস্থানে সমস্ত অনর্থ-নিবৃত্তি-সিদ্ধিই সুসম্পন্ন হইল।

ষট্ত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৬ ॥

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অরিন্দম প্রহ্লাদ এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে পরমানন্দময় নির্ব্বিকল্প সমাধি-ব্যাপারে নিরত হইলেন। তিনি যখন নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বরূপ-সাম্রাজ্যে অবস্থান করিতে

লাগিলেন, তখন তাঁহাকে চিত্রার্পিত পর্ব্বত অথবা প্রস্তর-সমুৎকীর্ণ মূর্ত্তি-বিশেষের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। ভুবন মধ্যে থাকিয়া সুমেরুগিরি যেমন বহুকাল অতিপাতিত করিতেছে, সুরশত্রু প্রহ্লাদও তেমনি উল্লিখিতরূপে স্বীয় গৃহে সমাধিমগ্ন থাকিয়া বহুতর কাল কর্ত্তন করিলেন। প্রচুর জলসেক কর, তথাপি অকালে যেমন বীজ হইতে অঙ্কুরোদ্গম হইবার নয়, তেমনি অসুরনায়কেরা বহুবার বহুপ্রকারে প্রবোধ প্রদান করিলেও মহামতি প্রহ্লাদ কিছুতেই প্রবুদ্ধ হইলেন না। এইরূপে প্রহ্লাদের ব্রহ্মভাব বর্দ্ধিত হইলে, উপলোৎকীর্ণ মার্ত্তণ্ড-মূর্ত্তির ন্যায় তিনি নিশ্চল ও প্রশান্ত হইয়া একাগ্রদৃষ্টিতে সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত অসুরপুরী মধ্যে অবস্থান করিলেন। এইরূপে প্রহ্লাদ নিশ্চলভাবে ভূমানন্দ-দশায় একান্ত পরিণত হইলে দর্শকেরা মনে করিল, প্রহ্লাদ বুঝি আনন্দাতীত মরণদশায় উপনীত হইয়াছেন এবং ইহাঁর বুঝি চৈতন্য মাত্র নাই।

ইত্যবসরে সমগ্র রসাতলে ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইল। দুর্ব্বলেরা প্রবলের হস্তে সর্ব্বত্র নিগৃহীত হইতে লাগিল। হিরণ্যকশিপুর পরলোক প্রাপ্তির পর কিয়দ্দিন অতীত হইলে তৎপুত্র প্রহ্লাদ সমাধি অবলম্বন করেন। তখন হইতে অসুররাজ্যে অপর কোনই রাজা থাকে না। প্রধান প্রধান অসুরেরা মিলিত হইয়া একযোগে অনেক প্রার্থনা করিলেন, অনেক চেষ্টা যত্ন করিলেন; কিন্তু প্রহ্লাদ সমাধি হইতে কিছুতেই উত্থিত হইলেন না। নিশাকালে অলিকুল যেমন প্রস্ফুট পদ্ম প্রাপ্ত হয় না, তেমনি অমরারিগণও কোনক্রমেই প্রহ্লাদকে প্রবুদ্ধ অবস্থায় প্রাপ্ত হইলেন না। প্রহ্লাদ সেই পূর্ব্বের ন্যায় একই ভাবে সমাধিসুখে নিমগ্ন হইয়া রহিলেন। দিনমণির অবসান ঘটিলে নিশাযোগে যেমন কোনও রূপ পৌরুষ চেষ্টা থাকে না, সকলেই নিদ্রায় অলস হইয়া পড়ে, দৈনিক কার্য্য কিছুই কোথাও হইতে দেখা যায় না, তেমনি গলিতমনা প্রহ্লাদের অন্তরে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় কোনরূপ প্রবোধলক্ষণই লক্ষিত হইল না। যেন সুপ্ত ব্যক্তি,—সেইরূপই তিনি চেষ্টাহীন।

তখন সেই অরাজকপুরে দানবেরা উদ্বিগ্ন হইল, উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল; কেহই কাহারও শাসনাধীন রহিল না। যাহার যে দিক্ ইচ্ছা,

সে সেই দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। পাতালপুরে বহুকালের জন্য অরাজকতা প্রতিষ্ঠিত হইল। রাজার অভাবে দুর্ব্বলের উপর প্রবলেরা নানারূপ অত্যাচার করিতে লাগিল। যাঁহারা গুণবান্ ছিলেন, তাঁহারাও তখন নিষ্ঠুর নির্গুণের ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। প্রবল ব্যক্তিরা বলপূর্ব্বক পরবনিতা অপহরণ করিতে লাগিল। লোকের মান, সম্ভ্রম বা মর্য্যাদা আর রহিল না। অবলাগণ সর্ব্বত্রই উৎপীড়িত ও অত্যাচারিত হইতে লাগিল। পরস্পর পরস্পরের পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্ত কাড়িয়া লইতে লাগিল। উৎপীড়িত নরনারীগণ উচ্চকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল। রাজপুরীর অভ্যন্তরে বিষম বিশৃঙ্খলতা দেখা দিল। কি নগর, কি উদ্যান, সর্ব্বত্রই অবাধে লুণ্ঠন কার্য্য চলিতে লাগিল। নাগরিকেরা অর্থনাশ ও আত্মীয় বন্ধুজনের বিচ্ছেদ-জনিত শোকাবেগে কাতর হইয়া পড়িল। অসুরেরা সকলেই গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইল। অনেকের আত্মীয়-স্বজন অন্নাভাবে বিপন্ন হইয়া পড়িল। অকস্মাৎ এইরূপ উৎপাত উপস্থিত হওয়ায় সকলেই একেবারে অবসন্ন হইল। দিঙ্মণ্ডল ধূলিজালে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। সুরবালকেরাও অসুরদিগকে আসিয়া অভিভূত করিতে লাগিল। চণ্ডাল, কুক্কুর, শৃগাল, রাক্ষস ও পিশাচাদিরাও স্থানে স্থানে অনেককে আক্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। পাতালপুরী ক্রমশঃ জনশূন্য হইয়া পড়িল। তাহার শোভা-সৌন্দর্য্য লোপ পাইল। নানাস্থান ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত হইয়া গেল। অসুর-পল্লীগুলি যুদ্ধবিগ্রহে চূর্ণ বিচূর্ণ হইবার উপক্রম হইল। পরবনিতা হরণ করিবার জন্য দুর্ব্বৃত্তগণ প্রতিনিয়ত মন্ত্রণা ও যুদ্ধ করিতে লাগিল। স্ত্রী ও ধনাদি অপহৃত হওয়ায় চতুর্দ্দিক্ হইতে কত লোকে আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। কুলিযুগবৎ ক্রূরস্বভাব কামুকগণ তখন নানাবিধ উৎপাত উপদ্রব আরম্ভ করায় সমগ্র দানবপুরী একান্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

সপ্তত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৩৭॥

অষ্টত্রিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাম! এই নিখিল জগৎ-সম্বন্ধীয় নিয়তি-নিচয়ের পালনই যাঁহার লীলা-খেলা, সেই ক্ষীরাব্ধি-মন্দিরের শেষ-শয্যাশায়ী অরিন্দম হরি একদা প্রাবৃট-নিদ্রার অবসানে দেবগণের প্রয়োজন সাধনের নিমিত্ত জ্ঞানবলে জাগতিক গতি অবলোকন করিলেন। প্রথমতঃ নিজ মন দ্বারা স্বর্গধাম দর্শন করিয়া পরে পৃথিবীস্থ জনগণের শুভাশুভ আচার-ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলেন; অনন্তর মনের সাহায্যে শক্র-পালিত পাতালতলে উপনীত হইয়া তথাকার অধিবাসীদিগের অবস্থার বিষয় পর্য্যালোচনা করিলেন। দেখিলেন,—দানবনায়ক প্রহ্লাদ নিশ্চল সমাধি অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেছেন। ও দিকে সুরাধিপতি ইন্দ্র আপনার রম্য রাজধানীতে থাকিয়া নির্ব্বিরোধে স্বর্গীয় রাজ্যসম্পদ ভোগ করিতেছেন। ক্ষীরাব্ধি-মধ্যস্থ, শেষ-শয্যাশায়ী, শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী, নিখিল দেহাভ্যন্তরচারী হরির মানস তৎকালে ঐ সকল দেখিয়া শুনিয়া ত্রিভুবন-কমলের মহামধুকর-রূপ অত্যুজ্জ্বল দেহ ধারণপূর্ব্বক এইরূপ চিন্তায় নিবিষ্ট হইল যে, প্রহ্লাদ অধুনা ব্রহ্মপদে বিশ্রাম লাভ করিয়াছে; পাতালপুরীর নায়ক কেহই নাই; সে এখন নায়কশূন্য হইয়া রহিয়াছে। অহো! কি কষ্টের কথা! দেখিতেছি, আমার সৃষ্টি এক্ষণে প্রায় দৈত্যহীন হইয়া উঠিল! এখন আর সেরূপ প্রবল দৈত্য প্রায় নাই; কাজেই সুরগণেরও জিগীষাবৃত্তি নিবৃত্তি পাইয়াছে। ক্রমে দেখিতেছি, এই সকল সুরেরাও অনাবৃষ্টিকালীন নদী-নিচয়ের ন্যায় প্রশান্ত হইয়া যাইবে এবং দ্বন্দ্ববিরহিত মোক্ষনামধেয় ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইবে। এইরূপে অভিমান কাহারও থাকিবে না, সকলেই বিরস লতার ন্যায় শুষ্ক হইয়া যাইবে। সুরগণ যদি উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে যজ্ঞ ও তপশ্চর্য্যাদি ক্রিয়াকলাপ সমস্তই অদেবত্ব-ফল হইয়া ভূমণ্ডল হইতে অচিরে নিশ্চয়ই লোপ পাইবে। ক্রিয়াকলাপ বিলুপ্ত হইয়া নিখিল ভূর্লোকই অস্তমিত হইবে। ভূলোকের বিলয় ঘটিলে এ সংসারেরও উচ্ছেদ

অবশ্যম্ভাবী। কল্পক্ষয়ের পর আমি যে এই ত্রিভুবন কল্পনা করিয়াছি, তাপযোগে যেমন হিমকণা গলিয়া যায়, ইহাও তেমনি অকালে বিলয় পাইয়া যাইবে। আমার কল্পিত এই বিশাল বিস্তৃত বিশ্বমণ্ডল যদি ক্ষয় পাইয়া যায়, তাহা হইলে মদীয় লীলারও অবসান হয়; নিজের লীলা নিজেই অকালে যদি ক্ষয় করিলাম, তবে আর আমার কি করা হইল? তখন আমিও এই রবি-শশি-গ্রহ-নক্ষত্রহীন শূন্যাকাশে স্বীয় শরীর লীন করিয়া সেই পূর্ণাত্মপদে বিশ্রান্তি লাভ করিব; কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ড যদি অকালে উপশম প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তো সুর-নরাদি জীব-নিবহের প্রকৃত কল্যাণ কিছুই দেখি না; ফলের মধ্যে এই হইবে যে, আমার এই জগৎ-কল্পনা বৃথা হইয়াই যাইবে; সুতরাং আমি মনে করি, দানবেরা জীবিত থাকুক। দানবেরা যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে, তাহাদের উদ্যমে বিবুধগণকে জীবিত থাকিতে হইবে। বিবুধবৃন্দের সজীবতায় এ সংসারে যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়াকলাপ সমস্তই অক্ষুণ্ণ থাকিবে। সংসার-নিয়মের ব্যত্যয় কিছুই ঘটিবে না; এ সংসার যেমনটী আছে, তেমনটীই থাকিবে। যে ঋতুর অভ্যুদয়ে যে পাদপ জীবিত থাকে, সেই ঋতু সমুদিত হইয়া সেই পাদপকে যেমন উত্থাপিত করে, আমিও তেমনি রসাতলে যাই,—যাইয়া দানবেন্দ্র প্রহ্লাদকে তাহার স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রবোধিত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় স্থাপন করি। প্রহ্লাদ ব্যতীত অন্য কোন দানবকে যদি আমি রাজ্যপদ প্রদান করি, তাহা হইলে সম্ভবতঃ সে আসিয়া স্বদলবলে দেবগণকে আক্রমণ করিতে পারে। প্রহ্লাদের দেহ অতীব পবিত্র; তাহার এই বর্ত্তমান দেহের অবসান ঘটিলে পুনর্জ্জন্ম হইবে না, প্রহ্লাদ তাহার এই দেহেই আকল্পকাল অবস্থান করিবে। প্রহ্লাদের যে এই দেহেই আকল্পকাল অবস্থান, ইহা পরমেশ্বরেরই নিশ্চিত নিয়ম; এ নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিবার নয়। অতএব এক্ষণে আমার কর্ত্তব্য এই যে, বারিদ যেমন গিরিনদী-সুপ্ত শিখণ্ডীকে গর্জ্জন দ্বারা বোধিত করে, পাতালে গিয়া প্রহ্লাদকেও আমার তেমনি প্রবোধিত করিতে হয়। স্বচ্ছ মণিতে মন নাই—মনের চেষ্টা নাই, তথাপি সে যেমন আপনাতে পদার্থান্তরের প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তেমনি দৈত্যপতি প্রহ্লাদ জীবন্মুক্তভাবে

অবস্থান করুক;—করিয়া অসুরদিগের নেতৃত্ব করিতে থাকুক। এইরূপ হইলে এই সৃষ্টি বিস্তার আর নিখিল সুরাসুর সহ বিলয় পাইবে না। পূর্ব্বের মত আবার সেই সুরাসুরগণের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইবে; তাহা হইলে আমার লীলাখেলাও অক্ষুন্ন রহিবে। যদিও এই জগন্মণ্ডলের ক্ষয় কিম্বা উদয়, উভয়ই আমার তুল্য; অর্থাৎ ইহার ক্ষয় হয়, হউক, তাহাতেও আমার দুঃখ নাই, আর ইহার উদয় হয়, হউক, তাহাতেও আমার আহ্লাদ নাই, তথাপি প্রাক্তন সৃষ্টি-সংস্থান অতিক্রম করিবার প্রয়োজন নাই; পূর্ব্ব পূর্ব্ব কল্পে ইহা যেমন হইয়াছে, এই বর্ত্তমান কল্পও তেমনিভাবে অবস্থান করুক। আমার অভিপ্রায় এই যে, উহা যেন অকাণ্ডে বিলয় প্রাপ্ত না হয়। অভিনিবেশ-সহকারে যে গমনাদি চেষ্টা হয়, তাহারই নাম যোগ-গমন; যোগনিদ্রায় যে সুখ সমুৎপন্ন হয়, তাহা গমন-চেষ্টার ভাব ও অভাব, সকল সময়েই ঘটে; ফল কথা, আমি যে দৈত্যপুরে যাইতেছি, ইহাতে আমার যোগনিদ্রা-জনিত পরম সুখ পরিত্যাগ করা হইতেছে না। আমি প্রহ্লাদকে প্রবোধ প্রদান করিবার জন্য যাইতেছি সত্য; কিন্তু অচলবৎ আমি স্থির ধীর ভাবেই অবস্থিত রহিয়াছি। কারণ মূর্খলোকে যে ভাবে সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করে, আমি সেরূপে সংসারলীলা সমাধা করি না। এক্ষণে আমি পাতালপুরেই প্রয়াণ করি এবং সেখানে গিয়া অসুররাজ প্রহ্লাদকে প্রবোধিত করিয়া তুলি। দৈত্যপুরের এখন বড় ভয়ঙ্কর অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। উদ্ধত দস্যুদল মর্য্যাদাহীন হইয়া সেখানে যে বিষম অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে, তাহাতেই সে অসুরপুর ভয়ের আকর হইয়া উঠিয়াছে। আমি সম্প্রতি সে পুরে যাই,—যাইয়া দিনকর-কৃত কমলপ্রকাশের ন্যায় প্রহ্লাদকে সমাধি হইতে উদ্বোধিত করিয়া লই। বর্ষাঋতু যেমন চঞ্চলস্বভাব মেঘমণ্ডলকে শৈলোপরি সংস্থাপন করে, আমিও তেমনি এই অখিল জগন্মণ্ডলের স্থিরত্ব বিধান করি।

অষ্টত্রিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৩৮ ॥

ঊনচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বাত্মা হরি স্বীয় পুরী ক্ষীরাব্ধি হইতে সপরিবারে যাত্রা করিলেন। তখন মনে হইল, যেন ক্ষীরার্ণব হইতে সানুমান্ মন্দরগিরি উৎপতিত হইল। হরি ক্ষীরার্ণবের তলগত রন্ধ্র দিয়া দ্বিতীয় ইন্দ্রপুরীর ন্যায় প্রহ্লাদের রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ রন্ধ্রপথের জল বিধাতৃ-সঙ্কল্পে স্তম্ভিত; সুতরাং সে পাতাল-বিবরে জল প্রবেশ করে না। হরি প্রহ্লাদপুরে গিয়া দেখিলেন,—প্রহ্লাদ সুন্দর হৈম-মন্দিরের অভ্যন্তরে মেরুকন্দরবাসী ব্রহ্মার ন্যায় সমাধি-মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। সেখানে যে সকল দৈত্য উপস্থিত ছিল, তাহারা হরির অভ্যাগমনে তদীয় তেজে দিবাকর-কর-শঙ্কিত কৌশিককুলের ন্যায় ধুলির আকারে বিক্ষিপ্ত হইয়া বহুদুরে প্রস্থান করিল। হরি তখন দুই তিন জন মাত্র প্রধান অসুরকে সঙ্গে লইয়া সপরিবারে সেই অসুরালয়ে প্রবেশ করিলেন। মনে হইল, তারকারাজি-রাজিত শশধর যেন গগনাঙ্গনে সমুদিত হইলেন। তিনি গরুড়াসনে সমাসীন; লক্ষ্মীদেবী তৎপার্শ্ববর্ত্তিনী হইয়া চামর-পরিচালনে তৎপরা, তাঁহার হস্তে গদাচক্রাদি আয়ুধ সকল সুশোভন এবং দেব, ঋষি ও মুনিবৃন্দ তদীয় বন্দনায় নিরত। এই অবস্থায় প্রভু হরি, প্রহ্লাদ-মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর 'মহাত্মন্! প্রবুদ্ধ হও' এই বলিয়া তাঁহার পাঞ্চজন্য শঙ্খ ধ্বনিত করিলেন। সেই শঙ্খশব্দে সমস্ত দিক্প্রাঙ্গণ ধ্বনিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, এককালে যদি প্রলয়-পয়োধি ও প্রলয়-পয়োদমণ্ডল গর্জ্জন করিত, তাহা হইলেই সেই মহান্ শঙ্খনাদের সহিত উপমিত হইতে পারিত। সহসা মেঘধ্বনি শুনিয়া লীলামত্ত রাজহংসাবলী যেমন সম্ভ্রম-সঙ্কুল হয়, তথাকার অসুরগণ তেমনি সেই শঙ্খশব্দ শুনিয়া চকিত ও ভূপতিত হইল। বিষ্ণুভক্ত-জনগণ তখন উল্লিখিত ধ্বনি শুনিয়া জলদ-নাদ-সমুৎফুল্ল কুটজকুসুমাবলীর ন্যায় সম্ভ্রমশূন্য হইয়া প্রমোদভরে প্রহৃষ্ট হইয়া উঠিল। বর্ষা-

গমে কদম্বতরু যেমন ক্রমশঃ কুসুমিত হইয়া উঠে, দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ তখন বিষ্ণুর শঙ্খশব্দে তেমনি ধীরে ধীরে প্রবুদ্ধ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে প্রহ্লাদের প্রাণশক্তি উত্থিত হইল,—হইয়া গঙ্গানদীকৃত সাগর-সম্পূরণের ন্যায় ক্রমশঃ তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ আপ্লাবিত করিল। উদয়ের পর সৌরী প্রভা যেমন ক্ষণমধ্যেই সমস্ত ভুবনান্তরালে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, প্রহ্লাদের প্রাণশক্তি তেমনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাঙ্গে সমাস্তৃত হইয়া পড়িল। তৎপরে তদীয় ইন্দ্রিয়বর্গ নবদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার চিৎ বা চৈতন্য তখন অভ্যন্তরগত লিঙ্গদেহরূপ দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া চেত্যোন্মুখী হইয়া উঠিল। হে রাঘব! প্রহ্লাদের চিৎ ঐ সময় চেতনীয় বিষয়ে উন্মুখী হইয়া চেত্যাকার ধারণপূর্ব্বক মনোভাব লাভ করিল। এই প্রকারে তাঁহার চিত্ত কিঞ্চিৎ অঙ্কুরিত হইবার পর তদীয় বিকাসোন্মুখ নেত্র দুইটী প্রভাতকালীন অর্দ্ধ-বিকসিত নীল কমল-যুগলের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল। অন্তঃপ্রবিষ্ট প্রাণ ও অপান পবনের সহায়তায় তাঁহার নাড়ীবিবরে সম্বিৎ সমুদ্বোধিত হইয়া উঠিলে মন্দ-মারুত-চালিত কমলবৎ তিনি স্পন্দনবান্ হইয়া উঠিলেন। প্রহ্লাদ ধীরে ধীরে প্রাণপূর্ণ হইলেন। তখন নিমেষ মধ্যে তদীয় মন পীবরভাব ধারণ করিল; মনে হইল, যেন চারিদিক্ হইতে জল আসিয়া জলাশয়ে পতিত হওয়ায় তাহার তরঙ্গ বৃদ্ধি পাইল। দিবসকর অর্দ্ধোদিত হইলে ফুল্ল-কমলশালী সরোবর যেমন সুশোভিত হইয়া উঠে, তেমনি তখন প্রহ্লাদের নেত্র, মন, প্রাণ ও দেহ বিকাশ প্রাপ্ত হইলে তিনিও পরম শোভা ধারণ করিলেন। মেঘধ্বনি হইবামাত্র শিখণ্ডী যেমন বোধ প্রাপ্ত হয়, তেমনি বিভু হরি তখন প্রহ্লাদকে 'প্রবুদ্ধ হও' এই কথা বলিবামাত্র প্রহ্লাদ প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। প্রহ্লাদের নেত্র দুইটী যখন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, মননশক্তি যখন জন্মিল এবং স্মৃতিশক্তি যখন উপচিত হইল, তখন ত্রৈলোক্যনাথ নারায়ণ পূর্ব্বে যেমন নিজ নাভিকমল-সম্ভব ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, তেমনি সেই প্রহ্লাদকে তিনি বলিতে লাগিলেন,—হে সাধো! তুমি তোমার মহতী দৈত্যরাজ্যশ্রী ও আত্মীয় আকৃতির বিষয় এক্ষণে স্মরণ কর। অকস্মাৎ অকালে কেন তুমি তোমার দেহের অবসান

ঘটাইতেছ? অধুনা তোমার হেয় কিম্বা উপাদেয় সঙ্কল্প নাই; সুতরাং শরীরগত যে কিছু সুখ-দুঃখ, তাহাতে তোমার কোনই ইষ্টানিষ্ট নাই। উক্ত হেয় বা উপাদেয় সঙ্কল্প যাহাদের আছে, দেহ-স্মরণ তাহাদেরই ত দুঃখের কারণ হয়। তুমি সঙ্কল্পহীন; তোমার উহা হইবে না। তাই বলিতেছি, তুমি আর এ ভাবে অবস্থান করিও না; গাত্রোত্থান কর। যাবৎ কল্পাবসান হয়, ততদিন তোমায় এই দেহেই অবস্থান করিতে হইবে। তোমার অনিন্দিত আয়ুর্নিয়তির বিষয় আমি বিলক্ষণ বিদিত আছি। তুমি রাজকার্য্য পরিচালন কর; করিলেও জীবন্মুক্ত তুমি,—তোমার কোন উদ্বেগ-অশান্তি ঘটিবে না; তুমি নিরুদ্বেগে কল্পকাল পর্য্যন্ত অনায়াসে তোমার এই দেহে অতিপাতিত করিবে। হে পূতচরিত্র! অনন্তর যখন কল্পান্ত ঘটিবে, তখন তোমার কলেবর বিশীর্ণ হইয়া যাইবে। ঘট ভগ্ন হইলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে মিশিয়া যায়, তোমার এই দেহ-ক্ষয়ে তুমিও তেমনি স্বীয় মহত্ত্বে অধিষ্ঠিত হইবে। এই তোমার বিশুদ্ধ দেহ জীবন্মুক্ত-বিলাস-যুক্ত ও লোক-পরাবরদর্শী হইয়া কল্পান্ত পর্য্যন্ত অবস্থান করিবে। কিন্তু সেই কল্পান্ত কালের এখনও বহু বিলম্ব আছে। এখনও এককালে দ্বাদশাদিত্য সমুদিত হয় নাই, এখনও ভূধরনিকর ভূগর্ভে বিলীন হয় নাই, এবং এখনও এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড প্রজ্বলিত হইয়া উঠে নাই। সুতরাং হে সাধুশীল! এ সময়ে তুমি তনুত্যাগে বৃথা কেন উদ্যত হইয়াছ? অমরগণও মরিবে, পবন তাহাদের ভূলুণ্ঠিত কপালশ্রেণী লইয়া—দগ্ধ জগতের ভস্মস্তূপে ধূসরিত হইয়া উন্মত্তভাবে প্রবাহিত হইবে; কিন্তু এখনও সে দিন আসে নাই; এখনও তাহা ঘটে নাই। এই জগদভ্যন্তরে পুষ্কর ও আবর্ত্তকনামক প্রলয়-মেঘে এখনও অশোকমঞ্জরীর ন্যায় তড়িৎপুঞ্জ ফুটে নাই; অতএব কেন আর তোমার এ সময় এই তনুত্যাগের বৃথা আয়োজন! এখনও তো দহ্যমান ধরিত্রীর প্রকম্পনে পর্ব্বতবৃন্দ বিদীর্ণ বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় নাই। এখনও প্রদীপ্ত প্রলয়ানলোজ্জ্বল দিঙ্মণ্ডল বিশীর্ণ হইয়া যায় নাই। সুতরাং কেন বল দেখি, তোমার এই তনুত্যাগের বৃথা উদ্যম? যৎকালে প্রলয় পয়োধরের প্রবল ধারাপাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি মাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আর সকলই বিনষ্ট হয়,

সেই দারুণ সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই। অতএব কেন তুমি এ সময় দেহ ত্যাগে বৃথা উদ্‌যোগী হইয়াছ? যখন দ্বাদশাদিত্যের প্রখর কিরণে ভূপদ্মদল-স্বরূপ লোকালোক শৈলের শৃঙ্গসহ ব্রহ্মাণ্ডভিত্তির পার্থক্য বা ভেদ অনুমিত হয়, এখনও সে সময় সমাগত হয় নাই এবং দিক্ সকলও জর্জ্জরিত হয় নাই; সুতরাং কেন বৃথা তুমি শরীর পরিহারে সমুদ্যত? যখন যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশ দিবাকরের প্রখরতর করনিকর টঙ্কারনাদে গিরিবর সুমেরুকে ভেদ করিয়া নভোমণ্ডলে বিকীর্ণ হইয়া পড়ে এবং যৎকালে প্রলয়ের জলদজাল গর্জ্জিয়া উঠে, সে সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই; সুতরাং কেন আর তবে দেহত্যাগ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইতেছ? এই দেখ, এখনও দশ দিক্ আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত ও ভূত-বৃন্দে পরিবৃত রহিয়াছে; আমি গরুড়বাহনে এই সকল দিঙ্মণ্ডলে ভ্রমণ করিতেছি। ফলে—প্রলয়ের সূচনা এখনও হয় নাই। অতএব তুমি দেহ ত্যাগ করিও না। এই অমরা, এই তুমি, ঐ শৈলকুল, এই ভূতবৃন্দ, এই জগৎ, ঐ আকাশ, এইরূপে এই দেখ, সমস্তই এখনও বিরাজমান; সুতরাং এমন অপ্রলয়কালে দেহ পরিহার করা তোমার পক্ষে সুসঙ্গত হয় না। প্রগাঢ় অজ্ঞানযোগে যাহার মন পর্য্যাকুল রহিয়াছে এবং দুঃখে যাহার দেহ জর্জ্জরিত হইয়াছে, দেহ বিসর্জ্জিয়া মরণদশায় উপনীত হওয়া তাহারই পক্ষে মঙ্গলকর। অপিচ, 'আমি ক্ষীণ', 'আমি অতি দুঃখী', 'আমি মূঢ়', এই সকল এবং অন্যান্য আরও নানা ভাবনায় যাহার বুদ্ধি বিলুপ্ত হয়, মরণ বটে তাহারই পক্ষে সুশোভন। যাহার অন্তঃকরণ আশাপাশে নিয়ন্ত্রিত রহিয়াছে এবং যে জন চঞ্চল মানসী বৃত্তির প্রেরণায় ইতস্তত নীত হইতেছে, মরণ বাস্তবিক তাহারই শোভন হইয়া থাকে। যাহার প্রবল তৃষ্ণা বিবেককে হরিয়া লইয়া প্ররোহের ন্যায় হৃদয়কে দলিত করে, তাদৃশ তৃণলোলুপ পশু অপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবেরই মরণ শোভা পায়। যাহার চিত্ত তালতরুবৎ সমুন্নত; তথাবিধ চিত্তরূপ অরণ্যমধ্যে যদীয় চিত্ত-বৃত্তিরূপিণী বল্লরী সুখ-দুঃখরূপ ফল প্রসব করে, এ হেন পুরুষের মরণই মঙ্গলাবহ। যাহা রোমরাজিরূপ লতাজালে পরিবেষ্টিত, তথাবিধ দেহাকার বিষবৃক্ষ যাহার কামাদি অনর্থ কার্য্যরূপ প্রচণ্ড পবনে সতত পরিচালিত

হইতেছে, তাদৃশ জনেরই মরণ মঙ্গলজনক হইয়া থাকে। যাহার বিলোল দেহ-লতাযুক্ত কায়-কানন অনবরত আধি-ব্যাধিরূপ দাব-দহনে দগ্ধ হইতেছে, মরণ প্রকৃত তাহারই পক্ষে সুশোভিত। বিশুষ্ক তরুকোটরবৎ যদীয় দেহাভ্যন্তরে কাম-কোপরূপ অজগর সকল গর্জ্জন করিতেছে, তাদৃশ জনের মরণ শোভন হইয়া থাকে। এই যাহাকে দেহ পরিত্যাগ বলিয়া অভিহিত করা হয়, তাহাই ঐ লোকে মরণ আখ্যায় প্রসিদ্ধ হইয়া থাকে। যিনি আত্মা,—তিনি এই মরণ বিধান করেন না; কেন না আত্মা নিষ্ক্রিয়, অপিচ আত্মা অসঙ্গ, তাঁহার দেহাসক্তি অপ্রসিদ্ধ। সুতরাং তাহার ত্যাগক্রিয়ার যোগ অসম্ভব। দেহকেও উক্ত মরণবিধায়ক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না; কেন না, দেহ অসৎ; যাহা অসৎ, তাহার স্বপরিত্যাগ সুদূর-পরাহত। দেহের অসত্তার প্রতি কারণ কি? কারণ—আত্মজ্ঞান। দেহাদির যে সদ্ভাব-ধারণা, তাহা অজ্ঞাননিবন্ধনই ঘটিয়া থাকে। যাহার মতি আত্মতত্ত্ব দর্শন হইতে উৎক্রান্ত হয় না, তথাবিধ তত্ত্বদর্শী প্রাজ্ঞ জনেরই জীবন শোভন হইয়া থাকে। ফল কথা,—দেহ হইতে প্রাণের উৎক্রমণই যে মরণ, তাহা নহে; পরন্তু আত্মতত্ত্ব হইতে মতির যে উৎক্রমণ, তাহারই নাম মরণ। এই মরণ প্রাজ্ঞ ব্যক্তির নাই; সুতরাং তাঁহার জীবনই সতত সুশোভন। অজ্ঞ জনের মতি সততই আত্মতত্ত্ব হইতে উৎক্রান্ত হয়; কাজেই সেই অজ্ঞ জন নিত্যই মৃতস্বরূপ। 'আমিই কর্ম্মকর্ত্তা' এইরূপে যাঁহার অহঙ্কৃত ভাব নাই, যদীয় বুদ্ধি বিষয়ব্যাপারে লিপ্ত নহে এবং যিনি সর্ব্বভূতেই সমদর্শী, তাঁহার জীবনই শোভন হইয়া থাকে। যাহার অন্তর শীতল, যাহাতে রাগদ্বেষের সম্পর্ক নাই, তাদৃশ বুদ্ধি দ্বারা যিনি সাক্ষিবৎ জগৎ দর্শন করেন, তাঁহার জীবনই সুশোভন হইয়া থাকে। যিনি সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইয়া হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং চিত্তের অবসানস্বরূপ চিদাকাশে যদীয় চিত্ত সমর্পিত হইয়াছে, তাদৃশ বিজ্ঞ জনের জীবনই শোভন হইয়া থাকে। অবস্তু শুক্তি-রজতাদির ন্যায় যাহা বস্তুস্বরূপে ভাসমান হইয়া সঙ্কল্প-কল্পিত বাহ্য বস্তুরূপে প্রতিভাত, সেই বাহ্য বস্তুরূপ মলে যাঁহার চিত্ত আসক্ত নহে এবং যিনি সেই নির্ম্মল চিত্তকে পরব্রহ্মে বিলীন করিয়াছেন, তাঁহারই জীবন শোভার সামগ্রী হয়। যিনি সত্যদৃষ্টি

অবলম্বন করেন,—করিয়া লীলাচ্ছলে জাগতিক কর্ম্ম সমাধা করেন এবং অন্তরে যাঁহার বাসনাবিকাশ নাই, তাঁহারই জীবন প্রশস্ত। যিনি জগদ্ব্যবহারে থাকেন,—থাকিয়া 'উপাদেয় বস্তু পাইলাম' বলিয়া অন্তরে সন্তোষ লাভ করেন না, কিম্বা হেয় প্রাপ্তি নিবন্ধন অন্তরে উদ্বিগ্ন হন না, তাঁহার জীবনই শ্লাঘনীয় হইয়া থাকে। স্বচ্ছ শুদ্ধ সরোবর হইতে যেমন হংসসমূহ নির্গত হয়, তেমনি যাহা হইতে শম-ক্ষমাদি গুণগণ প্রকাশমান হয়, তাঁহারই জীবন সুশোভন হইয়া থাকে। যাঁহার নাম শ্রবণে, যাঁহাকে দেখিলে এবং যাঁহাকে স্মরণ করিলে জীবনিবহ আনন্দানুভব করে, নিশ্চিত তাঁহারই জীবন সুশোভন হইয়া থাকে।

হে দনুজরাজ! যাঁহার উদয়ে জীবনরূপ মধুপ-সঙ্কুল সকল-লোকরূপ কুমুদকুল বিলসিত হইয়া উঠে, পরিপূর্ণ সুধাকরের পূর্ণতার ন্যায় তাঁহারই জীবন প্রকৃত সুশোভিত হইয়া থাকে; অন্যের কখনই হয় না।

উনচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৩৯॥

চত্বারিংশ সর্গ।

ভগবান্ কহিলেন,—এই প্রত্যক্ষ দেহের যে স্থিরতা, তাহাকেই লোকে জীবন, আর দেহান্তর পরিগ্রহের জন্য এই প্রত্যক্ষ দেহের যে পরিহার, তাহাকেই মরণ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। হে মহামতে! দেহের স্থৈর্য্য আর প্রাণের উৎক্রমণ, এই উভয়বিধ পক্ষ হইতেই তুমি নির্ম্মুক্ত হইয়াছ। ফলে, তোমার দেহের স্থৈর্য্যজ্ঞানও নাই এবং তোমার দেহ হইতে প্রাণও উৎক্রান্ত হইয়া যায় নাই। সুতরাং তোমার আবার জীবনই বা কি? আর মরণই বা আছে কি? হে অরিন্দম! তবে যে আমি বলিয়াছি, তোমার জীবনই সুশোভন; মরণ সুশোভন নহে; এ কথা কেবল দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনার্থই বলা হইয়াছে। পরন্তু হে সর্ব্বজ্ঞ! প্রকৃত কথা বলিতে গেলে বলিতে হয়, তুমি বস্তুতঃ কদাচ জীবিতও নহ এবং কখন মৃত ও নহ। বুঝিয়া দেখ, গগনে পবন থাকে, থাকিয়াও সে, গগনে সংলগ্ন

নহে; এই জন্য পরম যেমন গগন-শূন্য, তেমনি তুমিও দেহে আছ; কিন্তু থাকিয়াও দেহাসক্ত নহ বলিয়া দেহশূন্য হইয়া বিরাজিত। বাস্তবিকই এখন তোমার দেহদৃষ্টি নাই।

হে সুব্রত! শীতোষ্ণাদি স্পর্শজ্ঞান দেহের ধর্ম্ম; ইহা তোমার আছে কি যে, তোমার দেহসংস্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিব? তবে তোমার দেহে স্থিতি কিরূপে বুঝা যায়? এ পক্ষে বক্তব্য এই যে, দেহে যে শীতোষ্ণাদি স্পর্শজ্ঞান তাহার নিমিত্ত বলিয়া দেহেই তুমি আছ। বলিবে,—ত্বাচ স্পর্শজ্ঞানে অসঙ্গ আত্মা কারণ হইবেন কিরূপে? তাহাতে বক্তব্য এই যে, আকাশ বৃক্ষাদির ঔন্নত্যের অবরোধ করে না বলিয়াই লোকে যেমন আকাশকে তাহার ঔন্নত্যের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করে, তেমনি শীতোষ্ণাদি স্পর্শজ্ঞানের বিরোধক নহেন বলিয়াই আত্মাকে তাহার কারণ বলা হয়। ফলে কিন্তু আত্মা তাহাতে আসক্ত নহেন। বলিবে,—তবে অদেহত্ব সিদ্ধি হইল কিরূপে? উত্তরে বক্তব্য,—তোমার তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইয়াছে; সেই জন্য তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ। প্রবোধ জন্মিয়াছে বলিয়া সর্ব্বদ্বৈতের উপশম লাভ করিয়াছ; উপশমশালী বিজ্ঞদিগের আবার দেহ থাকিবে কোথায়? এই একমাত্র অবিচ্ছিন্নাত্মক দেহ অসম্ভাব্য হইলেও অপ্রবোধশালী ব্যক্তিবর্গেই বিদ্যমান। তুমি চিৎপ্রকাশরূপে বিরাজমান; একমাত্র পরব্রহ্মেই তোমার বুদ্ধি পরিনিষ্ঠিত রহিয়াছে। তুমি সর্ব্বকালেই সর্ব্বস্বরূপে বিদ্যমান। পরন্তু অজ্ঞ জনের ন্যায় দেহমাত্রেই তোমার অবস্থান নহে। তুমি যাহাকে গ্রহণ করিবে বা পরিহার করিবে, তথাবিধ দেহ কাহাকে বলা যায়? এবং কাহাকেই বা অদেহ আখ্যায় অভিহিত করা যায়? বসন্ত কালের অভ্যুদয় হউক বা প্রলয়-পবন প্রবাহিত হউক, ভাবাভাব-বিরহিত আত্মার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি আছে কি? শৈলকুল সমুন্মূলিত হইয়া যাউক, প্রলয়পাবক বিশ্ব দগ্ধ করে,—করুক, আর ঔৎপাতিক বায়ু বহিতে থাকে,—বহুক, তোমার তাহাতে ক্ষতি হইবে কি? অর্থাৎ তুমি আত্মা,—আত্মাতেই অবস্থিত রহিয়াছ। নিখিল পদার্থপরম্পরা থাকুক, আর যাউক, নষ্ট হউক, আর বৃদ্ধি পাউক, তুমি নিত্য আত্মাতেই অবস্থান করিতেছ। এই দেহ

নাশ পাইলেও পরমেশ আত্মার তাহাতে ক্ষয়প্রাপ্তি নাই, এই দেহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেও তাঁহার বৃদ্ধি নাই এবং এই দেহ যদি স্পন্দিত হয়, তাহাতেও তাঁহার স্পন্দন নাই। 'দেহের আমি' 'দেহী আমি' ইত্যাকার চিত্তবিভ্রম যখন ক্ষয় পাইয়া যায়, তখন 'আমি ত্যাগ করিতেছি, কি ত্যাগ করিতেছি না' এবম্বিধ কল্পনা ব্যর্থ হইয়াই পড়ে। হে তাত! 'এই কার্য্য করিয়া এই কার্য্য করিব, ইহা পরিত্যাগ করিয়া অন্য বিষয় ত্যাগ করিব' এরূপ সঙ্কল্প তত্ত্বজ্ঞদিগের ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। যাঁহারা প্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহারা সর্ব্বকর্ত্তা হইয়াও কিছুই করেন না। তাঁহাদের কার্য্য-কারিতা কখনই নাই; সুতরাং নিত্যই তাঁহারা অকর্ত্তৃত্বপদে প্রতিষ্ঠিত। কর্ত্তৃত্ব নাই বলিয়া তাঁহাদের অভোক্তৃত্বও প্রকৃত পক্ষে সুসিদ্ধ। দেখ, বীজ বপন না করিলে এই ত্রিভুবনে কাহারও ব্রীহি প্রভৃতি সংগৃহীত হইতে পারে কি? কর্ত্তৃত্ব গেলে,—ভোক্তৃত্ব শান্ত হইলে; তখন ত একমাত্র শান্তিই অবশিষ্ট থাকে। এই শান্তি যখন প্রৌঢ় দশায় উপনীত হয়, তখন তাহাই বুধগণের নিকট মুক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রবুদ্ধ, শুদ্ধ ও চিন্ময়রূপে সমস্ত আক্রমণ করিয়া অবস্থিত, তাঁহাদের কোন্ বস্তু ত্যক্ত হইয়াছে যে, তাঁহারা পরিগ্রহ করিবেন? আর কোন্ বস্তুই বা গৃহীত আছে যে, তাহা তাঁহারা পরিত্যাগ করিবেন? গ্রাহ্য, গ্রাহক, তৎসম্বন্ধ, প্রমাণ, প্রমেয়, অবয়ব, অবয়বী, ইত্যাদি কোনও-রূপ বিকারই যাঁহার নাই, এ হেন কূটস্থ আত্মা কি গ্রহণ করিবেন এবং কিই বা পরিত্যাগ করিবেন? ঐহিক, আমুষ্মিক, ইষ্ট, অনিষ্ট, হান, উপাদান নিমিত্ত গ্রাহ্য ও গ্রাহক সম্বন্ধ উপশান্ত হইয়া গেলে রাগাদি বিক্ষেপ-শান্তি সমুদিত হয় এবং সেই শান্তিই স্থিতি প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই মোক্ষপদেই ভবাদৃশ পুরুষ-প্রবরেরা অবস্থিত এবং সর্ব্বদাই শান্তভাবে বিরাজিত। এইরূপ ভাবে রহিলেও প্রারব্ধ ক্ষয় পর্য্যন্ত জীবন্মুক্তদিগকে ব্যবহার-পরায়ণ থাকিতে হয়। যেমন সুষুপ্ত বা ব্রহ্মপ্রাপ্ত হইয়াও যোগীরা আত্মসন্নিধিমাত্রে অবয়ব-স্পন্দন করেন, তেমনি জীবন্মুক্ত পুরুষ-প্রধানগণও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তোমার পরম ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে; তাই তুমি বাসনাবিহীন হইয়াছ।

এখন তুমি আত্মস্থিত বুদ্ধির সাহায্যে অর্দ্ধ সুপ্ত লোকের ন্যায় এই জাগতী স্থিতি অবলোকন করিতে থাক। পরমাত্মায় যাঁহাদের চিত্ত লীন থাকে, তাঁহারা বাহিরের রম্য বিষয়বিশেষে অনুরক্ত হন না এবং যত দুঃখই উপস্থিত হউক, তাহাতে তাঁহারা উদ্বেগ ভোগ করেন না। তাঁহাদের নিকট আত্মাই পরম বস্তু; একমাত্র তাহাতেই তাঁহারা রসায়নবৎ মধুর সুখ অনুভব করিতে থাকেন। মুকুর যেমন অনিচ্ছা সত্ত্বেও যথাপ্রাপ্ত প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তেমনি নিত্য-প্রবুদ্ধ জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গ অনাসক্তভাবে যথাপ্রাপ্ত কার্য্য সকল সমাধা করিয়া থাকেন। বলা বাহুল্য, তাঁহারা ইচ্ছা বা আগ্রহ করিয়া কোন কার্য্যে যত্ন প্রকাশ করেন না। যাঁহাদের আত্মতত্ত্ব জাগ্রত হইয়াছে, তাঁহারা স্বস্থ হইয়া সংসার-ব্যাপারে সুপ্তভাবেই অবস্থান করেন এবং সুষুপ্ত জনের ন্যায় আশয়সম্পন্ন হইয়া বালকবৎ ব্যবহার-পরায়ণ হন।

হে উচ্চাশয়! অন্তরে তুমি পরমাত্মপদ প্রাপ্ত হইয়াছ। এক্ষণে ব্রহ্মার একটী দিন মাত্র তুমি এই পাতালতলে থাকিয়া নানাগুণময়ী রাজলক্ষ্মী ভোগ কর,—করিয়া যে পদের আর বিচ্যুতি নাই, এ হেন বিদেহ-কৈবল্য-নামক পরম পদ তুমি লাভ কর।

চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৪০ ॥

একচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যিনি জগৎরূপ রত্নরাশির সম্পুটক এবং এই ত্রিলোকরূপ অদ্ভুত বস্তুর যিনিই একমাত্র প্রদর্শক, সেই পদ্মনাভ ভগবান্ জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ শীতল বাক্য-বিন্যাসে এইরূপ কথা কহিলে, প্রহ্লাদ তখন নয়ন-নীরজ-যুগল উন্মীলিত করিয়া মনন-ক্রম গ্রহণপূর্ব্বক ধীরভাবে প্রহর্ষভরে বলিলেন,—হে দেব! আমি রাজকীয় প্রভৃত কার্য্য এবং সেই সেই কার্য্য-সংক্রান্ত হিতাহিত-বিচারণায় একান্ত শ্রান্ত হইয়া

ক্ষণকালের জন্য বিশ্রাম লইয়াছি। হে ভগবন্! আপনার প্রসাদে আমার সম্যক্ স্বরূপ-স্থিতি ঘটিয়াছে। সম্প্রতি আমি কি সমাধি, কি অসমাধি, উভয় অবস্থায়ই সতত সমভাবে অবস্থিত রহিয়াছি। হে মহাদেব! আমি বিমল বুদ্ধিযোগে চিরতরে অন্তরে আপনাকে দেখিয়াছি। এক্ষণে আমার আরও সৌভাগ্য এই যে, আপনি বাহ্যদৃষ্টিতেও আমার দৃষ্টিগোচর হইলেন। হে মহেশ! আকাশ যেমন অসীম-অনন্ত-স্বচ্ছ আকাশেই অবস্থিত, আমিও তেমনি আপনা হইতেই এই সর্ব্বসঙ্কল্প-বিরহিত অনন্ত পরম স্বরূপ-দৃষ্টিতে অবস্থান করিয়াছি। আমি সমাধি অবলম্বন করিয়াছি বটে; কিন্তু না শোক, না মোহ, না বৈরাগ্যচিন্তা, না দেহত্যাগ, না সংসারভয়, এ সকলের কোন কিছুর নিমিত্তই করি নাই। কেবল একই যখন বিদ্যমান, তখন কোথায় শোক? কোথায় ক্ষতি? কোথায় সংসার? কোথায় স্থিতি? আর কোথায়ই বা ভয়াভয়? আমার দেহ-ত্যাগাদি অভিসন্ধি কিছুই ছিল না, আমি স্বয়ং সমুৎপন্ন সাধু ইচ্ছায় প্রেরিত হইয়া আপনা হইতেই এই বিতত পূত পদে অবস্থান করিয়াছি। হে ঈশ! 'আহা! আমি সংসারে বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছি, এ সংসার আমি পরিত্যাগ করিব', এতাদৃশ হর্ষ-শোক-বিকারজননী ভাবনা—যাহারা অপ্রবুদ্ধ ব্যক্তি, তাহাদেরই জন্মিয়া থাকে। 'দেহ থাকিলেই দুঃখ, দেহের অভাবেই দুঃখাভাব' এবম্বিধ চিন্তারূপিণী বিষধরী কালসর্পী মূর্খদিগকেই প্রতিনিয়ত দংশন করিতে থাকে। 'ইহা আমার দুঃখ, ইহা আমার সুখ, ইহা আমার আছে, ইহা আমারা নাই' এবম্বিধ দোলায়িত চিত্ত মূর্খলোককেই অস্থির করিয়া তুলে; পরন্তু বিবেকী জনকে একটুকুও টলাইতে পারে না। 'আমি এক জন, এই জন আমা হইতে অন্য' এবম্বিধ বাসনার উৎকর্ষ আত্মবুদ্ধি-বিহীন অজ্ঞ জীবদিগেরই হইয়া থাকে। 'ইহা গ্রাহ্য, আর ইহা ত্যাজ্য' এতাদৃশ অসত্য মনোভ্রম কুবুদ্ধি-সম্পন্ন অজ্ঞদিগকে যেরূপ উন্মাদ করিয়া তুলে, যাঁহারা প্রাজ্ঞ জন, তাঁহাদিগকে সেরূপ করিতে পারে না। হে পুণ্ডরীকাক্ষ! তুমিই বিতত সর্ব্বস্বরূপ আত্মা; তুমি বিদ্যমানে 'ইহা হেয় আর ইহা উপাদেয়' এবম্বিধ দ্বিতীয় কল্পনার আবির্ভাব কোথা হইতে হইবে? এই যে সৎ ও অসদাকারে সমুদিত সমগ্র জগৎ-দেখা যাইতেছে, ইহা আত্ম-

চৈতন্যের আভাস ব্যতীত অপর কিছুই নহে; ইহাতে এমন কি হেয় বা উপাদেয় আছে, যাহা ত্যাজ্য বা গ্রাহ্য হইতে পারে? আমি কেবল স্বীয় স্বভাবেই দ্রষ্টৃদৃশ্যের বিচার করিয়াছি,—করিয়া পরমাত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া ক্ষণমাত্র আত্মায় বিশ্রাম লাভ করিয়াছি। ভাবাভাব হইতে নির্ম্মুক্ত এবং হেয়-উপাদেয়-বুদ্ধি-বিরহিত হইয়া এতকাল আমি অবস্থিত ছিলাম; ইদানীং ভবদীয় নিদেশে ঈদৃশভাবে অবস্থান করিতেছি। আমি অধুনা স্ব-স্বভাব-প্রাপ্ত আত্মরূপে অবস্থিত হইয়াছি। হে মহাদেব! এক্ষণে ভবদীয় আদেশই আমার শিরোধার্য্য এবং আপনার যাহা রুচিকর, তাহাই আমার কর্ত্তব্য। হে কমলাক্ষ! আপনি ত্রিজগতের পূজনীয়; সুতরাং অধুনা আপনাকে আমার নিকট হইতেও নিয়তি-নির্দ্দিষ্ট পূজা গ্রহণ করিতে হইবে।

দানবাধিপতি প্রহ্লাদ এই কথা কহিয়া ক্ষীরাব্ধিশায়ী ভগবানের অগ্রভাগে অর্ঘ্যপাত্র উপনীত করিলেন, মনে হইল উদয়াদ্রি যেন পূর্ণ সুধাকরকে নীলাম্বুদ প্রান্তে উপস্থাপিত করিলেন। অনন্তর প্রহ্লাদ সুরগণ, অপ্সরোগণ ও সমগ্র ত্রিভুবনের সহিত সম্মুখস্থ সায়ুধ সবাহন গোবিন্দকে অর্চ্চনা করিলেন। যাঁহার বাহিরে এবং অভ্যন্তরে কত অনন্ত ভুবন ভ্রমণ করিতেছে, সেই ভুবনপতিকে পূজা করিয়া প্রহ্লাদ অবস্থান করিলে ভগবান্ কমলাপতি তাঁহাকে বলিলেন,—হে দানবেন্দ্র! তুমি গাত্রোত্থান কর,—করিয়া সিংহাসনে সমাসীন হও। আমি নিজেই তোমার অভিষেক-ক্রিয়া সমাধা করিতেছি। আমার পাঞ্চজন্য-শঙ্খের শব্দ শুনিয়া এই যে সকল সিদ্ধ, সাধ্য ও সুরবর্গ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, ইহাঁরা সকলেই তোমার মঙ্গল বিধান করুন।

কমলাক্ষ হরি এই কথা কহিয়া সেই দানবেন্দ্র প্রহ্লাদকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেম। তখন মনে হইল, সুমেরুশিখরে যেন জলধর যোজিত হইল। অনন্তর হরির আহ্বানে ক্ষীরাব্ধিপ্রভৃতি মহাব্ধিবৃন্দ, গঙ্গাদি সরিৎসমূহ, ত্রিভুবনস্থ সমস্ত তীর্থবারি, সমুদায় বিপ্রর্ষি, সমগ্র সিদ্ধ-সম্প্রদায় এবং নিখিল বিদ্যাধর ও লোকপালগণ আগমন করিলেন। অমেয়াত্মা হরি তাঁহাদের সহিত একযোগে মহাসুর প্রহ্লাদকে দৈত্যরাজ্যে

অভিষিক্ত করিলেন। পূর্ব্বে সুরগণ যেমন হরিকে স্বর্গধামে স্তব করিয়াছিলেন, তেমনি প্রহ্লাদকে তখন সুরাসুরগণ স্তব করিতে লাগিলেন। প্রহ্লাদ অভিষিক্ত হইবার পর সুরাসুরগণ কর্তৃক স্তূয়মান মধুসূদন তাঁহাকে এই কথা কহিলেন।

ভগবান্ কহিলেন,—হে নিষ্পাপ! যতদিন সুমেরুগিরি, যতকাল এই ধরিত্রী এবং যাবৎপর্য্যন্ত ঐ চন্দ্র ও অর্কমণ্ডল বিদ্যমান রহিবে, ততকাল যাবৎ তুমি অখণ্ডিত গুণগৌরবে শ্লাঘা-সম্পন্ন হইয়া রাজত্ব করিতে থাক; বুদ্ধি তোমার সমদর্শিনী; তুমি সেই বুদ্ধি-বলে ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট ফল পরিহার কর,—করিয়া বিষয়ানুরাগ বিসর্জ্জিয়া,—ভয় ও ক্রোধবিহীন হইয়া এই পাতালরাজ্য পালন কর। তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আনন্দভূমি ব্রহ্মপদ দেখিতে পাইয়াছ; দেখিও,—যেন এই ভোগময় রাজ্যে তুমি অনুরাগরূপ উদ্বেগ ভোগ করিও না। আর এক কথা, তোমার পিতৃপুরুষেরা যেমন স্বর্গ ও মর্ত্ত্য লোকের উদ্বেগ উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, দেখিও,—তোমা হইতে যেন সেরূপ কিছুই হয় না। অর্থাৎ তোমার রাজত্বে স্বর্গ, মর্ত্ত্য, উভয় লোকই যেন নিরুদ্বেগে শান্তিতে অবস্থান করে। কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা নিগ্রহাদি যে কিছু অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যই উপস্থিত হউক, দেশ, কাল ও ক্রিয়ার অনুসরণ করিয়া তৎসমস্তই যথাযথ সম্পাদন করিবে। দেখিও, বিষয়রাগাদি বৈষম্য যেন তোমায় আসিয়া অধিকার করে না; তুমি সর্ব্বথা তাহা দূরে পরিহার করিয়া থাকিবে। সর্ব্বত্র সমভাবে অবস্থান করাই তোমার কর্ত্তব্য। অতিদেহতা বা দেহাতিরিক্ত আত্মভাব নিবন্ধন্ তুমি যদি মমতা বা অমমতা পরিত্যাগপূর্ব্বক লাভালাভ বিষয়ে সমভাবে কার্য্য করিয়া যাও, তাহা হইলে আর বিষয়রাগ তোমায় বাধিত করিতে পারিবে না। এ সংসারের গতি কি, তাহা তুমি সকলই দেখিয়াছ; অতুল ব্রহ্মপদ তোমার লব্ধ হইয়াছে, সর্ব্বত্র সকল বিষয়ই তুমি জানিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দিবার আর বিশেষ কিছুই নাই। তুমি রাজা,—রাগ, ভয় ও ক্রোধহীন হইয়া বিরাজমান রহিলে এখন হইতে আর কোন দুঃখ-দুর্গ্রন্থিই অসুরদিগকে দলিত করিতে পারিবে না। বর্ষাকালের উন্মাদিনী তটিনী যেমন জলোচ্ছাসের সঙ্গে সঙ্গে তরঙ্গভঙ্গিমায় ধাবিত হইয়া স্বীয়

তীরগত বনরাজি প্লাবিত করিয়া ফেলে, তেমনি এখন আর অশ্রুবারিধারা অসুরবনিতাগণের কর্ণ-মঞ্জরী প্লাবিত করিবে না, অর্থাৎ তোমার রাজ্যশাসনে অবলাগণ ভয় ও শোকহীন হইয়া সুখেই অবস্থান করিবে। মন্থনের পর মন্দর উত্তোলিত হইলে সাগর যেমন প্রশান্তভাব ধারণ করিয়াছিল, অদ্য হইতে দেব-দানবদিগের মহাসংগ্রাম নিবৃত্ত হইল বলিয়া এই জগৎও তেমনি স্বাস্থ্য ও শান্তি লাভ করিল। সুর ও অসুরবর্গের কুটুম্বিনীগণ অধুনা স্ব স্ব ভর্ত্তার অন্তঃপুরে বিশ্বস্তভাবে অবাধে কালাতিপাত করিতে থাকুন।

হে দনুনন্দন! তুমি কৃষ্ণপক্ষীয় নৈশ তিমিরবৎ প্রগাঢ় অজ্ঞান-তমঃ নিরাস করিয়া সদা স্বপ্রকাশ ব্রহ্মাত্মভাবে স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইয়া থাক। এই ভাবে থাকিয়া দাবন-কামিনীগণের বিলাস-রম্য রিপুগণ কর্ত্তৃক অজেয় রাজ্যলক্ষ্মী উপভোগ কর; অথবা ব্রহ্মাত্মভাবে দেদীপ্যমান হইয়া সেবনীয় শান্তি-ক্ষান্তি প্রভৃতির বিলাস-রমণীয় ও কামাদি ষড়্‌রিপুর অনাক্রমণীয় রাজ্য-সম্পদ্ ভোগ করিতে থাক।

একচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪১ ॥

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পুণ্ডরীকাক্ষ হরি প্রহ্লাদকে এই সকল কথা কহিয়া সুর-নর-কিন্নরগণ সমভিব্যাহারে সেই অসুরমন্দির হইতে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার অন্তর্দ্ধানে মনে হইল যেন অপর আর একটা সংসার চলিয়া গেল। হরি স্বীয় বাহনে গরুড়ে আরোহণ করিলেন। প্রহ্লাদপ্রমুখ দৈত্যগণ পশ্চাৎ হইতে রাশি রাশি পুষ্পাঞ্জলি তাঁহার প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। পক্ষিপতির পশ্চাদুৎক্ষিপ্ত পুচ্ছপক্ষে এবং প্রহ্লাদপ্রক্ষিপ্ত পুষ্পপুঞ্জে হরির দেহ আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্রমশ তিনি ক্ষীরার্ণবে উপস্থিত হইয়া সুরবাহিনীকে বিদায় দিলেন এবং নিজে ফণি-ফণাসনে অবস্থান

করিলেন। তাঁহার সেই অবস্থান যেন শ্বেত পদ্মের উপর ষট্পদের সমাবেশ বলিয়া বোধ হইল। তখন বিষ্ণু ভুজঙ্গের ভোগাসনে; অমরগণসহ অমরেন্দ্র স্বর্গধামে এবং দানবেন্দ্র প্রহ্লাদ পাতালরাজ্যে বিগতজ্বর হইয়া অবস্থান করিলেন।

রামচন্দ্র! তোমার নিকট প্রহ্লাদের এই বোধপ্রাপ্তি-বার্ত্তা কীর্ত্তন করিলাম। ইহা নিখিল দুরিতদারিণী ও সুধাংশুবিম্বের গলিত সুধারসবৎ শীতল সুখদায়িনী। সদ্বুদ্ধি অবলম্বন করিয়া জগতীতলে যে সকল লোক প্রহ্লাদের এই তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্তির বৃত্তান্ত বিচার করিবে, তাহারা প্রভূত পাপাচরণ করিলেও অচিরে সেই তত্ত্বপদ অধিগত হইতে পারিবে। সামান্য মাত্র বিচার আলোচনা করিলেও যখন দুষ্কৃত ক্ষয় সংঘটিত হয়, তখন এই বাক্য ত যোগবাক্য!—ইহার বিচারণায় কাহার না পরপদ প্রাপ্তি হইবে? পাপ কি? অজ্ঞানকেই পাপ বলা হয়। বিচার দ্বারাই এই পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যাহাতে পাপের মূলোচ্ছেদ হয়, তাদৃশ বিচার কখনই পরিত্যাজ্য নয়। যাহারা প্রহ্লাদের এই সংসিদ্ধি-বার্ত্তা বিচার করিয়া দেখে, তাহাদের সপ্তজন্মার্জ্জিত দুষ্কৃতিরাশি নিশ্চয়ই ক্ষয় পাইয়া যায়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! মহাত্মা প্রহ্লাদের মন পরমপদে পরিণত হইয়াছিল; হরির পাঞ্চজন্য শঙ্খ-শব্দে কিরূপে তাহা প্রবুদ্ধ হইল? আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে পবিত্রমূর্ত্তে! ইহ সংসারে মুক্তি দ্বিবিধ নামে নির্দ্দিষ্ট; এক—সদেহ মুক্তি, অপর—বিদেহ মুক্তি। এক্ষণে উক্ত উভয়বিধ মুক্তির বিভাগ প্রকার বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। যাঁহার বুদ্ধি বিষয়ে আসক্ত নহে এবং যিনি অনিষ্ট কর্ম্ম ত্যাগ করিতে বা ইষ্ট কর্ম্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, জানিবে,—তথাবিধ ব্যক্তির স্থিতিই জীবন্মুক্তা। অর্থাৎ তিনিই জীবন্মুক্ত পুরুষ। হে রাম! ভোগদ্বারা দেহ ক্ষয়ে যাঁহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, তাঁহার সেই অবস্থাই বিদেহ-মুক্ততা; এই বিদেহমুক্ত মহাপুরুষগণ কখন কাহারও দৃষ্টিগোচর হন না। যাঁহারা জীবন্মুক্ত ব্যক্তি, তাঁহাদের অন্তরে পুনর্জ্জন্মরূপ অঙ্কুরহীন ভর্জ্জিত

বীজবৎ বিশুদ্ধ বাসনা বিদ্যমান থাকে। ঐ বাসনা পাবনী, অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মভাবনায় পবিত্রা; উহাতে তৃষ্ণাকার্পণ্য নাই। উহা বিশুদ্ধ সত্তার অনুগামিনী ও আত্মধ্যানময়ী। সুষুপ্ত ব্যক্তির বাসনার ন্যায় ঐ বাসনা নিত্য বিদ্যমানা। হে রঘুনাথ! সহস্র বর্ষ অতীত হইলেও যদি দেহের অস্তিত্ব থাকে, তাহা হইলেও ঐ অন্তরবস্থিত বাসনাবশেই জীবন্মুক্ত জন প্রবুদ্ধ হইয়া থাকেন। প্রহ্লাদের অন্তরে শুদ্ধসত্তাময়ী তদীয় স্বীয় বাসনা অবস্থিত ছিল; তাই যখন শঙ্খশব্দ হইল, অমনি উহা অববুদ্ধ হওয়ায় প্রহ্লাদও বোধপ্রাপ্ত হইলেন। বলিতে পার, প্রহ্লাদের শ্রোত্র লীন ছিল; তাহাতে শঙ্খশব্দ-গ্রহণের যোগ্যতা ছিল না; সুতরাং কি করিয়া তাবন্মাত্রেই তাহার বোধোদয় হইল? উত্তরে বক্তব্য,—হরি,—সর্ব্বভূতের আত্মা; তাঁহাতে যাহা প্রতিভাসিত হয়, সত্বর তাহা তদাকারেই পরিণত হইয়া থাকে। কেন না, আত্মাই সর্ব্বকারণ; কাজেই সেই বাসুদেব যখনই চিন্তা করিলেন যে, প্রহ্লাদ বোধ প্রাপ্ত হউক, অমনি নিমেষ মধ্যে তাঁহার সে চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইল। প্রহ্লাদের বোধ সঞ্চার ঘটিল। বাসুদেব কে? তিনি স্বয়ং শুদ্ধাত্মা অথচ ভূতগণের কারণস্বরূপ; তিনি আত্মাতেই জগৎ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত বাসুদেবময় আত্মাকারে শরীর মাত্র পরিগ্রহ করিয়াছেন। যিনি আত্মাবলোকনে সক্ষম হন, তিনি ঐ বাসুদেব মাধবকেই সত্বর সন্দর্শন করেন। মাধবের আরাধনায় স্বয়ং আত্মাই সত্বর অবলোকিত হইয়া থাকেন।

হে রাঘব! তুমি এই তত্ত্বদৃষ্টি অবলম্বন কর,—করিয়া আত্মাবলোকনে যত্নপরায়ণ হও। এইরূপ তত্ত্ববিচারে তন্ময় হইলেই সত্বর তুমি শাশ্বত-পদ লাভ করিতে পারিবে। রামচন্দ্র! এই বিচার-বিভাকরের বদন যত দিনে না দর্শনগোচর হয়, ততদিনই এই দারুণ দুঃখধারা-বর্ষিণী সংসার-বর্ষা মানবদিগের জড়তা উৎপাদন করে। পিশাচিকা যেমন মন্ত্র-সিদ্ধ ব্যক্তিকে আক্রমণ করিতে পারে না, তেমনি বিষ্ণুস্বরূপ আত্মার অনুগ্রহগুণে বিচার-নিরত ধীর জনগণকে এই অতিমহতী সংসারমায়া কদাচ কোন বাধা প্রদান করিতে পারে না।

হে রাম! যেমন বায়ু বহিতে থাকিলে বহ্নিশিখা কখন কখন প্রজ্বলিত

হইয়া উঠে, আবার বায়ুবশেই কখন বা ক্ষীণদশায় উপনীত হয়, তেমনি এই যে সংসার-রচনারূপিণী বৈষ্ণবী মায়া, ইহা সেই বিষ্ণুস্বরূপ আত্মার ইচ্ছাক্রমেই কখন কখন ঘনীভূত অর্থাৎ দেহাদি অনর্থভাব প্রাপ্ত হয়, আবার তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে বিবেক-বিচারাদির আবির্ভাবে কখন বা হ্রাস প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব জানিবে,—ঐশী প্রসন্নতা-জনিত বিচারাদি-বলে অবশ্যই জ্ঞানলাভ ঘটে, ইহাই সদুক্তির ফলিতার্থ।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪২ ॥

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্, সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ! সুধাংশুর অংশুপাতে ওষধিপুঞ্জ যেমন উৎফুল্ল হইয়া উঠে, আমিও তেমনি ভবদীয় বিশুদ্ধ বচন শ্রবণে পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলাম। আপনার বচনাবলী শ্রবণ-লোভনীয়, পবিত্র ও কোমল। উহা পুষ্পগুচ্ছের ন্যায় কর্ণযুগলে গৃহীত হইয়া একান্তই সুখ সম্পাদন করিল। পরন্তু অধুনা আমার আর একটী বিষয় জিজ্ঞাস্য আছে। আপনার উপদেশ-বচনে শুনিয়াছি যে, একমাত্র পৌরুষপ্রযত্নে সমস্তই লাভ করা যায়; বস্তুতঃ এই কথা যদি অভ্রান্তই হয়, তাহা হইলে প্রহ্লাদ মাধবের নিকট বর লাভ না করিয়া স্বীয় পুরুষকার-বলেই প্রবুদ্ধ হইলেন না কেন?

বশিষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে রাঘব! মহাত্মা প্রহ্লাদ যাহা যাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তৎসমস্ত তদীয় পৌরুষবলেই লব্ধ হইয়াছিল, অন্য কোন উপায়ে লব্ধ হয় নাই। যেমন তিল ও তিলগত তৈল, পট ও পটগত শুক্লতা এবং কুসুম ও কুসুম-সৌরভ অভিন্ন, তেমনি আত্মা ও নারায়ণ এ উভয়ই ভিন্ন নহে; অর্থাৎ একই। যিনি বিষ্ণু তিনিই আত্মা এবং যিনি আত্মা, তিনিই জনার্দ্দন। যেমন বিটপী ও পাদপ, তেমনি আত্মা ও বিষ্ণু উভয়ই একপর্য্যায়ক। ঐ আত্মা অগ্রে নিজেই নিজের পরম শক্তিবলে প্রহ্লাদাখ্য আত্মাকে বিষ্ণুভক্তপদে নিযোজিত করেন।

প্রহ্লাদ আত্মা দ্বারাই আত্মভূত বিষ্ণুর বর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি নিজেই নিজের মর্নকে বিচারে নিরত করেন,—করিয়া নিজেই জ্ঞান প্রাপ্ত হন। কখন কখন আত্মা বিনি,—তিনি নিজে নিজেই স্বীয় শক্তিবলে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠেন। কখন কখন ভক্তিলভ্য বিষ্ণু-দেহে প্রবোধিত হইয়া থাকেন। ঐ মাধব পরম প্রীত হউন, কিম্বা চির আরাধিতই হউন, যাহার বিচারক্ষমতা নাই, তাহাকে উনি জ্ঞান দান করিতে কখনই সক্ষম নহেন। একমাত্র পুরুষকারের সহায়তায় যে তত্ত্ববিচার উদ্ভূত হয়, তাহাই আত্ম-সাক্ষাৎকারের প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া গণ্য হয়। বর-লাভাদি উপায়—গৌণ উপায়। অতএব তোমায় বলি,—তুমি মুখ্য উপায় অবলম্বনেই তৎ-পর হও। এই মুখ্য উপায় অবলম্বন করিতে হইলে প্রথমে তুমি সবলে তোমার ইন্দ্রিয়পঞ্চক নিগৃহীত ও বশীভূত করিতে অভ্যাস কর; এই বশীকরণ-কার্য্যে যে কিছু চেষ্টা,—যে কিছু যত্নের প্রয়োজন, তাহা সর্ব্বথা নিয়োজিত করিয়া তোমার চিত্তকে তুমি বিচারবান্ করিয়া লও। লোকে যেখানে গিয়া যাহাই কিছু লাভ করুক, তৎসকলই স্ব স্ব শক্তিবলেই লভ্য হয়; স্বশক্তি ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে কোথাও কিছুই লভ্য হইবার নহে। সুতরাং পৌরুষ প্রযত্ন অবলম্বন কর,—করিয়া ইন্দ্রিয়-পর্ব্বত লঙ্ঘন কর; অনন্তর সংসার-সাগরের পর-পারে যাও,—যাইয়া পরম পদ প্রাপ্ত হও। পৌরুষ প্রযত্ন ব্যতীত যদি সেই জনার্দ্দনের সাক্ষাৎকার ঘটিত, তাহা হইলে পশুপক্ষীদিগের অপরাধ কি? তাহা-দিগকে তিনি এতদিন উদ্ধার করিতেছেন না কেন? বলিবে,—শিষ্যের কোন যত্ন করিবার আবশ্যক নাই; গুরু আছেন, তিনিই উদ্ধার করিয়া দিবেন? উত্তরে বক্তব্য এই যে, গুরু যদি পুরুষকারহীন অজ্ঞ শিষ্যকেও উদ্ধার করেন, তাহা হইলে আপনার বশীভূত উষ্ট্র কিম্বা বলীবর্দ্দকেও তো তিনি উদ্ধার করিতে পারেন। হরি হইতে, গুরু হইতে বা অর্থ হইতে মহৎ পদ প্রাপ্তি হয় না, যদি আপনার পৌরুষ চেষ্টায় মনকে বশীভূত করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আপনা হইতেই সেই মহৎ পদ লব্ধ হইতে পারে। বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া,—পুনঃপুন অভ্যাসযোগে ইন্দ্রিয়-ভুজঙ্গকে বশে আনিয়া আত্মা যাহা প্রাপ্ত হইতে না পারেন, এ ত্রিভুবনের কোথাও

কোনরূপে তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব তুমি আত্মা দ্বারা আত্মাকে আরাধনা কর, আত্মা দ্বারা আত্মার অর্চ্চনা কর; এবং আত্মা দ্বারা আত্মাকে অবলোকন কর। এইরূপ করিতে করিতে স্বীয় আত্মা দ্বারা আত্মাতেই অবস্থান করিতে থাক; কদাচ আত্মভাব হইতে বিচ্যুত হইও না। বলিতে পার, স্বীয় প্রযত্ন-জনিত বিশিষ্ট বিচার হইতেই যদি জ্ঞানোদয় হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রবাক্যে বিষ্ণুপ্রভৃতির প্রতি ভক্তি নিহিত করিবার যে বিধিনির্দ্দেশ আছে, সেরূপ বিধি-নির্দ্দেশের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, যাহারা সম্যক্ শাস্ত্রালোচনা করে না, রীতিমত চেষ্টা যাহাদের নাই এবং যাহারা তত্ত্ববিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া থাকে, তথাবিধ মূর্খদিগের প্রবৃত্তি যে কোনরূপে শুভপথে পরিচালিত করিবার নিমিত্তই বৈষ্ণবী ভক্তি কল্পনা করিবার প্রয়োজন হইয়াছে। অভ্যাস এবং যত্ন এই দুইটীই মুখ্য বিধি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অক্ষমতানিবন্ধন অভ্যাস ও যত্নের অভাব হইলে পূজ্য-পূজক ভাব গৌণ কল্পরূপে গণ্য হয়। অর্থাৎ বিষ্ণুকে পূজা করা, বিষ্ণুর প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া, ইত্যাদি গৌণ বিধিমধ্যেই গণনীয়। যদি ইন্দ্রিয়বর্গ বশীভূত হয়, তাহা হইলে আর পূজার প্রয়োজন কি? অন্য দিকে ইন্দ্রিয়বর্গ অজিত ও উচ্ছৃঙ্খল রহিল, সেই অবস্থায়ই পূজা করিতে থাকিলাম; এরূপ পূজায়ও অবশ্য কোনই ফল নাই। পূর্ণানন্দ-স্বরূপ হরিকে পাইতে হইলে বিচার এবং উপশম এই দুইটী উপায়েরই প্রয়োজন। ঐ দুই উপায়ের অভাবে তাঁহাকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যাহার বিচার নাই, উপশম নাই, তথাবিধ বিষয়াসক্ত ব্যক্তির হিতবিধান-কর্ত্তা,—স্বয়ং বিধাতাও হইতে পারেন না। তুমি তোমার চিত্তকে বিচার ও উপশমপদে উপনীত কর,—করিয়া আরাধনায় নিরত হও; দেখিবে,—উহা সিদ্ধ হইলে তুমিও সিদ্ধ হইবে অর্থাৎ পরম পুরুষার্থরূপিণী সিদ্ধি লাভ করিবে, আর তাহা না হইলে তুমি বনগর্দ্দভমধ্যেই গণ্য হইয়া রহিবে। মাধবাদি দেবসমীপে প্রণয়-প্রার্থনা করা হয়, কিন্তু সেই প্রার্থনা নিজের চিত্তের নিকটই করা হয় না কেন? বিষ্ণু সকল লোকের হৃদভ্য-ন্তরেই বিরাজমান। তিনি অন্তরে থাকিতে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যাহারা বহিঃস্থ বিষ্ণুর সেবা করিতে যায়, কি বলিব?—তাহারা নরাধম নামে-

রই যোগ্য। হৃদয়কন্দরের অভ্যন্তরে যে সনাতন আত্মচৈতন্য-তত্ত্বের বাস, সেই তত্ত্বই আত্মার মুখ্য দেহ। তবে যে শঙ্খ-চক্র-গদাধারী দেহ, তাহা তাঁহার গৌণ দেহমধ্যেই গণ্য। যে ব্যক্তি মুখ্য পরিত্যাগ করিয়া গৌণের অন্বেষণ করে, নিশ্চয়ই বলিব,—সে সিদ্ধ রসায়ন পরিহার করিয়া যাহা সাধ্য, তাহারই সাধনায় প্রবৃত্ত হয়। কে তবে বাহ্য বিষ্ণুভক্তির অধিকারী? তৎপক্ষে বক্তব্য এই যে, যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব-চমৎকারে স্থিতি লাভে অক্ষম, যাহার মন মোহপঙ্কেই নিমগ্ন, যাহাতে কিছু মাত্র আত্ম-বিবেক স্থান প্রাপ্ত হয় নাই, যাহার অজ্ঞানান্ধ চিত্ত নিজের বশে থাকে না, বরং সে নিজেই সেই অজ্ঞ চিত্তের বশীভূত, তথাভূত বিবশ-চেতা ব্যক্তিরই সেই শঙ্খ-চক্র-গদাধর পরমেশ্বর পরম অর্চ্চনীয়। অর্থাৎ তত্ত্ব-বিচারের অনধিকারী লোকেরাই আত্মার গৌণমূর্ত্তি,—শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুর ভক্ত হয়,—তাঁহাকে অর্চ্চনা করিতে থাকে।

হে রাঘব! এইরূপে বিষ্ণুপূজনে ফল যে একেবারে নাই, তাহা নহে। বিষ্ণুর বহিঃস্থ মূর্ত্তির পূজনরূপ উৎকট তপস্যায় ক্রমে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়; সেই বৈরাগ্য অভ্যাসের ফলে কালবশে চিত্ত নির্ম্মল হইয়া উঠে। নিত্য নিত্য পূজাভ্যাস ও বিবেকবলে চিত্ত অবশ্যই প্রসন্ন হয়। দেখ, আম্রবৃক্ষই ধীরে ধীরে সৌরভে, মুকুলে ও ফলে ফুলে সহকারদশা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অর্থাৎ আম্র যেমন ক্রমশ সহকারদশায় উপনীত হয়, পূজার্চ্চনায় ক্রমে বিবেক অভ্যাস হইলে চিত্তও নিশ্চয়ই নির্ম্মল হইয়া থাকে।

হে অরিন্দম! শাস্ত্রে যে হরির পূজাক্রম নামক নিমিত্ত হইতে ফলপ্রাপ্তির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে, ঐ ফলও আত্মাই আত্মা দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যে ব্যক্তি অমিতপ্রভাব বিষ্ণুর নিকট হইতে বর প্রাপ্ত হয়, জানিবে,—সে তাহার অভ্যাস-বৃক্ষেরই ফল লাভ করে। নিজ মনের নিগ্রহ করিয়া তাহাকে বশীভূত করিলে সকল সম্পদের অধিকারী হওয়া যায়। যেমন ভূতল,—সকল শস্য-সম্পদের আস্পদ, তেমনি নিজ মনের নিগ্রহই,—সর্ব্ববিধ উত্তম পদ ও সর্ব্ববিধ অনপায়িনী সম্পৎ-সমূহের আধার। যে সকল লোক মহীখননে সমুৎসুক, বা যাহারা অচল আকর্ষণে উদ্যত, তাহাদেরও মনের নিগ্রহ ব্যতীত কার্য্যসাধনের উপায়ান্তর নাই। পূর্ব্বে

সগরনন্দনেরা পৃথ্বী খনন করিয়া পাতালে প্রবিস্ট হইয়াছিল এবং সুরাসুরগণ নিধিরত্ন-লাভের জন্য জলধিজলে মন্দরাচল কর্ষণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলেরই স্ব স্ব কার্য্যের সাধনবিষয়ে মনের একাগ্রতা ব্যতীত উপায়ান্তর ছিল না। ফল কথা, মনের একাগ্রতা ভিন্ন কোন মহাকার্য্যই সিদ্ধ হইবার নহে। মনোরূপ মত্ত মহার্ণব যত দিন না উপশম প্রাপ্ত হয়, ততকাল পর্য্যন্ত মানবেরা সহস্র সহস্র জন্ম এ ভুবনে ভ্রমণ করিতে থাকে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র ও রুদ্রপ্রমুখ দেবেন্দ্রগণ পূজিত হইয়া যদি একান্ত করুণাপরবশও হন, তথাপি তাঁহারা মানবদিগকে তাহাদিগের মনোব্যাধির উপপ্লব হইতে পরিত্রাণ করিতে পারেন না। বিশদার্থ এই যে, মনের নিগ্রহ সাধন আপনাকেই করিতে হয়; অপরের সাহায্যে তাহা সিদ্ধ হইবার নহে। তাই বলিতেছি,—রাম! তুমি পুনর্জ্জন্ম-জয়ের নিমিত্ত বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ-গম্য বিষয়-রূপ পরিত্যাগ কর,—করিয়া জন্মক্ষয়ের নিমিত্ত একমাত্র চৈতন্য-রূপেরই চিন্তা করিতে থাক।

রামচন্দ্র! যাহা বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিষয়জাল হইতে পরিমুক্ত, যাহা নিরাময়, যাহা নিরতিশয় আনন্দময়, যাহা অনন্ত এবং যাহা সন্মাত্র ও সর্ব্বসাররূপে বিরাজিত, তুমি সেই চৈতন্যস্বরূপের আস্বাদ লইতে থাক। এইরূপ করিলেই তুমি ভব-নদীর পরপারে উপনীত হইতে পারিবে।

ত্রিচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৪৩॥

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই সংসারনাম্নী মায়ার পর্য্যবসান নাই। অর্থাৎ ইহা অপরিমিত ভ্রান্তির নিদান। এ মায়ার উচ্ছেদ সাধন করিবার একমাত্র উপায়,—আত্মচিত্ত-জয়। আপন চিত্ত জয় করিতে পারিলেই উহার পর্য্যবসান সুনিশ্চয়; নতুবা উহাকে ক্ষয় করিবার উপায়ান্তর নাই। হে নিষ্পাপ! এই জাগতিক মায়ার বৈচিত্র্য প্রতি-

পাদনার্থ আমি তোমার নিকট এই এক ইতিহাস প্রকাশ করিতেছি, তুমি ইহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর।

এই বসুধাপৃষ্ঠে কোশল নামে এক জনপদ আছে। সেই জনপদ নানারত্নের আস্পদ। মেরু-মহীধরে যেমন কল্পতরু-কানন অবস্থিত, তেমনি ঐ জনপদে গাধি নামে জনৈক গুণগণ-মণ্ডিত বিখ্যাত ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি পরম শ্রোত্রিয়, ধীশক্তিসম্পন্ন ও সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তির ন্যায় বিরাজমান ছিলেন। শরতের আকাশ হইতে মেঘমালিন্য চলিয়া গেলে, আকাশ স্বচ্ছ হইয়া উঠে; সেই স্বচ্ছ আকাশে ভুবন যেমন ভূষিত হয়, তেমনি সেই ব্রাহ্মণের চিত্তে বাল্য হইতেই বিষয়ানুরাগ ছিল না, তিনি সেই বিষয়-বিরক্ত চিত্তে অতীব উৎকর্ষ লাভ করেন।

একদা ঐ ব্রাহ্মণ মনে মনে কোন একটী অভিমত কার্য্যের সঙ্কল্প করিয়া স্বীয় বন্ধুবান্ধবদিগের নিকট হইতে বিদায় লইয়া তপস্যা করিবার জন্য বনগমন করিলেন। তিনি তথায় গিয়া এক প্রফুল্ল কমলোদ্ভাসিত সরোবর-সমীপে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে তথায় দেখিয়া মনে হইল, তারাপতি যেন তারকা-শোভিত প্রসন্ন-নির্ম্মল অম্বরদেশে সমুদিত হইলেন। যতকালে না বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ততকাল পর্য্যন্ত সেই দ্বিজরাজ তপস্যা করিবার জন্য সেই সরোবর-সলিলে আকণ্ঠ মগ্ন হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, বর্ষার উদয়ে সরোবরে যেন একটী পদ্ম ফুটিয়া রহিল। সেই সরোবর-জলে মগ্ন হইয়া তিনি আট মাস পর্য্যন্ত তপস্যা করিলেন। অনন্তর সহবাসী সরসিজ-দলের সঙ্কুচিতভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও মুখকান্তি কিঞ্চিৎ ম্লান ভাব ধারণ করিল।

অনন্তর একদা ভগবান্ হরি ঐ তপস্তপ্ত ব্রাহ্মণের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার শুভাগমনে মনে হইল যেন বর্ষার অভ্যুদয়ে সুনীল নীরদখণ্ড আসিয়া নিদাঘ-তপ্ত বসুধাপৃষ্ঠে সমুদিত হইল।

তখন ভগবান্ সেই ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি জল মধ্য হইতে উত্থিত হও,—হইয়া অভিমত বর গ্রহণ কর। তোমার তপোবৃক্ষ অদ্য অভীষ্ট ফলে অন্বিত হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ কহিলেন,—হে বিভো! তুমি অগণিত জগদবস্থিত জীব-

নিবহের হৃদয়-কমলের অভ্যন্তরচারী, আর তুমিই বটে ত্রিভুবন-রূপিণী নলি-নীর একমাত্র নিবাস-নিলয় জলাশয় ; তুমি বিষ্ণু,—তোমায় আমি নমস্কার করি। হে ভগবন্! তুমি যে সংসার-মায়া রচনা করিয়াছ, যাহা পরমাত্মায় অধ্যস্ত হইয়াছে, আমি তোমার সেই মোহকারিণী মায়া দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছি।

বশিষ্ঠ বলিলেন,—সেই সনাতন ভগবান্ তখন ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—হে বিপ্র! তুমি মদীয় মায়া দেখিতে পাইবে এবং তদনন্তর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়াই তৎক্ষণাৎ তিনি গন্ধর্ব্বপুরের ন্যায় অন্তর্দ্ধান করিলেন। বিষ্ণু অন্তর্হিত হইলে সেই দ্বিজরাজ জলমধ্য হইতে উত্থিত হইলেন। তাঁহার কলেবর নির্ম্মল ও শীতল হইল। তিনি তখন ক্ষীরাব্ধি হইতে সদ্যঃসমুত্থিত সুধাংশুর ন্যায় সম্যক্ সুশোভিত হইতে লাগিলেন। ইন্দু-সন্দর্শনে কুমুদ যেমন প্রফুল্ল হইয়া উঠে, তেমনি সেই দ্বিজবর জগদীশ হরির সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সাতিশয় প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। হরির সন্দর্শনে তাঁহার মন অতীব আনন্দিত হইল। তিনি তখন আনন্দের সহিত ব্রাহ্মণোচিত কর্ম্ম করত সেই অরণ্যে কতিপয় দিবস যাপন করিলেন।

একদা সেই দ্বিজবর তথাকার প্রফুল্ল শতদল-সমাকুল সরসীজলে স্নান করিলেন,—করিয়া বিষ্ণুর উপদেশ মত মহর্ষির ন্যায় মানসমধ্যে বিবিধ অতীত ও অনাগত বিষয় দেখিবার জন্য চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি যখন স্নানবিধি সমাধা করিয়া সকল কলুষ-ধ্বংস-কামনায় কুশান্বিত কর দ্বারা সম্মুখস্থ জলভাগ আবর্ত্তাকারে পরিণত করত অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন সহসা তাঁহার ধ্যানমন্ত্রের বিস্মৃতি ঘটিল। তিনি যে মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করিবেন ভাবিয়াছিলেন, তাহা আর কিছুতেই মনে আসিল না ; তাঁহার জ্ঞানের গতি সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। তিনি জলমধ্যে থাকিয়াই দেখিতে লাগিলেন,—যেন তিনি নিজ নিকেতনে মরিয়াছেন!—মরিয়া বাতবেগে গুহাগর্ভ-পতিত পাদপের ন্যায় শোচনীয় দশায় উপনীত হইয়াছেন। তাঁহার সেই মৃতদেহে প্রাণ ও অপান বায়ুর গতি নিরুদ্ধ হইয়াছে ; অবয়বে স্পন্দনমাত্র নাই। উহা নির্ব্বাত দেশস্থ

বৃক্ষাদির ন্যায় নিশ্চল হইয়া পড়িয়া আছে। তাঁহার মুখমণ্ডল পাণ্ডুরাভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহা বিশুষ্ক তরুপর্ণের ন্যায় নীরস হইয়াছে এবং ছিন্ননাল কমলের ন্যায় পরিম্লান হইয়া গিয়াছে। সেই শবীভূত দেহ নয়ন দুইটী মুদ্রিত করিয়াছে; তাহাতে উহা যেন প্রভাতকালীন নক্ষত্র-হীন আকাশদেশের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। সেই ভূলুণ্ঠিত ধূলি-ধূসরিত শবদেহ যেন অনাবৃষ্টি-নষ্ট গ্রামের ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। কুরর-পক্ষিগণ যেমন চীৎকার করিতে করিতে বৃক্ষ বেষ্টনপূর্ব্বক অবস্থান করে, তদীয় বন্ধু-বান্ধবগণ তেমনি অশ্রুজল-প্লাবিত-মুখে দীনভাবে করুণ ক্রন্দন করিয়া সেই শবদেহ বেষ্টন করিয়া আছে। তাঁহার ভার্য্যা তদীয় পাদমূলে অধো-বদনে বসিয়া আছেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন সেতু ভঙ্গ হওয়ায় জলাশয়ের জল বাহিরে নিষ্কাসিত হইয়াছে, তাহাতে আকণ্ঠ জল-মগ্না নলিনী যেন হঠাৎ জলক্ষয়-নিবন্ধন নতমুখে অবস্থান করিতেছে। জননী তাঁহার নবোদ্ভিন্ন শ্মশ্রুলাঞ্ছিত চিবুক ধরিয়া কখন উচ্চস্বরে কখন বা ভ্রমরগুঞ্জনবৎ অনুচ্চ রবে বহুবিলাপ করিতেছেন। অন্যান্য আরও অনেকে তথায় উপস্থিত আছেন; তাঁহারা গলদশ্রুমুখে দীনভাবে সেই শবদেহ-পার্শ্বে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগকে তাদৃশভাবে অবস্থিত দেখিয়া মনে হইল যেন হিমবিন্দুবর্ষী শুষ্ক পর্ণরাশি বৃক্ষপার্শ্বে পড়িয়া রহিয়াছে। সংযোগ হইলেই অন্তে বিয়োগ ঘটে, এই ভয়েই যেন তদীয় অবয়বগুলি একেবারেই সংযোগ-পরিহারেচ্ছায় অনাত্মীয়ের ন্যায় দূরে দূরে সরিয়া তাঁহার সেই শবদেহকে আবৃত রাখিয়াছে। অর্থাৎ প্রাণহীন অবস্থায় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এলাইয়া ছড়াইয়া পড়িয়াছে। শবদেহের ওষ্ঠ দুইখানি পরস্পর সংলগ্ন নাই; সুতরাং সেইখান হইতে শুভ্র দশনরাজির কিরণচ্ছটা নির্গত হইতেছে। তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন ঐ শবদেহ স্বীয় জীবনকে লক্ষ্য করিয়াই হাস্য করিতেছে। ঐ নিস্পন্দ দেহের দিকে তাকাইলেই মনে হয় যেন উহা মুনির ন্যায় ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিয়াছে; অথবা উহা যেন পুনরায় প্রবুদ্ধ না হইবার নিমিত্তই চিরতরে সুপ্ত হইয়া মৃণ্ময় প্রতিমা-বিশেষের ন্যায় নিশ্চল হইয়া রহিয়াছে। বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে কাহার কিরূপ স্নেহ-মমতা আছে, তাহা বিচারালোচনা করিয়া

দেখিবার নিমিত্তই যেন ঐ শবদেহ মৌনী হইয়া সযতনে তাহাদের উচ্চ বিলাপ-কোলাহল শুনিতেছে।

অনন্তর সেই দ্বিজবর আরও দেখিতে লাগিলেন,—তাঁহার বন্ধু-বান্ধবেরা যেন অত্যন্ত শোকাবেগে ব্যাকুল হইয়াছেন; তাঁহারা মধ্যে মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িতেছেন; নেত্রগলিত জল-প্রবাহে তাঁহাদের দেহ প্লাবিত হইতেছে; তাঁহারা স্ব স্ব বক্ষে করাঘাত করিতেছেন; উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদের স্বরভঙ্গ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণ আরও দেখিলেন,—তাঁহার শবদেহ লইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া তদীয় আত্মবন্ধুগণ ক্রমে নিরুপায় হইলেন। অবশেষে তাঁহারা সেই অমঙ্গল্য শব-দেহ আর যাহাতে দৃষ্টিগোচর না হয়, এই নিমিত্ত গৃহ হইতে তাহা নিষ্কাসিত করিলেন এবং মাংস,শিরা ও বসাপঙ্কে কলঙ্কিত ভীষণ শ্মশানে লইয়া গেলেন। তিনি দেখিলেন,—সে শ্মশান অতি ভয়ঙ্কর স্থান। তাহার কোথাও কোথাও রাশি রাশি মৃতদেহ; কোন স্থান গলিত শবরাশির রসপ্রবাহে ক্লেদযুক্ত এবং কোন কোন স্থান শত শত কঙ্কালস্তূপে সঙ্কুল। শ্মশানের উপর দিয়া জলদমালার ন্যায় শত শত শকুনি গৃধিনী উড়িতেছে; তাহাদের পক্ষবিস্তারে সূর্য্যকিরণ আচ্ছন্ন হইয়াছে। প্রতিনিয়ত অগণিত চিতা প্রজ্বলিত হইতেছে, সেই সকল চিতাগ্নি-প্রভায় সেই ভীষণ শ্মশানের অন্ধকার অপাকৃত হইয়াছে। কত শত উল্কামুখী শিবাদল বিচরণ করিতেছে। তাহাদের সেই অশিব বক্ত্রবিবর হইতে বিনিঃসৃত বহ্নিশিখায় সেখানকার ভূ-ভাগ যেন পল্লবিত হইয়েছে। কত স্থানে কত রুধিরনদী বহিতেছে। সেই সকল নদীতে নিমগ্ন হইয়া কত কঙ্ক ও প্রচণ্ড বায়সদল স্নান করি-তেছে। কোন কোন স্থানে কত বৃদ্ধ শকুনি শব-মাংস ভক্ষণ করিতে গিয়াছে,—গিয়া শোণিত-সিক্ত তন্ত্রীজালে জড়াইয়া পড়িয়াছে। সমুদ্র যেমন বাড়বাগ্নিযোগে স্বীয় সলিলরাশি দগ্ধ করে, তিনি দেখিলেন,—তাঁহার বান্ধ-বেরা তেমনি সেই ভীষণ শ্মশানে চিতা প্রজ্বালিত করিয়া তদীয় শবদেহ দাহ করিতে লাগিলেন। চিতা শুষ্ক ইন্ধনে যুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইলে তাহার অগ্নিশিখাগুলি যেন জটাজালবৎ বিস্তৃত হইয়া চটচটারবে ক্ষণমধ্যেই সেই শবদেহ একরূপ দাহ করিয়া ফেলিল। করী যেমন কটকটাধ্বনি সহকারে

ক্ষণমধ্যে বংশবন দলিত করে, তেমনি সেই গগনস্পর্শী চিতানল তখন চটচটা-রবে সমগ্র শবদেহ একেবারে ভস্মীভূত করিল। পূতিগন্ধে মেঘমার্গ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত হইল। চতুর্দ্দিকে শব-শরীরের মজ্জাগত বসারস বিকীর্ণ হইল এবং অস্থিরাশি পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গেল।

চতুশ্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৪ ॥

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর সেই বিপ্রবর গাধি এই ভীষণ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া একান্ত ব্যথিত-মনে সেই জলমধ্যে থাকিয়াই পুনরপি নির্ম্মল আত্মায় আত্মা দ্বারা অবলোকন করিতে লাগিলেন। দেখিলেন,—ভূত-মণ্ডল নামে এক জনপদ আছে, সেই জনপদের প্রান্ত সীমায় এক গ্রাম; সেই গ্রামের প্রান্তে কতকগুলি চণ্ডালের বাস। ব্রাহ্মণ দেখিলেন,—তাঁহার সেই মৃত আত্মা সেই সকল চণ্ডালমধ্যস্থ কোন এক চণ্ডালপত্নীর গর্ভে গিয়া প্রবেশ করিল। তদীয় কোমলাকৃতি আত্মা সেই চণ্ডালীর গর্ভে প্রবেশ করিয়া গর্ভবাস-যাতনায় পীড়িত হইয়া যেন আপন বিষ্ঠামধ্যে পড়িয়াই আকুল হইল। যথাকালে চণ্ডালীর গর্ভ পরিণত হইলে, সে এক মল-লিপ্তাঙ্গ শ্যামবর্ণ সন্তান প্রসব করিল; বোধ হইল, বর্ষা যেন শ্যামাভ অভ্র উৎ-পাদন করিল।

এইরূপে গাধির আত্মা চণ্ডালকুলে জন্ম লইয়া চণ্ডালদিগের অতি প্রিয়-তম শিশু হইয়া যমুনার জলস্রোতের ন্যায় ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। ক্রমে সেই চণ্ডালশিশুর এক দুই করিয়া দ্বাদশ বর্ষ কাটিল; অনন্তর সেই চণ্ডালতনয় ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিল। তাহার স্কন্ধ স্থুল হইল। দেহের বর্ণ মেঘবৎ সুন্দর শ্যামল হইল। ষোড়শবর্ষীয় চণ্ডালনন্দন তখন হৃষ্ট, পুষ্ট ও বলিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সে, এই অবস্থায় কতকগুলি কুক্কুর সঙ্গে লইয়া এক বন হইতে অন্য বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

লক্ষ লক্ষ মৃগ তাহার হস্তে নিহত হইতে লাগিল। এই ভাবে সে, ঘোর ব্যাধবৃত্তি আশ্রয় করিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। অনন্তর কোন এক চণ্ডাল-দুহিতার সহিত তাহার বিবাহ হইল। তদীয় কামিনী তমালবল্লীর ন্যায় শ্যামাঙ্গিনী; তাহার স্তনযুগল কুসুমগুচ্ছের ন্যায় এবং করযুগ্ম যেন নব-কিসলয়। ঐ কামিনী মলিন-দশনা এবং বনপল্লবে বিভূষিতা। উহার অঙ্গ বহু বিলাসের আস্পদ। সেই চণ্ডাল যুবক স্বয়ং শ্যামবর্ণ এবং তাহার পত্নীও শ্যামগাত্রী। যেমন ভৃঙ্গ-ভৃঙ্গী এক সঙ্গে কুসুম-সমূহের উপরি উপরি পরিভ্রমণ করে, তেমনি সেই চণ্ডাল যুবক নিজ নব প্রণয়িনীর সহিত বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল। সে, বনে বনে লতায় পাতায় বাস করিয়া,—ব্যসনে বিহ্বল ও বিশীর্ণ হইয়া মূর্ত্তিমান্ বিন্ধ্য-কান্তারের ন্যায় প্রতীত হইল। তাহার বাসস্থানের স্থিরতা কিছুই রহিল না। সে কখন কাননকুঞ্জে বিশ্রাম করিতে লাগিল, কখন গিরি-গহ্বরে শয়ান রহিল, কখন পত্রপুঞ্জে লুকায়িত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল, কখন লতাগুল্মে বসতি করিতে লাগিল এবং কখন কখন কর্ণে কিঙ্কিরাত-কুসুমের ভূষণ, গলদেশে যূথিকাপুষ্পের মালা, মস্তকে কেতকীকুসুমের ভূষণ এবং সর্ব্বাঙ্গে সহকারমঞ্জরীর মালা পরিয়া বনে বনে বিচরণ করিতে লাগিল।

এইরূপে সেই তপঃসিদ্ধ গাধি এক্ষণে সম্পূর্ণ ব্যাধবৃত্তি চণ্ডাল হইলেন। তিনি ব্যাধ হইয়া মৃগবধে সবিশেষ পারদর্শী হইলেন, অরণ্যতত্ত্বে অভিজ্ঞ হইয়া উঠিলেন, কখন কানন-পতিত কুসুম শয্যায় শয়ন করিতে লাগিলেন এবং কখন বা অদ্রিতটে ভ্রমণ করিয়া কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিয়দ্দিন পরে সেই চণ্ডালাত্মা গাধি, নিজকুলের অঙ্কুরস্বরূপ পরিণামে অতীব বিষম কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিলেন; সেই পুত্রগুলি দেখিয়া মনে হইল, যেন খদিরতরু শৈলোপরি কণ্টক সকল প্রসব করিল। এই প্রকারে তিনি সপরিবারে এক পাকা চণ্ডালগৃহস্থ হইয়া উঠিলেন। ক্রমে তাঁহার যৌবন অতীত হইল; বর্ষণহীন ভূভাগের ন্যায় ক্রমশঃ তিনি জীর্ণশীর্ণ হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই চণ্ডালরূপী গাধি পুত্র-কলত্রাদি সহ স্বীয় জন্মভূমি—ভূত-

গ্রাহ গ্রামে আসিলেন,—আসিয়া তাহার কিয়দ্দূরে এক পর্ণকুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অরণ্যবাসী তপস্বীর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। গাধি চণ্ডাল জরাজীর্ণ হইয়াছিলেন। ঊষরভূমির গর্ভজাত তমালতরুর ন্যায় তাঁহার দেহশ্রী অত্যন্ত কদর্য্য হইয়া পড়িল। তদীয় পুত্রগুলির আকৃতি-প্রকৃতি তাঁহারই অবিকল অনুকরণ করিল। গাধি-চণ্ডালের তখন পূর্ণ প্রৌঢ়াবস্থা উপস্থিত হইল। এই সময়ে তিনি বন্ধু বান্ধবে পরিবৃত হইয়া অন্যান্য চণ্ডালের ন্যায় গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার ইষ্ট-কুটুম্বের সংখ্যা বিলক্ষণ বৃদ্ধি পাইল। ক্রূর ব্যাধ নামের সার্থকতা তাঁহা হইতে সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইল। তিনিই সর্ব্ব রকমে অন্যান্য চণ্ডাল গৃহস্থের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিলেন।

অনন্তর চণ্ডালরূপী ভ্রান্ত গাধি দেখিলেন,—বৃষ্টিজলের প্রবাহে যেমন শুষ্ক পর্ণরাশি ভাসিয়া যায়, তেমনি একদা মৃত্যু আসিয়া তাঁহার পুত্র-কলত্র প্রভৃতি সমস্তই অপহরণ করিয়া লইল। তিনি তখন চারিদিক্ অন্ধ-কার দেখিলেন! যূথভ্রষ্ট মৃগের ন্যায় একাকী বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দুঃখভরে তাঁহার অঙ্গ জর্জ্জরিত হইল, তিনি উচ্ছলিত শোকাবেগে সংসারে তথা নিজ দেহে নিতান্ত অনাস্থাবান্ হইলেন। অনবরত তদীয় নয়ন হইতে অশ্রুজল প্রবাহিত হইতে লাগিল। এইরূপে শোকাক্রান্ত-চিত্তে কিয়দ্দিন তথায় যাপন করিয়া হংসাদি অণ্ডজ-কৃত শুষ্ক পদ্মময় সরোবর-পরিত্যাগের ন্যায় হঠাৎ এক দিন স্বীয় দেশ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তিনি চিন্তাভারে আক্রান্ত হইয়া যেন অন্য কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই বাত-বিচালিত মেঘের ন্যায় নানা দেশে বিচরণ করিতে লাগিলেন। কোন কিছুর প্রতিই তাঁহার আর আস্থা রহিল না। খেচর যেমন শূন্যে বিহার করিতে করিতে সহসা কোন সুচারু বিমান প্রাপ্ত হয়, তেমনি তখন চণ্ডালাত্মা গাধি নানা স্থানে বিচরণ করিতে করিতে একদা কীর-জনপদে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সম্মুখে এক সুন্দরী পুরী দেখিতে পাইলেন। তখন পুর-প্রবেশার্থ তিনি রাজপথে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন,—নর্ত্ত-কেরা সে পথে সর্ব্বদাই নৃত্য করে, তাহাদের নৃত্যকালীন অঙ্গচ্যুত রত্ন ও বসনসমূহে পথি পার্শ্বস্থ তরুলতা সকল সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। রাজপথে

যে রাশি রাশি কুসুম পড়িয়া আছে, তাহাতে গুল্‌ফ পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া যায়। সে পথ অগুরু-চন্দনের সুন্দর গন্ধে আমোদিত হইতেছে। সামন্তগণ, নাগরিকগণ ও অঙ্গনাগণ সে পথে সতত বিচরণ করায় পথ অনেকটা সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। গাধি আরও দেখিলেন,—একটা নানা মণিরত্ন-মণ্ডিত মঙ্গল হস্তী সেই পথে বিচরণ করিতেছে। প্রথম দর্শনে তাহাকে সঞ্চরণশীল শৈলেন্দ্র বলিয়াই ভ্রম হয়। সেই দেশের রাজা মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন, এইজন্য ঐ মঙ্গলহস্তী পুনরপি অন্য কোন সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিয়া রাজপদে বসাইবার নিমিত্ত বিচরণ করিতেছে। তাহার তাদৃশ ভ্রমণ দর্শনে মনে হয়, যেন কোন রত্নপরীক্ষায় দক্ষ পুরুষ চিন্তামণি দর্শন-বাসনায় নানা রত্ন অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছে।

তখন চণ্ডালরূপী গাধি ঐ গতিশীল অচলের ন্যায় বৃহদাকার হস্তীকে কৌতুক বশে বিস্ফারিত-নেত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিলেন। যেমন সুমেরুগিরি স্বীয় তটদেশে সূর্য্যকে সাদরে আরোপিত করে, তেমনি সেই দর্শক গাধি-চণ্ডালকে ঐ হস্তী শুণ্ড সাহায্যে স্বীয় গণ্ডে তুলিয়া লইল। চণ্ডালাত্মা গাধি গজ-গণ্ডে সমারোপিত হইলে চতুর্দ্দিক্ হইতে বহু বিজয়-দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। মনে হইল, গগনে প্রলয়-জলধর সমুদিত হওয়ায় মহাসাগর যেন গর্জ্জন করিতে লাগিল। তখন চারিদিক্ হইতে 'রাজার জয়, রাজার জয়' ইত্যাকার নর-কণ্ঠনাদ উত্থিত হইল। তাহাতে বোধ হইল, প্রভাতে বহু পক্ষী যেন জাগরিত হইয়া যুগপৎ কলরব করিয়া উঠিল। অনন্তর কুলপ্লাবী জলধির গভীর গর্জ্জনবৎ চারি দিক্ হইতে বন্দীদিগের উচ্চ কোলাহল পরিশ্রুত হইতে লাগিল। তখন কত বারাঙ্গনা গাধি চণ্ডা-লের ভূষণ-সন্বিধানের জন্য চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে আসিয়া বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, যেন মন্থনকালীন জলমগ্ন মন্দরাদ্রিকে ক্ষীরার্ণবের লহরী আসিয়া বেষ্টন করিল। তৎকালে ললনাগণ সূত্র-গ্রথিত নানা রত্ন-মালায় সেই গাধি-চণ্ডালকে মণ্ডিত করিতে লাগিল; মনে হইল, পূর্ব্ব সাগরের বিবিধ রত্নময়ী বেলাভূমি যেন আপনাতে বিম্বিত সৌর কিরণ-রাজি দ্বারা সমীপস্থ শৈলতটকে ভূষিত করিয়া তুলিল। বর্ষা যেমন বন্য নদীর প্রবাহ-পাতে উন্নত গিরিশিখরকে শোভিত করিয়া থাকে, তেমনি

সেই যুবতী রমণীগণ তখন তুষারবৎ শীতলস্পর্শ হারগুচ্ছ দ্বারা তাঁহাকে অলঙ্কৃত করিল। চঞ্চল কিসলয়-কর-শালিনী বসন্তশ্রী যেমন নানা জাতীয় কুসুমসমূহ দ্বারা বনস্থলী বিভূষিত করিয়া থাকে, তেমনি সেই কামিনীকুল বিবিধ বিচিত্র সুরভি কুসুমসমূহে সেই চণ্ডালরূপী গাধিকে মণ্ডিত করিতে লাগিল। অনন্তর বিবিধ সুগন্ধি বিলেপন দ্রব্য তদীয় গাত্রে লেপন করিয়া দিল ; মনে হইল, শৈলমালা যেন আপনার উপরিস্থিত মেঘরাজিকে নানাবিধ ধাতুরাগে রঞ্জিত করিয়া তুলিল। সন্ধ্যা সমাগমে সুমেরুগিরি যেমন সান্ধ্যরাগ-রঞ্জিত মেঘমালা, তারকা ও চন্দ্রমা প্রভৃতি দ্বারা পরিশোভিত গগনতলকে গ্রহণ করে, তেমনি সেই চণ্ডালরূপী গাধি নানারত্ন-রাজিত রাজা হইয়া তৎকালে সকলের চিত্ত গ্রহণ অর্থাৎ হরণ করিতে লাগিলেন। নবলতিকার ন্যায় বিলাসবতী কামিনীরা তাঁহাকে নানাভরণে সুসজ্জিত করিল। তিনি রত্ন-কুসুম-সমাকীর্ণ কল্পতরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। পথিস্থিত কুসুমিত পাদপের সমীপে যেমন পথিকেরা আসিয়া উপস্থিত হয়, তেমনি নিখিল প্রজাপুঞ্জ তখন সপরিবারে সেই নব নরপতির নিকটে উপনীত হইল, এবং সুরগণ যেমন শচীপতিকে ঐরাবতে আরোহণ করাইয়া স্বর্গরাজ্যে অভিষিক্ত করেন, তেমনি ঐ সকল প্রজা তাঁহাকে সেই মাঙ্গলিক গজে আরোপিত করিয়া সিংহাসনে বসাইয়া রাজ্যাভিষিক্ত করিল। ভাগ্যবশতঃ বায়স যেমন কখন কখন বন মধ্যে গিয়া হৃষ্ট পুষ্ট মৃত মৃগদেহ লাভ করে, তেমনি সেই গাধি দ্বিজ চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হইয়াও সৌভাগ্যক্রমে সেই কীরপুরে রাজ্য লাভ করিলেন। কীরকামিনীগণ করকমল দ্বারা তদীয় চরণকমল সম্বাহন করিতে লাগিল। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম লিপ্ত হওয়ায় তিনি সান্ধ্য অম্বুধরের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিলেন। সিংহ যেমন সিংহীগণে পরিবৃত হইয়া কাননমধ্যে সুশোভিত হয়, ঐ রাজা তেমনি কীরনগরে নারীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন। সিংহ-হত করিকুম্ভ হইতে উন্মুক্ত মুক্তামালায় তাঁহার শরীর বিভূষিত হইল। তিনি চিন্তা ও বিষাদবিহীন হইয়া মন্ত্রী ও পুরবাসিগণ সমভিব্যাহারে রাজ্য ভোগ করিয়া প্রচুর আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থা দর্শনে মনে হয়, করী

যেন রবিকরে ও নিজ মদে উত্তপ্ত হওয়ায় সরসীর সলিলপ্রবাহে নিমগ্ন হইয়া পরম সুখ বোধ করিতে লাগিল। কিয়দ্দিনের মধ্যেই সেখানে তিনি ইচ্ছানুরূপ রাজ্য শাসনের সুব্যবস্থা করিলেন। তাঁহার রাজশক্তি সর্ব্বদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। সর্ব্বত্র তাঁহার আজ্ঞা সাদরে পরিগৃহীত হইতে লাগিল। কার্য্যদক্ষ প্রকৃতিবর্গ তৎপ্রদত্ত রাজ-কার্য্যভার তৎপরতার সহিত নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তথায় তিনি গবলাখ্যায় বিখ্যাত রাজা হইয়া রাজকার্য্য পরিচালন করিতে লাগিলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৪৫ ॥

ষট্চত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এইরূপে সেই গাধি চণ্ডাল রাজা হইয়া বিলাসিনীগণে পরিবৃত রহিলেন। মন্ত্রিমণ্ডল তাঁহার প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সমস্ত সামন্ত রাজগণ তাঁহার অনুগত হইয়া তাঁহাকে সৎকার করিলেন। তিনি ছত্র-চামরাদি রাজচিহ্নে সুশোভিত হইলেন। তাঁহার শাসন সর্ব্বত্রই সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি সকলেরই প্রিয়দর্শন হইলেন। রাজ্যশাসনের রীতি নীতি সমস্তই তাঁহার সম্যক্ সুবিদিত হইল। তিনি এক মহাদশায় উপনীত হইলেন। তাঁহার সুশাসনে প্রকৃতিপুঞ্জ শোক, ভয় ও ক্লেশ-বিরহিত হইয়া মহাসুখে কালাতিপাত করিতে লাগিল। রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া গাধি দ্বিজ স্বীয় চণ্ডালভাব একেবারেই ভুলিয়া গেলেন। সতত স্তুতি ও মঙ্গল-গীতিকার আনন্দে বিভোর হইয়া মদমত্ত ব্যক্তির ন্যায় একাদিক্রমে পূর্ণ অষ্ট বর্ষ কাল তিনি কীররাজ্য পালন করিলেন। তৎকালে দয়া-দাক্ষিণ্যাদি নিখিল গুণ আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল।

একদা সেই রাজা যদৃচ্ছাক্রমে নিজ গাত্র হইতে অলঙ্কাররাশি উন্মোচন করিলেন,—করিয়া রবি, শশী, তারকা, তিমির ও মেঘ-পরিমুক্ত স্বচ্ছ

আকাশবৎ শূন্যদেহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। হার, কেয়ূর ও বলয় প্রভৃতি অলঙ্কারনিচয়ের প্রতি আর তাঁহার পূর্ব্ববৎ প্রীতি রহিল না। তদীয় চিত্ত ঔদার্য্যগুণে পরিপুষ্ট হইয়াছিল, তাই আর সে আহার্য্য-সৌন্দর্য্যের অভিনন্দন করিল না। দিনমণি যেমন নভোমণ্ডল পরিহার করিয়া অস্তাচলতটে গমন করেন, তেমনি সেই রাজা একাকীই তাদৃশ বেশে রাজপুরীর প্রধান চত্বর পরিত্যাগ করিয়া বহিঃপ্রাঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেই স্থানে আসিয়া দেখিতে পাইলেন,—একদল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ স্থূলাকার চণ্ডাল বাসন্তিক কোকিলকুলের ন্যায় মধুর স্বরে গান গাইতেছে এবং কর-কিশলয়ের লীলাক্রমে বীণাতন্ত্রী আকর্ষণ করিয়া মৃদু মন্দরবে বাজাইতেছে। দেখিয়া মনে হয়, পাদপ যেন আপনার পল্লব-করে মধুকরকুলের পক্ষশ্রেণী পরিচালন করিয়া তাহার মুখে গুন্-গুন্ গুঞ্জনরব উদ্ভাবিত করিতেছে।

সহসা একজন জরাজীর্ণ আরক্তনেত্র চণ্ডালনায়ক তুষারপূর্ণ কাচময় গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইল,—হইয়া সেই কীর-মহীপতিকে 'ভো কটঞ্জ!' বলিয়া সম্বোধন করিল এবং বলিল,—যেমন স্বরাভিজ্ঞ লোক কলকণ্ঠ কোকিলের আদর করে; তেমনি এখানকার রাজা তোমায় সঙ্গীতবিদ্যায় নিপুণ বলিয়া সম্মান করেন তো? বসন্ত সময় যেমন চূত-পাদপের শাখাকে ফলে ফুলে পূরণ করে, তেমনি অত্রত্য রাজা তোমায় বসনভূষণাদি দানে আপ্যায়িত করেন তো? যাহা হউক, সূর্য্যোদয়ে কমল যেমন প্রফুল্ল হয় এবং চন্দ্রোদয়ে ওষধিগণ যেমন আপ্যায়িত হইয়া উঠে, তেমনি তোমার দর্শন লাভে আমরা পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলাম। কেন না বন্ধুজনের দর্শন লাভ,—অশেষ আনন্দের, অশেষ লাভের এবং অনন্ত বিশ্রামের সীমান্তস্বরূপ।

সেই বৃদ্ধ চণ্ডালনায়ক রাজাকে এইরূপে যত বার যত কথা কহিল, রাজা তত বারই তাহার কথার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিলেন। তৎকালে বাতায়ন-পথস্থিত রাজমহিলাগণ এবং প্রকৃতিবর্গ এই ঘটনায় রাজাকে চণ্ডাল বলিয়া বুঝিলেন, বুঝিয়া বিষাদমগ্ন হইলেন। নাগরিকেরা রাজার চণ্ডালজাতিত্ব জানিতে পারিয়া হিম-হত কমলদলের ন্যায়, বৃষ্টি-বিহত গ্রামসমূহের ন্যায়

এবং দাবদগ্ধ আম্রকুলের ন্যায় দুর্ভাবনায় একান্তই পরিম্লান হইয়া পড়িল। এ দিকে চণ্ডালেরা যে যে কথা কহিতে লাগিল, রাজা তাহাদের সমস্ত কথায় পুনঃপুন কেবল অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তাঁহার ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, সিংহ যেন বৃক্ষোপরিস্থ মার্জ্জারের ফেৎকার-নাদ অবজ্ঞায় অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। অনন্তর রাজা সেখানে অপেক্ষা না করিয়া সত্বর সেই বিষণ্ণ-জন-বহুল রাজপুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন; তখন মনে হইল বর্ষার অভাবে বিশুষ্ক পঙ্কজময় সরোবরে যেন হংস প্রবেশ করিল। মূলদেশের কোটরাভ্যন্তরে অগ্নি সংলগ্ন হইলে শাল্মলি প্রভৃতি পাদপের যেমন সর্ব্বাঙ্গ শুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি সেই পুরীমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র তাঁহার সর্ব্বাবয়ব পরিম্লান হইতে লাগিল। তিনি রাজান্তঃ-পুরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন,—তথাকার সমস্ত লোক বিষণ্ণ-বদনে অবস্থান করিতেছে। সে ভাব দেখিলে মনে হয়, মুষিক যেন মূলদেশ কর্ত্তিত করিয়াছে; তাই ফুল্লগকুসুমের আশ্রয়গুল্ম ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। যাহা হউক, রাজা রাজপুরে প্রবেশ করিলেন বটে, কিন্তু কেহই আর তাঁহাকে পূর্ব্বের ন্যায় সম্মান প্রদর্শন করিল না। অধিক কি, রাজমহিলা-গণ, মন্ত্রিগণ, বা নাগরিকগণ তাঁহাকে শবদেহের ন্যায় অস্পৃশ্য বোধে স্পর্শ পর্য্যন্তও করিল না। বালকেরা যেমন প্রগাঢ় স্নেহান্বিত হইয়াও আত্মীয় বন্ধুর শবদেহকেও—ভয়ে ঘৃণায় দূরে বিসর্জ্জন করে, তেমনি তাঁহার চিরানুরক্ত ভৃত্যবর্গও তাঁহাকে দূর হইতে পরিত্যাগ করিল। রাজা চণ্ডালজাতীয় বলিয়া সকলেই বিষাদাকুল হইল। কেহই আর তখন পূর্ব্বের মত তাঁহার প্রতি বহু-মান-পুরঃসর ব্যবহার করিতে লাগিল না। এই ঘটনায় রাজার মুখ নিরানন্দ হইল। তিনি দগ্ধারণ্যবৎ মলিন ও ভ্রষ্টশ্রী হইয়া পড়িলেন। পুরবাসী নিখিল নর-নারীর হৃদয় পরিতপ্ত হইল। তাহাদের দেহ ধূমায়মান হইতে লাগিল। গিরিগাত্রে যেমন অগ্নিসংযোগ হয় না, তেমনি কোন পুরবাসীই তাঁহার সমীপে উপনীত হইল না। সভাসদ্গণ সকলেই ভগ্নোৎসাহ হইয়া পড়িল। তাহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় তাঁহার সম্মুখে অবস্থান করিতে লাগিল না। ভস্ম-পতিত জলবিন্দুর ন্যায় তদীয় আজ্ঞা সর্ব্বত্রই ব্যাহত হইতে লাগিল। তাঁহার আকৃতি তখন সর্ব্ব লোকের নিকট ক্রূরকর্ম্মকারী বলিয়া

প্রতিভাত হইল। তৎসহ একত্র অবস্থান করাও লোকে অমঙ্গলাবহ বলিয়া মনে করিল। লোকে রাক্ষস দেখিয়া ভয়ে যেমন দূরে পলায়ন করে, তাঁহাকে দেখিয়াও সকলে তেমনি দূরে পলাইতে লাগিল। তিনি বহু জনের মধ্যে ছিলেন, থাকিলেও তখন তাঁহাকে অর্থহীন নির্গুণ বিদেশস্থ পান্থ জনের ন্যায় অসহায় বলিয়া বোধ হইতে লাগি। বেণুর মধ্যে মুক্তা আছে,—থাকিলেও সমীরসংযোগে কূজনপরায়ণ বেণুর সহিত যেমন পথিকেরা আলাপ করে না, তেমনি সেই রাজা আপনা হইতে বহুবার আলাপ করিলেও কোন নগরবাসীই তাঁহার সহিত আলাপ করিতে সমুৎসুক হইল না।

অনন্তর নাগরিকগণ ও রাজমন্ত্রিগণ স্থির করিলেন,—আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া এই চণ্ডালসংসর্গে দূষিত হইয়াছি; অতএব কেবল প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আমাদের শুদ্ধি লাভ হইবে না; আমরা হুতাশনেই প্রবেশ করিব। এইরূপ স্থির নিশ্চয় করিয়া সকলেই তখন শুষ্ক ইন্ধন সংগ্রহ করিল,—করিয়া তৎসাহায্যে চতুর্দ্দিকে চিতানল প্রজ্বালিত করিল। তৎকালে গগনগত জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ন্যায় চারিদিকে যখন চিতানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন সমস্ত নগরবাসীর অত্যুচ্চ করুণ ক্রন্দনে সমগ্র নগর মুখরিত হইল। তাহারা অজস্র অশ্রুধারা বর্ষণ করিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভূতলে বিলুণ্ঠিত হইতে লাগিল। প্রজাবর্গ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডসমীপে আগমন করিয়া বিমূঢ় হইয়া পড়িল এবং অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাজমন্ত্রিগণ একে একে অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাদের ভৃত্যবর্গ রোদন করিতে লাগিল। লোক জনের অনবরত অশ্রুবর্ষণে ও গভীর আর্ত্তনাদে আকুল হইয়া সেই নগর যেন হিম-সম্পৃক্ত ঝঞ্ঝানিল-চালিত ঘোর অরণ্যের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। চিতানলে দীপিত বিপ্রেন্দ্রগণের দগ্ধ মাংসের অত্যধিক উৎকট গন্ধ লইয়া বাত্যা বহিতে লাগিল; সমীরবেগে ধূলিরাশি উত্থিত হইল। ধূলি-কণায় সম্পৃক্ত হওয়ায় মারুত যেন নীহারবিন্দুময় বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। তখন বাতবেগে বসাগন্ধ দূর প্রসর্পিত হওয়ায় দূর দূরান্তর হইতে কত পক্ষী ও পিশাচদল আসিয়া গগনতল আচ্ছন্ন করিল। মনে হইল, জলদজাল যেন গগনমণ্ডলে আসিয়া দিবাকরকে ঢাকিয়া ফেলিল। বাতবেগে চিতানল ঊর্দ্ধে প্রসর্পিত হওয়ায় যেন ব্যোমমণ্ডল দগ্ধ হইতে

লাগিল। চিতাগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল ইতস্ততঃ উড্ডীয়মান হওয়ায় মনে হইল, গগনাঙ্গনের চারিদিক্ হইতে যেন তারকারাজি বর্ষিত হইতে লাগিল। তখন অলঙ্কার-লোভে উদ্ধত তস্করেরা শিশুদিগকে তাড়াইয়া চলিল; তাহারা ভীত হইয়া কম্পিতকায়ে অত্যুচ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিল। নগরবাসীরা ত্রাসান্বিত হইয়া একে একে আত্মপ্রাণ অনলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিল। নিখিল নগর ধ্বস্ত বিধ্বস্ত হইয়া গেল। কোথায় কাহার গৃহ ছিল, তাহার চিহ্ন মাত্র রহিল না। সুযোগ বুঝিয়া চোরগণ সকলের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করিতে লাগিল। নাগরিকেরা পুত্রকলত্রাদির মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া সকলেই মরণের জন্য প্রস্তুত হইল।

এইরূপে তখন অশেষ জনতা-ক্ষয়-কর কল্পান্ত কালোপম বিষম দৈবদুর্ব্বিপাক উপস্থিত হইলে রাজ্য ও সজ্জনগণের সংসর্গ-বশতঃ পবিত্রবুদ্ধি গলব রাজা শোকাকুল-চিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—অহো! এই আকালিক প্রলয়ের ন্যায় ভীষণ লোক-ক্ষয়-কর কঠোর কদর্থনা অদ্য আমারই জন্য এ দেশে উপস্থিত হইয়াছে; সুতরাং এই পরপীড়াজনক জীবনে আমার আর প্রয়োজন কি? এক্ষণে মরণই আমার পক্ষে মহোৎসব-স্বরূপ। লোক-নিন্দিত দুষ্ট দুর্জ্জনের জীবন অপেক্ষা মরণই বস্তুতঃ মঙ্গলাবহ।

গবল রাজা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া প্রজ্বলিত পাবকে পতঙ্গবৎ অনায়াসে আত্মদেহ আহুতি প্রদান করিলেন। এইভাবে সেই গলব-দেহ সবলে হুতাশকুণ্ডে পতিত হইয়া ভস্মীভূত হইলে সেই জলমধ্যবর্ত্তী গাধি অঘমর্ষণ মন্ত্র জপ করিতে করিতে স্বীয় অঙ্গদাহ-জনিত তাপানুভূতি সহকারে সহসা প্রবোধ প্রাপ্ত হইলেন।

বাল্মীকি কহিলেন,—মুনিবর বশিষ্ঠ এই কথা কহিলে দিবা অবসান হইল। দিবাকর সায়ন্তন বিধি নির্দ্দেশে অস্তমিত হইলেন। সভাসদগণ পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিয়া সায়ন্তন স্নানাদি সমাধা করিবার নিমিত্ত সভাগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অনন্তর বিভাবরী প্রভাত হইলে রবিকর-নিকর প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে পুনরায় সকলে আসিয়া সভাধিবেশন করিলেন।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৬ ॥

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—অনন্তর বারিধির কূল-সন্নিহিত জলভ্রমের ন্যায় গাধির সেই মানস-বেদনাবহ বিষম ভ্রমজনক ব্যাকুলভাব মুহূর্তদ্বয়মধ্যে প্রশমিত হইয়া গেল। কল্পান্ত কালে ব্রহ্মা যেমন বিশ্ব-বিরচন-সঙ্কল্প হইতে বিরত হন, দ্বিজরাজ গাধিও তেমনি পূর্ব্বোক্ত মনঃসঙ্কল্পরূপ সম্মোহ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন। মত্ততা চলিয়া গেলে মত্ত ব্যক্তি যেমন চিত্তস্থৈর্য্য প্রাপ্ত হয়, তিনিও তেমনি ধীরে ধীরে শান্ত হইলেন,—হইয়া সুপ্তোত্থিত জনের ন্যায় নিজ বোধ প্রাপ্ত ও সুস্থ হইলেন। প্রভাতে রজনীর তিমিরাবগুণ্ঠন অপসৃত হইলে লোকে যেমন যথাযথ সমস্ত বস্তু অবলোকন করে, তেমনি 'এই আমি—সেই গাধি, আমি যে স্নানকতীর্ণ হইয়া অর্ঘমর্ষণ মন্ত্রজপ করিতেছিলাম, তাহাই করিতেছি, পূর্ব্বে যে আপনাকে চণ্ডাল হইয়া পরে রাজা হইতে দেখিলাম, সে কিছুই নহে' এইরূপ জ্ঞানে গাধি তখন আপনাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। শিশিরাপগমে বসন্ত যেমন মুকুলিত সরোজাভিমুখে পাদ চালন করে, গাধি তেমনি আপন স্বরূপ স্মরণপূর্ব্বক জলাভ্যন্তর হইতে তীরের দিকে পাদ নিক্ষেপ করিলেন। তখন তিনি এই বারি-ব্যোম-দিঙ্মণ্ডল-শালিনী ধরণীকে যেন অপর এক ধরণীর ন্যায় দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়-রসে মগ্ন হইলেন এবং 'কে আমি? কি দেখিলাম? এতকাল কি করিলাম?' এইরূপে বিস্ময়াবেশে ভ্রূভঙ্গ সহকারে ক্ষণকাল বিচার করিয়া স্থির করিলেন,—'ওঃ আমি বুঝিয়াছি, আমি পরিশ্রান্ত হইয়াছিলাম; তাই আমার ক্ষণমাত্র ভ্রম উপস্থিত হইয়াছিল। সেই ভ্রমে পড়িয়াই আমি যাহা দেখিবার দেখিয়াছি।'

এই প্রকার স্থির করিয়া গাধি দ্বিজ উদয়-গিরিগামী দিবাকরের ন্যায় জল হইতে উত্থিত হইলেন এবং তটে উঠিয়া ভাবিতে লাগিলেন,—আমি যখন আমার মাতা ও পত্নীর সমক্ষে মৃত্যু গ্রস্ত হইয়াছিলাম, তখন

আমার মাতাই বা কৈ? আর আমার পত্নীই বা কোথায়? আমার পিতা-মাতা ত তখন ছিলেন না। বাত-পরিচালিত পত্রের মাতৃ-পিতৃস্থানীয় বল্লী ও বৃক্ষ যেমন অসির আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়, তেমনি বাল্যকালে মদীয় অবোধ অবস্থাতেই আমার মাতাপিতা কালের কবলে পতিত হইয়াছিলেন। আমি চিরদিন অবিবাহিত আছি। দ্বিজ যেমন মদিরার স্বাদ জানেন না, আমিও তেমনি মনঃক্ষোভকরী দুষ্ট রমণীর স্বরূপ কিছুই কখন জানি না। আমার স্বদেশীয় বন্ধুবান্ধবেরাও বহুদূরে অবস্থান করিতেছে; সুতরাং যাহাদের মধ্যে আমি জীবন পরিত্যাগ করিব, তাহারাই বা আমার কে? অতএব বিবিধ আরম্ভময় গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আমি এ কি দেখিলাম! কি ঘটিল! তবে আমি যে বন্ধুজন মধ্যে আমার মরণাবস্থা দেখিয়াছি, নিশ্চয়ই তাহা কোন মায়া হইবে। এই মায়ামোহ মধ্যে কি যে সত্য নিহিত আছে, তাহা তো আমি কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলাম না। উন্মাদ শার্দ্দূল যেমন মহাবনে বিচরণ করে, দেহিগণের চিত্তও তেমনি অনন্ত ভ্রান্তি দৃষ্টিতে নিত্য এইরূপই ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকে।

দ্বিজবর গাধি এইরূপ অনেক চিন্তা করিলেন,—করিয়া উল্লিখিত ঘটনাপরম্পরাকে মনের মোহ বলিয়াই স্থির করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় আশ্রমে থাকিয়াই কতিপয় দিন অতিপাতিত করিতে লাগিলেন।

একদা জনৈক প্রিয় অতিথি তদীয় আশ্রমে প্রবেশ করিয়া তাঁহার নিকট আগমন করিলেন। মনে হইল, যেন ব্রহ্মার সমীপে দুর্ব্বাসা ঋষি সমাগত হইলেন। ঋতুরাজ বসন্ত যেমন ফল, পুষ্প ও রসার্পণে পাদপকে আপ্যায়িত করে, দ্বিজবর গাধি তেমনি ফল, পুষ্প ও সুমিষ্ট আহার্য্য দানে সেই অতিথির পরম পরিতোষ উৎপাদন করিলেন। তাঁহারা উভয়েই যথাকালে সন্ধ্যাবন্দনা ও জপোপাসনা সমাধা করিলেন,—করিয়া কোমল পল্লবরচিত শয্যায় গিয়া বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন। বসন্ত ঋতুর অভ্যুদয়ে কুসুমশ্রী যেমন সমুদিত হয়, তেমনি সেই দুই তাপসের সম্মিলনে পরস্পর পরস্পরের তপস্যা ও ধ্যানাদিবিষয়ক বিবিধ বাক্যালাপ তখন আরম্ভ হইল।

অনন্তর গাধি কথাপ্রসঙ্গে সেই সমাগত অতিথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনার দেহ এরূপ কৃশ হইয়াছে কেন? কেনই বা আপনাকে এত পরিশ্রান্ত বলিয়া বোধ হইতেছে?

অতিথি কহিলেন,—ভগবন্! সত্যই বটে আমি অতি কৃশ ও শ্রান্ত হইয়াছি, আমার এই কৃশতা ও শ্রান্তির কারণ আমি যথাযথ বলিতেছি; আপনাকে যাহা বলিব, তাহা সত্যই বলিব; কেন না, আমরা কখনই অসত্য কথা কহি না। আপনি শ্রবণ করুন;—এই ভূমিবলয়ের উত্তর দিগ্‌ভাগে কীর নামে এক সুপ্রসিদ্ধ সুসমৃদ্ধ সুবিপুল জনপদ আছে। আমি সেই জনপদে গিয়াছিলাম; চিত্ত-পিশাচ আমার মোহ উৎপাদন করিয়াছিল। আমি সেখানে একমাস বাস করিলাম। পুরবাসী জনগণ আমার সৎকার করিতে লাগিল। আমি সুরস খাদ্য সামগ্রীর লোভে আকৃষ্ট হইয়া সুখে অবস্থান করিতেছি। ইতিমধ্যে এক দিন কোন এক ব্যক্তি কথা-প্রসঙ্গাধীন আমায় বলিল,—'দ্বিজবর! এই রাজ্যে অদ্য আট বৎসর যাবৎ জনৈক চণ্ডাল রাজত্ব করিতেছেন।' আমি এই কথা শুনিয়া গ্রামান্তরে গমন করিলাম,—যাইয়া অন্যান্য অনেক লোকের নিকটও ঐ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলাম। তাহারাও ঐ কথারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলিল,—হাঁ। আট বর্ষ যাবৎ এক চণ্ডাল এ দেশের রাজা হইয়াছেন বটে। অনন্তর আমি সেখানে এ কথাও শুনিতে পাইলাম যে, সেই রাজা অবশেষে আপনার চণ্ডালত্ব অন্যান্য লোকে বুঝিতে পারিয়াছে জানিয়া হঠাৎ একদিন অনলে প্রবেশপূর্ব্বক আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন। কেবল রাজাই অনলে দগ্ধ হন নাই; সেই উপলক্ষে শত শত ব্রাহ্মণও হুতাশনে আত্মপ্রাণ আহুতি দিয়াছেন। হে দ্বিজ! আমি সেই সকল লোকের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র তথা হইতে নির্গত হইলাম এবং পাপ-প্রক্ষালনের নিমিত্ত প্রয়াগে আসিয়া অবশেষে প্রায়শ্চিত্ত করিলাম। তৃতীয় চান্দ্রায়ণের পর অদ্য পারণ করিয়াছি; পরে আপনার আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। এই জন্যই আমি শ্রান্ত এবং অতীব কৃশ হইয়া পড়িয়াছি।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! দ্বিজবর গাধি সেই অতিথি ব্রাহ্মণের মুখে এই কথা শুনিয়া পুনরায় তাঁহাকে ঐ বিষয়ই জিজ্ঞাসা করিলেন। অতিথি

ব্রাহ্মণও তাঁহার কথিত বৃত্তান্তেরই পুনরাবৃত্তি করিলেন; তদ্ভিন্ন তিনি আর অন্য কোন কথাই কহিলেন না।

অনন্তর গাধি বিস্ময়াপন্ন হইলেন,—হইয়া সে রাত্রি সেইখানেই কাটাইলেন। পর দিন বিশ্বভবনের মহাপ্রদীপ দিবাকর সমুদিত হইলেন। অতিথি ব্রাহ্মণ প্রাতঃস্নানাদি বৈধ কার্য্য সমাধা করিয়া গাধিকে সম্ভাষণান্তে স্বীয় আবাসে প্রস্থান করিলেন।

তখন গাধি বিস্ময়াবেশে উৎকণ্ঠিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন,—তাই ত! আমি যাহা ভ্রমের ঘোরে দেখিয়াছি, এই অতিথি [illegible]। [illegible] আমার নিকট সত্য বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গেল। তবে কি [illegible] মায়া বলিয়াই বুঝিব? আমি যে বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে স্বীয় [illegible] অবস্থা দেখিয়াছি, তাহা যে সম্পূর্ণই মায়া, সে পক্ষে আমার সন্দেহমাত্র নাই। যাহা হউক, এক্ষণে আমি ইহাই একবার দেখিব যে, আমার চণ্ডাল-জন্মের শেষ অবস্থায় কি ঘটিল? আমি আপনার চণ্ডাল-জন্ম-ঘটিত বিবরণাদি সম্যক্ জানিবার জন্য এখনই সেই ভূতমণ্ডল গ্রামের প্রান্তসীমায় গমন করিব।

গাধি ব্রাহ্মণ এইরূপ চিন্তা করিয়া সবিশেষ আগ্রহের সহিত ভূতমণ্ডল গ্রামে যাইবার জন্য তখনই গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহার সেই গমনোদ্যম দেখিয়া মনে হইল দিনমণি যেন সুমেরুশৈলের পার্শ্বদেশ দেখিবার জন্য উত্থিত হইলেন। প্রাজ্ঞ লোকেরা অধ্যবসায়গুণে মনোরাজ্যও লাভ করিয়া থাকেন; সুতরাং গাধি গমনপূর্ব্বক তাঁহার সেই স্বপ্নরূপ বিষয় যে অখণ্ডিতভাবে লাভ করিবেন, তাহাতে আর বিস্ময়ের বিষয় কি? যে কোন দুষ্প্রাপ্য বস্তুই হউক না, অধ্যবসায়গুণে তাহা নিশ্চয়ই লাভ করা যায়; এইরূপ স্থির ধারণা করিয়া গাধি, তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট জাগতী মায়া পুনঃ প্রত্যক্ষ করিতে প্রয়াসী হইলেন। তিনি তখন নিজ আশ্রম হইতে নির্গত হইলেন,—হইয়া বর্ষার বারিপ্রবাহের ন্যায় সবেগে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে বাতবেগী তুরঙ্গের ন্যায় সত্বর তিনি বহুদেশ অতিক্রম করিলেন,—করিয়া করঞ্জ-কাননে সমুপস্থিত কণ্টকার্থী উষ্ট্রের ন্যায় সেই পূর্ব্বাধ্যুষিত ভূতমণ্ডলাখ্য

জনপদে গিয়া উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, পূর্ব্বে তিনি ঐ জনপদে যাদৃশ আচার ব্যাবহার প্রচলিত দেখিয়াছিলেন, তখনও সেখানে তাহাই রহিয়াছে। তাঁহার স্বগ্রামের সংস্থান ও সন্নিবেশ সম্বন্ধে পূর্ব্বে তাঁহার যেরূপ ধারণা ছিল, তিনি তাদৃশ সংস্থান-সন্নিবেশ স্মরণ করিয়া দেখিলেন,—অবিকল সেইরূপ একটী ক্ষুদ্র গ্রাম সম্মুখে বিদ্যমান আছে। তিনি আরও দেখিলেন,—সেই গ্রামের প্রান্তসীমায় সেই ভাবেই সেই চণ্ডাল-পল্লী অবস্থিত রহিয়াছে। দেখিলেই মনে হয়, যেন ভুবনের অধোবর্ত্তী পাতালপ্রদেশে নরকনিবাস অবস্থান করিতেছে। দ্বিজবর গাধি পূর্ব্বে সেই চণ্ডালপল্লীতে চণ্ডালরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া জীবনে যে যে ঘটনা প্রত্যক্ষ ও যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই অন্তরে চিন্তা করিয়া দেখিলেন,—সেই সেই সকল চিহ্নই সেই চণ্ডালপল্লীতে তখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তিনি পূর্ব্বে যেরূপ সন্নিবেশময় চণ্ডালালয় দেখিয়াছিলেন, এক্ষণে তথায় উপস্থিত হইয়াও সেইরূপই দেখিলেন; দেখিবামাত্র তাঁহার মনে বৈরাগ্যোদয় হইল। তিনি তাকাইয়া তাকাইয়া অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন,—তাঁহার বাসগৃহাদি বর্ষা-জলধারায় নানাস্থানে ভগ্ন হইয়া ভূলুণ্ঠিতপ্রায় হইয়াছে। গৃহভিত্তিগুলিতে যবাঙ্কুর সকল জন্মিয়াছে; গৃহাচ্ছাদনের অর্দ্ধাংশ পড়িয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন তিনি নিজে যে কট-খণ্ডাদিতে শয়ন করিতেন, সেই শয্যার ছিন্নাংশও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি তাঁহার সেই বাসভবন বেশ করিয়া দেখিলেন,—তখন উহা যেন সুদৃঢ় দারিদ্র্য, যেন ভিত্তিযুক্ত দৌর্ভাগ্য, যেন স্খলিত-গাত্র দৌরাত্ম্য এবং যেন ছিন্নার্দ্ধ দুর্দ্দশার ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। গ্রামের প্রান্তদেশে কত গো, অশ্ব ও মহিষাদির অস্থিপুঞ্জ স্তূপীকৃত রহিয়াছে। তাহাদের দন্তসহ মুণ্ডরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। বোধ হইল যেন, চণ্ডালপল্লীর অস্তিত্ব বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্যই, সে সকল স্থানে স্থানে অবস্থিত রহিয়াছে। গাধি পূর্ব্বে চণ্ডালদশায় যে যে খর্পরে করিয়া পান ভোজন সমাধা করিতেন, সেই সেই খর্পর এক্ষণে বৃষ্টিজলে পূর্ণ রহিয়া যেন পানীয় পদার্থে পরিপূরিত হইয়াই নানাদিকে নিপতিত রহিয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল গবাশ্বাদি প্রাণী নিহত হইত, তাহাদের শুষ্ক

তন্ত্রীগুলি লতাজালের ন্যায় গৃহের চারিদিক বেষ্টন করিয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ তন্ত্রীগুলি যেন চণ্ডালদিগের মূর্ত্তিমতী সুদীর্ঘ তৃষ্ণার ন্যায় বিরাজমান।

গাধি বহুক্ষণ ধরিয়া সবিস্ময়ে তাঁহার সেই পূর্ব্বাধিষ্ঠিত গৃহ অবলোকন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, তত্ত্বাভিজ্ঞ ব্যক্তি যেন শুষ্ক শবীভূত প্রাক্তন স্বীয় দেহের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। পান্থ জন যেমন ম্লেচ্ছনিবাস পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যদেশে উপনীত হয়, তেমনি সেই গাধি তখন সেই স্থান নিরীক্ষণ করিয়া নিকটস্থ লোকালয়ে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া জনৈক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—সাধো! বলিতে পার, এই গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানে পূর্ব্বে যে এক চণ্ডাল বাস করিত, তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু স্মরণ আছে কি? আমি সজ্জনদিগের মুখে শুনিয়াছি, বুদ্ধিমান্ মাত্রেই বহুদিনের অতীত ঘটনা করস্থিত বস্তুর ন্যায় সুস্পষ্ট অবলোকন করিয়া থাকেন। এইজন্যই আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, এই গ্রামের নির্জ্জন প্রান্তে মূর্ত্তিমান্ দুঃখের ন্যায় যে এক বৃদ্ধ চণ্ডাল কিয়ৎদিন পূর্ব্বে বাস করিত, তাহাকে তোমার স্মরণ হয় কি? হে সাধো! যদি তাহার সম্বন্ধে তোমার কিছু জানা শুনা থাকে, আমার নিকট যথাযথ ব্যক্ত কর। জানিও,—পান্থ জনের সংশয় ছেদন করিলে মহা পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্যাধিগ্রস্ত আর্ত্ত ব্যক্তি যেমন একান্ত আগ্রহ সহকারে চিকিৎসকের নিকট স্বীয় রোগমুক্তির উপায় বহুবার জিজ্ঞাসা করে, সেই দ্বিজবর গাধি তখন তথাকার গ্রামবাসীদিগকে তেমনি আগ্রহের সহিত পুনঃপুন সেই বৃদ্ধ চণ্ডালের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সেই গ্রাম্য লোকেরা কহিল,—হে ব্রহ্মন্! আপনি যাহা কহিতেছেন, তাহা সত্য; এখানে যে এক জন চণ্ডাল বাস করিত, সে কথা মিথ্যা নহে। এখানে কটঞ্জ নামে এক দারুণাকার চণ্ডাল ছিল। পাদপের পত্ররাশির ন্যায় তাহার পুত্র, পৌত্র, আত্মীয়, স্বজন ও ভৃত্য প্রভৃতি বহুতর পোষ্য পরিজন ছিল। সেই চণ্ডাল সেই সকল পোষ্য-পরিজন লইয়া এক বিস্তৃত সংসার পাতাইয়া বাস করিতেছিল। কালক্রমে সেই চণ্ডাল

বৃদ্ধ হইল। তাহার বৃদ্ধদশায় তদীয় সমস্ত পরিজন কঠোর কালের কবলে পতিত হইল। তাহার দুরবস্থা দেখিয়া মনে হইল, গিরিশিখরের ফলকুসুম-শোভিত বনভূমি যেন দাবদহনে দগ্ধ করিয়া ফেলিল। এই দুর্ঘটনার পর সেই চণ্ডাল শোকাভিভূত হইয়া দেশত্যাগ করিল এবং ক্রমে কীরনগরে গিয়া উপস্থিত হইল। সেখানে উপস্থিত হইবামাত্র সে তথাকার রাজা হইয়া বসিল। রাজা হইয়া আট বর্ষ কাল নিশ্চিন্তে নিরুদ্বেগে সে রাজ্যে বাস করিল। অনন্তর সেখানকার অধিবাসীরা তাহাকে চণ্ডাল বলিয়া বুঝিতে পারিল এবং যেমন অনর্থ-সার্থকে অথবা যেমন গ্রামস্থ বিষবৃক্ষকে দূরে পরিহার করে, তেমনি তাহার সংসর্গ তাহারা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করিল। অনন্তর প্রধান প্রধান নাগরিকেরা দেহশুদ্ধির নিমিত্ত সকলেই অনলে আত্মপ্রাণ আহুতি দিল। আর্য্যজনের সংসর্গগুণে ঐ চণ্ডালও আর্য্যভাবাপন্ন হইয়াছিল; তাই সেও তখন অনলে প্রবেশ করিল। যাহা হউক, হে প্রভো! এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, আপনি সেই চণ্ডালের বিবরণ এরূপ আগ্রহ সহকারে আমাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? ঐ চণ্ডাল কি আপনার কোন বন্ধু ছিল? অথবা আপনি নিজেই তাহার কোন আত্মীয় ব্যক্তি ছিলেন?

গ্রামবাসীরা এই সকল কথা কহিতে লাগিল; গাধি দ্বিজ বারম্বার তাহাদিগকে সেই চণ্ডালের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ গ্রামের নানাস্থানে ঘুরিয়া ফিরিয়া তথায় প্রায় এক মাস কাল বাস করিলেন। তিনি চণ্ডাল-দশায় উপনীত হইয়া তৎকালে যে যে ভাব অনুভব করিয়াছিলেন, গ্রাম-বাসীরা তৎসমস্তই তাঁহার নিকট অবিকল বর্ণন করিল।

গাধি দ্বিজ সেই গ্রামে থাকিয়া পূর্ব্বে যাহা যাহা অনুভব করিয়াছিলেন, গ্রামস্থ সমস্ত ব্যক্তির মুখেও যথাযথ তাহাই শ্রবণ করিলেন,—করিয়া শশাঙ্কের কলঙ্কের ন্যায় হৃদয়ারূঢ় লজ্জায় লুক্কায়িত-কায় হইয়া সাতিশয় বিস্ময়রসে ডুবিয়া গেলেন

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ৪৭॥

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! গাধির মন বিস্ময়াপন্ন হইয়া বারম্বার সেই চণ্ডালগৃহের চারিদিকেই চিরনিবিষ্ট হইল। তিনি যতবার সেই আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শন করেন, তাঁহার মন আর কিছুতেই তৃপ্ত হয় না। পদ্মজন্মা ব্রহ্মা যেমন প্রলয়-ক্ষোভ-নিবৃত্ত অসংখ্য জগৎ অবলোকন করেন, তেমনি সেই গাধি দ্বিজ তথায় বহুতর ভগ্ন স্থান ও ভগ্ন গৃহাদি দর্শন করিলেন এবং তত্রত্য ভীষণ অরণ্যমধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ঐ অরণ্য শুষ্ক কঙ্কালমালায় বেষ্টিত ও পিশাচ-পরিভূত শ্মশান-পাদপের ন্যায় বহু ভগ্নগৃহে সমাকুল রহিয়াছে। গাধি দ্বিজ তন্মধ্যে থাকিয়া মনে মনে বলিতে লাগি-লেন,—এই সেই ভিত্তিভূমিতে নিখাত মৃত-মাতঙ্গের দন্তমালা আকল্পস্থিত সুমেরুশিখরের ন্যায় অদ্যাপি বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি আমার মদ্য-পান-মত্ত বন্ধুবান্ধবগণের সহিত এই স্থানে বসিয়া পক্ব বংশাঙ্কুর-যোগে বানরী-মাংস পাক করিয়া পরমানন্দে ভোজন করিতাম। গজগণ্ডের মদ-জলপাতে আমাদের সুরা তিক্ত হইত, এইখানে বসিয়া সেই তিক্ত সুরা পান করিয়া চণ্ডালযুবতীর অঙ্গ আলিঙ্গনপূর্ব্বক এই সিংহচর্ম্মে শয়ন করি-তাম। এই ত সেই গজদন্ত-স্তম্ভ; আমার কুক্কুর-কুটুম্বিনীরা সতত পিণ্যাক ও মাংস ভোজনে হৃষ্ট পুষ্ট হইয়া এই স্তম্ভেই চর্ম্মরজ্জু দ্বারা আবদ্ধ থাকিত। গজমুক্তা রাখিবার জন্য আমার তিনটী পাত্র ছিল, এই স্থানে সেই পাত্রত্রয় রক্ষিত হইত। ঐ পাত্র তিনটী দ্বিরদ-রদে নির্ম্মিত; মেঘবৎ শ্যামবর্ণ এবং মহিষচর্ম্মে পরিবৃত; ঐ পাত্রগুলির প্রমাণ,—তিনটী উখার ন্যায় ছিল। যেমন চূত পাদপের পত্রপুঞ্জে বসিয়া কোকিল-কুল কেলি করিয়া থাকে, তেমনি এই ত সেই আমার পূর্ব্বদৃষ্ট বনস্থলী;—এই স্থানে থাকিয়াই চণ্ডাল-বালকেরা ধূলাখেলায় নিরত থাকিত। এই-খানে বালকদিগের মুখমারুতে বংশীধ্বনি হইত, আমি সেই ধ্বনিরই অনু-রূপ গান গাইতাম; এইখানে বসিয়াই কুক্কুরী-রক্ত পান করিতাম, স্বয়ং শবাস্থি দ্বারা ভূষিত হইতাম এবং অন্যান্য সকলের ভূষণক্রিয়া সমাধা

করিতাম। কোন বিবাহোৎসব উপস্থিত হইলে, এইখানে আমি কুটুম্ব-বর্গের সহিত মিলিত হইয়া নৃত্য করিতাম এবং সাগর-কল্লোলের ন্যায় গভীর নাদে কত কি চীৎকার করিতাম। প্রতিদিন কত কাক, ভাস প্রভৃতি পক্ষী ভক্ষ্য সংগ্রহার্থ এই বনস্থান দিয়া উড়িয়া যাইতে উদ্যত হইত, আমি এই স্থানে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিতাম।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—গাধি দ্বিজ এইরূপে আপনার প্রাক্তন চণ্ডালচর্য্যা স্মরণ করিলেন,—করিয়া বিস্ময়াবেশে শিরঃকম্পন করত বিধাতার কার্য্য-প্রণালীর বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কার্য্যজ্ঞ গাধি বহুদিনাবধি সেই চণ্ডালপল্লীতে অবস্থান করিয়া পরে সেই প্রদেশ হইতে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর ক্রমশঃ চলিতে চলিতে সত্বর সেই ভূতমণ্ডল জনপদ অতিক্রম করিয়া দেশান্তরে আসিয়া উপনীত হইলেন। পথে কত গিরি, নদী, রাজ্য ও অরণ্যভূমি উল্লঙ্ঘিত হইল। ক্রমে তিনি হিমালয়-পৃষ্ঠস্থ কোন এক শ্রেষ্ঠ জনপদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে এক রাজধানী তাঁহার দৃষ্টি-গোচর হইল। দেখিলেন,—ঐ রাজকীয়-নগর গিরিশৃঙ্গবৎ সমুন্নত প্রাসাদ-মালায় মণ্ডিত। তিনি তথায় উপস্থিত হইলে মনে হইল, দেবর্ষি নারদ যেন সমস্ত জগৎ পর্য্যটনে শ্রান্ত হইয়া অবশেষে অমরধামে আসিয়া উপনীত হইলেন। বলা বাহুল্য, এই নূতন জনপদ তাঁহার সেই পূর্ব্বাবলোকিত কীররাজ্য। এখানে পূর্ব্বে তিনি নিজে যে যে স্থান অনুভব, দর্শন ও উপভোগ করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থান এক্ষণে আবার স্বচক্ষে দেখিয়া আগ্রহের সহিত তথাকার অধিবাসীদিগের কোন এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞা-সিলেন,—হে সাধো! কিছু দিন পূর্ব্বে এখানে এক চণ্ডাল আসিয়া রাজা হইয়াছিল, ইহা তোমার স্মরণ আছে কি? যদি সে সম্বন্ধে তোমার প্রকৃত তত্ত্ব জানা থাকে, তাহা হইলে আমার নিকট তাহা যথাযথ বর্ণন কর।

তখন নাগরিকেরা একযোগে কহিল,—হে দ্বিজ! হাঁ, এখানে একজন চণ্ডাল অষ্টবর্ষ পর্য্যন্ত রাজা হইয়াছিল। একটা মঙ্গলহস্তী তাহাকে এই রাজ্য সমর্পণ করিয়াছিল। অনন্তর সেই রাজাকে যখন সকলে চণ্ডাল বলিয়া বুঝিতে পারিল, তখন সেই রাজা জ্বলন্ত অনলে আত্মাহুতি প্রদান করিল। হে তাপস! অদ্য প্রায় দ্বাদশ বর্ষ হইল, এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

দ্বিজরাজ গাধি এই সকল কথা শুনিতে একান্ত কুতূহলী হইলেন। তিনি এ সম্বন্ধে যে যে লোককে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, তাহাদের সকলের মুখেই ঐ বৃত্তান্ত শুনিতে পাইলেন এবং নিজেও অনেক বিষয় স্মরণ করিয়া অনুভব করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবদনুগ্রহ-গুণে তিনি তখন আরও এইরূপ এক অদৃষ্টপূর্ব্ব ঘটনা দেখিলেন যে, স্বয়ং চক্রধারী ভগবান্ হরি ত্বদীয় পূর্ব্বদৃষ্ট বল-বাহনে সমন্বিত হইয়া তত্রত্য রাজপুরীর প্রাসাদ হইতে রাজরূপে বহির্গত হইলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী বল-বাহনের পাদ-পাতোত্থিত ধূলিজালরূপ জলদমণ্ডলে আকাশদেশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্দর্শনে গাধি দ্বিজ নিজ পূর্ব্বতন রাজভাব স্মরণ করিয়া অতীব বিস্ময়াবেশে আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন,—এই ত সেই কমল-কোশবৎ কোমলাঙ্গী তপ্তকাঞ্চনবৎ কান্তিমতী কীরনরপতির কামিনীগণ বিরাজমান! এই ত দেখিতেছি, ইহাদের সেই বিলোল নীলোৎপল-নয়নের চঞ্চল কটাক্ষ-বিক্ষেপ! এই ত সেই পিণ্ডিতাকার চন্দ্রকরবৎ পাণ্ডুরাভ চামর-নিচয়! ইহারা স্থিরতর নির্ঝরবারির ন্যায় অথবা কাশকুসুমগুচ্ছের ন্যায় সুশোভিত হইতেছে। আমি পূর্ব্বে দেখিয়াছি, এখনও দেখিতেছি, এই সেই কামিনীগণ নূতন ব্যজনাবলী পরিচালিত করিতেছে; ইহাদিগকে দেখিয়া মনে হয়, বনলতাবলী যেন পবন-প্রেরণায় পুষ্পমঞ্জরীগুলিকে সঞ্চালিত করিতেছে। যাহাদের দন্তাগ্রভাগে দিকৃতটচয় বিঘট্টিত হয়, এই সেই মত্ত মাতঙ্গদল কল্পদ্রুম-শোভিত সুমেরুর শিখরাবলীর ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে! এই ত দেখিতেছি, কীরনরপতির সেই সামন্ত-রাজগণ! ইহাঁরা তেজস্বিতায় সুরেন্দ্র-সামন্ত যম-বরুণাদি লোকপাল-সমূহের সমান। এই ত সেই সুবিশাল অট্টালিকাশ্রেণী বিরাজমান! ইহাদের অভ্যন্তরে কোন সামগ্রীরই অভাব নাই, সুতরাং সকলের অভীষ্ট বস্তুদায়ক কল্পপাদপকুঞ্জের ন্যায়ই ইহারা শোভমান। আর এই সেই আমার পূর্ব্বোপভুক্ত কীররাজ্য; ইহা এক্ষণে জন্মান্তরীয় আচারের ন্যায় আমার প্রত্যক্ষীভূত হইতেছে। এই যে সকল ঘটনা পূর্ব্বে আমি দেখিয়াছি, অধুনা তৎসমস্ত আবার আমার নিকট জাগ্রতের ন্যায় উপস্থিত হইয়া প্রত্যক্ষ হইতেছে। ইহারা যে প্রকৃতই স্বপ্নের ন্যায় অলীক ব্যাপার, সে পক্ষে সন্দেহ

মাত্র নাই। কিন্তু বলিতে কি, এ মায়া যে আমার কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়া বিকাশ পাইল, তাহা আমি কিছুই বুঝিতেছি না। অহো, কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! আমার মনের দীর্ঘ মোহই স্পর্দ্ধার সহিত আমাকে অধুনা জালবদ্ধ শকুন্তের ন্যায় বিবশ করিয়া তুলিয়াছে। আহা কি কষ্টের কথা! আমার মন বাসনায় বিহত হইয়া বোধ-বিরহিত হইয়াছে; এইজন্যই সে এখন চারিদিকে কেবল বালকবৎ ভ্রান্তি বিস্তার দেখিতে পাইতেছে। এ মায়া কাহার মায়া? ইহা সেই বৈষ্ণবী মায়া! অহো! আমার বিলক্ষণ স্মরণ হইতেছে, সেই বিষ্ণুই আমায় এই মায়া দেখাইয়াছেন। অতএব আর কেন? আমি এখন গিরিগুহায় গিয়া পুনরায় আশ্রয় লই। সেখানে থাকিয়া এমন যত্ন করি, যাহাতে এই মায়ার উৎপত্তি ও স্থিতি রহস্য আমার সম্যক্ পরিজ্ঞাত হইতে পারে।

গাধি দ্বিজ এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই নগর হইতে নির্গত হইলেন এবং কোন এক গিরিগুহায় গিয়া বিশ্রান্ত কেশরীর ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ভগবান্ বিষ্ণুকে পরিতৃপ্ত করাই তাঁহার এই তপঃসাধনার উদ্দেশ্য। তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত প্রতিদিন এক গণ্ডূষমাত্র জল পান করিয়া সার্দ্ধ এক বৎসর কাল তপস্যা করিলেন।

অনন্তর গাধির মনস্কামনা পূর্ণ হইতে চলিল। যিনি স্বভাবতই প্রসন্ন-মূর্ত্তি, যাঁহার দেহপ্রভা উৎপলবৎ শ্যামসুন্দর, সেই ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ শরৎকালীন উৎপলময় মহাহ্রদের ন্যায় প্রসন্ন হইলেন। নীরদ-নির্ম্মলকান্তি ভগবান্ হরি সেই দ্বিজনিলয় শৈলকন্দরোদ্দেশে আগমন করিলেন এবং ব্যোমদেশে বিরাজিত রহিয়াই গাধিকে বলিতে লাগিলেন।

ভগবান্ কহিলেন,—হে গাধে! আমার মহামহিমময়ী মায়া তুমি দেখিতে পারিলে কি? এই দৈবাত্মক জগজ্জাল-চেষ্টা তোমার স্পষ্টতই দৃষ্টিগোচর হইয়াছে। তোমার মনোবাঞ্ছিত মদীয় মায়া এতদিনে দেখিলে; অথচ কিজন্য আবার গিরিগুহার তটে বসিয়া তপোনুষ্ঠান করিতেছ? তোমার এই তপঃসাধনার অন্য কি আকাঙ্ক্ষা আছে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—ভগবান্ হরি এই কথা কহিলে দ্বিজবর গাধি তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কুসুমাঞ্জলি-দানে তদীয় পাদ-পদ্ম-যুগলে পূজা

করিলেন। কুসুমাঞ্জলি বিকিরণ, অর্ঘ্যপ্রদান, প্রদক্ষিণ এবং প্রণিপাত করিয়া সেই দ্বিজ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিলেন। মনে হইল, চাতক যেন নব মেঘের নিকট যাচ্ঞা করিল।

গাধি কহিলেন,—হে দেব! এই যে আপনি অতিমহতী মায়া আমায় দেখাইলেন, দিনমণি যেমন প্রভাতকালে মহীমণ্ডলের প্রকাশ সাধন করেন, আপনি তেমনি এক্ষণে এই মায়ার তত্ত্ব আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন। হে দেব! বাসনামলে জড়িত হইয়া মন আমার স্বপ্নের ন্যায় যেরূপ ভ্রম দর্শন করিল, এক্ষণে আমার স্বপ্ন নাই,—আমি জাগ্রদবস্থায় আছি, তথাচ সে ভ্রম আমার দৃষ্টিগোচর হয় কেন? বলুন,—দেব! এ রহস্য কি? হে নির্ম্মলপদের আস্পদ! আমি জলমধ্যে থাকিয়া মুহূর্ত্ত মাত্র সেই যে স্বপ্নভ্রম উপলব্ধি করিয়াছিলাম, অধুনা আবার তাহাই প্রত্যক্ষ করিলাম কেন? যে কালে আমার চণ্ডালভ্রম জন্মিয়াছিল, সেই কালের দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা এবং আমার সেই চণ্ডালদেহের উৎপত্তি ও বিনাশ, এ সকল আমার মাত্র মনেই রহিল না কেন? কেন এ সমুদায় বাহিরে আবার আমার দৃষ্টিগোচর হইল?

ভগবান্ কহিলেন,—হে গাধে! তুমি যে মহান্ জগদ্বিভ্রম দেখিতেছ, উহা চিত্তভাবাপন্ন আত্মস্বরূপেরই রূপবিশেষ বলিয়াই জানিবে। এই আত্মস্বরূপ নির্ম্মল নহে,—উহা বাসনারোগে আক্রান্ত এবং তত্ত্বদর্শনে অকৃতকার্য্য। ফলতঃ ঐ রূপ বাহিরে নাই, অন্তরে নাই বা উহা অল্পও নাই, দীর্ঘও নাই। যদি তুমি আছে বলিয়া আশঙ্কা কর, তাহা হইলে তোমায় বলি,—তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না; কেন না, আকাশ, দিক্, পর্ব্বত, পৃথ্বী, ইত্যাদির অস্তিত্ব প্রকৃতই বাহিরে কিছুই নাই। যেমন অঙ্কুরাভ্যন্তরে পত্রপুঞ্জ, তেমনি চিত্তমধ্যেই ঐ সমস্ত অবস্থিত। যেমন অঙ্কুরমধ্যস্থ তরু-পল্লবাদি অঙ্কুর হইতে নির্গত হইয়া বাহিরে স্বপ্রকাশ ভাব ধারণ করে, তেমনি ক্ষিতি প্রভৃতি নিখিল পদার্থই চিত্ত হইতে উৎপন্ন হইয়া বাহিরে বিকাশ পাইতেছে। বস্তুতঃ এই ক্ষিতি প্রভৃতি পদার্থপুঞ্জ চিত্তমধ্যেই অবস্থান করিতেছে। ইহাদের বহিঃস্থিতি কখন নাই। অঙ্কুর হইতে পল্লব-ফলাদির পশ্চাৎ বহিঃপ্রকটনের ন্যায় ক্ষিতি প্রভৃতি চিত্ত হইতেই

বহিঃপ্রকটিত হয়। চক্ষুরাদির সহায়তায় বর্ত্তমান বিষয়ের দর্শন, মনের সাহায্যে ভাবী বিষয়ের সমর্থন, অতীত বিষয়ের অনুধ্যান, ঐ সমুদায়ের নিরূপক ত্রিবিধ কাল এবং সেই সেই কালের প্রকাশক সূর্য্যাদির ক্রিয়া বা গতি, এ সকলই কুম্ভকার-কৃত ঘটনির্ম্মাণের ন্যায় চিত্ত আপনাতে নির্ম্মাণ করে এবং আপনাতেই উপসংহার করিয়া লয়। বালক হইতে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকল লোকেই স্বপ্ন, ভ্রম, মত্ততা,একান্ত আসক্তি বা বিশেষ বিশেষ রোগ,—ইত্যাদি সকল প্রকার দৃষ্টিই উদাহরণরূপে গ্রহণ করিয়া বিচারালোচনার সহিত দেখিলে এ তত্ত্ব অনায়াসেই অবগত হইতে পারে। মূলদেশ-যোগে ভূতল আক্রমিয়া কৃতাবস্থান বৃক্ষে যেমন অগণিত ফল-কুসুম বিরাজমান, তেমনি অধিষ্ঠান সদ্‌ব্রহ্ম-পদ অবলম্বনে অবস্থিত বাসনাময় চিত্তেই লক্ষ লক্ষ ঘটনা-পরম্পরা বিদ্যমান। বৃক্ষ যদি ভূতল হইতে বিচ্ছিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাতে যেমন পত্রাদি প্রকাশ পায় না, তেমনি জীব একবার বাসনা-বিরহিত হইলে তাহার আর কখন জন্মাদি-যাতনা ঘটে না। ভাবিয়া দেখ, এই অসংখ্য জগৎ যাহাতে সূক্ষ্মাকারে অবস্থান করিতেছে এবং যে ব্যক্তি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ করিতেছে, সে যদি চণ্ডালত্ব প্রকটিত করে, তবে তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কি আছে? হে দ্বিজ! তুমি যেমন প্রতি-ভাস বা ভ্রান্তিবিরচিত সেই সেই বিচিত্র চণ্ডালভাব অনুভব করিয়াছ, পক্ষান্তরে তোমার কাছে যে অতিথি আসিল, আহার করিল, শয়ন করিল, বাক্যালাপ করিল,প্রত্যাবর্ত্তন করিল, অপিচ তুমি যে ভূতমণ্ডলে গিয়াছ,তথায় যে চণ্ডালপল্লী দেখিয়াছ, লোকমুখে যে কটঞ্জক নামক চণ্ডালের বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছ, কীরবাজধানী দেখিয়াছ, এবং ভূতপূর্ব্ব কীরাধিপতির যে বিবরণ শ্রবণ করিয়াছ, এ সকল ঘটনাও তোমার ঐরূপ চিত্ত-ভ্রমেরই নিদর্শন। তোমার চিত্তই ঐ সকল দেখিয়াছে এবং অতি সূক্ষ্ম বাসনাকারে ঐ সমস্ত তোমার চিত্তমধ্যেই অবস্থান করিতেছিল।

হে দ্বিজবর! তুমি যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, যাহা তোমার অসত্য বলিয়া ধারণা জন্মিয়াছে এবং যে যে সকল তুমি দর্শন করিয়াছ, এই সমস্তই মোহের মাহাত্ম্য। বস্তুতঃ বাসনাবলিত চিত্ত কি না দর্শন করে? মনে কর, যে কার্য্য একান্তই অসাধ্য, স্বপ্নাবস্থায় দেখা যায়, তাহাও সুসাধিত

হইয়াছে। হে প্রশস্ত-বুদ্ধে! না সেই অতিথি, না সেই ভূতমণ্ডলের অধিবাসিগণ, না সেই কীরনাগরিকগণ, না সেই কীরগ্রামবাসী, ইহাদের কেহই কিছু নয়; সমস্তই মিথ্যা,—কেবল এ সকল ব্যামোহ-বশেই অবলোকন করিয়াছ। হে বিপ্র! তুমি পান্থ-বেশে [illegible] যাত্রা করিয়াছিলে, যাইতে যাইতে 'কাননে [illegible] কোন এক কন্দরে বিশ্রাম লাভ [illegible] শ্রম-জনিত মোহ উপস্থিত হয়, সেই মোহের ঘোরেই '[illegible] গ্রাম, এই সেই চণ্ডালপল্লী' ইত্যাদি সমস্তই তুমি দেখিয়াছ; [illegible] কথা বলিতে কি, ঐ সকলের একটাও সত্য নহে। বলা বাহুল্য, তুমি যে কীরনগর দেখিয়াছ, তাহাও ঐ রূপই। সেই যে সর্ব্বপ্রথমে তুমি অঘমর্ষণমন্ত্র-জপকালে আত্মমরণাদি দেখিয়াছিলে, তাহাও ঐ ভ্রমেরই মহিমা জানিবে। হে মুনে! অধিক বলিব কি, তুমি চারিদিকে ভ্রমণ করিতে করিতে সর্ব্বকালেই মনে মনে উন্মাদ ব্যক্তির ন্যায় এই সকল ভ্রম দর্শন করিয়াছ। যাহা হউক, এক্ষণে উত্থিত হও,—উঠিয়া প্রশান্তচিত্তে স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনপূর্ব্বক অবস্থান কর। দেখ, মানবেরা স্বকর্ম্ম ব্যতীত কুত্রাপি শ্রেয়ঃপ্রাপ্ত হইতে পারে না।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—পদ্মনাভ হরি,—ত্রিভুবনস্থ সমস্ত তপস্বীর পূজার পাত্র। তিনি গাধিকে এই সকল তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়া পবিত্রপাণি নানা দেব ও মুনিগণে পরিবৃত হইলেন,—হইয়া নিজ নিকেতন নীরনিধির নিকট গমন করিলেন।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৪৮ ॥

ঊনপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! ভগবান্ বিষ্ণু অন্তর্হিত হইবার পর দ্বিজবর গাধি নিজে নিজেই মোহ বিচার করিবার নিমিত্ত অম্বরে অভ্রের ন্যায় পুনরায় ভূতমণ্ডলাদি দেশে ক্রমশঃ পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অর্থাৎ ভগবান্

যাহা কহিয়া গেলেন, তাহা সত্য, কি মিথ্যা, অথবা পূর্ব্বদৃষ্ট ভূতমণ্ডলাদি মায়াময় কি না, তাহা পরীক্ষার্থ পুনরপি সেই সেই দেশ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি যে যে দেশে গমন করিলেন, সেই সেই দেশেই লোকমুখে স্বীয় চণ্ডালত্ব-লাভাদির বৃত্তান্ত,—পূর্ব্বে যেরূপ অনুভব করিয়াছিলেন, সেইরূপই শুনিতে লাগিলেন এবং চিহ্নাদির দ্বারাও সেইরূপই দেখিতে লাগিলেন। এইরূপে দেখিয়া শুনিয়া গাধি পুনরায় সেই গিরিকন্দরে গমন করিলেন এবং পুনরপি হরির আরাধনায় নিরত হইলেন। অনন্তর অল্পকাল পরেই জনার্দ্দন আবার আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এবার গাধির ঈদৃশ অল্পারাধনায় ভগবানের প্রসন্নতার কারণ এই যে, মাধব যদি একবার কখন সম্যক্ আরাধিত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি চির-বান্ধবের ন্যায় হইয়া থাকেন। যাহা হউক, মেঘ যেমন গম্ভীর নাদে ময়ূরের সহিত আলাপ করে, তেমনি সেই ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইয়া গাধিকে তখন গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—গাধে! আবার তুমি তপস্যা করিয়া কি বর প্রার্থনা করিতেছ?

গাধি কহিলেন,—হে দেব! আবার আমি ভূতমণ্ডল ও কীরনগর প্রভৃতি জনপদসমূহে পরিভ্রমণ করিয়াছি; কিন্তু সেই সেই দেশে যেরূপ জনপ্রবাদ শুনিলাম, তাহাতে মদীয় পূর্ব্বানুভূত বৃত্তান্তের ত কিছুই ব্যভিচার হইল না। ফল কথা, পূর্ব্বে যাহা যাহা দেখিয়াছিলাম, যাহা যাহা শুনিয়াছিলাম, এবারেও সেই সেই সকল দেখিয়াছি এবং সেই সেই বৃত্তান্তই শুনিয়াছি; সুতরাং তবে কেন আর হে প্রভো! আপনি আমার নিকট আমার পূর্ব্বদৃষ্ট ঘটনাগুলিকে ভ্রমের কার্য্য বলিয়া বর্ণন করিলেন? এক্ষেত্রে আমি আপনার কথা সমর্থন করি কিরূপে? অথবা আপনার তত্ত্বোপদেশ যথার্থই বা হইবে; কেন না, মহৎ ব্যক্তিগণের বাক্যে মোহনাশই হয়; পরন্তু তাহা কখনই মোহের বর্দ্ধক নয়।

ভগবান্ কহিলেন,—হে দ্বিজ! তোমার অন্তরে যেমন উল্লিখিতরূপে চণ্ডালপল্লীতে চণ্ডাল হইয়া অবস্থান ও কীরদেশে রাজপদ-লাভ ইত্যাদি ঘটনা অবস্থিত, তেমনি সেই প্রসিদ্ধ ভূতমণ্ডলবাসী ও কীরাধিবাসীদিগের

চিত্তেও কাকতালীয়যোগে ঐরূপ শ্বপচ-বিচরণ প্রতিবিম্বিত আছে। অর্থাৎ ভ্রমক্রমে প্রত্যক্ষের ন্যায় প্রতীত হইতেছে; এই জন্যই তাহারা তোমার নিকট উল্লিখিত ঘটনা-বিবরণ ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেছে। হে গাধে! প্রতিভাস বা ভ্রমের এমনি মহিমা যে, যতক্ষণ না বাধ-জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ততকালের মধ্যে কোনক্রমেই তাহার অন্যথা ঘটনা হয় না; ফল কথা, ততদিন তাহা সত্যের ন্যায়ই প্রতিভাত হইতে থাকে। জানিবে,—কোন চণ্ডাল পূর্ব্বে ঐ গ্রামে এক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কালক্রমে উহা ভগ্ন-দশায় উপনীত হইলে ভ্রান্তিবশতঃ তুমি তাহাকে আপনার বলিয়া অবলোকন করিয়াছ। এমন অনেক সময় ঘটে, যখন বহুলোকের এক প্রকারই প্রতিভাস বা ভ্রান্তি হইয়া থাকে। পক্ক তাল-ফলোপরি কাকোল-পক্ষীর অবস্থিতির ন্যায় মনের গতি অতি বিচিত্র। যাহারা সুরাপানে মত্ত, তাহাদের চিত্ত যেমন দিঙ্মণ্ডলকে একই রূপে ঘুরিতে দেখে, তেমনি একই সময় বহু লোকে একরূপ স্বপ্নই সন্দর্শন করিয়া থাকে। সংসারে এরূপ ঘটনার অভাব হয় না। আরও দেখ, বহু বালক একই সময়ে সিকতাদির সন্নিবেশে সঙ্কেত-কল্পিত গৃহ, প্রাসাদ ও দুর্গাদি বিবিধ ভ্রান্তি-লীলাতেই ক্রীড়া করিয়া থাকে। একই শস্য-শ্যামলা বনস্থলীতে বহু মৃগ বিচরণ করে। এই সকল দৃষ্টান্ত দেখিয়া বুঝ, সেই একই চণ্ডাল-বৃত্তান্তের ভ্রম বহুলোকের অন্তরে উদিত হইতে পারে কি না? ফল কথা, তোমার চিত্তে যেমন চণ্ডাল প্রতিভাস আবির্ভূত, অন্য বহু লোকের চিত্তেও ঐরূপ প্রতিভাস হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। ভাবিয়া দেখ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, বধ, বন্ধন, জয়, পরাজয় ও পলায়ন প্রভৃতি বহু বিবিধাকার ফল স্ব স্ব প্রারব্ধ ফলের পরিণামক্রমে লভ্য হইলেও বহু সৈনিকাদি লোক ভ্রান্তি বা প্রতিভাসের বশীভূত হইয়াই একই সময়ে একই রূপ জয় লাভাদি ভোগজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। অর্থাৎ লোভে পড়িয়া যুদ্ধাদি কার্য্য করিতে বদ্ধপরিকর হয়। বলিতে পার, এই জগৎ যদি এইরূপে মানস কল্পনাই হয়, তাহা হইলে তো হেমন্তাদি কাল ব্রীহি প্রভৃতির অঙ্কুরোদয়ের প্রতিবন্ধক আর যবাদির অঙ্কুরোদয়ের উহা প্রতিবন্ধক নহে, বরং অনুজ্ঞাদাতা, এই প্রকার যে লোকপ্রসিদ্ধি আছে, তাহার বাধ-ঘটনা

অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। কারণ, মানস কল্পনায় বাহ্যকালের ব্যবস্থাপকর্তা-যোগ অসম্ভব। ইহার উত্তরে বলা যায়, হে বিপ্র! লোকে যে কালকে উৎপত্তির কারণ ও উৎপত্তির অন্তরায় বলিয়া কল্পনা করে, সে কালও মনেরই সঙ্কল্পমাত্র। কেন না, বিশেষ বিশেষ দিগ্‌দেশ-ঘটিত সৌর গতি দর্শন করিয়া মন দ্বারাই যথাশাস্ত্র মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসরাদি কল্পিত হইয়া থাকে। তবে অকল্পিত কাল কি? এরূপ প্রশ্নের উত্তর এই যে, যাহা অকল্পিত বা অখণ্ড কাল, তাহার নাম পরমাত্মা; সেই পরমাত্মস্বরূপ কাল আপনাতেই আপনি অবস্থান করেন। তিনি কাহারও প্রতিরোদ্ধা বা অনুমোদনকর্ত্তা নহেন। সেই ভগবান্ কাল অমূর্ত্ত অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্ন বা অখণ্ড; তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ সেই কালকেই অজ ব্রহ্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। তিনি কদাচ কাহারও কিছুই গ্রহণ করেন না, বা কখন কিছুই পরিত্যাগ করেন না। যাহাকে লৌকিক বা লোক-কল্পিত কাল বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় এবং যাহা বর্ষ, যুগ ও কল্পাদি পরিচ্ছেদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, তাহা সূর্য্য ও চন্দ্রপিণ্ড প্রভৃতি উপাধি অবলম্বনপূর্ব্বক কল্পিত হয় এবং তাহাকে ক্রিয়াত্মক কালের ব্যবস্থাপক মাত্র বলা যায়। যাহা হউক, হে দ্বিজ! অধুনা প্রসঙ্গাগত কথা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করিতেছি। তুমি এবং ভূতমণ্ডল ও কীরদেশের অধিবাসীরা তোমরা সকলেই ভ্রমে পড়িয়া একই রূপ প্রতিভাসোদিত সেই সেই ঘটনা সেই সেইরূপই দেখিয়াছ। হে সাধো! যাহা দেখিবার দেখা হইয়াছে, এখন তোমার নিজের কর্ত্তব্য পালন কর। তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি বুদ্ধিপূর্ব্বক আত্মবিচার করিতে থাক। তোমার মনের মোহ কাটিয়া যাউক। তুমি এইখানেই আত্মনিষ্ঠ হইয়া অবস্থিত হও। আমি এক্ষণে চলিলাম।

ভগবান্ বিষ্ণু এই কথা কহিয়া অন্তর্দ্ধান করিলেন। তখন গাধি বহুল আধি-পরীত-চিত্তে সেই গিরিকন্দরে থাকিয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কতিপয় মাস অতীত হইলে পুনরায় গাধি দ্বিজ পুণ্ডরীকাক্ষ হরির আরাধনায় তৎপর হইলেন এবং দেখিলেন,—একদা ত্রিলোকনাথ

হরি তাঁহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে তিনি তাঁহাকে প্রণিপাত করিলেন এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন,—ভগবন্! আমি নিজ চণ্ডালস্থিতি এবং এই দীর্ঘ সংসার-মায়ার বিষয় মনে মনে স্মরণ করিয়া একান্তই মোহাচ্ছন্ন হইয়াছি। অতএব হে প্রভো! যাহাতে আমার এই মনের মোহ উপশমিত হইয়া যায়, আপনি এমন কোন উপায় বলিয়া দিয়া আমার সংশয়ের অবসান কাল পর্য্যন্ত এই-স্থানে অবস্থান করুন। আমার প্রার্থনা,—আমাকে আপনি একটীমাত্র নির্ম্মল কর্ম্মে নিয়োগ করুন।

ভগবান্ কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই যে জগৎ দেখিতেছ, ইহাই মহতী মায়া। আত্মবিস্মৃতির ফলে এখানে সর্ব্ববিধ আশ্চর্য্য ঘটনাই সম্ভব হইতে পারে। তুমি চণ্ডাল হইয়া ভূতমণ্ডলে বাস করিয়াছ এবং কীরদেশে রাজত্ব করিয়াছ, ইত্যাদি যে সকল ঘটনা তোমার প্রত্যক্ষ হইয়াছে, তাহার কোন কিছুই এখানে অসম্ভব নহে। কেন না, মনুষ্যমাত্রেই ভ্রমে পতিত হয় এবং ভ্রমে পড়িয়া কত অঘটন-ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে। তুমি একা ভ্রম দেখ নাই, ভূতমণ্ডলের অধিবাসীরা এবং কীরদেশীয় লোকেরাও ভ্রম দর্শন করিয়াছে। একই প্রকার সঙ্কল্পে একই কালে উল্লিখিত ঘটনাপরম্পরা সংঘটিত হইয়াছিল; সেই জন্যই ঐ সকল ঘটনা মিথ্যা হইলেও সত্যের ন্যায় অনুভূত হইতেছে। যাহা হউক, মার্গশীর্ষ-মাসীয় লতার ন্যায় তোমার চিন্তার যাহাতে ক্ষয় হয়, সে নিমিত্ত ভবদীয় গ্লানিকর চণ্ডাল-সম্বন্ধের বিযোজক এই যথাযথ ঘটনা বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। তুমি যেরূপ দেখিতে পাইয়াছ, যেরূপ অনুভব করিয়াছ, অবিকল সেইরূপ আকৃতি, গৃহ, গ্রাম, স্ত্রী, পুত্র ও চরিত্র-বিশিষ্ট কটঞ্জক নামক জনৈক চণ্ডাল পূর্ব্বে ভূতমণ্ডলগ্রামে জন্মিয়াছিল। সেই চণ্ডালই পুত্র-কলত্রাদি হইতে বিচ্যুত হয়,—হইয়া দেশান্তরে গমনপূর্ব্বক কীরদেশের আধিপত্য প্রাপ্ত হয় এবং পরে হুতাশনে আত্মজীবন আহুতি প্রদান করে। তুমি যখন জলমধ্যে থাকিয়া অঘমর্ষণ-মন্ত্র জপ করিবার উপক্রম করিতেছিলে, তখন আমারই ইচ্ছায় বা সঙ্কল্পানুসারে তোমার অন্তরে সেই কটঞ্জ চণ্ডালের তাদৃশ আকার, প্রকার, ব্যবহার ও অবস্থান, সমস্তই ভ্রমরূপে প্রতিভাত

হইয়াছিল। বলিতে পার, কখন যাহা দেখা হয় নাই, ঈদৃশ দেশান্তরস্থ অতীত ঘটনাকে কিরূপে সম্মুখাবস্থিতের ন্যায় দর্শন করা যায়? এ কথার উত্তর এই যে, দ্রষ্টা কখন কখন অনুভূত বিষয় ভুলিয়া যায়, আবার কখন কখন অদৃষ্ট বিষয়ও দৃষ্টিগোচর করে। হে গাধি! চিত্ত যেমন স্বপ্নে, মনোরাজ্যে কিম্বা সান্নিপাতিক রোগাক্রমণে নানাবিধ অনুভূতপূর্ব্ব ও অননুভূতপূর্ব্ব ভ্রম দর্শন করে, জাগ্রদবস্থাতেও লোকে তেমনি নানাপ্রকার ভ্রম স্বয়ং সন্দর্শন করিয়া থাকে। হে দ্বিজ! ত্রিকালদর্শী যোগীর চিত্তে যেমন ভাবী বিষয়ও তাহার উত্তরকালস্থ বিষয়ের প্রত্যক্ষ কালে অতীত কালস্থ বলিয়া বোধ হয়, তেমনি কটঞ্জ-বৃত্তান্ত অতীত ঘটনা হইলেও তোমার চিত্তে বর্ত্তমানবৎ প্রতিভা প্রাপ্ত হইয়াছে। যদি বল, সেই কটঞ্জ আমার কেহই নহে, আর তাহার গৃহ-কলত্রাদিও তো আমার অনাত্মীয়; এরূপ ক্ষেত্রে 'এই যে আমি, তদীয় গৃহ কলত্রাদি আমার' এইরূপে তন্ময়তায় আত্মজ্ঞান হইল কেন? উত্তরে বক্তব্য এই যে, যিনি আত্মজ্ঞ পুরুষ, তিনি 'এই সেই আমি, এই সকল আমার' ইত্যাদি ভ্রমে কদাচ মগ্ন হন না; পরন্তু যাহার আত্মজ্ঞান নাই, তাহাকেই উল্লিখিত রূপ ভ্রমপ্রবাহে মগ্ন হইতে হয়। আত্মানভিজ্ঞ সমস্ত ব্যক্তিরই আত্ম ভিন্ন দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি বিদ্যমান; সুতরাং তোমারও অনাত্মে আত্মজ্ঞান আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহাদের মনোমধ্যে 'সমস্তই আমি' এইরূপ ধারণা থাকিলে কদাচ তাঁহারা অবসাদগ্রস্ত হন না এবং পদার্থসমূহের অনর্থকর বিভাগ-কামনাও তাঁহাদের নাই। এই জন্যই সুখ-দুঃখ ভ্রম-পরম্পরায় কখন তাঁহারা পতিত হন না, এবং যদিও কদাচ পতিত হন, তথাপি জলে যেমন শুষ্ক অলাবুর মজ্জন হয় না, তেমনি তাঁহারাও একেবারেই মগ্ন হইবার নহেন। তোমার চিত্ত এখনও বাসনাজালে বিজড়িত আছে, এখনও তুমি বিচেতন রহিয়াছ এবং কিঞ্চিদবশিষ্ট মহাব্যাধি-গ্রস্ত ব্যক্তির ন্যায় এখন তুমি সম্পূর্ণ স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইতে পার নাই। তোমার জ্ঞানের পূর্ণতা হয় নাই, তাই যে ব্যক্তি নিজে গৃহ নির্ম্মাণ করে না, বা পরগৃহে প্রবিষ্ট হয় না, তাহার যেমন বৃষ্টি-জলধারা নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই, তেমনি তুমিও এক্ষণে মনের ভ্রম নিবারণ করিতে পার নাই। উন্নতকায় পুরুষ

যেমন উচ্চ বৃক্ষশাখা আক্রমণ করিতে পারে, তেমনি তোমার মনোমধ্যে যাহা উদিত হইতেছে, তাহাই ক্ষণমধ্যে তোমাকে আক্রমণ করিতেছে। চিত্তই মায়াচক্রের নাভি বা মধ্যস্থল। চারি দিকেই ইহা অনবরত ঘুরিতেছে। যদি তুমি উহা আক্রমণ বা অবরোধ করিয়া থাকিতে পার, তাহা হইলে উহা হইতে কদাচ তুমি আর বাধা বা পীড়া প্রাপ্ত হইবে না। তুমি উত্থিত হও, এই গিরিকুঞ্জে থাকিয়া দশবর্ষকাল অখিন্নমনে তপস্যা করিতে থাক। এই তপস্যার ফলে যাহা অনন্ত বিজ্ঞান, তাহাই তুমি পরে প্রাপ্ত হইবে।

পুণ্ডরীকাক্ষ হরি এই বলিয়া তৎক্ষণাৎ অন্তর্হিত হইলেন। মনে হইল, প্রবল বায়ু-চালিত মেঘ অথবা বাতাহত দীপ কিম্বা কালিন্দীর তরঙ্গ-ভঙ্গ যেন সহসা বিলয় প্রাপ্ত হইল। অনন্তর গাধি দ্বিজ বৈরাগ্য লাভ করিলেন। বোধ হইল, শরৎসময়ের অবসানে পাদপ যেন বিরস-ভাব ধারণ করিল। এইরূপে গাধির মতি যখন একেবারে ভ্রমজাল হইতে নির্ম্মুক্ত হইল, তখন তিনি প্রাক্তন কর্ম্মরূপ অদৃষ্টের সেই সেই অসঙ্গত বিচিত্র চেষ্টার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। চিত্ত সংযম অভ্যাস করিয়া পরম পদে বিশ্রাম লাভ করিবার জন্য তৎকালে তিনি পয়োধর-বৎ ঋষ্যমুক শৈলে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার সমস্ত সঙ্কল্প নিরস্ত হইল। তিনি দশবর্ষ যাবৎ সেইখানে কঠোর তপস্যা করিলেন। পরে তপঃফলে তাঁহার আত্মজ্ঞান লাভ হইল।

রামচন্দ্র! আত্মজ্ঞান লাভ হইবার পর গাধি দ্বিজ নিজ পারমার্থিক সত্তা লাভ করিলেন। তাঁহার ভয় বা শোক কিছুমাত্র রহিল না। তিনি জীবন্মুক্ত-স্বরূপে প্রতিভাত হইলেন। অতএব তাঁহার চিত্ত তখন অপরিচ্ছিন্ন আত্মানন্দ-মদে ঘূর্ণিত ও আপূর্ণ হইল। তিনি কলাপূর্ণ শশাঙ্কের ন্যায় অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাকাশে প্রশান্তভাবে বিশ্রান্তি লাভ করিলেন।

ঊনপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৪৯ ॥

পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! এই পারমাত্মিকী মহামোহময়ী মায়াকে তুমি অতি-বিস্তৃত, অতি বিষম ও অতি দুর্জ্জেয় বলিয়াই জানিবে। ভাবিয়া দেখ, কোথায় সেই গাধি ব্রাহ্মণের দুই মুহূর্ত্তব্যাপী স্বপ্ন-সম্ভ্রম-দর্শন, আর কোথায়ই বা সেই বহুবর্ষ-ব্যাপক চণ্ডাল-রাজ্যাদি-ভ্রম! কোথায় ভ্রম জ্ঞান, আর কোথায়ই বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান! কোথায় অসন্দিগ্ধ অসত্য-ভাব, আর কোথায়ই বা অসত্যের সত্য-পরিণাম! হে মহাবাহো! এ বিচিত্র মায়াগতি তুমি বুঝিতে পারিলে ত? আমি এই জন্যই তোমায় বলিতেছিলাম, এই মায়া অতি বিষমা; ইহা অসাবধান বা প্রমাদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সংসার-সঙ্কটে পাতিত করিয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই মায়াচক্র যদি এইরূপেই সর্ব্বাঙ্গ-চ্ছেদনের ন্যায় পূর্ণানন্দময় আত্মার পরিচ্ছেদ-দুঃখ প্রতিপাদন করিয়া প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে, তাহা হইলে কিরূপে ইহাকে রোধ করা সম্ভব হইবে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ! এই সংসাররূপ মায়াচক্র সদাই ঘূর্ণমান এবং সততই ভ্রমের নিদান; তুমি চিত্তকেই এই মায়াচক্রের মহা-নাভি বলিয়া জানিবে। যদি বুদ্ধিযোগে পুরুষকার প্রয়োগে চিত্তকে আক্রমণ করা যায়, তাহা হইলেই উল্লিখিত মায়াচক্রের মহানাভি গ্রহণ করা হয় এবং এইরূপে গ্রহণ করিতে পারিলেই ঐ মায়াচক্র ভ্রমণ হইতে বিরত হইয়া থাকে। রজ্জুকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে রজ্জুবেষ্টিত চক্র-কীলক যেমন আর ঘূর্ণিত হইতে পারে না, তেমনি মনোরূপ মহানাভিকে আক্রমণ করিয়া ধরিতে পারিলে, মায়াচক্র আর কোন ক্রমেই ঘুরিতে পারে না।

হে অনঘ! চক্রযুদ্ধে তোমার অসাধারণ অভিজ্ঞতা আছে; অথচ তুমি চক্রের ঘূর্ণন ও তাহার অবরোধ ক্রিয়ার প্রণালী জানিতেছ না কেন? জানিও,—

ঐ চক্রকে যদি নাভিদেশে সবলে চাপিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেই উহা বশতাপন্ন হইয়া থাকে ; অন্যথা উহাকে বশে আনয়ন করা অসম্ভব। তাই বলিতেছি, হে রঘুবংশনায়ক ! তুমি যত্নের সহিত চিত্ত-নাভিকে অবরুদ্ধ করিয়া আত্মার জনন-মরণ প্রবাহের প্রতিরোধ-কল্পে সংসারচক্রকে নিরুদ্ধ করিয়া ফেলো। আত্মার দুঃখ-মোচন পক্ষে এই চিত্ত-নিরোধ একটী প্রধান উপায়। এই উপায়ের অবলম্বন ব্যতীত আত্মার অনন্ত দুঃখ মুক্তি হইবে না ; যে দুঃখ,—সেই দুঃখই চিরদিন রহিয়া যাইবে। আমার উক্তিতে তুমি যদি সন্দিহান হও, তাহা হইলে নিজেই একবার মদুপবর্ণিত নিরোধ উপায় অবলম্বন কর,—করিয়া দেখ, আত্মার যাবতীয় দুঃখ ক্ষণকাল মধ্যেই বিলীন হইয়া গিয়াছে। এই দুঃখশান্তি ব্যাপারে চিত্ত-নিরোধই একমাত্র মহৌষধ। এই ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত অপর বহু যত্নেও সংসার-মহারোগের শান্তি হইবে না। তাই বলিতেছি, হে রঘুনন্দন ! তুমি তীর্থ-পর্য্যটন, দান ও তপস্যাদি ক্রিয়াকলাপ পরিত্যাগ কর,—করিয়া পরম শ্রেয়োলাভের নিমিত্ত মাত্র স্বীয় চিত্তকে বশীভূত কর। যেমন ঘটের মধ্যে ঘটাকাশ, তেমনি চিত্ত হইতেই সংসার-বিলাস। ঘট ধ্বংস হইলে যেমন ঘটাকাশ থাকে না, তেমনি চিত্ত নষ্ট হইলেই সংসারের আর অস্তিত্ব থাকে না। যেমন ঘটমধ্যে নিরুদ্ধ মশকাদি প্রাণী অল্পপরিসর ঘটাকাশে অতি দুঃখে সঞ্চরণ করে, অনন্তর দৈবক্রমে সেই ঘট যদি ভগ্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা যেমন অসীম অনন্তাকাশ পাইয়া মহাসুখে সঞ্চরণ করিতে থাকে, তেমনি তুমিও তোমার চিত্তরূপ ঘটাকাশ বিনাশ করিয়া অতুলিত ব্রহ্মাকাশে প্রবেশ কর,—করিয়া সুখী হও। চিত্ত যদি আয়াসহীন বা অনাসক্ত হয়,—হইয়া বাহ্যবুদ্ধিতে ক্ষণকালের জন্য কেবলমাত্র বর্ত্তমান বিষয়ের সেবা করিয়া অতীত ও অনাগত বিষয়ের ভাবনা পরিত্যাগ করে, তাহা হইলেই তাহার অচিত্ততা ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ চিত্ত তখন কল্পনা-হীন হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। তুমি যদি অনুক্ষণ সঙ্কল্পের অন্বেষণ না কর, তাহা হইলেই দেখিবে,—নিশ্চয়ই তুমি পবিত্র অচিত্তভাব লাভ করিয়াছ। যতদিন সঙ্কল্প-কল্পনা থাকে, চিত্তের প্রভুত্ব ততদিনই অক্ষুণ্ণ থাকে।—যতক্ষণ জলদবিস্তার, ততক্ষণই আকাশে জলবিন্দুর সঞ্চার। যে পর্য্যন্ত চিদাত্মা

চিত্তযুক্ত হইয়া থাকিবেন, সঙ্কল্প-কল্পনা ততকালই রহিবে। দেখ, এ জগতে যতকাল চন্দ্ররশ্মির অধিষ্ঠান, ততকালই তুষারবিন্দুসমূহের নিপতন। যদি তুমি চিদাত্মাকে চিত্ত হইতে পৃথক্ অর্থাৎ কূটস্থরূপে ভাবনা করিতে পার, তাহা হইলে জানিবে,—তোমার সংসারের মূল পর্য্যন্ত দগ্ধ হইয়া গিয়াছে। অর্থাৎ কাম, কর্ম্ম ও বাসনাদি সকলই তখন বিলয় পাইয়াছে। বলিতে পার, দগ্ধ হয় হইলই বা, তথাপি চিদাত্মায় পুনরায় কল্পনামল-বশতঃ চিত্তাদির উদ্ভব হওয়া অসম্ভব হইবে কি? উত্তরে বলা যায়, চিত্ত-রিক্ত চেতনই প্রত্যক্‌চেতন আখ্যায় অভিহিত। এই প্রত্যক্‌চেতন বস্তুতঃ নির্ম্মনস্ক-স্বভাব; সুতরাং ইহাতে কল্পনামল থাকিতেই পারে না। যাহা চিত্ত রহিত চেতনস্বরূপ, তাহাই পরমার্থ সত্যতা; তাদৃশ নির্ম্মনস্ক অবস্থাই শিবতা, তাহাই পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞতা এবং তাহাই বটে পরমার্থ-দৃষ্টি। শ্মশানে যেমন সততই বায়স বাস করে, তেমনি যেখানে মন, সেইখানেই আশা এবং সেই সেইখানেই সুখ-দুঃখ নিত্য সন্নিহিত। বলিতে পার, তত্ত্ববেদিগণের মধ্যেও তো অনেকের মন আছে, তথাচ তাঁহাদের মনঃ-সঙ্কল্পে আশাপ্রভৃতির উদয় নাই কেন? উত্তরে বলি,—হাঁ, তাঁহাদের মন আছে বটে; কিন্তু যে সংসারবল্লী আশাদি নিখিলভাবের ব্যবস্থা-পয়িত্রী, তাঁহাদের মানস সঙ্কল্পে তাহার বাসনাত্মক বীজই উৎপন্ন হইতে পারে না; কেন না, বস্তুতত্ত্বের অববোধ হেতু তাহা বাধ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সতত শাস্ত্রালোচনা ও সাধুজনের সংসর্গ করিতে অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপ অভ্যাসযোগের ফলে যে কিছু জাগতিক ভাব, তৎসমস্তের অবস্তুতাই অবগত হওয়া যায়। 'আমি এই জন্মেই জ্ঞান সাধনা করিব' এইরূপ স্থির-নিশ্চয় করিয়া পুরুষকার প্রয়োগ করিতে হয়। পুরুষকার দ্বারা চিত্তকে অবিবেক হইতে সবলে নিবর্ত্তিত করিয়া শাস্ত্রচর্চ্চা ও সাধুজন-সেবায় নিয়োগ করিবে। পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিবার পক্ষে আত্মাই প্রধান কারণ। দৃষ্টান্ত দেখ, কোন অগাধ জলে রত্ন পড়িলে সেই রত্নের রশ্মি-সাহায্যেই তাহাকে প্রত্যক্ষ করা যায়। আত্মাই আপনার অনুভূত সুখ-দুঃখাদি পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন; এই জন্য আত্মজ্ঞগণ আত্মাকেই আত্মবিবেকের প্রধান হেতু বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হে অনঘ! তুমি প্রলাপ কর, ত্যাগ কর, গ্রহণ কর, উন্মীলন কর, নিমীলন কর, কিম্বা আর যাহা যাহাই কর, সকল অবস্থাতেই বাহ্য মনন পরিহার করিয়া একমাত্র অনন্ত সম্বিৎ-পরায়ণ হইয়াই থাক। তুমি জাত, মৃত, জীবিত কিম্বা ক্রিয়া-রত, যে কোন অবস্থাতেই অবস্থান কর, পরিশোধন দ্বারা আত্মার অমলতা বিধান করিয়া সম্বিদংশে স্থির হইয়া থাক। উল্লিখিত জাত, মৃত, শব্দের বিশদার্থ এই যে, তুমি জনন-মরণ-সদৃশ সুখ-দুঃখ-দুর্দ্দশার অভ্যন্তরে থাকিলেও তোমার আত্মপ্রবণতার যেন বিস্মৃতি ঘটে না। তুমি সেই দিকেই সতত একাগ্র হইয়া থাক।

'এই পুরোবর্ত্তী বস্তু আমার এবং ঐ দূরস্থ বস্তু আমার', 'এই সেই প্রত্যভিজ্ঞায়মান দেহ,—আমি', এই প্রকার বাসনাকে তুমি বিশেষরূপে বর্জ্জন কর,—করিয়া একনিষ্ঠভাবে অন্তঃস্থিত সম্বিৎ-মাত্রেই তৎপর হও। বর্ত্তমান বাল্যাদি স্থিতি, ভবিষ্যতে যৌবরাজ্যস্থিতি, এইরূপে আজীবন সকল অবস্থাতেই স্বীয় সম্বিৎপ্রভাবে একনিষ্ঠ হইয়া ধ্যান ও সমাধি-তৎপর হইয়া থাক। কি বাল্য, কি যৌবন, কি বার্দ্ধক্য, কি সুখ, কি দুঃখ, কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, কি সুষুপ্তি, যে কোন অবস্থাতেই অবস্থান কর, একমাত্র আত্মচৈতন্যেরই অনুসন্ধান-পরায়ণ হও। তুমি বাহ্য বিষয়রূপ মনের মল পরিহার কর,—করিয়া একেবারে মনকে নির্গলিত করিয়া লও এবং আশাপাশ ছেদন কর,—করিয়া স্বীয় সম্বিৎ-মাত্রেই তৎপর হও, অর্থাৎ আত্মচৈতন্যেই একনিষ্ঠ হইয়া থাক। স্বীয় সঙ্কল্প-রচিত শুভ ও অশুভরূপ যে দুইটী সঙ্কেত আছে, তৎপ্রতি সংসক্ত আশা-বিষূচিকার উচ্ছেদ সাধন কর,—করিয়া ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট দৃষ্টি-বিরহিত হইয়া তুমি সারাৎসার সম্বিৎ-মাত্রের সন্ধান-পরায়ণ হও। উজ্জ্বল মণি যেমন সমীপস্থ বস্তু স্পর্শ করে না অথচ তাহার প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তুমিও তেমনি অহঙ্কারাদি, ইন্দ্রিয়াদি ও বিষয়াদি স্পর্শ না করিয়া কেবল প্রতিবিম্বগ্রাহীর ন্যায় অবস্থান কর,—করিয়া আত্মসম্বিদের অনুসন্ধানে তৎপর হও এবং নির্ব্বিকল্প ও নিরালম্ব হইবার চেষ্টা কর। তুমি জাগ্রদবস্থাতেও আপনার স্থিতিকে সুষুপ্তির ন্যায় নির্ব্বিকল্পরূপে ভাবনা কর,—ভাবিয়া 'আমিই সমস্ত' এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একমাত্র

সদাত্মস্বরূপে অবস্থান কর। তুমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দশা হইতে নির্ম্মুক্ত, দীপবৎ নিখিল বুদ্ধি-বৃত্তির প্রকাশকর্ত্তা ও সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন হইয়া মুক্তভাবে অবস্থানপূর্ব্বক সম্বিৎ-মাত্রের অনুসন্ধান-পরায়ণ হও। অপিচ আত্ম-পর-ভাব পরিহার কর, জগৎস্থিতি বিষয়ে তোমার বিভাগ-কল্পনা বিদূরিত হউক, তুমি বজ্রস্তম্ভ হেন আত্মাকে অবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে অবস্থান করিতে থাক। তোমার ধৈর্য্যৈকধর্ম্মিণী উদার বুদ্ধির সহায়তায় মনোমধ্য-স্থিত আশাপাশ তুমি ছেদন কর,—করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম হইতে পরিমুক্ত হইয়া অবস্থিত হও। আত্মতত্ত্বের আস্বাদ লইতে লইতে তোমার আত্মা যখন একমাত্র চৈতন্যরূপে পরিণত হইবে, তখন হলাহল বিষও তোমার নিকট অমৃত বলিয়া ধারণা হইবে। যাহাতে কোন মল নাই বা কোন অংশকল্পনা নাই, তাদৃশ আত্মচৈতন্যের যখন বিস্মৃতি ঘটে, ভবভ্রম-নিদান মহা-মোহ আসিয়া তখনই সমুদিত হইয়া থাকে। আবার যখন উল্লিখিত নির্ম্মল ও অংশকল্পনা-বিরহিত আত্মচৈতন্যে অবস্থান করা যায়, তখনই ভব-ভ্রমের মূলীভূত ঐ মোহ ক্ষীণদশায় উপনীত হয়। যে কালে আশা-মহাসাগর পার হইয়া স্বীয় স্বরূপ প্রাপ্ত হইবে, তখন তোমার সম্বিৎ সূর্য্যাংশুর ন্যায় সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া পড়িবে।

হে রাম! আত্মভাব অবলোকন করিয়া অদ্বৈত আত্মানন্দে অবস্থান করিতে পারিলে সুস্বাদু রসায়নও বিষের ন্যায় হেয় বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। যাঁহারা অস্মদীয় প্রকৃত স্বভাব বা প্রত্যগাত্মভাব প্রাপ্ত অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হইয়াছেন, আমাদের সৌখ্য স্থাপন তাঁহাদের সহিতই হইয়া থাকে। তাদৃশ পুরুষপ্রবরদিগের সহিতই আমরা মৈত্রীবন্ধন করিয়া থাকি। তদ্ভিন্ন অন্য যে সকল পুরুষকারহীন মাত্র 'পুরুষ' নামধারী দীর্ঘবাহু পুরুষ,—তাহারা গর্দ্দভের ন্যায়ই উপেক্ষার পাত্র; কদাচ দর্শনযোগ্য নহে।

বলিতে পার, জগতে ত কত যোগী ও উপাসকশ্রেণীর মহাপুরুষ আছেন, তাঁহাদের অপেক্ষা একমাত্র তত্ত্ববেদীর বিশেষ উৎকর্ষ কি? এ সম্বন্ধে এইমাত্র বলা যায় যে, যিনি স্বীয় সম্বিদ্‌গুণে সর্ব্বাপেক্ষা উন্নত পদে

অবস্থিত,—সুতরাং পরম উৎকর্ষ-কোটি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাবিধ তত্ত্ববেদী পুরুষের পুরোভাগে অন্যান্য যোগী সম্প্রদায় জ্ঞানলাভার্থ গমন করিলে মনে হয়, যেন সুমেরুর পুরোভাগে দন্তিগণ কোন প্রত্যন্ত পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে আসিয়া উপস্থিত হয়। ফল কথা, তত্ত্ববেদী পুরুষ মেরুর ন্যায় সর্ব্বোন্নত ও দৃঢ় বিশ্রান্ত; অন্যান্য যোগী বা উপাসক তদপেক্ষা অনেকাংশে অনুন্নত। যাহা পূর্ব্বে কেহ কখন দৃষ্টিগোচর করে নাই এবং বর্ত্তমানেও লোক-লোচনের যাহা অতীত, তত্ত্ববেদীরা তথাবিধ স্বীয় সম্বিৎস্বরূপ দিব্য চক্ষু ধারণ করেন। তাঁহাদের অন্তঃকল্পিত সূর্য্যাদির তেজঃপুঞ্জ তাঁহাদের কোনই উপকারে আইসে না। অর্থাৎ তত্ত্ববেদী ব্যক্তি স্বীয় সম্বিৎ-প্রভাবেই সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতপদে সমাসীন; তিনি আর অন্য কোন বিষয়েরই অপেক্ষা রাখেন না। যিনি তত্ত্ববিদ্যা লাভ করিয়া সেই বিদ্যাবলে আত্মপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, তাঁহার নিকট এই প্রভূত প্রভাপটলশালী সূর্য্যাদি তেজঃসমষ্টিও মধ্যাহ্নকালীন দীপপ্রভার ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে। ফল কথা, তিনি এতই প্রভা ধারণ করেন যে, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্ক বস্তুর যে একটা সত্তা আছে, তাহাই তাঁহার ধারণায় আইসে না। এতাবতা কথা এই যে, সূর্য্যাদি জ্যোতিষ্কগণ কেবল যে তাঁহার কোন উপকার করিতে পারে না, মাত্র তাহাই যথেষ্ট নহে; পরন্তু তাঁহার অগ্রে উহারা কোন বস্তু বলিয়াই গণ্য হয় না। যাঁহার তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে, যিনি তত্ত্বজ্ঞানী আখ্যায় সুপরিচিত, সকল প্রকার তেজের মধ্যে তিনি উৎকর্ষশালী এবং যত কিছু বলবান্ বা উন্নতশালী লোক আছে, তাহাদের অপেক্ষাও তিনি অতীব উন্নতপদে সমাসীন। কি সূর্য্য, কি চন্দ্র, কি বহ্নি, কি মণি, কি তারকা, এই সকল প্রভাময় পদার্থ যাঁহার প্রভায় প্রকাশিত হয়, তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ-শ্রেষ্ঠগণ সেই জগদীশ আত্মচৈতন্যেরই তুল্যরূপে এ জগতে বিরাজ করিয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান নাই, তাহারা অতি নিকৃষ্ট পদেই অবস্থিত। বলিতে কি, ভূগর্ভে যে সকল কীট আছে এবং যে সকল গর্দ্দভের পাল বা তির্য্যগ্জাতি ধরাপৃষ্ঠে বাস করিতেছে, ঐ অতত্ত্বজ্ঞ লোকেরা তাহাদিগের অপেক্ষাও মূঢ় বলিয়া বিখ্যাত। দেহী যত দিন

অনাত্মজ্ঞ থাকে, মোহবেতাল ততদিনই তাহার প্রতিপত্তি বিস্তার করে। আত্মজ্ঞানের উদয়ে উহার চির অবসান ঘটে। তত্ত্ববিদ্‌গণের মতে যাঁহারা আত্মজ্ঞ, তাঁহারাই সচেতন; তদ্ভিতর আর সমস্তই অচেতন বা জড়। অনাত্মজ্ঞ পুরুষ কেবল দুঃখাবহ চেষ্টায় তৎপর। তাদৃশ পুরুষ ভূতলে স্ফুরিত হয় বটে, কিন্তু সে অচেতন শবস্বরূপেই বিচরণ করিতে থাকে। যিনি আত্মজ্ঞ পুরুষ, তিনিই প্রকৃত সচেতন আখ্যায় অভিহিত। মেঘাড়ম্বর উপস্থিত হইলে আলোকশ্রেণী যেমন দূরাপসৃত হয়, তেমনি চিত্ত যখন পীবর ভাব ধারণ করে, তখন আত্মজ্ঞতা সুদূর-পরাহত হয়। বিশদার্থ এই যে, চিত্ত পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে আত্মজ্ঞান হওয়া অসম্ভব। কাল যেমন অজীর্ণ পর্ণের রসাপকর্ষণ করিয়া তাহাকে শুষ্ক করিয়া ফেলে, তেমনি বিষয় ভোগের প্রত্যাখ্যানে মনকে ধীরে ধীরে কৃশ করিয়া লইবে। চিত্ত পীন ভাব ধারণ করিবার কারণ,—অনাত্মবিষয়ে আত্মভাবনা, দেহ-মাত্রের প্রতি আস্থাবান্ হওয়া এবং পুত্র, কলত্র ও কুটুম্বাদির প্রতি মমতা-স্থাপনা। এই সকল কারণেই মন পীন হইয়া উঠে। অহঙ্কারের বিকাশ, মনে মমতামলের বিলেপন এবং 'এই দেহই আমার' কিম্বা 'এই ভোগায়তন দেহই আত্মা' এইরূপ ভাবনা-বশেই চিত্ত পীন ভাব ধারণ করিয়া থাকে। ঐরূপ ভাবনাই দোষ-বিষধরের বিবর এবং উহাই জনন-মরণ দুঃখের উৎপাদক। অনর্থক উহার বৃদ্ধি হয় এবং ঐ ভাবনার বৃদ্ধিতেই চিত্ত পীবর হইয়া উঠে। এ সংসারের রমণীয়তা ও স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই বিবিধ আধিব্যাধির লীলা-নিকেতন। ঐ রূপ বিশ্বাস এবং 'ইহা হেয় আর উহা উপাদেয়' ইত্যাকার ভাবনা এই দুই কারণেই চিত্ত পীনত্ব লাভ করে। স্নেহ, ধনাশা, লোভ ও আপাতরম্য কামিনী-কাঞ্চন লাভ, এই সকল কারণ হইতেই চিত্তের পীনতা হইয়া থাকে। দুরাশারূপ দুগ্ধ পান করিয়া—ভোগরূপ অনিলবলে উপচিত হইয়া সংসারে আস্থা স্থাপন ও বিবিধ বিষয়ে সঞ্চরণপূর্ব্বক এই চিত্তরূপ ভুজঙ্গম পীনতা প্রাপ্ত হয়। ভোগজাল উৎপত্তি ও বিনাশশীল; প্রকৃত বিষবৈষম্য উক্ত ভোগজাল হইতেই উৎপন্ন হয়; এই জন্য ঐ ভীষণ ভোগরাশিই চিত্ত-পীনতার কারণ হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! এই চিত্তরূপ বিষবৃক্ষ দেহ-গর্ত্তে উৎপন্ন হইয়া পর্ব্বতা-

কার উন্নত ও অদ্ভুতরূপে পরিণত হইয়াছে। তুমি তত্ত্ব বিচাররূপ ক্রকচ লইয়া তাহার সাহায্যে সবলে নির্ভীকভাবে উহাকে ছেদন কর। চিন্তা-জাল উক্ত বিষবৃক্ষের মঞ্জরীরূপে বিরাজমান; কাম-ভোগরূপ কুসুম-গুচ্ছে উহা শোভমান; আশা উহার মহতী শাখা এবং বিকল্প সকল উহার পত্রপুঞ্জরূপে বিদ্যমান। জরা, মরণ ও ব্যাধি প্রভৃতি উহার ফল; এই সকল ফলের ভরে ঐ বিষবৃক্ষ সর্ব্বদাই কিঞ্চিৎ নম্রভাবে বিরাজমান।

হে রঘুবংশীয় রাজসিংহ! তোমার কলেবররূপ কুকাননের অভ্যন্তরে চিত্তরূপ মহাগজ অবস্থান করিতেছে; ঐ চিত্ত গজের দৃষ্টি প্রমাদ-মদে ঘূর্ণিত, উহার প্রকৃতি অতি প্রচণ্ড; তুমি সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিরূপ নখররাজি দ্বারা ঐ চিত্তগজকে বিদারণ কর। ঐ গজ একমাত্র বহির্ম্মুখরূপ সংসার-শিখরের তটদেশে উপবিষ্ট; অতএব অন্তর্ম্মুখরূপ বিশ্রান্তি-সুখ অনুভব করিবার সামর্থ্য উহার নাই। ঐ গজ দ্বেষ ও অসূয়াদি দ্বারা অতীব ভীষণ; সুজন-গণ যে সমুদায়ের সেবা করেন, ঐ চিত্ত-গজ সেই সকল শম-দমাদিরূপ কমল-কাননের দর্শনে সততই সমুৎসুক। পরন্তু উহার স্বভাব অতিশয় কোপন; তাই ঐ কাননের রক্ষা করিতে ঐ গজ সম্পূর্ণই অক্ষম। সুখ ও দুঃখ উহার গণ্ডদ্বয় এবং কামাদি বিকার উহার দুই সুদীর্ঘ দন্ত। এই দুই দন্ত দ্বারা ঐ গজ ধৈর্য্যাদি সদ্‌গুণরাশি বিদারণ করিয়া থাকে।

হে রাম! তোমার শরীর-নীড় মধ্যে কটু কর্কশারাবী চিত্তরূপ বায়স বাস করিতেছে। ঐ চিত্ত-বায়স সতত দুষ্ট চেষ্টায় নিরত এবং দেহের বৃথা ভারস্বরূপ। উহাকে তুমি উক্ত শরীর-নীড় হইতে উৎসারিত কর। নিয়ত কুৎসিত বিষয়ে ঐ চিত্ত-বায়সের অনুরক্তি; দেহ-মাংস গ্রাস করিয়া সদাই উহা উপচিত; উহার যে তীক্ষ্ণ চঞ্চুদণ্ড আছে, তাহার সাহায্যে সর্ব্বদাই ঐ চিত্ত-কাক পরমর্ম্ম বিদারণে সক্ষম। ঐ বায়স একাক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। উহার দেহ পুষ্টতম ও মলিন। অশেষ দোষোপশান্তির জন্য অগ্রেই উহাকে উৎসারিত করা কর্ত্তব্য।

হে রাঘব! চিত্তকে পিশাচের সহিতও উপমিত করা যায়। তৃষ্ণারূপিণী পিশাচী ঐ চিত্ত-পিশাচের পরিচারিকা। অজ্ঞানরূপ মহাগর্ত্তে ঐ চিত্ত-পিশাচ বাস করিয়া থাকে এবং অগণিত দেহ-

মহারণ্যে উহা চির ভ্রমণ করে। নিজে নিজে বিবেক, বৈরাগ্য ও গুরুসেবা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া তৎসমুদায়ের সহায়তায় যত দিনে না চিদাত্মার নিবাসভূত হৃদয় হইতে ঐ চিত্ত-পিশাচকে উৎসারিত করিতে পারা যায়, ততদিনের মধ্যে আত্মসিদ্ধি হইবে কিরূপে?

হে রাম! হৃদয় যেন জীর্ণ শাল্মলিকোটর; ঐ কোটরের অভ্যন্তরে চিত্তরূপ মহাসর্প বাস করিতেছে। তুমি আত্মবিচাররূপ অমোঘ গারুড় মন্ত্রের সাহায্য গ্রহণ কর,—করিয়া ঐ মহাসর্পকে বিনাশ কর। তোমার সর্ব্ব ভয় অপগত হউক; তুমি অভয়াত্মা হইয়া অবস্থান কর। ঐ যে চিত্ত-সর্পের কথা কহিলাম, শুভাশুভ উহার মুখ, চিন্তা উহার বিষ, দেহ উহার কদর্য্য কঞ্চুক এবং স্বচ্ছ প্রাণপবন উহার দৈনন্দিন ভক্ষ্য বস্তু। ঐ চিত্ত-সর্প সকলেরই ভীতিপ্রদ এবং সকলেরই মৃত্যুর কারণ।

হে রাম! চিত্ত যেন এক বর্ষীয়ান্ গৃধ্ররূপেই প্রতিভাত। এই চিত্ত-গৃধ্র শরীররূপ শবসমূহের সেবা করিয়া অশিবাকার ধারণ করিয়া রহিয়াছে,—ক্ষতদেহে শ্মশান-পাদপ আশ্রয় করিতেছে,—দিগ্‌দিগন্তে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রমে কাতর হইয়াছে। ভোগরাশিই উহার ভোগ্য আমিষ; এই আমিষ-লালসায় ঐ চিত্ত-গৃধ্র উদ্‌গ্রীব হইয়া নানাদিকে ধাবিত হইতেছে। ভোগলালসার আধিক্যে নিয়তই উহার অধীরতা প্রকাশ পাইতেছে। এই চিত্তরূপ গৃধ্র তোমার দেহবৃক্ষ হইতে যদি উড়িয়া যায়, তাহা হইলেই তুমি সবিশেষ জয় লাভ করিতে পারিবে।

রামচন্দ্র! চিত্ত যেন মর্কটের ন্যায় অবস্থিত। এই চিত্ত-মর্কট ফলার্থী হইয়া কত দিগন্তরে,—বনান্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে। উহার চাঞ্চল্য এবং ব্যাকুলতা সততই বিদ্যমান। চিত্ত-মর্কট স্থির হইয়া কুত্রাপি অবস্থান করে না; এক জন্মভূমি পরিত্যাগ করে,—করিয়া অন্য জন্মভূমিতে গমন করে। এইরূপে ঐ মর্কট জনসাধারণের অনুকরণ করে এবং তাহাদের সংসারবন্ধনেরও অনুকরণ করিয়া চলে। নাসা ও নেত্রাদি যাহার কুসুম, ভুজাদি যাহার শাখা এবং অঙ্গুলিদল যাহার বিলোল পত্রপুঞ্জ, তাদৃশ দেহ-বৃক্ষে ঐ চিত্ত-মর্কট মহোল্লাসে বাস করিয়া থাকে। তুমি যদি অভীষ্ট-সাধন করিতে চাও, তাহা হইলে অচিরাৎ উহাকে বিনাশ কর।

হে রাঘব! চিত্তরূপ মেঘ ইষ্টসাধনের বিশেষ অন্তরায়। উহা কেবল সংফল ক্ষয় করিবার নিমিত্তই উত্থিত হয়। ঐ চিত্তরূপ মেঘের মুখে বিদ্যুদ্বিকাশের ন্যায় চিদাভাস প্রতিবিম্বিত আছে। উহা অজস্র অনর্থ-সার্থরূপ বারিধারা বর্ষণ করে এবং অন্তরে সদাই বাসনা-বায়ু দ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে। তোমায় বলি, তুমি সঙ্কল্প-কল্পনা ত্যাগ কর, এবং এই কল্পনা-ত্যাগরূপ উৎকট মন্ত্র গ্রহণ কর। অনন্তর ঐ মন্ত্রের প্রভাবে উৎসাহসম্পন্ন হইয়া হৃদাকাশের চিত্ত-মেঘকে অপসারিত করিয়া ফেলো। এই চিত্ত-মেঘ চলিয়া গেলে তুমি জীবন্মুক্তিরূপ মহাফল প্রাপ্ত হইবে এবং নিত্যমুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে পারিবে।

হে রাঘব! চিত্ত-পাশ বিষম বন্ধন; উহা আত্মার সৃষ্টি প্রারম্ভ হইতে সুকৃত-দুষ্কৃত কর্ম্ম দ্বারা নিরন্তর গ্রন্থি প্রদানে দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে। মন্ত্র দ্বারা উহাকে ভেদ করা যায় না এবং বহ্নিও উহাকে দগ্ধ করিতে পারে না। ঐ চিত্ত-পাশ কল্পনাবলে আত্মাকে অতি পীড়া প্রদান করে। উহা যাবতীয় জন্মপরম্পরা বন্ধনের উপযুক্ত সুদীর্ঘ রজ্জুরূপে বিরাজমান। এই দীর্ঘ রজ্জুযোগেই অগণিত দেহ গ্রথিত রহিয়াছে। তুমি মাত্র সকল্প ত্যাগরূপ অস্ত্রের সাহায্যে স্বয়ং সবলে ঐ চিত্ত-পাশ ছেদন কর,—করিয়া নিঃশঙ্কভাবে যথাসুখে বিহার করিতে থাক।

হে রাম! দেহগুহার অভ্যন্তরে সঙ্কল্পরূপ অজগর সর্প লুক্কায়িত আছে। ঐ সর্প স্বভাবতই মন্দগামী। উহার ফুৎকার-বলে সমস্ত প্রাণিজন দগ্ধীভূত হয়। ঐ সঙ্কল্প-সর্প সহজে পরের প্রবোধ প্রাপ্ত হইতে পারে না। উহার প্রভাবে যাবতীয় লোক শোষিত হইয়া যায়। বিষয়রূপ আমিষ-লালসায় তৃষ্ণা-মুখ ব্যাদান করিয়া ঐ সর্প আপনার দেহদণ্ড কম্পিত করিয়া থাকে। তোমায় বলি, এক্ষণে তুমি কামনা-রাহিত্য-রূপ অনল প্রজ্বালিত কর,—করিয়া তাহার প্রভাবে ঐ সঙ্কল্পরূপ ভীষণ অজগরকে দগ্ধ করিয়া ফেলো। এইরূপ করিয়া তুমি পরিপূর্ণ আনন্দবৈভবে মগ্ন হইয়া থাক।

হে সাধো! তোমায় অধিক আর কি কহিব? যোদ্ধা যেমন অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী যোদ্ধার ভীষণ অস্ত্রবেগ প্রশমিত করে, তুমিও

তেমনি চিত্ত শুদ্ধি করিয়া তাহার সাহায্যে সদোষ চিত্তের প্রশমন কর,—করিয়া চির চাঞ্চল্য পরিহার কর। অনন্তর মর্কটহীন বৃক্ষের ন্যায় অক্ষত শোভায় সুশোভিত হইয়া থাক।

হে রঘুনন্দন! উল্লিখিতরূপে মনকে প্রত্যগাত্মায় উপশমিত ও রাগাদি মল হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া স্থূল সূক্ষ্ম কারণ-দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই হেয়-দৃষ্টিতে তৃণখণ্ড অপেক্ষাও তুচ্ছতর অর্থাৎ স্বাপ্ন শরীরাদির ন্যায় একান্ত উপেক্ষাযোগ্য অসদাকারেই অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার-সাগরের পর পার প্রাপ্ত হও এবং লীলাক্রমে পান, আহার, বিহার ও ক্রীড়া করিতে থাক।

পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত। ॥ ৫০ ॥

একপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! চিত্ত-চরিত্র অতি দীর্ঘ, অতি সূক্ষ্ম, তীক্ষ্ণ, স্বচ্ছ ও ক্ষুরধারোপম; তুমি ঐ চিত্ত-চরিত্রে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকিও না। এই সংসারক্ষেত্রে বহু কালের পর তোমার বুদ্ধি-বল্লরী জন্মিয়াছে। হে নয়কোবিদ! তুমি বিবেক-জল সেচন করিয়া ঐ বুদ্ধি-বল্লরীকে বর্দ্ধিত করিতে থাক। কাল-রূপ প্রভাকর যে পর্য্যন্ত না এই কায়-লতিকাকে ম্লান করিয়া তুলে; বা যাবৎ না উহা ভূতলে পতিত হইয়া যায়, তুমি তত কালের মধ্যেই উহাকে উদ্ধার কর,—করিয়া বুদ্ধি-বল্লরীকে পালন করিতে থাক।

হে মদীয় বাক্যার্থের একমাত্র তত্ত্বজ্ঞ! ময়ূর যেমন মেঘধ্বনি শুনিয়া সুখী হয়, তুমিও তেমনি মদীয় বাক্যার্থের প্রকৃত তত্ত্ব অনুভব করিয়া সুখী হইতেছ। হে ধীর! তুমি উদ্দালক মুনির ন্যায় ভূতপঞ্চককে বারম্বার অতি ধীর বুদ্ধিযোগে কারণ ব্যতিরিক্ত কার্য্যাঙ্কুরের অপলাপে আলূন ও মূলীভূত অবিদ্যার উচ্ছেদে বিশীর্ণ বা বিগলিত করিয়া অন্তরে অন্তরে বিচার করিতে থাক।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! উদ্দালক মুনি কিরূপ ক্রমে ভূত-পঞ্চক আলুন করিয়া আপন অন্তরে বিচার করিয়াছিলেন?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! পূর্ব্বে উদ্দালক মুনি ভূততত্ত্বের বিচার করিয়া যেরূপে অক্ষত পরম দৃষ্টি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ কর।

এই জগদাকার জীর্ণ গৃহের কোন এক বিস্তৃত কোণদেশে অনিলদিক নামে এক ভূখণ্ড আছে। ঐ ভূখণ্ড পর্ব্বতমালায় সমাকীর্ণ। সেই সকল পর্ব্বতের মধ্যে গন্ধমাদন নামে এক পর্ব্বত আছে। সেই পর্ব্বতে কোন এক কুসুমরাজি-রাজিতা বনস্থলী বিরাজ করিতেছে। উহাতে পুষ্পিত তরুরাজি যেন কর্পূর-কেশরবৎ শোভা পাইতেছে। ঐ বনস্থলী বিবিধ ব্রততিমালায় বেষ্টিত। উহাতে নানাজাতীয় বিচিত্র বিহগশ্রেণী বিরাজ-মান। উহার প্রান্তভাগে বনচরেরা বাস করিতেছে। পুষ্পপুঞ্জের কেশর-চ্ছটায় ঐ বনস্থলীর নানাস্থান উদ্ভাসিত হইতেছে। উহার কোথাও উজ্জ্বল মহারত্নশ্রেণী দীপ্তি পাইতেছে, কোথাও পবনান্দোলিত বিলোল কমল ও উৎপলদল বিকসিত রহিয়াছে; কোথাও তুষারশ্রেণী বনস্থলীর কবরীর ন্যায় বিরাজ করিতেছে; কোথাও কত সরোবর আছে, সেই সকল সরোবর বনস্থলীর দর্পণের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। ঈদৃশ বনস্থলীযুত শৈলবরের একটী সমুন্নত সানু আছে। ঐ সানুদেশ সুস্নিগ্ধ ছায়াবহুল সরল পাদপে শোভিত এবং আগুল্ফ-পরিমিত কুসুমসমূহে সমাকীর্ণ। পূর্ব্বে উদ্দালক নামে কোন এক অপ্রাপ্তযৌবন মৌনাবলম্বী মাননীয় মুনি ঐ সানুদেশে বাস করিতেন। তিনি ঘোর তপস্যায় আসক্ত ছিলেন। প্রথমে তাঁহার প্রজ্ঞা অতি অল্প ছিল। তিনি পরমপদে বিশ্রাম লাভে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁহার প্রবোধ কিছুই ছিল না। পরে তিনি বিচারবান্ ও শুভাশয় হইয়া ক্রমিক তপস্যা ও শাস্ত্রসঙ্গত কার্য্যানুষ্ঠানের গুণে নব ঋতু-ভূষিত ভূতলের ন্যায় বিবেকভূষণে ভূষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ণ প্রজ্ঞা ও পরম বিশ্রান্তি ঘটিয়াছিল।

ঐ উদ্দালক মুনির মন প্রথমে যখন শুভপথে ধাবিত হয়, তখন তিনি একদা একান্তে বসিয়া,—সংসাররোগে ভীত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এ সংসারে এমন কি প্রধান প্রাপ্য ধন আছে, যাহা পাইলে

পুনরায় আর জন্মসম্বন্ধ ঘটিবে না এবং যাহাতে বিশ্রান্তি লাভ করিলে পুনরায় আর শোক করিতে হইবে না? যাহাতে মনোব্যাপার নাই, তাদৃশ পরম পবিত্র পদে আমি কবে—কোন্ কালে মেরু-বিশ্রান্ত মেঘের ন্যায় চির বিশ্রাম প্রাপ্ত হইব? সাগরের কুলকুল-নাদিনী চঞ্চল কল্লোলমালা যেমন আপনা হইতেই প্রশম প্রাপ্ত হয়, তেমনি কবে—কোন্ দিনে ভোগ-তৃষ্ণা আমার প্রশান্ত হইয়া যাইবে? 'আমি ইহার পর ইহা করিব, এই কার্য্য করিয়া পরে আবার এইরূপ অন্য কার্য্য করিব' এই প্রকার অনন্ত কল্পনার উদয় হয়, কিন্তু কবে—কোন্ কালে আমি পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করিয়া মনে মনে ঐরূপ কল্পনাকে উপহাস করিব? কমলদলে সলিল পড়ে,—পড়িয়াও তাহাতে যেমন তাহা সংলগ্ন হয় না, তেমনিভাবে কবে—কোন্ কালে কোন বিকল্পই আমার মনে সংলগ্ন হইবে না? আমার তৃষ্ণাতটিনী অবিবেকবলে বর্দ্ধিত হইয়াছে, কত শত কল্লোল-মালায় ঐ তটিনী উন্মাদিনী হইয়া ছুটিয়াছে। অহো! কবে—কোন্ কালে আমি পরমপদ-প্রাপ্ত পরম বুদ্ধিরূপিণী তরণীর সাহায্যে ঐ তৃষ্ণাতটিনীর পর-পারে উপনীত হইতে পারিব? এই যে শিশুদিগের খেলার ন্যায় জগতের জীবগণ অকিঞ্চিৎকর চঞ্চল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতেছে, কবে আমি এই সকল ক্রিয়ায় উপহাস প্রকাশ করিব? আমার মন বিকল্পে বিক্ষিপ্ত হইয়া দোলার ন্যায় অনুক্ষণ দুলিতেছে, উন্মাদ বাতরোগ বিনষ্ট হইলে, চিত্তের বিক্ষিপ্তভাব যেমন বিদূরিত হইয়া যায়, তেমনি কবে ঐ মন আমার প্রশান্ত হইয়া যাইবে? কবে আমার স্বীয় স্বরূপের প্রভা সমুদিত হইবে, সেই প্রভায় বিরাট আত্মার ন্যায় আমি পূর্ণ-বুদ্ধি হইব,—হইয়া জগতের গতির প্রতি কবে উপহাস করিব?—আর অন্তরে অন্তরে অপার সন্তোষ প্রাপ্ত হইব? কবে আমি অন্তরে পরমাত্মার সমান আকার ধারণ করিব? কবে আমার নিখিল ভোগ্য বিষয়ের স্পৃহা চলিয়া যাইবে এবং অন্তরে নির্ম্মল হইয়া কবে আমি মন্থনের অবসানকালীন ক্ষীরার্ণবের ন্যায় উপশম লাভ করিব? এই শত শত আশাময়ী অচলা দৃশ্যশ্রী বিরাজিতা; কবে আমি সুষুপ্তের ন্যায় সম্মাত্ররূপে এই সকল দৃশ্যশ্রী দর্শন করিতে করিতে অন্তরে বিশাল বিততরূপে অবস্থান

করিব? কবে আমার বুদ্ধি কল্পনাহীন হইবে? কি বাহ্য দৃশ্য, কি অভ্যন্তর দৃশ্য, সমুদায় দৃশ্যই আমি চৈতন্যস্বরূপে অবলোকন করিব? এবং কবে আমার এমন দিন হইবে, যে দিন আমি নিখিল দৃশ্য বিষয়ই চৈতন্য-স্বরূপে ভাবনা করিব? কবে আমার এমন দিন ঘটিবে,—আমার চিত্ত উপশান্ত হইবে, আমি পরম চিদেক-রসভাব প্রাপ্ত হইব,—আমার যেন জন্মান্ধতা ঘুচিয়া যাইবে, আমি পরম আলোক লাভ করিব? কবে আমার এমন দিন আসিবে, যে দিন আমি অভ্যাসবলে সুচারু চিৎপ্রকাশ প্রাপ্ত হইব, এবং সেই চিৎপ্রকাশের সাহায্যে দূর হইতে এই সূক্ষ্ম কাল-কলা অবলোকন করিতে থাকিব? কবে আমার এমন দিন হইবে,—যাহা ইষ্টানিষ্ট হইতে নির্ম্মুক্ত, যাহাতে হেয়োপাদেয় ভাব নাই, তাদৃশ স্বয়ম্প্রকাশ ব্রহ্মপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমি অন্তরে অন্তরে অপার সন্তোষ লাভ করিব? কদাশা-রূপিণী কৌশিকী যাহাকে ঘিরিয়া আছে, যাহার জড়তায় হৃদয়কমল জীর্ণ হইয়াছে, সেই এই ঘোর কৃষ্ণা অবিদ্যাযামিনী কবে ক্ষয়প্রাপ্ত হইবে, কবে আমার সুপ্রভাত হইবে? কবে আমি নির্ব্বিকল্প সমাধি অবলম্বন করিব? সেই সমাধি-ফলে কবে আমার মনোবৃত্তি উপশান্ত হইয়া যাইবে, আমি ভূধরকন্দরে থাকিয়া পাষাণ-তুল্যতা প্রাপ্ত হইব? আমার অহঙ্কার-মাতঙ্গ অভিমান-মদে মত্ত রহিয়াছে, কবে—কত দিনে পরমার্থবোধরূপ কেশরীর আক্রমণে উহা আহত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইবে? কবে আমি মৌনব্রত অবলম্বন করিব,—করিয়া নির্ব্বিকল্প ধ্যানে নিবিষ্ট হইয়া বিশ্রান্ত হইব,—আর আমার মস্তকে বনবিহঙ্গমেরা তৃণগুচ্ছ লইয়া কুলায় নির্ম্মাণ করিবে? কবে আমার এমন দিন আসিবে,—আমি ধ্যানব্যাপারে স্থিরবুদ্ধি হইব এবং শৈল ও স্থাণুর ন্যায় অচল ও অটলভাবে রহিব,—আমার স্কন্ধো-বিলম্বিত জটাজূটে বিহঙ্গমেরা মনের সুখে বিশ্রাম লাভ করিবে? আহা! আমার সংসাররূপ অরণ্য-সরোবর তৃষ্ণারূপ কর্দ্দমজালে জটিল হইয়াছে, জন্মরূপ জীর্ণ গুল্মসমূহে উহা আবৃত রহিয়াছে, কবে আমার এমন দিন ঘটিবে,—যে দিন আমি ঐ সরোবর পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিব?

সেই দ্বিজ উদ্দালক এইরূপ চিন্তাক্রান্ত-চিত্তে পুনঃপুন: উপবেশন করিয়া ধ্যানাভ্যাস করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার চিত্ত মর্কটের ন্যায়

চপল হইয়া বিষয়জালে আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাই তিনি পরম প্রীতিদায়িনী সমাধি প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মনোরূপ মর্কট কখন বাহ্য বিষয় পরিত্যাগ করিল,—করিয়া সাত্ত্বিক সুখাস্বাদনের জন্য কখন আকুল হইয়া উঠিল, আবার কখন কখন বা অন্তরের সমাধিসুখ-সম্পদ্ পরিত্যাগ করিল,—করিয়া বিষদিগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় ব্যাকুলভাবে বিষয়ের দিকে ধাবিত হইতে লাগিল।

হে কমলনয়ন! সেই উদ্দালক দ্বিজের মন কদাচিৎ অন্তরে উদ্যদাদিত্য-নিভ তেজ দর্শন করিল,—করিয়া আবার বিষয়ের সন্ধানে উন্মুখ হইতে লাগিল। কখন তাঁহার মন অন্তরের অজ্ঞানান্ধতা পরিত্যাগ করিল,—করিয়া আবার সেই দণ্ডেই বিষয়ে বিলোল হইয়া শঙ্কাকুল বিহঙ্গের ন্যায় উড়িয়া চলিল। কখন বা তাঁহার মন কি বাহ্য, কি আভ্যন্তর উভয়বিধ স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া—অজ্ঞান ও আত্মজ্যোতির অন্তরালে বিলীন হইয়া নিদ্রা-রূপিণী শাশ্বতী স্থিতি লাভ করিতে লাগিল। এইরূপে সেই মুনি ঘোর গভীর গিরিগুহায় থাকিয়া ধ্যানপরায়ণ হইতে লাগিলেন, আর মধ্যে মধ্যে তদীয় চিত্ত উল্লিখিতরূপে পর্য্যাকুলিত হইতে লাগিল। বাত-বিহত তীরতরু যেমন জলমগ্ন হয়, তেমনি তৃষ্ণারূপ তরঙ্গাঘাতে তাঁহার দেহ বিচালিত হইয়া অসারবৎ সঙ্কটে পতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর দিনাধিপতি যেমন প্রত্যহ মহামেরুর উপর বিচরণ করেন, তেমনি সেই উদ্দালক মুনি একদা ব্যাকুলচিত্তে, তত্রত্য গিরিশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি মোক্ষদশার ন্যায় এক গিরিকন্দরীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐ কন্দরী সর্ব্বপ্রাণীর দুর্গম; অতএবই সর্ব্বসঞ্চার হইতে বিরহিত। ঐ কন্দরী বায়ুবশে পর্য্যাকুলিত হয় না এবং কোন মৃগ বা পক্ষী সেখানে সঞ্চরণ করে না। কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব, কাহারও সেস্থান দৃষ্টিগোচর হয় নাই। উহা যেন অবিকল পরমাকাশের ন্যায় সুশোভন। উহার স্থানে স্থানে কুসুমরাশি পতিত আছে, কোন কোন অংশ কোমল শষ্পজালে শ্যামল শোভা ধারণ করিয়াছে; তাহাতে দৃষ্টিমাত্রেই মনে হয় যেন চন্দ্রকান্ত ও মরকত এই উভয়বিধ মণি দ্বারাই ঐ স্থান গ্রথিত হইয়া রহিয়াছে। স্নিগ্ধ শীতল

ছায়াময় রত্নদীপে ঐ কন্দরী আলোকিত হইতেছে, তদ্দর্শনে মনে হয় যেন বনদেবীগণের একটী গুপ্ত অন্তঃপুরী অবস্থিত রহিয়াছে। উহার দ্বারদেশ দিয়া শীতনিবারণ-ক্ষম কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ আলোক-নির্গম হইতেছে। ঐ কন্দরী সুবর্ণের ন্যায় গৌরীপ্রভা বিস্তার করিতেছে। ঐ প্রভা শারদীয় দিবাকর-করের ন্যায় নাতি উষ্ণ এবং নাতিশীত। ঐ কন্দরী বালার্কের আতপতাপে বিশুষ্ক হইয়া যায় এবং তথায় নীরবে মন্দ মন্দ মারুত-সঞ্চার হয়। সেখানে মঞ্জরীময়ী তরুরাজি বিরাজিতা। তাহাতে ঐ কন্দরী মাল্যধারিণী বালিকার ন্যায় প্রতীয়মানা। উহার নানাস্থান নিপতিত কুসুমসমূহে কোমল ও অভিরাম এবং কোন কোন স্থান পদ্মকোশবৎ আরও অধিক কোমল ও মনোজ্ঞ হইয়া যেন বিধাতার বিশ্রামযোগ্য হইয়াই রহিয়াছে। মুনি উদ্দালক এ হেন উপশম-পদবীর ন্যায় আশ্রমার্হ কন্দরীতে গিয়া উপনীত হইলেন।

একপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫১ ॥

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ

বশিষ্ঠ কহিলেন,— রামচন্দ্র! অলি যেমন বহু স্থানে বহুধা ভ্রমণ করিয়া অবশেষে পদ্মকুটীতে প্রবেশ করে, ধর্ম্মাত্মা উদ্দালক তেমনি গন্ধমাদন গিরির সেই সুন্দর কন্দরে গিয়া প্রবিষ্ট হইলেন। সৃষ্টি-ব্যাপারের বিরাম ঘটিলে ব্রহ্মা যেমন আত্মপুরীতে প্রবেশ করিয়া বিরাজিত হইয়া থাকেন, তেমনি সেই উদ্দালক দ্বিজ সমাধি-সাধনায় উন্মুখ হইয়া সেই কন্দরীমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সুশোভিত হইলেন। তিনি সেখানে প্রবেশ করিয়াই অম্লান পুষ্প-গুচ্ছসহ নব পত্র দ্বারা একখানি আসন প্রস্তুত করিলেন। মনে হইল, মেঘবাহন ইন্দ্র যেন সবিদ্যুৎ মেঘপুঞ্জ বিস্তারিত করিলেন। মেরু যেমন আপনার নীলরত্নময় তটদেশে তারকাপুঞ্জ বিস্তারিত করে, অনন্তর সেই মুনিও তেমনি সেই পত্রাসনের উপরিভাগে

একখানি মনোজ্ঞ মৃগচর্ম্ম পাতিত করিলেন। অতঃপর তিনি জড় বিষয় বর্জ্জন করিয়া স্বীয় চিত্তবৃত্তি ক্ষীণ করিলেন,—করিয়া অন্তঃশুদ্ধ-শরীরে মৌনী হইয়া সেই আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন বোধ হইল, গর্জ্জনহীন মেঘ যেন জল-বর্ষণান্তে গিরিশৃঙ্গে গিয়া উপবেশন করিল।

অনন্তর সেই মুনি, প্রবুদ্ধ কপিলাদির ন্যায় বদ্ধ-পদ্মাসনে উত্তরমুখে অবস্থিত হইয়া পার্ষ্ণিযুগল দ্বারা স্বীয় বৃষণদ্বয় সুদৃঢ়ভাবে ধারণপূর্ব্বক অঞ্জলি বন্ধন করিয়া ব্রহ্মাদি গুরুপরম্পরাকে প্রণাম করিলেন। তৎপরে তাঁহার যে মনোমৃগ বিষয়ের দিকে ধাবিত হইয়াছিল, তাহাকে তিনি বাসনাসমূহ হইতে আকর্ষণ করিয়া লইলেন এবং নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইবার নিমিত্ত আপনা আপনি বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সেই বিচার প্রকার এইরূপ যে,—রে মূর্খ মন! এই দৃশ্যমান সংসার-ব্যাপারে তোমার কি প্রয়োজন আছে? দেখ, ভবিষ্যতে যাহা দুঃখ উৎপাদন করে, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরা সেরূপ কার্য্য করেন না। যে জন শান্তি-রসায়ন পরিত্যাগপূর্ব্বক অকিঞ্চিৎকর বিষয়ভোগের দিকে ধাবিত হয়, নিশ্চয় বলিব, সে ব্যক্তি মন্দারবন পরিহার করিয়া বিষ জঙ্গলাভিমুখে গমন করে। ওরে মন! তুমি ভূবিবরে প্রবেশ কর কিম্বা ব্রহ্মলোকেই গমন কর, জানিও,—একমাত্র শান্তিসুধা ব্যতীত নির্ব্বাণ লাভের উপায়ান্তর নাই। রে মন! তুমি যদি শত শত আশাজালে জড়িত হইয়া থাক, তাহা হইলে দেখিবে, ঐ সকল আশা কেবল অনন্ত দুঃখই উৎপাদন করিবে। তাই বলিতেছি, ভোগাশা পরিত্যাগ কর,—করিয়া একান্ত সুন্দর পরম মঙ্গল প্রাপ্ত হও। এই যে সকল ভাবাভাবময় বিচিত্র ভোগকলনা, এই সমুদায়ই তোমার উৎকট দুঃখেরই নিমিত্তীভূত; পরন্তু এ সকল হইতে সুখসম্ভাবনা কোন কালেই নাই। রে মূর্খ! মেঘধ্বনি শুনিয়া মণ্ডূক যেমন ইতস্ততঃ বৃথা ধাবিত হয়, তেমনি তুমিই বা কেন এই শব্দ স্পর্শ প্রভৃতি হতবৃত্তি লোভে অনবরত অনর্থক ভ্রমণ করিতেছ? ওরে আমার মনোমণ্ডূক! তুই এতদিন অন্ধ হইয়াছিলি,—হইয়া এ জগতের যত্র যত্র বৃথা ভ্রমণ করিয়াছিস্; সে ভ্রমণে তোর কি ফল লাভ হইয়াছে? ওরে মূর্খ! যাহা হইতে কিঞ্চিৎ প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে, যাহাতে তুই প্রকৃত নির্ব্বৃতি লাভ

করিতে পারিনি, সেই সর্ব্ববৃত্তির উপরতিরূপ সমাধি-বিষয়ে—ওরে চিত্ত! তোর চেষ্টা নাই কেন? রে অবোধ! বৃথা বহির্ম্মুখ উত্থানে যাহা উপচিত হইয়া থাকে, তাদৃশ শ্রবণেন্দ্রিয়তা প্রাপ্ত হইয়া শব্দানুসারিণী বুদ্ধির বলে হরিণবৎ বৃথা ক্ষয় পাইয়া যাইও না। ওরে অজ্ঞ! তুমি ত্বগিন্দ্রিয় হইয়া স্পর্শোন্মুখী বুদ্ধিবলে করিণীলুব্ধ করীন্দ্রের ন্যায় কেবল দুঃখ ভোগের নিমিত্ত বদ্ধ হইও না। ওরে মূর্খ! তুমি রসনেন্দ্রিয় হইয়া কদন্ন-লোভে বৃতবড়িশ পিশিত-লোলুপ মীনের ন্যায় বিনষ্ট হইও না। রে মুগ্ধ! তুমি দর্শনেন্দ্রিয় হইয়া রূপ-দর্শন-বাসনায় কান্তি বা রূপলুব্ধ পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইও না। রে অবোধ! তুমি ঘ্রাণেন্দ্রিয় হইয়া বৃথা গন্ধের লোভে কলেবর-রূপ কমলের কোটরে ভৃঙ্গের ন্যায় বদ্ধ থাকিও না। অর্থাৎ হে মন! তুমিই বৃত্তিভেদে প্রাণ ও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় হইয়া থাক। ঐ ইন্দ্রিয়গুলিই অনর্থের মূল। দেখ, বনের হরিণ শ্রবণেন্দ্রিয়ের লালসাবশেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; যথা—ব্যাধেরা গীত গায়, তাহা শুনিয়া মৃগ আত্মহারা হয়; ব্যাধেরা তখন হরিণ বধ করে। যাহারা বন্যহস্তী ধরে, তাহারা বনমধ্যে পালিত হস্তিনী প্রেরণ করে, পরে হস্তিনীর স্পর্শে হস্তীর মোহ জন্মাইয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলে। কাজেই দেখা যায়, স্পর্শেন্দ্রিয়ের লালসাতেই হস্তীর মৃত্যু ঘটে। মীন রসনেন্দ্রিয়ের লোভে বড়িশগ্রথিত আমিষ খাইতে যায়,—যাইয়া সেই বড়িশে বিদ্ধ হইয়া প্রাণ হারায়। পতঙ্গ দর্শনেন্দ্রিয়ের লুব্ধতায় অগ্নির সৌন্দর্য্য দেখিবার জন্য লালায়িত হইয়া অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়াই প্রাণে বিনষ্ট হয়। ভ্রমর ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের বশে গন্ধলোভে আকৃষ্ট হয়,—হইয়া কমলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক রাত্রিযোগে তাহাতে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। এইরূপে কুরঙ্গ-মাতঙ্গ, মীন, পতঙ্গ ও ভৃঙ্গ, ইহারা শব্দ-স্পর্শাদি এক একটীতে আসক্ত হইয়াই নিহত হয়। কিন্তু তোমায় দেখিতেছি, তুমি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটীতেই আসক্ত হইতে যাইতেছ; তাই বলিতেছি, রে অবোধ! ঐ শব্দ স্পর্শাদির এক একটীই যখন অনর্থ-কর, তখন তুমি যদি ঐ পাঁচটীতেই বেষ্টিত হও, তাহা হইলে তোমার সুখপ্রাপ্তি কোথায়? ফলে তখন তো তোমার বিপদ্ নিতান্তই ঘনীভূত।

হে চিত্ত! কোশকার কীট যেমন আপন স্বাভাবিক লালা-ফেন

আপনারই বন্ধনের জন্য বিস্তার করিয়া থাকে, তেমনি তুমি কেবল নিজেরই বন্ধনার্থ এই বাসনাজাল বিস্তার করিতেছ। দেখ, তুমি যদি ভবরোগ পরিহার করিয়া শরৎকালের মেঘের ন্যায় বিশুদ্ধি লাভ করিতে পার এবং বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া শান্তিলাভ করিতে সক্ষম হও, তাহা হইলে তোমার অনন্ত জয়লাভ হইবে। চিত্ত! ভাবিয়া দেখ, এই জগৎসৃষ্টি কি করিতেছে? ইহা জনন-মরণ-দশা বিধান করিতেছে এবং পরিণামে পরিতাপ জন্মাইতেছে; তুমি ইহাকে জানিয়াও যখন পরিত্যাগ করিতেছ না, তখন দেখিতেছি, তোমার বিনাশ অবশ্যই ঘটিবে। অথবা তোমাকে আমার উপদেশ দিবারই বা প্রয়োজন কি? কারণ, যে পুরুষ বিচারবান্ হয়, তাহার তো চিত্ত থাকিতেই পারে না,—বিচারবলে চিত্ত লয় পাইয়া যায়। অতএব আমিও এখন তত্ত্ববিষয়েই প্রবৃত্ত হই, তাহাতেই আমার চিত্ত দমিত হইবে। অপিচ, চিত্তের উচ্ছেদ-সাধনেও তো পৃথক্ কোন চেষ্টা করিবার প্রয়োজন দেখি না। কেন না, যদি অজ্ঞানকে অপসারিত করা যায়, তাহা হইলেই চিত্তের উচ্ছেদ সাধন হয়। নতুবা অজ্ঞান যতদিন চিত্তকে ঢাকিয়া রাখিবে, চিত্ত ততকাল ঘনীভূত হইয়াই রহিবে। ইহার দৃষ্টান্ত এই যে, বর্ষার বারিধর যতদিন অবস্থিত, আকাশও ততদিনই নীহারাচ্ছন্ন; পক্ষান্তরে অজ্ঞান যেমন ক্ষীণভাব ধারণ করিতে থাকে, চিত্তও অমনি সেই সময় হইতেই ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে। এ কথারও দৃষ্টান্তে বলা যায়,—যখন হইতে বর্ষাক্ষয়ের সূচনা হয়, তখন হইতেই নীহার-ক্ষয়ের উপক্রম হইতে থাকে। বিচারবশে চিত্ত যখন ক্ষীণতা প্রাপ্ত হইয়া বিশুদ্ধ হইয়া উঠে, আমার বোধ হয়, শারদীয় মেঘের ন্যায় তখনই চিত্ত ক্ষয় পাইয়া যায়। এই অসৎ নশ্বর চিত্তকে উপদেশ দেওয়া আর আকাশে জল রাখা ও পবনকে আঘাত করা সমান বলিয়াই গণ্য। বিশদ কথা এই যে,আকাশে জল নিক্ষেপ কর, কিম্বা পবনে আঘাত প্রদান কর, এই উভয়ই যেমন ব্যর্থ, তেমনি চিত্তকে শত উপদেশ দাও,—সে উপদেশ বিফল; তাহাতে চিত্তের কিছুই হইবে না। কেন না, চিত্ত মিথ্যাস্বরূপ; যদি কিছু সত্যতা থাকে, তাহাও বিচারেই বিনশ্বর; অতএব ওরে চিত্ত! তুই যখন অসন্ময়, তোর যখন ক্ষয় আছে, তখন তোকে আমি ত্যাগ করিতেছি। যে, অনুশাসন বা উপদেশ

পরিত্যাগ করে, পণ্ডিতগণ বলেন,—তাহার মূর্খতার ইয়ত্তা নাই ; সে পরম মূর্খ। তুই চিত্ত, উপদেশের অতীত, অতএব মহামূর্খ। তোকে ত্যাগ করাই মঙ্গলাবহ। আমি নির্ব্বিকল্প হইয়াছি, চিৎপ্রদীপরূপে প্রতিভাত হইতেছি ; আমার অহঙ্কার নাই, বাসনা নাই। ওরে অসন্ময় ! তুই তো অহঙ্কারের বীজ ; সুতরাং তোর সহিত আমি আর কোন সম্বন্ধই রাখি না। রে চিত্ত ! তুই কি বলিতে চাহিস্ যে, আমার অপরাধ কি আছে ? আমাকে কেন বিনাশের পথে ফেলিতেছ ? তাহা হইলে বলি;—'এই, সে, আমি, আমার' ইত্যাদি প্রকার বৃথা কুদৃষ্টি কেবল তোরই অবলম্বন ; তুই-ই উহা অবলম্বন করিয়াছিস্। কিন্তু ঐ কুদৃষ্টি আশঙ্কা-বিষের প্রেরণায় বিষুচিকার ন্যায় অসত্যমূলক হইলেও উহা মূঢ়দিগের বিনাশ বিধান করে ; সুতরাং ইহাই তোর অপরাধ নহে কি ? মন অতি ক্ষুদ্র ; পরন্তু যাহা আত্মতত্ত্ব, তাহা অসীম বা অনন্ত। সুতরাং এত বড় আত্মতত্ত্বের কি উল্লিখিত ক্ষুদ্র মনের ক্রোড়ীকৃত হওয়া সম্ভবে ? যেমন বিল্বমধ্যে হস্তী ও হস্তিনীর অবস্থিতি অসম্ভব, তেমনি অহম্ভাব দ্বারা অসীম অনন্ত আত্মতত্ত্বের পরিচ্ছেদ-ঘটনাও অনুপপন্ন। বিশাদার্থ এই যে, অহম্ভাব হইতে আত্মার যে মমতা বা দেহাবচ্ছিন্নতা অনুভূত হয়, তাহা বাস্তব নহে—ভ্রান্তি। রে চিত্ত ! যাহা মহাগর্ত্তের ন্যায় গভীরা ও অতি দুঃখদা, তুই তাদৃশ বাসনাকে আশ্রয় করিয়াছিস্ ; কিন্তু আমি আর ঐ বাসনার অনুসরণ কিছুতেই করিতেছি না। 'এই সেই দেহই আমি, ইহা আমার' ইত্যাদি সকল ভ্রান্তি কেবল অহম্ভাবেই পরিকল্পিত ; পরন্তু বালকবৎ বিচারজ্ঞান-হীন ব্যক্তিরা যদি ঐরূপ ভ্রান্তি কল্পনা করে,—করুক, তাহাতে তো আমার কোনই ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। আমি পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে মস্তকের কেশাবধি সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্ম-ভাবে বিচার করিয়া দেখিলাম, কিন্তু কৈ 'অহং' নামক আমি কে, তাহা তো কোথাও প্রাপ্ত হইলাম না ? সুতরাং 'অহং' যে কি, কিরূপে আসিল, কোথায় আছে ? তাহা তো কিছুই নির্ণয় করা যায় না। কথা হইতে পারে, যদি 'অহং' পদার্থ নাই-ই, তবে তুমি কে ? আমি বলি,—দিক্-পরিচ্ছেদ-পরিহীন ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত একমাত্র সম্বেদন বা জ্ঞানস্বরূপই আমি। আমার সম্বেদন বা জ্ঞানস্বরূপতায় ক্রম-সম্বেদ্য অবস্থাত্রয়-রূপ কালকৃত পরি-

চ্ছেদ নাই কিম্বা কোন্ প্রকার ইতর বস্তুর সত্তাও উহাতে নাই। উহার নাই ইয়ত্তা, নাই নাম-কল্পনা, নাই একত্ব-সংখ্যা, নাই অন্যত্বসংখ্যা, নাই মহত্ত্ব, নাই অণুত্ব। আমি উক্তরূপ সম্বেদন বা জ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই স্ব-সম্বেদ্য চিত্ত তুমি,—তোমাকেই দুঃখের কারণ বলিয়া বুঝিতেছি। এইরূপ দুঃখহেতু বলিয়া বুঝিতেছি বলিয়াই এক্ষণে বিবেক-জনিত প্রজ্ঞার প্রভাবে তোমাকে বিনাশ করিতে সমুদ্যত হইয়াছি। এই ত দেখিতেছি, এই দেহের অভ্যন্তরে এই মাংস, এই রুধির, এই অস্থিপুঞ্জ এবং এই সেই শ্বাসমরুত-সকল; কৈ 'আমি' নামক এখানে কে আছে? এই দেহে যে স্পন্দন আছে, তাহা অন্যত্র বায়ুর অংশ, যে অববোধ আছে, তাহা মহাচিতের অংশ, যে জরামরণ আছে, তাহা তো দেহেরই ধর্ম্ম; সুতরাং ইহাতে 'আমি' নামক কোন্ বস্তু বিদ্যমান? হে চিত্ত! এক্ষণে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, এ দেহের মাংসও 'অহং' পদার্থ হইতে অতিরিক্ত, রক্তও অন্য বস্তু, অস্থিও অন্য পদার্থ, বোধও স্বতন্ত্র এবং স্পন্দনও পৃথক্ পদার্থ; সুতরাং ইহাদের মধ্যে 'আমি' নামে কে আছে? ফলে এ সকলের কোন একটীকেও তো 'অহং' নামে নির্দ্দেশ করা যায় না। অপিচ এই ত ঘ্রাণেন্দ্রিয় আছে, এই ত স্পর্শেন্দ্রিয় আছে, এই ত শ্রবণেন্দ্রিয় আছে, এই ত চক্ষুরিন্দ্রিয় আছে, আর এই ত রসনেন্দ্রিয় আছে, ইহাদের মধ্যেই বা কৈ 'অহং' নামে কে আছে? পরমার্থ-বিচারে বুঝিতে পারা যায় যে, মনও আমি নহি, তুমি চিত্তও—আমি নহি, বাসনাও আমি নহি। এই শুদ্ধ চিদাভাস আত্মাই কেবল বিলসিত হইতেছেন। ফলে এই আত্মা অহম্ভাব হইতে সম্পূর্ণ-রূপেই নির্লিপ্ত। আমি যত্র, তত্র, সর্ব্বত্র অবস্থিত, অথবা 'আমি কিছুই নহি, কোথাও নহি,' এইরূপ দৃষ্টিই সন্ন্যাসী বা সাধ্বী। ফল কথা, আত্মায় যখন অধ্যারোপ দৃষ্টি, তখন আমিই সর্ব্বত্র অবস্থিত এবং সকলই 'আমি' রূপে বিরাজিত, আর যদি আত্মায় অপবাদ-দৃষ্টি, তবে আমি কিছুই নহি, এই দুইয়ের একতরই সাধু দৃষ্টি। এক দেহমাত্রাবচ্ছিন্ন অহম্ভাবরূপ ইতর অহঙ্কারক্রম নাই।

অহো! বলদৃপ্ত বৃক যেমন অটবীমধ্যে মৃগশিশুদিগকে বঞ্চিত করিয়া নিহত করিয়া থাকে, তেমনি ধূর্ত্ত অজ্ঞান চিরদিন আমায় অহম্ভাবে

প্রতারিত করিয়া কতই না ক্লেশ প্রদান করিয়াছে। এক্ষণে আমার সৌভাগ্য এই যে, আমি সেই অজ্ঞান-চোরকে চিনিয়া লইয়াছি। আর কখনই আমি ঐ স্বরূপার্থের অপহর্ত্তা অজ্ঞান-চোরের প্রশ্রয় দিব না; কদাচ তাহাকে আশ্রয় করিব না। শৈলে আসিয়া মেঘ থাকে, কিন্তু ঐ মেঘ যেমন শৈলের কেহই নহে, তেমনি ঐ অজ্ঞান-চোরও আমার কেহই নহে; উহার সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই। আমি দুঃখ-মুক্ত আর ঐ অজ্ঞান-চোর দুঃখযুক্ত; সুতরাং আমরা ত উভয়েই পরস্পর বিরুদ্ধ-স্বভাব। বলিতে পার, তোমার যদি অহঙ্কারাদি কিছু মাত্রই নাই, তবে তুমি বচন-রচনাদি দ্বারা কিরূপে ব্যবহার-নিরত রহিয়াছ? এ কথার উত্তরে বলিব—হাঁ, আমার প্রকৃত অহঙ্কার নাই বটে; তবে আমি তাৎকালিক কল্পনাবশেই নটের ন্যায় 'অহং' বেশ ধারণ করিয়া আছি এবং সেই বেশে ভূষিত হইয়াই তোমায় এই সকল উপদেশবাক্য বলিতেছি, চক্ষুরাদি দ্বারা দেখিতেছি, জানিতেছি, আহ্বান করিতেছি এবং গমন করিতেছি। এই সকল করিয়াছি ও করিতেছি বটে; কিন্তু আর না,—এখন আর আমি ঐ সকল করিব না। কেন না, আমার আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছে; সুতরাং অধুনা আমার সে অহঙ্কার চলিয়া গিয়াছে। আমি নিশ্চয়ই মনে করি, প্রকৃতপক্ষে এই চক্ষুরাদি আমি। মদ্ব্যতিরিক্ত অন্য কোন জড় বস্তু এ দেহে থাকে তো থাকুক, আর যদি যায় তো যাউক, তাহারা আমার কেহই নহে; আমিও তাহাদের কেহই নহি। অহো! কি বলিব কষ্টের কথা! কে, কিসের জন্য এই 'অহং'-নামক পদার্থ কল্পনা করিল? ইহার জন্য কেন এতদিন আমি ক্লেশ পাইলাম। ইহা কোথা হইতেই বা আসিল? কিছুই ত বুঝিলাম না। এই 'অহং'-নামক বস্তুর আকৃতি তালবৎ উত্তাল অতুলাকৃতি বালক-কল্পিত বেতালের সহিতই তুলিত। যথায় তৃণ-লতা নাই, এহেন কুপর্ব্বতে হরিণ যেমন বৃথা ভ্রমণ করে, তেমনি এত দিন আমি বৃথা মোহ-গর্ত্তে ভ্রমণ করিয়াছি। পূর্ব্বে চক্ষু আপনার বিষয় দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইত, তাহাতে 'আমি'-নামে কোন্ ব্যক্তি দুঃখ-মোহে মগ্ন হইয়া থাকিত? অর্থাৎ আমার তাহাতে মুগ্ধ হইবার কি প্রয়োজন ছিল? ত্বক্ স্পর্শগ্রহণের নিমিত্ত

উন্মুখ হইয়া উঠিত, তখন কুপিশাচের স্থায় 'আমি' বলিয়া কে বটে তৎসঙ্গে সমুদিত হইত? রসনেন্দ্রিয় রস-গ্রহণে ব্যাসক্ত হইত, আমি তাহাতে 'আমিই মিষ্টভোজী' 'আমিই তিক্তাস্বাদী' এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইতাম কেন? শ্রবণ-লালসার বশীভূত হইয়া পূর্ব্বে শ্রবণেন্দ্রিয় শব্দশক্তি গ্রহণ করিত, কিন্তু তাহাতে আমার নির্জ্জীব অহঙ্কার-দুঃখের প্রসঙ্গ ছিল কেন? পূর্ব্বে ঘ্রাণ আত্মম্ভরিতা-ক্রমে গন্ধ গ্রহণ করিত, কিন্তু তাহাতে যে তখন 'আমি ঘ্রাতা' বলিয়া অভিমান করিত, সেই 'অহং' নামক চোরকে সে সময় আমি বিদিত হই নাই।

এইরূপে উল্লিখিত স্থলসমূহে যে অহম্ভাবকল্পনা, তাহা তো মৃগ-তৃষ্ণায় জলের ন্যায় অলীক বলিয়াই প্রতিপন্ন; সুতরাং দেখা যাইতেছে, 'এই দেহ আমি, ইহা আমার, আমিই সেই' ইত্যাদি কল্পনা ভ্রমের খেলা বৈ আর কিছুই নহে। বলিতে পার, বাসনার অভাবে বাহ্য প্রবৃত্তিগুলি সর্ব্বথা উপরত হইয়া থাকে; সুতরাং তখন তো জীবনযাত্রাও নির্ব্বাহ হওয়া অসম্ভব। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, এই দেহ বাসনাবিহীন হইলেও চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সকল স্ব স্ব ব্যাপারে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাতেই দেহ রক্ষা ও দেহের ক্রিয়া নির্ব্বাহ হইবে; সুতরাং দেখা যায়, ইহাতে বাসনার কোনই কারণতা নাই। মনে করিয়া দেখ, পূর্ব্বে যে দাম ব্যাল প্রভৃতির কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের কোনই কল্পনা ছিল না, অথচ তাহারা যুদ্ধাদি করিয়াছিল। কাজেই বাসনাশূন্য হইয়া যে কর্ম্ম করা যায় না, এ কথা সঙ্গত নহে। ওরে চিত্ত! বাসনাবিহীন-ভাবে কর্ম্ম করিবার ফল এইরূপ দাঁড়ায় যে, কর্ম্ম করিবার কালে কিঞ্চিৎ কালের জন্য ভোগা-ভাস প্রকটিত হয় মাত্র; কিন্তু পরে 'অহং সুখী' 'অহং দুঃখী' এরূপ অভিমান হয় না। ঐরূপ অভিমান হয় না বলিয়াই ভবিষ্যতে তদ্‌ঘটিত শোক, ভয়, মোহ, বিষাদ, চিন্তা বা উদ্বেগ এ সকলের কোন কিছুই জন্মে না। সুতরাং একথা নিশ্চয়ই যে, বাসনা বর্জ্জনপুরঃসর কর্ম্ম করিলে দুঃখের উদয় হয় না; পরন্তু শান্তিই সমুদিত হইয়া থাকে। তাই বলি-তেছি, ওরে আমার মূর্খতম ইন্দ্রিয়বর্গ! তোমরা স্ব স্ব বাসনা বিসর্জ্জন কর,—করিয়া যাবতীয় কর্ম্ম করিতে থাক; এইরূপ ভাবে কর্ম্ম করিলেই

তোমরা আর দুঃখ ভোগ করিবে না। বালকেরা প্রথমে পঙ্ক দ্বারা পুত্তলিকা প্রস্তুত করিবার কালে ক্লেশানুভব করে, অনন্তর তাহা যদি ভগ্ন বা নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে যেমন দুঃখ প্রাপ্ত হয়, তেমনি তোমরাও কেবল দুঃখেরই নিমিত্ত বাসনারাশি সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছ এবং বিষয়ের অর্জ্জনে ও তাহার বিনাশে দুঃখ ভোগ করিতেছ। অন্যদিকে ফলের বেলায় আবার বাসনাই হউক বা অন্য কিছুই হউক, তরঙ্গ ও জলাবর্ত্ত প্রভৃতি যেমন জল হইতে অভিন্ন, তেমনি তৎসমুদায়ই আত্মা হইতে অপৃথগ্‌ভূত। ইহা প্রাজ্ঞ জনের অভিমত; পরন্তু অজ্ঞ জনের নিকটই উহা পৃথক্‌ বলিয়া বিদিত। ওহে আমার ইন্দ্রিয়শিশুগণ! কোষকার কীট যেমন আপনা হইতে তন্তু উৎপাদন করে,—করিয়া তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি তোমরাও আপনা হইতে সমুৎপন্ন তৃষ্ণাবশে বৃথাই বিনষ্ট হইতেছ। গিরিচারী পথিকেরা যেমন দৃষ্টিভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া পার্ব্বত্য গভীর গর্ত্তে পতিত ও বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে, তোমরাও তেমনি তৃষ্ণার বশেই জরামরণময় সঙ্কটে পড়িয়া এই সংসাররূপ শিলা ও কণ্টকাকীর্ণ ভূভাগে বিলুণ্ঠিত হইতেছ। যেমন মুক্তাবলীর শূন্য গর্ভে প্রোত দীর্ঘ তন্তু—মুক্তাসমষ্টির একত্র বন্ধনের হেতু, তেমনি একমাত্র বাসনাই তোমাদের বন্ধনের মূলীভূত। এই বাসনা কি? ইহা কল্পনামাত্রেই সঙ্কলিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক পক্ষে উহাতে সত্যতা কিছুই নাই। সঙ্কল্পের অভাবই উক্ত বাসনাবিনাশের অস্ত্র। অসঙ্কল্প দ্বারাই উহাকে অনায়াসে উন্মূলিত করা যায়। পবন যেমন প্রদীপের,—অধিক কি, উজ্জ্বল উল্কা ও বিদ্যুৎপ্রভৃতিরও বিনাশের কারণ হয়, তেমনি তোমাদেরও এই বাসনাই মোহের ও ক্ষয়ের নিদান হইয়াছে।

হে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আধার চিত্ত! এই কারণেই বলিতেছি, তুমি নিখিল ইন্দ্রিয়ের সহিত একযোগে নিজেকে মিথ্যা বলিয়া দর্শন কর এবং বিমল বোধ-স্বরূপ নির্ব্বাণ লাভ করিয়া অবস্থান করিতে থাক। তুমি বাঞ্ছিত বিষয় বিসর্জ্জন কর,—করিয়া 'অহং'বাসনারূপিণী বিষয়-বিষময়ী বিসূচিকাকে একেবারে বিদূরিত করিয়া দাও। এইরূপে তোমার সংসার-

ভাব অপগত হউক। তুমি জনন-মরণাদি নিখিল ভয়ের অভূমি পূর্ণানন্দ আত্মস্বরূপে প্রতিভাত হও।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত॥ ৫২॥

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ।

উদ্দালক বলিলেন,—তিলাদি ক্ষুদ্র বস্তু কুসুমাদি দ্বারা এবং পৃথ্বী-জলাদি স্থূল বস্তু কস্তুরী প্রভৃতি দ্বারা বাসিত হইতে পারে; পরন্তু আত্মচিৎ যিনি, তিনি অপার,—অসীম,—অবয়বহীন এবং সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম; অতএব বাসনাদি দোষরাশি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া কিঞ্চিৎমাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। বলা বাহুল্য, আমিই আত্মচিৎস্বরূপে বর্ত্তমান। বলিতে পার, তোমার অপ্রকাশিত বিষয়ে বাসনার উদয় দেখা যায় না; সুতরাং তুমি যাহার বিস্তার করিয়াছ, তাদৃশ বাসনা সকল তোমায় স্পর্শ করে না, এ কিরূপ কথা? উত্তরে বলা যায়, আমি বাসনার বিস্তারক নহি। আত্মচৈতন্যের প্রতিবিম্ববশে বুদ্ধি ও 'অহং' তত্ত্বে জড় ইন্দ্রিয়-বর্গ কর্ত্তৃক বিষয়সমূহ সমানীত হইলে তৎসমুদায়ে বিষয়ের যে সুসূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি থাকে, মনীষীদিগের মতে তাহারই নাম বাসনা। তথাবিধ বাসনা অসৎ হইলেও বেতালের ন্যায় ভয়াবহ। ঐ বাসনা মনোমাত্রেরই অনুভাব্য। মনই বাসনার বিস্তার করে,—করিয়া তাহা অনুভব করিয়া থাকে। মন জাগ্রদবস্থায় বহু বিষয় বহুবার বিচার করে ও অনুভব করে, পরে আবার স্বপ্নকালীন অন্তরে অর্থাৎ নাড়ীচ্ছিদ্রের অভ্যন্তরে সেই সকল বাসনাময় বিষয়ই অনুভব করিতে থাকে। সুতরাং বুদ্ধি ও অহঙ্কার যাহার কর্ত্তা এবং মন যাহার অনুভাবক, তাহার স্পর্শও আমাতে নাই। আমি কি? আমি নির্লেপ চৈতন্যস্বরূপ। এই সংসার দুষ্ট চেষ্টায় রচিত; আমার দেহ ইহাকে গ্রহণ করুক, আর নাই করুক, আমার তাহাতে সম্বন্ধ নাই। আমি যেমন নির্লিপ্ত চৈতন্য, তেমনই রহিয়াছি। এই

আত্মচিতের জনন মরণ নাই; কেন না, ইনি সতত সর্ব্ব-গামিনী ও সর্ব্ব-রূপিণী। ইনি পূর্ণস্বভাবে বিরাজমানা; তাই ইনি মরেনও না, বা কাহাকে মারেনও না। জীবের মৃত্যু কি, কেই বা জীবকে মারিয়া থাকে? যিনি সর্ব্বাত্মা চিৎ, তিনিই সকলের জীবন; সুতরাং তাঁহার আবার জীবনে কি প্রয়োজন আছে? জীবনে যাহার প্রয়োজন আছে, মরণ হইতে তাহারই ভয় হইয়া থাকে, কিন্তু চিতের যখন জীবনে প্রয়োজনাভাব, তখন তাঁহার মৃত্যুভয়েরও সম্পূর্ণ অভাব। কেন না, চিৎই সর্ব্বদেশে সর্ব্বপদার্থে সর্ব্বকালে বিস্তৃত। তিনি নিজেই যখন জীবনস্বরূপে প্রতিভাত, তখন তিনি জীবন লইয়া কবে কি অন্য অপ্রাপ্য বস্তু প্রাপ্ত হইবেন? জীবন ও মরণ মনেরই কুকল্পনা মাত্র,—সুতরাং তাহাতে সেই বিমলাত্মা আত্মার দ্বেষ বা বাঞ্ছা প্রসক্তি নাই। যাহা দেহে অহম্ভাবতা প্রাপ্ত হয়, ভাবাভাব বা জনন মরণ দ্বারা তাহাই পরিগৃহীত হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি আত্মা, ঐ অহম্ভাব তাঁহার নাই। সুতরাং তাঁহার আবার ভাব বা অভাব হইবে কোথা হইতে? এখন কথা এই যে, ঐ দেহাহম্ভাব কাহার?—অহঙ্কারের, মনের, অথবা পদার্থসমষ্টির? এ পক্ষে বলা যায়,—অহঙ্কার একটা মিথ্যা মোহ, মন—মৃগতৃষ্ণিকা প্রায়, পদার্থসমষ্টি,—জড়স্বভাব; সুতরাং ঐ দেহাহম্ভাবনা নির্ব্বিষয় এবং নিরাশ্রয় বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। বলিব,—দেহ কি তবে ঐ দেহাহম্ভাবের আশ্রয়? না;—কেন না, দেহ ত মাত্র রক্তমাংস-ময়। মনও উহার আশ্রয় নহে; কেন না, মন বিচার মাত্রেই বিনষ্ট হয়। চিত্তাদি অন্যান্য সকলই জড়স্বভাব; সুতরাং বুঝিলাম না যে, ঐ দেহাহম্ভাবনা কাহার, বা কে উহার আশ্রয়? দেখিতেছি, ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব স্ব বিষয় লইয়া আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করিতেছে, পদার্থ-পুঞ্জ কেবল কতকগুলি পদার্থসমষ্টি-রূপেই অবস্থিত রহিয়াছে, সুতরাং কোথা হইতে যে ঐ অহম্ভাব-ভাবনার উদয়, তাহা কে বলিয়া দিবে? অপিচ সত্ব, রজ, ও তমঃ প্রভৃতি গুণত্রয় যথাক্রমে প্রকাশ, প্রবৃত্তি ও মোহরূপ স্ব স্ব ব্যাপারেই ব্যাপৃত; যিনি প্রকৃতি অর্থাৎ প্রধানাভিধেয় মায়া, তিনি প্রকৃতিতে অর্থাৎ গুণসাম্য অবস্থারূপ স্বীয় স্বভাবেই অবস্থিত এবং যিনি সৎ, তিনি সৎস্বরূপেই বিশ্রান্ত; সুতরাং

এ সমুদায়ের মধ্যে অহম্ভাবনা কোথায়,—বা কাহার? এই দেহের মধ্যে যে চিদাত্মা আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বকালস্থায়ী পরম মহান্ ও কেবলস্বরূপ। ঐ চিদাত্মা 'অহং পরমাত্মা' এইরূপ অবধারণেই অবস্থিত। সুতরাং তাহাকেও অহঙ্কারের আস্পদ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। যদি এইরূপই হয়, তাহা হইলে 'অহং' ইত্যাকারে দেহমাত্রাভিমানী কে? কাহাকে 'অহং' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়? তাহার আকার কি প্রকার? তাহার সংস্থান কীদৃশ? সে প্রকৃতপক্ষে কোন্ পদার্থ? কিরূপে সে নির্দ্দেশার্হ? কে তাহাকে কি হেতু নির্ম্মাণ করিল? তাহার বর্ণ কি প্রকার? সে কাহার বিকার? আমি 'অহং' ভাবে কোন্ পদার্থকে গ্রহণ করি এবং 'অনহং'ভাবেই বা কাহাকে পরিত্যাগ করি? অতএব নির্ব্বাচনের অযোগ্য বলিয়া অহঙ্কার-পদার্থ সম্পূর্ণই মিথ্যা। 'অহং' নামের ভাবত্ব বা অভাবত্বের উপপত্তি কোথাও নাই, আমাতে অহঙ্কারের যখন কোনরূপেই অস্তিত্ব নাই, তখন কাহার সহিত কি রূপে আমার সম্বন্ধ হইতে পারে? অহঙ্কারের যখন সত্যতা একেবারেই অপ্রসিদ্ধ, তখন অন্য কাহার সহিতই বা অপর কাহার কিরূপ সম্বন্ধ? সম্বন্ধের অভাবই যদি প্রতিপন্ন হইল; তবে ত দ্বিত্ব-কল্পনাও একেবারেই অসিদ্ধ বৈ আর কিছুই নহে। এইরূপই যদি সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে এ জগতে যাহা কিছু আছে, সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বৈ আর কি? ফলে এ জগৎ ব্রহ্মাদ্বৈত-সাম্রাজ্যরূপেই প্রতিষ্ঠিত। আমিই সেই সদ্‌ব্রহ্মরূপে বিরাজিত। সুতরাং আমি যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মরূপেই বিদ্যমান রহিয়াছি। তবে আর বৃথা শোক করিব কেন? একমাত্র সর্ব্বগত বিমল ব্রহ্মপদই বিদ্যমান; তাহাতে কিরূপে কোথা হইতে অহঙ্কার-কলঙ্কের আবির্ভাব হইবে? এ জগতে একমাত্র সর্ব্বব্যাপী আত্মাই অবস্থান করিতেছেন, তদিতর অন্য কোন পদার্থশ্রী এখানে বিদ্যমান নাই। আর যদিই বা পদার্থশ্রী থাকে, তবে তাহাতে সম্বন্ধ কাহারও নাই। ইন্দ্রিয়বর্গ মনের অবয়বরূপে কল্পিত; মন তাহাদিগকে আপনার বলিয়া কল্পনা করিয়া স্বপ্ন-সঙ্করণের ন্যায় নিজেই নিজেতে নিজ ব্যাপার সমাপ্ত বা সুসম্পন্ন করিয়া লয়। চিৎ যিনি, তিনি ইন্দ্রিয় ও বাহ্যার্থের সহিত অসঙ্গ-স্বভাব।

এইরূপে কাহার সহিত কাহা দ্বারা কিরূপ সম্বন্ধ, কোন্‌রূপেই বা সুসিদ্ধ হইবে? শিলা ও লৌহশলাকা এই দুইটী বস্তু পরস্পর সম্মিলিত হইলেও তাহাদের পরস্পর যেমন কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, তেমনি দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন ইহাদিগকে একসঙ্গে দেখা গেলেও ইহাদিগের মধ্যে পরস্পর সম্বন্ধ কিছুই নাই। অহম্ভাবরূপ মহাভ্রম বৃথাই আসিয়া সমুদিত হয়; এই জন্যই 'ইহা আমার, উহা ইহার' এইরূপে এই জগৎ ভ্রমময় ও বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই অহঙ্কাররূপ চমৎকৃতির কারণ,—একমাত্র তত্ত্বদর্শনের অভাব। যদি তত্ত্বসাক্ষাৎকার ঘটে, তাহা হইলেই উত্তাপ-যোগে তুষারলেখার ন্যায় ঐ অহঙ্কার-চমৎকৃতির বিলয় হইয়া থাকে। সর্ব্বত্র একমাত্র আত্মাই আছেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই নাই এবং 'এ সকলই ব্রহ্ম' ইহাই আমার তত্ত্ব; আমি এই তত্ত্ববিষয়েরই ভাবনা করি। গগনে যেমন নীলিমাদি বর্ণের বিকাশ, তেমনি এই অহঙ্কারভ্রমের আবির্ভাব; সুতরাং আমি ইহা সম্পূর্ণই বিশ্বাস করি যে, যদি ইহাকে আর স্মরণ করা না যায়, তাহা হইলেই উহার পর্য্যবসান ঘটে এবং তাহাতেই পরম শ্রেয়ঃসাধন হয়। অতএব আমি এক্ষণে এই চিরপ্ররূঢ় অহঙ্কার-ভ্রমের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলি। পরে সমস্ত বাহ্য বিষয় হইতে উপরত হই,—হইয়া শারদীয় স্বচ্ছাকাশে আকাশের অবস্থিতির ন্যায় নির্ম্মল আমি—নির্ম্মল আত্মায় অবস্থান করিতে থাকি। অহঙ্কারের অনুসন্ধান করিতে গেলে, ফলে কেবল অনর্থ-সার্থই বিস্তার পায়, দুষ্কৃতির সঞ্চয় হয় এবং সন্তাপ-সন্ততিরই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই হৃদাকাশে যদি একবার দুর্ব্বাসনারূপ জলগর্ভ 'অহং' মেঘ সমুদিত হয়, তাহা হইলে এই যে কলেবররূপ কদম্ব-পাদপ, ইহার সর্ব্বভাগে কেবল দোষমঞ্জরীই বিকসিত হইয়া উঠে। মরণের পর যে পারলৌকিক দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহার শেষ বা অন্তসীমা কোথায়? ফলে পুনর্জ্জন্মই তাহার অবধি; মরণের পর জন্ম হইলেই পারলৌকিক দুঃখের অবসান ঘটিয়া থাকে। এইরূপে এই ঐহিক দুঃখের ভোগও মরণাবধি; মরণ হইলেই ঐহিক দুঃখের অবসান ঘটিয়া থাকে। সুতরাং দেখা যায়, যে কিছু ভোগ্য বস্তু, তৎসমস্ত এইরূপেই বিনশ্বর। ফলতঃ এই দুঃখ-বেদনা একান্তই কষ্টদায়িনী।

নিদাঘকালে সূর্য্যকান্তমণি হইতে নিঃসৃত অগ্নি যেমন প্রশমিত হইতে চায় না, তেমনি যাহারা অহঙ্কার-দুর্বিদ্ধি আশ্রয় করে, তাহাদিগের—'ইহা লাভ করিয়াছি, ইহা লাভ করিব' এই প্রকার মনোবেদনা প্রশান্ত হইবার নহে। যেমন জড়াশ্রয় অভ্রমালা জড়াকৃতি শৈলকুলাভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি 'ইহা নাই, আর ইহা আছে' এই প্রকার জড়াশ্রয়া চিন্তা জড়াকৃতি অহঙ্কৃতির দিকেই ধাবিত হইয়া থাকে। অহঙ্কার যখন সম্পূর্ণ ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন এই সংসার-তরু একেবারেই বিশুষ্ক হইয়া যায়। কাজেই পাষাণবৎ আর যে কখন অঙ্কুরিত হইবে, তাহার আর সম্ভাবনা থাকে না। এই দেহ-পাদপে তৃষ্ণারূপিণী ভুজগী বাস করিতেছে। যদি বিচাররূপ বৈনতেয় আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ঐ ভুজগী যে কোথায় পলাইয়া যায়, তাহার আর সন্ধান থাকে না। মিথ্যা অজ্ঞান হইতেই এই বিশ্ব সমুৎপন্ন হয়; সুতরাং বলা যায়, ইহা অসৎ বৈ আর কিছুই নয়। তবে যে সৎস্বরূপে উহার প্রতীতি হয়, তাহা কেবল ভ্রম নিবন্ধনই হইয়া থাকে। উহার কার্য্য স্পন্দন, তাহাও অসন্ময়। কাজেই 'তুমি' 'আমি' ইত্যাকার ভেদ ব্যবহারই বা আবার কি? এই যে জগৎ দেখিতেছি, ইহা অকারণ ব্রহ্ম হইতেই অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছে; সুতরাং ইহাকেও অকারণ ও আকস্মিক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, যাহার কোনই কারণ নাই, তাহাকে সৎ বলিয়া ভাবনা করা বৃথা। যেমন সেই অনাদি অনন্ত কাল পূর্ব্বে মৃত্তিকায় ঘটাকৃতি ছিল, বর্ত্তমানেও তাহাই আছে, ভাবী কালেও সেইরূপই থাকিবে, অপিচ জল পূর্ব্বকালেও অবিকৃত জলাকারে ছিল, পরবর্ত্তী কালেও সেইরূপই থাকিবে; পরন্তু মধ্যে কিয়ৎকাল চঞ্চল ভাবাপন্ন হয় বলিয়া সেই চঞ্চল জল পূর্ব্ব ও পরকালীয় স্থিরভাব পরিহারপূর্ব্বক 'তরঙ্গ' নামে পৃথক্ আখ্যা প্রাপ্ত হইলেও তাহা যেমন যে জল, সেই একমাত্র জলই;—তদ্ব্যতীত অন্য বস্তু নহে; তেমনি ত্রিকালবর্ত্তী এই দেহও একমাত্র ব্রহ্মই; ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এই ক্ষণ-পরিস্পন্দ চঞ্চল তরঙ্গ নিভ দেহে যাহারা আস্থা স্থাপন করে, তাদৃশ কুবুদ্ধিশালী লোকেরা সেই দেহ নাশে নিজেই নিহত হইয়া থাকে। এই যে দেহাদি

যে কিছু বস্তু, এতৎসমস্ত পূর্ব্বে, পরে বা চারিদিকে বিদ্যমান নহে; পরিচ্ছিন্ন একদেশেই ক্ষণমাত্র এই সকল প্রতীত হইয়া থাকে। অতএব এই সমুদায়ে আবার আস্থা স্থাপন কেন? ফলে তাদৃশ অবস্থা একান্তই অসঙ্গত। এইরূপে স্থূল দেহের ত কথাই নাই; পরন্তু সূক্ষ্ম দেহও উৎপত্তির পূর্ব্বে সাক্ষী চিন্মাত্ররূপে অবস্থিত ছিল। উহার স্বীয় অধিকরণ-দেশের অন্যত্র বা বিনাশের পরত্র সত্তাই থাকে না; কাজেই তখন মনে হয় যেন ঐ সূক্ষ্ম বা লিঙ্গদেহ আকাশে লয় পাইয়াছে। এই জন্য উল্লিখিত লিঙ্গদেহকেও সৎ বা অসৎ এ উভয়ের কিছুই বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। স্বপ্নকালে, ভয় ও সম্ভ্রম সময়ে, ইন্দ্রিয়ের উন্মাদাবস্থায়, যান-বাহনাদি যোগে ভ্রমণ-জনিত সম্বেগে, বাতপিত্তাদি ধাতুবিকারে, তিমিরাদি দোষজাত চক্ষুরিন্দ্রিয়াদির বিকলতায়, একান্ত ইষ্ট বস্তুর লাভদশায়, হঠাৎ প্রচুর আনন্দে ও কামক্রোধাদির উত্তেজনাবস্থায় মানবের যেমন ভাব ও অভাব উভয়বিধ বস্তুর স্বরূপ ক্ষণস্থায়ী কামিনী-কাঞ্চনাদি বিবিধ বিষয়-বিশেষরূপে প্রতীত হয়; পরন্তু পরবর্ত্তী কালেই বাধ সঙ্ঘটন হওয়ায় তৎসমস্তই বিলয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আর প্রতীতিযোগ্য হয় না, তেমনি এই যে স্থূল-সূক্ষ্ম দেহ ও জগৎ বিস্তার, এ সমস্তই ঐরূপই ভ্রান্তির বিস্ফুরণ। তবে কথা এই যে, ভ্রম উভয়ত্র সমান নহে। কালগত ন্যূনতা ও আধিক্যই উক্ত দ্বিবিধ ভ্রমের বিশেষত্ব। স্বপ্নাদি কালে যে ভ্রম উৎপন্ন হয়, তাহা অল্পকাল থাকে, আর এই দেহাদি জাগতিক ভ্রম মোক্ষ না হওয়া পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়; সুতরাং বুঝা যায়, কালের ন্যূনাতিরেক ব্যতীত উল্লিখিত ভ্রমদর্শনের ন্যূনাধিক্য নাই।

ওরে চিত্ত! ঐ যে কালগত ন্যূনাতিরেকের কথা উল্লেখ করিলাম, তাহাও তুমিই করিয়াছ, তোমার কল্পিত ভ্রমব্যাপারে তুমি নিজেই ভ্রামিত হইতেছ। প্রতারক ব্যক্তির মুখে পুত্রকলত্রাদির মিথ্যা মরণাদি বার্ত্তা শ্রবণে তাহাতে সত্য বুদ্ধি স্থাপিত হয়, সেই সত্য বুদ্ধি ও সত্য ধারণাকল্পিত বিয়োগ-যামিনী যেমন পুত্রকলত্রাদির প্রতি একান্ত অনুরক্ত পুরুষকে অতীব দুঃখ প্রদান করে, তেমনি ইষ্ট বস্তুর সংযোগ ও বিয়োগজনিত সুখ দুঃখের হেতুভূত ঐ ভ্রান্তি তোমা কর্ত্তৃকই কল্পিত হইয়া

তোমাকেই বিশেষ কষ্ট প্রদান করিতেছে। অথবা হে চিত্ত! তুমি কোন দোষেরই দোষী নহ। আমি তোমাতে অহঙ্কারের অভ্যাস করিয়া আসিতেছি, তাহারই ফলে তুমি বস্তুতঃ মরীচিকাবৎ মিথ্যা হইলেও আমারই নিকট সত্য বলিয়া লক্ষিত হইতেছ। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অপরাধ যাহা কিছু, তাহা আমারই হইয়াছে; অতএব বুঝা যায় যে, তোমারই কৃতকর্ম্ম অধুনা আমারই কৃত বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। এই যে বিশাল-দৃশ্য বিশ্ব-বিস্তার দেখা যাইতেছে, যদি এতৎ সকল অবস্তু বা অসত্য বলিয়া অবধারণ করা যায়, তাহা হইলে মন অমনঃপদ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মন ক্ষয় পাইয়া যায়। হেমন্তকালে মঞ্জরী যেমন নাশ পায়, সেইরূপ 'সমস্তই অবস্তু বা মিথ্যা' মনোমধ্যে যখন এইরূপ স্থির নিশ্চয় হইয়া যায়, তখন নিখিল ভোগ-বাসনাই বিলয় প্রাপ্ত হয়। অথবা মন যখন চিন্ময়তা হেতু বিষয়ে অনাসক্ত হয় এবং নিখিল মনন ব্যাপার হইতে বিরত হইয়া থাকে, তখন আপনা হইতেই সে, মোক্ষপদে বিশ্রান্তি লাভ করে। চিত্ত আপনিই আপনার বহিঃ-প্রবৃত্ত অবয়ব,—ইন্দ্রিয়সমূহকে তত্ত্ববোধ বলে পরমাত্মরূপ অনলে নিক্ষেপ করিয়া আপনার চিত্তস্বরূপ দগ্ধ করিয়া ফেলে; অনন্তর নিত্য শুদ্ধি লাভে সক্ষম হইয়া থাকে। বীর পুরুষ যেমন সমরে প্রাণ পরিত্যাগ করে,—করিয়া স্বীয় স্বর্গগত দেহকে অন্যাকারে অবোলোকনপূর্ব্বক স্বীয় পূর্ব্বতন দেহসম্বন্ধী পুত্র, কলত্র, ধন, ও গৃহাদির বাসনারাশি বিসর্জ্জন করিয়া স্বীয় মৃত্যু ও সুখের বিষয় বিবেচনা করে ও পরে ব্রহ্মলোকে গমনপূর্ব্বক জয়-যুক্ত হইয়া থাকে, তেমনি মন যখন বিবেক-সম্পন্ন হয়, তখন সেও দেহকে অন্যরূপ অর্থাৎ ব্রহ্মাকারে ভাবনা করিয়া বিষয় বাসনা পরিত্যাগ করে,—করিয়া আপনার বিনাশ-ব্যাপার অঙ্গীকার করত সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজমান হয়। মন শরীরের শত্রু এবং শরীরও মনের শত্রু। যেমন আধার ও আধেয়,—জল ও ঘট এই উভয়ের কার্য্যভূত সংযোগ উহাদের একতরের নাশেই নাশ পাইয়া যায়, তেমনি উক্ত শরীর ও মনের মধ্যে একতরের বাসনা বিনাশে উভয়েই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। উহারা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে জীবিত থাকে; এইজন্য পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অনুরাগ আছে। অন্যদিকে উহারা উভয়েই উভয়কে তাপ প্রদান করে বলিয়া

উভয়েই উভয়ের প্রতি বিদ্বেষী। যাহা হউক, এই পরস্পর-বিদ্বেষী মন ও শরীরকে সমূলে নির্ম্মূল করাই পরম সুখ বা পরম শান্তি। প্রশ্ন হইতে পারে যে, মরণদশায় এই ভোগায়তন দেহের বিনাশেই সর্ব্ব দুঃখ মোচন না হইবে কেন? ইহার উত্তরে বলা যায়, দেহ নষ্ট হইল, আর মন রহিল; এ অবস্থায় প্রকৃত মরণ হয় না; কেন না, মন থাকিলেই অন্য দেহের কল্পনা অনিবার্য্য হইয়া থাকে। সুতরাং গগনোড্ডীনা রমণী-কৃত ভূমি-গ্রাসের ন্যায় মন ও দেহ এই উভয়ের একতরের বিদ্যমানতায় অর্থাৎ দেহ নাশে মনের সত্তায় 'মরণ' এইরূপ কথা হওয়াই অসম্ভব। মন ও শরীর ইহারা পরস্পর স্বভাবতই বিরোধী। ইহারা উভয়ে যেখানে থাকিবে, সেইখানেই শরধারার ন্যায় অজস্র অনর্থপরম্পরা পতিত হইতে থাকিবে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঐ উভয়ের উচ্ছেদ করাই কর্ত্তব্য এবং তাহাতেই সুখোদয় নিশ্চিত। দেহ ও মন পরস্পর পরস্পরের বিরোধী, ইহাদের যথায় সংসর্গ আছে, তাদৃশ বৈষয়িক সুখে যে অধম অনুরক্তি প্রকাশ করে, তাহার স্থান ভীষণ বাড়বাগ্নি মধ্যে হওয়াই সমুচিত। বালক-কৃত যক্ষকল্পনার ন্যায় মন আপনিই আপন সঙ্কল্পে শরীর নির্ম্মাণ করিয়া শরীরে অবস্থিতি-কাল পর্য্যন্ত তাহাকে কেবল স্বীয় দুঃখই সমর্পণ করিতে থাকে। দেহ মনঃপ্রদত্ত দুঃখে তাপিত হয়,—হইয়া তাহাকে নাশ করিতে সমুদ্যত হয়। অর্থাৎ দেহ কুবিষয়ের সেবা করিয়া দেহমধ্যে রাগ, দ্বেষ, শোক, মোহ ও পাপাদি উৎপাদন করে। বস্তুতঃ পিতা যদি আততায়ীর ন্যায় ব্যবহার করেন, তবে পুত্রও তাঁহাকে নিহত করিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে মন—পিতা এবং শরীর—পুত্রস্থানীয়। প্রকৃত পক্ষে কেহই কাহারও শত্রু বা মিত্র হয় না। কথা এই যে, যে সুখ প্রদান করে, তাহাকে মিত্র নামে নির্দ্দেশ করা যায়, আর যাহা হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়, তাহাকেই শত্রুসংজ্ঞায় অভিহিত করা হয়। দেহ দুঃখানুভব করিতে করিতে অবশেষে মনকে মারিতে উদ্যত হয় এবং মনও ক্রমে ক্রমে দেহকে স্বীয় দুঃখপরম্পরার আধার করিয়া তুলে। দেহ ও মন স্বভাবতই অত্যন্ত বিরোধী হইয়া এইরূপে পরস্পরকে যদি দুঃখ দান করিতে থাকে, তাহা হইলে সুখ লাভ হইবে কি রূপে? ফল কথা, সুখপ্রাপ্তি তো একান্তই অসম্ভব। মন

যখন পরিক্ষীণ হইয়া যায়, দেহ তখন আর দুঃখাস্পদ হয় না। এই জন্য মনের ক্ষয় সাধনে সমুৎকণ্ঠিত হইয়া দেহ নিয়ত ধাবমান হইয়া থাকে। যতদিনে না মনের আত্মবিবেক লাভ হয়, তত দিন দেহ নষ্ট হয় হউক বা নাই হউক, মনের প্রভাবে সেই দেহ আপদের আস্পদ হইয়া অনর্থ উৎপাদন করে। দেহ নাশ হইলেই যে মনের কোন ইষ্টসিদ্ধি আছে, তাহা নাই। তবে কথা এই যে, মন যদি আত্মবিবেক লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে তাহার যথার্থ ইষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে। জলধর ও জলাশয় এই উভয়ে যেমন উভয়ের সাহায্যে স্ফীত হয়, তেমনি মন ও দেহ উভয়েই উভয়ের সাহায্য পাইয়া পরস্পর কেবল আকৃতিগত পীনভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যেমন জল ও অনল এই দুই পদার্থ পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হইলেও পাকক্রিয়া সমাধা করিবার জন্য উভয়েই একযোগে কার্য্য করিতে থাকে, তেমনি মন ও দেহ, ইহারা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হইয়া দ্বিধারূপে বিদ্যমান হইলেও অন্যান্য তাদাত্ম্য অধ্যাস নিবন্ধন একরূপতা প্রাপ্ত হয়,—হইয়া দুঃখ ভোগ ও দুঃখবর্জ্জনের নিমিত্ত পরস্পর একযোগে বিষয় ভোগ সম্পাদন এবং মোক্ষসাধনও করিয়া থাকে। ক্ষয়প্রবণ চিত্ত যদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেহও সমূলে বিনষ্ট হইয়া থাকে, আর চিত্ত যদি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে দেহও পাদপের ন্যায় শতশত শাখায় সমাচিত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া উঠে। একবার যদি মনঃ ক্ষয় হয়, তাহা হইলে সেই সঙ্গে বাসনারও বিলয় ঘটে এবং দেহও বিনাশদশায় উপনীত হয়। কিন্তু যদি দেহ ক্ষয় হয়, তাহা হইলে মন কিম্বা বাসনা এ উভয়ের একটীরও ক্ষয় হয় না। অতএব এই কথাই নিশ্চয় যে, যাহাতে মন ক্ষয় হয়, তাহারই জন্য সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। মন যেন একটা কাননের ন্যায় প্রতিভাত। সঙ্কল্প সকল এই কাননের পাদপশ্রেণী এবং তৃষ্ণাই উহার ব্রততিরাজি। আমার এক্ষণে কর্ত্তব্য এই যে, ঐ পাদপ ও ব্রততিসমূহে সমন্বিত মনোরূপ কানন আমি ছেদন করিয়া সুবিস্তৃত সুপরিষ্কৃত ভূমিভাগ প্রাপ্ত হই,—হইয়া পরম সুখে বিহার করিয়া বেড়াই। সঙ্কল্প ক্ষয় হইয়া গেলে মন আর মনঃস্বভাবে থাকে না, সে

তখন ক্ষয় পাইয়া যায়। মনঃক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে বাসনারাশিও বর্ষান্তে বারিদমালার ন্যায় প্রশমিত হইয়া থাকে। এই দেহ—ত্বক্, অসৃক্, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্রাদি ধাতুসমূহের সন্নিবেশময়। ঈদৃশ দেহকেই আমি প্রধান শত্রু বলিয়া মনে করি। আমার মন যদি প্রক্ষীণ হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ দেহ-শত্রু তখন নষ্ট হউক বা থাকুক, তাঁহাতে আমার কোনই ক্ষতি-বৃদ্ধি বোধ নাই। কেন না, মনঃক্ষয়ই আমার প্রয়োজন। সেই প্রয়োজন সিদ্ধ হইলেই আমি চরিতার্থতা মনে করি। যদি বল, দেহ থাকিলে দুঃখ হইবে না কেন? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, দেহ-সম্বন্ধের হেতুভূত মন নাশ পাইয়া গেলে, তাহার সম্বন্ধই থাকে না, তাহাতে দুঃখপ্রসক্তি তো দূরের কথা। দেখ, ভোগশ্রী যাহার জন্য দেহ কামনা করে, আমার সেই মনই এক্ষণে নাই; আমিও তাহার নহি; সুতরাং আমার আর সুখের কথায় প্রয়োজন কি আছে? আমি যে দেহ নহি, এ সম্বন্ধে আর একটী যুক্তি আছে; শ্রবণ কর। আমার সেই যুক্তি এই যে, শবদেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলই থাকে; অথচ সেই শব দর্শন ও স্পর্শনাদি ক্রিয়া করিতে পারে না কেন? এ ক্ষেত্রে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, শব দেহের চৈতন্য নাই; সেই জন্যই সে দর্শন, স্পর্শন বা শ্রবণাদি দ্বারা লোক-ব্যবহার নিষ্পাদন করিতে পারে না। ফল কথা, শব দেহ ও দেহ একই বস্তু। আমার চৈতন্য আছে; এই জন্যই আমি দর্শন ও শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে পারি। অতএব আমি যে দেহ নহি, এ কথা যথার্থই বটে। আমি দেহাতীত, নিত্য ও নিত্য স্ফুরিত। যিনি বিভুত্বপ্রযুক্ত সৌরমণ্ডলেও সমধিষ্ঠিত হন এবং তথায় সূর্য্যসহ সম্মিলিত হইয়া সূর্য্যকে জানিয়া থাকেন, সেই চিৎ-স্বরূপই আমি। আমি অজ্ঞ বা অবোধ নহি। আমার না দুঃখ, না অনর্থ, না দুঃখিতা, কিছুই নাই। আমার দেহ থাকুক আর যাউক, আমি বেশ আছি,—আমি নিত্যই বিগতজ্বর হইয়া অবস্থান করিতেছি। যেখানে আত্মা আছেন, তথায় না মন, না ইন্দ্রিয়, না বাসনা, কেহই নাই; সেখানে উহাদের কাহারও থাকিবার অধিকার নাই। বস্তুতঃ রাজার নিকট পামর ব্যক্তিরা আসন পাইতে পারে কি? আমি সেই ব্রহ্মপদেরই অনুগত

হইয়াছি। আমি কেবল-স্বরূপেই রহিয়াছি। আমি সর্ব্বোৎকর্ষেই বিরাজ করিতেছি। আমি নির্ব্বাণ হইয়াছি, নিরংশ হইয়াছি, নিরীহ হইয়াছি এবং নিরীপ্সিত হইয়াছি। যেমন তিল হইতে তৈলকে পৃথক্ করিয়া লইলে তিলের অতৈলাংশের সহিত তৈলের কোন সম্বন্ধ থাকে না; তেমনি অধুনা কি দেহ, কি মন, কি ইন্দ্রিয়াদি, ইহাদিগের সহিত আমার কোনই সম্বন্ধ নাই। আমার মতি পূর্ব্ববাসনা হইতে পৃথক্-কৃত হইলেও যদি কখন অবশিষ্ট প্রারব্ধ ভোগ-লীলার্থ আমাকে এই পরাৎপর পরমাত্মপদ হইতে কথঞ্চিৎ বিচলিত হইতেও হয়, তথাচ তখন আমার এই দেহ ও ইন্দ্রিয়প্রভৃতিও স্বীয় পরিবারবর্গের ন্যায় আমারই শুভানুধ্যায়ী হইবে। বিশদার্থ এই যে, তাহাতে আমি কখন কোন দুঃখই পাইব না; ফলে আমার কেবল চিত্তবিনোদনই ঘটিবে। তখনকার তাদৃশ ভোগ-লীলায় আমার স্বচ্ছতা হইবে, পূর্ণকামতা হইবে, সৎস্বরূপতা হইবে, তত্ত্বজ্ঞতা হইবে, এবং আমার আনন্দময়তা, উপশম-শীলতা, সতত মৃদুভাষিতা, পূর্ণতা, উদারতা, অবাধিত আত্মভাবতা, একাগ্রতা, কান্তিমত্তা, সর্ব্বত্র সমদর্শিতা ও দ্বৈত বিকল্পশূন্যতা সংঘটিত হইবে। আমি আত্মাতেই একনিষ্ঠ হইব, আমার ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত গুণ-সম্পদ্‌গুলি নিত্য অভ্যুদয়শালিনী হইয়া সমভাব-সম্পন্ন, সুস্থ ও সুফলবিধায়িনী হইবে,—হইয়া হৃদয়েশ্বরী কান্তার ন্যায় বিরাজ করিতে থাকিবে। আত্মা—সর্ব্বময়; তাঁহাতে কল্পনাবলে কি না সম্ভব হয়? বস্তুতঃ সর্ব্বদা সর্ব্বথা সমস্তই তাঁহাতে সম্ভাব্য। অতএব আমার অধুনা নিখিল বিষয়সমূহের প্রতি ইচ্ছা, অনিচ্ছা, রাগ, দ্বেষ, সুখ, কিম্বা দুঃখ, কিছুই নাই; সকলই বিলয় পাইয়াছে।

আহা! আমার এক্ষণে মোহ নাই, মন নাই, আমি নির্ব্বিকল্পচিত্তে রহিয়াছি; সুতরাং শরতের নভোমণ্ডলে মেঘখণ্ড যেমন বিলীন হইয়া যায়, তেমনি আমি শীতল বা নিস্তাপ আত্মাতে উপরত হইয়া অর্থাৎ সমস্ত দৃশ্যভাব বিসর্জ্জন করিয়া বিশ্রান্ত হইয়াছি।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৩ ॥

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! মুনিবর উদ্দালক এইরূপে তাঁহার একান্ত বিশুদ্ধ বুদ্ধির সহায়তায় সম্যক্ বিচারালোচনা করিয়া বদ্ধপদ্মাসন হইলেন এবং অর্দ্ধোন্মীলিত-নয়নে অবস্থান করিতে লাগিলেন। যিনি সুচারুভাবে প্রণবোচ্চারণে পটু, তিনিই পরম ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। উদ্দালক মুনি এ তত্ত্ব অবগত ছিলেন; সুতরাং প্রণবকেই তিনি পরম ব্রহ্ম জ্ঞানে ধ্যান করিতে লাগিলেন। যেমন ঘণ্টামধ্যগত লাঙ্গুলের যথাযথ আঘাত বশতঃ ঘণ্টা হইতে অত্যুচ্চ ধ্বনি উত্থিত হয়, সেই মুনি উদ্দালক তখন তাদৃশ উচ্চতর ধ্বনি সহযোগে প্রণবমন্ত্র উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত না প্রণবাকার বৃত্তি-উপহিত চৈতন্য ও কূটস্থ জীবচৈতন্য তিনটী মাত্রার উচ্চারণ হইবার পর অর্দ্ধমাত্রাকারে বিস্ফুরিত বিমল বিতত আত্মাতে অখণ্ড ব্রহ্মাকৃতি ধারণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল, ততকাল তিনি প্রণবোচ্চারণে নিরত রহিলেন। অর্দ্ধমাত্রার সহিত অকার, উকার ও মকার এই তিন অংশ প্রণবের স্বীয় অবয়ব মাত্র। অগ্রে উদাত্তস্বরে তিনি প্রণবের প্রথমাংশ অকারমাত্র উচ্চারণ করিলেন। তাহাতে যথাযথ উচ্চারণবশতঃ উচ্চ স্বরে সম্যক্ সমভিব্যক্ত প্রণবের আদি অংশ বহির্নির্গমনোন্মুখ বিক্ষুব্ধ প্রাণপবন-যোগে সেই মুনির মূলাধার হইতে ওষ্ঠপুট পর্য্যন্ত দেহভাগ ধ্বনিত করিল।

অনন্তর প্রাণপবনের নিক্রমণরূপ রেচকাখ্য প্রতিক্রিয়ায় তদীয় সর্ব্বদেহ অগস্ত্যপীত সাগরের ন্যায় শুষ্ক হইয়া গেল। পক্ষী যেমন কুলায় ছাড়িয়া গগনপথে অবস্থান করিতে থাকে, তেমনি সেই রেচকাখ্য প্রক্রিয়ায় বহিরাগত তদীয় প্রাণপবন দেহ পরিহারপূর্ব্বক ব্রহ্মভাবনা করিতে করিতে অভিব্যক্ত চৈতন্যরসাপূরিত বাহ্যাকাশে বিরাজ করিতে লাগিল। পরে প্রাণপবনের নিক্রমণ-সঙ্কটে এবং ভাবনার প্রাবল্যে হৃদয়মধ্যে বহ্নি সমুদ্ভূত হইল। সেই সমুদ্ভূত বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া সর্ব্বদেহ দাহ

করিয়া ফেলিল; বোধ হইল প্রবলতর শুষ্ক বাত্যা-জনিত দাবানল যেন অরণ্যপ্রদেশ দগ্ধ করিল। তিনি প্রণবের প্রথমাংশ উচ্চারণে কেবল ভাবনাবশেই উল্লিখিত অবস্থায় উপনীত হইয়া ছিলেন; পরন্তু হঠযোগ দ্বারা তাঁহার ঐরূপ অবস্থা ঘটে নাই; কেন না, হঠযোগ অতি দুঃখদায়ক। তাহাতে এতদূর পর্য্যন্ত হয় যে, প্রাণসমূহের হঠাৎ নির্গমনে মূর্চ্ছা,—এমন কি, মরণ পর্য্যন্তও সংঘটিত হইতে পারে।

অতঃপর মুনিবর উদ্দালক কর্ত্তৃক প্রণবের দ্বিতীয় ভাগ উকার অনুদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হইয়া সমভাবে রহিলে প্রাণায়ামের কুম্ভক নামক মধ্যমাংশ নিষ্পন্ন হইল। তৎকালে প্রাণ-পবন স্তম্ভিত জলরাশির ন্যায় অন্তরে, বাহিরে, মধ্যদেশে, ঊর্দ্ধদেশে বা দিক্‌তটে কুত্রাপি বিচলিত হইল না। তিনি স্থির বা স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এদিকে বিদ্যুৎ যেমন ক্ষণকাল যাবৎ বহ্নিজ্বালা প্রদর্শনপূর্ব্বক উপশান্ত হইয়া যায়, তেমনি সেই উদ্দালক মুনির হৃদয়াগ্নিও ক্ষণকালের জন্য সমুৎপন্ন হইয়া তদীয় স্থূল দেহ দাহ করিল,—করিয়া উপশান্ত হইয়া গেল। তিনি ভাবিলেন,—তাঁহার দেহ তুষারবৎ শুভ্র ভস্মরাশিতে পরিণত হইল। সেই অবস্থায় তাঁহার অনুভবগোচর হইল যে, সেই নিষ্পন্দ শুভ্র শরীরাস্থিপুঞ্জ যেন কর্পূর-পরাগ-রচিত সুখশয্যায় সুপ্ত হইয়া রহিল। অনন্তর দেখিলেন,—ঊর্দ্ধপ্রবাহী প্রচণ্ড পবনে যেন ঊর্দ্ধনীত সেই অস্থি সহ ভস্ম তাঁহার দেহে লেপিয়া দিল। বোধ হইল, রুদ্রব্রতাবলম্বী ব্যক্তির স্বগাত্রে যেন অস্থি ভস্ম বিলেপিত হইল। পরে সেই প্রচণ্ড পবন-চালিত অস্থি যুত ভস্ম কিঞ্চিৎ কাল গগনদেশে ঘূর্ণমান হইয়া শারদীয় বারিধরবৎ কোথায় কোন অজ্ঞাত দেশে অদৃশ্য হইয়া গেল। ইহার পর প্রণবের দ্বিতীয় অংশ উকার উচ্চারণ কালেও উদ্দালক মুনির এবম্বিধ অবস্থাই অনুভূত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এ অবস্থাও তাঁহার হঠযোগের সাহায্যে ঘটে নাই; কেন না, তাহা অতি দুঃখদায়ক। কাজেই প্রণব উচ্চারণকালীন সকল অবস্থাই তাঁহার ভাবনাময় হইল।

অনন্তর যাহা উপশান্তি-প্রদ, প্রণবের সেই তৃতীয় অংশ 'ম' কার উচ্চারিত হইবার কালে প্রাণপবনের পূরণে পূরকসংজ্ঞক প্রক্রিয়াবিশেষ

সুসপন্ন হইল। এই সময় প্রাণবায়ু জীবচৈতন্যের মধ্যে ভাবিত অমৃতের মধ্যগত হইয়া বহিরাকাশে যেন হিমস্পর্শ প্রাপ্ত হইয়াই পরম শীতলভাবে আশ্রয় করিল। গগনাভ্যন্তরে সমুত্থিত ধূমসমূহ যেমন শীতল জলময় জলদরূপ ধারণ করে, ঐ গগনান্তরচারী প্রাণপবনও তেমনি ক্রমশঃ চন্দ্র-মণ্ডলতা উপগত হইল। ঐ চন্দ্রমণ্ডল সুধাময় কলাকলাপে পরিপূর্ণ হইয়া রসায়ন-মহার্ণবাকারে প্রতীত ও ধর্ম্মমেঘাখ্য সমাধিবৎ আহ্লাদময় হইল। তখন প্রাণপবন সকল অমৃতময় কিরণধারা হইয়া গবাক্ষপথ-গত সুধাংশুর অংশচ্ছটার ন্যায় অথবা স্ফটিকদণ্ডের ন্যায় প্রতীত হইতে লাগিল। মহাদেবের মস্তক হইতে নিঃসৃত রসপ্রবাহিনী মন্দাকিনী যেমন মর্ত্ত্যে পতিত হইয়াছিলেন, তেমনি সেই অমৃতধারা অম্বর হইতে স্ফুরিত হইয়া সেই অবশিষ্ট দেহভস্মে পতিত হইল। মন্দারযোগে মহাসাগর মথ্য-মান হইলে তাহা হইতে যেমন পারিজাত পাদপ প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, তেমনি সেই নিপতিত অমৃতধারা হইতে চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় সুন্দরাকার এক চতুর্ব্বাহু-বিশিষ্ট দেহ উৎপন্ন হইল।

উদ্দালক মুনির সেই দেহ ঐরূপে নারায়ণাকারে পরিণত হইল এবং ফুল্লনয়ন-পদ্মে শোভিত ও প্রফুল্ল-বদনে বিরাজিত হইয়া পরম শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সুধাময় প্রাণবায়ু সকল ঐ দেহকে পূর্ণ করিল; মনে হইল যেন স্থানান্তরাগত জলরাশি সরোবরকে উপচিত করিল অথবা যেন বাসন্তিক পল্লবোদ্গমে ভৌম রস তরুরাজিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিল। প্রবল জলপ্রবাহ যেমন চক্রাকারে আবর্ত্তিত হইয়া আসিয়া সুরনদীকে পূরণ করে, তেমনি সেই প্রাণবায়ু সকল যেন সত্বর সাগ্রহে গিয়া অন্তরস্থিত কুণ্ডলিনীকে আপূরিত করিয়া ফেলিল। ইহাতে উদ্দালকের দেহ প্রকৃতিস্থ হইয়া উঠিল। শরৎকাল উপস্থিত হইলে ভূতল যেমন শেষবর্ষায় বিধৌত হয়, আতপতাপে শোধিত হয়, ও বর্ষা-কালীন পঙ্কাদি-দূষিত বিকৃত আকৃতি পরিত্যাগপূর্ব্বক পরিষ্কৃত হইয়া লোকের গমনাগমনের সম্যক্ সুবিধাজনক হইয়া উঠে, তেমনি সেই দ্বিজবর উদ্দালকের দেহ দহন ও প্লাবনাদির ভাবনাবলে বিধৌত হইয়া সমাধি-ব্যাপারের সম্যক্ উপযোগী হইয়া উঠিল।

অনন্তর উদ্দালক মুনি পদ্মাসনে অবস্থানপূর্ব্বক পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করিলেন। বোধ হইল, হস্তিপক যেন হস্তীকে আলানস্তম্ভে আবদ্ধ করিল। ঐ অবস্থায় থাকিয়া পরে তিনি স্বীয় মনকে শারদাকাশবৎ স্বচ্ছ করিবার উদ্দেশে নির্ব্বিকল্প সমাধি সাধনার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পরে আশা ও তৃষ্ণাদির সহায়তায় যে প্রাণাদিরূপ হরিণ বহির্গমনে উন্মুখ হইতেছিল, তিনি প্রথমেই প্রাণায়াম অভ্যাস করিতে করিতে তাহাকে প্রশান্ত বা নিষ্পন্দ অবস্থায় উপনীত করিলেন। অদৃঢ়ভাবে নিখাত অশ্বাদি-বন্ধনের কীলক যেমন রজ্জুর আকর্ষণে উৎখাত হইয়া রজ্জু সহ নীত হইয়া থাকে, তেমনি তাঁহার মন তখন অনুভূতপূর্ব্ব গৃহ, ক্ষেত্র, পুত্র ও মিত্রাদির চিন্তায় সমাকৃষ্ট হইল। সেতু যেমন বেগ-বিনির্গত জলপ্রবাহকে রুদ্ধ করিয়া রাখে, তেমনি তিনি তৎক্ষণাৎ আবার বিষয়োন্মুখ স্বীয় ব্যাকুল মনকে বিবেকপ্রভাবে বিমল করিয়া রুদ্ধ করিলেন। অনন্তর তাঁহার নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত করিয়া রাখিলেন। ঐ নয়নদ্বয় উভয়তঃ পক্ষযুক্ত পক্ষ্মপঙ্‌ক্তি দ্বারা পরিশোভিত এবং উহার তারকাযুগল স্পন্দবিরহিত। তাঁহার তাদৃশ নয়নদ্বয় অর্দ্ধনিমীলিত হইলে বোধ হইল যেন ভ্রমরগর্ভ দুইটী কমল সন্ধ্যাকালে কিঞ্চিৎ নিমীলিত হইয়া রহিল! এইবার উদ্দালক মুনি মৌনী হইলেন,—হইয়া প্রাণ ও অপানবায়ুর বেগ স্থির, ধীর ও প্রশান্ত করিয়া তুলিলেন। বোধ হইল, কোন রাজাধিরাজের জননাদিব্যাপারে বায়ু যেন শুভ সূচনা করিবার জন্য প্রশান্তভাব ধারণ করিল। অনন্তর অন্তর্লীন কূর্ম্মাঙ্গসমূহের বহির্নিষ্কাসনের ন্যায় এবং তিল হইতে তৈলনিঃসারণের ন্যায় তিনি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়নিচয় হইতে স্বীয় ইন্দ্রিয়দিগকে পৃথক্‌কৃত করিলেন। বাহ্য বিষয়ে তাঁহার আর কোনই জ্ঞান রহিল না। কোন উজ্জ্বল মণিকে সহসা কোন একটা আবরণ দ্বারা আচ্ছাদিত করিলে সেই মণি যেমন তদীয় দূরবিসারী রশ্মিজাল পরিত্যাগ করে, তেমনি সেই ধীর-চেতা উদ্দালক মুনি তৎকালে যাবতীয় বাহ্য বিষয়স্পর্শ দূরে পরিহার করিলেন। হেমন্ত কালের অভ্যুদয়ে শাখী যেমন স্বীয় শাখাগত রস আপন অভ্যন্তরে বিলীন করিয়া লয়, তেমনি তিনি তাঁহার মনোবাসনারূপ আন্তর স্পর্শাদিও অধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্বে আকর্ষণ করিয়া বিলয়প্রাপ্ত করিলেন। জলপূর্ণ

কলসের মুখ দৃঢ়রূপে আচ্ছাদিত হইলে অন্তরে বায়ু-সঞ্চারের অভাবে সেই কলসের অন্তর্গত সূক্ষ্ম ছিদ্রও যেমন রুদ্ধ হইয়া যায়, তেমনি তাঁহার পার্ষ্ণি-দেশ দ্বারা মূলাধার সুদৃঢ়ভাবে অবরুদ্ধ হওয়ায় মলদ্বারের সঙ্কোচে তদীয় নবদ্বার বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল। তিনি সুমেরুকৃত স্বীয় রত্নোজ্জ্বল শৃঙ্গশিখা ধারণের ন্যায় আত্মরত্ন-প্রকাশিত স্বীয় গ্রীবাদেশ ধারণ করিলেন। বিন্ধ্যা-চলের গভীর খাত যেমন উন্মত্ত মাতঙ্গকে সংযত ও বশীভূত করিয়া রাখে, তিনিও তেমনি উন্মত্ত মনকে প্রত্যাহার উপায়ে স্বীয় হৃদাকাশে সংযত করিয়া রাখিলেন। তখন সেই উদ্দালক মুনি শারদাকাশবৎ অতি নির্ম্মল সৌম্যভাব ধারণ করিলেন,—করিয়া নির্ব্বাত নিষ্কম্প পূর্ণ অর্ণবের শ্রী হরণ করিলেন। বায়ু যেমন মশককুল বিতাড়িত করে, তেমনি তিনি কতিপয় চিত্তবৃত্তি-ধারায় বিচ্ছিন্নতা প্রাপ্ত ও মধ্যে মধ্যে স্বীয় অন্তরে প্রতিভাসিত বিকল্পসমূহকে বিদূরিত করিয়া দিলেন। বীর যোদ্ধৃ পুরুষ যেমন সমরে অসির প্রহারে শত্রু সংহার করে, তিনিও তেমনি যথেচ্ছরূপে উপস্থিত বিষয় প্রতিভাস-গুলিকে মনের সাহায্যে পুনঃপুন ছেদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে ক্রমে তাঁহার সকল বিষয়ের সঙ্কল্প উন্মূলিত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন,—সহসা তাঁহার বিবেক-বিভাকরের আবরণস্বরূপ বিলোল অন্ধকার আসিয়া স্বীয় হৃদাকাশ অধিকার করিল, অর্থাৎ পুনরায় তাঁহার তমোগুণ উদ্রিক্ত হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্বীয়-সত্ত্ব-গুণোদ্ভাসিত মনঃপ্রভাকরের সহায়তায় সেই অন্ধকার নিরাকৃত করিলেন,—যেন পবন দ্বারা আকাশের মেঘকজ্জল মার্জ্জিত হইল। অনন্তর নৈশ তিমির অপাকৃত হইলে কমল যেমন প্রভাত প্রকাশ দর্শন করে, তেমনি তাঁহার তমোগুণ প্রশমিত হইয়া গেলে তিনি তখন কমনীয় তেজঃপুঞ্জ নিরীক্ষণ করি-লেন। করিশাবক যেমন কমলদল দলিত করে, তেমনি তৎকর্ত্তৃক সেই তেজঃপুঞ্জও প্রতিহত হইল। বেতাল যেমন বেগে আসিয়া শিশুর শোণিত পান করে, তিনিও তেমনি তৎকালে সেই তেজঃপুঞ্জ গ্রাস করিয়া ফেলিলেন। অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্মতত্ত্ব দর্শনে বাধ হওয়ায় সে তেজঃ তখন নিরাকৃত হইয়া গেল। তেজ যখন প্রশান্ত হইল, তখন সেই উদ্দালক মুনির মন নৈশ কমলের ন্যায় কিম্বা মদিরামত্ত মানবের ন্যায় সুষুপ্ত অবস্থা

প্রাপ্ত হইল। তিনি নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন; পরন্তু মারুত যেমন মেঘরাজিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে, মত্ত মাতঙ্গ যেমন নীলনলিনীকে দলিত ও ভগ্ন করিয়া থাকে এবং দিবসকর যেমন সমুদিত হইয়া নিশাকে নিরস্ত করেন, তেমনি সেই মুনি তখন অবিলম্বে সেই নিদ্রাকে বিদূরিত করিলেন। গগনের নীলিমদর্শক ব্যক্তি যেমন গগনে ময়ূরাদির আকার ভাবনা করে, তেমনি নিদ্রার অবসানে তাঁহার মন আকাশের আকার ভাবনা করিতে লাগিল। মেঘচ্যুত বারিধারা যেমন তমালপুষ্পকে বিদীর্ণ করিয়া থাকে, দীপ যেমন তিমির সংহার করে, এবং সমীর যেমন নীহারকে নষ্ট করিয়া ফেলে, তেমনি তাঁহার ভাবিত সেই নির্ম্মল আকাশকেও তিনি মন হইতে মার্জ্জিত করিয়া ফেলিলেন। নিদ্রা ভঙ্গ হইলে মদিরামত্ত ব্যক্তি যেমন বিমূঢ়ভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই উদ্দালক মুনির আকাশ-জ্ঞান অপসৃত হইলে তাঁহার মন মোহ-দশায় উপনীত হইল। দিবাকর যেমন জগৎ হইতে যামিনী-জনিত জাড্য অপনয়ন করেন, তেমনি সেই উদারবুদ্ধি উদ্দালক নিজ মন হইতে সেই মোহকেও অপসারিত করিলেন।

এইরূপে ক্রমে সেই উদ্দালক মুনির মন হইতে তেজ গেল, তিমির অপসৃত হইল, নিদ্রা নষ্ট হইল এবং মোহাদি সমস্ত মালিন্য চলিয়া গেল। তখন তাঁহার মন নির্ম্মল হইয়া অপূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইল,—হইয়া ক্ষণকাল বিশ্রান্তি লাভ করিল। সরোবরের বারি আলিবন্ধনে প্রতিরুদ্ধ হইলে সে বারি যেমন প্রতিকূল গমনে পুনরায় স্বস্থানেই ফিরিয়া আইসে, তেমনি তাঁহার মন পূর্ব্বে বাহ্যাকার হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া পূর্ণাত্মায় নিরুদ্ধ হইয়াছিল, এক্ষণে তথা হইতে পরাবৃত্ত হইয়া সত্বর আবার বাহ্য প্রপঞ্চ-সমরূপিণী বৃত্তি সম্বিৎ প্রাপ্ত হইল। তাঁহার মন পূর্ব্বে ধ্যানাদি যোগে বহু অনুসন্ধানের ফলে আনন্দানুভব করিতে করিতে আত্মচৈতন্যের স্বাদ গ্রহণে লিপ্ত ছিল, এই জন্য বাহ্য সম্বিদ্ হইতে পরাবৃত্ত হইয়া পুনরায় সুবর্ণের নূপুরভাব ধারণের ন্যায় অবিলম্বে চিন্ময়তা উপগত হইল। যেমন ঘটান্তর্গত জল শুষ্ক হইয়া গেলে মধ্যস্থ আবিল জলের পঙ্কভাগ ঘট-গাত্রেই বিলীন হইয়া ঘটভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি তদীয় চিত্ত স্বীয় চিত্তভাব পরিহার করিয়া শুদ্ধ চিন্ময়াকারে পরিণত হওয়ায় পূর্ব্বাবস্থা হইতে অন্যাবস্থায়

উপনীত হইল। সাগরের তরঙ্গাদি ভেদবুদ্ধি বর্জ্জন করিলে জলময় সাগর যেমন জলসামান্য হইয়া পড়ে, তেমনি তাঁহার বিশুদ্ধ চিৎ একরসীভূত স্বীয় উপাধি বুদ্ধিশালিনী হইয়া চেত্যভাব পরিহার করিবার পরক্ষণেই চিদ্ভাব প্রাপ্ত হইয়া উঠিল।

অনন্তর উদ্দালক মুনি তত্ত্বসাক্ষাৎকার লাভ করিলেন,—করিয়া অখিল জগতের অধিষ্ঠানস্বরূপ মহান্ বিশুদ্ধ চিদাকাশরূপে পরিণত হইলেন। এই অবস্থাতেই তাঁহার নিরতিশয় আনন্দ প্রাপ্তি হইল। যাহাতে কোনই দৃশ্য দর্শন নাই, ব্রহ্মাদি উত্তম পুরুষেরাও যাহারই আস্বাদগ্রহণে তন্ময় হইয়া থাকেন এবং যাহা সর্ব্ববিধ সুখরসের আকর,—অনন্ত অর্ণবাকারে অবস্থিত, উদ্দালক মুনি ঐ অবস্থায় তাদৃশ অপার আনন্দই প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যেন শরীর হইতে সম্যক্ নির্গত হইয়া কোন এক অপূর্ব্ব ভূভাগে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে তাঁহার আত্মা সত্তাসামান্যরূপে প্রতিভাত হইল। তিনি আনন্দ-সাগর হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। যেমন স্বচ্ছ শারদাকাশে সম্পুর্ণ কলাময় শশধর বিরাজ করেন, তেমনি ঐ উদ্দালক দ্বিজের চৈতন্যরূপ হংস তখন আনন্দার্ণবে ভাসমান হইতে লাগিল। তিনি নির্ব্বাত-নিষ্কম্প দীপশিখার ন্যায়, নিস্তরঙ্গ নীরনিধির ন্যায় এবং বর্ষাবসান-কালীন গর্জ্জন ও সলিলহীন বারিধরের ন্যায় নিশ্চল, নিস্তব্ধ ও ও নিঃশব্দভাবে অবস্থানপূর্ব্বক চিত্রলিখিতের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

অনন্তর সেই উদ্দালকের এমন অবস্থা উপস্থিত হইল, যখন তিনি দেখিতে লাগিলেন,—তাঁহার চারিদিকে গগনচারী সিদ্ধসম্প্রদায়, অগণিত অমরবৃন্দ, ইন্দ্র ও সূর্য্যাদি-পদ-প্রদাতা সিদ্ধিনিবহ এবং অসংখ্য অপ্সরাবৃন্দের সমাগম হইল। কিন্তু সেই উদ্দালক দ্বিজ তাহাদিগকে দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি সেই সিদ্ধিসমূহের প্রতি কিছুমাত্র সমাদর প্রদর্শন করিলেন না। উদ্দালক তখন গম্ভীরভাবে অক্ষুব্ধচিত্তে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তাৎকালিক ভাব দেখিয়া মনে হইল, গম্ভীরপ্রকৃতি অচপল ব্যক্তি যেন শৈশব-বিলাসের সমাদর করিল না। সিদ্ধিসমূহের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিয়া উদ্দালক দ্বিজ ছয় মাস

কাল সেই আনন্দ-মন্দিরে যাপন করিলেন। বোধ হইল, রবি যেন বৎসরার্দ্ধ উত্তর দিক্‌তটে অতিপাতিত করিলেন। ব্রহ্মাদি দেবেন্দ্রগণ এবং সিদ্ধ ও সাধ্যসম্প্রদায় যে জীবন্মুক্তপদে বিরাজ করেন, সেই উদ্দালক দ্বিজও তৎকালে তথাবিধ সপ্ত ভূমিকাস্থ সর্ব্বোত্তম জীবন্মুক্ত-পদ প্রাপ্ত হইয়া তাহাতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার সেই আনন্দে রসাস্বাদরূপ চিত্ত-পরিণাম ছিল না; কাজেই তিনি তখন নিত্যানন্দ পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই কারণেই সেকালে তাঁহার আত্মচৈতন্য বিষয়ীদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র আনন্দে তন্ময় হইল না এবং তাহা যে নিরানন্দে বা দুঃখে রহিল, তাহাও নহে। পরন্তু তদীয় আত্মচৈতন্য তখন স্বপ্রকাশ একরসে পূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

রামচন্দ্র! যাহারা একবার স্বর্গবাসের সুখ অনুভব করিয়াছে, তাহাদের যেমন আর ভূলোকে বাস মনোনীত হয় না, তেমনি ক্ষণকালই হউক, কিম্বা সহস্র বর্ষই হউক, মন একবার যদি উল্লিখিত পরম পদে অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলে আর কখনই তাহা ভোগাসক্ত হইতে ইচ্ছা করে না। উদ্দালক মুনি যে পদে তখন অবস্থান করিতে ছিলেন, ঐ পদই পরম পদ, ঐ পদই—পরম গতি, ঐ পদই—প্রশান্ত নিকেতন, ঐ পদই—পরম শ্রেয়ঃ এবং ঐ পদই—শাশ্বত শিবস্বরূপ। ঐ পদে বিশ্রান্তি লাভ করিতে পারিলে, পুনরায় ভ্রান্তি কখন কোনওরূপে বাধা জন্মাইতে পারে না। যাহারা চৈত্ররথ বনে উপনীত হয়, তাহারা যেমন কখন আর খদির-কাননে গমন করে না, তেমনি সাধুগণ যদি একবার ঐ পরম পদ লাভ করেন, তাহা হইলে আর কখনই এই দৃশ্য দৃষ্টি প্রাপ্ত হন না। অতুল ঐশ্বর্য্যভোগী ভূপালগণ যেমন দীনতার প্রতি বহু মান প্রদর্শন করেন না, তেমনি উক্ত পরম পদ-প্রাপ্ত মহাত্মারাও এই দৃশ্যসমূহের প্রতি সমাদর প্রকাশ করেন না। তাঁহারা এই সকল দৃশ্যকে অতি অবজ্ঞার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। যে চিত্ত বোধপ্রাপ্ত হইয়া উল্লিখিতভাবে পরমপদে বিশ্রান্তি লাভ করে, সে, সমাধি হইতে সমুত্থিত হইয়া দৃশ্য দর্শন করাকে বড়ই ক্লেশজনক বলিয়া মনে করে; তাই পরের যত্নাতিশয়ে কদাচিৎ সমাধি হইতে সমুত্থিত হয়, পরন্তু যখন

সপ্তভূমিকায় উপনীত হয়, তখন আর সে একেবারেই বোধপ্রাপ্ত বা সমাধি হইতে সমুত্থিত হয় না। বলা বাহুল্য, সমাধি ভঙ্গ হইলেও ঐ চিত্তের কদর্থনা কিছুই হইবার নহে। যাহা হউক, উদ্দালক মুনি ইন্দ্রত্বাদি পদ-প্রাপক সিদ্ধিসমূহকে অনাদর করিয়া সেইরূপে ছয় মাস কাল কাটাইলেন। তিনি বসন্তকালীন নিহার-নির্ম্মুক্ত দিনমণির ন্যায় উন্মেষিত হইয়া উঠিলেন। উদ্দালক এই সময় আবার দেখিলেন,—কতকগুলি সুস্নিগ্ধ রমণী তাঁহাকে প্রণাম করিতে করিতে তাঁহারই দিকে অগ্রসর হইতেছে। ঐ রমণীগণ সকলেই অতি তেজস্বিনী এবং সকলেই চন্দ্র-বিম্ববৎ অতীব কান্তিমতী। তাহাদিগের মুখকমল হইতে যে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় সৌরভ ছুটিতেছে, তাহাতে সমাকৃষ্ট হইয়া মধুকরকুল তাহাদিগের হস্তস্থিত চামরে উপবেশন করিলে মনে হইতে লাগিল, উহারা যেন গৌরবর্ণ পারিজাত-পরাগে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। তিনি আরও দেখিলেন,—পতাকাপ্রকর-পরিশোভী স্বর্গীয় বিমানশ্রেণী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। পাণিপদ্মে পবিত্র দর্ভ লইয়া আমি আসিয়াছি এবং অন্যান্য মুনিগণ ও বিদ্যাধরী সহ বিদ্যাধরগণ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সকলে আসিয়া উদ্দালক মুনিকে প্রণামপূর্ব্বক বলিতেছেন,—ভগবন্! আমরা প্রণিপাত করিতেছি, আপনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন দৃষ্টি অর্পণ করুন। এই বিমান উপস্থিত; আপনি ইহাতে আরোহণ করিয়া সুরপুরে আগমন করুন। জানিবেন,—যে কিছু জাগতিক ভোগসম্পদ আছে, একমাত্র স্বর্গ ই সে সমুদায়ের সীমান্ত। স্বর্গীয় ভোগ অপেক্ষা উত্তম ভোগ কুত্রাপি আর নাই। হে বিভো! আপনার সম্বন্ধে অধিক আর কি কহিব, আপনি আপনার অভিমত সমুচিত ভোগসমৃদ্ধি আকল্প কাল ভোগ করুন। লোকে স্বর্গাদি ফল ভোগ করিবার উদ্দেশ্যেই তপস্যা করিয়া থাকে। এই এ দিকে দেখুন,—করিণী যেমন করীর অভিমুখে আগমন করে, তেমনি এই হার-চামর-ধারিণী বিদ্যাধরসুন্দরীরা ভবদীয় সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও অর্থ এই উভয় অপেক্ষা কামই শ্রেষ্ঠ। কামের মধ্যে আবার সুন্দরী ললনাকুলই সারসর্ব্বস্ব! ললনা-গণ মধ্যে আবার স্বর্গবাসিনীরাই প্রধানা। বসন্তে যেমন

বিরাজ করে, তেমনি এই উপস্থিতা ললনারাও স্বর্গেই বাস করিয়া থাকে।

তৎকালে সমাগত অতিথিবর্গ এইরূপ বলিতে লাগিলে, মুনিবর উদ্দালক তাঁহাদিগকে যথাবিধি অর্চ্চনা করিলেন; পরন্তু তাঁহাদিগের কথায় তাঁহার কিছুমাত্র কৌতূহল জন্মিল না। তিনি পূর্ব্বের ন্যায় ধীরভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই ধীরচেতা উদ্দালক সম্মুখাগত বিভূতির অভিনন্দন করিলেন না এবং তাহা যে পরিত্যাগ করা, তাহাও করিলেন না। তিনি এইমাত্র বলিলেন,—হে সিদ্ধসম্প্রদায়! আপনারা স্বস্থানে প্রস্থান করুন। এই বলিয়া পুনর্ব্বার তিনি স্বব্যাপার—সমাধিতেই মগ্ন হইলেন।

অতঃপর সিদ্ধগণ উদ্দালকসমীপে কিয়দ্দিন অবস্থান করিলেন। তাঁহারা বুঝিলেন, উদ্দালক মুনি প্রকৃতই ভোগ-ব্যাপারে একান্ত অনাসক্ত এবং স্বীয় ধর্ম্মকার্য্যে একান্তই অনুরক্ত। ইহা বুঝিয়া পরে তাঁহারা সে স্থান হইতে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন। উদ্দালক মুনি জীবন্মুক্ত দশায় উপনীত হইলেন। তিনি এই অবস্থায় বনমধ্যে অন্যান্য ঋষিগণের যে সকল আশ্রম ছিল, তৎসমুদায়ে যথাসুখে যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন। মেরু, মন্দর, কৈলাস, হিমালয় ও বিন্ধ্য প্রভৃতি সর্ব্ব পর্ব্বতে, দ্বীপ, উপবন ও বন জঙ্গল প্রদেশে, এতদ্ভিন্ন চতুর্দ্দিক্স্থিত অন্যান্য স্থানে তিনি আপন ইচ্ছাগত বিহার করিতে লাগিলেন। উদ্দালক মুনি যখন হইতে পরম পদ লাভ করিলেন, সেই অবধিই তিনি গিরিকন্দরে থাকিয়া ধ্যান-লীলাযোগে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। ধ্যাননিষ্ঠ উদ্দালক মুনি মধ্যে মধ্যে প্রবুদ্ধ হইতেছিলেন, তাঁহার এই প্রবুদ্ধ-ভাব কখন একদিন, কখন একমাস, কখন একবৎসর এবং কখন বা বহু বর্ষ পরে সংঘটিত হইতে লাগিল। তখন হইতে তিনি লোকব্যবহারে তৎপর হইলেও সমাধিসাধনায় নিরত রহিয়া চিত্তত্ত্বের সহিত একত্ব লাভে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার যখন চিত্তত্ত্বের সহিত একত্ব অভ্যাস ঘনীভূত হইল, তখন তিনি মহাচিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া ভূমণ্ডলের সর্ব্বত্র সৌরকরের তুল্যাকারে অবস্থান করিতে লাগিলেন। চিত্র লিখিত

ভাস্করের যেমন অস্ত বা উদয় নাই, তেমনি তিনি চিৎসামান্যের চিরাভ্যাস নিবন্ধন সত্তা-সামান্য প্রাপ্ত হইয়া এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ মধ্যে অস্তোদয়-হীনভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তৎকালে সর্ব্বপ্রকার বিক্ষেপের উপশম ঘটিয়াছিল বলিয়া উদ্দালক নিরতিশয় আনন্দরূপ পরম পদ প্রাপ্ত হইলেন। তদবস্থায় তাঁহার চিত্ত সম্যক্‌রূপে বিগলিত হইল। যাবতীয় কর্ম্মবীজ বিনষ্ট হওয়ায় ঐ উদ্দালক মুনির জন্মবন্ধন একেবারে ছিন্ন হইয়া গেল। তদীয় সন্দেহ-দোলায়িত অবস্থারও অবসান ঘটিল। তিনি শরদম্বরের ন্যায় অবিদ্যারূপ মেঘাড়ম্বর-হীন, অপরিচ্ছিন্ন, আবরণশূন্য, চিত্ত-বিরহিত বিমল ব্রহ্ম-স্বরূপতা ধারণ করিলেন।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৪ ॥

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! আপনি আত্মজ্ঞানরূপ বাসরের প্রকাশক অদ্বিতীয় প্রভাকর, অজ্ঞান-জনিত সন্তাপের প্রশমনকর্ত্তা শীত-রশ্মি এবং মদীয় সংসাররূপ তৃণদাহী দহনস্বরূপ; সুতরাং আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি বলুন,—সত্তাসামান্য কি?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ষষ্ঠ ভূমিকায় চিতির অবান্তর ভেদ-গুলি পরিমার্জ্জিত করিবার পর চেত্যাভাব চিৎসামান্য-স্বরূপে পরিণত হয়। অনন্তর তাহার অত্যন্ত ভাবনায় যখন চেত্যসংস্কারসমূহের আত্যন্তিক উচ্ছেদ ঘটে, তখন চিত্ত সম্পূর্ণ ক্ষয় পাইয়া যায়। ঐ সময় স্বীয় সত্তামাত্রে স্বতঃসিদ্ধ পরিশিষ্ট চিৎ ও অচিৎ এই উভয়গত যে সত্তা, তাহাই সত্তা-সামান্য আখ্যায় অভিহিত করা হয়। সমস্ত বৃত্তিতেই চিৎ প্রতিবিম্বিত হয়; পরন্তু নিখিল দৃশ্যের বাধ ঘটনায় যৎকালে উহা চেত্যাংশবৃত্তি ও বৃত্তিবিষয় হইতে বিরহিত হইয়া বিশ্বচৈতন্যে বিলীন হইয়া যায়, উল্লিখিত বিশ্বচৈতন্যের যে তাৎকালিক নীরূপ আকাশবৎ

অতি নির্ম্মল সত্তা, তাহাকেই বলে,—সত্তাসামান্যতা। চিত্তবৃত্তিতে অভিব্যক্ত অখণ্ড চৈতন্য যখন আন্তরিক ও বাহ্যিক নিখিল দৃশ্য বিশ্বের অপলাপ করিয়া চিত্তবৃত্তিতেই অবস্থিত হয়, চৈতন্যের তাৎকালিক অবস্থাকেই সত্তাসামান্য নামে নিরূপিত করা যায়। যৎকালে যাবতীয় দৃশ্য বস্তুই পারমার্থিকতায় পর্য্যবসিত হয়, তখনই সত্তাসামান্যতা ঘটিয়া থাকে। যৎকালে ভাবনারূপ যত্ন বিনাই নিখিল দৃশ্য,—কূর্ম্মের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির ন্যায় আপনা হইতেই আত্মায় বিলীন হয়, তখনই সত্তাসামান্যতা ঘটিয়া থাকে। সপ্ত ভূমিকায় সমারূঢ় হইলে এবম্বিধ পরমা দৃষ্টি তুর্য্যাতীত পদের তুল্য হয় বলিয়া উহা সদেহ এবং বিদেহ উভয়বিধ মুক্ত পুরুষের পক্ষেই সম্ভব হইয়া থাকে। ফল কথা, স্বরূপাস্থিতি ব্যাপারে সদেহ বা বিদেহ-দৃষ্টিতে বিশেষত্ব কিছুই নাই।

হে নিষ্পাপ! পরম যোগী পঞ্চম ভূমিকা প্রভৃতিতে সমারূঢ় হইয়া সমাধিস্থ হইলেও ঐ সত্তাসামান্যতারূপ পরম দৃষ্টি তাঁহার ঘটিয়া থাকে। যে যোগী সপ্তম ভূমিকায় সমারূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার সমাধি হইতে উত্থানকালেও ঐ পরমা দৃষ্টি উপস্থিত হইয়া থাকে। যিনি সম্যক্ তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, এই বোধ-জনিত পরমাদৃষ্টি তাঁহারই ঘটিয়া থাকে; এতদ্ভিন্ন অতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির এরূপ দৃষ্টি কখনই হয় না। যাবতীয় জীবন্মুক্ত মহাপুরুষেরাই এই পরমা-দৃষ্টিতে অবস্থান করেন,—করিয়া ভূতলে পারদাদির ন্যায় অথবা আকাশপথে বায়ুর ন্যায় ঐহিক ও আমুষ্মিক ভোগ ও তৃষ্ণারূপ রজঃস্পর্শ হইতে মুক্ত হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন।

হে রাঘব! ভূতলস্থ অস্মদাদি মহর্ষিগণ, স্বর্গীয় নারদাদি দেবর্ষিগণ এবং তদপেক্ষাও উর্দ্ধলোকস্থিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর প্রভৃতি দেব-প্রধানগণ, এই সকলেই আমরা পরম দৃষ্টিতে অবস্থান করিতেছি। পূর্ব্বোক্ত উদ্দালক মুনি এই নিখিল-ভয়াপহারিণী পরমা দৃষ্টিই অবলম্বন করিলেন,—করিয়া যত দিনে না প্রারব্ধ ক্ষয় হয়, তাবৎ পর্য্যন্ত এই বিশ্বভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহার বহু কাল অতীত হইল। পরে তাঁহার এইরূপ স্থির বুদ্ধি জন্মিল যে, আমি দেহ ত্যাগ করি,—করিয়া বিদেহমুক্ত-ভাবে অবস্থান করিতে থাকি। এই প্রকার স্থির নিশ্চয় করিয়া

তিনি গিরি-গহ্বরমধ্যে বিস্তৃত পল্লবাসনে বদ্ধপদ্মাসন হইলেন,—হইয়া অর্দ্ধোন্মীলিত-নেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার মলদ্বার নিরুদ্ধ হইবার পর ক্রমে একে একে সমস্ত নবদ্বার নিরুদ্ধ হইয়া গেল। তিনি শব্দ-স্পর্শাদি-গোচর চিত্তবৃত্তিগুলিকে এক একটীরূপে সংগ্রহ করিয়া হৃদয়ে নিবেশিত করিয়া লইলেন। অনন্তর পরমার্থভাবনায় হৃদয়-নিবেশিত উক্ত বৃত্তিগুলিকে আত্মার সহিত একীকৃত করিয়া চিৎস্বরূপের ঐকরস্য সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রাণবায়ু নিরুদ্ধ হইলে তিনি সমান ও সরলাকারে সমুন্নতগ্রীব হইয়া তালুমূল-তল-সংলগ্ন কণ্ঠরন্ধ্রে জিহ্বামূল প্রবেশিত করিলেন,—করিয়া উন্নতবদনে অবস্থিত হইলেন। তৎকালে তদীয় মন ও দৃষ্টি অন্তরে, বাহিরে, ঊর্দ্ধে, অধোদিকে বা শূন্যপথে কোথাও যোজিত রহিল না। তিনি তখন যে ভাবে রহিলেন, তাহাতে তাঁহার দন্ত দ্বারা দন্ত স্পৃষ্ট হইল না। তাঁহার প্রাণাদি বায়ু-প্রবাহের নিরোধ-ঘটনায় দেহ, মন ও ইন্দ্রিয়ের চাঞ্চল্য অপগত হইল। তিনি চিৎস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের অনুভব করিতে লাগিলেন; তাহাতে তাঁহার দেহ রোমাঞ্চিত হইল। তিনি নির্ম্মল ও প্রফুল্ল মুখকান্তিশালী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তদীয় অন্তঃকরণের একদেশীভূত যে বৃত্তিবিশেষ, তাহাতে যে পরিচ্ছিন্ন চিৎ প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, উহা এক্ষণে ব্রহ্মচৈতন্যোপহিত স্বীয় বৃত্তিবিশেষের অভ্যাসগুণে বিম্বভূত চিৎসামান্যে প্রবিষ্ট হইতে লাগিল। অনন্তর উদ্দালক বিম্বভূত চিৎসামান্যের অনুসন্ধান অভ্যাস করিয়া অন্তরে পরমোত্তম আনন্দস্পন্দ অধিগত হইলেন। তিনি প্রচুরতর আনন্দের আস্বাদ লইতে লাগিলেন। আনন্দাস্বাদ করিতে করিতে তদীয় চিৎসামান্য অবস্থার অবসান ঘটিল। তৎকালে তিনি বিপুল বিশ্বব্যাপী আত্মসত্তা-সামান্য লাভ করিলেন। এইরূপে তাঁহার বিক্ষেপবৈষম্য সম্পূর্ণই ঘুচিয়া গেল। তিনি পরম বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ সময় অনুপম অপার আনন্দে তাঁহার মুখমণ্ডল প্রসন্নতম হইয়া উঠিল। সে মুখচ্ছবি পরম সৌন্দর্য্যশালী হইল। তাঁহার তখন যে আনন্দোদয় হইয়াছিল, সে আনন্দজন্য রোমাঞ্চোদ্গম এইবার শান্ত হইয়া গেল। তদীয় মননাদি-জনিত ভবভ্রম এইবার একেবারেই চিরকালের জন্য সম্পূর্ণই বিলয় পাইল।

তিনি অমল পদ প্রাপ্ত হইয়া কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। সেই মহাসত্ত্বগুণশালী উদ্দালক সকল-কলাপূর্ণ শারদীয় স্বচ্ছাম্বর-গত শশধরের ন্যায় প্রতিভাত হইয়া চিত্রলিখিতবৎ প্রতীত হইতে লাগিলেন। শরৎকাল চলিয়া গেলে হেমন্তের অভ্যুদয় হয়; তৎকালিক বিমল দিনকর-করে তরু-রস যেমন উপশম প্রাপ্ত হয়, তেমনি সেই পুনরুক্তবজয়ী উদ্দালক মুনি কিয়দ্দিনের মধ্যেই ধীরে ধীরে অমল আত্মপদে উপশান্ত হইয়া গেলেন। তিনি নিখিল স-মল উপাধি হইতে মুক্ত হইলেন। তাঁহার সমস্ত বিকল্প বিলুপ্ত হইল। তিনি নির্ব্বিকার হইয়া মনোজ্ঞ শ্রী ধারণ করিলেন এবং যেখান হইতে হিরণ্যগর্ভ-পদ পর্য্যন্ত নিখিল বিষয়সুখ বিগলিত হইয়া গিয়াছে, তথাবিধ অনির্ব্বচনীয় সুখময় পদ সমধিগত হইলেন। তিনি তখন যাদৃশ সুখ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার নিকট সুরাধিপতির সমৃদ্ধিসম্পদও সাগর-সলিলে ভাসমান তৃণের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

অনন্তর সেই উদ্দালক দ্বিজ এমন এক অপূর্ব্ব পরম সুখময় রূপে পরিণত হইলেন যে, তাহা বাক্যের অগোচর, অনন্ত সত্য ও প্রচুর আনন্দ-ময়। তাঁহার সেই সুখ,—অপার অনন্ত নভোমধ্যব্যাপী দিঙ্মণ্ডলে পরিব্যাপ্ত। উহা সর্ব্বদাই পরিপূর্ণ। উল্লিখিত পরম সুখের অভ্যন্তরেই সর্ব্ববিশ্ব বিদ্যমান। যদি বহুতর শুভাদৃষ্ট সঞ্চিত থাকে, তাহা হইলেই ঐ পরম সুখ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মুনিবর উদ্দালকের চিত্ত এইরূপে আদ্য অমল পদ অধিগত হইলে, তাঁহার দেহ সেইখানে উপবিষ্ট অবস্থায় রহিল। সেই অবস্থায় থাকিয়াই উক্ত দেহ ছয় মাস পর্য্যন্ত রবিকর-নিকরের উত্তাপ পাইয়া সম্পূর্ণ শুষ্ক হইয়া গেল। ঐ শুষ্ক দেহে প্রবহমাণ পবনের ঘট্টন-জনিত নাদ ধ্বনিত হইলে মনে হইল, উহা যেন সেই শৈলবরের বাল-বৃক্ষ রূপ ভুজসমূহের বাদনযোগ্য শিরাতন্ত্রীনিচয়ে বিলাস-বীণার ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে।

অতঃপর আরও ছয় মাস অতীত হইলে একদা পিঙ্গলকেশধারিণী ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃগণ নভোমণ্ডল হইতে অবতীর্ণ হইলেন,—হইয়া জনৈক ভক্তের অভীষ্ট ফল সিদ্ধি প্রদান করিবার জন্য ভগবতী শৈলনন্দিনীর সহিত এক-যোগে তত্রত্য পার্ব্বত্য প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে

দেখিয়া বোধ হইল, বহ্নিশিখা যেন জাজ্বল্যমান অনল প্রান্তে আগমন করিল। ঐ সকল মাতৃকার মধ্যে শঙ্খিনী নামে এক চামুণ্ডা ছিলেন। তিনি নব নব বেশভূষায় বিভূষিতা, বিবুধনিবহের বন্দনীয়া এবং দেব-সমূহের অর্চ্চনীয়া। রাত্রিকাল উপস্থিত হইলে ঐ শঙ্খিনীদেবী উদ্দালক মুনির সেই সৌরকর-শুষ্ক দেহ লইয়া সহসা মস্তকস্থ খড়্গ-খট্টাঙ্গ-ভূষণের মধ্যবর্ত্তী মুকুট-কোটিভাগে ভূষণাকারে ধারণ করিলেন। ভগবতী শঙ্খিনীর শিরোভূষণ-মাল্য,—মেঘখণ্ডনিভ ময়ূরপুচ্ছে সুশোভিত, মন্দার-মালায় মণ্ডিত ও অগ্রগত পুষ্পপটলে পরিশোভিত ছিল। উদ্দালকের সেই শুষ্ক কদর্য্য দেহ উল্লিখিতরূপে তন্মধ্যে সমারোপিত হইয়া লতাজাল-লগ্ন ভৃঙ্গাকারে বেণীর ন্যায় পশ্চাৎ দিকে লম্বমান হইয়া রহিল।

রামচন্দ্র! উদ্দালক মুনির বিদেহ-মুক্তি প্রাপ্তির বিবরণ কথিত হইল। এই বৃত্তান্তের আলোচনা যেন একটী বল্লী; নিখিল দৃশ্য পদার্থের বিবেকো-দয়ে যে আত্মানন্দ স্ফুরিত হইয়া উঠে, সেই সুন্দর আনন্দই উহার কুসুম। এহেন বল্লী যাহার হৃদয়কাননে সমুদ্ভূত হইয়া পর পর ভূমিকারোহণে দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে, সে ব্যক্তি এই ত্রিতাপ-তাপিত সংসার-কান্তারে সতত সঞ্চরণ করিলেও যাহা সত্য ও শান্তিপ্রভৃতি গুণসমূহে সুশীতল, সেই সহজ সন্তোষরূপ ছায়ালাভে কখনই তাহার কোনই অন্তরায় ঘটে না। অধিকন্তু সে ব্যক্তি অতি উচ্চ অতি উত্তম মোক্ষফলের সহিত সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ স্বীয় আত্মভাব সহ পুনরাবৃত্তি-রহিত সম্বন্ধ-লাভ তাহার ঘটিয়া থাকে।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৫ ॥

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে কমলদল-নয়ন! তোমায় বলি, তুমিও এইরূপে আপনা আপনি আত্মবিচার করিতে থাক—করিয়া উল্লিখিতরূপে বিহার করিতে করিতে অন্তে সেই বিতত ব্রহ্মপদে বিশ্রান্তি প্রাপ্ত হও।

নিখিল দৃশ্য বস্তুর ক্ষয়াভ্যাস করিতে করিতে যতদিনে না পরম পদ লাভ করা যায়, ততদিন যাবৎ শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণ, পদার্থতত্ত্বের বিচারালোচন, গুরুপ্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ এবং চিত্ত সংশোধন করিয়া আত্মবিচারে নিরত হইতে হয়। যদি বৈরাগ্য অভ্যাস করা যায়, শাস্ত্রার্থসমূহের বিচারে নিরত হওয়া যায় এবং নিজ নির্ম্মল বুদ্ধি ও গুরূপদেশের সাহায্য লওয়া যায়, তাহা হইলে পরম পদ প্রাপ্তি ঘটে। এতদ্ভিন্ন একমাত্র স্বীয় প্রজ্ঞার সাহায্যগুণেও পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। যাহাতে কলঙ্ক-স্পর্শ নাই এবং যাহা প্রবোধযুক্ত ও তীক্ষ্ণ, একমাত্র তাদৃশ বুদ্ধিই উপায়ান্তরের সাহায্য ব্যতীত শাশ্বত ব্রহ্মপদ অর্পণ করিতে পারে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! হে ভূত-ভব্যেশ! কোন কোন সাধু প্রবুদ্ধ ও ব্যবহার-নিষ্ঠ হইয়াও যেন সমাধি লাভ করিয়া বিশ্রান্তি লাভ করেন, আবার কেহ কেহ নিভৃত নির্জ্জন দেশে গিয়া সমাধিমগ্ন হইয়া থাকেন; কখনই ব্যবহার-পরায়ণ হন না। হে প্রভো! উক্ত উভয়বিধ সমাধি-পর সাধুদিগের মধ্যে কে বটে শ্রেষ্ঠপদে সমাসীন? তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! এই মায়িক বিশ্বের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলে তাহাতে যে অন্তঃশীতলতা উৎপন্ন হয়, তাহাই সমাধি আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। এই অন্তঃশীতলতাই যোগশাস্ত্রোল্লিত নিরোধ-সমাধির ফল এবং উহাই এতৎশাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট জ্ঞানেরও ফল বা উদ্দেশ্য বলিয়া নিশ্চিত। কোন কোন মহাপুরুষ উক্ত লক্ষণান্বিত সমাধি সমধি-গত হইয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। 'আমার সহিত দৃশ্যের সম্বন্ধ নাই এ সকল মনেরই কল্পনা মাত্র; সুতরাং মনের সহিতই এই সমুদয় দৃশ্যের সম্বন্ধ।' এইরূপ যাঁহারা নিশ্চয় করিয়া অন্তঃশীতলভাবে অবস্থান করেন, তাঁহারাও মহাপুরুষ-পদবাচ্য। তন্মধ্যে কেহ কেহ ব্যবহার-নিরত হইয়া থাকেন এবং কেহ কেহ বা ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া অবস্থান করেন। পরন্তু উভয়েরই অন্তর যখন শীতলতায় পরিপূর্ণ, তখন উভয়েই তুল্যাবস্থ এবং উভয়েরই সুখ তুল্য। এখানে কথা এই যে, উক্ত উভয়েই অন্তঃশীতলতায় অবস্থিত হইলেও ঐ অন্তঃশীতল অবস্থা লাভ করিবার উপায়

ব্যক্তিবিশেষে বিসদৃশ হইয়া থাকে। কেহ কেহ দৃশ্য পদার্থসমূহের মিথ্যাত্ব বোধ স্থির রাখিতে অক্ষম হন,—হইয়া ইন্দ্রিয় নিরোধপূর্ব্বক দৃশ্যসম্বন্ধ হইতে মুক্ত হইবার পর অন্তঃশীতলতায় অবস্থান করিতে থাকেন। অপর কেহ কেহ বা কেবল মাত্র জ্ঞানশাস্ত্র-নিরূপিত বৈরাগ্যাদির অভ্যাস করিয়া দৃশ্যসমূহের মিথ্যাত্ব বোধ দৃঢ় করিয়া লয়েন; পরে দৃশ্যাতীত হইয়া অন্তঃশীতলতায় অবস্থান করিতে থাকেন।

রাম! অন্তঃকরণের যে শীতলতা সাধন, তাহাই অনন্ত তপস্যার ফল বলিয়া জানিবে। সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তির চিত্ত যদি বিষয়ব্যাপারে চঞ্চল হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাদৃশ সমাহিত ব্যক্তির সমাধি উন্মত্ত জনের তাণ্ডবতুল্য বলিয়াই গণ্য হইয়া থাকে। যাহার বাসনার অবসান ঘটিয়াছে; সে যদি উন্মত্ত ব্যক্তির ন্যায় নৃত্য করিতে থাকে, তাহা হইলে তাহার ঐ উন্মত্ত চেষ্টাও প্রবুদ্ধ সমাধি-নিষ্ঠ ব্যক্তির সমান বলা যায়। যিনি প্রবুদ্ধ হইয়া ব্যবহার-পরায়ণ হন, আর যিনি প্রবুদ্ধ হইয়া বনমধ্যে সমাধিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা উভয়েই সমান; কেন না, উক্ত উভয় ব্যক্তিই সর্ব্ব সন্দেহ-হর ব্রহ্মপদ লাভ করিয়াছেন। যাহার চিত্ত অন্যত্র সমাসক্ত থাকে, সেই ব্যক্তি অন্যোচ্চারিত কথা শ্রবণ করিলেও তাহাতে চিত্ত-সমাধানের অভাবে সে যেমন সেই কথা-শ্রবণক্রিয়ার কর্ত্তা হয় না, তেমনি চতুর্থ ভূমিকায় আরোহণ-কালে বাসনাবিহীন মন কার্য্যকারী হইলেও সেই সেই কার্য্যের অকর্ত্তা হইয়া থাকে। স্বপ্নাবস্থায় নিস্পন্দ দেহের মন যেমন গভীর গর্ত্তে পতন ও তথায় অবস্থানের কর্ত্তা হয়, তেমনি প্রচুর বাসনার আধার চিত্ত কোন কার্য্য না করিলেও যেন সেই সেই কার্য্যের কর্ত্তৃত্বপদে অধিষ্ঠান করিয়া থাকে। চিত্তের যে বাহ্য ক্রিয়ায় অকর্ত্তৃত্ব, জানিবে,—তাহাই উত্তম সমাধি আখ্যায় অভিহিত। তাহারই নাম কেবলীভাব বা মুক্তি এবং তাহাই পরম মঙ্গলময়ী পরম নির্ব্বৃতি। চল ও অচল এই উভয় ভাবে চিত্ত ধ্যান ও অধ্যান এই উভয়ের কারণ হইয়া থাকে। ফল কথা এই যে, চিত্ত যখন অচল বা স্থির হয়, তখন ধ্যানের কারণ আর যখন চঞ্চল হয়, তখন উহা ধ্যানরাহিত্যের কারণ হইয়া উঠে। এই জন্যই বলা যায় যে, তুমি ধ্যাননিষ্ঠ হইয়া রহিবার জন্য

চিত্তকে অঙ্কুরহীন করিয়া লও অর্থাৎ উহার স্থৈর্য্য সম্পাদন কর। যে মনে বাসনার লেশ নাই, তাহাকে নিশ্চল বলা হয়। মনের তাদৃশ নৈশ্চল্যই তাহার ধ্যান, সেই অবস্থার নামই কেবলীভাব। সতত যে শান্ত ভাব, তাহাও মনের বাসনাশূন্যতা। যখন বাসনাক্ষয় আরম্ভ হয়, তখনও বলা যাইতে পারে যে, মন উক্ত পদে অধিরূঢ় হইতেছে। মন যৎকালে একেবারেই বাসনাহীন হইয়া পড়ে, জানিতে হইবে,—তখনই মন অকর্তৃত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছে। বাসনা যদি ঘনীভূত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে চিত্ত কর্তৃত্বভাগী হইয়া সর্ব্ববিধ দুঃখই প্রদান করে। এই জন্যই বলিতে হয়, যাহাতে সম্পূর্ণরূপে বাসনার অবসান ঘটে, সর্ব্বতোভাবে তাহাই করা কর্ত্তব্য। প্রকৃত সমাধি কি? যাহাতে সমস্ত জগতে কিম্বা দেহাদি নিখিল দৃশ্য পদার্থপুঞ্জে 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার ভাব প্রশান্ত হইয়া যায়, শোক-শঙ্কাদি কিছুই কখন থাকে না এবং যে উপায়ে আত্মা আপন স্বরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, সেই উপায়ের নামই সমাধি।

হে রাম! এই যে কিছু দৃশ্য পদার্থ আছে, এতৎসমুদায়ে তুমি 'আমি' 'আমার' ইত্যাকার ভাব পরিহার করিয়া, হয় গিরিগহ্বরে সমাহিত হইয়াই থাক, অথবা গৃহমধ্যে ব্যবহার-পরায়ণ হইয়াই অবস্থান কর, তোমার যেমন ইচ্ছা, সেই অনুসারেই তুমি কালাতিপাত করিতে পার। যাঁহাদের মতি সুসমাহিত হইয়াছে এবং অহম্ভাব-দোষ তিরোহিত হইয়া গিয়াছে, তাঁহারা গৃহে থাকিলেও সেই গৃহই তাঁহাদিগের নিকট নির্জ্জন অরণ্যভূমি বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যাঁহারা প্রত্যগাত্মায় অবস্থান করিতেছেন, মন যাঁহাদের সুসমাহিত হইয়াছে, আকাশাদি মহাভূতবৎ তাঁহাদিগের নিকট অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান বলিয়া অবধারিত হইয়া থাকে।

হে রাজপুত্র! যদীয় চিত্তরূপ মহান্ মেঘ অপসারিত হইয়াছে, তাঁহার নিকট লোকভূয়িষ্ঠ বহ্নিজ্বালাকুল ভীষণ নগরও শূন্য অরণ্যের ন্যায় প্রতীতিগোচর হয়। হে শত্রুসূদন! যাহার চিত্ত রাগাদি-দোষে বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকে, তাহার নিকট বিজন বনভূমিও বহু লোকসমাকুল নগরের ন্যায় প্রতিভাত হয়। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত চিত্ত রাগাদিদোষে বিক্ষিপ্ত হইলে বিবিধ বিষয়ভ্রমের বীজভূত সুষুপ্তভাব সমধিগত হয়। যখন

রাগাদি বাসনা একেবারেই বিলয় পাইয়া যায়, তখন মোক্ষপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই জন্যই তোমায় বলিতেছি, তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই তুমি করিতে পার। যিনি আপনাকে সমস্ত দৃশ্য পদার্থের অতীত ও ব্যবহারে সর্ব্বভাবাত্মক-রূপে অবলোকন করেন, তাঁহাকেই সমাহিত আখ্যায় অভিহিত করা হয়। যাঁহার রাগদ্বেষ প্রক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, অন্তরে যিনি বিরাট্ আকার ধারণ করিয়াছেন, এবং যে কিছু ভাব পদার্থ, সকলই যাঁহার চক্ষে সমানাকারে প্রতিভাত, তাদৃশ সাধু পুরুষই সমাহিত নামে নিরূপিত।

হে নরপাল! উল্লিখিত সমাহিত ব্যক্তির মন কি জাগ্রৎ, কি স্বপ্ন, উভয় অবস্থাতেই এই নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চকে সৎস্বরূপ আত্মায় সৎস্বরূপে নিরীক্ষণ করিতে থাকে। তথাবিধ মন এই জগৎকে সৎস্বারূপ্য হইতে অতিরিক্ত বলিয়া অবলোকন করে না। বিপণিমধ্যে বহু লোক সমাবেত হয়,—হইয়া নিজ নিজ ক্রয় বিক্রয় কার্য্য করিতে থাকে। এই সময় কোন এক উদাসীন পুরুষ আসিয়া সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া সেই সকল লোক দ্বারা যদি কোন উপকার প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে সে যেমন মনে করে যে, হেথায় লোকের অস্তিত্ব নাই, তেমনি যাঁহারা তত্ত্ববিদ্, তাঁহাদের নিকটও—হউক না নগর জনকোলাহলে পরিপূর্ণ, তথাপি তাহা বিজন অরণ্যভূমি বলিয়াই প্রতীত। তত্রত্য লোকসমূহের সহিত তাঁহার কোনই সম্বন্ধ থাকে না বলিয়াই তাঁহাদের এইরূপ ধারণা হয়। যাঁহার মন সর্ব্বদা অন্তর্মুখী হইয়া থাকে, অর্থাৎ কেবল একমাত্র ব্রহ্ম-ভাবনায় মগ্ন হইয়া রহে, তথাবিধ যোগী পুরুষ সুপ্তই থাকুন, জাগরিতই থাকুন, কিম্বা গতিশীলই হউন, সকল অবস্থাতেই কি নগর, কি গ্রাম, কি জনপদ, সমস্তই তাঁহার নিকট অরণ্যের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। যাঁহার স্থিতি নিত্যই অন্তর্মুখিনী, তাঁহার নিকট এই ভূতাকুল বিশাল বিশ্ব সর্ব্বথা অনুপযোগী বলিয়া সর্ব্বতোভাবে আকাশভাবেই পর্য্যবসিত হয়। অর্থাৎ তিনি সমস্তই আকাশবৎ শূন্যাকারেই অবলোকন করেন। যে মানব অন্তঃশীতলতা লাভ করিবার পর বিজ্বরভাবে অবস্থান করে, তাহার ন্যায় তত্ত্বদর্শী ব্যক্তির নিকট এই জগৎ আজীবন শীতল বলিয়াই প্রতীত

হয়। অন্তর যাহাদের তৃষ্ণাতাপে উপতপ্ত, তাহাদের নিকট এই জগৎ দাবদাহময় বলিয়াই অনুভূত হয়। সর্ব্ব-প্রাণীর অন্তরে যাহার অস্তিত্ব থাকে, তাহাদের নিকট তাহা বাহিরে অবস্থিত বলিয়াই ধারণা হয়।

হে রাঘব! স্বর্গ, ধরণী, বায়ু, আকাশ, পর্ব্বত, সরিৎ, কিম্বা দিঙ্মণ্ডল, এই সকল চিত্তের বাহ্যভাগ বলিয়া নিশ্চিত। বিশদার্থ এই যে, ঐ সকল যেন চিত্তের বাহিরে আছে বলিয়া প্রতীত হয়; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেরূপ প্রতীতি অমূলক, কেন না, ফলের বেলায় দেখিতে গেলে দেখা যায় যে, ঐ সকল চিত্তেরই অন্তর্গত। পুষ্পের মধ্যে গন্ধ থাকে, সে গন্ধ যেমন পুষ্পবিকাশে বহিঃপ্রকটিত হয় এবং বটবীজের অন্তর্গত বট যেমন বহির্বিভাগে প্রসারিত হইয়া থাকে, তেমনি স্বীয় অন্তঃস্থিত সৎস্বরূপ আত্মাই এই সকল বহির্বস্তুরূপে চিত্তের সাহচর্য্যে বিকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ এ সকল অন্তরে নাই, বা বাহিরে কিছুই নাই। স্বরূপতঃ এতৎসমুদায়ের অস্তিত্বই অসম্ভব। প্রাক্তন বাসনাবলে যে বস্তু যেরূপে কল্পিত হয়, আত্মতত্ত্বই তদাকারে তাদৃশ বেশে উত্থিত হইয়া থাকেন। বহিবিকাশী সৌরভে পুটিকামধ্যস্থ কর্পূরের ন্যায় আত্মতত্ত্বনামক আন্তর বস্তুই বাহ্য জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে এবং উপাধি অনুসারে বহু বিভিন্নরূপে বিকাশিত হইতেছে। জগদাকারে, অহংরূপে, বাহ্যরূপে ও আভ্যন্তর আকারে একমাত্র আত্মাই স্ফূর্ত্তিমান্ হইতেছেন। অহঙ্কারাদিররূপ চক্ষুরাদির অদৃশ্য হইলেও তাহা অসৎ নহে, আবার চক্ষুরাদির দৃশ্য বাহ্য স্থূল রূপও সৎ হইতে পারে না। পরন্তু যিনি আত্মা নামে নির্দ্দিষ্ট, তিনি উক্ত উভয়ানুস্যূত সন্মাত্রস্বরূপ। ঐ আত্মা স্বসন্নিহিত চিত্তকেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনানুসারে বহিঃস্থিত চক্ষুরাদির সাহায্যে বহির্জগদাকারে এবং অন্তঃস্থিত জাগ্রদ্বাসনাদি দ্বারা হৃদভ্যন্তরে স্বপ্ন-রাজ্যাদিরূপে অবলোকন করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইবে যে, বাহ্য ও আভ্যন্তর এই উভয়বিধ জগৎ একই সদাত্মার দৃশ্য; সুতরাং ঐ উভয় যদি সদাত্মা হইতে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক্কৃত হয় অর্থাৎ তাঁহার অদৃশ্য হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত দ্বিবিধ জগতের নাস্তিত্ব স্বতই প্রকাশ পাইবে। পৃথক্করণের অভাবে অহন্তাবাদির ভেদ বিদ্যমানতায় তৎসমস্তের

অভাব অনুভূত হইয়া থাকে। এই কাল্পনিক অভাব নিবন্ধন আবার যথেস্ট ভয়সম্ভাবনা দেখা যায়। ঐ অভাবের ফলে আধিপ্রপীড়িত জীবের নিকট স্বর্গ, পৃথ্বী, পবন, গগন, পর্ব্বত, সরিৎ ও দিক্‌প্রভৃতি—তদীয় দৃষ্টিতে বিদ্যমান বস্তুনিচয়, ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিত হইয়া প্রলয়ারম্ভ সময়রূপেই সতত প্রতিপন্ন হয়। অপিচ যিনি একমাত্র সৎস্বরূপ আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া সতত তদেকনিষ্ঠ হইয়াই অবস্থান করিতে থাকেন, তিনি লোকদৃষ্টিতে কর্ম্মেন্দ্রিয়-পরিচালনায় বাহ্য ক্রিয়াকলাপ নির্ব্বাহ করিলেও শোক কিম্বা হর্ষাদির বশীভূত হন না। বিশদার্থ এই যে, কাল্পনিক দৃশ্যের অভাব হয় হউক, তাহাতে যাঁহার শোক কিছুই নাই, আর যদি কল্পিত বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি ঘটে, তাহাতেও যাঁহার হর্ষোদয় নাই, এবম্বিধ সাধু পুরুষকেই সমাহিত আখ্যায় অভিহিত করা হয়। যিনি একমাত্র সর্ব্বগত আত্মাকেই দর্শন করিয়া উপশান্তমনে অবস্থান করেন এবং কোন শোক বা চিন্তা যাঁহার অন্তরে অবকাশ প্রাপ্ত হয় না, তাঁহাকেই সমাহিত নামে নির্দ্দেশ করা যায়। যিনি জাগতিক গতির পূর্ব্বাপর সকল বিষয়ই দেখেন—দেখিয়া মিথ্যাবোধে তৎসমস্তের প্রতি উপহাস প্রকাশ করেন, তিনিই প্রকৃত সমাহিত নাম ধারণ করিয়া থাকেন। তথাবিধ সমাহিত ব্যক্তি কি জন্য উপহাস করেন, সে সম্বন্ধে বলা যায় যে, 'আমি সর্ব্বানুভবসিদ্ধ প্রত্যক্-স্বভাব; এই জগৎও আমাতেই বিদ্যমান অথবা যাহা শ্রুতিসিদ্ধ ব্রহ্মস্বভাব তাহাতেই বিদ্যমান?' এরূপ বিতর্কস্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত যে, ঐ জগৎ ও অহম্ভাব আমাতে বিদ্যমান নাই। কেন নাই? তাহার কারণ আমি দৃক্‌স্বরূপ, আর ঐ উভয় দৃশ্যস্বরূপ; সুতরাং দৃক্ কখন দৃশ্যের আশ্রয় হইতে পারে না, অপিচ পরব্রহ্মেও উহার অস্তিত্ব নাই; কেন না, তিনি অসঙ্গ, অদ্বয়, কূটস্থ ও স্বস্বরূপ, তাঁহাতে ঐরূপ বৈষম্য-যোগ অসম্ভব। যেমন দূর হইতে শারদীয় সৌরাতপ-সম্ভিন্ন বীচিমালার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে প্রতপ্ত গলিত রজতের ন্যায় পুঞ্জীভূত বিস্ফুরিত কান্তিচ্ছটা দেখিতে পাওয়া যায়; পরন্তু তাহার সমীপবর্ত্তী হইলে কিছুই দেখা যায় না, তেমনি ঐ অহম্ভাব ও জগৎ এ উভয় দূর হইতেই লক্ষিত হয়, কিন্তু যাঁহারা আত্মসন্নিধানে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে ঐ সকল কিছুই পতিত

হয় না। অন্তরে যাঁহার 'তুমি' বা 'আমি' ভাব নাই এবং জগদ্বিভাজক মনও যাঁহার নাই, তাঁহার চেতন বা অচেতনকল্পনাও নাই। একমাত্র সর্ব্বময় আত্মাই তাঁহার চক্ষে প্রতিভাত; তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুই নাই। তিনি আকাশবৎ বিমলস্বভাব। তাঁহার কর্ত্তৃত্বে যথাযথ বাহ্য কার্য্য সকল সম্পাদিত হয় সত্য; কিন্তু যদি হর্ষ বা রোষবিকারের কারণ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে তিনি কাষ্ঠ কিম্বা লোষ্ট্রবৎ নির্ব্বিকারভাবেই অবস্থান করিতে থাকেন। তাদৃশ ব্যক্তি সর্ব্বদাই শান্তভাবে বিরাজ করেন, তাঁহার বিকার কিছুই থাকে না। যিনি সকল প্রাণীকে স্বভাবতই আত্মবৎ ও পরদ্রব্য সকল লোষ্ট্রবৎ অবলোকন করেন, পরন্তু কোনরূপ ভয়ে পড়িয়া ঐরূপ করেন না; তিনিই প্রকৃত অবলোকন করিয়া থাকেন। সামান্য বরাটিকাই হউক কিম্বা হিরণ্যগর্ভের মহান্ ঐশ্বর্য্যই হউক, মূঢ় জন সে সকল অসৎস্বরূপে অবলোকন করে না, এবং সেই সেই ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠানভূত সৎস্বরূপের অনুভব করিতে পারে না বলিয়া প্রকৃত সন্মাত্র-স্বভাবেরও অনুভব বা দর্শন করিতে সক্ষম নহে। তবে কথা এই—যিনি তত্ত্ববেদী, তিনিই ঐরূপে দর্শন করিতে পারেন; তাঁহারই উভয়থা সমদর্শিত্ব উপপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সৎ, আর উহা অসৎ, এইরূপে বিভেদ জ্ঞান তাঁহার নাই। যে সাধু পুরুষ এইরূপ সত্ত্ব-পদ লাভ করিয়াছেন,—করিয়া মহাসত্ত্ব পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি বিনা চেষ্টায় বসিয়া থাকুন, ঐশ্বর্য্যাদি অভ্যুদয় প্রাপ্ত হউন, গমন করিতে থাকুন, পুত্র-কলত্রাদির বিয়োগ লাভ করুন, কিম্বা কোন অভ্যুদয় প্রাপ্ত নাই হউন, অথবা আপনার উত্তম ভোগসুখ-সম্পন্ন পুত্র-পরিজনাকীর্ণ ভবনেই বাস করুন, বা সর্ব্বভোগ-বিরহিত বিপুল বনেই অবস্থিত হউন, আর সর্ব্ব সঙ্গ পরিহার করিয়া ভূধরে গিয়াই বাস করুন, অথবা স্বীয় গাত্রে চন্দন, অগুরু ও কর্পূর লেপন করিয়াই থাকুন, কিম্বা প্রবল কামাকুল ও পানাসক্ত হইয়া নৃত্য করিতেই নিরত হউন, আর প্রজ্বলিত জ্বালামালাকুল ভীষণ হুতাশনেই পতিত হউন, এইরূপে তিনি মহাপাপ অর্জ্জন করুন, প্রভূত পুণ্যসঞ্চয় করুন, সদ্যই মরণাপন্ন হউন অথবা প্রলয় পর্য্যন্ত জীবিত অবস্থাতেই থাকুন, তাঁহার পক্ষে উল্লিখিত সমস্ত ব্যবহারই সমান। অতি বড় মহাসুখই উপস্থিত হউক, তাহাতেও তাঁহার সুখানুভূতি নাই আর অতি

বড় মহাদুঃখই উপস্থিত হউক, তাহাতেও তাঁহার কোনরূপ দুঃখানুভূতি নাই। মরণাদি মহাদুঃখ-দশায় যে মন ও দেহাদি বিকারবান্ হয়, তিনি তাহাদের কাহারই আশ্রয় নহেন; কাজেই উল্লিখিত নিখিল কার্য্য-পরম্পরা তাঁহার কর্ত্তৃত্বে কৃত হইলেও কিছুই কৃত হয় না। ভাবিয়া দেখ, সুবর্ণ পঙ্ক-লিপ্ত হয়,—হইলেও তাহা যেমন কলঙ্কিত হয় না, ফলে জলে প্রক্ষালিত করিলেই যে সুবর্ণ—সেই সুবর্ণই সমুজ্জ্বল হইয়া থাকে, তেমনি ঐ সমদর্শী ব্যক্তির কলঙ্ক কিছুতেই নাই। অশাস্ত্রীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান-নিবন্ধন বাসনা-রূপ ইন্দ্রিয়জ্ঞান কলঙ্কিত হয়; এই কলঙ্কিত ইন্দ্রিয়জ্ঞান ও তাহার আধার দেহের ভোগ্য যে শব্দাদি বিষয়, তাহাতে সেই ব্যক্তিই কলঙ্কিত হইয়া থাকে,—যাহার 'তুমিত্ব' ও 'আমিত্ব' জ্ঞান বিদ্যমান। বিশদার্থ এই যে, 'তুমি' ও 'আমি' ভাবাপন্ন ব্যক্তিরই কুকর্ম্ম ও কুৎসিত জ্ঞান-নিবন্ধন কলঙ্ক-লেপ হয়। যখন প্রকৃত সত্য জ্ঞান-লাভে যাবতীয় বাহ্য ও আভ্যন্তর ভ্রম-পদার্থ বিদুরিত হইয়া যায়, তখন চিত্ত স্বস্বভাবে অবস্থিত হয়, পরে তাহার উল্লিখিত প্রকার কলঙ্ক মিথ্যাজ্ঞানে বাধিত হয় বলিয়া স্বতই প্রশমিত হইয়া যায়। অহম্ভাবের অধ্যাসনিবন্ধন বাসনা উৎপন্ন হয়। বাসনারূপ অনর্থের উদ্বোধন বশতঃ চিন্ময় পুরুষের কাল্পনিক উদ্ভব-লাভে বিবিধ বিচিত্র সুখ দুঃখ লাভ ঘটিয়া থাকে। রজ্জুতে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়; সেই ভ্রম তিরোহিত হইলে যেমন সর্প নাই বলিয়া একটা স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায়, তেমনি অহঙ্কারের যখন নিবৃত্তি ঘটে, তখন সর্ব্বদুঃখ-জনিত বৈষম্য ঘুচিয়া যায়; তাহাতে সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য লাভ ঘটিয়া থাকে। লোকে যে কার্য্য সম্পাদন করে, যাহা ভক্ষণ করে, যাহা অর্পণ করে কিম্বা যাহা হোম করে, যিনি তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহার সে সকল কিছুই নাই। তিনি ঐ সকল কর্ম্ম করুন, কিম্বা নাই করুন, তাঁহার কর্ম্ম-করণেও কোন ফলোদয় নাই আর যদি কর্ম্ম না করেন, তাহাতেও তাঁহার কোনই হানি নাই। যাহা প্রকৃত আত্মভাব, তাহা তিনি পরিজ্ঞাত থাকেন; কাজেই পরমাত্মাতেই তাঁহার নিত্যস্থিতি হয়। যেমন প্রস্তর হইতে লতামঞ্জরীর উৎপত্তি হয় না, তেমনি তাঁহারও অন্তরে কোন আকাঙ্ক্ষা বা ইচ্ছার উদ্রেক হইবার নহে। তবে কখন কখন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাসনার

অভ্যাসবশে নানা ইচ্ছার উদয় হইলেও জলের তরঙ্গ-লহরীর ন্যায় পরমার্থ-দৃষ্টিতে সেই সেই ইচ্ছা তাঁহার স্বাত্মভূত হইয়া থাকে।

হে রাম! ঐ তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি নিজেই নিখিল বাহ্য প্রপঞ্চরূপে বিরাজ করেন। অখিল জগৎ তাঁহারই স্বরূপে বিরাজমান। এ জগতে বিভাগ বলিয়া কিছুই নাই। তিনিই সর্ব্ব-দোষের অস্পৃষ্ট বলিয়া পরম পাবন সদ্‌ব্রহ্ম-স্বরূপ। প্রকৃত সৎ বলিতে তাঁহাকেই বুঝা যায়। তিনিই পরাত্মা একরূপী। এইরূপ ক্রমে তাঁহাকেই সর্ব্ব-দ্বৈত-বন্ধ-মুক্ত সৎস্বরূপ-মাত্রে অবশিষ্ট নিত্যমুক্ত আখ্যায় অভিহিত করা হয়। তদীয় সৎস্বরূপতা ভিন্ন অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই।

ষট্‌পঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৬ ॥

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আত্মাই স্বপ্রকাশ-তৈক্ষ্ণ মরিচস্বরূপ; তাঁহার চিন্তাবহেতু তৈক্ষ্ণ প্রথারূপ যে জ্ঞান হয়, তাহাই ব্রহ্ম-স্বভাবের জ্ঞানাভাবেই তৎস্থানীয় 'আমি' 'তুমি' ইত্যাদি ভাবরূপ, ঘট-কুড্যাদিরূপ এবং তদাধার দেশ-কালাদিরূপ জগদাকারে বিকাশ পাইয়া থাকে। ফল কথা, যে আত্মচৈতন্য 'মরিচ বড় তীক্ষ্ণ' এইরূপ বোধে বিবর্ত্তিত হইতেছেন, তিনিই 'তুমি' 'আমি' জগৎ ইত্যাকার বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্ত্তিত হইতেছেন। এইরূপে সমস্ত জগতেরই চিদভিন্নতা পরমার্থতঃ সুসিদ্ধ এবং ব্যবহার-দশাতেও এই জগদ্বৈচিত্র্য চিৎস্বভাব বলিয়াই প্রতিপন্ন। যে আত্মচেতনা 'ইহা লবণ' এইরূপ বোধে বিবর্ত্তিত হয়, তাহাই 'আমি' 'তুমি' ও দেশ-কালাদিভেদে বিচিত্র বিশ্বাকারে বিবর্ত্তমান হইতেছে। যে আত্মচৈতন্যের 'ইক্ষু মধুর রসযুত' এইরূপ সম্বেদন বিজৃম্ভিত হয়, 'তুমি' 'আমি' 'জগৎ' ইত্যাকার অনুভবও তাঁহা হইতেই অভিব্যক্ত হইতেছে। যে আত্মচৈতন্য পাষাণগত হইয়া কাঠিন্য প্রথার বিস্তারক হয়, তাহাই 'তুমি' 'আমি' 'জগৎ' ইত্যাদি ভেদে

বিভিন্ন হইয়া বিকাশ প্রাপ্ত হইতেছে। যে আত্মচৈতন্যের অন্তরে পর্ব্বতের গুরুত্বানুভব হইয়া থাকে, তাহাই 'তুমি' 'আমি' 'জগৎ' ইত্যাদি আকারে অভিব্যক্ত হইতেছে। যে আত্মচৈতন্য জলভাবময় হইয়া দ্রবত্ব বোধের অধীন হইয়াছেন, সেই আত্মচেতনাই অহন্তাবাদি-ভেদে জলদাকারে প্রকাশিত হইতেছেন। যে আত্মচেতনা বৃক্ষাকারে বিজৃম্ভিত হইয়া শাখা-পল্লবাদি অনুভব করিতেছে, তাহাই অহন্তাবাদি-ভেদে বিশ্বাকারে প্রকাশ পাইতেছে। আত্মাকাশের অভ্যন্তরে চিন্ময়তা-নিবন্ধন যে শূন্যতা-সম্বেদন, তাহাই 'তুমি' 'আমি'ও ভুবনাদি ভেদে ভাবিত। দ্রব্যান্তর্গত আত্মাকাশের যে ছিদ্রতা ও ঘট-কুড্যাদির যে নিবিড়তা, সমস্তই সেই আত্মচেতনার বিবর্ত্তন। সমাধি প্রভৃতি কালে যে আত্মসত্তা একত্বে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, সেই আত্মসত্তাই সংসারে বহু বিভিন্নাকারে প্রকাশ পাইতেছে। অর্থাৎ চিন্ময়তা-হেতু আত্মসত্তার যে স্বতই একমাত্র সত্তাস্থান, তাহাই 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি ভেদে ও আভাস-চৈতন্যাকারে প্রতিভাত হইতেছে। আত্ম-প্রকাশের অন্তরে আপনা হইতেই যে প্রকাশভাবের উদয় আছে, তাহাই 'তুমি' 'আমি' ভাবে অভিব্যক্ত এবং তাহাই জীবভাবাপন্ন হইয়া সামান্য চিদ্ভাবকে বৃত্তিভেদে বিভিন্ন আভাসচৈতন্যের অনুগতরূপে কল্পনা করিয়া লয়। অর্থাৎ অন্তরাত্মার প্রকাশের যে নিরুপাধিক অবভাস, তাহাই এক্ষণে চিত্ত, অহং ও জীবাদি বিবিধ উপাধি গ্রহণ করিতেছে। আত্ম-চন্দ্রের অন্তরে যে চিৎস্বরূপ সুধা বিদ্যমান, তাহাই 'তুমি' 'আমি' ইত্যাদি ভাবের অনুভূতি-বিশিষ্ট হয়, পরন্তু অহন্তাবাদির পৃথক্ আবির্ভাব নাই। পরমাত্মরূপ গুড়ের অভ্যন্তরে চিদ্ভাব হেতু যে আস্বাদ প্রকাশ পায়, তাহাই স্বীয় আত্মায় আপনা হইতেই অহন্তাবাদিরূপে আস্বাদিত হইয়া থাকে। চিদ্ভাব-নিবন্ধন পরমাত্মমণির অন্তরে আপনা হইতেই যে দীপ্তি বিকাশ পায়, তাহাই চেতনারূপ আত্মপদে অহন্তাবাদির অনুভব করিয়া থাকে। প্রকৃত পক্ষে পরমাত্মা কিছুই বিদিত হইতেছেন না, কেন না, তদীয় বেদ্য বিষয় সম্পূর্ণই অসম্ভব। যখন বেদ্যই নাই, তখন তিনি কি বিদিত হইবেন? অপিচ তাঁহার আস্বাদ্য বিষয়েরও সম্পূর্ণই অসম্ভবতা; কাজেই তিনি কোন স্বাদু বিষয়েরও আস্বাদ গ্রহণ করেন না।

কোনরূপ চেত্য বিষয়েরও সম্ভাব্যতা নাই; সুতরাং তিনি কিছুই চিন্তাও করেন না। এইরূপে কোন লব্ধব্য বিষয়েরও সম্ভাব্যতা নাই; কাজেই তিনি যে কিছু লাভ করেন, তাহাও বলা যায় না। বিশদার্থ এই যে, সকলই পরমাত্মার মায়িক আভাস মাত্র। কাজেই বাস্তব পক্ষে আস্বাদ্য বা আস্বাদক এ সকল ভেদ কিছুই নাই। স্বাদ্য-স্বাদক নাই বলিয়া কেহ কিছুই আস্বাদও করে না। এই প্রকার বেদ্য ও বেদকের অসম্ভবতা হেতু কেহ কিছু বিদিতও হয় না। চেত্য অসম্ভব; সুতরাং কেহ যে চিন্তা করে, তাহাও নহে। ফলতঃ আত্মার আভাসিত জগদাকার একান্তই অসৎ। তিনি আত্মা—অনন্ত, পূর্ণস্বভাব, সতত মহাশৈল-সম নিবিড় ও আত্মাতেই অবস্থিত। অর্থাৎ একমাত্র নিরুপাধিক অসদাভাস সর্ব্বব্যাপী আত্মাই অনন্তাকারে অবস্থান করিতেছেন।

হে রঘুনন্দন! আমি উল্লিখিত বিবিধ বাক্যভঙ্গীর সাহায্যে তোমাকে 'অহং' 'মম' বা এই দৃশ্য জগদ্ভাবাদির যে ভেদ কিছুই নাই, তাহাই প্রদর্শন করিলাম। বাস্তবিকই উহাদের কেহই নাই। কি অহং, কি চিত্ত, কি জগদাদি, এ সমুদায়ের নাম ব্যতীত বস্তু কিছুই নাই। ফলে চিত্তও নাই, চেতয়িতাও নাই, জগদ্ভাবাদি ভ্রমও কিছুই নাই, থাকিবার মধ্যে বর্ষাবসান-কালীন মূক জলধরবৎ সেই স্বচ্ছ, সিত, শান্ত, ব্রহ্মমাত্রই আছেন। জল যেমন দ্রবত্ব নিমিত্ত আবর্ত্তাদি বিকারভাব আশ্রয় করে, তেমনি সেই মায়াবী সর্ব্বাভিজ্ঞ ঈশ্বরই নিজ মায়াময় জ্ঞপ্তিরূপ আত্মায় জীবভাব ও জগদ্ভাবাদি ধারণ করিতেছেন। জলে দ্রবত্বের ন্যায় এবং পবনে স্পন্দভাবের ন্যায় জ্ঞাপ্তিমাত্র-স্বরূপ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেই ঐ অহম্ভাব ও দেশকালাদি অবস্থিত রহিয়াছে। সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীয় ঐশভাবে অনাবরণ ও অবিচ্ছেদরূপ জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য কেবল নিরতিশয় আনন্দরূপ স্বরূপ-জ্ঞানই পরিজ্ঞাত হইতেছেন। পরন্তু অহম্ভাবময় স্থূল দেহরূপ জীবভাবে জীবনের হেতুভূত প্রাণ, করণ ও বিষয় সম্বন্ধের অধ্যাস-ক্রমে তিনিই 'জীবনাদিরূপ আত্মা' এইরূপই বিদিত হইতেছেন। তাঁহার এই শেষোক্ত জ্ঞানের বিশেষত্ব এই যে, এই জ্ঞান তাঁহার তাত্ত্বিক নহে। ভ্রান্তিমান্ অজ্ঞ জীবের যেরূপ কাম-কর্ম্ম-বাসনায়, যাদৃশ বিষয়াস্বাদে

ও যেরূপ দর্শনলাভ ও উপভোগাদি বৈচিত্র্য-প্রকারে যাদৃশ প্রিয়-মোদ ও প্রমোদাদি নানাবিধ তৃপ্তি সমুদিত হয় বা অনন্ত আত্মস্বরূপে সে, যেরূপ ভোক্তৃ, ভোগ্য ও ভোগবৈচিত্র্য অনুভব-গোচর করে, যিনি 'পরমেশ্বর,— তিনিও তাহার বাসনাক্রমে তথাবিধরূপেই বিবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ জীবের যেমন যেমন ভ্রান্তি, ঈশ্বরও সেই সেইরূপেই বিবর্ত্তিত হন। ঐ অজ্ঞ জীব যখন অধ্যাত্মশাস্ত্রের সমালোচনা বা গুরূপদেশাদির সাহায্যে এই ভোগ্য জগতের অধিষ্ঠান সন্মাত্ররূপ স্ফূর্ত্তিকেই সারাৎসার পরমার্থ-স্থিতি বলিয়া বুঝিতে পারে এবং নিখিল জীবনিবহের জীবন যাহার অধীন, তথাভূত আত্মানন্দকেই স্বরূপ বলিয়া বিদিত হইতে পারে, তখনই তাহার নিকট ভোগ্য ও ভোক্তা এই উভয়ের অধিষ্ঠান-দ্বয় চিৎস্বরূপেই পর্য্যবসিত বলিয়া বোধ হয় এবং এইরূপ হইলে তখন সে জীব ও ঈশ্বরে যে একান্ত ভেদ নাই, তাহাও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে। জানিবে;— জীব ও ঈশ্বরের ভেদ-নিবৃত্তির ন্যায় ক্রমশঃ ঈশ্বর ও তুরীয় ব্রহ্মেরও ভেদ নিবৃত্তি পাইয়া যায়। তখন কেবল সেই একমাত্র অখণ্ড শান্ত পরব্রহ্মই বিরাজ করিতে থাকেন। ভেদ-বোধের উত্থাপক অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে সর্ব্বত্র এক অখণ্ড পূর্ণানন্দই উপলব্ধিগোচর হয়।

রামচন্দ্র! জানিয়া রাখ, এই সমস্ত জগৎই একমাত্র পূর্ণ, স্বপ্রকাশ, আনন্দৈকরস, প্রশান্ত পরব্রহ্ম। তাঁহাতে চেত্য বিষয় নাই বা স্বব্যাবর্ত্তক ধর্ম্মও কিছুই নাই। বাস্তবিকই এক ব্রহ্ম ভিন্ন কদাপি কুত্রাপি অপর কিছুরই সত্তা নাই। একমাত্র ব্রহ্মই বিদ্যমান, অন্য সমস্তই প্রশান্ত, ইত্যাকার বাক্য কেবল উল্লিখিত অখণ্ড লক্ষ্য ব্রহ্মের বোধনিমিত্তই প্রয়োগ করা হয়। নতুবা যাহার একেবারেই অভাব, তাহা প্রশান্ত বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে কি? এতাবতা বুঝিতে হইবে, ঐ প্রকার বাক্যাবলীও মিথ্যা। তবে সত্য কি? একমাত্র ওঙ্কার-স্বরূপ পরব্রহ্মই সত্য; তিনিই নিত্য বিদ্যমান।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৭ ॥

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এই বিষয়ে বিচক্ষণগণ এক অতি প্রাচীন ইতিহাস উল্লেখ করিয়া থাকেন। ঐ ইতিহাস কিরাতপতি সুরঘুর বৃত্তান্ত-ঘটিত; উহা অতি বিস্ময়াবহ। আমি এক্ষণে সেই ইতিহাসের অবতারণা করিতেছি, শ্রবণ কর।

সুপ্রসিদ্ধ হিমালয়-শৈলের কোন একটী শিখর কৈলাস-নামে পরিচিত। ভারতভূমির উত্তর দিগ্‌বর্ত্তী ঐ কৈলাসগিরি অতীব শুভ্রতম। উহাকে দেখিলে মনে হয়, যেন ভূগর্ভ হইতে কর্পূরপুঞ্জ সমুত্থিত হইয়া একত্র স্তূপাকারে অবস্থান করিতেছে; অথবা ঐ পর্ব্বতে সুধাংশুমৌলি বাস করেন, তাঁহারই অট্টহাস্য যেন বিকাশ পাইতেছে; কিম্বা সুধাংশুর শুভ্রতম অংশুপুঞ্জই যেন পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে; অথবা এমনও বোধ হয় যে, ঐ শৈলারণ্যে যে সকল মাতঙ্গ বাস করে,তাহাদিগেরই মস্তক-চ্যুত মুক্তারাশি যেন একত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। ক্ষীরাব্ধি যেমন বিষ্ণুর বাসগৃহ, স্বর্গধাম যেমন সুরেন্দ্রের নিকেতন এবং বিষ্ণুর নাভি-নলিন যেমন ব্রহ্মার বাসস্থান, তেমনি ঐ কৈলাস-শৈলই ভগবান্ চন্দ্রশেখরের বাস-ভবন। ঐ স্থানে কত রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ আছে, সেই সকল বৃক্ষে রত্ন-শলাকান্বিত কত দোলা লম্বিত রহিয়াছে। অপ্সরাগণ সেই সকল দোলায় চড়িয়া দোল খাইতেছে। তাহাতে ঐ শৈল যেন লহরী-রাজিত অম্বুধির ন্যায় বিভাত হইতেছে। বিলাসী প্রমথগণ সর্ব্বদা সেখানে প্রফুল্লমনে বিচরণ করিতেছে। তাহাদের প্রিয়জন-বিয়োগ-জনিত শোক-সম্পর্ক নাই। মদমত্ত প্রমথ-বধূগণের পাদাহত অশোকতরুসমূহের ন্যায় তাহারা তথায় সদাই প্রফুল্ল রহিয়াছে। ভগবান্ চন্দ্রশেখর সেই পর্ব্বতভূমির যে যে দিকে বিচরণ করেন, সেই সেই দিগ্‌বিভাগস্থিত চন্দ্রকান্তমণি হইতে অজস্র জলধারা নির্গত হইলে তত্রত্য উচ্চস্থানসমূহ হইতে নির্ঝর-বারি নিপতিত হয় এবং তাঁহার যে দিকে গতিবিধি নাই, সেখানে সেরূপ জলধারা পাত

হয় না। ঐ পর্ব্বত—তরু, লতা, গুল্ম, বাপী, হ্রদ, নদ, নদী, মৃগ, পশু, পক্ষী ও অপরাপর বহু জীব জন্তুগণে পরিপূর্ণ হইয়া যেন একটা অপর ব্রহ্মাণ্ড-খণ্ডের ন্যায় বিরাজ করিতেছে।

ঐ কৈলাস-শৈলের কোন এক অংশবিশেষে কতকগুলি কিরাত বাস করিত। তাহারা হেমজট নামে অভিহিত হইত। তাহাদের বাসস্থান একত্র ঘন-সন্নিবিষ্ট ছিল। দেখিয়া মনে হইত, যেন একটা বৃহৎ বট-তরুর মূলতলস্থ গর্ত্তমধ্যে পিপীলিকা-দল বাস করিতেছে। সেই সকল নীচপ্রকৃতি কিরাতেরা কৈলাসগিরির প্রত্যন্তপর্ব্বতে যে সকল রুদ্রাক্ষ-বৃক্ষ ও অন্যান্য তরু গুল্ম আছে, তাহা হইতে ফল, পুষ্প ও কাষ্ঠাদি আহরণ-পূর্ব্বক বায়স-বৃন্দের ন্যায় নিত্য নিত্য জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ঐ কিরাত-দিগের এক রাজা ছিলেন। তাঁহার নাম সুরঘু। কিরাতরাজ সুরঘু উদারস্বভাব, শক্রজয়ী ও প্রবল পরাক্রম-শালী। যে সকল শক্র দেববৎ পরাক্রান্ত ছিল, তিনি তাহাদিগেরও দর্প-দলনে সমর্থ ছিলেন। তাঁহার ভাস্করের ন্যায় পরাক্রম ছিল। তিনি বেগে মূর্ত্তিমান্ মারুতের ন্যায় প্রতীত হইতেন। ঐ কিরাতরাজ প্রকৃতিপুঞ্জের পরিপালনে সর্ব্বদাই আনুকূল্য প্রকাশ করিতেন। তিনি যেন জয়লক্ষ্মীর দক্ষিণ ভুজ-স্বরূপে বিরাজমান ছিলেন। রাজা সুরঘু রাজ্যৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়া রাজরাজ ধনাধিপতিকেও স্বীয় বৈভবে পরাভূত করিয়াছিলেন। তাঁহার বুদ্ধি অতি প্রখর ছিল। তিনি বুদ্ধিবলে সুরগুরু বৃহস্পতি অপেক্ষাও বলীয়ান্ ছিলেন। সুরঘু কাব্য-রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার নীতি-নৈপুণ্যে ও কাব্যরচনার চাতুর্য্যে অসুরাচার্য্য শুক্রকেও পরাভূত হইতে হইত। দিবাকর যেমন অক্লান্তভাবে নিত্য নিত্য দিবস-ব্যাপার সমাধা করেন, তিনিও তেমনি দুষ্টের নিগ্রহে ও শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ-বিতরণে নিরত রহিয়া যথাযথ রাজকর্ম্ম সমাধা করিতেন।

কিরাতরাজ সুরঘু কিয়ৎকাল ঐ ভাবেই রাজকার্য্য পরিচালন করিলেন; কিন্তু পাশবদ্ধ পক্ষী যেমন শিথিলাঙ্গ হইয়া পড়ে, তিনিও তেমনি প্রজাবর্গের প্রতি নিগ্রহ ও অনুগ্রহ-বিতরণ জন্য সুখ-দুঃখে একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

একদা সেই রাজা ভাবিতে লাগিলেন,—তৈলযন্ত্র তিলকে যেমন নিষ্পেষণ করে, আমি তেমনি বলপ্রয়োগ করিয়া কেন এই আর্ত্ত প্রজাবর্গকে পীড়ন করিতেছি! আমাকে কেহ পীড়ন করিলে আমি ক্লেশানুভব করি, প্রাণি-মাত্রেরই ত সেইরূপই ক্লেশ জন্মিয়া থাকে। অতএব আমি এক্ষণে লোককে ধন দান করি; কেন না, ধনেই লোক আনন্দিত হইয়া থাকে। আমি ধন পাইলে আনন্দিত হই, অন্য সকলেরও ধনে সেইরূপই আনন্দ হয়! সুতরাং আর না,—আর প্রজাপীড়ন করিবার প্রয়োজন নাই। অথবা নিগ্রহ ব্যতীত প্রজা বশে রাখিবার উপায়ান্তর নাই। আমাকে নিগ্রহ-ব্যবস্থা করিতেই হইবে। যেমন বারি বিনা নদী থাকে না, তেমনি নিগ্রহ ভিন্ন প্রজাগণ স্ব স্ব মর্য্যাদায় থাকিবে না; সুতরাং আমি যেমন প্রজা পীড়ন করিতেছিলাম, সেইরূপই করি। আহা, কি কষ্টের বিষয়! এই প্রজাদল আমার নিত্য নিগ্রহ এবং অনুগ্রহ উভয়েরই পাত্র হইতেছে। ভাগ্যগুণে আমি সুখ-ভাগীও বটে, আবার ভাগ্য-বৈগুণ্যে আমি দুঃখভাজনও বটে।

এইরূপে সেই কিরাত-মহীপতির চিত্ত সংশয়-দোলায় সমারূঢ় হইয়া রহিল। ফলে, কি যে কর্ত্তব্য, তাহা স্থির করিতে পারিল না। কাজেই তাঁহার সে চিত্ত কিছুতেই বিশ্রান্তি-লাভে সক্ষম হইল না। মনে হইল যেন নিদ্রিত ব্যক্তির চির-তৃষিত চিত্ত স্বপ্নদৃষ্ট মহান্ জলাবর্ত্তে পতিত হইয়া ঘুরিতে লাগিল।

এই সময় একদিন মাণ্ডব্য মুনি তদীয় ভবনে আগমন করিলেন। তখন মনে হইল, নারদ যেন নানা দিক্ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে ইন্দ্রভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহামুনি মাণ্ডব্য সর্ব্বশাস্ত্রে পারদর্শী ও সন্দেহরূপ রু-পাদপের ছেত্তা পরশুস্বরূপ। রাজা সুরঘু তাঁহার যথাযথ পূজা করিয়া তাঁহাকে তাঁহার সংশয়িত বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুরঘু কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! ভূতলে মাধবের অভ্যুদয় হইলে লোক সকল যেমন অপার আনন্দ লাভ করে, আমিও তেমনি ভবদাগমনে পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইলাম। হে প্রভো! দিনমণির দর্শন পাইয়া কমল যেমন বিকসিত হইয়া উঠে, ভবদীয় দর্শনপথে পতিত হইয়া আমিও তেমনি অধুনা কৃতার্থ জনগণের অগ্রণী হইলাম। ভগবন্! আপনি নিখিল ধর্ম্মতত্ত্বের মর্ম্ম অবগত আছেন,

এবং পরম পদে আপনার বিশ্রান্তি লাভ ঘটিয়াছে। অতএব আপনাকে পাইয়া আমি যে কতদূর কৃতকৃত্য হইয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য। যাহা হউক, আমার একটী সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। আপনি অধুনা সৌর-কর-কৃত অন্ধকার-নাশের ন্যায় আমার সেই সংশয়টী নিরাস করুন। বস্তুতঃ মহৎ লোকের সঙ্গগুণে কাহার না পীড়া নষ্ট হইয়া থাকে? যাঁহারা পীড়ার মর্ম্ম বিদিত আছেন, তাঁহারা সংশয়কেই প্রধান পীড়া বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। কেশরীর নখর যেমন কুঞ্জরের পীড়া উৎপাদন করে, তেমনি প্রজাপুঞ্জের প্রতি মৎকৃত অনুগ্রহ ও নিগ্রহ-জনিত চিন্তা আমাকে একান্ত পীড়িত করিতেছে। এই জন্যই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি যে, হে মুনে! সৌর কিরণাবলীর ন্যায় মদীয় বুদ্ধিতে সর্ব্বদা যাহাতে সমতা সমুদিত হয়, আপনি কৃপা করিয়া তাহার উপায় নির্দ্দেশ করুন। ইহা ভিন্ন অন্য প্রার্থনা আমার নাই।

মাণ্ডব্য কহিলেন,—মহারাজ! আপনার এই মনঃক্লেশ নিরাস করিবার উপায় আপনাতেই আছে। আপনি নিজে নিজে যত্ন করিলেই হিমের ন্যায় উহা বিলয় পাইয়া যাইবে। দেখুন, যেমন শরৎকালের অভ্যুদয় হইবা মাত্রেই চতুর্দ্দিকস্থ মেঘমালিন্য অপাকৃত হইয়া যায়, তেমনি আত্মবিচারে প্রবৃত্ত হইলেই আপনার মনঃপীড়া প্রশমিত হইয়া যাইবে। কে আপনার পুত্রমিত্র-কলত্রাদি এবং কে আপনার শরীর-গত ইন্দ্রিয়াদি? উহারা কে? কি প্রকার? কোথা হইতে আসিল? এই সকল আপনি আপন মনে বিচার করুন। অপিচ কে আমি? কোথা হইতে আসিলাম? এই যে জগৎ দেখা যায়, ইহাই বা কি? কিরূপে ইহা উৎপন্ন হইল? এই জননমরণ-ঘটনাই বা কি এবং কিরূপে হইয়া থাকে? আপনি আপনার মনোমধ্যে এইরূপই বিচার করিতে থাকুন। এইরূপ বিচার করিতে করিতেই আপনার মহত্তত্ত্ব লাভ ঘটিবে,—আপনি কৃতার্থ হইবেন। ঐ রূপ বিচার দ্বারা যখন আপনি স্বীয় স্বরূপ-তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন, তখনই চিত্ত আপনার অচঞ্চল ভাব ধারণ করিবে। হর্ষ কিম্বা অমর্ষদশায় আপনার অচল চিত্ত কখনই আর চঞ্চল হইবে না। জলে তরঙ্গ উঠে, সেই তরঙ্গ যেমন স্বীয় স্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া পুনরায়

ভূতপূর্ব্ব জলভাব ধারণ করে, তেমনি আপনিও তখন স্বীয় মনঃস্বরূপ পরিহার করিবেন,—করিয়া বিগতজ্বর হইবেন,—হইয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

হে নিষ্পাপ! ঐ অবস্থায় আপনার মনের সত্তাই যে একেবারে নাশ পাইবে, তাহা নহে। যেমন কলিকালের পূর্ব্ববর্ত্তী মনুর অবসান ঘটিলে এ জগৎ কলি-কলঙ্কে কলুষিত হইয়া উঠে; পরে আবার যখন মন্বন্তর উপস্থিত হয়, তখন জগৎ তাহার স্বীয় সত্তা পরিত্যাগ না করিয়াই যেমন আপন কলঙ্ক-বৈকল্য পরিত্যাগ করে, তেমনি মনও ঐ অবস্থায় জীবন্মুক্তবৎ ব্যবহার-ক্ষম থাকিয়াই পূর্ব্বতন মনের স্বরূপ পরিহার করিয়া থাকে। বিচারে আপনার তত্ত্ব দর্শন হইবে; তত্ত্ব দর্শন করিয়া আপনি পরম পরিতুষ্ট হইবেন। তৎকালে এই অবনীতলস্থ যাবতীয় শ্রীসম্পন্ন লোকই আপনার অনুকম্পার্হ হইবে। আপনি পিতার ন্যায় প্রজাপুঞ্জের প্রতি সদয় হইয়া পরম আনন্দ-সাম্রাজ্য লাভ করিবেন।

হে নরপতে! অপনি যদি বিবেক-দীপের সাহায্য লইয়া আত্মদর্শন করিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার পরমার্থপ্রদ মহত্ত্ব লাভ হইবে। আপনার সেই মহত্ত্ব সুমেরু, সাগর, এমন কি আকাশ অপেক্ষাও অধিক হইয়া উঠিবে। তখন তাহাদিগকে আপনার ক্ষুদ্র বলিয়াই মনে হইবে। হে সাধো! গজের যেমন গোষ্পদ-গর্ত্তে মগ্ন হওয়া অসম্ভব হয়, তেমনি মহত্ত্ব লাভের পর আপনার চিত্তেরও সংসার-ব্যাপারে মগ্ন হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। হে রাজন্! যে চিত্ত কামকর্ম্মে কলুষিত হইয়া থাকে, গোষ্পদ-গত স্বল্প সলিলে মশকের ন্যায় তাদৃশ চিত্তকেই অকিঞ্চিৎকর ক্ষুদ্র বিষয়-ব্যাপারে মগ্ন হইতে হয়। দৃশ্য মাত্রই যে বাসনার অবলম্বন, তথাবিধ বাসনার বশেই মন দীনদশায় উপনীত হইয়া কীটের ন্যায় বিষয়-পঙ্কে মগ্ন হইয়া থাকে।

হে মহাবাহো! যে ক্ষণ হইতে পরমালোকময় স্বয়ংজ্যোতিঃ পরমাত্মমাত্রেরই পরিশিষ্টতা অনুভূত হইবার উপক্রম হইবে, সেই সময় হইতেই এই সকল দৃশ্যপ্রপঞ্চ আপনা হইতে বিদূরিত হইতে থাকিবে। যে পর্য্যন্ত সুবর্ণমাত্রের অবশেষ হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই সুবর্ণাকারে স্থিত

অন্য ধাতুর প্রক্ষালন করা হয়। এইরূপে যত কালে আত্মদর্শন লাভ ঘটে, ততকাল পর্য্যন্ত সমস্ত দৃশ্যই দর্শন করিতে হয়। পরন্তু যখন দৃশ্য দর্শন করিয়া-করিয়া আত্মদর্শন করা যায়, তখন দৃশ্য প্রপঞ্চ দেখিবার আর প্রয়োজন হয় না। সর্ব্ব বস্তুভূক্ত বুদ্ধির সাহায্যে সর্ব্বত্র সর্ব্ব দৃশ্য সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে পারিলে সর্ব্বস্বরূপ আত্মা স্বয়ংই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। যদি মাত্র কয়েকটা বিষয় পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে কখন কোথাও কোনওরূপে আত্মোপলব্ধি হইবে না। যত দিন না সমস্ত দৃশ্য পরিত্যক্ত হয়, ততদিন আত্মলাভ করা যায় না। যখন সর্ব্ববিধ অবস্থা পরিত্যক্ত হয়, তত্ত্ববিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন, তখন একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন।

হে সাধুশীল! সাধারণ বস্তু সম্বন্ধেও এই নিয়ম আছে যে, একটী ত্যাগ না করিলে, অপরটী পাওয়া যায় না। অর্থাৎ এক সঙ্গে দুইটী বস্তু দেখা প্রায়ই ঘটে না। এক বস্তুর দেখা শেষ হইলে তবে অন্য বস্তুটী প্রত্যক্ষ-গোচর হয়। সুতরাং স্বীয় আত্মলাভ বিষয়ে যে ঐ রূপ ত্যাগ-প্রণালী অবলম্বন করা সম্পূর্ণ ই প্রয়োজন, সে কথা বলাই বাহুল্য মাত্র।

হে নরপতে! আত্মা অন্যান্য কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকারে যে বিষয় লাভ করিবার জন্য স্বয়ং যত্ন প্রকাশ করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব স্বীয় আত্মাবলোকনের জন্যই সমস্ত দৃশ্য পরিত্যাগ করা উচিত। যাহা কিছু দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমস্ত পরিহারের পর যাহা দেখা যায়, তাহা সেই পরম-পদ বৈ আর কিছুই নয়। এই নিখিল কার্য্য-কারণ-পরম্পরাময় জগতে যে কিছু বস্তুরাজি বিলসিত হইতেছে, মন সে সমুদায় পরিত্যাগ ও স্বীয় দেহের অপলাপ করিয়া যাহা লাভ করে, তাহাই সেই পরম ব্রহ্ম-পদ।

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৮ ॥

ঊনষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনাথ! ভগবান্ মাণ্ডব্য মুনি সুরঘু রাজাকে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া স্বীয় রমণীয় আশ্রম-পদে গমন করিলেন। মাণ্ডব্য মুনি প্রস্থান করিবার পর রাজা সুরঘু কোন এক নির্জ্জন স্থানে গিয়া স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা চিন্তা করিতে লাগিলেন,—এই যে 'আমি' 'আমি' বলি, এই 'আমি' কে? ঐ যে মেরু আছে, আমি ঐ মেরু নহি; ঐ মেরুও আমার নহে। এই যে দৃশ্য জগৎ, ইহাও আমি নহি; এই জগৎও আমার নহে। এইরূপে—আমি পর্ব্বত নহি; এই সকল পর্ব্বতও আমার নহে। এই পৃথ্বীও আমি নহি এবং পৃথ্বীও আমার নহে। এই যে কিরাতরাজ্য আছে, ইহাও আমি নহি এবং এই রাজ্যও আমার নহে। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে অভিষেকাদি দ্বারা এখানে আমি রাজা; এইরূপ সঙ্কেত বা কল্পনা মাত্রেই এই দেশটা আমার হইয়াছে। নতুবা সত্যই কি এ দেশ আমার?—কখনই না। আমি এখন ঐ সঙ্কেত বা কল্পনা পরিত্যাগ করিলাম; সুতরাং আমি এ দেশের নহি, এ দেশ আমি নহি এবং এই দেশও আমার নহে। পূর্ব্বে যে যে পদার্থের নামোল্লেখ করিলাম, উহাদের একটীও আমি নহি। এক্ষণে অবশিষ্ট এই নগর, ইহাও আমি নহি; ইহাই স্থির নিশ্চয়। এই ত কত পতাকা, কত বনশ্রেণী, কত ভৃত্য, কত উদ্যানরাজি, এবং কত গজ, অশ্ব ও সীমান্তসমূহে এই পুরী সমাকুল রহিয়াছে। এই পুরীও ত আমি নহি এবং এই পুরীও আমার নহে। একটা অনর্থক সঙ্কেত ছিল, সেই জন্য আমার সহিত ঐ সকলের সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এখন আর সে সঙ্কেত নাই, তাহা চলিয়া গিয়াছে; সুতরাং ঐ সকল দৃশ্য পদার্থের সহিত আমার যে উল্লিখিতরূপ সম্বন্ধ ছিল, তাহা এখন ছিন্ন হইয়াছে। তার পর ভোগসমূহের কথা; কৈ সে সকলও ত আমি নহি বা আমার নহে। এই বিবিধ ভোগ ও এই সকল কলত্র, ইহাদের কিছুই আমি নহি বা ইহারাও আমার নহে। এইরূপে দেখিতে গেলে, এই যে ভৃত্য, বল, বাহন ও নগর-সমন্বিত রাজ্য আছে, এই রাজ্যও

আমি নহি এবং এই রাজ্যও আমার নহে। পূর্ব্বে যে সঙ্কেতের কথা কহিয়াছি, উহা কেবল অন্ধপরম্পরাক্রমে ব্যবহার-সিদ্ধ; বাস্তবিক উহা মিথ্যা বলিয়াই প্রতিপন্ন। এখন এই কর-চরণাদি-বিশিষ্ট দেহের বিষয় বিচার করিব। মনে এইরূপ উদয় হয় যে, বুঝি এই দেহই আমি। বাস্তবিকই এই দেহ আমি কি না? বিচারে দেখা যায়, এই দেহে যে অস্থি-মাংস আছে, তাহা আমি নহি। কেন না, আমি হইলাম,—সচেতন আর এই যে অস্থি-মাংসাদি, ইহা অচেতন। পদ্মপত্রে যেমন জল সংলগ্ন হয় না, তেমনি আমিও ঐ অস্থিমাংসাদির সহিত কোনওরূপে সংশ্লিষ্ট নহি। মাংস বল, অস্থি বল, রক্ত বল, এ সকল তো জড় পদার্থ; সুতরাং আমি এ সমুদায়ের কেহই নহি এবং ঐ সকলের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়াও আমি মনে করি না। এই যে হস্ত পদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়, এ সকলও আমি নহি; এবং ইহারাও আমার কেহই নহে। এই দেহের ভিতরে যত কিছু জড় পদার্থের অস্তিত্ব আছে, সে সকলও আমি নহি, এবং উহারাও আমার কেহই নহে। কেন না, 'আমি' হইলাম চেতন, আর উহারা হইল অচেতন। এই যে জড় ও অসৎ-স্বরূপ বুদ্ধীন্দ্রিয়, ইহাও আমি নহি এবং ইহাও যে আমার, তাহা নহে। এই ভোগ-সকলও আমি নহি এবং ইহারাও আমার কেহই নহে। মন সংসার-দোষের মূল; আমি সে মনও নহি, মনও আমার নহে। মন জড়স্বভাব; সুতরাং চেতন আমি, আমি তো মন হইতে পারি না। এই যে বুদ্ধি কিম্বা অহঙ্কারদৃষ্টি আছে, তাহাও আমি নহি বা আমার নহে। কেন না, ঐ দৃষ্টি ত মনেরই অবস্থাভেদ। এইরূপে দেহ হইতে মন ও বুদ্ধীন্দ্রিয়াবধি সমস্ত স্থূল-সূক্ষ্ম ভূতপ্রপঞ্চ তন্ন তন্ন করিয়া দেখিলাম, উহাদের মধ্যে কোন একটীও ত 'আমি' হইতেছি না। এক্ষণে আর যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা দেখিয়া একবার বিচার করা যাউক। দেখিতেছি এখন মাত্র অবশিষ্ট আছে,—জীব। জীব প্রমাতা, প্রমেয় সহ সে চেতিত হয়, তথাচ আমি ইহা চেতিত করিতেছি, এই বলিয়া সাক্ষী চৈতন্য কর্ত্তৃক প্রবোধিত হইয়া থাকে; সুতরাং সেই জীবকেও আত্মার তাত্ত্বিকমূর্ত্তি বলা যাইতে পারে না। কাজেই ঐ জীব যে আমি, তাহাও হইতে পারিলাম

না। এইরূপ যুক্তিবলে আমি এক্ষণে সাক্ষি-সম্বেদ্য প্রমিতি-প্রমেয় পরিত্যাগ করিলাম; কেন না, আমি যে চেত্য নহি, ইহা প্রসিদ্ধই বটে। তবে আমি কে? আমি সর্ব্বাবশিষ্ট নিখিল বিকল্প-রহিত বিশুদ্ধ চিদাকারেই অবস্থিত। অহো, কি আশ্চর্য্য! আমি এতকাল ধরিয়া যত যত্ন করিয়াছি, আমার সেই যত্নের ফল এতদিনে ফলিয়াছে। আমি পরম পুরুষার্থফলে ফলবান্ হইয়াছি। আমি যে চিৎস্বরূপ বৈ আর কিছুই নহি, তাহা এতদিনে জানিতে পারিয়াছি। আজ আমার আত্মলাভ হইয়াছে। আত্মলাভে আমি কৃতার্থ হইয়াছি। বুঝিয়াছি,—সেই অসীম অনন্ত আত্মাই আমি! আমি পরমাত্মস্বরূপ, আমার অন্ত কোথাও নাই। যেমন মুক্তামালার সূত্র প্রত্যেক মুক্তার সহিতই সম্বদ্ধ, এই ভগবান্ আত্মাও তেমনি, কি ব্রহ্মা, কি ইন্দ্র, কি যম, কি পবন, বা কি অপর ভূতবৃন্দ, সর্ব্বত্রই সম্বন্ধবান্ হইয়া অবস্থিত। চিৎশক্তি নির্ম্মল; কোনরূপ চেত্যব্যাধির সম্পর্ক তাঁহাতে নাই। এই চিৎশক্তিই বিরাট আকার ধারণ করিয়া অশেষ দিক্কুঞ্জ আপূরিত করত অবস্থিত। অন্যদিকে আবার ইনিই নিখিল ভাবের অনুগতা অতীব সূক্ষ্মা। পরন্তু ভাব কিম্বা অভাব বলিয়া কোন কিছুই তাঁহাতে নাই। আব্রহ্ম স্তম্বপর্য্যন্ত সমগ্র ভুবনের অভ্যন্তরেই তাঁহার অধিষ্ঠান। যত কিছু শক্তি আছে, সকলেরই ইনি পেটিকারূপিণী। যত কিছু সৌন্দর্য্য বা নিরতিশয় আনন্দ আছে, তৎসমুদায় দ্বারাই ইনি সুভগা বা পরিপূর্ণা। যত কিছু বস্তু আছে, তৎসমুদায়েরই প্রকাশ বিষয়ে ইনি যেন দীপশিখারূপে সমুদ্ভাসিতা। এই সমগ্র সংসার যেন মুক্তা-কলাপাকারে দেদীপ্যমান; ইনি তাহার সুবিস্তৃত তন্তুর ন্যায় শোভমান। যত প্রকার আকার-বিকার, সে সমুদায় দ্বারাই ইনি সমন্বিতা। অন্য দিকে আবার ইহাও সত্য যে, ইহাঁর কোনই আকার নাই বা বিকার নাই। ইনি সতত সর্ব্ব-ভূত-স্বরূপতা উপগত হইয়া আছেন এবং সর্ব্বদাই সর্ব্বভাব প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। ইনি চতুর্দ্দশ ভুবনোদরে চতুর্দ্দশবিধ ভূতবৃন্দ ধারণ করিয়া আছেন। এই চিৎশক্তিই জগন্ময়ী কলনা এবং ইনিই জাগতী বেদনাত্মিকা। এই জাগতিক সুখ-দুঃখ দশা চিৎশক্তির অসত্য আভাসমাত্র এবং এই চিৎশক্তিই নানাকারবিভাসিত

আত্মা। এই যে পরমা চিৎ, ইনিই আমার আত্মা এবং জগৎ-ব্যাপিয়া বিরাজমানা। এই চিৎই আমার বুদ্ধিসাক্ষী হইয়া অবস্থান করিতেছেন এবং ইনিই দ্রষ্টা ও দৃশ্যাদি নানাকার ধারণ করিয়া 'অহং রাজা' এইরূপ ভ্রান্তির উৎপাদিকা হইতেছেন। মন এই চিতের প্রসাদেই দেহরথে আরূঢ় হয়,—হইয়া সংস্কার-জাল-লীলায় গমন করে, বল্গিত হয় ও নৃত্য করিয়া থাকে। এই যে মন ও দেহাদি দেখা যাইতেছে, এ সকল বাস্তবিক কিছুই নহে। ইহারা সমস্তই ক্ষণবিনশ্বর; ইহাদের যদি নাশ হয়, তাহা হইলে কিছুই নষ্ট হইবে না। এই যে সাক্ষিরূপিণী চিৎশক্তি, ইনিই বুদ্ধিরূপিণী দীপ-শিখার সহায়তায় এই সমগ্র জগদ্ব্যাপী চিত্ত-নটের নৃত্যক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতেছেন! আহা, কি কষ্টের কথা! এতদিন প্রজাবর্গের প্রতি মৎকৃত অনুগ্রহ ও নিগ্রহ এই দুই বিষয় লইয়াই আমি এই দেহে অনর্থক চিন্তা করিয়াছি। আমার এই দেহনিষ্ঠ চিন্তা প্রকৃতই বৃথা হইয়াছিল; কেন না, এই দেহ ত কিছুই নহে। অহো! এক্ষণে আমি প্রবুদ্ধ হইয়াছি। আমার যে দুর্দৃষ্টি ছিল, তাহা ঘুচিয়া গিয়াছে। যাহা দ্রষ্টব্য, তাহা আমি দেখিয়াছি এবং যাহা প্রাপ্তব্য, তাহা আমি এই প্রাপ্ত হইয়াছি। এই যে জগজ্জাত যাবতীয় দৃশ্য দেখা যাইতেছে, ইহাতে চিন্মায়ার জীবভ্রম, তন্মধ্যে সপ্তদশ লিঙ্গদেহ ভ্রম, তন্মধ্যে বাহ্যিক অন্তঃকরণে ভেদ-ভ্রম এবং তাহার মধ্যে জাগ্রৎ-স্বপ্ন দৃশ্য ভ্রম,—এইরূপে ভ্রম-পরম্পরাই বিরাজিত; তদ্ব্যতীত অপর কোন নিত্য বস্তু নাই। যদি বিভাগ করিয়া বিচার করা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই ইহাতে নাই। এইরূপে জগতের মিথ্যাত্বই প্রতিপন্ন হয়; সুতরাং ইহাতে যে নিগ্রহ, অনুগ্রহ কিম্বা হর্ষ বিমর্ষ, কিরূপে কি আকারে কোথায় অবস্থিত আছে, তাহা ত বুঝিতে পারিতেছি না। এ সংসারে সুখ-দুঃখ কি?—কিছুই নয়; সকলই একমাত্র বিতত ব্রহ্ম। আমার এতদিন বৃথা মোহ ছিল, মোহের ঘোরেই সুখ-দুঃখের প্রসঙ্গ কল্পিত হইয়াছিল। আমি মোহ-মগ্ন ছিলাম। আমার ভাগ্য প্রসন্ন; তাই এখন সে মোহ আমার কাটিয়া গিয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মই সত্য; সুখ দুঃখ কিছুই নয়! ইহা এখন বুঝিতে পারিয়াছি। এই একাদ্বয় ব্রহ্ম পরমানন্দ-রূপেই অনুভূত

হইতেছেন। ইহাঁতে শোচ্য কি আছে, আর মোহের বিষয়ই বা কি আছে? অপিচ ইহাঁতে দর্শনীয়ই বা কি? করণীয়ই বা কি? স্থিতি-যোগ্যই বা কি? আর গমনীয়ই বা কি? ফল কথা, উল্লিখিত সমুদায়ের কোন কিছুই উহাতে সম্ভাব্য নহে। তবে কি আছে? —কি বটে সম্ভাব্য? এই একমাত্র অলৌকিক চমৎকার চিদাকাশই বিরাজমান রহিয়াছে! ইহারই অস্তিত্ব চির-সম্ভাব্য। অতএব হে নিস্তত্ত্ব! হে সুন্দর চিদাকাশ! আমার অপার ভাগ্য; তাই তোমাকে আমি অদ্য দর্শন করিতে পারিলাম। তোমায় আমার বারম্বার নমস্কার।

অহো! এতদিনে আমি সম্পূর্ণ প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার সম্যক্ জ্ঞানলাভ হইয়াছে। সম্যক্ জ্ঞানোদয়ের ফলে আমি অনন্ত হইয়াছি। আমি আমাকেই নমস্কার করিতেছি। আমি স্থির সুষুপ্তি-কলায় উপাধি অপগমে একীভূত হইয়া,—যাহা নিরঞ্জন ও নির্বিষয়ভাবে সমস্ত-ভব-ভ্রম-রঞ্জনা হইতে নির্ম্মুক্ত, তথাবিধ আত্মাতে আত্যন্তিক অভিন্ন-ভাবে বাস করি, কদাচ আমার আর বৈষম্যপ্রসক্তির সম্ভাবনা নাই।

উনষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৫৯ ॥

ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র যেমন স্বীয় বিবেক ও অধ্যবসায়গুণে ব্রহ্মণ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই হেমজটাধিপতি সুরঘু তেমনি এইরূপে নিজ বিবেকবলে অনুত্তম-পদ প্রাপ্ত হইলেন। দিনমণি যেমন নিয়তই দিনপরম্পরায় ভ্রমণ করেন,—করিয়াও কোনই ক্লেশানুভব করেন না, তেমনি ঐ সুরঘু রাজা বহুবার কোন কার্য্য করিয়াও যদি তাহার বিপরীত ফল প্রাপ্ত হইতেন, তথাচ সে জন্য তিনি কুণ্ঠিত, খেদান্বিত বা বিচলিত হইতেন না। সেই অবধি তিনি সতত বিগতজ্বর হইয়া রহিলেন। নদী-জল-প্রবাহের মধ্যে যদি কোন পর্ব্বত থাকে, তাহা হইলে সেই পর্ব্বত

যেমন সমভাবেই অবস্থিত হয়, জলের স্রোতোবেগে কিছুতেই বিচলিত হয় না, তেমনি সেই সুরঘু রাজা রাজোচিত অনুগ্রহ বা নিগ্রহ-ব্যাপারে সমানভাবেই অবস্থান করিতে লাগিলেন, কদাচ শোক বা হর্ষ-বিকার-প্রাপ্তি তাঁহার হইতে লাগিল না, তিনি হর্ষামর্ষ হইতে নির্ম্মুক্ত হইলেন,—হইয়া উদার ও গম্ভীরভাবে দৈনন্দিন স্বীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় সেই রাজা অক্ষুব্ধ গভীর জলধির শোভা ধারণ করিলেন। ফল কথা এই যে, তাঁহার হর্ষ বা অমর্ষের কারণ যদিও কখন উপস্থিত হইত, তাহা হইলেও তিনি জলধির ন্যায় গম্ভীরভাবে থাকিতেন। সে জন্য তাঁহার কোন বিকারোদয় হইত না। এইরূপে তিনি তাঁহার সুষুপ্ত ভাবাপন্ন জ্ঞানোজ্জ্বল, নিশ্চল চিত্তবৃত্তি দ্বারা বিরাজিত হইলেন, বোধ হইল, নিবাত-নিষ্কম্প উজ্জ্বল শিখায় প্রদীপ যেন বিদীপিত হইতে লাগিল। তিনি নির্দ্দয় নহেন, দয়ালু নহেন, সুখ বা দুঃখ-ভোক্তা নহেন, মৎসরী নহেন, সুধী নহেন, অসুধী নহেন, অর্থী নহেন বা অপ্রার্থী নহেন; অবিকল তিনি এমনই ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

তখন সুরঘু রাজার চিত্তবৃত্তি সর্ব্বদা সমদৃষ্টি, সর্ব্বদা অচঞ্চল, সর্ব্বদা ধীর ও সর্ব্বদা অন্তঃশীতল হইয়া রহিল। তিনি তথাবিধ চিত্তবৃত্তি দ্বারা পরিপূর্ণ অর্ণব ও সম্পূর্ণ কলান্বিত কুমুদবান্ধবের ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন। তদীয় বুদ্ধি তখন সুখ-দুঃখভাব হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হইল এবং সর্ব্বথা পরিপূর্ণ হইয়া শোভা পাইতে লাগিল। এই দৃশ্যমান, সর্ব্ববিশ্বই চিৎ-সঙ্কল্প; এইরূপ দৃষ্টি লাভে তাঁহার দেহ সমুল্লসিত ও চিত্ত বিকসিত হইল। তিনি কি উপবেশন, কি গমন, কি স্বপন, কি জাগরণ, সকল অবস্থাতেই সমাধিস্থের ন্যায় অবস্থিত হইয়া চৈতন্যে বিলয় পাইতে লাগিলেন।

এইরূপে সেই সরোজ-নয়ন সুরঘু রাজা অনাসক্ত-ভাবে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। ঐ অবস্থায় অক্ষত বা অভগ্ন-কলেবরে তাঁহার বহু শত বর্ষ অতিপাতিত হইল। অনন্তর এমন দিন আসিল, যে দিন তিনি স্বয়ং স্বীয় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। মনে হইল, রবি-কর-সম্পর্কে হিমবিন্দু যেন বিলীন হইয়া গেল। যিনি সর্ব্বজগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের কারণ, এমন কি ব্রহ্মাদিরও নিয়ামক, সেই পরমেশ পরব্রহ্মে তিনি জন্মাদির মূলবীজ

অবিদ্যার আবরণ উন্মোচন সহকারে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বৃত্তিতে বিলীন হইয়া গেলেন।—বোধ হইল, নদীজল যেন পরিপূর্ণ অর্ণবে গিয়া মিশিয়া গেল। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাকাশ যেমন মহাকাশে বিলয় পায়, তেমনি সেই মহাত্মা সুরঘু রাজা আনন্দৈকরস স্বপ্রকাশ বিমল আত্মায় বিলীন হইলেন। তাঁহার জন্মাদি বিকার তিরোহিত ও সর্ব্বশোক নিবৃত্ত হইল। তিনি ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া গেলেন।

ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬০ ॥

একষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে কমলদল-নয়ন, রঘুনন্দন! উল্লিখিত সুরঘু রাজার ন্যায় তুমিও তত্ত্ব-বোধ লাভ করিয়া শোক-হর্ষাদির মূলীভূত পাপ-তাপের মূলোচ্ছেদ করিয়া ফেলো এবং শোক-হীন হইয়া অদ্বন্দ্ব-পদ লাভ কর। ঘোর অন্ধকারে পড়িয়া শিশু যেমন সাতিশয় ভয়াবিষ্ট হয়, পরে যখন দীপালোক লাভ করে, তখন যেমন তাহার আর ভয়বিহ্বলতা থাকে না, মনও তেমনি গভীর অজ্ঞানান্ধকারে মগ্ন হইয়া নিতান্ত পরিতাপান্বিত হয়; অবশেষে যখন তত্ত্বদৃষ্টির অবলম্বনে আত্মালোক প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহার কোনই পরিতাপ থাকে না, সকল তাপই বিদূরিত হইয়া যায়। যে মন মোহান্ধকূপে পড়িয়া থাকে, সে যদি ঐ সুরঘু রাজার ন্যায় বিবেক-দশায় উপনীত হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই যেন তৃণসমষ্টি হস্তাবলম্বন পাইয়াই পরম নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইতে পারে। হে রাম! তুমি এই পাবনী বিবেক-দৃষ্টির আশ্রয় লও,—লইয়া পুনঃপুন পরিশীলন দ্বারা স্বয়ং উহা দৃঢ়ীকৃত করিয়া অপরকেও এইরূপই উপদেশ প্রদান কর এবং ভূতল ভূষিত করত এক-সমাধান হইয়া অবস্থান কর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আপনি যে মনের কথা কহিলেন, উহা ত দেখিতেছি, বাতাহত ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় অতীব চঞ্চল। ঐ

মন কিরূপে এক-সমাধান হইবে? এবং সেই এক-সমাধনতাই বা কাহাকে বলা হয়?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এ সম্বন্ধে আমি প্রবুদ্ধ দশায় উপনীত সুরঘু ও রাজর্ষি পর্ণাদের অপূর্ব্ব-সংবাদ বিবৃত করিতেছি, শ্রবণ কর। হে রাঘব! উক্ত উভয় ব্যক্তির আত্মা এক-সমাধানেই বোধিত হইয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহাদের পরস্পর যে কথোপকথন হইয়াছিল, তাহাই তোমার নিকট এক্ষণে বলিব।

পূর্ব্বে পারসীক দেশে পরিঘ নামে এক পরবীরঘাতী রাজা ছিলেন। হে রঘুনন্দন! নন্দন-কাননচারী কন্দর্পের সখা বসন্তের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সুরঘু রাজা সেই পরিঘরাজের পরম মিত্র ছিলেন। একদা প্রজাবর্গের পাপাচরণের ফলে পরিঘরাজের রাজ্যমধ্যে কল্পান্তকালের ন্যায় ঘোর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইল। সেই অনাবৃষ্টির প্রভাবে বহুসংখ্যক প্রজা ক্ষুধার্ত্ত হইয়া প্রখর দাব-দহন-পতিত প্রাণিবৃন্দের ন্যায় প্রাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। প্রজাপুঞ্জের তাদৃশ দারুণ দুঃখ দেখিয়া রাজা পরিঘ নিতান্ত বিষাদাপন্ন হইলেন এবং পথিক যেমন অগ্নিদগ্ধ গ্রাম পরিত্যাগ করে, তেমনি তিনিও দুঃখের সহিত অতি শীঘ্র স্বীয় রাজ্য পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার প্রজাবর্গ ক্ষয় পাইতেছিল, তিনি তাহার প্রতীকার করিতে সক্ষম হইলেন না; তাহাতে তাঁহার বৈরাগ্যোদয় হইল। তিনি অজিনাবৃত মহাতপস্বীর ন্যায় তপস্যার্থ বন-গমন করিলেন। রাজ্যৈশ্বর্য্যে তাঁহার বিরাগ জন্মিল। তিনি এক বহু দূরবর্ত্তী বনে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পুরবাসীরা সে বনের সন্ধান কিছুই জানিতে পারিল না। মনে হইল, রাজা পরিঘ বুঝি লোকান্তরে গিয়া বাস করিলেন। তিনি বনবাসী হইয়া শম-দমাদি গুণ-গণে মণ্ডিত হইলেন। বনমধ্যস্থ একটী কন্দর-মন্দির তাঁহার তপোনুষ্ঠানের স্থান হইল। তিনি তথায় থাকিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। বৃক্ষের স্বয়ম্পতিত বিশীর্ণ পক্ক পর্ণই তাঁহার আহার্য্য হইল। এই ভাবে তিনি কাল কাটাইতে লাগিলেন। পাবক যেমন শুষ্ক পর্ণ ভক্ষণ করে, তেমনি সেই রাজা বনে থাকিয়া শুষ্ক পর্ণ মাত্র আহার করিতে লাগিলেন; তাহাতে বনবাসী অন্যান্য তপস্বি-সমাজে তিনি পর্ণাদ

নামে পরিচিত হইলেন। সেই হইতে ক্রমশঃ জম্বুদ্বীপস্থ সমস্ত মুনি-সমাজেই তাঁহার পর্ণাদ নাম প্রখ্যাত হইল। তিনি রাজর্ষিপ্রবর পর্ণাদ নামেই পরিচিত হইলেন।

অনন্তর সহস্র বর্ষ যাবৎ পরিঘ রাজা ঘোর তপস্যা করিলেন। অভ্যাস-বশে তাঁহার চিত্ত-শুদ্ধি ও ঈশ্বরানুগ্রহ লাভ হইল; তাহার ফলে তিনি তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলেন। তখন তাঁহার শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বানুভব দূরীভূত হইল। সমস্ত আশা ক্ষীণ হইয়া গেল। তিনি শান্তচিত্ত হইলেন। তাঁহার বিষয়ানুরাগ নিরাকৃত হইল। তিনি নিরনুক্রোশ, প্রবুদ্ধবুদ্ধি ও জীবন্মুক্ত হইলেন।

হে সাধো! অলি যেমন মরাল সহ সরোজিনীর উপর বিহার করে, ঐ তপঃসিদ্ধ পরিঘ রাজাও সিদ্ধ ও সাধ্যগণ সহ তেমনি এই ত্রিলোকীরূপিণী মঠিকার উপর যথেচ্ছ বিচরণ করিতে লাগিলেন।

একদা ভ্রমণ করিতে করিতে পরিঘ রাজা পূর্ব্বোক্ত হেমজটাধিপতি সুরঘু রাজার রাজধানীতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখা গেল, ঐ রাজধানী রত্নরাজি দ্বারা রাজিত অপর এক সুমেরুশিখরবৎ মনোহারিণী। সুরঘু ও পরিঘ উভয়েই প্রাক্তন বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ। উভয়েই জ্ঞাতজ্ঞেয় এবং উভয়েই মূঢ়তার আধার সংসার হইতে নিষ্ক্রান্ত। বহু কালের পর দুই বন্ধুর পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। সাক্ষাৎ হইবা মাত্র উভয়ে উভয়ের সৎকার করিলেন এবং আদর আপ্যায়নের পর পরস্পর পরস্পরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন,—আহা! অদ্য আমার কল্যাণ-জনক পুণ্য কার্য্যের ফল ফলিল! আজ বহু দিনের পর তোমাকে দেখিতে পাইলাম। এই বলিয়া তাঁহারা পরস্পর পরম প্রহৃষ্ট হইলেন, পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিলেন,—করিয়া উভয়ে একাসনে উপবেশন করিলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া বোধ হইল, রবি শশী যেন একযোগে ভূধর-শিখরে সমারূঢ় হইলেন।

রাজা পরিঘ কহিলেন,—বন্ধু! অদ্য তোমার দর্শন পাইয়া আমার অন্তঃকরণ পরমানন্দে মগ্ন হইল,—বুঝি বা শুধাংশুবিম্বে মগ্ন হইয়াই একান্ত শীতল হইয়া উঠিল। যে পল্লল-প্রান্তবর্ত্তী তরুর মূল ছিন্ন হয় নাই,

তাদৃশ তরু যেমন শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তেমনি যাহাকে অকৃত্রিম প্রেম বলা যায়, সে প্রেম বিরহদশাতেও শত শত শাখায় সমন্বিত হইয়া বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ফল কথা, আমাদের উভয়ের প্রেম অকৃত্রিম; আমরা এতদিন পরস্পর বিযুক্ত থাকিলেও আমাদের সে প্রেম কিছু মাত্র হ্রাস পায় নাই; প্রত্যুত তাহা সবিশেষ উপচিতই হইয়াছে। হে সাধো! পূর্ব্বে তুমি যে আমার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিয়াছ, যে যে লীলা বিলাস প্রকাশ করিয়াছ এবং বারম্বার যে যে চেষ্টা দেখাইয়াছ, অদ্য সেই সেই পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ করিয়া আমি বাস্তবিকই পরম প্রহৃষ্ট হইতেছি। হে নিষ্পাপ! তুমি মাণ্ডব্য মুনির অনুগ্রহবলে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছ, আমিও পরম কারুণিক পরমাত্মার প্রসন্নতায় এক্ষণে জ্ঞান লাভ করিয়াছি। অধুনা জিজ্ঞাসা করি, তুমি সম্প্রতি সর্ব্বদুঃখ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছ ত? ভুবনাধিপতি দিনমণি যেমন সুমেরু-শৈলে বিশ্রাম লাভ করেন, তুমিও তেমনি সেই পরমকারণ পরমব্রহ্মে বিশ্রান্তি লাভ করিয়াছ ত? শরদাগমে সরসী-জল যেমন প্রসন্ন হইয়া উঠে, তেমনি তুমি এক্ষণে আত্মারাম হইয়া পরম কল্যাণাস্পদ হইয়াছ বলিয়া তোমার চিত্ত এখন প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে ত? অর্থাৎ তোমার মন এখন রজঃ ও তমোগুণ হইতে সম্পূর্ণ নির্ম্মুক্ত হইয়াছে ত? হে সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর লীলানিকেতন, নরনাথ! তুমি প্রসন্ন ও সর্ব্বত্র সুম অনস্ত দৃষ্টি অবলম্বন করিয়া তোমার অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্ম সকল সমাধা করিতেছ ত? ভবদীয় প্রজাবর্গ আধিব্যাধি হইতে নির্ম্মুক্ত আছে ত? তাহারা ধনধান্যশালী ও বিগতজ্বর হইয়া ধীর স্থিরভাবে স্বচ্ছন্দে বাস করিতেছে ত? তোমার অধিকারভুক্ত ভূমি শস্যাদি ফলবতী হইয়া ফলভার-নতা কল্পবল্লীর ন্যায় যথাকালে অভীষ্ট ফল প্রদানপূর্ব্বক ভবদীয় প্রজাপুঞ্জের পরিপোষণ করিতেছে ত? তোমার তুষারপুঞ্জাকার পুণ্য শীতল যশোরাশি সুধাংশুর অংশুরাজির ন্যায় দিগ্‌দিগন্তে বিচ্ছুরিত হইতেছে ত? মৃণালমধ্যবর্ত্তী ছিদ্র যেমন সরোবর-জলে পূর্ণ থাকে, তেমনি সমগ্র দিঙ্মণ্ডল তোমার গুণ-গরিমায় পরিপূর্ণ আছে ত? ভবদীয় অধিকারভুক্ত প্রত্যেক গ্রামে যে সকল শস্যশালী ক্ষেত্র আছে,

ঐ সকল ক্ষেত্রের কোণ-দেশস্থিতা শস্যরক্ষিণী কুমারীরা হৃষ্ট হইয়া তোমার আনন্দজনক যশোগাথা গান করিয়া থাকে ত? তোমার পুত্র, কলত্র, ভৃত্য, মিত্র, নগর ও ধন-ধান্যাদির মঙ্গল ত? তোমার এই দেহ-লতিকা আধিব্যাধি প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইয়া ঐহিক ও আমুষ্মিক পুণ্য ফল ধারণ করিতেছে ত? তোমার মন অধুনা আপাত-রম্য পরিণাম-বিরস বিষয়-বিষধরের প্রতি বিরক্ত হইয়াছে ত? আহা! বহু দিন হইয়াছে, আমরা উভয়ে বিযুক্ত হইয়া বাস করিতেছিলাম, এক্ষণে কালক্রমে পুনরায় বসন্ত ও শৈলকুঞ্জের সম্মিলনের ন্যায় আবার উভয়ে সম্মিলিত হইলাম। হে সখে! এ জগতে সংযোগ ও বিয়োগ-জনিত যত প্রকার সুখ-দুঃখ দশা আছে, বাঁচিয়া থাকিলে তৎসমস্তই অনুভব-গোচর হয়। যাহা হউক, আমরা এই দীর্ঘকাল ধরিয়া বিযুক্ত অবস্থায় বাস করিতেছিলাম, অদ্য আবার আমরা মিলিত হইতে পারিলাম। আহা, নিয়তির কি এই অপূর্ব্ব লীলা!

সুরঘু কহিলেন,—ভগবন্! ভগবতী নিয়তি ঈশ্বরেচ্ছারূপিণী; তাঁহার গতি সর্পগতির ন্যায় দুরবগাহা ও বিস্ময়াবহা। কে জানিতে পারে—এই নিয়তির গতি? আমরা বহুকাল ধরিয়া বহুদূরে বিযুক্ত হইয়া ছিলাম, এক্ষণে পুনরায় আসিয়া সম্মিলিত হইলাম। আমাদের এই বিচ্ছেদ ও মিলন-ঘটনা সেই অঘটনঘটন-পটু বিধাতা বা নিয়তিরই মহিমা। অহো! নিয়তির অসাধ্য কি আছে? হে মহাসত্ত্বনিধে! সকলেই আমরা সর্ব্বথা কুশলভাজন হইয়া অবস্থান করিতেছি। বিশেষতঃ আমরা অদ্য ভবদীয় আগমন-জনিত পুণ্যগুণে পরম পবিত্রতাই প্রাপ্ত হইলাম। জানিবেন,—আপনার আগমনে অদ্য আমাদের পাপক্ষয় হইল, আমাদের পুণ্যপাদপ এতদূর ফলবান্ হইয়া উঠিল যে, আমরা সকলেই সর্ব্ববিধ ব্যাকুলতা হইতে বিমুক্ত হইয়া কৃত-কৃত্য হইলাম। হে রাজর্ষে! আমার পুরে কোন বস্তুরই অভাব নাই। সমস্ত সম্পত্তিই এখানে অবস্থিত আছে। অদ্য আবার আপনার শুভাগমনরূপ অভ্যুদয় উপস্থিত হইল বলিয়া সে সকল শত শত শাখায় সুপ্রসারিত হইয়া উঠিল। হে মহানুভব! ভবদীয় পুণ্য মধুর সম্ভাষণ ও পবিত্র দর্শন অদ্য যেন সর্ব্বদিকেই

পীযূষধারা বিকিরণ করিল। বস্তুতঃ সাধুসঙ্গ পরমপদ লাভের সহিতই তুলনীয়।

একষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬১ ॥

দ্বিষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! এইরূপে তখন ঐ উভয় বন্ধুর পরস্পর স্নেহগর্ভ পূর্ব্বতন বিশ্রম্ভালাপ চলিতে লাগিল। ঐ প্রকার বাক্যালাপে তাঁহাদের অনেক কাল কাটিয়া গেল। অনন্তর রাজা পরিঘ, সুরঘু রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে ভূপতে! হে নির্ম্মলাশয়! এই সংসার-প্রবাহে পতিত হইয়া যে যে কর্ম্মই করা যাউক, আমি দেখিয়াছি, সমাহিত-চেতা ব্যক্তিরই তাহা সুখের হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন অপরের পক্ষে কর্ম্ম করিয়া প্রকৃত সুখ নাই। তাই জিজ্ঞাসিতেছি, যাহাতে সঙ্কল্প সম্পর্ক নাই, যাহা পরম বিশ্রান্তির নিকেতন ও পরম শান্তির অধিষ্ঠান, তুমি সেই সাংসারিক সর্ব্ববিধ সুখ অপেক্ষা শ্রেয়স্তর সমাধি সাধনার অনুষ্ঠান করিতেছ ত?

তখন রাজা সুরঘু প্রত্যুত্তরে বলিলেন,—হে ভগবন্! যাহাতে কোনওরূপ সঙ্কল্প-সম্পর্ক নাই এবং যাহা পরম উপশমের আস্পদ, তাহাই বটে শ্রেয়স্তর; আপনার এই উক্তিই যুক্তিসঙ্গত। আপনি এই কথাই আমাকে বলুন। পরন্তু সমাধি অনুষ্ঠিত হইতেছে কিনা, এ কথা আপনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন? হে মহাত্মন্! যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তিনি সতত তূষ্ণীম্ভাবেই থাকুন, আর ব্যবহার-নিষ্ঠ হইয়াই কালাতিপাত করুন, কখনও কি তিনি অসমাহিত-চিত্ত থাকেন? ফলে কস্মিন্ কালেও তাঁহার অসমাহিত-চিত্ততা নাই। যদি নিশ্চল আত্মস্বরূপে অবস্থিতিই আপনার মতে সমাধি হয়, তবে তাহা ত সর্ব্বদাই আছে; সুতরাং অনুষ্ঠেয় ত কিছুই নাই। দেখুন, যাঁহারা নিত্য প্রবুদ্ধ ও একমাত্র আত্ম-পরিনিষ্ঠিত,

তাঁহারা জাগতিক ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিলেও সর্ব্বদাই সমাহিতভাবে বিরাজিত। যাঁহার আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠা নাই, তিনি যদি বদ্ধ-পদ্মাসন হইয়া পরম ব্রহ্মের উদ্দেশে অঞ্জলি বন্ধন করিয়াও অবস্থান করেন, তথাচ তাঁহাকে সমাহিত আখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। অর্থাৎ আপনি যদি আমাকে অজ্ঞ মনে করেন; তাহা হইলেও সমাধির উপদেশ অনুপপন্ন হইয়া পড়ে। কেন না, যেখানে চিত্ত সমাধেয় হইবে, তাহার সহিত পরিচয়াভাবে কোন্ উপায়ে কিরূপ সমাধির সম্ভাবনা হইতে পারে? হে ভগবন্! যাহা সমস্ত আশারূপ তৃণসমষ্টির দাহকারী দহনস্বরূপ, তাহার নাম তত্ত্বজ্ঞান; সেই তত্ত্বজ্ঞানই সমাধি শব্দের বাচ্য। পরন্তু নিরন্তর তূষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করাই সমাধি নহে। হে সাধো! যাহা একাগ্রতার সহিত সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে দর্শন করিতে থাকে এবং যাহা নিত্যই সন্তুষ্টভাবে অবস্থিত, তাদৃশ পরম বুদ্ধিকেই বিজ্ঞগণ সমাধি আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। যাহাতে অহঙ্কার-সম্পর্ক নাই, যাহা সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্বভাবের অতীত এবং যাহা অক্ষুব্ধ সুমেরু শৈলের ন্যায় স্থির ধীর ভাবে অবস্থিত, তথাবিধ বুদ্ধিই সমাধি নামে নিরূপিত হইয়াছে। যে কালে মনোগতি চিরাভিলষিত পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত হয়, যখন এই জাগতিক প্রপঞ্চের প্রতি তাহার হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি থাকে না, এবং এই অবস্থায় সে যখন পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তখনই তাহাকে সমাধি নামে অভিহিত করা হয়। যে সময় হইতে মন আত্যন্তিক তত্ত্ব বোধ লাভ করে, তখন হইতেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তদীয় আত্মসমাধি প্রতিষ্ঠিত থাকে। এতাবতা ফল কথা এই যে, বর্ণিত প্রকার সকল অবস্থা আমার পূর্ব্বেই হইয়াছে; সুতরাং তাহার আর এখন অনুষ্ঠেয়তা নাই। খেলায় মত্ত বালকের হস্ত-স্থিত বিষতন্তুকে দূরে টানিয়া লইলে সে যেমন সহজে ছিন্ন হইয়া যায়, যে মন তত্ত্ববোধে অন্বিত, তাহা হইতে সমাধি সেরূপে কিছুতেই কখন ছিন্ন হইতে পারে না। দিনমণি যেমন সারা দিন আলোকদান করেন, কিঞ্চিৎকালের তরেও বিরত হন না, তেমনি তত্ত্ব-বোধে দৃঢ়তাপন্ন প্রজ্ঞাও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একটুকু কালের জন্যও তত্ত্বদর্শন হইতে বিরত হয় না। নদী যেমন অজস্র অম্বু বহন

করে, কদাচ তাহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তেমনি তত্ত্বদর্শী জন কিঞ্চিৎ কালের জন্যও স্বীয় তত্ত্ব-বোধ হইতে বিরত হইবার নহেন। কাল যেমন সর্ব্বদাই প্রবাহিত;—সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম সময়ের জন্যও তিনি স্বীয় ক্রিয়াগতি বিস্মৃত হন না, তেমনি প্রাজ্ঞবুদ্ধি জন অবিরত আত্মরতই থাকেন; কদাচ তিনি আত্ম-বিস্মৃত হন না। বায়ু যেমন সর্ব্বদা সর্ব্বত্র আপনার প্রবাহে বিরাজমান,—মুহূর্ত্তের জন্যও স্বীয় প্রবাহগতি বিস্মৃত হইতেছেন না, তেমনি যিনি প্রাজ্ঞধী, তিনি কখনই নিশ্চেয় চিৎস্বরূপ ভুলিয়া যান না; অনবরত তাহাতেই বিরাজ করিয়া থাকেন। কালের মূর্ত্তি রবি-শশি-প্রভৃতি সততই যেমন স্ব স্ব গতিক্রিয়া সম্পাদন করিতে থাকেন, চেত্য-সম্পর্ক-শূন্য চৈতন্যও তেমনি স্বীয় গতিবিধি নির্ব্বাহ করিতেছেন। অর্থাৎ তিনি কোনও কালের জন্য স্বাকার-বৃত্তি পরিত্যাগ করেন না। যে পদার্থের সত্তা নাই, তাহার যেমন উপলব্ধি হয় না, তেমনি যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তাঁহার আত্মজ্ঞান-বিরহের কিছুমাত্র অবসর আছে বলিয়া মনে করি না। এ সংসারে যেমন গুণহীন গুণীর অস্তিত্ব অসম্ভব, তেমনি আত্মজ্ঞান-বিরহিত আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিরও অস্তিত্ব সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। জানিবেন—সদাই আমি প্রবুদ্ধ, সদাই আমি নির্ম্মল, সদাই আমি শান্ত-স্বভাব এবং সদাই আমি সমাহিত। বস্তুতঃ অগ্নিতে উষ্ণতার ন্যায় আমাতে আত্মসম্বিত্তি সতত বিরাজিত; কদাচ তাহার বিচ্ছেদপ্রসক্তি নাই। আমি সর্ব্বদাই সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতেছি। কে কিরূপে আমার সেই সমাধি ভেদ ঘটাইতে সক্ষম হইবে? আমার সমাধি আত্মস্বরূপ হইতে অপৃথগ্ভূত; সুতরাং আমি সর্ব্বদা সৎস্বরূপেই বিরাজিত। কাজেই বুঝিতে হইবে, মদীয় মন কখনই অসমাধিময় বলিয়া অভিহিত হইতে পারে না। অথবা আমি ত নিয়তই একাদ্বয় আত্মতত্ত্ব; সুতরাং আমার ত মনই নাই। আমার আবার সমাধি-সংস্থান কি? আত্মা সর্ব্বদা সর্ব্বথা সর্ব্বগামী ও সর্ব্বস্বরূপ; সেই হেতু কাহাকেই বা সমাধি বলি, আর কাহাকেই অসমাধি মধ্যে গণ্য করা যায়? মহাত্মাদিগের ভেদবুদ্ধি একেবারেই নাই। তাঁহারা সর্ব্বত্রই সমভাবাপন্ন ও কার্য্যপরিণামের বিভাগ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া অবস্থিত। কাজেই বলা যায়, সমাহিত ও অসমাহিত এবম্বিধ ভেদবোধক ভবদীয় বাক্য-ভঙ্গীর

সঙ্গতি হইবে কিরূপে? অতএব আমার মতে ঐরূপ ভেদপ্রবৃত্তি সর্ব্বথা অনুপপন্নই বটে।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬২ ॥

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

পরিঘ বলিলেন,—হে রাজন্! সত্যই তুমি প্রবুদ্ধ হইয়াছ। যথার্থই তুমি শীতলান্তঃকরণ প্রকৃতই তোমার পরম পদ-প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। যাহা আনন্দমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, হইয়া পূর্ণেন্দুর ন্যায় বিরাজ করিতেছ। তুমি শীতল হইয়াছ, তথাবিধ পরমোত্তম লক্ষ্মীর তুমি আস্পদ হইয়াছ। তুমি স্নিগ্ধ হইয়াছ, মধুর হইয়াছ,—হইয়া রাজীববৎ বিরাজ করিতেছ। তুমি বিমল, বিতত, পরিপূর্ণ, গম্ভীর ও প্রকটাশয় হইয়া—বেলানিল-হিল্লোল-মুক্ত উক্ত নিখিল গুণযুক্ত জলধির সাদৃশ্য ধারণপূর্ব্বক বিরাজিত হইতেছ। তোমার অহং-মেঘ চলিয়া গিয়াছে; তাই তুমি স্বচ্ছ হইয়াছ,—অপার আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়াছ,—পরিস্ফুট হইয়াছ,—বিস্তীর্ণ হইয়াছ ও গম্ভীর হইয়াছ,—হইয়া শারদ গগনের ন্যায় বিলসিত হইতেছ। তুমি সর্ব্বত্রই লক্ষিত হইতেছ। সর্ব্বত্র সর্ব্ববিষয়েই তুমি পরিতুষ্ট হইয়া রহিয়াছ। তুমি বিষয়সমূহে বীতরাগ হইয়াছ। হে রাজন্! সর্ব্বত্রই তুমি বিরাজ করিতেছ। তুমি তোমার মহতী ধীশক্তিবলে সার, অসার, সম্যক্ বিচার করিয়াছ,—করিয়া এই দৃশ্যপ্রপঞ্চ সকলই যে এক অখণ্ড ব্রহ্ম, তাহা তুমি বুঝিতে পারিয়াছ। তুমি ভাব ও অভাব বিষয়ের বিচার করিয়া তত্ত্বজ্ঞ ও মুদিতাশয় হইয়াছ। আরোহ ও অবরোহ দশার প্রযোজক ভোগানুরাগ হইতে যে চাঞ্চল্য উৎপন্ন হয়, ভবদীয় দেহ এক্ষণে তদ্বিরহিত হইয়া আনন্দময়রূপে বিরাজিত হইতেছে। হে সৌম্য! অম্বুধির অভ্যন্তরে অমৃত আছে বলিয়া সে যেমন পরিতৃপ্ত থাকে, তেমনি যাহা হইতে আর পরম বস্তু নাই, সেই আত্মপদেই তুমি আপন মহত্ত্বে তৃপ্ত হইয়া রহিয়াছ। তোমার আর কখন ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই।

সুরঘু কহিলেন,—এ সংসারে এমন বস্তু কিছুই নাই, যাহা আমাদের নিকট উপাদেয় বলিয়া প্রতীত হইতে পারে। এই যে কিছু দৃশ্য পদার্থ দেখা যাইতেছে, প্রকৃত পক্ষে ইহাদের কিছুই কিছু নহে। কাজেই যখন উপাদেয় বস্তুই কিছু নহে, তখন হেয় বস্তুই বা কি? বা কাহাকে বলা যাইতে পারে? উপাত্ত বিষয়ের বিসর্জ্জনই হেয়তা; হেয়তার প্রতিকূল উপাদেয়তা; অপিচ হেয়তাবলেই উপাদেয়তার নাশ হয়। পরন্তু উপাদেয়তা বিনাই বা হেয় বলিয়া কাহাকে নির্দ্দেশ করা যায়? যাবতীয় ভাব বস্তুর হেয়তা ও উপাদেয়তা হেতু মদীয় মনের যে হেয় বা উপাদেয় ব্যবস্থা, তাহা বহু দিন হইতেই নাই। দেশ-কালবশে প্রথমে যাহা হেয় থাকে, পরে তাহা উপাদেয় হয় আবার পূর্ব্বে যাহা উপাদেয় থাকে, তাহাও পরে হেয় হইয়া থাকে। এইরূপে হেয়োপাদেয়তার নিয়ম-ব্যত্যয় দেখিয়া বিজ্ঞগণের পক্ষে বস্তুর নিন্দা বা স্তুতি কিছুই করা কর্ত্তব্য নহে। লোকে যে স্তুতি ও নিন্দা প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা রাগবশতই হইয়া থাকে। ইহা চিরপ্রসিদ্ধই আছে যে, একের প্রতি অনুরাগবশে তাহার স্তুতি আর অপরের প্রতি অনুরাগহেতু তাহার নিন্দা করা হয়। যাহাকে রাগ বলা যায়, তাহা বাঞ্ছিত বস্তুর প্রতিই হইয়া থাকে। যাঁহার সুবুদ্ধি বা প্রশস্ত বুদ্ধি আছে, তিনি মহা বস্তুরই বাঞ্ছা করিয়া থাকেন। এই ত্রৈলোক্যে যে সকল রমণী আছে, রম্য রম্য শৈল, সরিৎ, সাগর ও বনরাজি আছে, এমন কি যত কিছু প্রাণী আছে, সমস্তই অসার; প্রকৃত পক্ষে ঐ সমুদায়ে সার কিছুই নাই। এই যে মাংস-অস্থি ও কাষ্ঠ-মৃত্তিকাদিময় জীর্ণ জগৎ বিদ্যমান, প্রকৃত বাঞ্ছনীয় বস্তু ইহাতে কিছুই নাই। ইহা একান্তই শূন্য পদার্থ; সুতরাং ইহাতে কিসের বাঞ্ছা করা যায়? বা কোন বস্তুই বা বাঞ্ছনীয় আছে? যেমন দিবসশ্রীর অপগমে আলোক ও আতপের অবসান ঘটে, তেমনি বাঞ্ছা বিনিবৃত্ত হইয়া গেলে রাগ ও দ্বেষেরও অবসান ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, এই বিষয়ে বচন-রচনা আর অধিক পল্লবিত করিয়া কি হইবে? স্থির সিদ্ধান্ত ইহাই বটে যে, একমাত্র আত্মদৃষ্টিই যথার্থ সুখের হেতুভূত; সুতরাং সেই আত্মদৃষ্টির সেবা করা অবশ্যকর্ত্তব্য। মন যখন একেবারেই রাগ-রহিত হয় এবং যাবতীয় বিক্ষেপবৈষম্য তাহার ঘুচিয়া

যায়, তখনই সে আত্মানন্দ লাভ করিয়া থাকে এবং সেই আত্মানন্দ লাভ করিতে পারিলেই তাহার অনুত্তম-পদে প্রতিষ্ঠাপ্রাপ্তি হয়।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত॥ ৬৩॥

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! এইরূপে এই জগৎ যে একটা ভ্রমমাত্র বা ভ্রমেরই খেলা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তদ্ব্যতীত অন্য সকলই মিথ্যা, ইহাই বিচারালোচনায় স্থির করিয়া সেই সুরঘু ও পরিঘ রাজা পরস্পর পরস্পরের প্রতি আদর আপ্যায়ন করত পরস্পর পরম পরিতুষ্ট হইলেন এবং পরে উভয়েই স্ব স্ব ব্যাপার সমাধা করিবার জন্য গমন করিলেন।

হে রাঘব! এই সেই তত্ত্ববোধ-প্রতিপাদক সংবাদ তুমি শ্রবণ করিলে; এক্ষণে ইহা শ্রবণ করিয়া এইরূপ তত্ত্ববোধ-বলেই তুমি যথাযথ লব্ধাস্পদ হইয়া থাক। বিজ্ঞদিগের আধ্যাত্মবিচারের ফলে প্রজ্ঞাশক্তি তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত হয়; সেই প্রজ্ঞার প্রভাবে হৃদাকাশ হইতে অহঙ্কাররূপ কাল মেঘ কাটিয়া যায়। এই কাল মেঘ কাটিয়া গেলেই তখন চিত্তরূপ শরৎকাল আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই চিত্ত-শরৎ সকলেরই অভিমত, সকলেরই হৃদয়াহ্লাদ-কর, নির্ম্মল, বিতত ও সর্ব্বথা সফলতা-প্রাপ্ত। যখন চিত্ত-শরতের অভ্যুদয় হয়, তখন সেই একমাত্র শরণ্য, সুগম, সকলানন্দময় স্বচ্ছ চিদাকাশরূপ পরমাত্মায় যে জন একমাত্র আত্মবিচারে নিরত হন,—হইয়া বাহ্য বিষয়ানুরাগ ভুলিয়া যান এবং নিত্য সেই একাদ্বয় চিত্তের অনুসন্ধানেই তৎপর থাকেন, তিনি মনোজনিত শোকে কখন অভিভূত হন না, তাদৃশ শোকে তাঁহার কদাচ কোনই বাধা জন্মাইতে পারে না। এ হেন সাধুজন যদি ব্যবহার-পরায়ণ হন, তবে মূঢ় লোকের চক্ষে তিনি রাগ-দ্বেষে পরিপূর্ণ বলিয়া পরিদৃষ্ট হইলেও যেমন কমলদলে

জল-সংলগ্ন হয় না, তেমনি তাঁহার অন্তরেও রাগ,দ্বেষ-জনিত কলঙ্ক-কালিমা লিপ্ত হইবার নহে। যিনি যথাযথ ভাবে আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছেন,—হইয়া শুদ্ধ ও শান্তমনা মুনি হইয়া অবস্থান করিতেছেন, মাতঙ্গ যেমন মৃগেন্দ্র-জয়ে সক্ষম হয় না, তেমনি সেই মনও তাঁহাকে আয়ত্ত বা বশীকৃত করিতে পারে না। তত্ত্ববিদের চিত্ত সতত সুনির্ম্মল। নন্দনবনে যেমন নিন্দনীয় তরু নাই, তেমনি যাহা একমাত্র বিষয়রসেই রসিক হইয়া দীনদশায় উপনীত, এরূপ চিত্ত তত্ত্ববিদের থাকিতেই পারে না। বিশদার্থ এই যে, যিনি তত্ত্ববিদ্, তাঁহার চিত্ত কখনই ক্ষুদ্র বিষয়-সুখের লালসায় স্পৃহা রাখে না। এ সংসারে দুঃখময় ব্যাপারে মানবের যখন বিরাগ উপস্থিত হয়, তখন জরা আসিয়া আক্রমণ করুক বা মৃত্যু আসিয়াই গ্রাস করিয়া ফেলুক, সে জন্য যেমন সেই বিরক্ত ব্যক্তির কোনই দুঃখ হয় না, তেমনি চিত্ত যখন এই দেহাদি নিখিল দৃশ্যপ্রপঞ্চকে অবিদ্যা বা ভ্রান্তির বিলাস বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন সে আর দুঃখের ধার ধারে না,—দুঃখ কি, তাহা তাহার অনুভবের বিষয়ই হয় না।

হে সাধুশীল! যিনি মনের মোহমহিমা বুঝিতে পারিয়াছেন, এই জাগতিক ব্যবহারে তিনি কর্ত্তৃত্ব করিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমান বশতঃ পাপ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। বস্তুতঃ নির্ম্মল গগনতলে কখন ধূলি স্পর্শ হইতে পারে কি? এই অবিদ্যাময় জগৎ প্রকৃতই বিষম ব্যাধির ন্যায় প্রতিভাত; এ ব্যাধির মহৌষধ কি? উত্তরে বলা যায়, প্রদীপ যেমন তিমির নাশের প্রশস্ত উপায়, তেমনি এই জগৎ একটা মিথ্যা অবিদ্যা বা ভ্রান্তিমাত্র, এইরূপ জ্ঞানই ঐ বিষম ব্যাধির অমোঘ ঔষধ। স্বপ্নাবস্থায় ভোগ বিলাসে বিভোর হওয়া যায়; কিন্তু যখন জানা গেল যে, উহা স্বপ্নের খেলা; তখন যেমন ঐ ভোগবিলাস অকিঞ্চিৎকর বা মিথ্যা হইয়া যায়, তেমনি এই যে জগৎপ্রপঞ্চ, ইহা যখন অবিদ্যা বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, তখনই মিথ্যা বা অলীকরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। একমাত্র ব্রহ্মেই যাঁহার মতি একাগ্রতার সহিত অবস্থিত, তথাবিধ বাহ্য সংসার-ব্যাপারে অসক্তিহীন সাধু—মীনের নেত্র যেমন জলস্পৃষ্ট হয় না, তেমনি কখনই পাপলিপ্ত হন না। দীপ্ত চিদালোক প্রাপ্ত হইলে অজ্ঞান-

যামিনীর যখন অবসান হয়, জীব তখন তত্ত্বজ্ঞ হইয়া থাকে, তাহার বুদ্ধি তখন পরমানন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। অজ্ঞাননিদ্রার উপশম হইলে লোক যখন জ্ঞান-দিনমণির উদয়ে প্রবোধ প্রাপ্ত হয়, তখন তাহার সেই প্রবোধ এরূপ হইয়া থাকে যে, তাহাতে আর পুনরায় তাহাকে মোহ-মগ্ন হইতে হয় না। আত্মস্বরূপ সুধাকর হইতে যৎকালে হৃদাকাশে চিদাকার জ্যোৎস্না প্রকাশ পায়, তখনই তাহার প্রকৃত জীবন লাভ হইয়া থাকে এবং তাহার যে কিছু ক্রিয়া-কলাপ, তৎসমস্ত তখনই সফল হইয়া আনন্দ উৎপাদন করে। চন্দ্রমা যেমন নিজ সুধায় নিজে শীতলতা প্রাপ্ত হন, মোহোত্তীর্ণ মানবও তেমনি সর্ব্বদা আত্মচিন্তাবলে স্বীয় অন্তরে শীতল-ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। যাহাদের সহায়তা গুণে বৈরাগ্য সহ চিত্তের আত্মাকার বৃত্তিরূপ অভ্যুদয় লব্ধ হয়, তাহাদিগকেই যথার্থ মিত্র বলা যায়। ঐরূপ সাহায্যকারীদিগকেই প্রকৃত শাস্ত্র এবং তাহাদিগকেই প্রকৃত দিবস-মধ্যে গণনা করা হয়। যাহাদের পাপ ক্ষয় হয় নাই, যাহারা আত্মতত্ত্ব দর্শনে অবহেলা করে, তথাবিধ দীন জনগণ জন্ম-জঙ্গলের লতাস্বরূপ; চিরকালই তাহাদিগকে শোক করিতে হয়।

হে রাম! এই সংসারস্থ জীবরূপ বলীবর্দ্দ-দল শোকোচ্ছ্বাসে যতই পতিত হউক, কিম্বা জরা প্রভাবে যতই জর্জ্জরিত হউক, উহারা আশাপাশে আবদ্ধ হইয়া বহুল দুঃখভার বহন করিতে করিতে বিষয়-শস্পের লীলায় জন্ম-জঙ্গলে বিচরণ করিতে থাকে। সর্ব্বাঙ্গ উহাদের কুকার্য্য-কর্দ্দমে আলিপ্ত হয়। সেই অবস্থায় উহারা মোহ-পল্বলে অবগাহন করিতে থাকে। তৃষ্ণারজ্জু উহাদিগকে বাঁধিয়া রাখে; বিষয়ানুরাগরূপ দংশকুল সতত উহাদিগকে দংশন করিতে থাকে। ঐ জীব-বলীবর্দ্দ দল মনোরূপ বণিকের ভবনে অবস্থান করে। উহারা বন্ধুজন-রূপ বন্ধনে এমনই আবদ্ধ যে, উহাদের চলিবার ক্ষমতা নাই। উহারা পুত্র ও কলত্রাদিরূপ জরাজীর্ণ গোময়-পঙ্কে সর্ব্বদা মগ্ন ও উন্মগ্ন হইয়া থাকে। সর্ব্বদাই উহারা শ্রান্ত-ক্লান্ত; উহাদিগের বিশ্রাম কিছু মাত্র নাই। উহারা ভবাটবীর দীর্ঘ পথে নিয়ত যাতায়াত করিয়া থাকে; তাহাতে উহাদের দেহ পরিক্ষীণ বা ভগ্ন হইয়া পড়ে। শীতল ছায়ায় বিশ্রাম লাভ উহারা কখনই করিতে

পারে না; সর্ব্বদাই তীব্র তাপে তাপিত হইয়া থাকে। বাহ্যিক আকারে ঐ সকল বলীবর্দ্দ দেখিতে বিলক্ষণ সুন্দর, কিন্তু উহাদের অন্তর অতি কদর্য্য। উহারা কাম্য কর্ম্মের প্ররোচক অর্থবাদরূপ ঘণ্টারবে আক্রান্ত, চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়গণের বাহনভূত এবং দুষ্কৃতসমূহের তাড়নায় অভিভূত। আবির্ভাব ও তিরোভাবরূপ শকটভার বহনেই উহাদিগকে কালাতিপাত করিতে হয়। উহাদিগের পরিশ্রমের অবধি নাই। উহারা শ্রমভরে অবসন্ন-দেহে অজ্ঞানরূপ উৎকট অটবীমধ্যে বিলুণ্ঠিত হইতে থাকে। ঐ জীব-রূপী বলীবর্দ্দ দল একান্তই অকিঞ্চন; উহারা সর্ব্বদা স্বার্থ সাধনে মগ্ন হইয়া অবশেষে কর্ম্মভারে অবসন্ন হইয়া পড়ে এবং করুণকণ্ঠে চিৎকার করিয়া কাল কাটাইতে থাকে।

রামচন্দ্র! এই জীবরূপ বলীবর্দ্দ-দলকে সংসার পঙ্কিল হইতে উদ্ধার করিতে হইলে বহু দিন ধরিয়া বহু যত্ন ও বিশেষ বল প্রয়োগ করিতে হয়। এ কার্য্যে তত্ত্বদৃষ্টিরই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। যখন তত্ত্ব দর্শনের ফলে চিত্ত ক্ষয় সংঘটিত হয়, তখন আর ঐ জীব জন্ম গ্রহণ করে না। সে এই সংসাররূপ মহার্ণব হইতে তৎকালে উদ্ধার পাইয়া যায়। হে রাঘব! জানিয়া রাখ, নাবিক জনের নৌকা যেমন পারাবারের পরপার-গমনের এক মাত্র উপায়, তেমনি তত্ত্বজ্ঞ সাধু জনের সম্পর্কই ভবাব্ধি-লঙ্ঘনের অদ্বিতীয় সহায়। যথায় স্নিগ্ধ চ্ছায়াময় সকল-তত্ত্বজ্ঞ সজ্জন-পাদপ নাই, তাদৃশ মরুপ্রায় দেশ কখনই বুধগণের বাসযোগ্য নহে। হে রাম! স্নিগ্ধ শীতল বাক্য যাহার পত্ররাজি, স্মিতরূপ কুসুম-সমূহে যাহা সমুজ্জ্বল ও সুচ্ছায়, তাদৃশ সজ্জনরূপ চম্পক পাদপের আশ্রয় লইতে পারিলে ক্ষণমাত্রেই পরম বিশ্রাম লাভ করিতে পারা যায়। যিনি ধীমান্, যাঁহার কিছু মাত্র বিবেকোদয় হইয়াছে, এ সংসারে সুপ্ত অবস্থায় থাকা তাঁহার কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। তাঁহার জানিয়া রাখা উচিত, এ সংসারে বিশ্রান্তির লেশ মাত্র নাই; ইহা মহামোহ-জনিত উপতাপ-দানে সদাই ব্যাপৃত। সুতরাং আত্মবিশ্রান্তির জন্যই সতত তাঁহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আত্মাই আত্মার বন্ধু; আত্মার সাহায্যেই আত্মাকে উদ্ধার করিতে হয়। দেহাভিমান বড় বিষম গর্ব্ব; তাদৃশ গর্ব্বভরে

আত্মাকে কখন জন্ম-পঙ্কময় অর্ণবে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য নহে। এই দেহাধীন দুঃখের স্বরূপ কি প্রকার, কোথা হইতে কিরূপে ইহার উৎপত্তি হইল, এ দুঃখের মূল কোথায় রহিয়াছে, কোন্ উপায় অবলম্বন করিলে এই দুঃখকে ক্ষয় করা যায়, প্রাজ্ঞগণের সবিশেষ যত্নের সহিত এ সকল বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যাঁহারা আত্মাকে উদ্ধার করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হন, ধন বল,—মিত্র বল,—অধ্যাত্ম শাস্ত্র ভিন্ন অন্য কোন শাস্ত্র বল, বা অপরাপর বন্ধু-বান্ধব বল, কেহই তাহাদের কোনই উপকারে আইসে না। যদি একমাত্র সদাসঙ্গী বিশুদ্ধ মনোরূপ সুহৃদের সহিত বিচার করিতে প্রবৃত্ত হওয়া যায়, তাহা হইলেই আত্মার উদ্ধার সাধন সহজে হইয়া থাকে। বৈরাগ্যের অভ্যাস করিয়া যত্নের সহিত আত্মবিচার করিতে হয়; তাহা হইলে তত্ত্বদৃষ্টিরূপ পোতের সাহায্য পাওয়া এবং তাদৃশ পোত সাহায্য প্রাপ্ত হইলেই ভব-পারাবার হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়। আত্মা ভবার্ণবে মগ্ন হইয়া সর্ব্বদা দুরাশায় দগ্ধ হইয়াছে; তাহাতেই তাহার শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে। এরূপ দশায় পতিত আত্মার প্রতি অবজ্ঞা করা কাহারও উচিত নয়; বরং যত্নের সহিত তাহার উদ্ধারের চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই জীবরূপী হস্তী অহঙ্কারস্তম্ভে তৃষ্ণারজ্জু-যোগে আবদ্ধ রহিয়াছে, এবং মনোমদময় জন্মপঙ্কে মগ্ন হইয়াছে; ইহাকে পঙ্ক হইতে উদ্ধার করা নিতান্তই বিধেয়।

হে রঘুনন্দন! আত্মার পরিত্রাণ করাই প্রধান কর্ত্তব্য। যদি অজ্ঞানকে নিরাস করিয়া অহঙ্কারকে মার্জ্জিত করিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলেই আত্মার পরিত্রাণ করা হইয়া থাকে। মনোজালের অপসারণ ও অহম্ভাবের ছেদন, এই দুইটী কার্য্য করিতে পারিলেই আত্মা পরমাত্মার বোধাবধি বিচারে প্রকট পরিদৃষ্ট হইয়া উঠেন। এই দেহকে যদি কাষ্ঠ-লোষ্ট্রের ন্যায় অসার বলিয়া জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলেই পরমেশ পরমাত্মা দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া থাকেন। 'অহং'-মেঘ সরিয়া গেলে ঐ চিদাদিত্য দৃষ্টিগোচর হন। তাহার পর যখন ঐ চিদাদিত্যরূপে পরিণত হইতে পারা যায়, তখনই তৎপদ প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যখন অন্ধকারের উচ্ছেদ ঘটে, তখন যেমন আপনা হইতেই আলোক দর্শন হয়, তেমনি অহঙ্কার

যখন চলিয়া যায়, তখন আপনা হইতেই আত্মসাক্ষাৎকার লাভ সংঘটিত হয়। অহঙ্কার ক্ষয় পাইলে যে এক অপার আনন্দময়ী দশা উপস্থিত হয়, তাদৃশ পরিপূর্ণাকৃতি দশার সেবা করা অতি যত্নের সহিতই কর্ত্তব্য। মনে হয়, ঐ দশা পরিপূর্ণ অর্ণবের ন্যায়; অথবা সে যে কি অপূর্ব্ব দশা,—তাহা বাক্যের গোচরীভূত নহে। কোন একটা উপমা দিয়া ঐ দশার বিষয় বুঝাইয়া দিবার উপায় নাই; উহা নিরুপম। কোনরূপ দৃশ্য-রঞ্জনার অনুধাবন উহার নাই। ঐ দশা কেবল চিৎপ্রকাশের অংশ-কলারূপে স্থিরভাবে অবস্থিত। যখন তুরীয় দৃষ্টি লাভ হয়, তখনকার সেই অবস্থার সহিতই উহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে। ঐ দশা আকাশশ্রীর ন্যায় বিশাল ও পূর্ণ-স্বরূপ, বিক্ষিপ্ত ভাবের অভাবাংশে সাদৃশ্য আছে বলিয়া বলিতে পারা যায়, একমাত্র সুষুপ্ত ব্যক্তিরই ঐ দশা ঘটিয়া থাকে। যখন মন লয় পায় ও অহঙ্কারের অবসান ঘটে, তখন—যিনি সর্ব্বভাবের অন্তরে অনুস্যূত, সেই পরমানন্দময়ী পরম ঐশী তনু সমুদিত হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! ঐ যে পরম ঐশী তনুর কথা কহিলাম, উহা স্বীয় যোগ-বলেই সিদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ তনু কেবল সুষুপ্ত ব্যক্তিদিগেরই সন্নিহিত, উহা বাক্যাতীত; পরন্তু স্বীয় হৃদয়মধ্যেই উহার অনুভূতি হয়। মোদক-খণ্ডাদির স্বরূপ বা স্বাদ কি, তাহা যেমন নিজের অনুভূতি ব্যতীত জানিবার উপায় নাই, তেমনি আত্মার যে প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা আপন অনুভূতি ভিন্ন বুঝিতে পারা যায় না। ফল কথা এই যে, যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্তই অনন্ত আত্মতত্ত্ব বৈ আর কিছুই নয়। যখন চিত্ত হইতে বাহ্য বিষয় সকল উপশমিত হইয়া যায়, চিত্ত তখন সুদৃঢ়ভাবে প্রত্যগাত্মায় পরিণামী হইয়া উঠে। ঐ সময়ই যিনি নিখিল চরাচরের প্রত্যগ্‌ভূত ও চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রকাশসাক্ষী পরমাত্মা, তিনি নিজেই সাক্ষাৎ আবির্ভূত হন। অনন্তর সমস্ত বিষয়-বাসনার অবসান হয়; তৎপশ্চাৎ যাহা পরম পুরুষার্থস্বরূপ স্বীয় আত্মা, সতত পূর্ণভাবে তাঁহার অনুভব সুসিদ্ধ হইয়া উঠে। তৎপরে কি সমাধি, কি অসমাধি, সকল অবস্থাতেই সমতা সমুদিত হয়; তন্নিবন্ধন আত্যন্তিক বৈষম্য ঘুচিয়া যায়; তখন একমাত্র পরমানন্দরূপেরই পরিণতি হইয়া থাকে। তখনকার সেই

চরম অবস্থা যে কি অপূর্ব্ব, কি চমৎকার, তাহা ব্রহ্মাদিরও চিন্তার অবিষয়ীভূত এবং বাক্য ও মনের অতীত।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৪ ॥

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে কমলাক্ষ! 'অহং' 'মম' ইত্যাদি ভাব পরিত্যাগ করিয়া যদি মনের সাহায্যে মনের উচ্ছেদ সাধনপূর্ব্বক আত্মাকে অবলোকন করা না হয়, তাহা হইলে এই জগৎ-দুঃখের আর অবসান হয় না,—চিরকালই রহিয়া যায়; ফলে, চিত্রিত ভাস্করের ন্যায় কস্মিন্ কালেও উহা অস্তগমন করে না। ক্রমশঃ এই যে মেঘের ন্যায় কিম্বা প্রগাঢ় অন্ধকারের ন্যায় শ্যামবর্ণ সুবিশাল সংসারবর্ষা, ইহা মহাসাগরের ন্যায় অগাধ হইয়া উঠে এবং বারম্বার দুঃখ-তরঙ্গ-পরম্পরার কারণ হইয়া কেবল দুঃখ-তরঙ্গ-মালাই বিস্তার করিতে থাকে। এই বিষয়ে একটী প্রাচীন ইতিহাস উল্লিখিত হইয়া থাকে। এই ইতিহাস সহ্য শৈলের সানুদেশবাসী ভাস ও বিলাস নামক দুই সুহৃদের বৃত্তান্ত-ঘটিত।

এই ভারতবর্ষে সহ্য নামে এক ত্রিলোকজয়ী পর্ব্বত আছে। ঐ পর্ব্বতের ঊর্দ্ধগত ঔন্নত্যে আকাশ আক্রান্ত হইয়াছে, উহার উপত্যকা ভূতলকে অভিভূত করিয়াছে এবং তলভাগের উৎকর্ষে পাতাল পরাজিত হইয়াছে। ঐ সহ্যাচলের উপরিভাগে কত যে পুষ্পিত পাদপ রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না এবং উহা হইতে কত যে নির্ম্মল জলবাহী নির্ঝর নিঃসৃত হইয়াছে, তাহারও সংখ্যা করা দুরূহ। ঐ পর্ব্বতে যে সকল নিধি আছে, গুহ্যকগণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত রহিয়াছে। উহার স্থানে স্থানে কত শত মণিপ্রভা বিকীর্ণ আছে, ঐ সকল প্রভা প্রখরতাহেতু দুর্নিরীক্ষ্য হইয়াছে। সুর-কুঞ্জরের গণ্ডস্থল যদি মুক্তামালায় মণ্ডিত ও ভানু-কিরণে উজ্জ্বল হয়, তাহা হইলে ঐ কুঞ্জরের যেমন শোভা হইয়া থাকে, তেমনি ঐ গিরির তটদেশের নানাস্থানে রাশি রাশি মুক্তা বিক্ষিপ্ত

রহিয়াছে এবং ভাস্বর ভানু-কিরণে উহার সুবর্ণ তটদেশ ভাস্বর হইয়াছে; তাহাতে ঐ সহ্যগিরি সমধিক শোভা পাইতেছে। উহার কোন কোন স্থানে রাশি রাশি পুষ্প বিকীর্ণ রহিয়াছে, কোন কোন স্থান গৈরিক ধাতুসমূহে সুশোভিত হইতেছে, কোথাও কোথাও কত কত সরোবর আছে, সেই সকল সরোবর বিকসিত কুসুমসমূহে সমুদ্ভাসিত হইতেছে, এবং কোথাও কোথাও বা রত্নরাজি-রাজিত শিলাতট শোভা পাইতেছে। ঐ গিরির একদিকে নির্ঝর-নীর-নিপতনের ধ্বনি শুনা যাইতেছে; অপর একদিকে বেণুপুঞ্জের পরস্পর সংঘর্ষনাদ শ্রুতিগোচর হইতেছে; অন্য দিকে কন্দর-নির্গত সমীর-শব্দ সমুত্থিত হইতেছে এবং উহার কোন কোন দিকে মধুকরকুলের গুন্‌গুন্ গুঞ্জন কর্ণগোচর হইতেছে। সেই সহ্য শৈলের সানুদেশে অপ্সরাদিগের সঙ্গীতনাদ শুনা যাইতেছে; বনাভ্যন্তরে কত পশু পক্ষী বিবিধ রব করিতেছে; উহার অধিত্যকায় বারিদবৃন্দ গর্জ্জন করিতেছে; উহার উপরিতন আকাশদেশে বিহঙ্গমেরা নানা রব তুলিয়া ভ্রমণ করিতেছে, কমলাকরসমূহে ভ্রমরগণের গুঞ্জনধ্বনি শুনা যাইতেছে; উহার পর্য্যন্ত ভূভাগে যে সকল কিরাতজাতি বাস করে, তাহাদিগের গীতরব উত্থিত হইতেছে এবং বিহঙ্গমদিগের গীতনাদে তত্রত্য বনদ্রুমরাজি মুখরিত হইতেছে। ঐ গিরির গুহামধ্যে বহু বিদ্যাধর বাস করিতেছে। উহার ঊর্দ্ধ দেশে দেবগণ, পাদমূলে মানবগণ এবং পাতাল-বিবরে নাগগণ বাস করিতেছে। উহার কন্দরে কন্দরে সিদ্ধসমূহের আশ্রম এবং অভ্যন্তর ভাগ বহুবিধ রত্নের আকর। সেই গিরিবরে যে সকল চন্দনতরু আছে, তাহাতে বহু সর্পের বাস এবং তথাকার শিখরাগ্র-গুলি সিংহসমূহের নিবাস স্থল।

এইরূপে ঐ গিরি যেন দ্বিতীয় জগদাগারের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। উহা অগণিত পুষ্পিত পাদপে পাণ্ডুরাভা ধারণ করিয়াছে। উহার নানাস্থান অধঃপতিত পুষ্পপুঞ্জরূপ মেঘমালায় সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে এবং বৃক্ষাবলী হইতে সদ্যঃপতিত কুসুমসমূহের অন্তরীক্ষস্থ পরাগপুঞ্জরূপ মেঘমালায় ঐ গিরি যেন পাংশুময় হইয়াছে। উহার কোন কোন স্থল পতমান পুষ্পরাজিরূপ মারুতান্দোলিত মেঘবৃন্দে সমাবৃত রহিয়াছে।

উহার মধ্যে মধ্যে এমন বহু স্থান আছে, যাহা গৌরিকাদি ধাতুসমূহের ধূলিপুঞ্জে কপিলাভা ধারণ করিয়াছে। উহার কোন কোন স্থানে নানা রত্নময় শিলা আছে; পুরনারীগণ তদুপরি অবস্থান করিতেছে, তদ্দর্শনে বোধ হয় যেন মন্দার-শাখা-বিহারিণী সুর-পুরনারীগণ প্রতিভাত হইতেছে। ঐ গিরির নানা স্থান-স্থিত মেঘরূপ নীলাম্বর ও নিঃশব্দ রত্নালঙ্কার-ধারিণী হেমরম্যাকৃতি শিলারাজি যেন গিরিশিখরচারিণী অভি-সারিকা কামিনীদিগের ন্যায় বিরাজ করিতেছে। উহার উত্তর-তটে এক রমণীয় সানুপ্রদেশ আছে। সেই প্রদেশ কত ফলভার-নম্র তরুনিকরে সমাকুল ও স্বর্গাপেক্ষা নয়নাহ্লাদ-প্রদ। সেই সানুদেশে যে রত্ন-খচিত পুষ্করিণী আছে, উহার ঊর্দ্ধভূমি হইতে প্রবাহিত নির্ঝর-নীর আসিয়া তৎসমুদায়ে পতিত হইতেছে। ঐখানে কত চূতদ্রুম ও চূত-লতিকা আছে, তাহা হইতে কত পুষ্পস্তবক নিম্নতলে নিপতিত হইতেছে। সেই সকল পতিত পুষ্পপুঞ্জে ঐ দেশ যেন কিঞ্চিৎ উন্নত হইয়া উঠিয়াছে। সেই গিরিবরের তটদেশে কত অঙ্কোল, কত পুন্নাগ ও কত অসংখ্য উৎপল উৎফুল্ল রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ব্রততিরাজি প্রসর্পিত হইয়া দিবাকর দেবকে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। স্থানে স্থানে যে সকল রত্ন আছে, তাহাদের প্রভাপটলে বহু স্থান ভাস্বর হইতেছে। কোন কোন স্থানে প্রচুর জম্বুফল-রস নিঃসৃত হইয়া নদীর আকারে বহিয়া যাইতেছে। এইরূপে ঐ গিরিপ্রদেশ এতই চমৎকার যে, উহা স্বর্গবাসীদিগেরও সর্ব্বথা আহ্লাদ-জনক হইয়াছে।

সেই শৈল-সানুদেশে অত্রিমুনির পবিত্র আশ্রম বিরাজমান। শ্রান্ত সিদ্ধগণ ঐ আশ্রমে স্ব স্ব শ্রম অপনোদন করিয়া থাকেন। ঐ পুণ্যাশ্রম স্বর্গের ন্যায় এতই রম্য ও এতই সুখাবহ যে, সময়ে সময়ে উহাকে শিব-লোক বা ব্রহ্মলোক বলিয়াই মনে হইয়া থাকে।

পুরাকালে একদা ঐ মহাশ্রমে দুইজন তত্ত্বজ্ঞ তপস্বী বাস করিতেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া আকাশস্থ শুক্র ও বৃহস্পতি বলিয়া ভ্রম হইত। একদা সেই একাশ্রমস্থ তাপসদ্বয়ের দুইটী সুন্দর পুত্র জন্মগ্রহণ করে। সেই পুত্রদ্বয়কে দেখিয়া মনে হয়, যেন দুইটী কমল হইতে দুইটী ফুল্ল কোরক

প্রাদুর্ভূত হইল। যেমন তরুলতা হইতে নির্গত পল্লবদ্বয় ক্রমশঃ দীর্ঘ হইয়া উঠে, তেমনি সেই তাপসদ্বয়ের পুত্র দুইটীও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঐ দুই তাপস-নন্দনের মধ্যে একের নাম বিলাস এবং অপরের নাম ভাস। তাপসকুমারদ্বয় পরস্পর সুস্নিগ্ধ ও পরস্পার পরস্পরের সুহৃৎ ও বল্লভ হইয়া উঠিল। তাহারা তিল ও তৈলের ন্যায় অথবা পুষ্প ও সৌরভের ন্যায় পরস্পার আশ্লিষ্টভাবে এক সঙ্গে বাস করিতে লাগিল। সেই দুই পুত্র-সম্পন্ন তাপসদ্বয় পরস্পর নিতান্ত অনুরক্ত ও অবিযুক্তভাবে দম্পতির ন্যায় মহাসুখে কাল কাটাইতে লাগিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের সৌহার্দ্দ এতই প্রগাঢ় হইয়াছিল যে, তাহা দেখিয়া ধারণা হইত যেন উভয়ের একই মন দুই ভাগে বিভক্ত রহিয়াছে। যেমন মুকুলিত কমলদল মধ্যে দুইটী মধুকর বাস করে, তেমনি সেই তাপসদ্বয় তাদৃশ অভিন্ন-হৃদয়ে প্রফুল্লভাবে সেই আশ্রম উজ্জ্বল করিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এই ভাবে কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইল। অনন্তর কালক্রমে সেই তাপসদ্বয়ের প্রিয়তম নবকুমার দুইটী রবি-শশীর ন্যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া শৈশবের সীমা অতিক্রমপূর্ব্বক যৌবনসীমায় পদার্পণ করিলেন। কঠোর কালপরিণামে ক্রমে তাঁহাদের পিতৃদ্বয় জরাভারে জর্জ্জরিত হইলেন। অনন্তর অল্পকাল মধ্যেই তাঁহারা দেহভার পরিহারপূর্ব্বক স্বর্গধামে গমন করিলেন। তখন মনে হইল, দুইটী বিহঙ্গ যেন কুলায় ছাড়িয়া আকাশে উড়িয়া গেল।

এইরূপে সেই উভয় ঋষিকুমারেরই পিতৃদ্বয় পরলোক প্রাপ্ত হইলেন। তখন পিতৃবিয়োগে উভয় কুমারই দীন দশায় উপনীত হইয়া একেবারে উৎসাহ-হীন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা জলোদ্ধৃত কমলের ন্যায় বড়ই সন্তপ্ত ও পরিম্লান হইতে লাগিলেন। অনন্তর যথাকালে উভয়ে উভয়ের পিতার ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া সমাধা করিয়া কতই না বিলাপ আরম্ভ করিলেন।

হে মানদ! অনন্তর সেই উভয় ঋষিকুমার একান্ত শোকাচ্ছন্ন ও ব্যথিত হইয়া করুণকণ্ঠে বহুকাল ধরিয়া বিলাপ করিলেন,—করিয়া অবশেষে

মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। এই অবস্থায় তাঁহাদের সর্ব্বচেষ্টা চলিয়া গেল কিছু কাল তাঁহারা চিত্র-লিখিতের ন্যায় মহাসুখে অবস্থান করিলেন।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৫ ॥

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম ! অরণ্যস্থ পাদপ যেমন নিদাঘকালীন দাবানলে বিশুষ্ক হইয়া যায়, তেমনি সেই একান্ত শোকাভিভূত তাপস-কুমারদ্বয় দুঃখ-সন্তাপে বড়ই বিশুষ্ক হইয়া গেলেন। তখন বনমধ্যস্থ যূথভ্রষ্ট হরিণ-যুগলের ন্যায় তাঁহারা একেবারেই অসহায় ও নিরুপায় হইয়া পড়িলেন। সেই অবস্থায় তাঁহাদের সংসারাসক্তি কমিয়া গেল। তাঁহারা আসক্তিহীন হইয়া বিরক্তভাবে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

অনন্তর দিনান্তে দিন, মাসান্তে মাস ও বৎসরান্তে বৎসর, এইরূপ করিয়া তাঁহাদের বহুকাল অতীত হইয়া গেল। ক্রমশঃ তাঁহারা গভীর গর্ত্ত-জাত পাদপের ন্যায় জরাভারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িলেন। জরাজীর্ণ-দেহে কিয়ৎকাল তাঁহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থান করিলেন; কিন্তু তখনও তাঁহারা অমল আত্মতত্ত্ব জ্ঞান প্রাপ্ত হইতে পারেন নাই।

একদা তাঁহারা উভয়ে মিলিত হইলেন,—হইয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি বলিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে অগ্রে বিলাস কহিলেন,—ওহে আমার একান্ত বন্ধু ভাস! তুমি মদীয় হৃদয়গত অমৃতের অম্বুধিস্বরূপ। আমি তোমায় আমার জীবনরূপ প্রধান পাদপের ফল বলিয়াই মনে করি। তোমার এক্ষণে শুভাগমন হউক। হে সাধো! বল,—তুমি এত কাল আমার সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া কোথা ছিলে? কোথায় এতদিন অতিবাহিত করিয়াছ? তোমার তপস্যা সফল হইয়াছে ত? তুমি অধুনা আত্মবান্ হইয়াছ ত? তোমার বুদ্ধি বিস্তর হইয়াছে ত? তুমি কৃতবিদ্য হইয়াছ ত? অর্থাৎ তোমার বিদ্যার ফল ফলিয়াছে ত? তুমি কুশলী আছ ত?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বিলাস সংসারে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তখনও তাঁহার পরম আত্মতত্ত্ব-লাভ ঘটে নাই। তিনি বন্ধুবর ভাসকে উল্লিখিতরূপে সম্ভাষণ করিলে, ভাস তাঁহাকে সাদরে বলিলেন,—হে সাধো মানদ! অদ্য তোমাকে দেখিতে পাইলাম বলিয়া প্রকৃতই আমার এ আগমন শুভ হইয়াছে। পরন্তু আমরা সংসারে থাকি; আমাদের আবার প্রকৃত কুশল কোথায়? যাবৎ না জ্ঞাতজ্ঞেয় হইতে পারি, যে পর্য্যন্ত না চিত্ত জন্য কাম-ক্রোধাদি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং যাবৎ না এই সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিতেছি, তাবৎ আমার কুশলসম্ভাবনা কোথায়? যত দিনে না এই চিত্ত জন্য আশা সকল অশেষ প্রকারে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তত দিনের মধ্যে আর আমাদের কুশল আছে কৈ? যেমন দাত্র দ্বারা লতাজাল ছেদন করা হয়, তেমনি যত দিনে না এই চিত্তজন্য আশারাশিকে সমূলে সমুৎপাটিত করা হয়, তত কালের মধ্যে আর আমাদের কুশলসম্ভাবনা কোথায় আছে? যে পর্য্যন্ত না জ্ঞান লাভ করিতে পারিতেছি, যতদিনে না সম্যক্ তত্ত্ব বোধ সমুদিত হইতেছে এবং যতকালে না সমতার আবির্ভাব ঘটিতেছে, ততকালের মধ্যে আর আমাদের কুশল আসিবে কোথা হইতে?

হে সাধো! যতক্ষণে না আত্মলাভ ঘটে এবং যতদিনে না জ্ঞান-মহৌষধ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এই সংসাররূপিণী দুষ্ট বিসূচিকা ততদিন পর্য্যন্তই পুনঃ পুন আভির্ভূত হইতে থাকে। এই সংসার একটা কুপাদপ বিশেষ; শৈশব ঐ কুপাদপের অঙ্কুর, নব যৌবন উহার পল্লব এবং জরা উহার কুসুমরূপে সমুদ্ভাসিত হইতেছে। কত বার যে ঐ পাদপ জন্মিতেছে, তাহার ইয়ত্তা করা সহজ নহে। এই দেহরূপ জীর্ণ বৃক্ষ হইতে পুনঃপুন মৃত্যুরূপিণী মঞ্জরী বিকাশ পাইতেছে। জরাকার কুসুমরাশি উহার শোভা সম্পাদন করিতেছে। বন্ধুবান্ধবগণের ক্রন্দনধ্বনি ঐ মঞ্জরীর ভ্রমর-গুঞ্জনের ন্যায় প্রতীত হইতেছে। এই সংসার বাসের ফলে এইরূপ ঘটে যে, এই নীরসপ্রায় বর্ষপরম্পরা বার বার বৃথাই চলিয়া যায়। বিরস বলিলাম কেন? তাহার কারণ এই যে, মরণের পর দুষ্কৃত কর্ম্মের ফলে নরকে বা তির্য্যগ্‌যোনি প্রভৃতিতে উপগত হইয়া নিরন্তর অনন্ত দুঃখপরম্পরাই ভোগ করিতে হয়। দৈবাৎ যদি কিঞ্চিৎ সুকৃত কর্ম্মের ফলে স্বর্গধামে

উপনীত হওয়া যায়, তাহা হইলেও তথায় পুণ্যসঞ্চয় করিবার অনধিকার নিবন্ধন পূর্ব্বসঞ্চিত পুণ্যের ক্ষয়, হর্ষ, অমর্ষ, অসূয়া ও কামাদি দোষের বাহুল্য, শমদমাদির অসম্ভাবনায় জ্ঞানেরও দৌর্লভ্য এবং কেবল ভোগ-লম্পটতা হেতু পুনঃপুন পূর্ব্বোপভুক্ত বিষয়সমূহেরই অনুভূতি হয় বলিয়া অভিনব বিষয়ের অভাব, এই সকল কারণেই বর্ষপরম্পরা পুরাতনপ্রায় দিবসসমূহেই পরিপূর্ণ; কাজেই উহারা নীরসরূপেই অতিবাহিত হইতেছে। এই যে মানব জন্ম, ইহাতেও দেহ-শৈলের ক্রিয়া-পরম্পরারূপিণী মহাগুহায় বিলুণ্ঠিত হইতে হয়। ঐ ক্রিয়াগুহা বিষয়ভোগরূপ হিংস্র জন্তুগণে সমাকীর্ণ এবং তৃষ্ণারূপ কণ্টকজালে সমাবৃত। ফলে, ইহাতেও আত্ম-বিবেকের সম্ভাবনা সুদূর-পরাহত। কত শুভ, অশুভ, দীর্ঘ, অদীর্ঘ, দুঃখ ও সুখলেশের আকারে ক্রমাগত দুঃখজালেই অপর্য্যাপ্ত আগমাপায় কাল-সকল অতিপাতিত হইতেছে। প্রাণিগণ ব্যর্থ কর্ম্মে লিপ্ত হইয়া,—কদাশায় মুগ্ধ হইয়া তুচ্ছাতিতুচ্ছ কর্ম্মপরম্পরায় কেবলই স্বীয় আয়ুঃক্ষয় করিয়া ফেলিতেছে। মন মত্তমাতঙ্গের ন্যায় পরমাত্মরূপ বন্ধনস্তম্ভ উন্মূলিত করত তৃষ্ণারূপিণী করিণীর প্রতি লালসাবশে উন্নিদ্র হইয়া বহু দূর-দূরান্তরে ধাবিত হইয়া থাকে। এই কলেবররূপ তরুনীড় হইতে চিন্তামণি পতিত হইতেছে; আর ঐ কায়তরুর হৃদয়নীড়ে নিরন্তর লোভরূপ বৃদ্ধ গৃধ্রই জিহ্বাচাপল্যে লগ্ন হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছে। এই নীরস নিঃসুখ লঘু দিনাবলী জীর্ণ পর্ণরাশির ন্যায় বৃথা বিগলিত হইয়া যাইতেছে। এই সকল দিনক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে কতই না কোমল দেহের অবসান হইতেছে। বৃদ্ধা-বস্থায় মানবের মুখশ্রী পুত্র-কলত্রাদি-কৃত অপমানরূপ ধূলিজালে ধূসরিত হইয়া হিম-হত কমল-কান্তির ন্যায় পরিম্লান হইয়া যায়। তখন দেহের শোভা কিছুই থাকে না; সকলই বিলুপ্ত হইয়া যায়। যখন যৌবন-জলের অপগমে কলেবররূপ সরোবর শুষ্ক হইয়া যায়, তখন তাহার আয়ুরূপ রাজহংস একটুকু কালও অপেক্ষা করে না, তথা হইতে তৎক্ষণাৎ পলায়ন করিয়া থাকে; আর যে সে ফিরিয়া আসিবে, তাহারও সম্ভাবনা থাকে না। এই জীর্ণ জীবনতরু কালরূপ বায়ুবেগে বিধুত হওয়ায় ইহা হইতে ভোগরূপ পুষ্প ও দিবসরূপ পত্ররাজি অনবরত অধোদিকে

নিপতিত হইয়া থাকে। যাহা ভোগ-ভুজঙ্গের ও দুঃখ সমূহের আশ্রয় স্থল, তথাবিধ মোহান্ধকাররূপ কূপে ও পুরমধ্যে মন সদাই নিমগ্ন হইতেছে। মানুষের তরল তৃষ্ণা বিবিধ বিষয়রাগে রঞ্জিত হইয়া দেবমন্দিরাদির উচ্চ চূড়ায় উত্থাপিত পতাকার ন্যায় অতি দূরেই আরোহণ কৃতান্তরূপ মূষিক এই অনন্ত-কালরূপ গর্ত্তে বসিয়া দং জীবিতাশারূপ সূত্রসমষ্টি ছেদন করিয়া ফেলিতেছে। এই জীবন একটী নদীর ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। যৌবন অবস্থা ঐ নদীর উন্নত ঊর্ম্মির ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে, অসিধারার ন্যায় প্রখর ক্রোধাদি উহার ফেনপুঞ্জের ন্যায় দৃষ্ট হয়, এবং লোভ ও তৃষ্ণা প্রভৃতি উহার বিশাল আবর্ত্তাকারে বিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই সংসারস্থ লোকদিগের ক্রিয়াপরম্পরাও নদীর ন্যায় প্রবহমাণ হইতেছে; শিল্প, তর্ক ও নীতি প্রভৃতি কলা সকল এবং জাগতিক যাবতীয় ব্যবহার ঐ নদীর কল্লোলের ন্যায় সকলকে আকুল করিয়া চলিয়া যাইতেছে। এ নদীর অন্ত নাই; ইহা জন্মে জন্মে এমনই ভাবে প্রবাহিত হইতেছে। এই অনন্ত কাল যেন এক অতলস্পর্শ সাগর; এ সাগরের গভীর গর্ভে কত যে লোক, অনন্ত বন্ধু-বান্ধব সহ অজস্র নিপতিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। এই দেহরূপ রত্ন-শলাকা মরণরূপ পঙ্কিল পয়োধির অভ্যন্তরে জন্মে জন্মে কোথায় যে মগ্ন হইয়া যায়, তাহা পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। অম্বুনিধির আবর্ত্তে পড়িয়া তৃণ যেমন ঘূর্ণমান হইতে থাকে, কুকর্ম্মাসক্ত চিত্ত তেমনি সতত চিন্তাচক্রে বদ্ধ হইয়া নিয়তই ঘূর্ণন করিয়া থাকে। অগণিত কার্য্যরূপ মহোর্ম্মি-মালায় আরোহণ করিয়া এবং চিন্তা-চর্চ্চায় নর্ত্তিত হইয়া চিত্ত কখন একটুকু কালের জন্যও বিশ্রান্তি-লাভে সমর্থ হয় না। 'ইহা করিয়াছি, ইহা করিতেছি, এবং ভবিষ্যতে উহা করিব' এই প্রকার কল্পনা-জালে বুদ্ধিরূপিণী বিহগী জড়িত হয়,—হইয়া মূর্চ্ছিতাবস্থায় কালাতিপাত করে। এই আমার মিত্র, আর ঐ আমার শত্রু, এই প্রকার বিবাদ-রূপ মহামাতঙ্গ আমার নীলোৎপল-নিভ কোমল মর্ম্মস্থল একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। চিন্তা-নদীর মহান্ আবর্ত্তে ও তরঙ্গ-ভঙ্গে পতিত হইয়া মানুষের চিত্তরূপ চপল মীন ক্ষণমধ্যেই বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। আত্মায় যাহাদের সংস্পর্শ মাত্র নাই,

সংসারের লোক সকল অনাত্ম দেহাদি নিমিত্ত এবম্বিধ বহুল দুঃখ আত্ম-বুদ্ধিতে সঞ্চয় করিয়া বৃথাই দীন দশা ভোগ করিতেছে। এই লোক সকল বহুল সুখ-দুঃখের মধ্যেই বাস করিয়া থাকে। ইহারা জনন-মরণরূপ বিশাল বাত্যায় রুগ্ন ভগ্ন হইয়া এই জগন্মণ্ডল-রূপ শৈলমধ্যে বিলুণ্ঠিত হইতেছে,—হইয়া শুষ্ক পর্ণের ন্যায় জর্জ্জরাবস্থায় চূর্ণ হইয়া যাইতেছে।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৬ ॥

সপ্তষষ্টিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! উল্লিখিত প্রকারে তাঁহারা উভয়ে পরস্পর কুশল প্রশ্ন করিয়া সংসারের অসারতা-বিষয়ক বহু আলোচনা করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে কালক্রমে তাঁহারা বিমল জ্ঞান লাভ করেন এবং পরে মোক্ষ পদ প্রাপ্ত হন।

হে মহাবাহো! আমি তোমাকে এই জন্যই বারম্বার বলিয়া আসিতেছি যে, পাশবদ্ধ চিত্তের বন্ধন মোচন করিয়া জ্ঞান লাভ ব্যতীত সংসার-তরণের উপায়ান্তর নাই। এ সংসারের দুঃখ অনন্ত হইলেও বিবিক্তমতি মানবের নিকট উহা যৎসামান্য বলিয়া প্রতীত হয় এবং তাদৃশ মানব অনায়াসেই উহার উচ্ছেদ করিতে পারেন। ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্রতম খগের নিকট অম্বুনিধি দুস্তর হয় বটে, কিন্তু সর্পশত্রু বৈনতেয়ের নিকট উহা গোষ্পদের ন্যায়ই প্রতীয়মান হইয়া থাকে। দর্শক যেমন দূর হইতে জনতা নিরীক্ষণ করে, তেমনি যাঁহাদের দেহাভিমান নাই, তথাবিধ মহা-পুরুষেরাই চিন্মাত্র আত্মায় অবস্থান করিয়া দূর হইতে দেহ দর্শন করেন; ফল কথা, এই যে, তাঁহারা দেহ হইতে বহু দূরেই অবস্থান করিয়া থাকেন। এই দেহ যদি দুঃখভরে অত্যধিক ক্ষুব্ধ হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমাদের তাহাতে ক্ষতি কি আছে? যদি পুরাতন রথ ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা হইলে সারথির তাহাতে ক্ষতি হয় কি?

রঘুরাজ! মন যদি ক্ষুব্ধ হয়, তাহা হইলে চিত্তত্ত্বের তাহাতে কোন ক্ষতি আছে কি? জল তাহার তরঙ্গাদি নিখিল বিকারভাবে আলোড়িত হয় হউক, তাহাতে জলধির পূর্ণ স্বভাবের কোন প্রচ্যুতি ঘটে কি? ফলে জলধির যে পূর্ণতা, সেই পূর্ণতাই থাকিয়া যায়। একটুকু চিন্তা করিয়া দেখ, জলে হংস থাকিলেও তাহার সহিত হংসের সম্বন্ধ কি? জলের সহিত শিলার সম্বন্ধই বা কি? অপিচ শিলা সহ কাষ্ঠের সম্বন্ধই বা কি? এইরূপ বিচার করিয়া দেখ, এই যে সকল ভোগ্য বিষয়, এতৎসমুদায়ের সহিতই বা পরমাত্মার সম্বন্ধ কি? হে শ্রীমন্! আরও দেখ, সাগরগর্ভে যদি শৈল থাকে, তাহা হইলেই বা তাহার সহিত সাগরের সম্পর্ক কি? এইরূপে ভাবিয়া দেখ দেখি, পরমাত্মা ও সংসার এই উভয়ের মধ্যে আবার সম্বন্ধ আছে কি? নদী তাহার উৎসঙ্গে পদ্মদল ধারণ করে বটে, কিন্তু নদীর তাহারা কে? এইরূপে বুঝিয়া দেখ, এই দেহ—পরমাত্মার কে? ফলের বেলায় ইহাই স্থির যে, এ দেহ পরমাত্মার কেহই নহে। যেমন কাষ্ঠ সহ জলের সঙ্ঘর্ষ ঘটিলে উত্তুঙ্গ সলিলকণা সকল সমুত্থিত হয়, তেমনি দেহ ও আত্মা এই উভয়ের পরস্পর তাদাত্ম্য অধ্যাসবশেই এই সকল সুখ-দুঃখাদি চিত্তবৃত্তি সমুদিত হইয়া থাকে। জলের উপর কাষ্ঠ ধরিলে তাহাতে যেমন কাষ্ঠের প্রতিবিম্বপাত হয়, তেমনি এই যে সকল শরীর দেখা যায়, ইহারাও পরমাত্মায় পতিত প্রতিবিম্বরূপেই স্ফুরিত হইতেছে। মুকুরে বা জলোর্ম্মিমালায় বস্তুর প্রতিবিম্ব-পাত হয়; পরন্তু ঐ প্রতিবিম্ব যেমন সত্যও নহে বা মিথ্যা বলিয়াও নির্দ্দিষ্ট নহে, জানিবে,—এই যে শরীর, ইহাও আত্মাতে সেইরূপই বটে। যেমন দারু, জল ও উপল, ইহাদিগের পরস্পর যোগ হউক, বা বিয়োগ হউক, তাহাতে যেমন কাহার কোনও সুখ বা দুঃখানুভূতি নাই, তেমনি দেহাদির আকারে পরিণতিপ্রাপ্ত এই ভূতপঞ্চকের পরস্পর যোগে বা বিয়োগে কোন ক্ষতিই লক্ষিত হয় না। যেমন দারু-সমালোড়িত জল হইতে কম্পনাদি হইয়া থাকে, তেমনি চিৎসান্নিধ্যে বোধপ্রাপ্ত দেহ হইতে স্পন্দনাদির প্রাচুর্ভাব ঘটে। বলিবে, তবে এই সুখ দুঃখাদি জ্ঞান কাহার হইয়া থাকে? উত্তরে বলিব,—শুদ্ধ চিৎ বা জড় দেহ, এ দুইয়ের মধ্যে কাহারও

ঐ সুখ দুঃখাদি জ্ঞান হয় না। উহা একমাত্র অজ্ঞানেরই কার্য্য; যদি অজ্ঞান নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই একমাত্র চিৎই অবশিষ্ট থাকেন। যেমন দারু ও জল এই দুইয়ের সংযোগ-ঘটনায় কাহারও কোন সুখ-দুঃখানুভব হয় না, তেমনি দেহ ও দেহাভিমানীর পরস্পর সম্মিলন ঘটিলেও কাহারও কিছুই একটা সুখ বা দুঃখানুভব নাই। অজ্ঞ ব্যক্তি যেমন যেমন দেখে, তাহাতে তাহার নিকট এ সংসার সত্যরূপে প্রতিভাত হয় বটে; কিন্তু জ্ঞানী জনের চক্ষে উহা নিতান্তই অসত্য। যেমন শিলা ও জল এই উভয়ের সম্বন্ধ উভয়ের অন্তর্নিহিত নহে, তেমনি এই মনোবৃত্তি-সংলগ্ন বাহ্য ভোগানুভূতিও প্রকৃত পক্ষে জ্ঞানী জনের অন্তঃসঙ্গ-বিহীন। জল ও দারুর সম্বন্ধ যেমন অন্তঃ-সঙ্গ-বিরহিত দেহ ও দেহীর সম্বন্ধও বস্তুতঃ সেইরূপ অন্তঃসঙ্গ-পরিশূন্য। দারু ও জল, দেহ ও দেহী এবং প্রতিবিম্ব ও জল ইহাদের পরস্পর সম্বন্ধ প্রকৃতপক্ষে একই প্রকারে প্রতিভাত। যাহাতে সম্বেদ্য নাই, এবম্বিধ বিশুদ্ধ সম্বিৎই সর্ব্বত্র বিরাজিত। পরন্তু দ্বৈত-লাঞ্ছিত অন্য জঘন্য সম্বিৎ একান্তই নাই। যাহা অদুঃখ, তাহাই ভাবনার প্রাবল্যে দুঃখ-স্বরূপে সমুপাগত হয়; দৃষ্টান্ত দেখ, যে বেতাল ভ্রান্তিক্রমে দৃষ্ট হয়, তাহা যথার্থ বেতাল বলিয়া ভাবনা করিতে থাকিলে নিশ্চয়ই বিশাল আকারে পরিণত হইয়া উঠে। স্বপ্নাবস্থায় স্ত্রীসম্ভোগ হয়; সে সম্ভোগ মিথ্যা হইলেও যেমন তাৎকালিক নিশ্চয় বশে প্রকৃত কার্য্যের উপযোগী হইয়া থাকে, এবং স্থাণুদর্শনে বেতাল ভ্রম হইলে তাহা যেমন যথাযথ জ্ঞানে ভয় ও মোহাদি কার্য্যের জনক হইয়া উঠে, তেমনি অন্তরে যদি দৃঢ় নিশ্চয় থাকে, তাহা হইলে যাহা অসম্বন্ধ, তাহাও সম্বন্ধ হইয়া থাকে। যেমন জল ও দারুর সম্বন্ধ অসৎপ্রায়, তেমনি দেহ ও পরমাত্মার সম্বন্ধও অসৎ বা মিথ্যা বৈ আর কিছুই নয়। অহম্ভাবের অধ্যাস নাই বলিয়া জল যেমন দারুপাতে পীড়ানুভব করে না, তেমনি আত্মাও দেহাধ্যাস হইতে নির্ম্মুক্ত হইলে দেহ-দুঃখে কখন দগ্ধ হন না। দেহভাবনা-বশেই আত্মা দেহের দুঃখে দুঃখী হইয়া থাকেন; পরন্তু যখন তিনি ঐ দেহ-ভাবনা পরিত্যাগ করেন, বুধগণ বিদিত আছেন,—তখনই তিনি উল্লিখিত দুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

হে রাঘব! যেমন পত্র, অম্বু বা দারু প্রভৃতি পদার্থপুঞ্জ পরস্পর সংশ্লিষ্টভাবে রহিলেও অন্তঃসঙ্গ নাই বলিয়া কোন একটা দুঃখানুভব করে না, তেমনি আত্মা বল, দেহ বল, ইন্দ্রিয় বল, আর অনর্থ বল, ইহারা পরস্পর সংশ্লিষ্ট হইয়া রহিলেও অন্তঃসঙ্গহীন-অবস্থায় দুঃখ কি, তাহা একেবারেই জানে না।

বৎস! এ সংসারে অন্তঃসঙ্গই দেহীদিগের জরা, মরণ ও মোহরূপ মহীরুহের মূলীভূত বীজস্বরূপ। অন্তঃসঙ্গ-বিশিষ্ট জীবই সংসার-পারাবারে মগ্ন হইয়া থাকে। পরন্তু যাহার অন্তঃসঙ্গ নাই, তথাবিধ জীবই সংসারাব্ধির পরপারে উপনীত হয়। যে চিত্ত অন্তঃসঙ্গশালী, তাহাকেই শত শত শাখাসম্পন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আর যে চিত্তের অন্তঃসঙ্গ নাই, তাহা বিলয়প্রাপ্ত বলিয়া নির্ণীত হয়। ভগ্ন স্ফটিক লিঙ্গাদি যেমন অপাবন, জানিবে,—যে চিত্ত অন্তঃসক্ত, তাহাও তেমনি অপবিত্র। যে স্ফটিক-লিঙ্গাদি ভগ্ন নহে, তাহা যেমন পবিত্র, তেমনি আমার এই যে চিত্ত, জানিবে,—ইহাও অন্তঃসঙ্গহীন বলিয়া পবিত্র। যে চিত্তের অন্তরাসক্তি নাই, উহা সংসারী হইয়াও নির্ম্মল হইয়া থাকে। আর যে চিত্তের অন্তরাসক্তি আছে, তাহা যদি সুদীর্ঘ তপোনুষ্ঠানে তৎপর হইয়াও রহে, তথাপি তাহা নিতান্ত বদ্ধ বলিয়াই জানিবে। যে মন অন্তঃসক্ত—তাহাই বদ্ধ, আর যে মন অন্তঃসঙ্গহীন, তাহাই মুক্ত বলিয়া কথিত। অন্তঃসঙ্গ ও অন্তঃসঙ্গের অভাবই বন্ধ ও মোক্ষের কারণ বলিয়া নির্ব্বাচিত হয়। নৌকা দারুভার লইয়া যায় এবং সে নিজেও দারুভূত বটে; কিন্তু তথাপি ঐ নৌকা যেমন দারুগত ছেদ, ভেদ ও দাহাদি গুণদোষে কিম্বা জলগত চলন, পরিবর্ত্তন, নৈর্ম্মল্য ও কালুষ্যাদি গুণাগুণে লিপ্ত হয় না, তেমনি যাহার অন্তঃসঙ্গ নাই, তিনি কার্য্য করিলেও সে কার্য্যের কর্ত্তৃত্বাভিমান তাঁহার নাই। যদি অন্তঃসঙ্গ থাকে, তাহা হইলে জীব অকর্ত্তা হইলেও কর্ত্তা হইয়া পড়ে। স্বপ্নাবস্থায় সুখ ও দুঃখানুভূতি হয়। ঐ অবস্থায় নিশ্চেষ্ট ভাবে লোকে কখন কখন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু দেখে, পরে সেই ব্যাঘ্রাদির ভয়ে তাহার যেমন পলায়ন-ব্যাকুলতা দৃষ্ট হয় এবং দেহ নিশ্চেষ্ট হইলেও স্বপ্নাদি স্থলে যেমন সচেষ্ট দেখা যায়, এইরূপ চিত্তের কর্ত্তৃত্ববশেই জীবের কর্ত্তৃত্ব

ঘটিয়া থাকে। চিত্তের কর্তৃত্ব অবস্থায় নিশ্চেষ্ট জীবের বিক্ষুব্ধ সুখ-দুঃখ দর্শন ঘটে, এই জন্য জীব মুখ্য কর্ত্তার ন্যায়ই হইয়া থাকে। কোনরূপ দেহচেষ্টা নাই, এমন ভাবে যে ব্যক্তি বসিয়া আছে, তাহার জাগ্রদবস্থাতেও পুত্র কিম্বা ভৃত্যাদির যুদ্ধাদিব্যাপার প্রত্যক্ষ করা হয় এবং ঐ যুদ্ধাদি ঘটিত জয়-পরাজয়ে তাহার সুখ-দুঃখানুভব হইয়া থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে লোকে নিশ্চেষ্ট ও অকর্ত্তা হইলেও সুখ-দুঃখের অনুভাবক বলিয়া কর্ত্তা নামেই নির্দ্দিষ্ট হয়। মনের যখন কর্তৃত্ব না থাকে, তখনই লোকের অকর্তৃত্ব স্পষ্ট উপলব্ধ হয়। উহার কারণ এই যে, শূন্যচিত্ত ব্যক্তি যে কার্য্যেই লিপ্ত হউক, তাহার অনুভূতি করিতে সে পারে না। সেরূপ ক্ষেত্রে তাহাকে অকর্ত্তা বলিয়াই নির্দ্দেশ করা হয়। চিত্ত যাহা করে, সেই কর্ম্মেরই ফল তুমি প্রাপ্ত হইয়া থাক, আর চিত্ত যাহা না করে, তাহার ফলপ্রাপ্তি বা অনুভূতি তোমার হয় না। অতএব দেখা যায়, চিত্তই কর্তৃত্বের মুখ্য কারণ, দেহকে কখনই মুখ্য কারণ বলিয়া নির্ণয় করা যায় না। অসংসক্ত মন কর্ত্তা হইলেও অকর্ত্তা বলিয়াই উল্লিখিত হইয়া থাকে। কেন না, যাহার সংসক্তি নাই, তাহার কর্ম্মফল-ভোগের নিয়ম নির্দ্দেশ নাই। দূরবর্ত্তিনী কান্তার প্রতি যাহার চিত্ত আসক্ত হয়, তাহার যেমন পুরোবর্ত্তী সুখদুঃখাদি অনুভূতি থাকে না, তেমনি ব্রহ্মহত্যাই বল, আর অশ্বমেধাদি যজ্ঞই বল, অনাসক্ত ব্যক্তি তজ্জনিত পাপ বা পুণ্য সঞ্চয়ে লিপ্ত হয় না। যাহার অন্তরাসক্তি নাই, তাদৃশ জীব বিক্ষেপের অভাবনিবন্ধন পরম সুখ অনুভব করিতে থাকে। ঐ জীব কোন বাহ্য কর্ম্মে লিপ্ত হউক বা নাই হউক, সে জন্য সে কখনই কর্ত্তা বা ভোক্তা কিছুই হইবে না। যে মনের অন্তরাসক্তি নাই, তাহাকেই অকর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয় এবং সেই মনই মুক্ত, প্রশান্ত ও নির্লেপ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে। অতএব বুঝিতে হইবে,—নিখিল পদার্থই সর্ব্বান্তর আত্মার বহিঃসংশ্লিষ্ট, উহারা কদাচ অন্তঃসংশ্লিষ্ট নহে। কেবল অজ্ঞাননিবন্ধনই উহাদের অন্তঃসংশ্লিষ্টতা হইয়া থাকে। পরন্তু ঐ অন্তঃসংশ্লিষ্টতা নিখিল দুঃখেরই উৎপাদিকা; সুতরাং যত্নের সহিত উহাকে বর্জ্জন করাই কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র! স্ফটিক মণিবৎ স্বচ্ছ সলিল যেমন নিশিত অসি ধারাকার

সুনীল জলে মিলিয়া এক হইয়া যায়, তেমনি চিত্ত যখন, অন্তঃসঙ্গরূপ দোষ হইতে নিতান্তই মুক্ত হয়, তখন আদ্য সংসার দশা হইতে প্রশান্ত অম্বরের ন্যায় নির্ম্মল প্রাক্তন প্রক্ষোপশমরূপ প্রত্যক্ তত্ত্ব উপগত হইয়া থাকে। এই অবস্থা ঘটিলে সে তখন মল-বিরহিত হইয়া আত্মার সহিত একীভূত হইয়া যায়।

সপ্তষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৭ ॥

অষ্টষষ্টিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! সঙ্গ কাহাকে বলা হয়? উহা কি প্রকার, কিরূপেই বা উহা নরগণের বন্ধের কারণ হয়? এবং কীদৃশ সঙ্গই বা মোক্ষপ্রাপ্তির উপযোগী হইয়া থাকে? যাহা বন্ধন ও দুঃখের কারণ হয়, তাদৃশ সঙ্গের প্রতিকারই বা কিরূপে হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! দেহের জড়ত্ব ও দেহীর চিন্ময়ত্ব বিভাগ পর্য্যালোচনা না করিয়া জীব দেহের উপর আত্মতা-বিশ্বাস স্থাপন করে,—করিয়া আমি আমার ইত্যাকার ধারণা করিতে থাকে। তাহার উক্ত বিশ্বাস বা ধারণাকেই বন্ধের কারণীভূত সঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা হয়। আত্মতত্ত্ব অনন্ত; তাহার অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বভাব ভুলিয়া গিয়া পরিচ্ছেদ-কল্পনার ফলে যে বিষয়সুখে অভিলাষ হয়, এই অভিলাষও বন্ধনযোগ্য সঙ্গ বলিয়া নিরূপিত হইয়া থাকে। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ কিছুই নহে; এ সকলই আত্মা বা আমি; কাজেই এ জগতে আমার পরিত্যাজ্যই বা কি আছে? আর আমার বাঞ্ছনীয়ই বা কি আছে? ফলে, হেয় কিম্বা উপাদেয় কিছুই আমার নাই। এইরূপ বিজ্ঞান-সম্পন্ন জীবের যে বিষয়াসঙ্গ পরিহার-পূর্ব্বক আত্মতত্ত্বের আসক্তি, তাহাই তাহার জীবন্মুক্ত স্থিতি। আমি অহং-পরিচ্ছিন্ন নহি; মদতিরিক্ত অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই, সুতরাং এই যে দেহাদি দেখা যাইতেছে, এ সকলই মিথ্যা। যাহা মিথ্যা, তাহাতে সুখের উদ্রেক

হউক, আর নাই হউক, আমি তৎসমুদায়ে স্বভাবতই নির্লিপ্ত। এইরূপ সুদৃঢ় নিশ্চয় করিয়া যিনি দেহাদি-বিষয়ে অনাসক্ত ভাবে অবস্থান করেন, তিনিই প্রকৃত মোক্ষভাগী হইয়া থাকেন। যিনি ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া কোন কর্ম্মে লিপ্ত হন না এবং নিষ্কর্ম্মভাবেরও অভিনন্দন করেন না, সিদ্ধি কিম্বা অসিদ্ধি উভয়ত্রই যাঁহার সমবুদ্ধিতে অবস্থান, তাদৃশ ব্যক্তিই প্রকৃত পক্ষে নির্লিপ্ত বা অসংসক্ত-ভাবে বিরাজমান। একমাত্র আত্মতত্ত্বেই যাঁহার মন সতত পরিনিষ্ঠিত থাকে, কখন যিনি হর্ষ কিম্বা অমর্ষের বশীভূত নহেন, তিনিই নিঃসঙ্গ এবং তিনিই বটে প্রকৃত জীবন্মুক্ত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। যিনি মন হইতে নিখিল কর্ম্ম ও নিখিল কর্ম্মফল সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন করিয়াছেন, তিনি বাহ্য কার্য্যে ঐ সকল পরিত্যাগ না করিলেও অসংসক্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। এক মাত্র সঙ্গরাহিত্যের ফলেই বিবিধ বিজৃম্ভিত দুশ্চেষ্টা সকল চিকিৎসিত হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরম মঙ্গল প্রাপ্তি ঘটে। সঙ্গই সকল অনর্থের মূল। একমাত্র সঙ্গ হইতেই বিবিধ দুঃখরাশি গর্ত্তোৎপন্ন কণ্টকী বৃক্ষের ন্যায় শত শত শাখা প্রসারিত করিয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। গর্দ্দভ যে নাসাদেশে রজ্জুবদ্ধ হইয়া ভীতভীত ভাবে পথ মধ্য দিয়া ভার বহিয়া লইয়া যায়, তাহাও ঐ সঙ্গ বা সংসক্তিরই একমাত্র বিকাশ বলা যায়। মহীরুহগণ যে একদেশে থাকিয়া নিয়ত শীত-বাত ও আতপ-তাপ-ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকে, তাহাও ঐ সংসক্তি বা সঙ্গেরই পূর্ণ পরিণতি ব্যতীত কিছুই নহে। ক্ষুদ্র কীটকুল ধরাগর্ভে বাস করে,—করিয়া ক্লিষ্ট-কায়ে বিরসভাবে কালক্ষয় করিতে থাকে। তাহাদিগের যে তথাবিধ দুরবস্থায় কালাতিপাতন, ইহাও সেই সংসক্তি বা সঙ্গেরই বিজৃম্ভণ। ক্ষুধায় ক্ষীণোদর হইয়া পক্ষী যে অপর কাহারও প্রহার ভয়ে বৃক্ষশাখায় লুকায়িত থাকে এবং এই অবস্থায় সে যে তাহার আয়ুষ্কাল অতিপাতিত করিতে থাকে, ইহাও সংসক্তিরই পূর্ণ বিকাশ বৈ আর কিছুই নহে। হরিণ মাত্র দুর্ব্বাঙ্কুর ও তৃণাহার করে, সে কাহারও অনিষ্ট না করিলেও ব্যাধের শরে তাহাকে জীবনপাত করিতে হয়, হরিণের এই যে দুরাবস্থা, ইহাও সংসক্তিরই পূর্ণ পরিচয়। এই যে জনগণ জরাজীর্ণ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে,—হইয়া বারম্বার কৃমি কীট হইয়া জন্মিতেছে,

ইহাও ঐ সংসক্তিরই পূর্ণ পরিণতি। এই যে অনন্ত তরঙ্গপরম্পরা বারম্বার প্রাদুর্ভূত হইয়া তরঙ্গিণীর অঙ্গে তরঙ্গততির ন্যায় বারম্বার বিলীন হইতেছে, ইহাও সেই সংসক্তিরই পূর্ণ প্রকাশ বৈ আর কিছুই নয়। এই যে নরগণ নিরন্তর তৃণ-তরু-লতা প্রভৃতির দশা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃপুন মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, ইহাও সেই সংসক্তিরই বিজৃম্ভণ। এই যে তৃণ, গুল্ম ও লতা প্রভৃতি ভূতল-গত রসের যোগে স্ব স্ব আকারে বর্দ্ধিত হইতেছে, ইহাও সেই সংসক্তিরই বিলসিত ব্যতীত আর কি হইতে পারে? এই যে অনর্থ-পরম্পরা রূপ পদার্থপুঞ্জময়ী সংসার-নদী, ইহাও ঐ সংসক্তিরই বিকাশ-বশে বহিয়া যাইতেছে।

হে রঘুনন্দন! ঐ যে সংসক্তির কথা কহিলাম, উহা দুই প্রকার; এক,—বন্দ্যা অর্থাৎ প্রশংসনীয়া, অপর বন্ধ্যা, অর্থাৎ পুরুষার্থ-ফল-বিরহিতা। এই শেষোক্ত বন্ধ্যা সংসক্তি মূঢ়দিগেরই হইয়া থাকে। আর ঐ প্রথমোক্ত বন্দ্যা-সংসক্তি কেবল মাত্র তত্ত্ববিদ্‌গণেরই নিজস্ব সম্পত্তি। আত্মতত্ত্বের অজ্ঞতা নিবন্ধন দেহাদি পদার্থ-পরম্পরায় সত্যতাজ্ঞান সমুৎপন্ন হয়; সেই জ্ঞান হইতে সংসারে একটা দৃঢ় আসক্তি জন্মিয়া থাকে। এই সংসারাসক্তিই বন্ধ্যা-সংসক্তি নামে নিরূপিত। আত্মতত্ত্বের অববোধ বশতঃ নিত্যানিত্য বস্তু-বিবেক-জনিত যে সংসারহীন সংসক্তি, তাহাকে তুমি বন্দ্যা সংসক্তি বলিয়া জানিবে। এই বন্দ্যা সংসক্তি-বশতই শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী হরি বিবিধ প্রকারে এই ত্রিলোকীর পরিপালন ক্রিয়া করিতেছেন, দেব দিবাকর যে প্রতিদিন অনাশ্রয় আকাশপথে প্রধাবিত হইতেছেন, তাহার মূলেও এই বন্দ্যা সংসক্তিরই প্রভাব পরিস্ফুট রহিয়াছে। এই বন্দ্যা সংসক্তি-বশতই প্রাকৃত প্রলয়ে কৈবল্যবিশ্রান্তি নিমিত্ত দ্বিপরার্দ্ধ কাল যাবৎ সৃষ্টি কল্পনা করত হৈরণ্যগর্ভ আকার পরিস্ফুরিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঐ বন্দ্যা সংসক্তির প্রভাবেই সৃষ্টিকল্পনার জন্য ব্রহ্মার আবির্ভাব হয়। ভগবান্ শঙ্করের দেহ ঐ বন্দ্যা সংসক্তির বলেই গৌরী-দেহরূপ বন্ধন-স্তম্ভে লীলাবশে সমাসক্ত ও বিভূতি-ভূষিত হইয়া অবস্থান করিতেছে। ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানে যাঁহাদিগের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, তপাধিপ সিদ্ধগণ, লোক-পাল সকল ও অপরাপর দেব-নিবহ ঐ বন্দ্যা সংসক্তির মাহাত্ম্যবশেই

এই জগৎপ্রাঙ্গণে বিরাজিত রহিয়াছেন। এই ভুবনমণ্ডলে আর যত তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বাস করিতেছেন, তাঁহারাও ঐ বন্দ্যা সংসক্তির প্রভাবেই জরা-মরণ-হীন দেহ-যন্ত্র সকল ধারণ করিয়া রহিয়াছেন।

রামচন্দ্র! এক্ষণে বন্দ্যা সংসক্তির বিষয় শ্রবণ কর। শকুন যেমন মাংসখণ্ডে পতিত হয়, তেমনি মন যে বৃথা রমণীয়তা কল্পনা করিয়া ভোগজালে আসক্ত হইয়া থাকে, তাহার এই ভোগাসক্তি বন্দ্যা-সংসক্তিরই বিজৃম্ভণ। সংসক্তি বশেই সমীরণ ভুবনকোটরে প্রবাহিত হইতেছে, পঞ্চভূত বিদ্যমান রহিয়াছে এবং জাগতিক স্থিতি নির্ব্বাহিত হইতেছে। স্বর্গে সুরগণ, ভূতলে মানবগণ এবং পাতালে নাগ ও অসুরগণ ঐ সংসক্তি-বশতই ব্রহ্মাণ্ড-রূপ উড়ুম্বর-ফলের অভ্যন্তরবর্ত্তী মশকবৃন্দের ন্যায় বিরাজমান। তরঙ্গিণীর অঙ্গে যেমন তরঙ্গরাজি বারম্বার উৎপতিত ও নিপতিত হয়, তেমনি এই যে অনন্ত ভূতপরম্পরা পুনঃপুন আবির্ভূত ও তিরোভূত হইতেছে, ইহাও সেই সংসারসংসক্তিরই পরিণতি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। নির্ঝর-নিঃসৃত নীরকণার ন্যায় এই যে অগণিত ভূতরাজি বারম্বার উৎপতিত হইয়া বিলয় প্রাপ্ত হইতেছে, ইহাও সেই সংসক্তিরই বিস্ফুরণ বৈ আর কি? ঐ সংসক্তিবশেই জন্তুগণ জড়তায় জীর্ণ ও ভ্রান্ত হয়, মৎস্য-ন্যায়ে পরস্পর পরস্পরের অঙ্গ নিগিরণ করিয়া অম্বর-গত বিশীর্ণ পর্ণ-রাশির ন্যায় ঘূর্ণমান হইতে থাকে। পাদপের উপরিভাগে যেমন মশকবৃন্দ বিরাজ করে, গগনে যেমন নক্ষত্রমালা অভ্যুদিত হয়, এবং জলপ্রবাহ যেমন পাতালতলে আবর্ত্তাকারে পড়িতে থাকে, এই জীবগণ তেমনি সংসক্তিবশেই স্ফুরিত হইতেছে। চন্দ্রমা অদ্যাপি পতন ও উৎপতনে জীর্ণ হইয়া কাল-বালকের ক্রীড়াকন্দুকবৎ রহিয়াছেন; এখনও তিনি স্বীয় কলঙ্ক-পঙ্কিল আকৃতি পরিহার করিতে পারিতেছেন না, দেবগণের মন পুনঃপুন ভিন্ন ভিন্ন যুগের পরিবর্ত্তন-জনিত বিবিধ দুঃখরাশি অনুভব করিয়া অস্ত্র-চিকিৎস্য ব্রণবিশেষের ন্যায় যাতনাস্থান হইয়া রহিয়াছে, দেবগণ তাহার দুঃখে দুঃখী হইলেও অদ্যাপি তাহা ছেদন করিতে সক্ষম হইতেছেন না। এ সকলের কারণ একমাত্র সেই সংসক্তি বৈ আর কিছুই নহে।

হে রাঘব! ঐ দেখ, কে যেন ঐ আকাশে বাসনার বশে বিচিত্র

চিত্র আঁকিয়া রাখিয়াছে। একমাত্র মনের সংসক্তিরূপ রঙ্গ-যোগেই ঐ শূন্যাকাশে এই যে জগন্ময় চিত্র অঙ্কিত রহিয়াছে, জানিবে,—ঐ আকাশ-চিত্র কখনই সত্য নহে। এ সংসারে যাহারা সংসক্তমনে ব্যবহার-পরায়ণ হয়, অগ্নিশিখা যেমন তৃণ দগ্ধ করে, তেমনি তৃষ্ণা তাহাদের দেহ ভক্ষণ করিয়া থাকে। সংসক্ত-মতি মানবের যে কত দেহ, তাহা কে গণিয়া উঠিতে পারে? সমুদ্রের বালুকারাশি ও ত্রসরেণু-রাজির ন্যায় তাহার দেহপরম্পরার সংখ্যা করা অসম্ভব। অর্থাৎ তাদৃশ মানব বহু দেহ ভোগ করিয়া থাকে। সুমেরুগিরির আপাদ-মস্তক-লম্বিনী মুক্তালতাকৃতি সুরতরঙ্গিণীর তরঙ্গরূপ মুক্তারাশি বরং গণিয়া উঠা যায়, পরন্তু সংসক্ত-চিত্ত ব্যক্তির দেহ যে কত, তাহা গণনা করা অসম্ভব। সংসক্ত-মনা ব্যক্তিবর্গের নিমিত্ত রৌরব, অবীচি ও কালসূত্র প্রভৃতি নরক-নিকর রম্য অন্তঃপুররূপে কল্পিত রহিয়াছে। যাহার চিত্ত সংসক্ত, তাহাকে তুমি প্রজ্বলিত নরকানলের দগ্ধ কাষ্ঠ বলিয়াই বুঝিও; কেন না, তথাবিধ ব্যক্তি দ্বারা নরকানল প্রদীপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা সংসক্তচিত্ত ব্যক্তি, তাহাদের জন্যই এ জগতের যত কিছু দুঃখ কল্পিত রহিয়াছে। যেমন জল-কল্লোলময়ী মহানদী-নিচয় সমুদ্রে গিয়া নিপতিত হয়, তেমনি যে কিছু দুঃখপরম্পরা আছে, তৎসমস্ত সংসক্তচিত্ত ব্যক্তির নিকটেই সমুপাগত হইয়া থাকে। এই যে মনঃসংসক্তির কথা কহিতেছি, এই সংসক্তিরই অপর নাম অবিদ্যা। সেই অবিদ্যাই শিলাদি-ভারের ন্যায় এই ভারভূত দেহ মস্তকে বহিয়া লইয়া বেড়ায়। জীবের যে জনন-মরণ-দশা, তাহাও এই অবিদ্যা হইতে হইয়া থাকে। বলা বাহুল্য, এই যে কিছু দৃশ্যমান বস্তু আছে, সমস্তই সেই অবিদ্যার কল্পনাবলে বিস্তার পাইয়াছে।

হে রাম! জানিয়া রাখ, বর্ষাকালীন নদীনিচয় যেমন বিস্তার প্রাপ্ত হয়, যদি ভোগাসক্তি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলে সকল প্রকার বিভূতিই তেমনি বিস্তৃতি লাভ করে। ফল কথা, তখন সর্ব্ববিধ সুখ-সম্প্রাপ্তিই ঘটিয়া থাকে। হে রঘুবংশ-তিলক! তুমি জানিয়া রাখ, অন্তঃসঙ্গই দেহের মালিন্য-বিধায়ক অঙ্গার। অন্তঃসঙ্গের অভাবই দেহের রসায়ন। এরক এক প্রকার তৃণ, তাহার সহিত মিশ্রিত ওষধিবিশেষ যেমন

স্বসম্পৃক্ত তৃণোৎপন্ন বহ্নি দ্বারা দগ্ধ হয়, তেমনি জীব আপন অন্তঃস্থিত সংসক্তি দ্বারা আপনি দগ্ধ হইয়া থাকে।

রঘুবর! অসংসক্ত চিত্ত সর্ব্বত্রেই অপার শান্তিসুখ ভোগ করিয়া থাকে। সে চিত্ত আকাশের ন্যায় পরিচ্ছিন্নভাবেই অবস্থান করে। সদাভাস অসৎকল্প মন যদি অসংসক্তভাব ধারণ করে, তাহা হইলেই অপার সুখের নিমিত্ত হইয়া থাকে। যাঁহার চিত্ত অবিদ্যাবিষয়ে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে এবং সংসক্তিহীন হইয়া বিদ্যাংশে অভ্যুদয় লাভ করিয়াছে, জানিবে—তথাবিধ ব্যক্তিই মুক্ত পুরুষ।

অষ্টষষ্টিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৮ ॥

ঊনসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যিনি বিবেক-সম্পন্ন হন, তিনি সেই সেই কালোচিত সেই সেই ব্যবহারে থাকিয়া সেই সেই ব্যবহারোচিত ইষ্ট মিত্র, পুত্র, দারাদি সকলের সহিত অবস্থানপূর্ব্বক অনিষিদ্ধ লৌকিক ও শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অভিরত রহিলেও চিত্ত কুত্রাপি সংসক্ত রাখিবেন না। কোন চেষ্টায় নহে, কোন চিন্তায় নহে, কোন পদার্থে নহে, আকাশে নহে, অধোদেশে নহে, সম্মুখে নহে, কোন দিকে নহে, কোন লতায় নহে, বাহিক বহু ভোগে নহে, ইন্দ্রিয়বৃত্তিতে নহে, অভ্যন্তরে নহে, প্রাণে নহে, মস্তকে নহে, তালুতে নহে, ভ্রূমধ্যে নহে, নাসাগ্রে নহে, মুখে নহে, নয়নতারায় নহে, অন্ধকারে নহে, প্রকাশে নহে, হৃদাকাশে নহে, জাগ্রদ্ভাবে নহে, স্বপ্নে নহে, সুষুপ্তি অবস্থায় নহে, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণে নহে, তমোগুণে নহে, রজোগুণে নহে, গুণ-পরম্পরায় নহে, চঞ্চল কার্য্যকলাপে নহে, স্থির অব্যক্ত কারণে নহে, আদিতে নহে, মধ্যে নহে, অন্তে নহে, পার্শ্বে নহে, দূরে নহে, নিকটে নহে, অগ্রে নহে, কোন বস্তুবিশেষে নহে, আত্মায় নহে, শব্দে স্পর্শে বা রূপাদিতে নহে, বিষয়ভোগ-লিপ্সায় নহে, আনন্দ-ব্যাপারে নহে বা গমনাগমন-ব্যাপারে নহে,—কোন কিছুতেই কুত্রাপি তাঁহার চিত্ত সমাসক্ত রাখা কর্ত্তব্য নহে।

তথাবিধ বিবেকীর চিত্ত নিশ্চল বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া একমাত্র চিন্মাত্রে বিশ্রান্তি লাভ করুক,—করিয়া কেবল পরমানন্দ-রসে নিমগ্ন ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ের রসাস্বাদ-শূন্য হইয়া অবস্থান করিতে থাকুক। তাদৃশ অবস্থায় অবস্থিত হইয়া জীব এ সকল ব্যবহারিক কর্ম্ম করুক বা নাই করুক, সে আসক্তিশূন্য হইয়া একমাত্র আত্মরতি হইয়াই অবস্থান করে। ঐ জীব কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে বলিয়াও তাহার কোন ফল নাই, আর না করিলেও তাহার কোন প্রত্যবায় নাই। ঐরূপ অবস্থায় উপনীত হইয়া জীব ক্রমশঃ ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া থাকে। জীব স্বীয় আত্মায় নিরত হইয়া বাহ্য ক্রিয়া করিলেও সে কখনই তাহার কর্ত্তা হয় না। অম্বরে যেমন অম্বুদ-সঙ্গ ঘটে না, তেমনি ঐ জীবের সহিত কোন প্রকার ক্রিয়াফলেরই সম্বন্ধ-সম্ভাবনা থাকে না। জীব কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মফলের ভাজন হয় না, অথবা জীব তাহার পূর্ব্বোক্ত চৈত্যাংশ অর্থাৎ বুদ্ধি-সাক্ষিভাবও পরিত্যাগ করিয়া শান্ত চিদ্ঘন হইয়া জ্বলন্ত মণির ন্যায় আত্মাতে প্রশান্তভাবে অবস্থান করিয়া থাকে।

হে রামভদ্র! জীব আত্মাতে নির্ব্বাণ লাভ করিয়া—সতত আত্মভাবে অভ্যুদয় প্রাপ্ত হইয়া ব্যবহারফলে নিরভিলাষ হয়। এই অবস্থায় সে ব্যবহার-পরায়ণ হইলেও আসক্তি-বিরহিত হইয়া অবস্থান করে। তদবস্থায় কর্ম্মফলের সহিত তাহার কোনই সম্বন্ধ থাকে না। পরন্তু যত দিনে না প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ঐ জীব দেহভার মাত্র বহন করিতে থাকে। অবশেষে যখন প্রারব্ধ কর্ম্ম ক্ষয় পাইয়া যায়, তখন তাহার বিদেহ-কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে।

উনসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৬৯ ॥

সপ্তত্রিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! যাঁহারা সর্ব্বদা অসংসক্তিসুখের আস্বাদনে তৎপর হইয়া পূর্ণভাবে অবস্থিত, তথাবিধ মহাত্মগণ লৌকিক ব্যবহারে নিরত রহিলেও অন্তরে তাঁহাদের শোক-ভয়াদি কিছুই নাই। যাঁহার চিত্ত অসংসক্ত থাকে, তাদৃশ ব্যক্তি বিক্ষোভের হেতুভূত পুত্র ও ধনাদির নাশ, বন্ধন ও অপমানাদি দ্বারা বিক্ষুব্ধ-দেহবৎ লক্ষিত হইলেও তাঁহার চিত্ত-বৃত্তি সর্ব্বদা পরমার্থসুখে পরিপূর্ণ থাকে, তিনি সদাকালই অন্তরে পূর্ণস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকেন। এই নিমিত্ত তাঁহার মুখমণ্ডলে সকল সময়ের জন্য ইন্দুমণ্ডলের ন্যায় সুন্দর শ্রী দেখিতে পাওয়া যায়; বিষণ্ণতার লেশ মাত্রও তাহাতে পরিলক্ষিত হয় না। যাঁহার মন চেত্যভাব পরিহারপূর্ব্বক একমাত্র চিদাবলম্বী হইয়া গতজ্বর হয়, তদীয় অনুগ্রহবশে কতক-পরিষ্কৃত জলের ন্যায় অন্যান্য লোকদিগেরও অন্তঃকরণ প্রসন্ন হইয়া উঠে। অতএব তিনি নিজে যে নির্ব্বিক্ষোভ বা নির্ম্মল, এ কথা বলাই বাহুল্য মাত্র। যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ, তিনি সর্ব্বদা আত্মদৃষ্টিতেই লীন হইয়া স্ব স্ব ভাবে অবস্থিত থাকেন। পরন্তু তিনি যে জল-বিম্বিত রবিমণ্ডলের ন্যায় চঞ্চল ভাব ধারণপূর্ব্বক ক্ষুব্ধবৎ পরিলক্ষিত হন, তাহা একান্তই অসত্য। ফল কথা এই যে, যেমন প্রকৃত সূর্য্যের চাঞ্চল্য নাই; চঞ্চল হইতে হইলে প্রতিবিম্ব-সূর্য্যই হইয়া থাকে, পরন্তু প্রতিবিম্বসূর্য্যের সত্যতা কিছুই নাই, তেমনি তত্ত্ববিদ্‌গণের প্রতিবিম্ব ভাগই চঞ্চল বা বিক্ষুব্ধভাব-প্রাপ্ত বলিয়া লক্ষিত হয়, কিন্তু ঐ প্রতিবিম্ব ভাগ সত্য নহে, মিথ্যা। যাঁহারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন, পরমাত্মায় আরাম লাভ করিয়াছেন, তাদৃশ পরম অভ্যুদয়-সম্পন্ন মহাত্মাগণ বাহিরে ময়ূরপুচ্ছের অগ্রভাগের ন্যায় চঞ্চল হইলেও অন্তরে সুমেরুগিরির ন্যায় অচল ও অটলভাবে অবস্থিত হইয়া থাকেন। যেমন কোন রঞ্জন দ্রব্য দ্বারা মসৃণ স্ফটিক মণিকে রঞ্জিত করা সম্ভব নহে, তেমনি আত্ম-ভাব-গত চিত্ত কখনই সুখ-দুঃখে রঞ্জিত হইবার নহে। পথ যেমন জল-রেখায় রঞ্জিত হয় না, তেমনি যে চিত্ত ঐশ্বরিক তত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব এই উভয় তত্ত্ব

বিদিত হইয়া একান্ত আনন্দাভ্যুদয় লাভ করিয়াছে, তাদৃশ চিত্তকে সংসার-দৃষ্টি কখনই রঞ্জিত করিতে সক্ষম নহে। জীব যখন পরমাত্ম-বোধ প্রাপ্ত হয়,—হইয়া বাহ্য বিষয়ানুরাগের মূলীভূত মল হইতে মুক্ত থাকে, তখন সে ধ্যান-বিরহিত অবস্থাতেও নিতান্ত আনন্দময় পরমাত্মার স্বাভাবিক স্ফুরণ নিবন্ধন নির্ব্বিকল্প সমাধিনিষ্ঠের ন্যায় সর্ব্বদাই আত্ম-ধ্যানময় হইয়া থাকে এবং তথাবিধ ব্যক্তি আত্মসংসক্ত বলিয়াই কীর্ত্তিত হয়।

হে রঘুনন্দন! জীব উল্লিখিত অবস্থায় উপনীত হইলে অদ্বন্দ্ব ও নিত্য-স্বরূপ হয়, তাহার অস্তোদয়-ভাব থাকে না; সে জাগ্রদবস্থাতেই সুষুপ্ত জনবৎ লক্ষিত হইয়া থাকে। জীব যখন পরমাত্মায় আরাম লাভ করে, তখনই সে অসংসক্ত হইয়া থাকে। আত্মজ্ঞানের অভ্যুদয় হইলেই সংসক্তি ক্ষয় পাইয়া যায়। নতুবা সংসক্তি ক্ষয়ের উপায়ান্তর নাই। যেমন প্রতি-দিন চন্দ্রকলার ক্ষয় প্রাপ্ত হওয়ায় চন্দ্রমা অমাবস্যায় সূর্য্যভাব লাভ করেন, তেমনি অভ্যাসগুণে জীব যখন উল্লিখিত দশায় উপনীত হয়, তখন সে পবিত্র চিদাদিত্যরূপেই পরিণত হইয়া থাকে। চিত্তের চিত্তদশা প্রক্ষীণ হইলে তখন সে বাহ্য বিষয়-রাহিত্যে অবস্থান হয়, তাহাই জাগ্রদবস্থায় সুষুপ্তভাব বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। এই সুষুপ্ত অবস্থায় উপনীত হইলে জীব [illegible] যদিও মানব ব্যবহার-পরায়ণ হয়, তথাপি সুখ দুঃখরূপ [illegible] [illegible] তাহাকে আকৃষ্ট হইতে হয় না। ঐরূপে [illegible] [illegible] সে [illegible] জাগ্রদবস্থায় জাগতী ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিতে থাকে, যে শক্তির [illegible] প্রতিনিয়ত মানবকে সুখ-দুঃখ জন্মাইয়া কখন কালেও অতিক্রম [illegible] না। যে শক্তি অহঙ্কারময়ী, তাহাই চিৎশক্তির জননী। [illegible] বিষয়ের ভাব ও অভাব নিবন্ধন ঐ শক্তিই সকলকে সুখ দুঃখ [illegible] থাকে। কিন্তু চিত্ত যখন আত্মভাব লাভ করে, তখন আর কে তাহার [illegible] জন্মাইতে পারে? যাহার বুদ্ধি সুষুপ্ত অবস্থায় উপনীত হয়, সে জীব বাহিরে অবলীলা-ক্রমে কর্ম্ম সম্পাদন করে, তথাপি তাহাতে তাহার বন্ধন ঘটে না; সে জীব জীবন্মুক্তভাবেই অবস্থান করিতে থাকে।

হে নিষ্পাপ! তুমি উল্লিখিত প্রকার সুষুপ্ত ভাব অবলম্বন কর; ঐ অবস্থায় তোমার প্রারব্ধ পরিপাক বশতঃ লৌকিক বা শাস্ত্রীয় বর্ণাশ্রমীয়

কার্য্য যাহাই উপস্থিত হউক, তুমি সে সকল চাই করিতে পার, চাই না করিতেও পার। ফলে তখন কর্ম্ম করা বা না করা এ দুইয়ের কিছুতেই কিছু আসিয়া যাইবে না এবং তাহাতে তোমার একটা স্পৃহাই জাগিবে না। কেন না, যাঁহারা আত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হন, তাঁহাদের নিকট কর্ম্মের আদান কিম্বা বিসর্জ্জন কিছুই রুচিজনক হয় না। আত্মতত্ত্বজ্ঞ সুধীগণ যথাযথ কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যদি তুমি তত্ত্বজ্ঞ হও,—হইয়া সুষুপ্ত অবস্থায় উপনীত বুদ্ধিযোগে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলেও তুমি সেই কার্য্যের কর্তৃত্বভাজন হইবে না। যদি তোমার আত্মতত্ত্ব অপরিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে তুমি অকর্ত্তা হইলেও কর্তৃত্বভাজন হইবে। ফল কথা, কৃত কর্ম্মের কর্ত্তা হইলে সেই কর্ম্ম জনিত সুখ-দুঃখের যে অনুভূতি হইয়া থাকে, সে অনুভূতি তখন তোমার লোপ পাইবে না। এক্ষণে তোমার যেরূপ ইচ্ছা হয়, করিতে পার।

হে রঘুবর! শিশু জন মঞ্চোপরি শয়ন করিয়া থাকে; সেই শায়িত শিশুর কোন প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্য না থাকিলেও সে যেমন নৈসর্গিক আনন্দেই স্পন্দিত হইয়া থাকে, সেইরূপ তুমি কোন ফলাভিসন্ধি না রাখিয়া অনাসক্তভাবেই কর্ম্ম করিয়া যাও। জীব যখন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া চেত্য ভাব পরিহারপূর্ব্বক চৈতন্য পদে স্ব স্ব ভাবে অবস্থান করে এবং জাগ্রদবস্থাতেও সুষুপ্ত ভাব প্রাপ্ত হয়, তখনকার সেই অবস্থায় সে, যে যে কর্ম্ম করে, তাহাতে তাহার কর্তৃত্ব কিছুই থাকে না, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির অন্তরে বাসনার লেশ মাত্র থাকিতে পারে না; তিনি সুষুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দরস-ধারায় অন্তরে শীতাংশুর ন্যায় শীতল ভাব ধারণ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক মহাতেজোময় পূর্ণেন্দুগণের ন্যায় পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজ করেন এবং শৈলবর যেমন সকল ঋতুতেই সমান ভাবে অবস্থিত হয় অর্থাৎ ঋতুপর্য্যায়ে তাহার যেমন বিশেষত্ব কিছুই দেখা যায় না, তেমনি তিনি সকল ভাবেই সমানাকারে অবস্থান করেন। পর্ব্বতকে যেমন চালিত করিবার চেষ্টা করিলেও সে কখন চলিত বা স্পন্দিত হয় না, তেমনি যিনি সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থিত হইয়া পরমাত্মায় স্থিরতা প্রাপ্ত হন, তথাবিধ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বাহ্য কার্য্য করিলেও তাহাতে কখন বিচলিত হন না।

রামচন্দ্র! তোমায় বলি, তুমিও উল্লিখিতরূপে কালুষ্যহীন হইয়া সুষুপ্ত অবস্থায় অবস্থানপূর্ব্বক সত্বর স্বীয় দেহকে নিপাতিত কর, অথবা শৈলের ন্যায় দীর্ঘ কাল যাবৎ ধারণ করিয়া থাক। যখন অভ্যাসবলে সুষুপ্ত অবস্থা সুদৃঢ় হইয়া উঠে, তখন তত্ত্বজ্ঞ সাধুগণ উহাকে তুরীয় অবস্থা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তত্ত্বজ্ঞ মহাশয় পুরুষের অন্তরে কোনরূপ পীড়া থাকে না, তিনি ঐকান্তিক ভাবে অস্তমিত-চিত্তে আনন্দময় হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। তত্ত্বদর্শী ব্যক্তি তথাবিধ অবস্থায় অবস্থিত, প্রমুদিত ও পরমানন্দ-রস-পানে ঘূর্ণিত হইয়া এই যে কিছু দৃশ্য রচনা আছে, সমস্তকেই সতত লীলার ন্যায় দর্শন করিতে থাকেন। আত্মবান্ পুরুষ এইরূপে তুরীয় দশায় আরোহণ করেন,—করিয়া সংসার-সম্ভ্রম পরিহার করত শোক, ভয় ও ক্লেশ হইতে পরিমুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি আর কখনই তথাবিধ অবস্থা হইতে পরিপতিত হন না। তত্ত্বজ্ঞ ধীর ব্যক্তি পবিত্র আত্মপদে আরোহণ করিয়া শৈলারূঢ় ব্যক্তির নিম্নভূমি দর্শনের ন্যায় এই ভ্রান্তিযুক্ত জগৎকে হাস্য-বিকাশের সহিত দর্শন করিতে থাকেন। তিনি উল্লিখিত তুরীয় অবস্থায় অবস্থিত হইয়া নিত্য স্থিতি লাভ করেন,—করিয়া প্রচুর আনন্দে বিলয় প্রাপ্ত হওয়ায়, যাহা হইতে আর উত্তম কিছুই নাই, তথাবিধ মহান্ আনন্দ-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অনন্তর ক্রমে যোগী যখন ঐ সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম মহানন্দকলা হইতে অতীত হইয়া তুরীয় পদ অতিক্রম করেন, তখন তিনি মুক্ত আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকেন। তৎকালে তাঁহার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, এবং যে কিছু তমোময় অভিমান থাকে, সে সকলই তাঁহার বিলয় প্রাপ্ত হয়। সেই মহাত্মা পুরুষ তখন এমন অবস্থায় উপনীত হন যে, জলবিলীন সৈন্ধবের ন্যায় তাঁহার কেবল পরমরসময়ী সত্তা প্রাপ্তি ঘটে, অর্থাৎ জলে সৈন্ধব মিশিয়া গেলে তাহার যেমন আকার কিছুই দেখা যায় না, মাত্র আস্বাদেই তাহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হয়, তেমনি ঐ তুরীয় দশাতীত যোগী পুরুষ নিরাকার হন,—হইয়া কেবল সত্তাস্বরূপেই অবস্থান করিতে থাকেন।

সপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭০ ॥

একসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুবংশনায়ক! তুরীয় ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ অনুভব যে সময়েই হয়, তখনই কৈবল্য পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই পদ জীবন্মুক্তদিগের অধিকৃত এবং উহাই শ্রুতি প্রভৃতি বাক্যের প্রতিপাদ্য। হে মহাভুজ! যেমন আকাশদেশ বায়ুর গম্য হইলেও উহা মনুষ্যের অবিষয়ীভূত, তেমনি ঐ তুরীয় দশার যাহা অতীত পদ, তাহা বিদেহ মুক্তগণেরই প্রাপ্য। তদ্ব্যতীত অন্য জীবন্মুক্তগণের ঐ পদ অধিকৃত হইবার নহে, এবং কোন বেদবাক্যেরও উহা গোচর নহে। ব্যোমদেশ যেমন ব্যোমচারী সমীরণেরই গম্য স্থল, তেমনি সেই অতিদূর হইতেও দূরস্থ বিশ্রাম-পদ একমাত্র বিদেহমুক্ত ব্যক্তিবর্গেরই অধিগম্য হইয়া থাকে। যাঁহারা জীবন্মুক্ত পুরুষ, তাঁহারা সুষুপ্ত দশার ন্যায় কিয়ৎকাল জাগতিক ব্যাপার অনুভব করিয়া পশ্চাৎ পরমানন্দধারায় পরিপ্লাবিত হন,—হইয়া তুরীয় পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিবর্গ যেমন তুর্য্যাতীত পদে বিশ্রাম লাভ করেন, তেমনি তুমিও দ্বন্দ্বাতীত পদে গমন কর এবং সুষুপ্ত দশার অনুসরণ-পূর্ব্বক ব্যবহারিক সত্তায় সংশ্লিষ্ট হইয়া থাক। এইরূপ ভাবে থাকিলে চিত্রাঙ্কিত রবির যেমন ক্ষয় বা রাহুগ্রাসের সম্ভাবনা থাকে না, তেমনি তোমারও তখন মরণ ও সমুদায় ভয় বিদূরিত হইয়া যাইবে। এই দেহের নাশ হউক, বা স্থিতি হউক, তাহাতে সম্বিদের ক্ষয়োদয় কিছু মাত্র নাই। কেন না, দেহ যে রহিয়াছে, ইহা একান্তই ভ্রান্তি; সুতরাং দেহের নাশে বা অবস্থানে তোমার কোনই প্রয়োজন সিদ্ধ হইবার নহে। তাই বলিতেছি, তুমি আত্মজ্ঞানে উদ্‌যোগী হও,—হইয়া পরাবর সমভাবেই অবস্থান করিতে থাক।

হে রাম! যাহা পারমার্থিক সত্য, তাহা তুমি পরিজ্ঞাত হইয়াছ, যাহা সেই কৈবল্য ধাম, তাহা তুমি অধিগত হইয়াছ, এবং যাহা সেই অখণ্ড বাক্যার্থের স্বরূপ, তাহাও তোমার অপ্রাপ্ত নাই; অতএব তুমি অধুনা

আত্মবিভূতির জন্য বিশোক হইয়া অবস্থান কর। তোমার অন্তরে ইষ্ট কিম্বা অনিষ্ট বাসনা নাই; সুতরাং যাহাতে মেঘ নাই ও অন্ধকার নাই, তথাবিধ শরৎকালীন আকাশের ন্যায় অন্তর তোমার প্রতিভাত হইতেছে। যে জন খেচরীবিদ্যায় নিপুণ, সে যেমন গগন ছাড়িয়া ভৌম সুখের অন্বেষণ করে না, তেমনি তোমার এখনকার জ্ঞানশুদ্ধ চিত্তও বাহ্যিক বিষয়ের প্রতি লালসা পোষণ করিতেছে না। তুমি বিশুদ্ধ চিৎশক্তিযুক্ত হইয়াছ বলিয়া 'অহং' 'মম' ইত্যাকার ভ্রমজ্ঞান সকল তোমার নিকট হইতে এখন তিরোহিত হইয়া যাউক। কেবল মাত্র ব্যবহার-সমাধার জন্যই 'অহং' বা 'আমি' ইত্যাকার সংজ্ঞা কল্পনা করা হইয়াছে। নতুবা ব্রহ্মস্বরূপ হইতে নাম বা রূপাদির কল্পনা ত বিদূরিত হইয়াই রহিয়াছে। জল ও তরঙ্গাদিই সাগর; উহারা যেমন সাগর হইতে পৃথক্ কোনই পদার্থ নহে; তেমনি আত্মাই এই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডাদি সমস্ত বস্তু, এ সকল বস্তুর পৃথক্ উপাধি কিছুই নাই। সাগর যেমন জলময়; তাহাতে যেমন জল হইতে পৃথক্ কিছুই নাই, তেমনি এই নিখিল জগৎ আত্মস্বরূপেই অবস্থিত; এ জগতে আত্মা ব্যতীত অপর কিছুই প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

হে প্রাজ্ঞ! 'এই দেহই আমি' ইত্যাকার ভ্রমব্যবস্থা ধারণা করিয়া রাখিতেছ কেন? এই দেহাদি ভাবে যাহা তুমি বা যাহা তোমার, তাহা কি? এবং যাহাতে তুমি নাই বা যাহা তোমার নহে, তাহাই বা কি? যাহা ব্রহ্মস্বরূপ, তাহার দ্বিত্ব নাই, দেহাদি নাই বা তৎসমুদায়ে তাহার সম্বন্ধও কিছুই নাই। যেমন সূর্য্যসহ অন্ধকার-সম্পর্ক নাই, তেমনি তাহাতে কোনও উপাধিকল্পনা নাই। যদিই বা সেই ব্রহ্মস্বরূপের দ্বৈতভাব স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তথাচ এই যে বর্ত্তমান দেহাদি, ইহার সহিত তাহার কোনই সম্পর্ক-সম্ভাবনা নাই। ছায়া ও সৌর করের এবং আলোক ও অন্ধকারের যেমন সম্বন্ধ-সংঘটন অসম্ভব, তেমনি দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ-বন্ধনও অলীক।

হে রাঘব! আরও দেখ, যেমন পরস্পর-বিরোধী শীত ও উষ্ণের সম্বন্ধ ঘটে না, তেমনি দেহের সহিতও আত্মার সম্বন্ধ সম্ভবিতে পারে না। অতএব যাহারা নিত্যই বিভিন্ন, তথাভূত জড়দেহ ও চেতন আত্মার

পরস্পর সম্বন্ধ কিছুতেই উপলব্ধ হইবার নহে। কাজেই বলিতে হয়, চিন্মাত্র আত্মার দেহের সহিত-সম্বন্ধ আছে, এই যে একটা কথা, ইহার অর্থ—দাবদহনে জলধির অস্তিত্ব-কথার ন্যায় একান্তই দুর্ব্বোধ্য। আতপ-তাপে বিশুষ্ক বারি যেমন অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি সত্য দর্শন হইলে ঐ দেহাত্মসম্বন্ধের অধ্যাসও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। চিন্ময়স্বরূপ আত্মা—নির্ম্মল ও নিত্য স্বপ্রকাশ; তাঁহাতে কলঙ্কসম্পর্ক নাই। পরন্তু দেহ অনিত্য পদার্থ-এবং সর্ব্বদাই মালিন্য-সম্পন্ন। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, এ হেন দেহের সহিত উল্লিখিতরূপ আত্মার সম্বন্ধ-সঙ্ঘটন কিরূপে হইতে পারে? আরও একটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া দেখ, কেহ সিদ্ধান্ত করিতে পারেন যে, মরণের পূর্ব্বে দেহের সহিত আত্মার বিশেষ সম্পর্ক থাকে, তাই তাহা সচেতন দেখা যায়; পক্ষান্তরে মৃত দেহে আত্মার সম্পর্কাভাব হয় বলিয়াই তাহার স্পন্দনাদি থাকে না। সুতরাং আত্মার সহিত দেহের সম্বন্ধ ত স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয়। কিন্তু আমি বলি, আমার মতে এই সিদ্ধান্ত একান্তই ভ্রান্তিমূলক। কারণ দেহের যে স্পন্দনাদি ক্রিয়া হয়, তাহা প্রাণাদি বায়ুর সম্পর্কবশতই হইয়া থাকে এবং দেহের যে স্থূলতাদি হয়, তাহাও অন্নপানাদি ভুক্ত পীত দ্রব্যের সামর্থ্যেই ঘটিয়া থাকে। সুতরাং দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ কোথায়? বস্তুতঃ দেহ সহ আত্মসম্বন্ধ আছে, এরূপ কথাই ত হইতে পারে না।

হে সুমতে! আত্মার দ্বিত্ব সুসিদ্ধ বলিয়া ধরিয়া লইলেও দেহের সহিত আত্মার কোনও সম্বন্ধ সম্ভাবনা নাই। পরন্তু অসিদ্ধ বিষয়ে এরূপ কল্পনা একেবারেই ত অসম্ভব। অর্থাৎ যখন দ্বৈত পক্ষেও দেহদেহীর প্রকৃত সম্বন্ধ অসম্ভব, তখন অদ্বৈত পক্ষের কথা কি বলিব? অতএব এই কথাই বলি যে, তুমি দ্বৈত-ভ্রম পরিহার কর—করিয়া অদ্বৈত চিন্মাত্রে অবস্থান করিতে থাক। হে রঘুরাজ! তুমি অন্তরে ইহাই ধারণা করিয়া রাখিবে যে, বন্ধ বা মোক্ষ কাহার কদাচ নাই। কেবল অজ্ঞদিগের জন্যই বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থা। বাস্তবিক পক্ষে উহারা কাল্পনিক।

হে রাম! এই দৃশ্যমান সমস্ত সংসারকেই শান্ত আত্মময় বলিয়া অবলোকন করিবে এবং কি বাহ্য, কি অভ্যন্তর, সর্ব্বত্রই উক্ত প্রত্যয় দৃঢ়

করিয়া রাখিবে। পরন্তু 'আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি মূর্খ' এই প্রকার দর্শন একান্তই নিন্দনীয়। সুতরাং ঐরূপ দৃষ্টিতে যদি সত্যবুদ্ধি সংস্থাপন কর, তাহা হইলে তুমি অনন্ত দুঃখেই নিমগ্ন হইয়া রহিবে। শৈল ও সামান্য তৃণের পরস্পর তুলনায় যে বিশেষত্ব আছে, এবং অতি লঘু কৌষেয় ও পাষাণের যে পার্থক্য দেখা যায়, পরমাত্মা ও শরীরেরও পরস্পর তুলনায় তেমনি বিশেষত্ব বা ভেদ নিরূপিত হইয়াছে। তেজ ও তিমির এই উভয়ের যেমন পরস্পর সম্বন্ধ নাই বা তুলনাও হইতে পারে না, তেমনি একান্ত বিভিন্ন আত্মাতে ও দেহে পরস্পর সম্বন্ধ নাই বা তুলনাও অসম্ভব। যেমন শীত ও উষ্ণ এই উভয়ের ঐক্য কথামাত্রেও প্রখ্যাত নাই, তেমনি জড় দেহ ও চেতন আত্মার পরস্পর সংশ্লেষ বা সংযোগ একেবারেই অসম্ভব। তবে যে আত্মসম্বন্ধের অভাবেও দেহচেষ্টা হয়, তাহার কারণ একমাত্র বায়ু; বায়ুবশেই দেহ চলিতে থাকে, আসিতে থাকে, যাইতে থাকে, এবং দেহের অভ্যন্তরে যে নাড়ী-নিচয় আছে, তাহাতে সঞ্চরমাণ বায়ুর প্রভাবেই দেহ শব্দ করিতেছে। বেণুর মাঝে বায়ুর প্রভাবেই যেমন অব্যক্ত শব্দ সমুত্থিত হয়, তেমনি দেহের মধ্যে বায়ুর যে ক্রিয়া হয়, সেই ক্রিয়াতেই দেহের রন্ধ্র কণ্ঠাদিস্থান হইতে কবর্গ, চবর্গ, ও টবর্গাদি শব্দ স্ফুরিত হইয়া থাকে। চক্ষুর স্পন্দনে তারার যে স্পন্দন হয়, তাহাও বায়ু হইতেই হইয়া থাকে। এইরূপে চক্ষুরাদি সমস্ত ইন্দ্রিয়-স্পন্দই বায়ুর প্রসাদাৎ সম্পন্ন হয়। আত্মার কার্য্য কেবল সম্বিৎ ব্যতীত আর কিছুই নয়। সত্য বটে, আত্মার বিশেষ বিশেষ অবস্থা-রূপিণী সম্বিৎ আকাশ ও পর্ব্বতাদি নিখিল বস্তুতে থাকে বলিয়া সর্ব্বগামিনী ও সদাতনী হয়, কিন্তু তথাপি মুকুর-মধ্যগত প্রতিবিম্বের ন্যায় চিত্তেই সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া থাকে। চিত্ত-পক্ষী দেহ-নীড় পরিত্যাগ করিয়া আপন বাসনাবলে যেখানে গমন করে, আত্মা সেইখানেই অনুভূত হইয়া থাকেন। যেমন যেখানে পুষ্প আছে, সেইখানেই গন্ধসম্বিৎ রহিয়াছে, সেইরূপ যেখানে চিত্ত, সেইখানেই আত্মার সম্বিৎ বিরাজিত আছে। আকাশ যেমন সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়াও দর্পণে বিম্বিত হইয়া থাকে, আত্মাও তেমনি সর্ব্বব্যাপী হইয়াও চিত্তমধ্যে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকেন। নিম্নভূমি

যেমন জলের আশ্রয় হয়, চিত্তও তেমনি আত্মসম্বিদের আস্পদ হইয়া থাকে। প্রভাকরের প্রভা যেমন আলোক বিস্তার করে, তেমনি অন্তঃকরণ-বিম্বিত আত্মসম্বিদই এই সত্য-মিথ্যাময় জগৎ-স্বরূপ বিস্তার করিয়া থাকে; সুতরাং বুঝিতে হইবে, একমাত্র অন্তঃকরণই ভূতসমষ্টির সৃষ্টি-ব্যাপারের কারণ হইতেছে। সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত আত্মা প্রতিবিম্ববশতঃ কারণ হইলেও স্বরূপ-সম্বন্ধে তিনি কারণ নহেন। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে অন্তঃকরণের কারণ কি? সে পক্ষে পণ্ডিতগণের মত এই যে, সংসার-স্থিতির নিদান অবিচার, অজ্ঞান ও মূর্খতাই পূর্ব্বোল্লিখিত অন্তঃকরণেরও কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। অসত্যদর্শনের সংস্কারবলে ঐ অন্তঃকরণই মোহবশতঃ ভ্রান্তিবীজের কণারূপিণী সত্তাকে গ্রহণ করিয়াই যেন মিথ্যা চিত্তরূপে পরিণত হইয়া থাকে।

হে রঘুনন্দন! যথাযথ বস্তুস্বরূপের পরিজ্ঞানেই দীপ দ্বারা অন্ধকারের ন্যায় ক্ষণমাত্রেই চিত্তের সত্তা একেবারেই লোপ পায়। অতএব সংসারের কারণ অজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া অধিকারী চিত্ত নিজেই জীব, অন্তঃকরণ, চিত্ত ও মন, ইত্যাদি স্বীয় নামনিরুক্তির বিষয় সম্যক্‌রূপে বিচার করিয়া দেখিবেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কি প্রকারে চিত্তের ঐ জীব প্রভৃতি সংজ্ঞাগুলি যোগরূঢ় হইয়াছে, তাহা আমার বিচারসিদ্ধির জন্য বর্ণন করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যেমন জল-তরঙ্গ-কণাসকল জল হইতেই উত্থিত হয়, তেমনি এই যে কিছু ভাব দেখা যায়, এ সকলই আত্মতত্ত্ব সহ একাকারে পরিণতিপ্রাপ্ত চিত্ত হইতেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যেমন জলধির বিলোল তরঙ্গ-সমূহে জল থাকে, তেমনি কোন কোন ভাবে বা বস্তুতে স্পন্দনস্বরূপ আত্মা অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। যেমন তরলাকারে অপরিণতিপ্রাপ্ত জলমাত্রে জলভাবই বর্ত্তমান, তেমনি কোন কোন ভাবে বা বস্তুতে অস্পন্দ-স্বরূপ মহেশ্বর আত্মা অবস্থিত রহিয়াছেন। এই জন্য উপলাদি স্থাবর বস্তু-সমষ্টি আত্মায় অবস্থিত থাকিয়াও অলোল অর্থাৎ অস্পন্দ এবং সুরার ফেন সুরা হইলেও তাহা

যেমন আকৃতিভেদে চঞ্চল, তেমনি জীবাদি বস্তুবর্গ আত্মাস্বরূপ হইলেও স্পন্দন-ধর্ম্মী বলিয়া বিলোল। এতাবতা বুঝা যায়, সর্ব্বশক্তি আত্মা যে যে দেহে অজ্ঞানশক্তিতে আবিষ্ট হন, সেই সেই দেহ অজ্ঞ আখ্যায় অভিহিত হইয়া থাকে, আর যে দেহে তিনি স্বয়ং ও স্বকল্পিত অজ্ঞানে প্রতিবিম্বিত, সেই দেহে তিনি জীবসংজ্ঞা লাভ করিয়া অবস্থিত। এই জীবই সংসারে মহামোহের মায়াময় পিঞ্জরে আবদ্ধ হস্তীর ন্যায় অবস্থান করিতেছে। জীব ধাতুর প্রাণধারণ অর্থ প্রসিদ্ধ; জীবন বা প্রাণধারণ করেন বলিয়াও তিনি যৌগিক জীব উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। 'অহং' ইত্যাকার অভিমান ধারণে 'অহং' নিশ্চয় করেন বলিয়া বুদ্ধি এবং সঙ্কল্প-মাত্রের মনন বা কল্পনা করেন বলিয়া মনঃসংজ্ঞায় ঐ পরমতত্ত্বই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। স্বকল্পিত স্বাত্মাজ্ঞান বস্তুই প্রকৃতি এবং তাহার হ্রাস ও বৃদ্ধি যোগেই দেহ; সুতরাং দেহের প্রাকৃতিক অংশ জড়, অপিচ তাহাতে যে স্বাত্মসত্তা, তাহা চেতন। এইরূপে দেখা যাইবে, এই চরাচর নিখিল বিশ্বই চেতনাচেতন বা জড়াজড়-স্বরূপ। জড়েতর চেতন এবং চেতনেতর জড়, এই উভয়ের অভ্যন্তরে পরম আত্মতত্ত্ব বিরাজমান। এইরূপে ঐ পরম-তত্ত্বই জড় ও চেতনদৃষ্টির অভ্যন্তরে থাকিয়া বহুপ্রকারতা প্রাপ্ত হন,—হইয়া জীব, বুদ্ধি চিত্ত ইত্যাদি নানানামে প্রথিত হইতেছেন। বৃহদারণ্যক প্রভৃতি বহু বেদান্ত শাস্ত্রে জীবের এতাদৃশরূপ বহু প্রকার বিবৃত আছে বটে, কিন্তু যাহাদের বেদজ্ঞান নাই, যাহারা কুতর্ক ও কুকল্পনায় নিপুণ, তথাবিধ মূঢ় লোকেরাই নিজ মোহবুদ্ধির জন্য উল্লিখিতরূপে বহুবিধ জীব-সংজ্ঞায় ব্যর্থ আস্থা স্থাপন করে।

হে মহাভুজ! এইরূপেই জীব সংসারের কারণ বলিয়া নিরূপিত হন; পরন্তু রাগাদিশূন্য জড়াকৃতি দীন দেহ কখনই কারণ হইতে পারে না। দেহ এবং আত্মা এই উভয়ের মধ্যে আধার ও আধেয় সম্বন্ধ ভিন্ন অন্য কোন স্বরূপ সম্বন্ধ নাই, কাজেই উহাদের একতরের নাশে অন্যতরের বিনাশ হয় না; যদি তাহাই না হয়, তাহা হইলে দেহের নাশে যে আত্মার নাশ হয় না, এ কথা সহজেই প্রতিপন্ন হইয়া পড়ে। একটা বৃহৎ বৃক্ষের একটী পত্র শুষ্ক হইলেই যে তাহার রসক্ষয় হয়, তাহা নহে; কেন

না, ঐ রস সৌর কিরণসমূহের মধ্যেই প্রবেশ করিয়া থাকে। এইরূপ দৃষ্টান্তে বুঝিতে হইবে, শরীর ক্ষয় পাইলে শরীরীর ধ্বংস হয় না, কেন না, শরীরী যদি বাসনাসমন্বিত হয়, তাহা হইলে বাসনায় থাকে আর যদি বাসনা-বিরহিত হয়, তাহা হইলে আকাশে ব্রহ্ম-স্বভাবেই অবস্থান করিতে থাকে। দেহের নাশ হইলে যে অজ্ঞ ব্যক্তি মনে করে যে, আমি নষ্ট হইলাম, তাহার প্রকৃতই বুদ্ধিভ্রম ঘটে। আমার বিবেচনায় তাদৃশ ব্যক্তি মাতার স্তনতট হইতেও বেতাল উৎপত্তির সম্ভাবনায় স্তন্যপানভয়ে জীবনে নিরাশ হইয়া থাকে। যে বজ্র-বন্ধনভূত উপাধির আত্যন্তিক নাশ হইলে জীব ব্রহ্মভাবে প্রত্যভিজ্ঞ হইয়া উদিত অর্থাৎ নিরতিশয় আনন্দরূপ অভ্যুদয় প্রাপ্ত হয়, তথাবিধ চিত্ত-নাশই জীবের বিনাশ এবং তাহাই তাহার মোক্ষ বলিয়া প্রখ্যাত হইয়া থাকে। জীব নষ্ট হইল কিম্বা মৃত হইল, এই প্রকার উক্তি মিথ্যা বলিয়াই মনে হয়। কেন না, এরূপ দেখা গিয়া থাকে যে, দেশ ও কালে অন্তরিত হইয়া ঐ জীব পুনঃপুন দেহান্তর গ্রহণ করে। এ সংসারে মরণদশারূপ নদী-নিচয়ের তরঙ্গমধ্যে তৃণ-প্রায় জীববৃন্দ দেশ ও কালে তিরোহিত হইয়া ভ্রান্তিক্রমে উল্লিখিত প্রকারে মৃত, নষ্ট, জড়, সুখী, দুঃখী ইত্যাদি বিবিধ ভাবের বিতর্ক উত্থাপন করে। বানর যেমন এক বৃক্ষ ছাড়িয়া বৃক্ষান্তর আশ্রয় করে, জীবও তেমনি বাসনাস্থ হইয়া এক দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেহান্তরে অবস্থান করিয়া থাকে।

হে রঘুনন্দন! ঐ জীব পুনরায় সেই আশ্রয় দেহও পরিহার করিয়া ক্ষণকাল মধ্যেই অপর এক সুবিস্তৃত দেশে কালান্তরে অপর এক দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ধূর্ত্ত ধাত্রী যেমন বালকদিগকে অন্য-মনস্ক করাইয়া এদিকে ওদিকে ঘুরাইয়া লইয়া বেড়ায়, জীবগণের স্বরূপ-প্রচ্ছাদিকা বাসনাও তেমনি তাহাদিগকে চিরদিন ধরিয়া চারিদিকে ভ্রামিত করিয়া থাকে। পরস্পর উপযোগী বলিয়া জীবগণই জীব-সমূহের জীবনোপায় হয়। ঐ সকল জীব বাসনাপাশে বেষ্টিত হইয়া প্রথমে গিরিগহ্বরে কষ্টকর কর্ম্মানুষ্ঠান করত জীবনকে জীর্ণ দশায় উপনীত করিলেও পুনরপি পূর্ব্ববৎ কঠোর সাধনা-ব্যাপারে নিরত হইয়া

তাহাকে আরও অধিক জীর্ণ করিতে থাকে। হৃদয়গত বাসনার বশে জীবগণ জীর্ণ হইতে জীর্ণতর হইলেও দারিদ্র্য, রোগ ও বিয়োগাদি বিবিধ দুঃখভার বহন করিয়া থাকে এবং নানাবিধ দেহান্তরাদির পরিণামক্রমে বারবার জর্জ্জরিত হইয়া চিরতরে নিরয়ে নিমগ্ন হইয়া থাকে।

বাল্মীকি বলিলেন,—ভরদ্বাজ! মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ এই পর্য্যন্ত কহিলেই সে দিবস অতীত হইল। প্রভাকর অস্তমিত হইলেন। সভাসদ্‌গণ পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করিয়া সায়ন্তন বিধি সমাধার জন্য স্নান করিতে গমন করিলেন। অনন্তর বিভাবরীর অবসান হইল। রবি-কর-নিকর প্রসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তৎকালে সকল সভ্যই পুনরায় আসিয়া সভাস্থলে যোগদান করিলেন।

একসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭১ ॥

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! দেহ রহিলেও তুমি থাক না, আর দেহ যদি নষ্ট হয়, তাহা হইলেও তুমি নষ্ট হও না। তুমি আত্মা বিশুদ্ধ-স্বরূপ; অকলঙ্ক আত্মাতেই তোমার অবস্থান। দেহ তোমার কেহই নহে। তবে যে দেহে আত্মার সম্বন্ধ কল্পনা করা হয়, তাহা কুণ্ড-বদর কিম্বা ঘটাকাশ-ন্যায়েই হইয়া থাকে; পরন্তু ঐ রূপ কল্পনা নিতান্তই ভ্রান্তি-বিলসিত। অতএব উল্লিখিত ন্যায়ানুসারে দেহ নাশ হইলেই আত্মারও নাশ হয়, এরূপ মনে করা ভ্রমাত্মক বৈ আর কিছুই নহে। দেহীর দেহ স্বভাবতই ভঙ্গপ্রবণ; এ. দেহের ধ্বংসোন্মুখতা দেখিয়া যে জন 'আমি নষ্ট হইলাম' মনে করিয়া খেদ প্রকাশ করে, তাদৃশ অন্ধ-চেতা ব্যক্তি শত শত ধিক্কারেরই যোগ্য পাত্র।

রামচন্দ্র! রথ ও রথরশ্মির যেরূপ পরস্পর সম্বন্ধ, আত্মার সহিত দেহ, চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বর্গের সম্বন্ধও সেইরূপই। এ সম্বন্ধে অনুরাগ বা

বিরাগ কিছুই নাই। সরোবরস্থ পঙ্কের সহিত নির্ম্মল জলের যেমন সম্বন্ধ, আত্মার ও দেহাদির সহিত তেমনি পরস্পর নিরপেক্ষ-সম্বন্ধ। যেমন অতিক্রান্ত পথের জন্য পান্থ জনের খেদ হয় ও প্রাপ্ত পথের জন্য মমতা জন্মে, তেমনি দেহীরও দেহের বিচ্ছেদে দুঃখ ও দেহ সহ সংযোগে মমতা হইয়া থাকে। কিন্তু জানিবে,—দেহীর ঐরূপ দুঃখ বা মমতা অহেতুক ও অকিঞ্চিৎকর। যেমন মনে মনে বেতাল কল্পনা করিয়া সেই কল্পিত বেতালের বিকট বদন-দশনাদি-দর্শনে শিশুগণ ভীত হয়, জানিবে,—স্নেহ কিম্বা সুখাদির কল্পনাও তেমনি মিথ্যা।

হে রাঘব! যেমন একটা বিটপ হইতে বহুসংখ্যক বিচিত্র পুত্তলিকা নির্ম্মিত হয়, তেমনি ভূতপঞ্চক-পিণ্ড হইতেই এই বিভিন্ন জীবসঙ্ঘ উৎপন্ন হইতেছে। যেমন রাশীকৃত কাষ্ঠে কেবল কাষ্ঠ বৈ আর কিছুই দৃষ্ট হয় না, তেমনি এই পাঞ্চভৌতিক দেহে ভূতপঞ্চক ভিন্ন আর কিছুই লক্ষিত হয় না। আহা, রে প্রাণিবৃন্দ! কেন তোমরা এই পঞ্চ-ভূতের সংযোগ ও বিয়োগ দেখিয়া অকারণ আনন্দ ও বিষাদের বশীভূত হইতেছ? বাস্তবিক এরূপ ভাবে বশতাপন্ন হওয়া কিছুতেই উচিত নহে। দেখ, কোমল কামিনী-দেহই বল, আর অন্য কোন সুন্দর সুঠাম পুরুষ-দেহই বল, সকলই পাঞ্চভৌতিক পিণ্ড; উহাতে এমন আতিশয্য কি আছে,—যাহার লোভে তোমরা পাবকে পতঙ্গ-প্রবেশের ন্যায় বিষয়-বহ্নিতে পতিত হইতেছ? জানিও,—পঞ্চভূতের গঠনবিশেষেই অবয়বের সৌন্দর্য্য-সৌষ্ঠব হয়। উহা অজ্ঞদিগের সন্তোষজনক হইলেও যাঁহারা পরমার্থ জ্ঞানে জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহাদিগের চক্ষে কি নারীদেহ, কি নরদেহ, কোন দেহই পঞ্চভূতাতিরিক্ত দৃষ্ট হয় না। শিল্পিগণ একখানি প্রস্তরে নানাবিধ পুত্তলিকা প্রস্তুত করে; ঐ সকল পুত্তলিকার মধ্যে কোনটী পুত্রমূর্ত্তি এবং কোনটী মাতৃমূর্ত্তি হইয়া থাকে, অথচ উহাদের কেহই যেমন কাহারও প্রতি স্নেহানুরক্ত হয় না, তেমনি চিত্ত ও দেহ এই উভয়ের পরস্পর মিলন থাকিলেও একের প্রতি অপরের অনুরাগ-সাহিত্যই নিশ্চিত হয়।

হে রাম! মৃত্তিকাময়ী বহু পুরুষাকৃতির পরস্পর সম্মিলনে যেরূপ

ভাবোদয় হয়, ভবদীয় বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মা, ইহাদিগের সম্মিলন-ঘটনায় তথাবিধ অকিঞ্চন ভাবেরই অভিব্যক্তি হউক। যেমন শিলাময় প্রতিমা সকল পরস্পর পরস্পরের প্রতি স্নেহভাজন হয় না, তেমনি দেহ, ইন্দ্রিয় এবং মন ইহারাও পরস্পর পরস্পারের প্রতি স্নেহাকৃষ্ট হয় না; সুতরাং এ বিষয়ে আর কাহার কি পরিদেবনা হইতে পারে? যেমন নদীতরঙ্গ সকল বিভিন্ন স্থানজাত তৃণ-পরম্পরাকে সবলে আকর্ষণ করিয়া একত্র সম্মিলিত করে, তেমনি আত্মা যিনি, তিনিও ভূতপঞ্চকের একত্র সমবায় করেন মাত্র।

হে রঘুনাথ! সাগরজলে তৃণরাজির ন্যায় এই জীবনিবহ কখন কখন আত্মায় সংযুক্ত ও কখন কখন বা বিযুক্ত হইতেছে। অম্বুধি যেমন আবর্ত্তাদি আকারে উপচিত হইয়া তৃণ-কাষ্ঠাদি বহু বস্তুকে আক্রমণ করিয়া অবস্থান করে, তেমনি আত্মাও চিত্তরূপ পরিধির আশ্রয়ে দেহাদিকে আলিঙ্গন করিয়া বিরাজ করিতেছেন। জল যেমন আপনার স্পন্দনাদির সহায়তায় স্বীয় আবিলতা পরিহারপূর্ব্বক নির্ম্মলতাকেই লাভ করে, আত্মাও তেমনি জ্ঞান-বিকাশে বিষয়-সংস্কার পরিহারপূর্ব্বক স্বস্বরূপতা উপগত হইয়া থাকেন। খেচর দেবাদি জীব যেমন অতি ঊর্দ্ধগত বায়ুস্তরে থাকিয়া বসুধামণ্ডলকে পৃথগবস্থিত বলিয়া মনে করে, তেমনি মুক্ত জীব দেহকেও অসংশ্লিষ্ট বা পৃথক্স্থিতরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। জ্ঞানী পুরুষ ভূতবৃন্দকে পৃথক্স্থিত অবলোকন করেন,—করিয়া দেহাতীত অজ হইয়া দিন-মধ্যগত দিবাকর-দ্যুতির ন্যায় বিশিষ্ট দীপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। তখন আর তাঁহার অজ্ঞান-জনিত মত্ততা থাকে না; এই অবস্থায় তিনি নিজেই নিজেকে বিশিষ্টরূপে বিদিত হইয়া থাকেন। সাগর যেমন তরঙ্গজল-কণা ও কল্লোলাদি বিবিধ আকারভেদে এক অনন্ত জলরাশিরই বিকাশরূপে বিরাজিত আছে, তেমনি এই যে অনন্ত বস্তুপরম্পরায় পরিপূর্ণ সংসার—ইহাও তখন অনন্ত আত্মস্বরূপেই স্পন্দিত হয়।

হে রাম! এ সংসারে উল্লিখিতরূপ মহাজ্ঞানী অনাসক্ত ও নিষ্পাপ ব্যক্তিরাই জীবন্মুক্ত হইয়া বিরাজিত। তাঁহারাই পরম পদে আরোহণ করিয়া স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিয়া থাকেন। যেমন মহার্ণবের মহোর্ম্মি সকল

সাধারণ শিলাখণ্ডগুলির ন্যায় মহার্ঘ মণিরত্নাদির উপর দিয়াও অনাসক্ত-ভাবেই বহিয়া যায়; তেমনি উত্তম পুরুষেরাও বাসনাকে বিসর্জ্জন দিয়া অনাসক্তভাবেই চিত্ত ব্যবহার আশ্রয়পূর্ব্বক বিচরণ করিয়া থাকেন। যেমন স্বীয় কূল-পতিত তৃণ-কাষ্ঠাদি কিম্বা অন্তরীক্ষাগত ধূলি সম্পর্ক দ্বারা সমুদ্রের কোনই মালিন্য-যোগ হয় না, তেমনি যিনি আত্মজ্ঞানসম্পন্ন সাধু-ব্যক্তি, তাঁহার লৌকিক ব্যবহারাচরণ দ্বারাও তিনি কখনই মলিনিমায় লিপ্ত হন না। স্বচ্ছ বস্তুর সম্পর্ক হউক কিম্বা মলিন বস্তুর আশ্লেষ থাকুক, তাহাতে যেমন সাগরের স্বচ্ছতা বা কলুষতা কিছুই হয় না, তেমনি আত্মজ্ঞ ব্যক্তির নিকট স্বচ্ছ ব্যবহার উপস্থিত হউক কিম্বা কলুষ ব্যবহারই উপস্থিত হউক, তাহাতে তাঁহার অনুরাগ বা দ্বেষ কিছুই কখন জন্মে না; কেন জন্মে না? তাহার কারণ এই যে,তাঁহারা বুঝিয়া রাখেন যে,জাগতিক যাবতীয় ব্যবহারই চেত্যোন্মুখ চিত্তত্ত্বের স্ফুরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে।

হে রঘুনন্দন! এই যে আমি আছি, আর ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান, এই ত্রৈকালিক যাহা আছে, এতৎসমস্তই দৃশ্য-দর্শনের সম্পর্ক নিবন্ধন মনেরই প্রকাশ মাত্র। এই সংসারে যাহা কিছু দেখা যায়, তৎসমস্ত সৎ কিম্বা অসৎ, সে বিচারণায় দৃষ্টি বিস্তার নিষ্প্রয়োজন; ফলে ঐ সকল জগদ্ব্যবহার যাহাই হয় হউক, বুঝিতে হইবে, ও-সকল ব্যাপারে শোক বা হর্ষের কোনই কারণ নাই। দেখ—সত্য, অসত্য এবং সত্যাসত্য, এই ত্রিবিধ কর্ম্মেই শোক বা হর্ষের অবসর কিছুই হইতে পারে না। কেন না, যাহা অসত্য, তাহা নিত্যই অসত্য, তাহাতে হর্ষ-শোকের নির্ব্বিষয়তা স্পষ্টতই প্রতিপন্ন, আর যাহা সত্য, তাহারও নিত্যসত্তা হেতু লাভ প্রযুক্ত হর্ষাভাবে শোকের অযোগ্যতা সুস্পষ্ট এবং যাহা সত্যাসত্য, তাহাও বিরুদ্ধ ঐক্যযোগের অসদ্ভাবে অসৎ বলিয়াই প্রতিভাত। অতএব এ জগতে হর্ষ-শোকের যোগ্যতা কিছুই নাই; সুতরাং জানিবে—সে বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হওয়া বৃথা। যাহা বৃথা, তাহার জন্য আর কেন মুগ্ধ হইতেছ?

হে সুদৃষ্টি-শালিন্! অধুনা মিথ্যা দৃষ্টি পরিত্যাগ কর,—করিয়া যাহা পরমার্থ, তাহাই নিরীক্ষণ করিতে থাক। দেখ, যিনি প্রাজ্ঞ তত্ত্ব-দৃষ্টি-সম্পন্ন, তিনি কোন বিষয়েই মোহগ্রস্ত হন না। সত্য বটে, দৃশ্যের

দর্শন ব্যাপারে মিথ্যা জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহাতে যে মাত্র স্বীয় অনুভূতি দ্বারা সম্বেদ্য পরমাত্মবিষয়ক সুখ উৎপন্ন হয়, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিরা তাহাকেই সারাৎসার ব্রহ্মস্বরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং দৃশ্যের দর্শনসম্বন্ধে যে সুখ হয়, তাহা অতীব উত্তম। উল্লিখিত দৃশ্য দর্শন অজ্ঞ ব্যক্তির সংসারভার উৎপাদন করে, আর যিনি প্রাজ্ঞ জন; তাঁহাকে নিত্য মুক্তি সমর্পণ করিয়া থাকে ; এই জন্য যাঁহারা আত্মজ্ঞানী, তাঁহারাই তজ্জনিত সুখ অনুভব করিতে থাকেন। আস্বাদ্যমান বিষয়ে যে রাগাদি দোষ উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই বন্ধন ঘটে এবং সেই বন্ধন হইতে যে মোচন, তাহাই মুক্তি নামে নিরূপিত হয়। এই মুক্তি দৃশ্য দর্শন হইতে উৎপন্ন ; উহা অনন্ত সুখজ্ঞান ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, এই জাগতিক ব্যাপারে যে অস্তোদয়-হীন পূর্ণানন্দময় অনুভূতিজ্ঞান, তাহারই নাম মুক্তি। এই প্রকার মুক্তি আশ্রয় করিলেই তোমার অজ্ঞানদৃষ্টি দূর হইয়া যাইবে এবং তোমার যাহা স্বরূপদৃষ্টি, তাহা প্রকাশ পাইবে।

হে রঘুবর! এই যে দৃশ্য দর্শন-ঘটিত জ্ঞান, ইহাই ক্রমে ক্রমে তুরীয় ব্রহ্মে উপনীত হইয়া মুক্তিস্বরূপে অবস্থিত হয়। এই অবস্থায় আত্মা না স্থূল, না সূক্ষ্ম, না প্রত্যক্ষ, না অপ্রত্যক্ষ, না চেতন, না অচেতন, না অভাবসম্পন্ন, না নিত্য সত্তা-বিশিস্ট, এইরূপ ভাবেই উপলব্ধ হইয়া থাকেন। তৎকালে তিনি—আমি বা অন্য কেহ, এরূপ ভাবেও অনুভূতি-গোচর হন না এবং এক কিম্বা অনেক, এরূপ ভাবেও তাঁহাকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় না। তিনি না সমীপস্থ, না দূরস্থ, না সর্ব্বত্র-গামী, না একত্র-গামী, না লভ্য, না অলভ্য, না পদার্থ, না অপদার্থ, কিছুই নহেন। তিনি না পঞ্চভূত, বা না পঞ্চভূতের আত্মা, কিছুই থাকেন না। ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের আস্পদ মন—এই যাহা অনুভূত হইতেছে, ইহার অতীত পদেও তিনি অবস্থান করেন না। এই দৃশ্য বিশ্বকে যিনি যথাবস্থিতরূপে তত্ত্বতঃ অবলোকন করেন, তাদৃশ বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট এ বিশ্বসংসার আত্মাময় হইয়া থাকে। তিনি দেখেন, আত্মা ভিন্ন আর কিছুই বিদ্যমান নাই। প্রশ্ন হইতে পারে, কিরূপে তাহা হইলে ক্ষিতি প্রভৃতির ভূততা পরিদৃষ্ট হয়?

উত্তরে বক্তব্য, একমাত্র আত্মাই ক্ষিতি প্রভৃতি মহাভূতপঞ্চকের কাঠিন্য, দ্রবত্ব, স্পন্দন, শূন্য ও প্রকাশের অবলোকনে ক্রমশঃ ভূ, বারি, প্রভৃতি জাগতিক ভাবসমূহে নটের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন।

হে রাম! বস্তু-পরম্পরার যে যে সত্তাই হউক, চিদাত্মা ব্যতীত তাহার কেহই অবস্থান করে না; যে হেতু চিদ্ব্যতীত বস্তুসত্তা থাকে না, এই জন্যই বলিতে হয়, 'আমি আত্মা হইতে অতিরিক্ত' এরূপ কথা উন্মত্তেরই প্রলাপ-বাক্য। জানিবে,—সকল কালে অনন্ত কল্পক্রমের অভ্যন্তরে যে সকল জগৎ নিবিষ্ট এবং সেই জগতের অভ্যন্তরে যে সকল জীবসংসার অবস্থিত, সকলই সেই একমাত্র আত্মা; আত্মা ব্যতীত ইতর কাল-কলনা কিছুই কুত্রাপি নাই। হে মহাত্মন্! তুমি এইরূপই বুদ্ধি-সম্পন্ন হও,—হইয়া ঈদৃশ বুদ্ধির সহায়তাগুণেই এ সংসার অতিক্রমপূর্ব্বক অবস্থান করিতে থাক।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭২ ॥

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! যেমন নিপুণ রত্ন-পরীক্ষকেরা চিন্তামণি প্রাপ্ত হয়, তেমনি যাঁহারা তত্ত্বজ্ঞানশালী বিবেকী ব্যক্তি, তাঁহারাই ঐরূপ বিচারবতী দৃষ্টি দ্বারা দ্বৈতভাব পরিহার করিয়া,—যাহা স্বস্বরূপে অবস্থানরূপ মুক্তি, তাহাই লাভ করিয়া থাকেন।

হে রাম! অধুনা অপর দৃষ্টির বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মদুক্ত দৃষ্টির সহায়তাগুণেই তুমি দিব্য দৃষ্টি-শালী হইবে এবং দৃশ্য মধ্যে অটল ও অচলভাবে অবস্থিত আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। তখন বুঝিবে,—আকাশ আমি, সূর্য্য আমি, দিঙ্মণ্ডল আমি, পাতাল আমি, দৈত্য আমি, দেবতা আমি, এমন কি সমস্তই আমি। আমি দিন, আমি রাত্রি, আমি পৃথ্বী, আমি সর্ব্ব বস্তু, আমি বায়ু, ও আমি অগ্নি, অধিক কি, এ জগতের যাহা কিছু, তৎসমুদায়ই আমা ভিন্ন নহে; এই জগতের সর্ব্বত্রই

আমি আত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি। আমি সর্ব্বাতিরিক্ত ভাবে কেহই নহি। এই দেহাদিও আমা ব্যতিরিক্ত নহে। আমি এক অদ্বিতীয়; সুতরাং আমার আবার দ্বিত্ব কল্পনা কি প্রকার? তাই বলিতেছি, হে রাম! তুমি অন্তরে ঐরূপ স্থির নিশ্চয় রাখিয়া,—এ জগৎকে আত্মময় অবলোকন কর। এইরূপ দর্শনে অজিতেন্দ্রিয় লোকের ন্যায় তোমাকে কখন হর্ষ বা বিষাদে পরিভূত হইতে হইবে না।

হে কমলাক্ষ! এই নিখিল বিশ্ব-সংসার যদি আত্মভাবেই অবস্থিত রহিল, তাহা হইলে বল দেখি, কে আত্মীয় আর কেই বা পর হইয়া দাঁড়াইল? যিনি তত্ত্বজ্ঞানশালী হন, তাঁহার হর্ষই হউক আর বিষাদই হউক, তাহাতে তাঁহার অভিভব ঘটে না, তিনি জগন্ময় আকারেই অবস্থান করিতে থাকেন। তত্ত্বজ্ঞান হইতে দ্বিবিধ নির্ম্মল পারমার্থিক 'অহং' দৃষ্টি জন্মিয়া থাকে। উক্ত উভয় দৃষ্টিই মুক্তি প্রদান করে। হে রঘুবর! আমি আকাশের ন্যায় অতি সূক্ষ্ম ও সর্ব্বাতীত; এইরূপ 'অহং'দৃষ্টিই ঐ পূর্ব্বোক্ত উভয় দৃষ্টির মধ্যে প্রথম আর আমিই সমস্ত, আমা ব্যতীত আর কিছুই নহে, এইরূপ 'অহং' দৃষ্টিই দ্বিতীয়।

হে অনঘ! উক্ত দ্বিবিধ দৃষ্টি ব্যতীত আর এক তৃতীয় 'অহং' দৃষ্টি আছে, তাহাতে 'আমিই দেহ' এই প্রকার দেহাভিমান প্রকট হইয়া উঠে। জানিবে,—এরূপ দেহাভিমান-জনিকা দৃষ্টি কখনই শান্তির কারণ হয় না; প্রত্যুত উহাতে কেবল দুঃখই বিস্তার পাইয়া থাকে।

হে রাম! সর্ব্বসিদ্ধি লাভের জন্য ঐ ত্রিবিধ 'অহং' দৃষ্টিই তুমি পরিত্যাগ কর,—করিয়া বিশুদ্ধ চিন্মাত্রকেই আশ্রয় করিয়া স্বাবলম্বন-ভাবে অবস্থান করিতে থাক। এই অবস্থায় আত্মা সর্ব্বাতীত, সর্ব্ব সত্তা-বিরহিত ও অসত্তাময় জগতের আবরক হইয়াও সর্ব্বপ্রকাশকরূপে বিরাজ করিতে থাকেন।

হে তত্ত্বাভিজ্ঞ! তুমি যুক্তি কিম্বা শাস্ত্রাদেশের অনুসরণ না করিয়া কেবল নিজের অনুভবেই দর্শন করিতে থাক, এইরূপ করিতে করিতে বাসনার সহিত হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি ছেদন করিয়া ফেলো। জানিবে,—অনুমানই হউক, বা আপ্ত-বাক্যই হউক, তাহার কোন একটী দ্বারাই কদাচ

আত্মার সত্তা স্থিরীকৃত হয় না, কেবল মাত্র স্বীয় অনুভূতি দ্বারাই তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বস্বরূপে প্রত্যক্ষ হইয়া থাকেন। স্পর্শ-স্পন্দাদি যে কিছু ব্যবহার প্রকট হয়, তৎসমুদায়ের বাহ্য উপাধি যদি পরিত্যাগ করা হয়, তাহা হইলে একমাত্র বিভু আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন। সেই আত্ম-দেব না সৎ, না অসৎ, না অণু, না মহান্, কিছুই নহেন। তিনি নেত্রদ্বয়ের গোচর না হইলেও সর্ব্বত্রই তাঁহার অবস্থান। তিনিই বাগী-ন্দ্রিয়ের ব্যবহারী অথচ তিনি বাক্‌শক্তি-বিহীন। কাজেই দেখিবে—নির্ম্মল আত্মাই আছেন, তিনি ব্যতীত আর কিছুই নাই। তবে যে এইরূপ একটা সংজ্ঞা নির্দ্দেশ হয় যে, 'আমি ইহা নহি, বা এই আমি' ইহা সতত অজ্ঞানরূপ স্বীয় শক্তির প্রভাবে স্বয়ং আত্মাই আপনাতে কল্পনা করিয়াছেন।

হে রাম! ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান, এই কালত্রয়েই আত্মা প্রভাবশালী হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি অতি সূক্ষ্ম বা অতি মহান্, এরূপ ভাবে তাঁহাকে অনুভব করা যায় না। যদিও অনন্ত পদার্থপরম্পরা আছে, তথাপি তিনি পুর্য্যষ্টকরূপ আদর্শে প্রতিবিম্ব-পাতে জীবরূপে প্রকটিত হন। যেমন অন্তরীক্ষদেশে মেঘের সঞ্চলন দেখিয়া বায়ুর সত্তা স্থির করা যায়, তেমনি ঐ পুর্য্যস্টকের স্ফুরণ ক্রমেই সর্ব্বগামী আত্মার অনুভব হইয়া থাকে। আত্মা চিন্ময়; তিনি সর্ব্বগামী ও সর্ব্বব্যাপী হইলেও কুত্রাপি অবস্থান করেন না। পদার্থপরম্পরার সত্তার ন্যায় তাঁহার প্রতীতি হয় না, তিনি এক দেহে আছেন আর অন্য দেহে নাই, এরূপ নহে। যেমন পবন থাকিলেই ধূলির বিকাশ হয়, আর দীপ থাকিলেই চক্ষুর প্রকাশ ঘটে, তেমনি পুর্য্যষ্টক থাকিলেই তাহাতে জীবের স্ফুরণ হয়, সাধারণ উপলে তাঁহার স্ফুরণ হয় না অর্থাৎ পুর্য্যষ্টকেই আত্মার স্পস্ট উদয় হয়, আর তাহাতেই তিনি 'অহং' ইত্যাকারে অনুভূয়মান হইয়া থাকেন। যে যে দেহে পুর্য্যষ্টক, সেই সেই দেহেই তাঁহার স্ফূর্ত্তি অধিক দেখা যায়। উপলাদি পদার্থের পুর্য্যষ্টক নাই বলিয়া সে সমুদায়ে তাঁহার স্ফূর্ত্তি বা ব্যক্তভাবের একান্তই অভাব দেখা যায়।

রামচন্দ্র! আকাশে সূর্য্যের উদয় হইলেই লোক সকলের যেমন

কর্ম্মস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, তেমনি আত্মা যখন স্বস্বরূপে থাকেন, তখনই তাঁহার অসাধারণ প্রীতি ও বিচিত্র ভোগেচ্ছা পুর্য্যষ্টকেই প্রতিভাত হইয়া থাকে। অর্থাৎ আত্মাই প্রিয়াপ্রিয়াদি নিখিল ব্যবহারের নির্ব্বাহক হইয়া থাকেন। বলিতে পার, আকাশে সূর্য্য থাকিলেও লোকের ইচ্ছানুরূপ ব্যবহার নষ্ট হইয়া থাকে, এরূপ ব্যবহার-নাশে সূর্য্যের কি কোন ক্ষতি হয়? এইরূপ বিভু আত্মা স্ব-স্বরূপে থাকিলেও তাঁহারই সত্তাবলম্বনস্থ দেহ যদি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আত্মার কি ক্ষতি হইয়া থাকে? উত্তরে বলি—এ কথা সত্য; কেন না, আত্মার জন্ম নাই; মরণ নাই, তিনি কোন একটা বিষয়ের বাসনাও পোষণ করেন না, কোন বিষয় গ্রহণ করেন না এবং তাঁহাকে যে কেহ কখন বদ্ধ বা মুক্ত করে, তাহাও নহে। দিক্ কিম্বা কালাদি দ্বারা তাঁহার অবচ্ছেদ হয় না বলিয়া কদাচ তাঁহাকে বদ্ধ-আখ্যায় অভিহিত করা যায় না। তিনি অবদ্ধ; কাজেই বন্ধনের অভাবে তাঁহার মুক্তিই বা কোথায়? মুক্তি নাই; সুতরাং তিনি অমুক্ত অবস্থাতেই সতত অবস্থিত।

হে রাঘব! জানিও,—সমুদায় জীবেরই আত্মা এইরূপই স্বভাব-সম্পন্ন। তবে যে মূঢ় লোকেরা তাঁহার জন্য শোক করে, তাহা তাহাদের স্ব স্ব অজ্ঞতারই ফল বৈ আর কিছুই নহে। হে সুমতে! তুমি পূর্ব্বাপর নিখিল জগদ্ব্যাপার বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখ,—দেখিলে মুর্খ লোকের ন্যায় কখনই তোমাকে শোকগ্রস্ত হইতে হইবে না। জলযন্ত্র যথাস্থানে বিন্যস্ত হইয়া পেষণে প্রবৃত্ত হইলে তৎসন্নিহিত পুরুষ যেমন উক্ত কর্ম্মেই লিপ্ত বলিয়া বোধ হয়; পরন্তু সে যেমন স্বতই ব্যাপারশূন্য হইয়া অবস্থান করে, যিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি, তাঁহারও তেমনি বন্ধ-মোক্ষময় বৈষয়িক কর্ম্ম-পরম্পরা পরিহার করিয়া স্বভাবতঃ নির্ব্যাপারভাবেই দেহাদির সহিত ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

রামচন্দ্র! যাহাকে মোক্ষ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়, তাহা না পাতালে, না ভূমণ্ডলে, না অন্তরীক্ষে, কুত্রাপি নাই। বলিবে, তবে মোক্ষ কি, বা কিপ্রকার? উত্তরে বলা যায়, উহা কেবল সম্যক্ জ্ঞান বিবোধিত বিমল চিত্ত ব্যতীত আর কিছুই নহে। যে কিছু বাঞ্ছিত বিষয় আছে,

তাহাতে অনাসক্তি হইলে ক্রমশঃ যে চিত্ত ক্ষয় সজ্ঘটিত হয়, যাঁহারা আত্ম-দর্শী তত্ত্ববিৎ, তাঁহারা তাহাকেই মোক্ষ নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

হে রাম! যে পর্য্যন্ত না বিমল বোধ সমুদিত হয়, মানব স্বীয় মূর্খতা ও দীনতা বশতঃ ভক্তির সহিত ততদিন যাবৎই মোক্ষ কামনা করে। পরন্তু চিত্ত যখন পরম প্রবোধ প্রাপ্ত হইয়া চিদাকারতা উপগত হয়, লোকে তখন দশবিধ মোক্ষেরও কামনা করে না; সুতরাং এক প্রকার মোক্ষের কথা আর কি বলিব? হে অভব! ইহা বন্ধ, আর ইহা মোক্ষ, এই প্রকার কোমল কল্পনা তুমি পরিহার কর,—করিয়া মহাত্যাগী হও, —মহাত্যাগী হইয়া তুমিই সেই মোক্ষস্বরূপে বিরাজ কর।

রামচন্দ্র! তোমার বিকল্পবুদ্ধি বিদূরিত হউক। এই অবস্থায় তুমি সতত সমুদিতশ্রী হইয়া অবস্থান কর, অন্তরে তোমার অসঙ্গভাব চির-বিরাজিত হউক। এই ভাবে তুমি এই সাগর-পরিখা-পরিবেষ্টিত পৃথ্বী-মণ্ডলকে দীর্ঘ কাল পরিপালন করিতে থাক।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৩॥

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যেমন স্ত্রী-পুত্রাদি প্রিয়জনগণের মুখাবলোকন করিতে না পারিলে মূঢ়জনের হৃদয়ে বিষাদ সঞ্চার হয়, তেমনি অজ্ঞদিগের আত্মা পরমপ্রেমাস্পদ স্বরূপ দর্শন করিতে পারে না বলিয়া তাহাতে কালক্রমে চিদ্‌বিলাসবশেই দেহাভিমান উৎপন্ন হয়; অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম সমষ্টি-ব্যষ্টি দেহ জন্মিয়া থাকে। ঐ দেহাভিমানের ফলে সুরাস্বাদের ন্যায় একটা মদ-শক্তি আসিয়া আবির্ভূত হয়। ঐ মহতী মায়ামদশক্তি মিথ্যাস্বরূপিণী ও রাগদ্বেষাদিময়ী; মরুপ্রদেশে তীব্র আতপের সম্পর্ক বশতঃ যেমন অসত্য সলিলের অস্তিত্ব দেখা যায়, তেমনি পরমাত্মার ঐ যাহা অন্যথা ভাব-জনিতা বিকারবর্ত্তী রাগাদি-শক্তি, তাহারই

প্রভাবে এ জগতের উৎপত্তি-স্থিতি সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। সাগর যেমন তরঙ্গাদি নানাকারে পরিণতি প্রাপ্ত স্বস্বরূপ সলিলেই পরিস্ফুরিত হয়, তেমনি আত্মাই মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়বর্গ ও বাসনা ইত্যাদিরূপে কল্পিত নানা বিভিন্ন নামে বিকাশ পাইতেছেন।

হে রাম! চিত্ত ও অহঙ্কারের পার্থক্য শব্দমাত্রেই পর্য্যবসিত; বস্তুতঃ দ্বৈবিধ্য তাহাতে নাই। কেন না, চিত্তই অহঙ্কার এবং যাহা অহঙ্কার, তাহাই চিত্ত আখ্যায় অভিহিত। হিম হইতে শুক্লতার পার্থক্য কল্পনার ন্যায় চিত্ত ও অহঙ্কারের ভেদ কল্পনা মিথ্যা বলিয়াই বিজ্ঞেয়। যেমন শুক্ল পট নষ্ট হইলে পট ও তদীয় শুক্লতা উভয়ই নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি চিত্ত ও অহঙ্কার এই উভয়ের মধ্যে একের অপায়ে ঐ উভয়েরই অপায় নিশ্চয় ঘটিয়া থাকে। সেই জন্য উপদেশ এই যে, তুচ্ছ মোক্ষবুদ্ধি ও তুচ্ছ বন্ধবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় বিবেক ও বৈরাগ্যবলে মনের অস্তিত্ব অপনীত করাই কর্ত্তব্য। আমার মুক্তি হউক, অন্তরে এই প্রকার চিন্তার উদয় হইলেই চিত্ত বিকাশ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু ঐ চিত্ত যদি মননোৎসুক হয়, তাহা হইলে উহাই শরীরাকারে পরিণত হয়,—হইয়া বহির্ম্মুখতার আপাদনে কেবল দোষেরই আস্পদ হইয়া থাকে।

হে রাঘব! আত্মা যখন সর্ব্বাতীত বা সর্ব্বভূতে বিস্তৃত, তখন তাঁহার বন্ধনই বা কি আর মোক্ষই বা কি? অতএব মনের মননধর্ম্ম যাহাতে নির্ম্মূল হয়, সর্ব্বতোভাবে তোমার অধুনা তাহাই করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ পরিচ্ছিন্ন দেহভাবই দোষের হইয়া থাকে; পরন্তু শুদ্ধাত্মভাব বা জগদাত্মভাব দোষের নহে। সুতরাং যাহাতে পরিচ্ছেদ-মনন নির্ম্মূল হইয়া যায়, তুমি এক্ষণে তাহাই কর। বায়ু স্পন্দনধর্ম্মী; সুতরাং সে যখন দেহ মধ্যে সঞ্চলন করে, তখন হস্ত, পদ ও রসনাদিরূপ পল্লবদল স্ফুরিত হয়। বায়ু যেমন বৃক্ষে সংলগ্ন হইয়া পল্লবশ্রেণীকে চালিত করে, দেহ-মধ্যস্থ পবনও তেমনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গসমূহকে পরিচালিত করিয়া থাকে। কিন্তু হে রামচন্দ্র! যিনি সর্ব্বব্যাপিনী অতি সূক্ষ্ম চিৎশক্তি, তিনি স্বয়ং চঞ্চলা নহেন এবং কেহ তাঁহাকে চালিত করিতেও সক্ষম নহে। সুমেরু যেমন সমীরবেগে চালিত হয় না, চিৎশক্তিও তেমনি স্বভাব হইতে

কদাচ কিছুতেই চালিত হইবার নহেন। চিৎ কেবল স্বীয় আত্মাতেই অবস্থিত; তাঁহাতে সর্ব্ববস্তুরই প্রতিবিম্বপাত হয়, তিনি দীপশিখার ন্যায় বোধসম্পর্কে এই সকল জগৎসংসারকে প্রকাশিত করিতেছেন।

হে রঘুনাথ! এই প্রকারে আত্মার স্বরূপত্ব সিদ্ধি স্পষ্টতই রহিয়াছে; অথচ মূঢ়মতি মানবেরা কেন যে অকারণ 'এই আমার অবয়ব, এই আমি বর্ত্তমান' এইরূপে মুগ্ধ হইয়া দুঃখভোগ করে, তাহা ত বাস্তবিকই বিস্ময়ের বিষয়! মূঢ় লোকেরা আপনাকে জ্ঞাতা, ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া বুঝে; তাহাদের এই প্রকার বোধ কেবল তাহাদিগের দেহাভিমান-জনিত ভ্রান্তি দর্শনের কার্য্য বৈ আর কিছুই নহে। কেন না, ঐরূপ দুর্ব্বুদ্ধি দ্বারাই আমি ভোক্তা, আমি কর্ত্তা, আমি জ্ঞাতা, ইত্যাদিরূপ বাসনারাশি মরুদেশস্থ মৃগতৃষ্ণার ন্যায় বস্তুতঃ বৃথাই দুঃখপ্রদ হয়।

হে রাম! মনোরূপ মত্ত হরিণ বিষয়তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়, ঐ মিথ্যাভূত অজ্ঞতা মৃগতৃষ্ণার ন্যায় আপাততঃ সত্যরূপে প্রতীত হইয়াই তাহাকে আকর্ষণ করিতে থাকে; পরন্তু যখনই ঐ অবিদ্যাকে নিরবয়বা বলিয়া মিথ্যাকারে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, ব্রাহ্মণসমিতি হইতে চণ্ডাল-কন্যার অপসারণের ন্যায় তখনই উহা দূরে পলায়ন করে। মরীচিকার তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে তাহা যেমন আর মৃগাকর্ষণে সমর্থ হয় না, তেমনি ঐ অবিদ্যাও বিশেষরূপে বিজ্ঞাত হইলে কদাচ জীবকে নিজায়ত্ত করিতে পারে না।

হে রাঘব! যেমন দীপালোকে অন্ধকারশ্রী নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি পরমার্থ-জ্ঞানের উদয় হইলে বাসনাজাল সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। তৎকালে আলোকবিকাশবৎ আত্মপ্রকাশ হইতে থাকে, এবং শাস্ত্র-যুক্তির সহায়তায় অবিদ্যার অভাব সিদ্ধি ঘটনায়—যেমন সন্তাপসম্পর্কে তুষারকণিকা লয় পায়, তেমনি তখন অবিদ্যা ক্রমশই ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে। এ দেহ জড়, ইহার জন্য ভোগাদির কোনই প্রয়োজন নাই; এইরূপ সিদ্ধান্তই আশামূলক অজ্ঞানকে উন্মূলিত করে। এই অজ্ঞানধ্বংস সিংহ-কৃত পঞ্জরধ্বংসেরই অনুরূপ হইয়া থাকে।

হে রাম! হৃদয় হইতে আশাবন্ধন উচ্ছিন্ন হইলে পুরুষ চন্দ্রের

ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী হইয়া আহ্লাদময় হইয়া উঠেন। বৃষ্টিপাতে বিধৌত গিরিতটের ন্যায় তিনি সুশীতল হন। অবিবেকী দরিদ্র জন লব্ধরাজ্য হইয়া যেরূপ সন্তোষ লাভ করে, সে পুরুষ তেমনি পরম সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। শারদীয় আকাশবৎ তাঁহার অসাধারণ শোভার আবির্ভাব হয়। তিনি প্রলয়-পয়োধির ন্যায় আপনাতে আপনি অপরিমাণ হইয়া উঠেন। বৃষ্টি-বিরহিত বারিধরের ন্যায় তাঁহার কোনই উদ্যম থাকে না; প্রশান্ত পয়োনিধির ন্যায় আপনাতেই তিনি শান্তি লাভ করেন। সুমেরু শৈলের ন্যায় তদীয় স্থিরত্ব প্রাপ্তি হয়। অকাষ্ঠ-জ্বলিত পাবকের ন্যায় তিনি স্বচ্ছ শোভায় সুশোভিত হইতে থাকেন। নির্ব্বাণ দীপের ন্যায় আত্মাতেই তাঁহার নির্ব্বাণ প্রাপ্তি হয়। পীযূষপায়ী মানবের ন্যায় তিনি পরম তৃপ্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন অভ্যন্তরে দীপান্বিত ঘটের মধ্যে জ্বলিত পাবক ও দীপ্তিযুক্ত মণি, তেমনি তিনি অন্তরে স্বপ্রকাশ হইতে থাকেন।

রামচন্দ্র! তৎকালে সেই জ্ঞানী পুরুষ স্বীয় আত্মাকে সর্ব্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বনায়ক, সর্ব্বাকার ও নিরাকাররূপে অবলোকন করেন। তাঁহার যে সকল সুকোমল দিবস অতীত হইয়াছে, যে সকল দিনে তদীয় হৃদয় স্মর-শরে জর্জ্জরিত ও একান্ত বিবশীকৃত হইয়াছিল, তখন তৎসমুদায়ের প্রতি তিনি উপহাস করিতে থাকেন। তিনি তখন বিশুদ্ধ আত্মস্বরূপে অবস্থান করেন। তিনি সংসারসঙ্গ বা সংসাররঞ্জনা হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া মনোজ্বর বিদূরিত করেন। তাঁহার চিত্ত পবিত্র হয়। তিনি পরিপূর্ণ ও অধ্যাত্মরতি হইয়া অবস্থান করেন। তাঁহার কামপঙ্ক প্রক্ষালিত হইয়া যায়, তিনি স্বীয় ভ্রমবন্ধনের উচ্ছেদ সাধন করেন। তাঁহার সংসার-পারাবারের পরপার প্রাপ্তি ঘটে। তিনি তখন দ্বন্দ্বদোষ-ভয়ে কিছু মাত্র ভীত হন না। যাহা দুর্লভ পরম পদার্থ, তাহা তখন তাঁহার লব্ধ হয়। তিনি পরমার্থ লাভ করিয়া তখন চরমে বিশ্রাম-সুখ ভোগ করেন; যে স্থানে গিয়া পুনরায় আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা তিনি তাদৃশ স্থানেই অবস্থান করিতে থাকেন। তাঁহার ব্যবহার তখন সকলেরই বাঞ্ছনীয় হয়; কিন্তু তিনি তৎকালে কিছুরই বাঞ্ছা করেন না, তাঁহার আনন্দ সকলেরই অনুমোদিত হয়,

কিন্তু তিনি কিছুতেই কিছু অনুমোদন করেন না। তৎকালে তিনি কিছুই দান করেন না, কিছুই গ্রহণ করেন না, কাহাকে স্তব করেন না বা কাহারও নিন্দা করেন না। তিনি অস্তোদয়-বিরহিত ভাবে অবস্থান করিতে থাকেন, তাঁহার সন্তোষ বা শোক প্রকাশ কিছুতেই নাই। তিনি তখন শোক, সন্তোষ, কিছুই প্রকাশ করেন না।

হে রঘুনায়ক! এইরূপে সর্ব্বব্যাপার ও সর্ব্ববাসনা হইতে বিরত হইয়া যদি সর্ব্ববিধ উপাধি পরিত্যাগ করা যায়, তাহা হইলেই জীব জীবন্মুক্ত হয়। রাম! তুমি অধুনা সকল বাসনা ত্যাগ কর,—করিয়া ধারাবর্ষণান্তে ধারাধরের ন্যায় মৌনী হইয়া অবস্থান করিতে থাক। বাসনা-ত্যাগ বিধুর ন্যায় একান্তই শীতলতা-জনক; তাহাতে অন্তঃকরণ এরূপ শীতল হইয়া উঠে যে, বোধ হয় সুন্দরী রমণীর আলিঙ্গনেও তাদৃশ সুখ হয় না। বলিতে কি, সর্ব্বাঙ্গের শীতলতা-জনক নৈরাশ্য যেমন অন্তরে সুখ সন্নিধান করে, স্বয়ং চন্দ্রমা কণ্ঠলগ্ন হইলেও তথাবিধ শৈত্য সুখ প্রদানে সমর্থ নহেন। নৈরাশ্য পূর্ণ-মনা উদারমতি মুনি যেমন সুশোভিত হইয়া থাকেন, মনে হয় নব কুসুমিত লতাজালে বসন্তও তেমনি বিরাজ করে না। নৈরাশ্যই পরম সুখ এবং নৈরাশ্যই পরম শীতলতা। নৈরাশ্য হইতে যে শীতলতা প্রাপ্ত হওয়া যায়, কি হিমাদ্রি, কি মুক্তহার, কি কদলীস্তম্ব, কি চন্দন, কি চন্দ্রমা, ইহাদের কোন একটী হইতেই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। রাজ্য বল, স্বর্গ বল, ইন্দু বল, মাধব বল, কিম্বা কান্তাসঙ্গ বল, ইহাদের কোন কিছু হইতেই প্রকৃত সুখ ঘটে না; একমাত্র নৈরাশ্যই পরম সুখ,—নৈরাশ্য হইতেই প্রকৃত সুখোদয় হয়।

হে সাধুশীল! যেখানে ত্রিভুবনের ঐশ্বর্য্যও তৃণের ন্যায় কোনই উপকারে আইসে না, তাহাই পরম নির্ব্বৃতি; সে নির্ব্বৃতি একমাত্র নৈরাশ্য হইতেই ঘটিয়া থাকে। তাই বলিতেছি, যাহা আপৎস্বরূপ করঞ্জের কুঠার, পরম সন্তোষের একমাত্র আস্পদ ও শান্তিময় পাদপের পুষ্পাস্তবকস্বরূপ, তুমি সেই নৈরাশ্য আশ্রয় কর। যিনি নৈরাশ্যভূষণে বিভূষিত হইয়া থাকেন, এই ভূবলয় তাঁহার নিকট গোষ্পদ, সুমেরু সামান্য শুষ্ক বৃক্ষ ও দিগ্‌বিভাগ একটা ক্ষুদ্র পেটিকামাত্র বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। এই সংসারের

প্রতি যাঁহাদিগের কোনই বাসনা নাই, তাদৃশ মহাত্মগণ কি দান, কি প্রতিগ্রহ, কি সঞ্চয়, কি ভোগ, কি বিভবাদি, এই সমুদায়ের প্রতিই একান্ত উপহাস প্রকাশ করেন। যাঁহার হৃদয় কখনই আশায় অধিকার করে না, এই ত্রিভুবনকে তিনি সামান্য তৃণ বলিয়াই জ্ঞান করেন; সুতরাং এ জগতে তাঁহার উপমাস্থল কোথায়? ইহা আমার হউক আর ইহা আমার না হউক, এই প্রকার বাঞ্ছা যাঁহার অন্তরে নাই, সাধারণ লোকেরা তাদৃশ মহাত্মার পরিমাণ পাইবে কিরূপে? অতএব সর্ব্ব বিপদের অতিবর্ত্তী বলিয়া যাহা অতি স্বচ্ছ সুখ-স্বরূপ ও বুদ্ধির প্রধান সৌভাগ্যরূপ, তুমি তাদৃশ নৈরাশ্যকে অবলম্বন কর।

হে রাম! আশা তোমার 'কেহই নহে' এবং তুমিও আশাসমূহের কেহই নহ; সুতরাং এ জগৎকে তুমি মিথ্যা ভ্রম বলিয়াই জানিও। যেমন ধাবমান রথে সমারূঢ় ব্যক্তি স্বীয় পার্শ্বস্থ ক্ষেত্র-কাননাদিকে চক্রাকার ভ্রমযুক্ত অবলোকন করে, এই জগদ্ভ্রমও তেমনি মিথ্যা উত্থিত হইতেছে বলিয়াই জানিবে। হে মহাভুজ! এইরূপে বোধিত হইয়াও কেন বৃথা 'ইহা আমার, এই সেই দেহই আমি' ইত্যাকার ভ্রমপূর্ণ-মনে তুমি মূর্খের ন্যায় মোহ প্রাপ্ত হইতেছ? তুমি বুঝিবে—এই নিখিল জগৎই আত্মা, আত্মা ভিন্ন কিছুই বিদ্যমান নাই। দেখ, যাঁহারা প্রকৃত পণ্ডিত-পদ-বাচ্য, তাঁহারা এ জগতের অস্তিত্ব আত্মস্বরূপেই অবগত হন,—হইয়া কদাচ খেদানুভব করেন না।

হে রাঘব! যথার্থ বস্তুস্বরূপ কি, তাহা অবলোকন করিয়াই লোকে বুদ্ধিবৈমল্য-বিধায়ক নৈরাশ্যকে লাভ করিয়া থাকে। পদার্থপরম্পরার যথার্থ স্বরূপ কি, তাহা জানিতে হইলে তৎসমুদায়ের ভাবাভাব-বিকল্প পরিত্যাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক তুমি পদার্থের স্থিতিনির্ণয় কর। যদি এইরূপ করিতে পার, তাহা হইলে মৃগী যেমন কেশরীকে দেখিয়া পলায়ন করে, তেমনি এই সাংসারিকী মোহিনী মায়া ভবদীয় বৈরাগ্য-বীর মনের নিকট হইতে অতিদূরে পলায়ন করিবে। যিনি ধীরধী ব্যক্তি, তিনি বনলতার ন্যায় চঞ্চলা উদ্দামকামা কামিনীকেও জীর্ণ পাষাণপ্রতিমার ন্যায় অবলোকন করিয়া থাকেন। কোনরূপ ভোগ-

সামগ্রীই তাঁহার অন্তরে আনন্দ জন্মাইতে পারে না, কিম্বা কোন প্রকার আপদ বা দুর্ঘটনাই তাঁহাকে খিন্ন করিতে সমর্থ হয় না। পর্ব্বতের উপর দিয়া যতই বায়ু বহিতে থাকুক, তাহাতে যেমন তাহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটে না, তেমনি কোন প্রকার দৃশ্য শোভাই তাদৃশ ব্যক্তির ধৈর্য্যহানি করিতে পারে না। কোন কোমলাঙ্গী বরাঙ্গনা ঐ উদারবুদ্ধি মুনির প্রতি অনুরাগিণী হইলেও তদীয় মানস হইতে কাম-শরনিকর ধূলিকণাকারে নির্গত হইয়া বিদূরিত হইয়া যায়; কেন না, যিনি আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানে জ্ঞানবান্ হন, তিনি শিথিলেন্দ্রিয়ের ন্যায় কখনই রাগদ্বেষাদি কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হন না। বলা বাহুল্য, রাগ বা দ্বেষের সহিত তাঁহার স্পন্দনই ঘটে না, তাহাতে আক্রমণের সম্ভাবনা কিরূপে হইবে? কি লতা, কি লোল বনিতা, উভয়ত্রই তাঁহার দৃষ্টি তখন সমভাবে থাকে; এই জন্য তিনি পর্ব্বতশিলার ন্যায় জড়াকারে পরিণত হন এবং মরু প্রদেশে যেমন পথিকের অনুরক্তি থাকে না, তেমনি ভোগসামগ্রীতে তাঁহার কিছু মাত্র অনুরাগ হয় না। যেমন দর্শনেন্দ্রিয় নিজে অনাসক্তভাবেই আলোকানুভব করে, তেমনি যে সকল বিষয় অনিষিদ্ধ ও অনায়াস-লব্ধ, কেবল তৎসমস্তই তিনি অনাসক্তচিত্তে ভোগ করিতে থাকেন। কান্তা প্রভৃতি ভোগসামগ্রী সকল সেই ধীরধী ব্যক্তির নিকট কাকতালীয় ন্যায়ে উপস্থিত হইয়া পরিণামে কোনই ক্লেশকর হয় না, বরঞ্চ সে সকল তাঁহার সন্তোষেরই সম্পাদক হইয়া থাকে। যেমন সাগর-তরঙ্গ মন্দরাচলকে চঞ্চল করিতে অক্ষম হয়, তেমনি পরমার্থদর্শনের পন্থা যাহার বিশেষরূপে পরিচিত হয়, তাদৃশ জ্ঞানী জনকে সুখদুঃখাদি-ব্যাপারে কখন কিছুমাত্রই বিচালিত করিতে সক্ষম হয় না। তিনি ভোগ রাশির প্রতি মৃদু ও গম্ভীরভাবে মিথ্যাজ্ঞানে দৃষ্টিপাত করেন,—করিয়া সর্ব্বভূতের অন্তরস্থ আত্মপদেই অবস্থান করিতে থাকেন। ব্রহ্মা যেমন বিশ্ব-বিধান-ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়া আত্মপরায়ণ হন, তেমনি তিনিও কালোচিত কার্য্যে নিরত ও দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়া নিজে অব্যাকুলভাবে আত্মায় অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকেন।

রামচন্দ্র! বসন্তাদি ঋতুসমূহের পরিবর্ত্তন ঘটিলেও তাহাতে যেমন পর্ব্বতভূমির কোনওরূপ বিকৃতি ঘটে না, তেমনি সেই ধীর পুরুষ কাল,

দেশ ও ক্রমানুসারে যেরূপ সুখ-দুঃখই উপস্থিত হউক, তাহাতে কিছুমাত্রই ক্ষুব্ধ বা. বিচলিত হইবার নহেন। কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহের ব্যাপার-বশতঃ বিষয়ে তিনি নিমগ্ন থাকেন বটে, কিন্তু বিষয়মগ্ন থাকিলেও তাঁহার অন্তরে কিছুমাত্র বিষয়াসক্তি হয় না। সুবর্ণের অন্তরে যদি নিকৃষ্ট ধাতুর সম্পর্ক থাকে, তাহা হইলেই তাহার নাম যেমন কলঙ্কী হয়, অন্যথা বাহিরে কলঙ্ক-লেপ সত্ত্বেও সেরূপ নামনিরুক্তি হয় না, তেমনি জীব বাহিরে আসক্ত রহিলেও অন্তরে যদি অনাসক্ত হয়, তবেই তাহাকে অনাসক্ত জ্ঞানী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হয়।

হে রাঘব! যিনি দেহাতিরিক্ত আত্মাকে অবলোকন করেন, তাদৃশ বিবেকসম্পন্ন জনের দেহ কর্ত্তন করিয়া ফেলো, তথাপি তাঁহার কিছুই কর্ত্তিত হইবে না। তিনি মহাত্মা মহাপুরুষ, কিছুতেই তাঁহার কখনই দেহাতিরিক্ত আত্মার বিস্মৃতি ঘটিবে না। কেন না, বিমল প্রভাত কালকে যদি একবার চিনিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কেহ কি কখন তাহাকে ভুলিয়া থাকে? কিম্বা বন্ধুজনসহ যদি একবার পরিচয় হয়, তাহা হইলে সে বন্ধু আর কি কখন অজ্ঞাত থাকে? অথবা রজ্জুগত সর্পভ্রম যদি বিদূরিত হয়, তবে আর কি সে ভ্রম থাকিতে পারে? কিম্বা গিরিনদী একবার যদি গিরি হইতে নির্গত হয়, তবে আর কি ফিরিয়া তথায় পৌঁছিতে পারে?

রামচন্দ্র! যেমন বিশুদ্ধ বিমল সুবর্ণখণ্ড কর্দ্দমাক্ত হইলেও অনল-তাপে আর মালিন্য প্রাপ্ত হয় না, যেমন বৃন্ত হইতে পুষ্প বিচ্যুত হইলে বিশেষ আয়াস করিয়াও আর কেহই কখন পুনরায় তাহাকে বৃন্তবদ্ধ করিতে পারে না, এবং এক প্রস্তর হইতে মণি বাহির করিয়া লইলে কোন মণি-কারই যেমন আর তাহাকে পুনরায় সে প্রস্তরে পূর্ব্বের ন্যায় একত্র রাখিতে সক্ষম হয় না, তেমনি হৃদয়ের গ্রন্থিগুলি একবার ছিন্ন হইয়া গেলে আর কিছুতেই তাহার বন্ধন-ঘটনা হয় না। দেখ, অবিদ্যা বা তাহার কার্য্য কি, তাহা যদি একবার জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে আর কে তাহাতে পুনরায় মগ্ন হইয়া থাকে? যাত্রাকালে চণ্ডালাদি দেখিলে ব্রাহ্মণের যেমন যাত্রাভিলাষ থাকে না এবং যেমন বিচারবলেই বিমল জলে দুগ্ধ-ভ্রম নিরাকৃত

হয়, তেমনি স্বীয় বুদ্ধিবিচারেই সংসারবাসনা বিদূরিত হইয়া থাকে। যতকাল পর্য্যন্ত মদ্যে মদ্য-জ্ঞান না জন্মে, ততকাল পর্য্যন্তই জল-জ্ঞানে ব্রাহ্মণের তাহা পানীয় হয়; পরন্তু মদ্যজ্ঞান হইবামাত্র তাহা যেমন তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে, তেমনি কামিনী রূপলাবণ্যবতী হইলেও জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট তাহা চিত্রিত কান্তার ন্যায় দূর-পরিহার্য্য হয়। নারীর অঙ্গে যতই সৌন্দর্য্য থাকুক, তত্ত্বজ্ঞানী দেখেন,—চিত্রিত নারীদেহের ন্যায় তাহা কতকগুলি দ্রব্যের সমাবেশ বৈ আর কিছুই নহে। তত্ত্বজ্ঞানী বুঝেন,—নারীচিত্রে যেমন রঙ্গাদি পঞ্চ বস্তু থাকে, তেমনি জীবিতা নারীতেও ক্ষিতি প্রভৃতি পাঁচটী মাত্র পদার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে। কাজেই সে নারী-দেহের আর উপাদেয়তা কি হইতে পারে? যেমন তাপ-যোগাদি নানা কারণ সত্ত্বেও গুড়ের মাধুর্য্য অন্যথা হয় না, সে যেমন—তেমনিই থাকে, তেমনি আত্মার স্বরূপানন্দের অনুভব যদি একবার হয়, তাহা হইলে আর কিছুতেই নষ্ট হইবার নহে। দেখ, পরানুরাগিণী নারী যদি গৃহকর্ম্মে ব্যগ্র হইয়াও থাকে, তথাচ অন্তরে অন্তরে নিরন্তরই পরসঙ্গরূপ রসায়ন পান করিতে থাকে। অর্থাৎ একবার মাত্র আত্মতত্ত্বের অনুভূতি হইলে তাহা আর অন্যথা করিবার সাধ্য কাহারও হয় না; তখন তাহাতে এক-নিষ্ঠা-নিবন্ধন সর্ব্বদাই তাহা অনুভূত হইতে থাকে।

রামচন্দ্র! যাহা বিশুদ্ধ পরম তত্ত্ব, তাহাতে যদি ধীর ব্যক্তি ঐরূপ বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইন্দ্র-প্রমুখ দেবগণও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারেন না। যেমন স্বামী সবিশেষ বলিষ্ঠ হইলেও পর-প্রেমানুরক্তা রমণীকে তদীয় সঙ্কল্পিত পুরুষসঙ্গম-জনিত আনন্দ তাহার অন্তর হইতে বিস্মারিত করিতে পারে না, তেমনি যিনি একবার জ্ঞানসুধা-রসের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তথাবিধ তত্ত্বজ্ঞ মহাত্মার মতিকে কদাচ কোন সাংসারিক ভাবই আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয় না। বধূজন সুখ-দুঃখময় বিবিধ গৃহকর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া সামাজিক অধীনতা ও শ্বশ্রূ-শ্বশুর প্রভৃতি গুরুজনের সাবধানতায় খেদান্বিত হইলেও প্রার্থিত পুরুষের সমাগমে আনন্দে অধীর হইয়া পড়ে, কোন দুঃখই তাহার যেমন তখন কোন প্রকার বাধা জন্মাইতে পারে না, তেমনি যিনি জ্ঞানী ব্যক্তি, তাঁহার যখন অবিদ্যার

অবসান হইয়া যায়, তখন তিনি বাহ্য-ব্যপারে নিরত রহিলেও সম্যগ্‌দর্শী ও সদাচারনিষ্ঠ হইয়া অন্তরে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। এই অবস্থায় তদীয় অঙ্গ কর্ত্তিত হইলেও তিনি অকর্ত্তিত রহেন, নয়ন হইতে অশ্রুধারা বর্ষণ হইলেও তিনি রোদন করেন না, প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ হইতে থাকিলেও তিনি দাহ্য হন না, এবং তাঁহার দেহ নাশ হইলেও তিনি নাশ প্রাপ্ত হন না। যে পর্য্যন্ত না তাঁহার স্বীয় চিত্তের বিলয় ঘটে, সে পর্য্যন্ত তিনি প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে দারিদ্র্য দুঃখই ভোগ করুন, কি শৈলারোহণাদি সঙ্কট-সঙ্ঘেই পতিত হউন, কি রম্য হর্ম্ম্যতলে বা অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গেই বিহার করুন, প্রশান্ত তপোবনে অথবা বিশাল বিপিনেই বাস করুন, সংসারের আনন্দ বা শোক তাঁহাকে কদাচ কুত্রাপি কিছুতেই আসিয়া আশ্রয় করিতে পারে না।

চতুঃসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৪ ॥

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! রাজর্ষি জনক স্বীয় রাজ্য মধ্যেই ব্যবহারনিষ্ঠ হইয়া বাস করিতেন। তিনি অন্তরে অনাসক্ত ছিলেন। সেই অবস্থায় সদাই তিনি অনাকুল-মনে কার্য্য করিয়া যাইতেন। তোমার পিতামহ মহাত্মা দিলীপ সকল ব্যাপারেই আসক্ত ছিলেন,—থাকিলেও অন্তরে তিনি অনাসক্ত হইয়াই বহুকালের নিমিত্ত এই পৃথ্বীরাজ্য পালন করিয়া গিয়াছেন। সেই প্রখ্যাতনামা সূর্য্যসুত মনু স্বীয় চিত্তকে রাগাদি হইতে মুক্ত করিয়া একজন বিশিষ্ট জ্ঞানী হইয়াছিলেন। তিনি জীবন্মুক্ত-ভাবে বহুদিনের জন্য এই ত্রৈলোক্য-রাজ্য শাসন করিয়া স্বীয় লোকরক্ষা-ব্রতের উদ্‌যাপন করিয়াছেন। এইরূপে সেই প্রাচীনতম রাজা মান্ধাতাও অগণিত সৈন্য-সমূহে পরিবৃত হইয়া বহুকাল যুদ্ধ-বিগ্রহাদি বিবিধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন, তথাচ অন্তে তিনি পরম পদ লাভ করিয়াছিলেন। পাতালে বলি রাজা

অবস্থান করিতেছেন, তিনি সদা ত্যাগী ও সতত অনাসক্ত হইয়াই যাবতীয় ব্যবহার পালন করেন। নমুচি নামে এক দানবাধিপতি ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা সুরগণ সহ সমর-ব্যাপারে নিরত হইয়া সর্ব্ববিধ লোক-ব্যবহারের অনুশীলন করিলেও অন্তরে কখনই সন্তাপ অনুভব করিতেন না। উদার-চেতা বৃত্রাসুর ইন্দ্র সহ যুদ্ধ করিয়া দেহত্যাগ করেন। তিনি অন্তরে শান্তিময় থাকিয়াই সুরগণ সহ যুদ্ধ-ব্যাপারে লিপ্ত হইতেন। মহামতি প্রহ্লাদ সমস্ত পাতালরাজ্য পালন করিতেছেন,—করিয়া যাবতীয় দৈত্য-কার্য্য সুসম্পাদিত করিলেও অন্তরে সেই অবাঙ্মনস-গোচর নিত্যানন্দ অনুভব করিতেছেন।

রামচন্দ্র! শম্বর নামে এক মায়াবী অসুর আছে। সে সর্ব্বদা মায়ানিষ্ঠ হইলেও এই জটিল সংসার-মায়াকে অনায়াসেই পরিত্যাগ করিয়াছে। অনাসক্ত-চিত্ত শম্বর বিষ্ণুর সহিত ঘোর সমর করিয়াও পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছে। অগ্নিদেব সর্ব্বদেবের মুখস্বরূপ এবং সর্ব্বদাই কর্ম্মতৎপর। তিনি চিরকাল যজ্ঞসমৃদ্ধি ভোগ করিয়াও মুক্তভাবেই অবস্থান করিতেছেন। চন্দ্রমা সর্ব্বদাই ব্রহ্মামৃত-পানে তৎপর; তিনি সুরসমূহ কর্ত্তৃক সতত পীয়মান হইয়াও যেমন অম্বর পাদাক্রান্ত হইলেও কুত্রাপি লিপ্ত নহে, তেমনি কোথাও সুখদুঃখাদির সংসর্গভাগী নহেন। বৃহস্পতি দেবগুরু; তিনি স্বীয় পত্নীর জন্য চন্দ্রসহ বিগ্রহ-ব্যাপারে লিপ্ত ও স্বর্গে নানা চেষ্টায় ব্যাপৃত রহিয়াও মুক্তভাবে অবস্থান করেন। শুক্রাচার্য্য পরম পণ্ডিত; তিনি নীতিশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া অসুরদিগের অভীষ্টার্থ সম্পাদন করিলেও অনন্তকালের জন্য অম্বরতল উদ্ভাসিত করত নির্ব্বিকার-মনে কালাতিপাত করিতেছেন। পবনদেব জগদ্বাসী যাবতীয় ভূতবৃন্দের অঙ্গ সঞ্চালনপূর্ব্বক সতত সর্ব্বত্র সঞ্চরণশীল হইয়াও মুক্তভাবেই অবস্থান করিতেছেন।

হে রঘুনাথ! বিশেষ বলিব কি? যিনি অনবরত অখিল সংসারের সৃষ্টিব্যাপারে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, সেই বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মাও সম-চিত্ত হইয়া মুক্ত-ভাবেই তদীয় সুদীর্ঘ আয়ু অতিপাতিত করিতেছেন। ভগবান্ হরি জরামরণ-যুদ্ধাদি-দ্বন্দ্বলীলায় সমাসক্ত হইয়াও অন্তরে অনাসক্তভাবে মুক্ত

হইয়া বিচরণ করিতেছেন। মহাদেব মুক্ত যোগী; তিনি সৌন্দর্য্যতরুর মঞ্জরীরূপিণী স্বীয় কামিনী গৌরীকে কামুক-কৃত বনিতালিঙ্গনবৎ আপন দেহেরই অর্দ্ধাংশে ধারণ করিতেছেন; গিরিতনয়া গৌরী মুক্ত হইয়াও চিরদিনের জন্য নিজকণ্ঠে চন্দ্রোপম নির্ম্মল মুক্তাহারবৎ ত্রিলোচনকে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন। মহামতি কার্ত্তিকেয় বীর ও সমগ্র জ্ঞানরূপ রত্নের একমাত্র আকর। তিনি তারকাদি দানবগণের সহিত সমর-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াও মুক্ত হইয়াছেন।

হে রাম! শিবের প্রধান অনুচর ভৃঙ্গীশ্বরের কথাও লোক-প্রসিদ্ধ। ভৃঙ্গী আপনার ধ্যানধৌত ধীর ও মুক্ত বুদ্ধির বলে কুপিতা মাতা গৌরীকে অনায়াসেই স্বীয় দেহের রক্ত-মাংস অর্পণ করিয়াছিলেন। জীবন্মুক্তস্বভাব দেবর্ষি নারদের নাম কে না জানে? তিনি সতত স্বীয় কলহ-কৌতুকময়ী বুদ্ধিবলেই এই অসার সংসার-জঙ্গলে ভ্রমণ করেন। বিশ্বমান্য বিশ্বামিত্র মুনি নিজে জীবন্মুক্ত হইয়াই বেদোক্ত যাগ-যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করেন। অনন্তদেব ধরা ধারণ করেন, দিবাকর দিবস প্রকাশ করেন; এবং যম সংযমন করেন, বলা বাহুল্য, ইহাঁরা সকলেই জীবন্মুক্ত। এই যে সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের কথা কহিলাম, এতদ্ভিন্ন আরও কত যে সুরাসুর ও যক্ষ-রক্ষ-মানবেরা মুক্তভাবে থাকিয়াও সংসারকার্য্য সমাধা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব।

এইরূপে বহু জীব বহু বিবিধ সংসার-ব্যবহারে নিরত আছে,—থাকিয়াও তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ অন্তর শীতল হওয়ায় মুক্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বা মূঢ়তা-বশতঃ শিলার ন্যায় জড় হইয়া যাইতেছে। কেহ কেহ ভৃগু, ভরদ্বাজ, বিশ্বামিত্র ও শুক প্রভৃতির ন্যায় পরম যোগ আশ্রয় করিয়া অরণ্যাশ্রমে কাল কাটাইতেছেন। কেহ কেহ ছত্রচামরাদি রাজ-চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া জনক, মান্ধাতা, শর্য্যাতি ও সগর প্রভৃতি রাজর্ষির ন্যায় স্ব স্ব রাজ্যমধ্যেই অবস্থান করিতেছেন। কত জীব আকাশের জ্যোতিশ্চক্রের অভ্যন্তরে বৃহস্পতি, ভৃগু, চন্দ্র ও সূর্য্যাদির পদে অবস্থান করিতেছেন। কত মহাপুরুষ জ্ঞানী হইয়া বিমলতা অবলম্বনপূর্ব্বক অগ্নি, বায়ু, বরুণ, যম, ও নারদ প্রভৃতির ন্যায় দেবতার পদে অধিষ্ঠান

করিতেছেন। কেহ কেহ জীবন্মুক্ত হইয়া বলি, সুহোত্র, অন্ধক ও প্রহ্লাদ প্রভৃতির পদে পাতালতলে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে তির্য্যগ্-যোনি প্রভৃতিতে বহু জ্ঞানবান্ মুক্ত মহাত্মা আছেন। যথা—হনুমান্ ও গরুড় প্রভৃতি। অন্যদিকে আবার দেবাদি উত্তম যোনিতেও বহু শত অজ্ঞ মূঢ় জীব অবস্থান করিয়া থাকে। ঈদৃশ অবস্থান-বৈচিত্র্যের কারণ এই যে, সর্ব্বশক্তিশালী পরমেশ সতত সর্ব্বস্থানেই সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্ব-আত্মাতেই সর্ব্বস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। কাজেই যেমন স্বপ্নাবস্থায় অসম্ভাবিত বস্তুর দর্শন হয়, তেমনি কোথাও কাহারও অসম্ভাবনাও হইতে পারে না। অর্থাৎ দেবযোনি সাত্ত্বিকতম বলিয়া স্বভাবতই জ্ঞানৈশ্বর্য্যের অভিব্যক্তি হইলেও স্বপ্নে অঘটন-ঘটন-দর্শনের ন্যায় দেবযোনিতেও মূঢ় আত্মার অসম্ভাবনা নাই। কেন না, বিধির বিধান বিচিত্র; উহা অশেষ ক্রিয়াপরম্পরায় জটিল। উহার প্রয়োগকৌশল এমন যে, তাহাতে সর্ব্বত্রই সর্ব্ব বস্তু দৃষ্ট হয়। দৈব, ধাতা, সর্ব্বেশ্বর শিব ও ঈশ্বর, এই সকলই বিধির নাম। তিনিই আমাদের আত্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তাঁহার এমনি প্রভাব যে, সে প্রভাবে সৈকতস্তূপমধ্যে কাঞ্চনলাভের ন্যায় অবস্তুতে বস্তু-দর্শন এবং কাঞ্চনে মালিন্য ঘটনার ন্যায় বস্তুতে অবস্তু-ঘটনা সহজেই সঙ্ঘটিত হয়। ইহাতে আশ্চর্য্য কিছুই নাই।

হে রঘুনন্দন! যুক্তিবিশেষের অবলম্বনে অযুক্তেও যুক্ততা দেখা যায় এবং পাপের ভয়েও লোক ধর্ম্মাচরণে নিরত হইয়া থাকে। হে সাধো! যাহা অসত্য, তাহাতেও সত্যদর্শন হয় এবং যাহা শূন্য ধ্যান-যোগ, তাহাতেও শাশ্বত পদ লব্ধ হইয়া থাকে। যাহা কস্মিন্ কালেও নাই, দেশ-কালাদির বিলাসে তাহাও সমুদিত হয়। শৃঙ্গহীন শশকদিগকেও শাম্বরী লীলায় শৃঙ্গশালী বলিয়া দেখা গিয়া থাকে। অদ্য যাহাদিগকে বজ্রসার-সদৃশ সুদৃঢ় বলিয়া কস্মিন্ কালেও ক্ষয়ের সম্ভাবনা করা যায় না, দুই দিন পরে তাহারাও বিনষ্ট হইয়া যাইবে, না হয়, আরও কিছুদিন বিলম্বে তাহাদের ধ্বংস হইবে, চিরকাল কিছুই রহিবে না। চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথ্বী, সাগর ও সুরগণ কল্পশেষে সকলেরই লয় হইবে।

হে মহাভুজ! এইরূপে এই সদসৎ সংসারের পরিবর্ত্তন দর্শন করিয়া

হর্ষ, অমর্ষ, শোক, রাগ ও দ্বেষাদির ব্যাপার পরিহার কর,— করিয়া যাহা সমত্ব, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। সংসারে যাহা অসৎ, তাহা সতের ন্যায় প্রতিভাত হয় এবং যাহা সৎ, তাহা অসতের ন্যায় ভাসমান হইয়া থাকে। কাজেই সেই সেই বিষয়ে আস্থা এবং অনাস্থা, উভয়ই পরিত্যাগ কর,—করিয়া যাহা সমতা, তাহারই আশ্রয় গ্রহণ কর। হে রাঘব! সংসারদশায় লোকসকল অজ্ঞানে মগ্ন হইয়া রহে, সেই জন্য তাহারা কোটি কোটি অনর্থপরম্পরা উপগত হইয়া থাকে। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় অজ্ঞান চলিয়া যায়। তখন অনর্থের লেশমাত্রও থাকে না। জীবগণ অজ্ঞান-অবস্থাতেই ভ্রমে পতিত হয়, বিদেহ-মুক্ত অবস্থায় তাহাদিগের আর পুনরায় সংসারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। মুক্তি আপনারই স্বরূপ-সাক্ষাৎকার মাত্র। যেমন বিস্মরণবশে কণ্ঠলগ্ন স্বর্ণহার অপ্রাপ্তবৎ অবস্থান করে, পরে পুনঃ স্মরণ হইলে প্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়; যাহা মুক্ত অবস্থা, তাহাকেও তুমি সেইরূপই জানিয়া রাখিবে। বিবেকবলে বিনা আয়াসে লভ্য হইলেও অবিবেক মুক্তিকে দুর্লভ্য করিয়া রাখে। তাই বলিতেছি, যাহাতে মনঃক্ষয় ও বিবেকোদ্দীপন হয়, তুমি এক্ষণে তাহাই করিতে থাক।

রামচন্দ্র! যাহারা পরম মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, তাঁহাদিগের আত্ম-দর্শনে যত্ন করা কর্ত্তব্য। কেন না, আত্মসাক্ষাৎকার লাভ হইলেই সর্ব্ব-দুঃখের উচ্ছেদ হইয়া থাকে। ইহ সংসারে মহামতি জনক ও সুহোত্রাদির ন্যায় বহুশত মহাত্মা জীবন্মুক্ত হইয়াছেন। ভোগাদিতে তাঁহাদিগের অনুরক্তি কিছুই হয় নাই। বৎস! তোমায় বলি, তুমি বৈরাগ্য ও বিবেকবলে বুদ্ধিনৈর্ম্মল্য লাভ করিয়া এক্ষণে পাষাণে কাঞ্চনে সমান বুদ্ধি স্থাপন কর,—করিয়া জীবন্মুক্ত হইয়া বিচরণ করিতে থাক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এ সংসারে দেহীদিগের দ্বিবিধ মুক্তি উক্ত হইয়াছে; যথা,—এক সদেহ মুক্তি, অপর বিদেহ মুক্তি। দেহ বিদ্যমানে পদার্থে আসক্তি-রাহিত্য বশতঃ মনের যে শান্তি হয়, তাহা সদেহ মুক্তি আর দেহের অবিদ্যমানতায় যে শান্তি হয়, তাহার নাম বিদেহ মুক্তি। পণ্ডিতগণ বলেন,—স্নেহ মমতার ক্ষয়ই শ্রেষ্ঠ মুক্তি; এই মুক্তি দেহের সত্তা এবং অসত্তা উভয়ত্রই হইয়া থাকে। যিনি

স্নেহ-মমতাহীন হইয়া জীবিত থাকেন, তিনিই জীবন্মুক্ত আখ্যায় অভিহিত। যিনি স্নেহবান্ হইয়া জীবিত, তিনিই বদ্ধ নামে নির্দ্দিষ্ট। এতদ্ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি বিদেহ মুক্তি। এই সকল মুক্তি পাইবার জন্য যুক্তি-সহকারে যত্ন দ্বারাই যত্ন করা কর্ত্তব্য। কেন না, যাহার যত্ন নাই, যুক্তি নাই, তাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে গোষ্পদ-গর্ত্ত-গত জলও উত্তীর্ণ হওয়া অসম্ভব। আর যদি যত্নের জন্য যত্ন করা না হয়, তাহা হইলে কেবল মোহ আসিয়া উপস্থিত হয়; আর সে মোহ,—কেবল দুঃখেরই নিমিত্ত হইয়া থাকে। যত্ন ও যুক্তিহীন মানবের আত্মা ক্রমশই পরাধীন হইয়া উঠে। কাজেই আত্মার চিরসিদ্ধির নিমিত্ত অধ্যবসায়শীল অন্তঃকরণে মহাধৈর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক তুমি আপনিই আপনাকে বিচার করিয়া দেখ। জানিও,—যিনি বিপুল অধ্যবসায়-সম্পন্ন পুরুষ, তাঁহার নিকট এই সমগ্র বিশ্বই গোষ্পদবৎ প্রতীত হইয়া থাকে।

বৎস! বুদ্ধদেব যে বহু বিচার করিয়াও অধ্যবসায়ে অসামর্থ্য-প্রযুক্ত আত্মতত্ত্বকে অধ্রুব বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন; পরমবিবেকী মহর্ষি কপিলও যে আত্মস্বরূপের অবধারণে অক্ষম হইয়া গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থারূপ প্রধান পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং অর্হত নামক জনৈক বেদ-নিন্দক ক্ষত্রিয় নরপতি যে আত্মার মহত্ত্ব-নির্ণয়ে অক্ষমতা-নিবন্ধন তদীয় চিৎস্বভাবত্ব অবগত হইয়াও দেহপরিমাণে তাঁহার অধ্রুবত্ব অবধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই সেই অবধারণ অনুত্তম হইলেও বলা যায়, তাঁহারা মিথ্যাপদেই মগ্ন হইয়াছিলেন। পরন্তু বেদতত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষেরা যে উত্তম সত্যানন্দ পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, বেদোক্ত মার্গে তাঁহাদের এই পদপ্রাপ্তিই প্রযত্নরূপ কল্পতরুর মহাফল। অতএব অন্যান্য তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তিরও তথাবিধ যত্ন করাই কর্ত্তব্য।

পঞ্চসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৫ ॥

———

ষট্‌সপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! ব্রহ্ম স্বরূপের অজ্ঞতা নিবন্ধন এই সকল মিথ্যা জগতের আবির্ভাব হয় এবং অবিবেক প্রভাবেই উহারা স্থৈর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আবার যখন বিবেক উপস্থিত হয়, তখনই উহাদের উপশান্তি ঘটে। ব্রহ্মরূপ সাগরে যে বিশ্বব্যাপাররূপ কত অনন্ত জলতরঙ্গ উত্থিত হয়, গবাক্ষ-পতিত সৌর-কিরণে ত্রসরেণুর ন্যায় কে তাহাদের সংখ্যা করিতে পারে? জানিবে,—এ জগতের স্থিতি-বিষয়ে একমাত্র মিথ্যা দর্শনই কারণ, আর জগদ্ভ্রমের যে উপশম ক্রিয়া, তৎপক্ষে একমাত্র সম্যগ্‌দর্শনই কারণ হইয়া থাকে। এই সংসার-সাগর বড়ই বিষম; যুক্তি ও যত্ন বিনা সহজে ইহা পার হওয়া যায় না। কেন না, এ সাগর মোহজলে পরিপূর্ণ এবং ইহাতে মরণরূপ অগাধ আবর্ত্ত বর্ত্তমান ও বিপুল তরঙ্গ বিরাজমান; এইজন্য ইহা বিষম হইয়া উঠিয়াছে। পুণ্যপুঞ্জ ইহার ফেনরাজির স্থান অধিকার করিয়াছে। নরক-যাতনারূপ বাড়বানল ইহাতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তৃষ্ণা উহার চঞ্চল লহরী, মনোরূপ মহা জলজন্তুর উহা বিলাসস্থান, এবং জীবনরূপ নদীনিচয় ইহার চারিদিকে বিরাজমান। এ সাগর ভোগরাজিরূপ রত্নপুটকে বিভূষিত। ইহাতে রোগরূপ উরগ-নিচয় সতত চঞ্চল হইয়া যাতায়ত করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাম ইহার জলজন্তু; তাহারা ভীষণ ঘর্ঘররবে এই সাগরমধ্যে ভয়োৎপাদন করে।

হে রাম! এই দেখ, এই যে মুগ্ধাকৃতি অঙ্গনাপদার্থ আছে, জানিবে,—ইহা ঐ সংসার-সাগরের মনোজ্ঞ-তরঙ্গভঙ্গী। অঙ্গনার অধরোষ্ঠের শোভাই উহার পদ্মরাগমণি এবং নেত্র-রাজিই উহার নীলকমল-দল। উহা অঙ্গনার দন্তরূপ পুষ্প-ফলে পরিপূর্ণ এবং হাস্যাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফেনপুঞ্জে সুশোভন। অঙ্গনার কেশপাশ উহার ইন্দ্রনীল-মণি এবং ভ্রূবিলাস তরঙ্গভঙ্গী। উহার নিতম্বরূপ পুলিনে ও কণ্ঠরূপ শঙ্খে উহা

বিভূষিত। উহা অঙ্গনার ললাটরূপ রত্নপীঠে অম্বিত এবং স্বীয় বিলাস-রূপ জলজন্তু-নিচয়ে পরিপূর্ণ। অঙ্গনার লোল কটাক্ষ উহার এতই চাঞ্চল্য যে, তাহাতে উহা অতীব দুরবগাহ হইয়াছে। এ হেন তরঙ্গভঙ্গী অঙ্গনার বর্ণরূপ সুবর্ণ-বালুকায় পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে।

হে রাঘব! পূর্ব্বে যে ঐ সংসার-সাগরের কথা কহিয়াছি, নারী উহার চঞ্চল তরঙ্গ; এই তরঙ্গ-সঞ্চলনেই সংসার-সাগর অতীব ভীষণ হইয়াছে। কাজেই বলিতে হয়, এ সাগরে ডুবিয়া গিয়া যদি কেহ আবার পার প্রাপ্ত হইতে পারে, তবে তাহার বিশিষ্ট পুরুষকারের বিশিষ্ট সাফল্যই হইয়া থাকে।

হে রঘুবর! প্রাজ্ঞারূপিণী তরণীতে বিবেকরূপ সুদক্ষ নাবিক নিযুক্ত রহিলেও যে ব্যক্তি না এই সংসার-সাগরের পরপারে উপনীত হয়, তাহাকে আমি ধিক্কারেরই যোগ্যপাত্র বলিয়া মনে করি। এই বিশ্বকে যিনি ব্রহ্মস্বরূপেই ভাবনা করেন,—করিয়া এ সংসার-সাগরের আশ্রয় না লইয়াই অনায়াসে উহার পারে প্রয়াণ করেন, জানিবে,—সেই মহাত্মাই প্রকৃত পুরুষপদ-বাচ্য। বৎস! প্রথমতঃ আর্য্যগণ সহ সম্যক্ বিচার করিয়া স্বীয় প্রজ্ঞার সহায়তায় উত্তমরূপে সংসারকে অবলোকন করিতে হয়। অনন্তর যদি সেই সংসারে প্রবেশ করা হয়, তবে তাহা শোভার হইয়া থাকে, নতুবা সংসার কখন শোভার বস্তু হয় না। হে সাধুশীল! এ সংসারে তুমি ভব্য হইয়া অবস্থান কর, তাহা হইলেই তুমি তোমার স্বীয় বিচারনিষ্ঠ প্রজ্ঞার সহায়তায় এই বয়সেই সংসারের তত্ত্ব বুঝিতে পারিবে। তৎকালে ভবাদৃশ যে কোন ব্যক্তিই বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া এ সংসারে প্রবিষ্ট হইবে, তাহাকেও কখন সংসারে মগ্ন হইতে হইবে না।

রামচন্দ্র! এই ভোগরাশি বিষাক্ত সর্পসমূহের ন্যায় একান্তই ভয়াবহ; অগ্রে এই ভোগরাশিকে বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া পরে ইহাদিগকে ভোগ করিতে হয়। এইরূপ ভোগে পরিণামে কোনই ক্লেশের আশঙ্কা নাই। প্রত্যুত গরুড়-কৃত পন্নগ-ভোগের ন্যায় বিচারপূর্ব্বক বিষয়ভোগ অক্লেশ-করই হইয়া থাকে। অগ্রে তত্ত্ব বিচার করিয়া পরে যে সকল বিভূতি ভোগ করা হয়, পরিণামে সেই সমুদায় ভোগই সুখাবহ হইয়া

থাকে; এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট ভোগ কেবলই দুঃখের হেতু হয়। দেখ, বসন্ত ঋতুর অভ্যুদয় হইলেই বৃক্ষ যেমন সৌন্দর্য্যাদি নানা গুণে অলঙ্কৃত হইতে থাকে, তেমনি যিনি তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ,—বল, বুদ্ধি, তেজ,—এ সকল তাঁহারই দিন দিন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

হে রঘুনন্দন! তুমি বেদ্য বস্তু বিদিত হইয়াছ, তাই তোমার প্রজ্ঞা প্রগাঢ় আনন্দসুধায় পরিপূর্ণ, সুশীতল ও সর্ব্বত্র সমভাবাপন্ন হইয়াছে। তুমি তথাবিধ প্রজ্ঞাপ্রভাবে ব্যোমবিহারী বিধুর ন্যায় সুশোভিত হইতেছ। এইরূপেই তোমার সুখাবস্থান হউক।

ষট্‌সপ্ততিতম-সর্গ সমাপ্ত॥ ৭৬॥

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনে! আপনি তত্ত্ব-চমৎকৃতি বিদিত আছেন। অতএব সংক্ষেপতঃ পুনরপি উদার বৃত্তান্ত সকল বর্ণন করুন। আপনার কথায় কাহারও তৃপ্তি শেষ হয় না; যতই শুনা যায়, উত্তরোত্তর তাহাতে কুতূহল বৃদ্ধিই হইয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! তোমার নিকট জীবন্মুক্তের লক্ষণ আমি বহুধা কীর্ত্তন করিয়াছি। এক্ষণে পুনরপি যাহা বলিতেছি, তুমি তাহা অবধানপূর্ব্বক শ্রবণ কর। আত্মবান্ পুরুষের বাসনারাশি ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, এই জন্য তিনি পরমার্থ-দৃষ্টিবলে এ সংসারকে সুষুপ্তবৎ মিথ্যা ও সর্ব্বত্র অনাসক্তরূপে দর্শন করিয়া থাকেন। সুষুপ্ত চিত্তের ন্যায় তাঁহার কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে; তিনি নিত্যানন্দ উপভোগ করিতে থাকেন। তাদৃশ ব্যক্তি প্রথমতঃ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে বস্তুনিচয় অনুভব করেন, পরে স্বহস্তে গ্রহণ করেন,—করিলেও প্রকৃত পক্ষে আন্তরিক সমবুদ্ধিবশে কিছুই গ্রহণ করেন না। প্রশান্তচিত্ত আত্মজ্ঞানী ব্যক্তি আন্তরিক প্রজ্ঞার প্রভাবে এই সংসারপ্রবাহকে কৃত্রিম যন্ত্রময় পুত্তলিকার ন্যায় দর্শন করত

একান্তই উপহাস করিয়া থাকেন। তিনি ভবিষ্যতের অপেক্ষা করেন না, বর্ত্তমানেও তাঁহার আস্থা থাকে না এবং অতীত বিষয়েরও তিনি স্মরণ করেন না, অথচ সমস্তই তিনি করিয়া থাকেন। তিনি সুপ্তপ্রায় হইয়াও সর্ব্বদাই প্রবুদ্ধভাবে অবস্থান করেন এবং প্রবুদ্ধ হইয়াও সতত প্রসুপ্ত হইয়া থাকেন। অপিচ তিনি বাহিরে সকল কর্ম্মই করেন,—করিয়াও অন্তরে কিছুই করেন না। অন্তরে তিনি সর্ব্বত্যাগী হইয়া থাকেন, কোন চেষ্টাই তাঁহার থাকে না, তিনি বাহিরে সর্ব্ব কর্ম্ম নিষ্পাদন করিলেও সমতার আশ্রয়েই অবস্থিত হইয়া থাকেন। বাহিরে তিনি সর্ব্ববিষয়েই যত্ন রাখেন,—রাখিয়া যথাপ্রাপ্ত কর্ম্মমাত্রেই উন্মুখ হইয়া থাকেন। পিতৃ-পিতামহাদি ক্রমে উপস্থিত রাজকার্য্যাদি তিনি নির্ব্বাহ করেন এবং বন্ধুকৃত্য দান-মানাদিরও তিনি অনুসরণ করিয়া থাকেন। তিনি স্বয়ং সমগ্র ভোগ-সুখাদির আত্মস্বরূপে অবস্থিত হইয়া যেন নিখিল বিষয়বাসনায় আস্থা স্থাপন করিয়াই কর্ম্মসমূহ করিয়া থাকেন। বাস্তব পক্ষে অজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় তাঁহার কর্ত্তৃত্বাভিমান থাকে না, তিনি সর্ব্বকার্য্যে উদ্যম প্রকাশ করিলেও সর্ব্বত্র উদাসীনবৎ অবস্থানপূর্ব্বক কোন কিছুরই আকাঙ্ক্ষা রাখেন না। কোন কিছুতেই তাঁহার বিদ্বেষ নাই এবং কিছুর জন্য তিনি শোক করেন না ও কিছুতেই তাঁহার আনন্দ হয় না। তিনি অনুকূল জনে আনুকূল্য করেন এবং প্রতিকূল জনে তাঁহার প্রতিকূল ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি ভক্তজনে বিশিষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করেন এবং শাঠ্যপরায়ণ লোকের প্রতি শঠের ন্যায়ই ব্যবহার করিয়া থাকেন। তৎকালে বালকেরা তাঁহাকে বালক বলিয়া জ্ঞান করে, বৃদ্ধ লোকেরা তাঁহাকে সমবয়স্ক বলিয়া মনে করেন। তিনি ধীর জন-সমীপে ধৈর্য্যশালীর ন্যায় প্রতিভাত হন, যুবকের নিকট যুবকরূপে প্রতিপন্ন হইয়া থাকেন এবং দুঃখী লোকে তাঁহাকে স্বীয় দুঃখে দুঃখিত হইতে দেখে। তিনি বাগ্‌বিন্যাসে প্রবৃত্ত হইয়া পুণ্যকথার অবতারণা করেন। তদীয় অন্তরে দীনতার লেশমাত্র স্থান প্রাপ্ত হয় না। তিনি কেবলই প্রজ্ঞা ও আনন্দযুক্ত হইয়া সতত পুণ্যাখ্যানেই প্রবৃত্ত হইয়া রহেন। তাঁহার স্বীয় প্রতিভার প্রকাশ হয়, তাহাতে তিনি সতত পরিপূর্ণ ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইয়া সর্ব্বদাই কোমল ও প্রসন্ন মধুরভাবে অন্বিত হইয়া

থাকেন। তাঁহার বিষাদ ও খেদ-দুর্গতি সমস্তই নিরস্ত হইয়া যায়, তিনি সর্ব্বত্রই স্নিগ্ধভাবে মধুর বন্ধুভাব প্রকাশ করেন। সর্ব্বত্র তাঁহার সাম্য-মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি উদার-চরিত্র ও সৌম্যাকৃতি হইয়া সুখসাগরে মগ্ন হইয়া থাকেন। তাঁহার অপার শান্তি সমুদিত হয়। তিনি অভ্যুদয় প্রাপ্ত পূর্ণ সুধাকরের ন্যায় সুস্নিগ্ধ ও শীতলস্পর্শ হইয়া বিরাজ করিতে থাকেন। পুণ্যে তাঁহার প্রয়োজন থাকে না, ভোগে বা কর্ম্ম-করণেও তিনি কোন আবশ্যকতা মনে করেন না। বস্তুতঃ কি দুষ্কৃতি, কি ভোগত্যাগ, কি বন্ধুজন-সঙ্গ, কি কার্য্য-কারণারম্ভ, কি কার্য্য-পরিহার, কি বন্ধ, কি মোক্ষ, কি পাতাল, কি স্বর্গ, কিছুতেই তাঁহার কোনই প্রয়োজন হয় না; কেন হয় না? তাহার কারণ এই যে, যখন জাগতিক পদার্থপরম্পরা একমাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপেই পরিদৃষ্ট হয়, তখন সুখ, বন্ধন, বা মোচন কোন কিছুতেই কখন মন কৃপণ হয় না।

রামচন্দ্র! সম্যক্ জ্ঞানাগ্নি দ্বারা যদীয় সন্দেহজাল দগ্ধ হইয়া যায়, তাঁহার চিত্ত-বিহঙ্গম নিঃশঙ্ক হইয়াই সর্ব্বত্র সমুড্ডীন হইয়া থাকে। যাঁহার মনে কোন ভ্রান্তি থাকে না, তাঁহার সেই অভ্রান্ত মন ব্রহ্মস্বারূপ্য লাভ করে,—করিয়া ব্যোমবৎ সমস্ত দৃষ্টিতেই অনস্তমিত ও অনুদিত হইয়া থাকে। দোলা-মধ্যস্থ সুখসুপ্ত শিশুর চেষ্টার ন্যায় পরমানন্দের অভ্যুদয়ে তদীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রভৃতির পরিচালন মাত্র হইয়া থাকে। মত্ত ব্যক্তির ন্যায় তিনি নিত্যানন্দ অনুভব করিতে থাকেন। তাঁহার পুনর্জ্জন্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, সর্ব্বত্র তিনি হেয় বুদ্ধি পোষণ করেন; এই জন্য কৃতাকৃত কর্ম্ম সকল তাঁহার স্মৃতিপথে সমুদিত হয় না। তিনি সর্ব্বথা সর্ব্ববস্তুই গ্রহণ করেন এবং সর্ব্বথা সমস্ত বস্তুই পরিত্যাগ করিয়া থাকেন। তাঁহার হেয় বুদ্ধি সমস্ত বস্তুতেই স্থাপিত হয়, তিনি শিশুর ন্যায় সর্ব্বত্র চেষ্টমান হইয়া থাকেন। তিনি দেশ, কাল ও ক্রিয়াক্রম-অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রে অবস্থিত হইলেও কার্য্য-করণ জন্য কোনরূপ সুখ বা দুঃখ তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও স্পর্শ করিতে পারে না। বাহিরে তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও অন্তরে তাঁহার সম্পূর্ণ চেষ্টা থাকে না বলিয়া বাহ্য-ব্যাপারে সত্যজ্ঞানে তিনি আস্থা স্থাপন করেন না। কাজেই সেই সেই কার্য্য-জনিত ফলের অনুসন্ধানও তাঁহার থাকে না, তিনি

দুঃখের দশায় উপেক্ষা প্রদর্শন করেন এবং সুখেও তিনি আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেন না। কোন কার্য্য সম্পন্ন হউক, তাহাতেও তিনি আনন্দিত নহেন কিম্বা কোন কার্য্য ধ্বংস হইয়া যাউক, তাহাতেও তিনি দুঃখিত নহেন। যদি সৌর-কিরণ শীতল হয়, সুধাংশু-বিম্ব সন্তাপ দান করে কিম্বা পাবক-দেব অধোমুখে প্রজ্বলিত হইতে থাকেন, তথাপি তাঁহার বিস্ময়ের ভাব হয় না; কেন না, তিনি মনে করেন, এই সমুদায় শক্তিই চিন্ময় আত্মায় বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সুতরাং যতই আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটুক, তাহাতে আত্মজ্ঞানী জনের কোন কৌতুকের বিষয় নাই। তিনি কাহারও প্রতি দয়া প্রকাশ করেন না, বা দয়া করিতে পারিলাম না ভাবিয়া কোনরূপ দৈন্য অনুভব করেন না, অথচ তিনি নির্দ্দয়ও নহেন; তাঁহার মন কোন ক্রূর কর্ম্মের দিকে ধাবিত হয় না, ভিক্ষাদি অপমানকার্য্যে তিনি লজ্জা বোধ করেন না; তাঁহার আত্মা কদাচ দৈন্যগ্রস্ত নহে এবং কদাচ তিনি উদ্ধত-স্বভাব অবলম্বন করেন না। তিনি কখন প্রমত্ত নহেন, খিন্ন নহেন, উদ্বিগ্ন নহেন, কিম্বা প্রফুল্ল নহেন। শরতের অম্বরের ন্যায় তাঁহার অন্তর সতত সুনির্ম্মল ও সুবিস্তৃত; অন্তরীক্ষে যেমন নবাঙ্কুরোদয় হয় না, তেমনি তাঁহার তাদৃশ অন্তরেও কদাচ কোপাদির উদ্রেক হইতে পারে না।

হে রাঘব! এই জগৎস্থিতি-ব্যাপারে অনবরত অনন্ত ভূতনিবহ উৎপন্ন ও বিনষ্ট হইতেছে; সুতরাং সুখিতাই বল, আর দুঃখিতাই বল, কোথায় কিরূপে তাহাদের সম্ভব হইতে পারে? কেন না, জলে তরঙ্গ-সম্পর্ক বশতঃ ফেনপুঞ্জ যেমন ভ্রাম্যমাণ হয়, তেমনি এই সংসার-ব্যাপার নিত্যই পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কাজেই বলিতে হয়, কোথায় কিরূপে কীদৃশ সুখ-দুঃখের সমাবেশ ঘটিতে পারে? জীবন্মুক্ত মানবগণ দেখেন,—আমিই আত্মায় জগন্মায়ার সৃষ্টি করিতেছি, এইরূপ দেখিতে দেখিতে সতত অসংখ্য জীবের ভাব ও অভাব দর্শনেও জনন-মরণ-হীন হইয়া কদাচ তাঁহারা দুঃখিত বা আনন্দিত হন না। অর্থাৎ জীবজন্তুদিগের অনবরত উৎপত্তি ও বিপত্তি হইতেছে বলিয়া একটা ধারণা হয় বটে, কিন্তু তৎসমুদায় কেবল দৃষ্টি-সৃষ্টি বৈ আর কিছুই নহে। ফলে কিন্তু কোনও কিছু হয়ও না বা যায়ও না। হওয়া বল, যাওয়া বল, আর থাকা বল, সমস্তই আত্মনিষ্ঠ

অজ্ঞানের কল্পনা মাত্র। কাজেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সে বিষয়ে এই মাত্র বিদিত থাকেন যে, সকলই দৃষ্টির বা কল্পনারই বিলসিত ব্যতীত আর কিছুই নহে। এই দগ্ধ-সংসার নিত্য সমুৎপন্ন ও নিত্য বিনশ্বর, এ সংসারে হর্ষ বা বিষাদের সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে? শুভ কর্ম্মের অভাবে সুখাভাব এবং শুভ কর্ম্মের ফলে সুখোদয়, এরূপ ধারণা অতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যেই সীমাবদ্ধ; পরন্তু তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির শুভাশুভ কিছুই আকাঙ্ক্ষা নাই বলিয়া তাহার নিকট সুখ-দুঃখের অভাব সম্পূর্ণরূপেই স্থিরীকৃত হইয়া থাকে; কাজেই কোনরূপ দুঃখপ্রবাহই জীবন্মুক্ত ব্যক্তিদিগকে কখন কোন প্রকারেই অভিভূত করিতে পারে না। কেন না, সুখের অনুভব হইতেই দুঃখের বীজ উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ সুখ কিয়ৎক্ষণ মাত্র অনুভূত হইবার পরই তাহার অবসান ঘটিয়া থাকে; সেই অবসানই শোক-মোহাদি দুঃখ-জনক হয়। কিন্তু শুভ কর্ম্মাদির অভাবে যখন সুখানুভবের শান্তি হয়, তখন এই দুঃখাবস্থা আপনা হইতেই শান্ত হইয়া যায়।

হে রাম! যে প্রকারেই হউক, যদি সুখ কিম্বা দুঃখের আকাঙ্ক্ষার অভাবে সুখ-দুঃখ ক্ষীণ হইয়া যায়, তাহা হইলেই হেয় কিম্বা উপাদেয়, এরূপ প্রতীতিরও অবসান ঘটিয়া থাকে। কাজেই তখন তাঁহার ইষ্টানিষ্ট বা শুভাশুভ বিষয়েরও কোন প্রকারেই সম্ভাবনা হইতে পারে না। ফলে, মূলে যদি শুভাশুভ বিভাগ না থাকে, তবে হেয় বা উপাদেয় ভাব আসিবে কি জন্য? ইহা রম্য আর উহা অরম্য, এই প্রকার দৃষ্টি দূরীভূত হইলে ভোগবাসনারও অবসান হয়। তখন একমাত্র নৈরাশ্যই বদ্ধমূল হইয়া থাকে। নিরাশাবশেই জীবন্মুক্তের মন হিমের ন্যায় গলিয়া যায়। যেমন তিলরাশি দগ্ধ হইলে তাহাতে আর তৈলের আশা থাকে না, তেমনি মন যখন সমূলে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন আর তাহাতে কোন সঙ্কল্পই থাকিতে পারে না। আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই, সমস্তই সেই আত্মা, এইরূপ ভাব যখন গভীর ভাবনায় ঘনীভূত হইয়া উঠে, তখন তাদৃশ দৃঢ় নিশ্চয়বশে দৃশ্য পদার্থপুঞ্জ সঙ্কল্প-বিকল্প-হীন হইয়া আকাশবৎ সৎস্বরূপ মাত্রে অবস্থিত হয়; পরিচ্ছেদের কারণ তখন কিছুই থাকে না। সুতরাং জ্ঞানময় মহান্ আত্মা তৎকালে নিত্যতৃপ্ত ও স্বীয় নিরতিশয় আনন্দস্বভাবে মুদিত হইয়া

জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন যথাপ্রাপ্ত বিষয়ের সমালোচনাত্মক চিত্তমধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকেন, চিত্ত বিলয়ে সুষুপ্তিকালে সুপ্ত এবং প্রারব্ধ ক্ষয়-কাল যাবৎ জীবিত হন।

সপ্তসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৭ ॥

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যেমন জ্বলদঙ্গারের পরিভ্রমণে ভ্রান্তিক্রমে অগ্নিচক্রই পরিদৃষ্ট হয়, তেমনি চিত্তস্পন্দনেই এই অসৎ জগৎ সতের ন্যায় প্রতীত হইয়া থাকে। যেমন জলের স্পন্দনে ভ্রমক্রমে জলাতিরিক্ত গোলাকার আবর্ত্ত দেখা যায়, তেমনি চিত্তস্পন্দনের অতিরিক্ত ভাবে জগতের যে বিকাশ, জানিবে—তাহা সম্পূর্ণই ভ্রমমাত্র বৈ আর কিছুই নহে। আতপ-সম্মুখে নয়ন-দ্বয়ের স্পন্দন বশত আকাশে যেমন ময়ূরপুচ্ছ বা মুক্তা-নিকরাদির অসত্য দর্শন হয়, তেমনি চিত্তের স্পন্দনেই এই মিথ্যা জগৎ সত্যরূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! কেন চিত্ত স্পন্দিত হয় এবং কিসেই বা চিত্ত-স্পন্দন নিবারিত হয়, তাহা আপনি আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন, আমি ভবদুপদিষ্ট উপায় অবলম্বনে উহার চিকিৎসা বিধান করি।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! যেমন হিম ও হিমের শুক্লতা, তিল ও তিলান্তর্গত তৈলকণা, পুষ্প ও পুষ্পের সৌগন্ধ এবং অগ্নি ও অগ্নির দাহিকা শক্তি পরস্পর পরস্পর সহ নিত্য-সংশ্লিষ্ট, তেমনি চিত্ত ও চিত্তস্পন্দন উভয়ই অভিন্ন; তথাচ ইহাদের যে ভেদকল্পনা করা হয়, জানিবে—তাহা কেবল মিথ্যা আভিধানিক মাত্র। উল্লিখিত চিত্ত ও চিত্তস্পন্দ এই উভয় পক্ষের একতরের ধ্বংসে গুণী ও গুণ উভয়েরই নিশ্চয় নাশ হয়। হে রাঘব! চিত্তনাশের দুইটী প্রধান উপায়—যোগ ও জ্ঞান; এই দুই উপায়ের মধ্যে চিত্তবৃত্তির নিরোধের নাম যোগ এবং বস্তুর যে সম্যক্ দর্শন, তাহার নাম জ্ঞান।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! প্রাণাপানাদির নিরোধ-কর কীদৃশ যোগোপায় জীব কখন কিরূপে অবলম্বন করিয়া অসীম সুখ-শান্তিদায়িনী মানসী শান্তি প্রাপ্ত হইতে পারে? তাহা আমার নিকট ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস! যেমন ভূগর্ভের সর্ব্বত্রই জলের চলাচল বিদ্যমান, তেমনি এই দেহ মধ্যে যে সকল নাড়ী আছে, তৎসমুদায়ের অভ্যন্তরে বায়ুর চলন সুপ্রকাশ। এই বায়ুই প্রাণসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকেন। ইনি অভ্যন্তরে থাকিয়া স্পন্দন বশতঃ নানা আশ্চর্য্য-জনক কার্য্য-সমূহ সম্পাদন করেন; এই জন্যই আত্মদর্শী ব্যক্তিগণ উহাঁর অর্থাৎ প্রাণ-বায়ুর অপান ও ব্যান প্রভৃতি নাম-নিচয় নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সৌরভের আধার পুষ্প এবং শুক্লতার আধার হিম, ইহারা যেমন পরস্পর যথাক্রমে সৌরভ ও শুক্লতা গুণ হইতে অভিন্ন, অর্থাৎ ইহারা যেমন পরস্পর পরস্পারের আশ্রিত, তেমনি রসাত্মক প্রাণ চিত্তের আধার হইলেও প্রাণ ও চিত্ত পরস্পর একান্তই অভিন্ন। হে রাঘব! অন্তরে প্রাণের পরিস্পন্দন হয়; তাহাতে সংসার-ভাবোন্মুখী চিৎশক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে; জানিবে,—এই চিৎশক্তিই চিত্ত নামে নির্দ্দিষ্ট। প্রথমতঃ প্রাণের পরিস্পন্দন হয়; তাহাতে চিদ্বৃত্তি বিকাশ পাইয়া থাকে। এই চিদ্বিকাশ-বশেই সংসারভাবের বিকাশ হয়। জল-স্পন্দনবশে তরঙ্গ-রাজির ন্যায় এই ক্রমাগত ব্যাপার-পরম্পরা চক্রাবর্ত্ত অনুসারে উদ্ভূত হয়। এই জন্য শাস্ত্র-সমালোচক পণ্ডিতগণ প্রাণের গতিস্পন্দনকেই চিত্ত আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। অতএব যদি প্রাণ সংরুদ্ধ হইয়া যায়, তাহা হইলে মনের উচ্ছেদ নিশ্চয়ই ঘটিয়া থাকে। মনের যদি উচ্ছেদ হয়, তাহা হইলেই সংসারভাবের তিরোধান ঘটে। এই তিরোধান—সৌরালোক-বিকাশের অভাব ঘটনায় জগদ্বাসী লোকদিগের দৈনন্দিন ব্যবহারপরম্পারার তিরোধানের ন্যায়ই হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! গগন-গামী প্রাণাদি পবন সকল এই দেহাকার ক্ষুদ্র গৃহের অভ্যন্তরে নিরন্তর বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগকে নিরোধ করা যাইতে পারে কিরূপে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রঘুবর! শাস্ত্রচর্চ্চা, সজ্জন-সঙ্গ এবং বৈরাগ্যাভ্যাস

এই সকল দ্বারা সংসার-ব্যাপারে অনাস্থা হইবার পর প্রথমতঃ একাগ্রতার সহিত অভীষ্ট বস্তুর ধ্যান করিতে হয়। অনন্তর ব্রহ্ম-তত্ত্বের দৃঢ় অভ্যাস করিতে করিতেই প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া যায়। অথবা যদি একান্ত ধ্যান যোগের সহিত অভিন্নভাবে পূরক, কুম্ভক ও রেচকাদির নিরন্তর অভ্যাস করা হয়, তাহা হইলেও প্রাণের স্পন্দন নিরুদ্ধ হইয়া যায়। কিম্বা ওঙ্কারের সুদীর্ঘ উচ্চারণ দ্বারাও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। অর্থাৎ দীর্ঘ উচ্চারিত ওঙ্কারের শেষ প্রান্তে শব্দতত্ত্ব অনুভূত হয় এবং তৎকালেই বাহ্য-বিষয়ক জ্ঞানের উপশম ঘটিলে প্রাণের নিরোধ ঘটনা হয়। অথবা বারম্বার কেবল রেচক অভ্যাস করিতে থাকিলেও প্রাণ দীর্ঘতা প্রাপ্ত হয়,—হইয়া যখন ছিন্ন অভ্র-খণ্ডের ন্যায় বহিরাকাশে উপনীত হইয়া থাকে, পরন্তু নাসারন্ধ্রাদি পথে পুনঃ প্রত্যাগত হয় না, তখন তৎপ্রভাবেও প্রাণ নিরোধ ঘটিতে পারে। কেবল রেচকের কথা নহে, মেঘদল যেমন পর্ব্বতের উপর্য্যুপরি অনবরত আশ্রয় লইয়া সহজেই নিশ্চেষ্ট হইয়া রহে, তেমনি বারম্বার কেবল পূরকের অভ্যাস করিলেও অনায়াসেই প্রাণ সঞ্চারহীন হইয়া পড়ে। প্রাণের নিরোধ-ঘটনা তখন এই একমাত্র পূরকদ্বারাও সম্ভব হইতে পারে। এইরূপ যদি একমাত্র কুম্ভকেরও অভ্যাস করা হয়, তাহা হইলেও প্রাণ অনন্তকালের জন্য পূর্ণ কুম্ভের ন্যায় নিশ্চল হইয়া থাকে। এইরূপ অবস্থাকেও প্রাণ নিরোধ আখ্যায় অভিহিত করা যায়। যোগী পুরুষ তালু-মূলস্থ ঘণ্টাকার মাংসপিণ্ডকে স্বীয় জিহ্বা দ্বারা যত্নের সহিত আক্রমণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণ স্থাপন করিয়া থাকেন। যোগীর এতাদৃশ যত্ন দ্বারাও প্রাণের নিরোধ ঘটনা হয়। এইরূপ কার্য্যে প্রাণ-পবনের অধঃসঞ্চার রহিত হয় এবং সে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপিত হইয়া থাকে বলিয়া প্রাণ-নিরোধনামক যোগ সম্পন্ন হয়। ধ্যানযোগে মনকে যদি নির্ব্বিকার হৃদাকাশে লীন করা যায়, তাহা হইলেও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে। ফল কথা, নির্ব্বিকল্প সমাধি বিধানও প্রাণ-পরাজয়ের উপায়ান্তর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। নাসিকার অগ্রভাগ হইতে দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমাণ বহিরাকাশের মধ্যে যদি চক্ষু ও মন স্থির করিয়া রাখিতে পারা যায়, তাহা হইলেও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইতে পারে। অভ্যাসের গুণে সকলই সম্ভব হইয়া

থাকে। যদি ঊর্দ্ধ রন্ধ্র দ্বারা অভ্যাসবশে তালুর ঊর্দ্ধস্থ ব্রহ্মরন্ধ্রে প্রাণকে স্থাপিত করা হয়, তাহা হইলে প্রাণের বাহ্যসম্পর্ক রহিত হইয়া যায়। এইরূপ উপায় দ্বারাও প্রাণের নিরোধক্রিয়া সমাহিত হইয়া থাকে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে সতত চক্ষুরিন্দ্রিয়কে আবদ্ধ রাখিলেও প্রাণের স্পন্দন রুদ্ধ হয়, এবং চিৎস্বরূপ পরমেশ্বরই আত্মা, এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মিলেও কদাচিৎ প্রাণ নিরোধ হইয়া থাকে। অথবা কখন যদি ভগবদনুগ্রহে সহসা তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হওয়ায় বিকল্পজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে সেরূপ ঘটনায়ও প্রাণ নিরোধ হইতে পারে। যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া হৃদাকাশে ধ্যান করা যায়, আর সেই ধ্যানের ফলে যদি কখন তত্ত্বসাক্ষাৎ-কার ঘটে, তাহা হইলে তথাবিধ সাক্ষাৎকারে সর্ব্ব কল্পনার উপশম হইয়া থাকে। এইরূপেও প্রাণ নিরোধ ঘটনা হইতে পারে।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! মহান্ আদর্শের ন্যায় যাহাতে এই সমস্ত বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, জাগতিক জীবগণের সেই হৃদয় কি প্রকার?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে সাধো! শ্রবণ কর, জগতে জীবগণের হৃদয় দ্বিবিধরূপে নির্দ্দিষ্ট। তন্মধ্যে এক হেয় এবং অপর উপাদেয় বলিয়া কথিত। দেহাত্মবাদীগণের বক্ষ ও পৃষ্ঠ স্থলের মধ্যস্থ মাংসখণ্ডকেও হৃদয় বলা হয়, এই হৃদয়কেই হেয় বলিয়া জানিবে। জ্ঞানীদিগের হৃদয় জ্ঞান মাত্র; এই হৃদয়ই উপাদেয় সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট। ইহাই অন্তরে বাহিরে সর্ব্বত্রই বিরাজিত অথচ কুত্রাপি বিরাজিত নহে। এই হৃদয়ই প্রধান; ইহাতেই এই বিশ্ব বিরাজমান। এই জ্ঞানমাত্র হৃদয়ই নিখিল পদার্থের দর্পণস্বরূপ; ইহাই সর্ব্ব সম্পত্তির কোষাগার এবং ইহাকেই অখিল প্রাণীর চিন্ময় জ্ঞানরূপ হৃদয় আখ্যা প্রদান করা হয়। এই হৃদয় দেহীর দেহের কোন অবয়বেরই অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট নহে। জড়-জীর্ণ উপল-খণ্ডের সহিতই উহার উপমা দেওয়া যাইতে পারে। জীব তাহার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া যদি আপনার জ্ঞানময় বিশুদ্ধ হৃদয়ে যত্নের সহিত চিত্তনিবেশ করিতে পারে, তাহা হইলেও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইয়া থাকে।

হে রাম! প্রাণস্পন্দ নিরোধ করিবার যে সকল উপায়ক্রম পূর্ব্বে

নির্দ্দেশ করা হইল, সেই সমুদায় ক্রম কিম্বা স্বীয় সঙ্কল্পানুযায়ী অন্যবিধ ক্রম অথবা পণ্ডিত-জনানুমোদিত অন্যান্য ক্রমানুসারেও প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইতে পারে। এই সকল যোগযুক্তি ধীরে ধীরে সাবধানে অভ্যাস করিতে হয়; নতুবা হঠাৎ প্রাণ নিরোধ করিবার চেষ্টা করিলে ব্যাধি প্রভৃতি বিবিধ বাধা আসিয়া উপস্থিত হইতে পারে। ভব্য ব্যক্তি যদি সাবধানে এই যোগ অভ্যাস করেন, তাহা হইলেই সংসার-পরিহার ব্যাপারে তাঁহার প্রকৃষ্ট উপায় লাভ হইতে পারে। বলা বাহুল্য, অবিবেচনার সহিত হঠযোগ কোনক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। কেন না, তাহাতে কঠিন রোগাদি দ্বারা আক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে, একবার রোগাক্রান্ত হইলে তখন আর ভব-বন্ধন-চ্ছেদন সহজে হইবার নহে।

হে রাঘব! পূরক, কুম্ভক ও রেচকাত্মক প্রাণায়াম বৈরাগ্য-পরিলাঞ্ছিত হইয়া অভ্যাসযোগে দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইলে, যখন যে যে বাসনারই উদ্ভব হউক, সে তাহারই নিরোধ-ব্যাপারে সাফল্য লাভ করিতে পারে; অথবা মোক্ষ বাসনা বলবতী হইলে, মোক্ষ ফল প্রদান করে কিম্বা ভোগ-বাসনার প্রাবল্য ঘটিলেও তাহার চরিতার্থতা সম্পাদনে সক্ষম হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! গিরিনির্ঝরিণী যেমন দূর পথে প্রধাবিত হইয়া প্রশান্ত-ভাব অবলম্বন করে, প্রাণও তেমনি কণ্ঠাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া দ্বাদশাঙ্গুল-পরিমিত প্রদেশে ভ্রূ, নাসা ও তালু পর্য্যন্ত অবয়ব সংস্থানে বারম্বার প্রাণায়াম অভ্যাসে উপশান্ত হইয়া যায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জিহ্বার প্রান্ত ভাগ দ্বারা সুদৃঢ় অভ্যাসযোগে তালুদেশস্থ ক্ষুদ্র ঘণ্টিকাকে যদি বার-বার স্পর্শ করা যায়, তাহা হইলেই প্রাণপ্রবাহের গতি-নিরোধ ঘটিয়া থাকে।

বৎস! এই সকল সমাধি স্ব স্ব সিদ্ধিফলে বিকল্পবহুল হইলেও যদি পুনঃপুন অভ্যাসযোগে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে জীবের পরম উপশমের নিমিত্ত শীঘ্রই বিকল্পবিহীন হইয়া পড়ে। অভ্যাসের ক্ষমতা যে কত, তাহা আর কি বলিব, অভ্যাসগুণে মানুষ শোক-তাপ হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া আত্মারাম হয় এবং অন্তরে অপার শান্তি সুখ অনুভব করিতে পারে। অভ্যাস ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা এরূপ সুখশান্তি ঘটে না,

অতএব তোমায় বলি, তুমিও অভ্যাসবান্ হও। প্রাণের পরিস্পন্দ অভ্যাস-গুণেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ হইলেই মন বিলয় প্রাপ্ত হয়। মনের লয়ে একমাত্র নির্ব্বাণই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। বাসনা-বিহীন মনই মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত। পরন্তু বাসনাবলিত মন দেহকে এবং দেহের সহিত প্রাণকে পর্য্যন্ত অভিমান বশে গ্রহণ করে; তাই বলি, হে রামচন্দ্র! তুমি ইহা দেখিয়া শুনিয়া তোমার যেরূপ ইচ্ছা করিতে পার। জানিও—যাহা প্রাণস্পন্দ, তাহাই মনের স্বরূপ; ইহা হইতেই সংসারভ্রম সম্ভূত হয়। কিন্তু যখন উহার উপশম প্রাপ্তি হয়, তখনই ঐ সংসারভ্রম নিরাকৃত হইয়া থাকে।

হে রাম! জীবের সংসারভ্রম বা বিকল্পাংশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে সেই একমাত্র বাক্য-মনের অতীত পদ অবশিষ্ট থাকে। সে পদপ্রান্তে সংসার-ভাবময় বাক্যাবলি উপস্থিত হইতে পারে না। ফলে বাক্য দ্বারা তাহাকে নির্দ্দেশ করা যায় না বলিয়া তিনি বাক্যাতীত, তাঁহাতেই সমস্ত প্রতিষ্ঠিত, তাহা হইতেই সমস্ত আবির্ভূত, তিনিই সমস্ত এবং সমস্ত হইতেই তিনি; অথচ তাঁহাতে কিছুই বিদ্যমান নাই, তাঁহা হইতে এ সকল কিছুই নহে এবং তিনি এই জগৎস্বরূপও নহেন। সমস্তই বিনশ্বর, সমস্তই বিকল্পময় এবং সমস্তই গুণাত্মক বলিয়া সেই গুণাতীত পরমাত্মার কোনই সদৃশ দৃষ্টান্ত কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না; তত্রাচ প্রজ্ঞাশালী সাধকসম্প্রদায় তাঁহার যে পরিচয় পরিজ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা কেবল তদীয় প্রতিভার-বিকাশ-দর্শনেই ঘটিয়া থাকে। তিনি শস্যসমুদায়ের আস্বাদনী শক্তি, সমস্ত তৈজস বস্তুর দীপনী শক্তি এবং কামাদি নিখিল আন্তর বিষয়েরও প্রকাশোন্মুখী হইয়াই অন্তরে চিন্ময়টী চন্দ্রিকারূপে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। তিনি কল্পতরুর স্বরূপ; তাঁহা হইতেই নানা রসময়ী সংসার-ফলরাজি অজস্র আবির্ভূত হইতেছে ও পতিত হইতেছে। যে স্থিরধী মহামনা মানব সেই সর্ব্ব সীমার অতীত পদ অবলম্বনপূর্ব্বক অবস্থান করেন, তিনি বিজ্ঞ এবং তিনিই জীবন্মুক্ত আখ্যায় অভিহিত। তাঁহার তখন কাম ভোগাদির যাবতীয় উৎকণ্ঠা বিদূরিত হইয়া যায়; সেই উৎকণ্ঠা অপগমের সঙ্গে সঙ্গে ইষ্ট বা অনিষ্টবিষয়ক হিত বা অহিত বাসনাও

অপগত হইয়া থাকে। তিনি সমুদায় ব্যবহারেই সমজ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া পুরুষোত্তমরূপে বিরাজ করিতে থাকেন।

অষ্টসপ্ততিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৮ ॥

ঊনাশীতিতম সর্গ

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! চিত্ত নাশের দ্বিবিধ ক্রম উল্লিখিত আছে। তন্মধ্যে প্রথম ক্রম যোগ ও দ্বিতীয় ক্রম জ্ঞান। এই যোগ ও জ্ঞান ক্রমের মধ্যে আদ্য যোগ ক্রম বা চিত্ত নাশের প্রকার আপনি নিরূপণ করিয়াছেন, এক্ষণে অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার নিকট আপনি জ্ঞান-ক্রমের বিষয় সম্যক্ প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! এ সংসারে একমাত্র নিত্য স্বপ্রকাশ পরমাত্মাই আছেন। তাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইরূপ স্থির সিদ্ধান্তই পণ্ডিতগণের মতে সম্যক্ জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান। ঘট, পট, মঠ, ইত্যাদি আকারে এ সংসারে কত অসংখ্য পদার্থপুঞ্জ পরিদৃষ্ট হয়, এই সমস্তই আত্মা; তদ্ভিন্ন আর কিছুই বিদ্যমান নাই। এইরূপ স্থির নিশ্চয়কেই সম্যক্ জ্ঞান বা সম্যক্‌দর্শন বলা হয়। এই জ্ঞানেই মুক্তি হইয়া থাকে। উহার বিপরীত অর্থাৎ অসম্যক্ জ্ঞান হইতেই সংসারভাবের বিকাশ হইয়া থাকে। যেমন রজ্জুস্বরূপের অজ্ঞান-নিবন্ধন তাহাতে সর্প দর্শন হয়, আবার রজ্জুস্বরূপের জ্ঞান হইলে যে রজ্জু সেই রজ্জুই দেখা যায়, তেমনি আত্মস্বরূপের অজ্ঞান বশতঃ সংসারদৃষ্টি হয় এবং আত্মস্বরূপের জ্ঞান হইলে মোক্ষ হইয়া থাকে। মোক্ষদশায় সম্বিৎ-মাত্রই ভাসমান থাকে; তাহাতে সঙ্কল্প বা সম্বেদ্য কিছুই থাকে না এবং অন্য কোন কিছুর বিদ্যমানতা বা ভাসমানতারও তাহাতে সম্পূর্ণ অভাব দেখা যায়। যদি বিশুদ্ধরূপে বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সম্বিৎই পরমাত্মসংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে, এবং উহা চিরশুদ্ধ হইলেও যদি

অবিশুদ্ধভাবে অন্তরে বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে অবিদ্যা নামে নির্দ্দিষ্ট হয়। পরমাত্ম-জ্ঞান-দশায় সম্বিত্তি ও সম্বেদের ভেদ-কল্পনা নিরস্ত হইয়া যায়। অজ্ঞান বশে সংসারভাব সঞ্চিত হয়, জ্ঞানোদয়ে আত্মপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে সে ভাব থাকে না; তখন একমাত্র আত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, অন্য কিছুই থাকে না। একমাত্র আত্মাই এই সমস্ত সংসার, এইরূপ নিশ্চয় জ্ঞানেই পূর্ণতা আবির্ভূত হয়।

রামচন্দ্র! যখন উল্লিখিতরূপে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন বুঝিতে পারা যায়, ভাব-অভাব বা বন্ধ-মোক্ষ, এ সকল কেবল কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে এবং শোক বা দুঃখের বিষয়ও এ ত্রিজগতে কুত্রাপি নাই। তখন বুঝা যায়, কোন চেত্য নাই বা চিত্ত নাই, একমাত্র ব্রহ্মই এই সকল ভাবে বিকাশ পাইতেছেন। এই দৃশ্য বিশ্ব একমাত্র পরম ব্যোম ব্যতীত আর কিছুই নহে; সুতরাং মুক্তি কি আর বন্ধই বা কার? ব্রহ্ম বৃহৎ হইতেও সুবৃহৎ, তিনি স্বীয় আত্মাতেই মায়াবলে নটের ন্যায় এই বৃহদাকার দৃশ্য বিশ্বরূপে বিরাজ করিতেছেন। তাই বলিতেছি, তুমি জ্ঞানবলে ভেদ-বুদ্ধি বিদূরিত করিয়া আপনাতে আপনি অবস্থান কর। যদি সূক্ষ্মভাবে পর্য্যবেক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে বুঝা যাইবে, কাষ্ঠ, পাষাণ বা বস্ত্র, এ সমুদায়ের পরস্পর ভেদ কিছুই নাই; সুতরাং তখন একই বস্তুতে হেয় বা উপাদেয় বুদ্ধি আসিবে কিরূপে? আদিতে এবং অন্তে যে অবিনশ্বর স্বরূপ, তাহাই যথার্থ বস্তু; এবং সেই বস্তুই আত্মার স্বরূপ।

হে রঘুবর! তুমি তন্ময় হইয়াই অবস্থান কর। এই চরাচর নিখিল সংসার পরমানন্দময় ব্রহ্মেরই স্বরূপ; সুতরাং ইহাতে সুখের বা দুঃখের অবসর কিছুই নাই। অতএব তোমায় বলিতেছি, তুমি বিজ্বর হইয়াই অবস্থান করিতে থাক। দেখ, জল হইতেই তরঙ্গাদির আবির্ভাব হয়, সুতরাং জলই যেমন তরঙ্গাদি নানাকারে প্রকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি আত্মাও অজ্ঞ জনের সমীপে অজ্ঞান-জনিত জরামরণময় নিজাকারেই বিকাশ পাইয়া থাকেন। বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাবলে বিমল আত্মাকে যিনি আলিঙ্গন করিয়া অবস্থান করেন, তথাবিধ আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিকে কোন ভোগাদিই বন্ধন করিতে সক্ষম হয় না। যেমন কিঞ্চিন্মাত্র বায়ু বহিলে বিশাল শৈল-

কলেবরের কিছুই করিতে পারে না, তেমনি যিনি প্রজ্ঞাবলে বিচার-পরায়ণ হইয়া রহেন, কামাদি রিপুগণ তাঁহাকে কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে সক্ষম হয় না। 'বক যেমন জল-নির্গত মীন ভক্ষণ করে, তেমনি যাহার বিচার-নিষ্ঠা নাই, তাদৃশ অজ্ঞানাচ্ছন্ন, আশাপাশ-যন্ত্রিত মূঢ় ব্যক্তিকে দুঃখরাশি আসিয়া কবলিত করিয়া ফেলে।

হে রঘুবর! এ সংসার সকলই সেই আত্মা; এখানে অবিদ্যা কোথাও নাই। তুমি এই প্রকার দৃষ্টি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বস্বরূপে স্থির হইয়া থাক। দেখ, সরোবর যত প্রকারই থাকুক, তৎসমুদায়ে যেমন জল বৈ আর কিছুই নাই, তেমনি এই সংসার-ভাবপ্রবাহে বস্তুতঃ নানাপ্রকারিতা কিছুই নহে; ফলে সকলই সেই এক ব্রহ্ম। যাঁহার এই প্রকার স্থির ধারণা আছে, তিনিই প্রকৃত পক্ষে পদার্থের যথার্থ তত্ত্ব অবলোকন করিয়া থাকেন এবং তাঁহাকেই মুক্ত আখ্যায় অভিহিত করা হয়।

উনাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৭৯ ॥

অশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! বিবেকশালী ব্যক্তি অন্তরে ঐরূপ বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার সম্মুখস্থ ভোগরাশির প্রতিও কিঞ্চিন্মাত্র স্পৃহা জন্মে না। বিবেকী বিবেচনা করেন,—এই যে চক্ষু, ইহা কেবল আলোকনের নিমিত্ত মাত্র বৈ আর কিছুই নহে। বলীবর্দ্দ যেমন ভার বহনই করে, কিন্তু ভারভূত দ্রব্যে প্রভুত্ব তাহার কিছুই নাই, তেমনি এই চক্ষুরিন্দ্রিয় কেবল প্রিয় বা অপ্রিয় পদার্থ দর্শন করে মাত্র, পরন্তু তজ্জনিত সুখ-দুঃখের ভোগ জীবই করিয়া থাকে। কাজেই বলা যায়, চক্ষুরিন্দ্রিয় যদি রূপাকৃষ্ট হয়, তবে তাহাতে বিবেকী আত্মার ক্ষতি কি হইয়া থাকে? দৃষ্টান্ত স্থলে বলি, সেনাসমবায়ের অন্তর্গত রজকের গর্দ্দভ যদি পঙ্ক-পতিত হয়, তবে তাহাতে সেনাপতির কি ক্ষতি হইয়া থাকে? তাই বলিতেছি, রে অধম নয়ন! তুমি আর সৌন্দর্য্যাদি কর্দ্দমের আস্বাদ গ্রহণ করিও না;

কেন না, উহা নিজেও নাশ পায়, এবং ক্রমে তোমাকেও ধ্বংস করিবে। তুমি স্বভাববশে রূপে প্রধাবিত হও, হইবে; কিন্তু আত্মার তাহাতে কিছুই হইবে না। দেখ, তুমি রূপে মগ্ন হইতে হয় হও, যেন তাহার স্বাদ গ্রহণ করিও না; কারণ, যে অন্তর্গত চিদাত্মার সাহায্যে অন্তরের ও বাহিরের পদার্থ তুমি প্রকাশ কর, তোমার কৃতকার্য্য দ্বারা সে চিদাত্মা যেন বন্ধনদশা ভোগ করে না। হে নেত্র! তুমি অবশ্যম্ভাবী মরণের নিমিত্ত উৎপন্নধ্বংসী ও আপাতরম্য;—সুতরাং অসন্ময় রূপাদির আশ্রয় লইও না। কেন না, ভাবিয়া দেখ, যিনি সতত সর্ব্বার্থ-দর্শনে সক্ষম, তথাবিধ পরমাত্মাই যদি রূপাদির দর্শন ব্যাপারে উদাসীনভাবে অবস্থান করিলেন, তবে তুমি আর কেন বৃথা সাময়িক দীপাদির আলোক প্রাপ্ত হইয়া রূপ সন্দর্শনপূর্ব্বক সে রূপে মগ্ন ও অকারণ অনুতপ্ত হইতেছ? রে চিত্ত! নদীজলে যেমন ফেন-বুদ্বুদাদি দর্শন আর আকাশে যেমন পিচ্ছিকাবলোকন, তেমনি এই মিথ্যা সংসারের মিথ্যা বিলাসে তোমার দৃষ্টি আকৃষ্ট বা অনুরক্ত হইতেছে, হউক, কিন্তু তাহাতে তোমার কি যে, তুমি বৃথা অনুরক্ত বা আসক্ত হইতেছ? ওহে অহঙ্কার! তোমাকেও বলি, চক্ষুর যাহা ইচ্ছা, সে তাহা দেখুক, প্রলয়-পয়োধি-জলের ক্ষুদ্র শফরীর ন্যায় মায়াবশে সদা চঞ্চল চিত্ত যে ভাবে স্ফুরিত হইতে হয়, হউক, তাহাতে তুমি আবার কোথা হইতে আসিয়া কেন বৃথা যোগদান করিতেছ? হে চিত্ত! আলোক ও রূপ ইহারা পরস্পর আধার ও আধেয় ভাবে নিত্য অবস্থিত; সুতরাং সূর্য্যাদির আলোক অবলম্বন করিয়া রূপ স্ফুরিত হয় হউক, আর আলোকও রূপাদিকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইতে হয় হউক, ইহাতে তোমার ত সম্পর্ক কিছুই নাই? তবে এ বিষয়ে তোমার বৃথা ব্যাকুলতা কেন? চক্ষুর সাহায্যে বাহিরের রূপাদি দর্শন ও মনের দ্বারা সেই সেই দৃষ্ট বিষয়ের সঙ্কল্পন, ইহাদের পরস্পর কাহারও সহিত কাহারই বাস্তব সম্বন্ধ নাই, তথাচ মুখমণ্ডল ও তাহার আদর্শ-গত প্রতিবিম্বের ন্যায় উহারা নিত্য সংলগ্নভাবেই লক্ষিত হয়। কিন্তু যাহার জ্ঞান নাই, তাদৃশ জীবের নিকটই উহারা নিত্য-সংশ্লিষ্টভাবে দৃষ্ট হইয়া থাকে; পরন্তু একথাও সত্য যে, যাহার অজ্ঞানকে জ্ঞান আসিয়া গ্রাস করিয়া

ফেলে, তাহার নিকট নিত্যই অসদাকারে পরিণত ও নিত্যই পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। রূপ, আলোক ও মনস্কার এই তিনটী মনের কল্পনাবলেই পরস্পর সুসম্বদ্ধ রহিয়াছে।

রামচন্দ্র! মধ্যম বা অধম অধিকারী ব্যক্তিগণ নিজ মনের মননরূপ বন্ধন-সূত্রকে বিচারপুরঃসর সযত্নে ছেদন করিয়া ফেলেন। পরন্তু যিনি সর্ব্বথা অধিকারী, তাঁহার জ্ঞানোৎপত্তি অনায়াসেই হয়; কাজেই তদীয় অজ্ঞান স্বভাবতই দূর হইয়া যায়। অজ্ঞান যখন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার মনেরও লয় হইয়া থাকে। অজ্ঞান ও মন ক্ষীণ হইলে দেখা যাইবে, রূপ, আলোক ও মনস্কার, এ তিনের আর সঙ্ঘর্ষ হইতেছে না। চিত্তই সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের উদ্বোধক; অতএব গৃহ হইতে যেরূপ পিশাচকে বিতাড়িত করে, তেমনি যে কোন প্রকারেই হউক, অন্তর হইতে চিত্তের উচ্ছেদ করা কর্ত্তব্য।

ওহে চিত্ত! তোমায় বলিয়া রাখিতেছি, কেন আর তুমি অনর্থক চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেছ? তোমার আদি-অন্ত আমি জানিতে পারিয়াছি; আদিতে বা অন্তে তোমার কিছুই নাই। তুমি যখন আদ্যন্তহীন, তখন বর্ত্তমানেও তোমার বিনাশ নিশ্চিতই। হে চিত্ত! ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদিপঞ্চক আনয়ন করিতেছে; তুমি তাহাদের আকারে আমার অন্তরে কেন বৃথা স্ফুরিত হইতেছ? যে তোমাকে আপনার বলিয়া জানে, তাহার নিকট তুমি ঐরূপে স্ফুরিত হইও, তাহাই তোমার মানাইবে, নতুবা তোমার ঈদৃশ স্ফুরণ আমার কিছু মাত্র প্রীতির কারণ নহে। দেখ, তুমি ঐন্দ্রজালিকের মায়াদর্শক ব্যক্তির মানসবৃত্তির ন্যায় মৎসমীপে নিজ বৃত্তিতে বিচরণ করিতেছ,—করিয়া পরিণামে আপনা আপনিই দগ্ধ হইতেছ। আমি স্পষ্টই বলিতেছি, চিত্ত! তুমি থাক, আর যাও, আমার তুমি কেহ নহ এবং তুমি জীবিত বলিয়াও আমি মনে করি না, কেন না, তুমি স্বভাবতই মৃত; বিচার করিয়া দেখিলে কোন কালেই তোমাকে জীবিত বলিয়া বোধ হয় না; সত্য সত্যই তুমি নিত্য মৃত। হে নিত্য মৃতাকার চিত্ত! তুমি নিস্তত্ত্ব, জড়, ভ্রান্ত ও শঠ। যে মূঢ়—সেই তোমার বাধ্য হইয়া থাকে। কিন্তু তুমি বড় চতুর হইয়াও বিচারশীল ব্যক্তিকে

কিছুতেই বাধ্য করিতে পার না। তোমার যে অস্তিত্ব কিছুই নাই, তুমি যে একটা মৃত পদার্থ, ইহা এতদিন আমরা মূর্খতা বশতঃ বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু এখন আর সে মূর্খ-ধারণা নাই, দীপের নিকট তিমিরের যেমন নিত্য অভাব বিদ্যমান, তেমনি আমাদের এখনকার জ্ঞানদশায় তোমার অভাব স্পষ্টতই প্রতীয়মান। তুমি বড় শঠ; আমার এই দেহ-গৃহকে এতকাল শাঠ্যবলেই আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমিই শঠতা করিয়া আমার এই দেহ গৃহে কোন ক্রমেই সাধুসমাগম হইতে দাও নাই। কিন্তু এখন কি হইয়াছে? তুমি প্রেতপ্রতিম জড়স্বভাব শঠ, আমার দেহ-গৃহ হইতে বিতাড়িত হইয়াছ; কাজেই এক্ষণে আমার দেহাশ্রমে সতত শমদমাদি সাধুজনের সমাগম হইতেছে। বলিব কি, আমার এখন আর সুখের অবধি নাই। ওরে দুষ্ট! পূর্ব্বে তোমার অস্তিত্ব ছিল না, এখনও হইতেছে না বা ভবিষ্যতেও থাকিবে না; অতএব রে জগদাকার চিত্ত-বেতাল! এইরূপে কালত্রয়ে তোমার নিবারণ সত্ত্বেও এক্ষণে হেথায় থাকিতে কি তোমার লজ্জা হইতেছে না! যদি তোমার লজ্জা হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলি, ওরে চিত্ত-বেতাল! তুমি তৃষ্ণারূপিণী পিশাচীগণকে ও ক্রোধপ্রমুখ রিপুগণকে সঙ্গে লইয়া আমার দেহ-গৃহ হইতে সত্বর নিস্ক্রান্ত হও।

আহা কি ভাগ্য আমার! যেমন পশুরাজের শব্দ শুনিবামাত্র গুহাভ্যন্তরে লুক্কায়িত ব্যাঘ্র পলায়ন করিয়া থাকে, তেমনি সতত অনবস্থিত চিত্ত-বেতাল আমার বিবেকের অভ্যুদয় দর্শনেই দেহ-গৃহ হইতে সত্বর পলাইয়া গিয়াছে। অহো! ইহা অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার যে, এই চিত্ত একান্ত জড় ও ক্ষণভঙ্গুর হইয়াও এই সমস্ত জনসাধারণকে বিবশ করিয়া তুলিতেছে। রে চিত্ত! তুমি অজ্ঞানী লোককেই আক্রমণ করিয়া থাক; কিন্তু এরূপ আক্রমণে তোমার বল-বীর্য্যের পরিচয় কিছুই প্রকাশ পায় না। হাঁ স্বীকার করি, যদি তুমি একবার আমায় অভিভূত করিতে পার, তবেই তোমার বিক্রমের পূর্ণ পরিচয় হয় এবং তবেই বুঝিতে পারি যে, তোমার আশ্রয়, সহায় বা বলের অভাব নাই। ওরে অবোধ চিত্ত! তুই আর কিছুতেই আমার নিকট থাকিতে পারিবি না; আমি অনেক দিন

পূর্ব্ব হইতেই তোকে মৃত বলিয়া বুঝিয়াছি; সুতরাং অদ্য আর নূতন করিয়া কি বুঝিব? আমি এতকাল তোকে জীবিত জ্ঞান করিয়া এই সুদীর্ঘ সংসারনিশায় প্রগাঢ় আলিঙ্গন করিয়া আসিয়াছি; কিন্তু এখন বেশ বুঝিতে পারিয়াছি যে, তুই একান্তই মৃত পদার্থ; কাজেই আমার আর কোন আশাই নাই, আমি সর্ব্বত্যাগী হইয়া কেবল আত্মাতেই অবস্থান করিতেছি।

অহো আমার কি ভাগ্য! কি সুখের দিবস! অদ্য আমি চিত্তকে মৃত বলিয়া বুঝিতে পারিলাম। আর না, আর আমি ঐ কপট শঠ চিত্তের সহবাসে কদাচ আমার এই সুদীর্ঘ জীবন যাপন করিব না। আমি দেহ-গৃহ হইতে ঐ শঠ মনকে নিঃসারিত করিয়াছি, আর আমার বেতাল-সংসর্গ নাই। আমি অধুনা আত্মাতে অবস্থান করিয়া সুখী হইয়াছি। এতকাল আমি চিত্ত-বেতালে আক্রান্ত হইয়াছিলাম। ঐ অবস্থায় তখন কতই না বিকার করিয়াছি। এক্ষণে সে সকল স্মরণ হয়, আর আমি স্বতই হাসিতে থাকি। আমার হৃদয়-সদনে বাস করিয়া ঐ চিত্ত-বেতাল বড়ই বৃদ্ধি পাইয়াছিল; আমার অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন, তাই আমি বিচাররূপ অস্ত্র দ্বারা উহাকে এক্ষণে নিহত করিয়াছি। তাই ঐ বেতাল উপশান্ত হইয়া গিয়াছে। বেতাল বিলীন হইবার পরই ভাগ্যগুণে আমার দেহ-নগর শান্তি-পথে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমি এখন বড়ই সুখে অবস্থান করিতেছি। আমি অমোঘ বিচারমন্ত্র প্রয়োগ করিয়াছি, তাহারই প্রভাবে আমার মনের মৃত্যু ঘটিয়াছে, চিন্তা চলিয়া গিয়াছে ও অহঙ্কার-নিশাচর নিরাকৃত হইয়াছে। অধুনা আমি কেবল আত্মাতেই পরম সুখে রহিয়াছি। আমার মন কি, আশা কি, অহঙ্কার কি, কলত্রবর্গই বা কি? ফলে সকলই ব্যর্থ, সকলই অসার। কিন্তু আমার বড় ভাগ্য, সে সকলই সমূলে আমার নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি। আমার সমস্ত বিকল্প তিরোহিত হইয়াছে। আমি নিত্য চিন্ময় পরমাত্মস্বরূপে অবস্থান করিতেছি; সুতরাং আমার আর অন্য নমস্কারার্হ কে? আমি আপনাকেই আপনি বারম্বার নমস্কার করি। আমার শোক নাই, মোহ নাই, আমি অভিমানপ্রধান জড়াংশ নহি, আমার

কেহ নহে, আমি অন্য কেহ নহি, আমি আমাকেই নমস্কার করি। আমার আশা নাই, কর্ম্ম নাই, সংসার নাই, কর্ত্তৃত্ব নাই, ভোক্তৃত্ব নাই, দেহ নাই; আমি আমাকেই বারবার নমস্কার করি। আমি আত্মশব্দ জন্য প্রত্যয়-বিষয় নহি, অথচ আত্ম ভিন্ন অন্য নহি, 'অহং' শব্দ জন্য প্রত্যয়-বিষয় নহি, এবং তদ্ভিন্ন অন্যও আমি কেহ নহি। আমিই সকল এবং সকলই আমি। সুতরাং আমাকেই আমার নমস্কার। আমি ভুবনের কারণ হইয়া চিদাকারে এই—বিশ্বসংসার ধারণ করিয়া রহিয়াছি। আমার কোনই পরিচ্ছেদ নাই, আমি আমাকেই বারবার নমস্কার করি। আমার বিকার কিছুই নাই, আমি নির্ব্বিকার, নিত্য, নিরংশ, এবং সর্ব্বকালেই সর্ব্বথা সর্ব্বস্বরূপ মহাত্মা; আমি আমাকেই পুনঃপুন নমস্কার করি। আমার কোন রূপ নাই, কোন নাম নাই, আমি স্বয়ং আত্মায় স্বপ্রকাশ ও আত্মাতে এক-নিষ্ঠ, আমি আমাকেই বারবার নমস্কার করিতেছি। আমি সর্ব্বরূপিণী বিশ্ববিকাশিনী সম-সূক্ষ্ম সত্তাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছি, আমার সেই আত্মাকে আমি নমস্কার করি।

এই যে নগ-নদী-নীরধি-শালিনী মেদনী-সহিতা দৃশ্যশ্রী, ইহা আমি নহি; এইরূপে এই যে অতীত অনাগত পদার্থযুক্ত সমস্ত জগৎ, ইহাও আমি নহি, অথচ এই সকলই আমি; সুতরাং আমাকেই আমার নমস্কার। যাহাতে কোনই মনন নাই, যিনি সর্ব্ব সৌন্দর্য্যের নিকেতন, যাঁহার জরা-মরণ নাই, যিনি গুণাতীত ও জন্ম-বিরহিত, আমি সেই অচ্যুত ঈশকে বারম্বার নমস্কার করিতেছি।

অশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮০ ॥

একাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে মহাভুজ! আত্মাকেই যাঁহারা অবশ্যজ্ঞাতব্য বলিয়া অবধারণ করেন, তাদৃশ তত্ত্বাভিজ্ঞ মহাত্মগণ উল্লিখিত প্রকারে বিচার করিয়া চিত্তের মিথ্যাত্ব বিদিত হইলেও পুনর্ব্বার বক্ষ্যমাণরূপে চিত্ত-

বিচারে প্রবৃত্ত হইবেন। তাঁহাদের বিচারপ্রণালী এইরূপ,—যে চিত্ত এ জগতের জগদ্ভাব মার্জ্জন করিয়া আত্মাতেই পর্য্যবসিত করিয়া দেয়, অর্থাৎ ইহা জগৎ নহে,আত্মাই, এই প্রকার বোধ উদ্ভাবন করে, সে চিত্ত যে অবস্থিত হয়, ইহা একান্তই আশ্চর্য্যের বিষয়। চিত্ত থাকিবে কিরূপে? এই যে জগৎ দেখা যাইতেছে, ইহাই যখন কিছুই নহে, তখন চিত্তের কি কোন বস্তু হওয়া সম্ভবে? বস্তুতঃ চিত্ত সম্পূর্ণই অসৎস্বরূপ; কেন না, সে অবিদ্যমান কিম্বা তাহার উৎপত্তি মায়িক বিলাস। অথবা চিত্ত নিশ্চয়ই নাই কিম্বা তাহা আকাশকুসুমবৎ ভ্রান্তিরই বিকাশ মাত্র। যেমন নৌকারোহী শিশুর নিকট ভ্রমক্রমে তীরস্থ তরুরাজির গতিশীলতা প্রতিপন্ন হয়, আত্মভ্রান্ত অজ্ঞানীর নিকটও চিত্তস্পন্দ তেমনি হইয়া থাকে। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী সাধুপুরুষ, তাঁহার নিকট ঐ চিত্ত নিত্যই মিথ্যাস্বরূপ। কোন তিল বা ইক্ষু-পেষণ যন্ত্রে উত্থিত হইয়া ভ্রমণপূর্ব্বক তাহা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও কিয়ৎকাল যেমন সম্মুখস্থ শৈলাদিকেও ভ্রমণ করিতে দেখা যায়, তেমনি অজ্ঞানবশে যতদিনে না ভ্রম নিরস্ত হয়, ততদিন কেবল চিত্তস্পন্দনই অনুভূত হইতে থাকে। যে ভ্রম দ্বারা চিত্তের স্থিতি হয়, সে ভ্রম চলিয়া গেলে চিত্তের অস্তিত্ব থাকে না। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, চিত্ত নাই; কেবল ব্রহ্মই বিদ্যমান। কাজেই মিথ্যা চিত্ত হইতে যে সকল পদার্থভাবনার উদয় হয়, সে সমুদায়ও মিথ্যা; মিথ্যা বলিয়া সে সকলই আমার পরিত্যাজ্য। পূর্ব্বে যে চিত্ত বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল, এক্ষণে তাহা আমার গলিয়া গিয়াছে, আমি অধুনা গতজ্বর ও স্বস্থ হইয়াছি। পূর্ব্বে যে আমি পারমার্থিকতায় অবস্থিত ছিলাম, এখনও আমি কেবল সেই স্বানুভাবেই অবস্থান করিতেছি। আলোকের অভাব হইলেই রূপভেদ-বোধক জ্ঞানাদি যেমন থাকে না, তেমনি চিত্তের যখন অভাব হয়, তখন অজ্ঞতানিদান বাসনারাশিরও অবসান হইয়া থাকে। আমার চিত্ত বিনষ্ট হইয়াছে, তৃষ্ণা বিদূরিত হইয়াছে, মোহজাল ক্ষয় পাইয়াছে এবং অহঙ্কার ছিন্ন হইয়াছে; সুতরাং আমার অজ্ঞাননিদ্রারও অবসান ঘটিয়াছে। আমি সম্প্রতি জাগ্রৎ আত্মাতেই প্রবুদ্ধ রহিয়াছি। এক আছেন ব্রহ্ম; তিনিই বটে নিত্য সত্য। তাঁহার ভেদ ভিন্নতা নাই। কাজেই অন্তরে আর

কেন সে অসৎ বিশ্বের অস্তিত্ব ধারণা পোষণ করিতে থাকিব? বলিতে কি, সে অসদালাপের প্রয়োজনও কিছুই নাই। আমি এখন যে পদে উপনীত হইয়াছি, তাহা নিরাভাস, অনাদি, অনন্ত, পবিত্র ব্রহ্মপদ। আমি সৌম্য, সর্ব্বগত, সূক্ষ্ম, শাশ্বত আত্মা হইয়াই অবস্থান করিতেছি। এ সংসারে ব্যবহার-দৃষ্টিতে যে চিত্তাদি আছে এবং জ্ঞানদৃষ্টিতে ব্রহ্ম চৈতন্যাদির যে বিদ্যমানতা রহিয়াছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে তাহা আকাশ হইতেও স্বচ্ছ, অতীব বিতত, অসীম ও শান্ত। দেহাভ্যন্তরে চিত্ত থাকুক, বা অন্তরে বিলয় পাইয়া যাউক, অথবা মৃত কিম্বা জীবিত থাকুক, আমার সহিত তাহার সম্বন্ধ কি? আমি ত নিত্যোদিত নিঃসঙ্গ আত্মা; আমার যখন সঙ্গ নাই, তখন আর চিত্তের ঐ সকল অবস্থাবিচারে আমার প্রয়োজন কি? এত কাল অতীত হইয়াছে, আমি নিজের মূর্খতা বশতঃ কিছুমাত্র বিচার করি নাই, তখন আমি পরিমিত বা পরিচ্ছন্নাকার ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে বিচার করিয়া বুঝিলাম, আমি অমিতাকার, আমার বিচারই বা কি, আর আমিই বা কে বিচারক? এবং কিসেরই বা আমি বিচার করিয়া দেখিব? আমার ধারণা, এ সকলে প্রয়োজন কিছুই নাই। মন যে দিন মরিয়াছে, সেই দিন হইতেই বিশ্ববিকল্পসমূহের অবসান ঘটিয়াছে। সুতরাং অদ্য হইতে আমি যাবতীয় অন্তঃস্থ সঙ্কল্প পরিহার করিলাম এবং এইরূপ নির্ণয় করিয়া ওঙ্কার-নির্ব্বাচ্য তুরীয় পরমাত্মায় শান্তভাবে মৌনী হইয়া রহিলাম।

হে রঘুনন্দন! আত্মজ্ঞগণ গমন, অবস্থান, ভোজন, শয়ন সকল সময়েই স্বীয় প্রজ্ঞাবলে প্রত্যহ ঐরূপ বিচার করিবেন এবং স্বয়ং স্বস্বরূপে অবস্থিত হইয়া নিরুদ্বেগে বর্ণাশ্রমোচিত যাবতীয় কর্ম্ম-পরম্পরা নির্ব্বাহ করিবেন।

রামচন্দ্র! এইরূপে প্রজ্ঞাশালী ব্যক্তির অভিমান অপগত হয়। অভিমান চলিয়া গেলে তাঁহার অন্তঃকরণ অতি প্রফুল্ল হইয়া উঠে। তিনি শারদ সুধাকরের ন্যায় কান্তিমান্ হইয়া বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্ম পালনপুরঃসর এ সংসারে প্রচুর আনন্দের সহিত বিহার করিয়া থাকেন।

একাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮১ ॥

দ্ব্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! পুরাকালে বৃহস্পতির ভ্রাতা বিদ্বান্ সম্বর্ত্ত এইরূপই বিচার করিয়াছিলেন এবং আত্মতত্ত্ব বিদিত হইয়া বিন্ধ্যাচলে বিচরণ কালে আমার নিকট উক্তরূপ বিচারবার্ত্তাই ব্যক্ত করিয়াছিলেন। অতএব তুমি বিচারনিষ্ঠ বুদ্ধিবলে অসৎ দৃষ্টি নিরুদ্ধ করিয়া উত্তরোত্তর চিত্ত বিশ্রান্তির প্রকর্ষ-পরিপাক প্রযুক্ত ক্রমিক ভূমিকারোহণ করত এই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হও।

হে রাম! এক্ষণে তোমার নিকট অপর এক তত্ত্বদৃষ্টি-বিবরণ ব্যক্ত করিতেছি; পূর্ব্বে বীতহব্য মুনি এই দৃষ্টি অবলম্বন করিয়াই অশঙ্কিত ব্রহ্মপদে আরোহণ করিয়াছিলেন।

পুরাকালে মহাতেজা বীতহব্য মুনি অরণ্যপ্রদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন। দিবাকর যেমন মেরু-কন্দরে ভ্রমণ করেন, তেমনি তিনি সমাধি-সাধনার অনুকূল বিন্ধ্যগিরির কন্দরে কন্দরে ভ্রমণ করিতেন। কালক্রমে আধি-ব্যাধিময় সংসার-ভ্রমজনক ভীষণ ক্রিয়াক্রম হইতে তাঁহার একান্তই ভয় জন্মিয়াছিল, তাই তিনি নির্ব্বিকল্প সমাধি-লভ্য পরম পদ প্রাপ্তির কামনায় সংসার হইতে আত্মব্যাপারসমূহকে সঙ্কুচিত করিয়া লইলেন এবং ঐ বিন্ধ্যাচলেরই কোন এক প্রদেশে কদলীদল দ্বারা একখানি পর্ণ-কুটীর প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার নির্ম্মিত সেই পর্ণকুটীরের মধ্যভাগ শুভ্র, সৌগন্ধযুক্ত ও অলিব্যাপ্ত উৎপলের ন্যায় অতীব রমণীয় হইল। তিনি স্বহস্তে সেই কুটীরাভ্যন্তরে একখানি পবিত্র মৃগ চর্ম্মাসন পাতিয়া লইলেন এবং হিমগিরিশৃঙ্গস্থ বর্ষণহীন বারিধরের ন্যায় অচঞ্চলচিত্তে তদুপরি উপবেশন করিলেন।

তৎকালে বীতহব্য মুনি উভয় পদের উভয় তলমূলের উপরিভাগে করাঙ্গুলিদল বিন্যস্ত করিয়া বদ্ধপদ্মাসন হইলেন এবং স্বীয় গ্রীবাদেশ সরল ও সমুন্নত করিয়া গিরিশৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে সমাধি-ব্যাপারে নিরত হইয়া রহিলেন। অনন্তর ইন্দ্রিয়জ্ঞানরূপ আলোকের সহায়তায় সংসারভাব

প্রবিষ্ট মনকে তিনি নিগ্রহ করিয়া রাখিলেন। বোধ হইল, দিবাকর যেন সায়ংকালে সুমেরু কন্দরে প্রবেশোন্মুখ স্বীয় প্রভাপটলকে সংহার করিয়া লইলেন। ক্রমশঃ ইন্দ্রিয়সম্বন্ধে বাহ্যিক ও মনঃসম্পর্কে আভ্যন্তরিক বিষয়স্পর্শ তাঁহার পরিত্যক্ত হইল। তিনি নির্ব্বিকল্প-হৃদয়ে বক্ষ্যমাণরূপে বিচার করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই বিচার প্রকার এই যে,—কি আশ্চর্য্য! আমি আমার মনকে যতই নিগৃহীত করিতেছি, মন আমার কিছুতেই স্থির হইতেছে না; জলতরঙ্গোপরি ভাসমান পত্রদলের ন্যায় মন সর্ব্বদাই অস্থির রহিয়াছে। কন্দুকাদি স্থির বস্তু হইলেও তলদেশে আঘাত পাইলে সে যেমন ঊর্দ্ধদিকে উত্থিত হয়, মনও তেমনি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়বর্গের চেষ্টায় স্বস্ব বিষয়ে পরিচালিত হইয়াই প্রতিনিয়ত নর্ত্তন করিতেছে। মন পূর্ব্ব পূর্ব্ব বিষয় পরিহার করে বটে; কিন্তু ইন্দ্রিয়দলের অনুসরণক্রমে উত্তরোত্তর বিষয় গ্রহণ করিতেছে। কি করিব? মনকে আমি যে দিকে যাইতে নিবারণ করি, মন আমার সেই দিকেই উন্মত্তের ন্যায় ধাবিত হইতেছে। মর্কট যেমন এক বিটপী হইতে অন্য বিটপীর শাখায় শাখায় বিচরণ করিয়া বেড়ায়, তেমনি মন আমার ঘট হইতে পটে, পট হইতে মঠে এবং মঠ হইতে শকটে, এইরূপে নানা পদার্থে বিচরণ করিতেছে। আমি দেখিতেছি, চক্ষুরাদি দুষ্ট পঞ্চেন্দ্রিয় ঐ মনের পঞ্চ নির্গম-দ্বার হইয়া রহিয়াছে। রে দগ্ধ-দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণ! কেন তোরা আমার আত্মদর্শনের অবসর প্রদানে পরাঙ্মুখ হইয়াছিস্? রে চপলচিত্ত ইন্দ্রিয়গণ! তোরা এরূপ অনর্থ সাধনার্থ চাঞ্চল্য প্রকাশ করিস্ না, একবার তোরা অতীতবিষয়ক অসংখ্য দুঃখপরম্পরার কথা স্মরণ করিয়া দেখ্। আরও বলি, তোরা মনের দ্বারস্বরূপ হইলেও জড়াকার; সুতরাং একান্তই অধম; অতএব মরীচিকার ন্যায় অনর্থক স্পর্দ্ধা তোদের কিছুতেই শোভার সামগ্রী নয়। কেন না, যাহাদের স্বরূপই মিথ্যা, তাহাদের এইরূপ আত্মজ্ঞানহীন ঔদ্ধত্য অমার্গ-ধাবিত অন্ধদিগের কূপ-পাতের ন্যায় পরিণামে কুফলই প্রদান করে। তাই বলিতেছি, রে ইন্দ্রিয়দল! তোদের দ্বারা আমার কোনই প্রয়োজন নাই। আমি আত্মা চিন্ময়। আমিই

সাক্ষিরূপে ব্যবহারিক কার্য্যপরম্পরা নির্ব্বাহ করিতেছি; সুতরাং কেন তোরা বৃথা ব্যাকুল হইতেছিস্? এই যে চক্ষুরাদি আছে, ইহারা মিথ্যা-স্বরূপ হইয়া মিথ্যাই প্রকাশ পাইতেছে এবং সর্পে রজ্জুভ্রমের ন্যায় সংসারকে সত্যজ্ঞানে তাহাতে প্রবিষ্ট হইতেছে। যে সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বজ্ঞ আত্মা চক্ষুরাদিকে বিশেষরূপে চিনিয়া লইয়াছেন, স্বর্গ সহ পাতালস্থ পর্ব্বতের ন্যায় তাঁহার সহিত উহাদের অল্পমাত্রও সম্বন্ধ নাই। পান্থ যেমন সর্প হইতে এবং বিপ্র যেমন যবন হইতে ভীত হইয়া তৎ-সন্নিধান পরিহার করে, তেমনি চিন্ময় আত্মা ইন্দ্রিয়বর্গের সান্নিধ্য পরি-ত্যাগ করিয়া বহুদূরে অবস্থান করিয়া থাকেন; সুতরাং সৌরকর প্রকাশে দিবস-ব্যাপারের ন্যায় আত্মার প্রকাশে আপনা হইতেই লৌকিক ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। কাজেই বলা যায়, এ কার্য্যে ইন্দ্রিয়াদির চাঞ্চল্যে প্রয়োজন কিছুই নাই। রে চিত্ত! তুই সকল প্রকারে বহি-র্ম্মুখে বিচরণ করিয়া থাকিস্; এইজন্য তুই ধারণ এবং আপনাকে সকল দিকে চরিতার্থ করিতেছিস্; এই নিমিত্ত তুই ভিক্ষুক। তাই বলি, কেন তুই বৃথা আপন অনর্থের নিমিত্ত কুক্কুরবৎ এ জগতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিস্? রে মন! তুই ভাবিতেছিস্—তুই চিন্ময়; কিন্তু এরূপ ধারণা তোর একান্তই অসত্য। রে শঠ! তোমাতে এবং চৈতন্যে অতীব পার্থক্য বিদ্যমান; তাই একত্ব সম্ভাবনা কিছুতেই হইতে পারে না। 'আমি আছি' এই বলিয়া তোর যে 'অহং' জ্ঞান হয়, ইহাতে উহা সত্য বা অসত্য, কিছুই বলা চলে না। প্রত্যুত ঐরূপ দুর্ম্মতি বৃথা এবং পরিণামে দুঃখের নিমিত্তই উৎপন্ন। অথচ অহঙ্কারের আবির্ভাবে 'আছি' বলিয়া তোর যে অভিমান হয়, তাহা তুই পরিত্যাগ কর্। রে মুর্খ! তুইতো কিছুই নহিস্ অথচ বৃথা কেন চঞ্চল হইতেছিস্? আমি জানি, চিন্ময় জ্ঞানই অনাদি ও অনন্ত। এ দেহের ঐ জ্ঞান ব্যতীত অপর কিছুই নাই; তাই বলিতেছি, রে মূর্খতম মন! তুই আবার কে এই চিত্ত নামে বিখ্যাত হইতেছিস্? রে চিত্ত! তুই ভোক্তা ও কর্ত্তা বলিয়া তোর যে একটা অভিমানোদয় হইতেছে, তাহা আপাতত রসায়নের ন্যায় হইলেও পরিণামে বিষের ন্যায়ই কার্য্য করিবে। তাই বলিতেছি, তুই এখন ঐ

অসত্য অভিমান পরিত্যাগ কর্। তুই মূর্খ ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় লইয়াছিস্—লইয়া কি নিমিত্ত উপহাসের আস্পদ হইতেছিস্? তোকে কর্ত্তা বা ভোক্তা কিছুই বলা চলে না; তুই কেবল জড়স্বরূপ; তাই অন্যের সাহায্যে বোধিত হইয়া থাকিস্। তুই ভোগরাশির কেহই নহিস্; ভোগরাশিও তোর কেহ নহে। তুই জড়—তোর আত্মা নাই; সুতরাং তোর আর সুহৃদ্ বা বন্ধুজনাদি থাকিতে পারে কিরূপে? অপিচ যাহা জড়, তাহার সত্তাও ত কোনরূপেই নাই; কাজেই তাহাতে কি কর্ত্তৃত্ব, কি ভোক্তৃত্ব অথবা কি তদিতর ভাব, কিছুরই তো অস্তিত্ব সম্ভাবনা করা যায় না; তাহা কেবল নিজে অসৎস্বরূপ হইয়াও পরের সত্তাতেই সতের ন্যায় বিভাত হইতে থাকে। অথবা রে চিত্ত! তুই যদি প্রত্যক্-চেতনরূপীই হইতিস্, তাহা হইলে তো আত্মাই তোর দেহ হইত, পরন্তু তাহাতে তোর ভাবাভাবময়ী দুঃখদায়িনী সত্তা হইত কিরূপে? রে চিত্ত! তুই যেরূপে অনর্থক কর্ত্তৃত্ব ও ভোক্তৃত্বাভিমান পোষণ করিতেছিস্, এবং আমিও যে প্রকারে সেই অভিমানকে ধীরে ধীরে বিদূরিত করিতেছি, তাহা বলিতেছি, তুই তাহা শ্রবণ কর্।

রে চিত্ত! তুই যথার্থই জড়; তোর জড়ত্বে সংশয় কিছুই নাই; কাজেই বলিতে হয়, জড়ের কি কখন কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে? দেখ, শিলা কোথাও নৃত্য করে কি? তাই বলি, তুই যদি এমন মনে ভাবিস্ যে, কাষ্ঠও চেতনের সাহায্যে নৃত্য করিয়া থাকে, তবে তুই তাহাই কর্,—ঈশ্বরাংশ শুদ্ধ চিদাভাসের সামর্থ্যে চিরদিন তুই কার্য্য করিতে থাক্। আমি জীবিত আছি, আমি করিতেছি, আমি যাইতেছি, আমি হিংসা করিতেছি, এ সকল তোর বৃথা ভাবনাই বটে। কেন না, যাহার সামর্থ্যে কৃত হয়, তাহাকেই লোকে কর্ত্তা বলিয়া থাকে। দৃষ্টান্ত দেখ, দাত্রদ্বারা পুরুষের সামর্থ্য ধান্য ছেদিত হয়; এইজন্য লোকে পুরুষকেই ছেদক বলিয়া থাকে। আরও দেখ, যাহার সামর্থ্যে যে লোক হত হয়, তাহাকেই তাহার হনন কর্ত্তা বলা হইয়া থাকে, পুরুষের সামর্থ্যেই খড়্গ লোককে নিহত করে; তাই পুরুষই হন্তা হয় এবং পানপাত্রও পুরুষের কর্ত্তৃত্বে পানক্রিয়া নির্ব্বাহ করে; এইজন্য পুরুষই পানকর্ত্তা হয়। ফল কথা,

তুই যাহা করিতেছিস্ বলিয়া ভাবিয়া থাকিস্, ঐশ অংশ চিদাভাসের সামর্থ্যেই তৎসমস্ত সম্পাদিত হইতেছে; ইহাতে তোর এত অভিমান কিসের? তুই তো স্বভাবতই অতি জড়; সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার কর্তৃত্বেই তুই প্রবোধিত হইয়া থাকিস্; এই জন্যই তুই আত্মাকে স্বপ্নের ন্যায় বুঝিয়া থাকিস্। কিন্তু বাস্তব পক্ষে তোর সংজ্ঞা বা কার্য্য কিছুই নাই। পরমেশ পরমাত্মা তোকে নিয়তই বোধ প্রদানে উদ্ভাসিত করেন; কেন করেন? তাহার কারণ পণ্ডিতগণের স্বভাবই এই যে, তাঁহারা মূর্খ-দিগকে উপদেশাদি দানে নিয়তই বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। একমাত্র বোধস্বরূপিণী আত্মসত্তাই স্ফূর্ত্তি পাইয়া থাকে। তুই তাঁহারই আশ্রয়ে চিত্ত শব্দ লাভ করিয়া অবস্থান করিতেছিস্। ওরে চিত্ত! তুই এইপ্রকারে আত্মশক্তির অজ্ঞানবশেই চিত্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিস্। কিন্তু এখন কি হইল? তীব্র আতপে যেমন হিমপিণ্ড গলিয়া যায়, জ্ঞানের প্রভাবে তোকেও তেমনি গলিত হইতে হইল। অতএব তুই প্রকৃতই মৃত, তুই মূঢ় এবং পরমার্থতঃ কেহই নহিস্; সুতরাং জন্ম-জরাদি দুঃখের জন্য তোর যে একটা স্থিরাভিমান আছে, তাহা এক্ষণে একেবারেই বিদূরিত হউক। যেমন ঐন্দ্রজালিকের উদ্ভাবিত লতা, তেমনি তোর এই চিত্তসত্তা; ইহা বাস্তবিকই একান্তই মিথ্যা। যাহা ব্রহ্মের বিজ্ঞান, তুই এবং তোর দৃশ্য জগৎ তাহাই; তদ্ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন জলধির জল—ফেন, কণা ও বুদ্বুদাদির আকারে বিকাশ পাইয়া থাকে, তেমনি সেই এক ব্রাহ্মী শক্তিই এই সুরাসুর-নর-কিন্নরাদিময় জগদাকারে প্রকাশ পাইতেছে। রে মূঢ়! যদিও তর্কের অনুরোধে বলা যায়, তুই আত্ম-জ্ঞানের উদয়ে চিন্ময় হইয়ছিস্, তাহা হইলেও তো তোর শোক-দুঃখাদি কিছুই থাকিবার নহে। কেন না, সে ভাবে তুই পরম পদ হইতে অভিন্ন। সেই ব্রহ্মপদ সর্ব্বগ, সর্ব্ব-ভাবস্থ ও সর্ব্বস্বরূপ। রে অজ্ঞ! তাহা পাইলে সকলই সর্ব্বদা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সত্য সত্যই তুই নাই, দেহ নাই, একমাত্র বিশাল ব্রহ্মই স্ফুরিত হইতেছেন। সেই ব্রহ্ম পদেই 'আমি' 'তুমি' শব্দের প্রতিভাস হইতেছে। ইহাতে কাহার কি আর্ত্তি হইতে পারে? রে চিত্ত! তুই যদি আত্মাই হইবি, তবে ত তুই বিশ্বব্যাপী এবং

তোর অতিরিক্ত কেহই নাই। আর যদি আত্মাতিরিক্ত জড়স্বরূপ হইস্, তবে তো জড়ের স্বাধীন সত্তার অভাবে তোরও স্বাধীন অস্তিত্ব নাই। এই বিশ্ব সংসার সকলই আত্মা; আত্মাতিরিক্ত অন্য কিছুই নহে। যদি তুই আত্মা ব্যতীত অন্য কিছু হইয়া থাকিস্, তবে বলিব, তোর পারমার্থিক স্বরূপ কিছুই নাই। আমি এই বালক-বপু, আমি এই বৃদ্ধ-দেহ, এই সকল পুত্রাদি আমার স্বজনগণ, এইরূপে তুই কেন বৃথা অভিমান পোষণ করিস্? তুই ত নিজেই অসৎ, সুতরাং তোর এরূপ অভিমান হয় কোথা হইতে? শশনামক জন্তুর শৃঙ্গ আছে, এ কথা একেবারেই অসম্ভব; কিন্তু কোন লোক কি সেই অসত্য শৃঙ্গে কখন সমাহত হইয়া থাকে?

রে কপট! তুই যদি বলিস্ যে, আমি চিন্ময় বা জড় এতদুভয়ের কেহই নহি; পরন্তু এতদুভয় ব্যতিরিক্ত অপর কোন তৃতীয়ভাবে পরিপূর্ণ আছি। তাহা হইলে বলি, তোর এ ধারণা একান্তই অলীক; কেন না, যেমন ছায়া ও আতপ, এই দুইয়ের মধ্যে অন্য তৃতীয় কিছুই নাই, তেমনি জানিতে হইবে যে, উক্ত উভয়াতিরিক্ত অন্য তৃতীয় কেহই নাই। যখন তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যুদয়ে চিত্তের ও ভ্রমকল্পিত জড়ের জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখন কেবল মাত্র আত্ম-চৈতন্যই প্রতিষ্ঠিত রহিয়া যায়। তাই বলি, রে মূঢ়! তোর নাই কর্তৃত্ব, নাই ভোক্তৃত্ব, সুতরাং তুই মূঢ়তা পরিহার কর, —করিয়া আত্মবান্ হইয়া থাক্। 'মনের দ্বারা দেখিবে' এই প্রকার বেদ-বাক্য তোকে জ্ঞাতা বলিয়া নির্দ্দেশ করে বটে; কিন্তু সে নির্দ্দেশ কেবল উপদেশ সিদ্ধির জন্য। কথিত আছে,—আত্মা তোকেই করণরূপে রাখিয়া কার্য্য করিতে থাকেন। জানা আছে,—করণ মাত্রই অসৎ; কাজেই তাহা জড় এবং নিরাশ্রয়। কর্ত্তার স্ফুরণ ভিন্ন কিছুতেই করণের স্ফুরণ হইবার নহে। এতাবতা বলিতে হয়, তুই যখন জড়, তখন কোন ব্যাপারেই তোর কর্তৃত্বাভিমান পোষণ করা অবৈধ। যেমন ছেদক নাই, দাত্র আছে; এ ক্ষেত্রে দাত্রের কিছুই করিবার যোগ্যতা নাই, তেমনি কর্ত্তা ভিন্ন করণের ক্ষমতা কিছুই নাই। রে চিত্ত! যেমন খড়্গ দ্বারা প্রহার বা তৎকৃত ছেদন, এই দুই কার্য্যে পুরুষেরই সামর্থ্য

বিদ্যমান; পরন্তু জড় খড়্গ সর্ব্বথা শুদ্ধ হইলেও ঐ ছেদনাদি ব্যাপারে কোনই যোগ্যতা প্রকাশে সক্ষম হয় না, তেমনি তুই জড়স্বরূপ; তোরও অবস্থা ঐরূপই। অতএব হে সখে! তোমার যখন কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই, তখন তুমি বৃথা দুঃখভাগী হও কি জন্য? আরও দেখ, পরের ক্লেশ আপন স্কন্ধে চাপাইয়া দুঃখ ভোগ করা মূর্খতারই পরিচয়। ওরূপে ক্লেশ ভোগ করা কিছুতেই তোমার সাজে না। অথবা যদি জীব ঈশ্বরাংশ বুঝিয়াই তাহার জন্য শোক কর, তবে তাহাও তোমার পক্ষে উচিত নহে। কেন না, পরমেশ্বর কখনই লোকের লক্ষ্য হইবার নহেন। সুতরাং যে তোমার তুল্য ব্যক্তি, তাহারই জন্য তোমার শোক করা কর্ত্তব্য। বিশেষতঃ কার্য্য কিম্বা অকার্য্য, কিছুতেই পরমেশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। তিনি কিছুই করেন না; তিনি সদাই অক্লেশভাগী। আমি করিলাম, এরূপ বুদ্ধি কেবল গর্ব্ব-সম্ভূত। তবে যদি আত্মারই উপকার করিতেছি, এই প্রকার অভিমানভরে স্বীয় অবয়বকে ক্লিষ্ট করিতে চাও, তবে তাহাতে তোমারই কেবল ক্লেশ ভোগ; পরন্তু আত্মার কোনই উপকার নাই। পরমেশ্বর অকর্ত্তা এবং অভোক্তা; তোমার যদি তাঁহারই জন্য প্রবৃত্তি, তবে সেরূপ প্রবৃত্তিতে প্রয়োজন নাই; কেন না, তাঁহার তৃপ্তি সর্ব্বদাই আছে। সুতরাং তাঁহার ইচ্ছাও কিছুতেই নাই। কেন নাই? তাহার কারণ এই যে, সেই সর্ব্বব্যাপী চিন্ময় আত্মা একাকীই স্বীয় অকৃত্রিম স্বপ্রকাশতায় এই বিশ্বসংসারকে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। এ পক্ষে আর কোনই কল্পনান্তর নাই। এই নিখিল জগৎ তাঁহাতে আছে এবং তিনিই ইহা কল্পনা করিয়াছেন; সে জন্য তিনিই সর্ব্বাত্মা। যিনি সর্ব্বাত্মা, তাঁহার আবার ইচ্ছা কি আছে? তাঁহার কিসের অভাব রহিয়াছে যে, তিনি তাহা পাইবার জন্য আকাঙ্ক্ষা করিবেন? কিন্তু যাহারা তোমার ন্যায় মূর্খ, তাহাদিগেরই বস্তু দর্শনের পর ক্ষুব্ধতা জন্মিয়া থাকে। এ ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তস্থলে সুন্দরী রাজমহিষী দেখিয়া যুবজনের বৃথা হৃদয়-ক্ষোভের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। অরে মূর্খ! তুমি কি ভাবিতেছ যে, তুমি আত্মার সম্বন্ধ পাইয়া কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়াছ? তোমার এ ভাবনা বৃথা; কেন না, আত্মা তোমার সম্বন্ধযোগ্য নহেন। দেখ, পুষ্পের

সম্বন্ধ পাইয়াই ফল হয়; পরন্তু পুষ্প কখন ফলের সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় না। সম্বন্ধ কথার অর্থ কি? শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, একের সহিত অপরের কোন এক ক্রিয়ার কিম্বা উভয় ক্রিয়ার যে একীভাব বা মিলন, তাহাই সম্বন্ধ নামে নির্দ্দিষ্ট। ঐ সম্বন্ধ পূর্ব্বে দ্বৈত থাকে, পরে একত্ব প্রাপ্ত হয়। যত দিন তাহা অর্থাৎ ভ্রমকল্পিত দ্বৈত ছিল, ততদিন তদনুযায়ী সম্বন্ধও বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এখন আর আত্মার সহিত তোমার তাদৃশ সম্বন্ধ নাই; সুতরাং মিলন হওয়াও অসম্ভব। তুমি একপ্রকার নহ, তোমার কার্য্য-কলাপও একপ্রকার নহে। অপিচ তোমার যে সুখ-দুঃখ-দশা, তাহাও একবিধ নহে। সুখ ও দুঃখের কারণ বলিয়া আত্মা হইতে তুমি একান্তই পৃথক্‌ভাবে রহিয়াছ। সংসারে দেখা গিয়া থাকে, সমানের সহিত সমানের ও অর্দ্ধ সমানের সহিত অর্দ্ধ সমানের পরস্পর মিশ্রণ-রূপ সম্বন্ধ হইয়া থাকে; পরন্তু যাহারা পরস্পর একান্তই বিরুদ্ধধর্ম্মী, তাহাতে মিলন কুত্রাপি দেখা যায় না। তাহাতে এই হয় যে, জল ও অনলের ন্যায় একের নাশ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে; সুতরাং এ কথা নিশ্চয়ই যে, আত্মসম্পর্কে তোমার সত্তা থাকিতে পারে না। রে চিত্ত! বলিতে পার, শব্দ স্পর্শাদি যে সকল বিরুদ্ধ গুণসম্পন্ন সূক্ষ্ম ভূত আছে, তাহাদেরও যখন পঞ্চীকরণ দ্বারা পরস্পর সম্বন্ধ বা সম্মিলন দেখা যায়, তখন আমারই বা আত্ম সহ সম্বন্ধ-সঙ্ঘটনার অসম্ভাবনা হইবে কেন? উত্তরে বলা যায় যে, উহাদের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ভাব কিছুই নাই। কেন নাই, তাহার কারণ এই যে, পঞ্চভূতের পঞ্চীকরণ-প্রক্রিয়াতেও এক ভূতের গুণ ভূতান্তরের আশ্রয় লইয়া থাকে। এ সংসারে সম্বিৎ ও জাড্যের নিত্য বিরোধ বিদ্যমান; তুমি জড়; তাই যদি সম্বিৎ হইতে স্খলিত হও, তবে তোমার জড়াংশও সুসিদ্ধ হইতে পারে না, কেন না, তোমার সত্তা প্রতিপাদন সম্বিৎ হইতেই হয়। সুতরাং সম্বিৎ হইতে তুমি যদি প্রচ্যুত হও, তবে তোমার পক্ষে তাহা আত্মবিনাশক দুঃখ হইয়াই দাঁড়াইবে; অতএব বলি সম্বিৎ হইতে কদাচ প্রচ্যুত হইও না। অন্তর্দৃষ্টি বা সম্বিতের সহায়তায় যদি দুঃখপ্রদ দৃশ্য পদার্থের অভাব বা অপায় হয়, তাহা হইলে দুঃখবিরহিত নিত্য নিরতিশয় আনন্দময় আত্মমাত্রেরই

পরিশেষ হইয়া থাকে। তাই বলি, তুমি যদি এতাবতাও পরিতোষ প্রাপ্ত হও, তবে একান্ত ধ্যানযোগের সহিত নিরবচ্ছিন্ন সমাধিনিষ্ঠ হইয়া আত্মদর্শী হইয়া থাক।

রে চিত্ত! তুমি যদি সঙ্কল্পোন্মুখ হও, তবে তাহাতে তোমার প্রকৃত সুখ কিছুই নাই। যদি সমাধি অবলম্বন কর, তবেই তোমার প্রকৃত সুখ-শান্তি হয়। অতএব জানিয়া রাখ, সঙ্কল্পোন্মুখতাই দুঃখদায়িনী। ফল কথা এই, সঙ্কল্পমাত্রেই সম্বিদের বিচ্যুতি ঘটে, যেমন নির্ঝরবারি বিচ্যুত হইয়া শিলাখণ্ডে পতিত হয়, হইয়া শতধা বিশীর্ণ বা বিকীর্ণ হইয়া যায়, তেমনি সঙ্কল্পের উদ্রেক মাত্রেই সম্বিৎপদার্থের বিচ্যুতি ঘটে এবং ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বহুধা বহু পথে বিভক্ত হইয়া পড়ে। সম্বিদের বিবিধ ভাব হওয়ার নামান্তরই দুঃখ এবং উহার একীভাবের নামই সুখ। রে চিত্ত! আকাশে যেমন পুষ্পের সম্ভাবনা নাই, তেমনি তোমাতেও কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব সম্ভাবনা নাই। তবে কি বলিবে, আত্মার কর্ত্তৃত্ব আছে? তাহাও নাই। আকাশে যেমন মৃত্তিকা স্পর্শ হয় না, তেমনি আত্মাতেও কোনও প্রকার কলনা আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে না। অতএব আকাশের অবয়বের ন্যায় আত্মাতে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব সম্ভাবনা নাই। জলধি যেমন ফেন-বুদ্বুদাদি নানাকারে জলস্ফুরণেই প্রস্ফুরিত হয়, তেমনি আত্মাও তোমারই বিবিধ ব্যবহারে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন; পরন্তু নিজে তিনি কিছুই করেন না। যেমন জলধিগর্ভে উত্তপ্ত অঙ্গার থাকে না, তেমনি আত্মদেব যখন সঙ্কল্প-হীন হন, এবং দেহ ও মনের যখন জড়ত্ব সিদ্ধ হয়, তখন কল্পনাকর্ত্তার অভাব বশতঃ কোন কল্পনাই থাকিতে পারে না। তবে যে ইহা শুভ, ইহা অশুভ, ইহা অপর এবং ইহা অপর নহে, এই প্রকার কল্পনা হয়, ইহা কেবল বিশিষ্ট জ্ঞানবিহীন সম্বিৎ ব্যতীত অপর কিছুই নহে। কাজেই আকাশে যেমন কানন নাই, তেমনি এ সকল অসতী কল্পনাও সম্ভবপর নহে। কেবল মাত্র অসম্বেদ্য সম্বিদই বিস্তার পায়; তাহাই বটে সার, তদ্ব্যতীত অপর কিছুই নয়। এই আমি, এই তিনি, অমুক নাই, অমুক আছে, এ সকল কল্পনা কেবল রূপাদি-বিরহিত সর্ব্বব্যাপী মহান্ আত্মায় আরোপিত মাত্র; পরন্তু সত্যভূত বলিয়া কিছুতেই নির্দ্দেশ করা যায় না। দেখ, আকাশ-

গাত্রে ঋগ্‌বেদের মানসী কল্পনা বৈ সত্যই কি কেহ তাহাতে উহা লিখিয়া রাখিতে সক্ষম হয়?

রে চিত্ত! যে সমস্ত পদ ও অর্থকে বস্তু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়, আত্মা তৎসমুদায়েরই সারভূত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। তিনি নিত্যোদিত ও-সম্বিৎ-স্বভাবেই বিরাজিত। তুমি যদি আপনার নৈর্ম্মল্যগুণে সকল দিক্ দেখিয়া শুনিয়া সেই আত্মাকে সর্ব্বথা অসন্দিগ্ধ ও অপরোক্ষ ভাবে বিদিত হইতে পার, তবেই তোমার সুখ-দুঃখ-লেশ—মরীচিকা, রজ্জুসর্প ও শুক্তিরজতাদি মিথ্যা বস্তুর ন্যায় ক্ষীণ হইয়া যাইবে; কেন না, নিশ্চয়ই সেই প্রাক্তন সুখ-দুঃখ-প্রত্যয় মোহ বা ভ্রান্তি-বিলসিত, বস্তুতঃ উহা অসত্য।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮২ ॥

ত্র্যশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! ধীরচেতা মুনিবর বীতহব্য বিজনে বসিয়া স্বীয় চিত্তকে এইরূপে উপদেশ দিলেন। অনন্তর আপনার বিশুদ্ধ ধারণাবতী বুদ্ধিবলে পুনর্ব্বার নিজ ইন্দ্রিয়বর্গকে সম্যক্ প্রকারে প্রবোধ প্রদান করিতে লাগিলেন। বৎস! তিনি তাঁহার ইন্দ্রিয়বর্গের প্রতি বিজনে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমার নিকট বিশদরূপে বিবৃত করিতেছি; তুমি ইহা শ্রবণ কর—করিয়া তাদৃশ ভাবনায় বিভোর হও—হইয়া দুঃখের প্রান্ত সীমায় উপনীত হইবার যোগ্য হও।

বীতহব্য তদীয় ইন্দ্রিয়গ্রামকে সম্বোধন করিয়া কহিয়াছিলেন,—রে ইন্দ্রিয়গণ! তোমাদের এই স্ব স্ব আত্মসত্তা মাত্র অবিচারদর্শনেই আবির্ভূত হইয়া জীবিত অবস্থায় দুঃখ উৎপাদন করিতেছে এবং অন্তে উহা নরকাদি নানা যাতনার হেতুভূত হইতেছে। এই জন্য বলিতেছি, তোমরা এই অসত্য স্বীয় সত্তাকে পরিহার কর। আমি পূর্ব্বে যে আত্মতত্ত্ব-বিষয়ক উপদেশ দিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই তোমাদের সত্তা ক্ষয় পাইয়া

গিয়াছে। কেন না, অজ্ঞান হইতেই তোমরা আবির্ভূত ; পরন্তু জ্ঞানোদয়ে তোমাদের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। রে চিত্ত! তোমাকেও আবার বলি, যেমন বালকেরা অতি প্রদীপ্ত পাবক মধ্যে ক্রীড়া করিলে, সে ক্রীড়া তাহাদের দেহ-দাহেরই কারণ হইয়া উঠে, তেমনি তোমার যে সত্তা—তাহাও পরিণামে দুঃখভোগেরই হেতুভূত হইয়া পড়ে। আরও ভাবিয়া দেখ, তোমার বিদ্যমানতায় সংসাররূপিণী সরিৎসকল ভ্রমময় জল কল্লোল-মালায় সমাকুল হইয়া অনবরত কালসাগরে প্রবেশ করিতেছে। তদুপরি কোথা হইতে অতর্কিতভাবে বর্ষণধারার ন্যায় অজস্র দুঃখরাশি আসিয়া আপতিত হইতেছে। ঐ সকল দুঃখপ্রবাহ পরস্পর অহমহমিকায় উৎপন্ন এবং পরস্পরের জয়-পরাজয় নিবন্ধন অনন্ত চিন্তাজালে পরিপূর্ণ। অপিচ তুমি আছ, তাই সম্পদ্ ও বিপৎস্বরূপিণী ভীষণ বিসূচিকা আসিয়া হৃদয় উৎপাটন করিবার জন্য আক্রমণ করিয়া থাকে এবং সেই জন্যই এই দেহরূপ জীর্ণ পাদপে জরা-মরণরূপিণী মঞ্জরী উৎপন্ন হয় ও কাস-শ্বাসাদি-রূপ ভ্রমর আসিয়া সেই মঞ্জরীর উপর গুঞ্জন করিয়া থাকে। তখন চিন্তারূপ-চঞ্চল-জাল-রচনা-ব্যগ্র কীট আসিয়া দেহমধ্যস্থ হৃদয়-কোটর অধিকার করে। মনোরথরূপ শত শত হিংস্র জন্তু আসিয়া উপস্থিত হয় এবং ইন্দ্রিয়দ্বার সকল নিবিড় নীহার-জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। তৎকালে কলেবররূপ প্রাচীন মহীরুহে লোভরূপ বিহঙ্গম আসিয়া আশ্রয় লয় এবং স্বীয় সুখদুঃখময় চঞ্চুপুট দ্বারা এই দেহতরুর শমদমাদিরূপ ফলকুসুম-নিচয় খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলে। কাম-কুক্কুট বড় দুর্ব্বৃত্ত ও বড়ই অপবিত্র ; সে আসিয়া এই জীর্ণ দেহ-তরুর হৃদয়দেশ পাদদ্বয় দ্বারা পুনঃপুন বিকিরণ করিতে থাকে। অজ্ঞানরূপ পেচক আসিয়া মোহরূপিণী ভীষণ যামিনী-যোগে ঐ হৃদয়পাদপে সগর্ব্বে ভ্রমণ করিতে থাকে। এইরূপে সেই মোহ-নিশায় রাত্রিচরী পিশাচীর ন্যায় অপর কতশত অশুভশ্রী আসিয়া তৎকালে ঐ জীর্ণ দেহ-পাদপে বিহার করিতে থাকে, তাহার ইয়ত্তা হয় না। রে আমার চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়বর্গ! তোমাদের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে প্রভাতকালীন পদ্মিনীর ন্যায় সমগ্র শুভশ্রী সম্যক্ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। তখন হৃদাকাশ বিমল জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। সমস্ত মোহ-

মিহিকা প্রশান্ত হইয়া যায় এবং অন্তর একান্তই নীরজস্ক হইয়া পড়ে। আকাশ-নিষ্কাশিত সলিলধারার ন্যায় বিক্ষেপহেতু বিকল্পজাল তখন কোনক্রমেই আপতিত হইতে পারে না। তৎকালে কেবল বৃক্ষ হইতে নবোদ্ভিন্ন কোমল মঞ্জরীর ন্যায় হৃদয় হইতে সকল-জনাহ্লাদজননী পরম-শান্তিদায়িনী পরম-পাবনী মৈত্রী অভ্যুদিত হয়। তখন আর কোন চিন্তাই থাকে না; হিমাচ্ছন্ন পদ্মিনীর ন্যায় মূর্খজন-সেবিত চিন্তা হৃদয়-মধ্যে একেবারেই বিশুষ্ক হইয়া যায়। শরৎকালে আকাশে মেঘ থাকে না; সেইজন্য সূর্য্যমণ্ডল যেমন সমধিক প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, তেমনি অজ্ঞান অপসারিত হইয়া যায় বলিয়া তখন অন্তরে নিরন্তর জ্ঞানালোকই বিকাশ পাইতে থাকে। হৃদয় তখন কোনরূপেই ক্ষুব্ধ হয় না, বা কেহই তাহাকে অভিভূত করিতে পারে না; এই জন্য সে সদাই স্থির-ধীর হইয়া অবস্থান করে, হৃদয়ের গাম্ভীর্য্য তখন প্রকটিত হইয়া উঠে, তাহাতে সে বায়ু-বিক্ষোভ-হীন বারিধির ন্যায় সমত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। পুরুষ তখন নিত্যানন্দময় হইয়া উঠেন। তিনি অন্তরে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শীতলভাবে পরিপূর্ণ হইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। সে কালে অজ্ঞান অপক্ষীণ হইয়া যায়। অন্তরে জ্ঞানালোক বিকাশ প্রাপ্ত হয়। সেই জ্ঞানালোকে সচরা-চর সমস্ত সংসার উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। অজ্ঞানের অভাব নিবন্ধন সম্বিৎ তখন পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং এই জগৎ ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় মিথ্যা বলিয়া অনুভূত হইতে থাকে। ইন্দ্রিয়গণের অসংসর্গে দেহ যেমন আনন্দ-মন্থর হয়, আশাপাশ-বিধায়ী ইন্দ্রিয়গণের সংসর্গ বশে তাদৃশ আনন্দ-মন্থর কিছুতেই হয় না। যেমন বনবহ্নি দ্বারা বৃক্ষ-পত্রাদি দগ্ধ হইলেও বর্ষাগমে পুনরায় তাহার অভিনব অঙ্কুরোদ্গম হয়, তেমনি জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সংসারের জরা-জন্মাদি-রূপ মহাপথ ভস্মীভূত হইয়া গেলেও জীবন্মুক্ত মহা পুরুষদিগের কান্তি, পুষ্টি, তুষ্টি ও আরোগ্য প্রভৃতি গুণ-সমবায়ের পুনঃসমাগম ঘটিয়া থাকে। এ সংসারে বারম্বার ভ্রমণ করিতে না হয়, এ জন্য জীবন্মুক্তগণ আনন্দময় পরমাত্মায় চিরদিনের তরে বিশ্রাম লাভ করেন। পূর্ব্বে যে সকল গুণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তৎসমস্ত ব্যতীত অন্যান্য গুণরাশিও তৎকালে প্রকাশ পাইয়া থাকে।

রে চিত্ত! তুমিই নিখিল আশাপাশের নিদান, তাই তোমার যদি অভাব হয়, তাহা হইলেই আশাপাশ সকল ছিন্ন হইয়া যায়। এই জন্য বলি, আত্মস্বরূপে অবস্থান এবং নিজের একান্ত অসত্তা, এই উভয় পক্ষের মধ্যে যাহাতে তোমার নিজের কল্যাণ হইবে বুঝিতে পার, তুমি সত্বর তাহা ধরিয়া লও। হে আমার সম্মানার্হ মন! আমি মনে করি, আত্মভাব অবলম্বন করাই তোমার পক্ষে শ্রেয়; সুতরাং আমার বক্তব্য এই যে, 'আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুই নাই' তুমি অভ্যাসযোগে ইহাই ভাবনা কর। নতুবা এরূপ শ্রেয়স্কর বিষয় পরিত্যাগ করিলে মূঢ়ের কার্য্যই করা হইবে। চিত্ত! তুমি যদি এমন ভাবিয়া থাক যে, চিৎশক্তি আমারই অভ্যন্তরে আছে এবং সেই শক্তিই সত্যস্বরূপ। তোমার এরূপ ভাবনা হইলে কেহই তোমাকে একান্ত অভাবগ্রস্ত হইতে বলে না। ফল কথা, চিরদিন তুমি সেই চিৎশক্তিরূপে জীবিত থাক। কেহই তোমার অত্যন্তাভাব ইচ্ছা করিবে না। কিন্তু হে সুন্দর! আমি সত্যই বলিতেছি, তুমি এখনও আত্মস্বরূপে অবস্থিত হও নাই। তুমি অসৎ, এ কথা আমি আপাতদর্শনে বলিতেছি না, শ্রুতি-শাস্ত্রানুযায়ী জ্ঞানের বলেই বিচার করিয়া বলিতেছি। রে চিত্ত! তুমি স্বাবলম্বনে জীবিত আছ, এইরূপ আশায় মিথ্যা সুখী হইয়া রহিও না। কেন না, তুমি যে অসৎ, ইহাই স্থির-নিশ্চিত। তথাচ ভ্রমবশতঃ তোমার যে অস্তিত্ব বোধ হইতেছিল, অধুনা বিচারসম্পর্কে সেই ভ্রম সম্পূর্ণ নিরস্ত হইয়াছে। হে সাধো! তোমার স্বরূপ সিদ্ধি অবিচারদশাতেই হয়। যদি সম্যক্‌রূপে বিচারালোচনা করা যায়, তাহা হইলে তোমার সন্মাত্র সদ্রূপই অবস্থিত হইয়া থাকে। আলোকের অভাব হইলেই যেমন অন্ধকার প্রকাশ পায়, তেমনি বিচারের অভাব হইলেই তোমার উৎপত্তি হইয়া থাকে। পরন্তু আলোক-সম্পর্কে তমোরাশি যেমন বিদূরিত হইয়া যায়, তেমনি বিচার সহযোগেই তোমার উপশম ঘটিয়া থাকে। ফলে তোমার স্বরূপ ধ্বংস হইয়া যায়; তুমি অসৎ-স্বরূপেই অবস্থান করিতে থাক। বিশদ বিবৃতি এই যে, এখন হইতে তুমি আর আশার প্রলোভনকে সুখ বলিয়া ভাবিও না। পূর্ব্বে তুমি 'আমি আছি' এই প্রকার ভাবনা ভ্রান্তির বশেই করিয়াছ; কিন্তু এখন বিচারে সে ভ্রম

নিরাস হইয়াছে; তাই তোমার প্রকৃত স্বরূপ যে কি, তাহা তুমি এখন বুঝিতে পারিয়াছ। এক্ষণে বিচারালোক বিকাশ পাইয়াছে, তোমার আর অবিচার-অন্ধকার নাই। অধুনা তুমি নিজের স্বরূপ সম্যক্‌রূপেই দেখিতে পাইবে।

হে সখে। এতকাল তুমি ভাল করিয়া বিবেকের পথে পদার্পণ কর নাই; তাই 'আমি' 'আমার'-করিয়া স্ফীত হইতেছিলে এবং বালকের বেতাল-দর্শনবৎ আপন অস্তিত্ব দেখিতেছিলে; ইহাতেই তোমার সুখ-দুঃখ ও মান-অপমানাদি ভোগ হইতেছিল। কিন্তু এখন আর সে অবস্থা নাই। বর্ত্তমানে তোমার কোনই সঙ্কল্প নাই; বিবেকের অনুগ্রহে অবিদ্যার কার্য্য ক্ষয় পাইয়াছে বলিয়া তুমি এখন নিত্য নিরাময় স্বপ্রকাশরূপে প্রতিভাত হইতেছ। অতএব ধন্য বিবেক, বিবেককেই আমি নমস্কার করি। রে চিত্ত! আমি তোমাকে বহুবার বুঝাইয়াছি, শাস্ত্রমর্ম্ম জ্ঞাপন করাইয়াছি; তুমি নিজেও এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছ যে, তুমি যে চিত্ততারূপে অবস্থিত ছিলে, তাহা এক্ষণে মিথ্যাত্বে পর্য্যবসিত হওয়ায় তুমি পূর্ব্বে যে পরমেশ্বর ছিলে, এখন জ্ঞানদশায় সেই পূর্ব্বস্বরূপেই বিলসিত হইতেছ। তোমার সর্ব্ব বাসনা বিগলিত হইয়াছে; সুতরাং তুমি এক্ষণে মহেশ্বর হইয়া অবস্থান করিতেছ। দেখ, আলোকের অভাব যেমন অন্ধকারের সৃষ্টি করে, এবং আলোক যেমন অন্ধকারের বিনাশ করে, তেমনি অবিবেক যাহাকে উৎপাদন করে, বিবেক তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকে। এই নিয়ম আছে বলিয়াই পূর্ব্বে তোমার অবিবেক-বশেই যে চিত্তস্বরূপে অবস্থান ঘটিয়াছিল, তাহা এক্ষণে বিবেকপ্রসঙ্গে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

হে সাধো! তোমার অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিচারের দৃঢ়তা ও স্থির সিদ্ধান্ত তোমারই সুখসিদ্ধির নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকারে তোমার বিনাশ আনয়ন করিয়াছে। অতএব এতদিন পরে নির্ণীত হইল, তুমি নাই, তুমি পৃথক্ বস্তু বা সত্য নহ। হে ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর চিত্ত! তোমার স্বস্তি হউক। তুমি সংসারসাগরের পরপারগামী হও। রে চিত্ত! তুমি পূর্ব্বেও ছিলে না, বর্ত্তমানেও নাই এবং ভবিষ্যতেও তোমার আর সত্তা থাকিবে না। সুতরাং তোমার অনস্তিত্ব হেতু আমি এক্ষণে শান্ত হইয়াছি, নির্ব্বাণ পাইয়াছি,

গতজ্বর হইয়াছি। ভাগ্যগুণে আমি এখন আপনাতেই অবস্থান করিতেছি, আমার তুর্য্য পদ অধিগত হইয়াছে, আমি সেই পদেই রহিয়াছি; অতএব এ সংসারে চিত্তের স্থিতি নাই, চিত্ত কখন নাই; থাকিবার মধ্যে আছেন কেবল আত্মা। আত্মাই আছেন, আর কিছুই নাই। "আমি আত্মাই, আমা ভিন্ন আর কোনও কিছুই নাই। আমিই চিন্ময় বোধ-স্বরূপে সর্ব্বত্র সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছি। আমার নির্ম্মলান্তরে 'এই আত্মা' এরূপ কল্পনাও এখন স্থান পায় না। কেন না, আমাতে 'এই' শব্দের ব্যবচ্ছেদ-কলনা কোথায়? অতএব 'এই আমি' এইরূপ বাক্যোচ্চারণ না করিয়া জলে যেমন তরঙ্গাবস্থান, আমিও তেমনি আত্মাতেই আপনি মৌনী হইয়া অবস্থান করি। যেখানে বাসনার লেশ মাত্র নাই, চিদাভাসের পৃথক্ অবস্থানের অভাবে যাহা চেতনাংশের আশ্রয় নহে, যথায় প্রাণাদির সঞ্চার নাই, পার্থক্য নাই, সুতরাং যাহাকে জড়ভাব আসিয়া স্পর্শ করিতে পারে নাই, আমি সেই সম একরস পূর্ণ চিন্ময় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া সমস্ত মানস চেষ্টা বর্জ্জনপুরঃসর মৌনভাবে বিশ্রান্ত হইয়াছি।

ত্র্যশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৩ ॥

চতুরশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! বীতহব্য মুনি এই প্রকার নির্ণয় করিয়া বাসনারে বিসর্জ্জন দিলেন এবং বিন্ধ্যাচলের গুহাভ্যন্তরে সমাধি অবলম্বনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন সম্বিদের কিছুমাত্র স্পন্দন রহিল না; তিনি কেবল পূর্ণানন্দময় হইয়া মনকে বিদূরিত করত অচঞ্চল অম্ভোনিধির ন্যায় নিস্তব্ধভাবে রহিলেন। যেমন অনলের আশ্রয় কাষ্ঠ-নিচয় দগ্ধ হইয়া গেলে আর তাহার জ্বালামালার পরিস্পন্দ হয় না, তেমনি তাঁহার অন্তর তখন নির্ব্যাপার হওয়ায় ক্রমশঃ তদীয় প্রাণাপানাদি

পবনসমূহও উপশান্ত হইয়া গেল। তাঁহার অর্দ্ধোন্মীলিত নয়ন দুইটীর স্থিরপ্রভা নাসিকার প্রান্ত পর্য্যন্ত অল্পাল্প পরিমাণে উপনীত হইয়াছিল বলিয়া তৎকালে তাহারা ঈষদ্বিকসিত কমলের শোভা ধারণ করিল। বাহিরে বা অভ্যন্তরে তাঁহার ইন্দ্রিয়-ব্যাপার কিছুই ছিল না, তাই তাঁহার অক্ষির পক্ষ্মযুগলও স্থির হইয়াছিল। মহামতি বীতহব্য তখন যে ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন তাহাতে গ্রীবা ও মস্তকাদি নিখিল অবয়বই স্থির ও উন্নতভাবে অবস্থিত ছিল। তিনি প্রস্তরোৎকীর্ণ মূর্ত্তির ন্যায় অথবা চিত্র-লিখিত পুত্তলিকার ন্যায় অবস্থান করিতেছিলেন। বিন্ধ্যাদ্রির গভীর গহ্বরে এই ভাবে অবস্থান করিয়াই তাঁহার সুদীর্ঘ তিনশত বৎসরকাল অর্দ্ধ-মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিপাতিত হইল। এত বড় দীর্ঘকাল অতীত হইয়া গেল, ইহা সেই ব্রহ্মজ্ঞানী মুনি বুঝিতে পারিলেন না। তিনি জীবন্মুক্ত পুরুষ, তাই ধ্যানধারণায় অবস্থানপূর্ব্বক স্বীয় দেহকেও পরিত্যাগ করিলেন না। তৎকালে তাঁহার সমাধির বিঘ্নজনক বহু দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল; কিন্তু তাহাতে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হয় নাই। তিনি যখন ধ্যানমগ্ন ছিলেন, তখন প্রচুর ধারাবর্ষণ সহকারে ভীষণ মেঘ-গর্জ্জন হইতে লাগিল। পর পর বহু নরপতিই বিন্ধ্যারণ্যে আসিয়া মৃগয়া-ব্যাপারে লিপ্ত হইতে লাগিলেন; তাহাতে অনবরত ভীষণ মৃগয়া-কোলাহল হইতে লাগিল। পক্ষী ও মর্কটকুলের বিকট শব্দ সর্ব্বদাই শুনা যাইতে লাগিল। মাতঙ্গকুলের গভীর বৃহংণধ্বনি হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে মৃগরাজের ভীষণ চীৎকার এবং নিরন্তর নির্ঝর-বারি-পাতের বিবিধ শব্দ পরিশ্রুত হইতে লাগিল। এই সকল উপদ্রব সত্ত্বেও আরও কত নূতন নূতন উপদ্রব উপস্থিত হইতে লাগিল। কত বার কত বজ্রপাত হইল। জীব-জন্তুগণের কত কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল। কতবার কত ভূমিকম্প হইয়া গেল। কতবার দাবানল আবির্ভূত হইল। কতবার কত জলপ্লাবন হইয়া গেল। পর্ব্বতের তুঙ্গশৃঙ্গ-ভঙ্গ নিবন্ধন কতবার কত উৎপাত উপস্থিত হইল। কতবার প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিতট ধ্বসিয়া পড়িল। কতবার ভূগর্ভ হইতে কত সজল মৃত্তিকার উৎপতন-রব শ্রুত হইল। কতবার প্রতিকূল জল-প্রবাহের পরস্পর আঘাতধ্বনি উত্থিত হইল এবং কত বার অগ্নির ন্যায়

তীব্র নিদাঘাদি সন্তাপ সমুদ্ভূত হইল। কিন্তু কিছুতেই সেই মহামুনি বীতহব্যের কঠোর সমাধি ভঙ্গ হইল না।

এইরূপে প্রকৃতির নিয়মানুবর্ত্তিতায় কাল সকল অতিক্রান্ত হইতে লাগিল। মুনিবর বীতহব্যের দেহ সেই গিরিকন্দরেই রহিল। ঐ দেহ কিয়ৎকালের মধ্যেই প্রাবৃট-পরিক্ষিপ্ত উপর্য্যুপরি উপচীয়মান পঙ্কজালে আচ্ছন্ন হইয়া গেল; তাহাতে উহা ক্রমশঃ ভূগর্ভ-নিখাতের ন্যায় অলক্ষিত-অবস্থায় রহিল। তৎকালে সেই গিরি-কন্দরবাসী মুনিবর পঙ্কাবৃত কলেবরে যেন একখণ্ড শৈলশিলার ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন। এইরূপে তিনশত বর্ষ অতীত হইবার পর সেই আত্মস্বরূপ বীতহব্য মুনি আপনা হইতেই সমাধি ভঙ্গ করিয়া প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এই দীর্ঘ কাল ধরিয়া লিঙ্গদেহস্থ চিন্ময়ী শক্তিই তদীয় ভূগর্ভস্থ পাঞ্চভৌতিক দেহকে রক্ষা করিয়াছিল। পরন্তু সূক্ষ্মতা বশতঃ প্রাণবৃত্তিরূপ স্পন্দ উদ্রিক্ত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। কেন না, তদীয় প্রাণপবনাদির গতাগতি ক্রিয়ার একেবারেই অভাব ঘটিয়াছিল।

অনন্তর ক্রমশঃ তাঁহার জীবসম্বিৎ প্রারব্ধ শেষ ভোগ করিবার জন্য উন্মেষণক্রমে স্থূলতা প্রাপ্ত এবং তদীয় হৃদয়মধ্যেই মনোরূপিণী হইয়া তাঁহাকে নিম্নোক্ত বিবিধ দশা ভোগ করাইয়াছিল।

মুনিবর জীবন্মুক্ত হইয়া প্রথমতঃ কৈলাসশৈলের কানন-মধ্যস্থ কদম্বতরুর তলদেশে একশত বর্ষ যাপন করেন। অনন্তর একশত বর্ষ নিরুপদ্রবে বিদ্যাধরদেহ ভোগ করেন। অবশেষে পঞ্চ যুগ যাবৎ সুর-চারণগণের অভিবন্দিত ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনে! মুনিবর বীতহব্য প্রবুদ্ধ হইয়া স্বীয় মনোমধ্যে যে আপন মুনিত্বাদি দশা ভোগ করিয়াছিলেন, তাহা সম্ভবপর হইবে কিরূপে? কারণ এই যে, তাঁহার প্রবোধ কাল অতি সামান্য, কিন্তু আপনার কথায় বুঝিলাম,—ঐ সকল অনুভবকাল অতি বহু। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য, কাল-দেশের নিয়ম ও অনিয়ম উভয় কিরূপে ঘটিল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! চিৎশক্তি সর্ব্বস্বরূপিণী; তাই যখন যেখানে যে ভাবে প্রকাশিত হন, তখন তিনি সেইখানে সেই ভাবেই

অনুভূত হইয়া থাকেন। চিৎশক্তি সর্ব্বাত্মিকা বা সর্ব্বব্যাপিনী নহেন, এই প্রকার জ্ঞানের বিদ্যমানতায় সামান্য দেশে সামান্য কালে বিস্তৃত দেশের ও প্রভূত কালের কল্পনা সম্ভবপর হয় না, এ কথা সত্য; কিন্তু যদি তাঁহাকে সর্ব্বময়ীরূপে বিদিত হওয়া যায়, তাহা হইলে তথাবিধ কল্পনা সমুদিত হইবার বাধা কিছুই নাই। দেশ কিম্বা কাল অল্পই হউক বা বহুলই হউক, সকলই ত তাঁহারই স্বরূপ। ফল কথা, দেশ কিম্বা কালাদি এবং সেই সমুদায়ের অল্পত্ব ও বহুত্ব সকলই বুদ্ধির সাহায্যে অনুভবগম্য হয়। বুদ্ধি যন্ময়ী, অনুভবও তন্ময় হইয়া থাকে। এই জন্য বলা যায়, পূর্ব্বোল্লিখিত কল্পনার অসম্ভাবনা নাই। জানিবে—যে নিয়মের অনুবর্ত্তন করিয়া জীবনিবহ শয়ন করিবা মাত্র শত বর্ষব্যাপী রাজত্বের, তদধিক বর্ষব্যাপী অনাহারের এবং ততোধিক বর্ষব্যাপী দুঃখ-কষ্ট-ভোগের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে, বীতহব্য মুনি সেই নিয়মেরই অনুসরণ ক্রমে সমাধি ভঙ্গের পরবর্ত্তী কালে অল্পকাল মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত সেই দীর্ঘকাল-ভোগ্য বিষয় সকল ভোগ করেন, এবং স্বহৃদয়ে জ্ঞানাকাশে বিবিধ জগৎ দর্শন করেন। এ স্থলে তোমায় বলিয়া রাখি, তুমি অবশ্য এমন মনে করিও না যে, ঐ সকল অনুভূত জন্মাদি তাঁহার মুক্তির পরিপন্থী হইয়াছিল; কেন না, যেমন দগ্ধ বীজের স্বীয় শক্তি নষ্ট হইয়া যায়, তেমনি যথার্থ জ্ঞানীদিগের জীবন্মুক্ত অবস্থায় যে যে বাসনার উদ্রেক হয়, জ্ঞানানলে দগ্ধ হওয়ায় সে বাসনা বাসনানামেরই যোগ্য নয়। সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই বলা যায়, বীতহব্য মুনির ইন্দ্রত্বাদি অনুভব তদীয় মোক্ষ-পরিপন্থী কিছুতেই নয়। এইরূপে কেবল ইন্দ্রত্বই যে তাঁহার ভোগের চরম হইয়াছিল, তাহা নহে। তিনি এক কল্পকাল ভগবান্ চন্দ্রশেখরের গণাধিপতি হইয়াছিলেন। ঐ সময় তাঁহার সমস্ত বিদ্যায় নৈপুণ্য হয়। তিনি ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান, এই ত্রৈকালিক অমল দৃষ্টি লাভ করেন। বলা বাহুল্য, যিনি যাহাতে দৃঢ় সংস্কার-সম্পন্ন হন, তিনি তাহাই দর্শন করিয়া থাকেন; এই বিধিবলেই বীতহব্য জীবন্মুক্ত হইয়াও প্রারব্ধ কর্ম্মে উপযুক্ত সংস্কারশালী ছিলেন বলিয়া ঐ সকল অনুভব করিয়াছিলেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! বীতহব্যের যখন এইরূপ

ভোগাদির প্রতিভাস হইয়াছিল, তখন ধরিয়া লওয়া যায়, অন্যান্য জীবন্মুক্ত সাধারণেরও বন্ধন ও মুক্তি উভয়ই ঘটিয়া থাকে।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! জীবন্মুক্তদিগের যখন প্রারব্ধ ভোগ হয়, তখন সেই ভোগদশাতেও এই বিশ্বাকাশ বিমল প্রশান্ত ব্রহ্মরূপেই অবস্থান করে; কাজেই তাঁহাদিগের আর বন্ধন বা মোচন কিছুই থাকিতে পারে না। বিশদার্থ এই যে, যেমন বস্ত্রখণ্ড দগ্ধ হইয়া গেলেও কিয়ৎকাল তাহার বস্ত্রাকারে অনুবৃত্তি এবং লম্বিত সূত্র দগ্ধ হইলেও কিছুকাল তাহা ঝুলিতে থাকে, তেমনি জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের দেহ বা দৈহিক কার্য্যাদি প্রারব্ধ ভোগ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত অনুবৃত্ত হইতে থাকে। এইরূপ দেহ বা কার্য্যানুবর্ত্তনে তাঁহাদিগের জীবন্মুক্তভাবের কোনই ক্ষতি হয় না। ফলে বদ্ধ জীবের জ্ঞানের সহিত তাঁহাদের জ্ঞানের উপমা হইতে পারে না। ইহা বন্ধন, আর উহা মুক্তি, এরূপ ভেদজ্ঞান জীবন্মুক্তগণের নাই। কেন নাই, তাহার কারণ এই যে, তাঁহাদের জ্ঞান একমাত্র ব্রহ্মেই পরিনিষ্ঠিত। তাঁহাদের সম্বিদাকাশ যেখানে যেখানে যে যেরূপেই প্রকাশ পায়, সেই সেইখানেই সেই সেইরূপে তাহা সত্যার্থ হইয়া থাকে। তাই বলিতেছি, হে রঘুনন্দন! জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সর্ব্বস্বরূপ সর্ব্বাত্মা; তাই তিনি ব্রহ্মরূপেই বহু শত জগতের অনুভূতি করিয়াছেন এবং করিতেছেন। ঐ অনুভূত ও অনুভূয়মান জগৎপরম্পরার নিজ নিজ রূপ কিছুই নাই। উহারা নীরূপ এবং প্রতিভাস ক্রমে বিতত ও সংখ্যাতীত। যখন দেখা যায়, চৈতন্য ভিন্ন বস্তুগত্যা আর কিছুই নাই, তখন সেই ভূগর্ভ-নিমগ্ন মহাত্মা বীতহব্যের যে চৈতন্য, সেই চৈতন্যই ঐ অনন্ত জগৎপুঞ্জের স্বরূপ, অর্থাৎ এ কথার বিস্তৃতি তুমি এইরূপই জানিবে যে, বীতহব্যের হৃদয়োপলক্ষিত যে চৈতন্য, অস্মদাদি জীবসমূহেও সেই চৈতন্য, আবার আমাদিগের হৃদয়োপলক্ষিত চৈতন্যই বীতহব্যমুনির হৃদয়োপলক্ষিত সেই চৈতন্য; কিন্তু এই উভয় চৈতন্যের প্রভেদ এই যে, অস্মদাদির বুদ্ধিতে তমোগুণের আবরণ রহিয়াছে, সে জন্য চৈতন্যেরও আবরণ ঘটিয়াছে। পরন্তু বীতহব্যপ্রমুখ জীবন্মুক্তগণের বুদ্ধিতে রজঃ নাই, তমঃ নাই; সুতরাং তাঁহাদের হৃদয়োপলক্ষিত চৈতন্যও নিরাবরণ, সেই জন্যই তাঁহারা সর্ব্বদর্শী সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জীবন্মুক্ত বীতহব্যের

ব্রহ্মরূপেই বহু শত জগতের অনুভূতি। ঐ অসংখ্য জগতে মহাত্মা বীতহব্যের চিদাত্মায় যিনি আত্মবোধবিহীন ইন্দ্রস্বরূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন; তিনি অদ্য দীন জনের নিবাসভূমি দীনদেশে রাজা হইয়াছেন। এক্ষণে তিনি অরণ্য প্রদেশে গিয়া মৃগয়া-কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। ব্রহ্মার পাদ্মকল্পে বীতহব্য গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐ সময় কৈলাস-বনকুঞ্জে তাঁহার যে এক আত্মবোধহীন কেলিহংস ছিল, সে এক্ষণে নিষাদপতি হইয়া অবস্থান করিতেছে। যিনি সৌরাষ্ট্ররাজ্যে অপ্রবুদ্ধ রাজা ছিলেন, সেই তিনিই এক্ষণে অন্ধ্রদিগের প্রচুর পাদপ-পরিশোভিত গ্রামমধ্যে অবস্থান করিতেছেন।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! জানিলাম,—বীতহব্যের ঐ সকল মানসী সৃষ্টি; সুতরাং ভ্রান্তিমাত্র। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ঐ সমস্ত সচেতন ইন্দ্রাদি ও কেলিহংসাদির দেহের সত্তা কিরূপে সম্ভব হইল?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! বহুবার বলা হইয়াছে, এই সকল জগৎই মনঃকল্পিত, সুতরাং ভ্রান্তিমাত্র ব্যতীত আর কিছুই নহে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে এ জগৎ তোমার চক্ষে আবার কিরূপে সচেতন-গণশালী বলিয়া প্রতিভাস প্রাপ্ত হইতেছে? এই জগৎ যদি কেবল দেহ-চৈতন্যরূপে পরিদৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ইহাকে মাত্র মনের ভ্রম বলিয়াই তুলিত করিতে হইবে, অথবা ইহাকে যদি মাত্র মন বলিয়া নির্ণীত করা যায়, কিম্বা ভ্রমমাত্র বলিয়া তুলিত করা হয়, তবে ইহা চিন্মাত্র ব্যোমই বলা যাইবে। বাস্তব পক্ষে বলিতে কি, রাম! এ জগৎ এরূপ নহে এবং এরূপ ভিন্ন অন্যরূপও ইহার নাই। অপিচ জগৎরূপে তোমারও যে সত্তা আছে, তাহা নাই। কেন না, একাদ্বয় ব্রহ্মই আছেন, তিনিই এই জগদাকারে প্রতিভাসিত হইতেছেন। অতএব বুঝিতে হইবে ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান এবং ইহা, উহা বা অন্য কোন বস্তু, ইত্যাদি এই সমস্ত দৃশ্য বিশ্বই কেবল সম্বিন্মাত্রাবশিষ্ট মনোময়ই; তাহা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। কিন্তু যত দিনে না ব্রহ্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাবৎকাল ঐ সকল হৃদয়মধ্যে সুদৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল হইয়া থাকে। পরন্তু যখন বিদিত হওয়া যায়, তখন একমাত্র পরম চিদাকাশ ভিন্ন অন্য সমস্তই ঐন্দ্র-

জালিক দৃশ্যের ন্যায় মিথ্যা বৈ কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। জলধির জল যেমন জলধি হইতে অভিন্ন হইলেও প্রত্যুল্লাস, বিলাস বা বৃদ্ধি প্রভৃতি পরিণামের প্রভাবে নানাকারে প্রকাশিত হয়, তেমনি এই মনই অজ্ঞানের বশে উল্লিখিত প্রকার পরিণামের বশতাপন্ন হইয়া এই জগদাকারে বিলসিত হইতেছে। ফল কথা, অবিকৃত চিদাকাশ স্বস্বরূপস্থিত মায়াশক্তির উদ্রিক্ততায় নিজেকে চেতন বা চেতয়িতা বলিয়া কল্পনা করিয়া চিত্ত আখ্যা প্রাপ্ত হন এবং পরে মননশক্তির উন্মেষণে মন আখ্যায় অভিহিত হইয়া নানাকার বিবিধ বিচিত্র বিশ্ব বিরচণ করিতে থাকেন। এইরূপে এই দৃশ্য বিশ্ব বিতত বা বিস্তৃত হইয়াছে। বাস্তব পক্ষে কিন্তু কিছুই বিতত বা বিস্তারপ্রাপ্ত হয় নাই।

চতুরশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৪ ॥

পঞ্চাশীতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মুনিবর! অতঃপর বীতহব্য মুনি সেই বিন্ধ্যাচলের কন্দরাভ্যন্তরস্থ আত্মদেহের উদ্ধার সাধন কিরূপে করিলেন এবং কি প্রকারেই বা তিনি সেই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! বীতহব্য মুনি সমাধি অবস্থায় আত্মাকে অনন্ত ব্রহ্মরূপে চমৎকারমাত্র বলিয়াই বিদিত হইলেন এবং ধ্যানাবস্থায় তদীয় প্রাক্তন জ্যোতিঃ উন্মেষিত হইয়াছিল বলিয়া একদা তাঁহার ভূতপূর্ব্ব জন্মপরম্পরার দর্শন-ব্যাপারে একান্তই অভিলাষ জন্মিল। অভিলাষ হইবা মাত্র তিনি ভিন্ন ভিন্ন জন্মের যাবতীয় দেহই দর্শন করিলেন। দেখিলেন,—সেই সকল দেহের মধ্যে বহু দেহ নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কতকগুলি তখনও অবিকৃত অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহার তাৎকালিক দেহ গিরিগুহার অভ্যন্তরে মৃত্তিকাচ্ছন্ন ছিল, অবিকৃত বা অনষ্ট দেহ-

সমূহের মধ্যে তখন তিনি তাঁহার সেই বর্ত্তমান দেহও দেখিতে পাই-লেন, তাহা দেখিয়া তাঁহার সেই দেহোদ্ধারার্থ যদৃচ্ছা ক্রমে বাসনার উদ্রেক হইল। বীতহব্য দেখিলেন,—পঙ্ক-মধ্য-স্থিত কীটের ন্যায় তাঁহার সেই বীতহব্যনামক দেহ গিরিগুহার অভ্যন্তরে অবস্থান করিতেছে। অজস্র বর্ষাবারি-পাতে সে দেহ পঙ্কময় ও পীড়িত হইয়াছে। উহা অধোমুখে অবস্থিত; তাই উহার পৃষ্ঠভাগের চর্ম্মোপরি যে সকল পঙ্ক জমাট বাঁধিয়াছে, তাহাতে কাশাদি দীর্ঘ দীর্ঘ তৃণরাজি উৎপন্ন হইয়াছে।

মহাপ্রভাব মহামুনি বীতহব্য তাঁহার দেহের ঐ অবস্থা দেখিয়া পরম বোধময়ী বুদ্ধি যোগে পুনরায় এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমার ঐ নানা যাতনাময় দেহ প্রাণপবন কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। কাজেই এক্ষণে আর উহার সঞ্চরণাদি কোন কার্য্য করিবারই যোগ্যতা নাই। অতএব আমি অধুনা ঐ দেহের উদ্ধার সাধনের উপায় জানিয়া সত্বর বিভাকরের তেজোদেহে প্রবেশ করি; তাহা হইলেই তদীয় পিঙ্গলাখ্য অনুচর আমার ঐ দেহোদ্ধারের চেষ্টা করিবেন অথবা এ দেহ উদ্ধার করিয়াই বা আমার প্রয়োজন কি আছে? আমি অধুনা নিরাপদে পরম-পদে বিশ্রাম লাভ করি, আমি নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হই, স্বীয় পদ অধিগত হইয়া অবস্থান করিতে থাকি। এই দেহলীলায় আমার আবশ্যক কি?

মুনিবর বীতহব্য মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া কিয়ৎকাল মৌনী হইয়া রহিলেন; পরে পুনরায় চিন্তা করিতে লাগিলেন,—আমি যদি এখন দেহ ত্যাগ করি অথবা দেহকে গ্রহণ করি, তাহাতে আমার কি হইবে? ফলে পরিত্যাগ বা পরিগ্রহ এ উভয়ের কোন দিক্ দিয়াই কোন বিশেষত্ব এখন নাই; সুতরাং ঐ উভয়ের কোনটীই আমার উপাদেয় বলিয়া বোধ হইতেছে না। কেন না, দেহের ত্যাগ কিম্বা আশ্রয় উভয়ই আমার নিকট একইরূপ; তত্রাচ যতক্ষণ এই দেহটী রহিয়াছে এবং এখনও যখন ইহা ধূলিসাৎ হইয়া যায় নাই, তখন ইহার আশ্রয় লইয়া কিয়ৎকাল আমি বিহার করিতে থাকি। সূর্য্যানুচর পিঙ্গলের সহায়তায় আমার দেহ উদ্ধার করাইতে হইবে; এই জন্য দর্পণে প্রতিবিম্ব-পাতের ন্যায় অগ্রে আমি আকাশস্থ সৌর তেজোময় দেহ আশ্রয় করি।

বীতহব্য মুনি এই প্রকার চিন্তা করিয়া বায়ুরূপে বিভাকর-দেহে প্রবেশ করিলেন। ভগবান্ ভাস্কর তখন বীতহব্যকে স্বদেহে অনুপ্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তদীয় পূর্ব্বাপর কর্ম্মপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলেন এবং দেখিলেন,—সেই মুনির দেহ বিন্ধ্যগিরির গুহামধ্যে মৃত্তিকাময় হইয়া রহিয়াছে। উহার উপরিভাগে তৃণরাজি জন্মিয়াছে। সম্বিদের অভাবে উহা মৃতপ্রায় হইয়া অবস্থান করিতেছে। গগনমধ্য-বিহারী বিভাকর মুনির অভিপ্রায় অবগত হইয়া ধরাতল হইতে ঐ দেহ উত্তোলন করিবার জন্য আপনার প্রধান অনুচর পিঙ্গলের প্রতি আদেশ করিলেন। এই সময় বীতহব্য মুনির বায়ুময়ী সূক্ষ্ম সম্বিৎ পূজনীয় প্রভাকরকে মনে মনে প্রণিপাত করিল। ভানুদেব হৃদয় মধ্যেই বহু মানপুরঃসর মুনিকে অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তাঁহার অনুজ্ঞাক্রমে মুনিবর বিন্ধ্য-কন্দরে কার্য্য সাধনার্থ প্রস্থানোদ্যত পিঙ্গলের দেহে প্রবিষ্ট হইলেন। পিঙ্গল নভঃপ্রদেশ পরিত্যাগ করিয়া কুঞ্জ-কুঞ্জর-শোভিত বিন্ধ্যবনে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং নিজ নখর দ্বারা ভূতল খনন করিয়া ভূমধ্য হইতে সেই মুনিদেহ উত্তোলন করিলেন। তখন মনে হইল, সারস যেন পঙ্ক হইতে মৃণালকে তুলিয়া লইল। অনন্তর মুনি তখন স্বীয় লিঙ্গদেহে প্রবেশ করিলেন, বোধ হইল বিহঙ্গম যেন গগনভ্রমণে একান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া স্বীয় আবাসে আশ্রয় গ্রহণ করিল। তৎকালে মূর্ত্তিমান্ বীতহব্য এবং সূর্য্যানুচর পিঙ্গল উভয়েই উভয়কে প্রণিপাতপূর্ব্বক স্ব স্ব কার্য্যে তৎপর হইলেন। অনন্তর পিঙ্গল ব্যোমপথে প্রস্থান করিলেন। বীতহব্য এক কুমুদ-কহ্লারশালী প্রফুল্ল পঙ্কজ শোভিত সরোবরে গিয়া প্রবেশ করিলেন। তখন মনে হইল পঙ্কপূর্ণ পল্বল মধ্যে ক্রীড়া করিবার পর করি-শাবক যেন বনপ্রদেশে প্রবিষ্ট হইল। বীতহব্য মুনি সেই সরোবরের বিমল জলে স্নান করিয়া জপ করিলেন এবং জপান্তে দিবাকরকে পূজা করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন। তখন আবার মননাদি-ব্যাপারে তদীয় দেহযষ্টি তেজস্বিনী হইয়া উঠিল।

এইরূপে সেই মুনিবর বীতহব্য বিন্ধ্যাচলের সুবিমল সরোবর তটে একটী দিন মাত্র সমাধি হইতে স্খলিত হইয়া ক্রীড়া করিয়াছিলেন। পরন্তু

মৈত্রী, সমতা, শান্তি, মুদিতা, প্রজ্ঞা, কৃপা ও শ্রী এই সমুদায় তাঁহার সর্ব্বদাই বিরাজিত ছিল। তিনি অন্য বহিঃসঙ্গ হইতে চিত্তকে অপকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৫ ॥

ষড়শীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—র ! দিবাবসানে বীতহব্য মুনি পুনরায় সমাধি সাধনার জন্য একটী পূর্ব্ব-পরিচিত সুবিস্তৃত গুহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই ব্রহ্মজ্ঞ মুনি ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াধিপ মনকে পরিহারপূর্ব্বক অন্তরে আত্মানুসন্ধানে তৎপর হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন,—আমি ত বহু পূর্ব্বেই ইন্দ্রিয়াভিমান পরিত্যাগ করিয়াছি। এখন আর সে চিন্তায় প্রয়োজন কিছুই নাই। অধুনা 'অস্তি' 'নাস্তি' এই দুই কল্পনাকে কোমলা লতার ন্যায় বিসর্জ্জন দিয়া অবশিষ্ট সাক্ষি-চিন্মাত্রকে অবলম্বনপূর্ব্বক বদ্ধ-পদ্মাসনে গিরিশৃঙ্গবৎ নিশ্চলভাবে অবস্থান করি। আমি জীবিত থাকিয়াও অজ্ঞানদর্শনে মৃতপ্রায় এবং মৃতপ্রায় হইয়াও তত্ত্বদৃষ্টিসামর্থ্যে জীবিত রহিয়া সমাধি অবলম্বনপূর্ব্বক নির্ম্মল চিন্ময়ভাবে বিরাজ করি। যোগিগণ যে অবস্থায় প্রবুদ্ধ হইলেও সুষুপ্তস্থ এবং সুষুপ্তস্থ হইলেও প্রবুদ্ধবৎ অবস্থান করেন, আমি তুর্য্যপদ অবলম্বন করিয়া সেই অবস্থায় দেহাভ্যন্তরেই স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিব। স্থাণুর ন্যায় বাহ্য ক্রিয়ায় আমার কোন আসক্তিই রহিবে না, আমি সেই মননাতীত সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ সত্তাময় ব্রহ্মপদে একান্তই আসক্ত হইয়া রহিব।

এইরূপ ভাবিয়া চিন্তিয়া সেই মুনিবর ছয় দিন পর্য্যন্ত ধ্যানাবস্থায় রহিলেন। অনন্তর ক্ষণ-নিদ্রিত পান্থ জনের ন্যায় পুনরায় প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। সেই দিন হইতে ভগবান্ বীতহব্য সিদ্ধ মহাতপা হইলেন এবং চিরকাল জীবন্মুক্তভাবে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি কদাচ কোন প্রিয় বস্তুরই অভিনন্দন করিতেন না এবং কখন কোন অপ্রিয়

বস্তুরও নিন্দা করিতেন না। কোন অনিষ্ট-ঘটনায় তাঁহার উদ্বেগ ছিল না এবং কোন ইষ্ট-সমাগমেও তিনি হৃষ্ট হইতেন না। কি গমন, কি অবস্থান, সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়েই তিনি আপন হৃদয়ে আত্মবিনোদনার্থ নিজ মনের সহিত নিম্নোক্ত রূপে বাক্যালাপ করিতেন। তিনি প্রায়ই বলিতেন—রে আমার ইন্দ্রিয়গণের অধীশ্বর মন! তুই এখন শান্তিপূর্ণ হইয়া কিরূপ সুখী হইয়াছিস্, তাহা এই বার একবার ভাল করিয়া দেখিয়া ল'। হে চঞ্চলচূড়ামণে! তুমি এখন যাহা আছ, উত্তর কালেও এরম্বিধ আসক্তিহীন অবস্থাকেই অবলম্বন করিবে; তাহাতেই তোমার ধৎপরোনাস্তি সুখোদয় হইবে। তাই বলিতেছি, তুমি আর কখন চাপল্যের আশ্রয় লইও না। ওহে ইন্দ্রিয়-চোরগণ! রে রে হতাশাসকল! আমি যাঁহাকে অনুভব করিতেছি, সেই আত্মা তোদের কেহই নহেন এবং আত্মারও তোরা কেহই নহিস্। তোরা অসৎ পক্ষ আশ্রয় করিয়াছিস্, তোদের আশা বিফল হইয়াছে। তোরা নিতান্তই ভঙ্গপ্রবণ; তাই এখন আমাকেও আক্রমণ করিবার যোগ্যতা তোদের নাই। তোদের একটা ধারণা হইয়াছিল যে, আমরাই সকলের আত্মা; কিন্তু জানিবি—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় তোদের সে ধারণা একেবারেই মিথ্যা। তোদের যে অনাত্মস্বরূপে আত্মবোধ হইয়াছিল এবং অবস্তুতে বস্তুজ্ঞান জন্মিয়াছিল, সে কেবল অবিচারবশেই হইয়াছিল; কিন্তু এখন কি হইয়াছে? এখন বিচারবলে সমস্তই ক্ষয় পাইয়াছে। তোরা একপ্রকার করণভূত রহিয়াছিস্, আমরা অন্য মননকর্ত্তা আছি, ব্রহ্ম একাদ্বয় আছেন, কর্ত্তৃত্ব অন্য আছে, ভোক্তা চিদাভাস আছেন এবং গৃহীতা মন আছে, এস্থলে কার্য্যজন্য দোষ কাহার কিরূপে হইবার সম্ভাবনা আছে? দেখা যায়, বনে কাষ্ঠ জন্মিয়াছে, বংশের ত্বকে রজ্জু নির্ম্মিত হইয়াছে, লৌহফলকে কুঠারাদি প্রস্তুত হইয়াছে এবং কাষ্ঠজীবী ব্যক্তি নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত কাষ্ঠ কাটিয়া আনয়ন করিতেছে, এইরূপে নানা প্রয়োজনবশে সুসম্পন্ন ক্রিয়াপরম্পরা দ্বারা কাকতালীয়-ন্যায়ে যেমন এক গৃহ নির্ম্মাণ হয়, তেমনি এই যে সকল ব্যবহারিক কার্য্য দেখা যায়, এতৎসমস্ত কেবল ইন্দ্রিয়াদির দর্শন, শ্রবণ ও বচনাদি ফল-জনক শক্তিসমষ্টির পরস্পার সমন্বয়ক্রমে কাকতালীয়বৎ চঞ্চলভাবেই নির্ব্বাহিত

হইতেছে। ইহাতে কাহার কি ক্ষতি আছে? ফলতঃ ক্ষতি কাহারও নাই। আমি অবিদ্যাকে চিরদিনের জন্য ভুলিয়াছি। আমার আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইয়াছে। যাহা সৎ, তাহা সৎই আছে, আর যাহা অসৎ, তাহা অসৎই রহিয়াছে, যাহা বিনষ্ট, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে, আর যাহা স্থিত, তাহা স্থিরই আছে।

মহাতপা মহামুনি বীতহব্য এই প্রকার বিচারালোচনায় বহু শত বর্ষ যাপন করিলেন। অনন্তর যেখানে চিন্তার চর্চ্চা নাই, এবং যথায় মূঢ়তার প্রসার থাকিতে পারে না, তিনি পুনরাবৃত্তি-নিবৃত্তির জন্য সেই স্বস্বরূপেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অতঃপর যাহা দ্বারা যথাবস্থিত পদার্থপরম্পরায় আপাতদর্শন-জনিত অনর্থ অপসারিত করা যায়, তিনি সেই ধ্যানযোগ অবলম্বনপূর্ব্বক সর্ব্বদা অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তখন হেয় পদার্থে উপেক্ষা বা উপাদেয় পদার্থে সমাদর কিছুই রহিল না; তাই তাঁহার অন্তঃকরণ সর্ব্ববিধ ইচ্ছা ও অনিচ্ছার দূরবর্ত্তী হইয়া রহিল। তিনি সংসার-সঙ্গ পরিত্যাগ করিলেন—করিয়া ব্রহ্মামৃত-রস-পানের বাসনায় জন্ম-কর্ম্ম-বহির্ভূত জীবন্মুক্তভাবে অবস্থান করিলেন এবং অন্তরে সেই বাসনা পোষণ করিয়াই সহ্যাদ্রির স্বুবর্ণ-মণ্ডিত কোন এক গুহামধ্যে আশ্রয় লইলেন, তথায় থাকিয়া জাগতিক ভাব পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক পুনরাবৃত্তি নিবৃত্তি-বাসনায় বদ্ধ-পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইয়া আপনাপনি বলিতে লাগিলেন,—

ওহে রাগ! তুমি নীরাগ হও। দ্বেষ! তুমি আমার সহজ শত্রু-দিগের একজন; তোমায় অনুরোধ করি, তুমি দ্বেষ বিসর্জ্জন কর। আমি আমার এ দেহে অনেক দিন ধরিয়া তোমাদের সহিত ক্রীড়া করিলাম; এখন তোমরা প্রস্থান কর। হে ভোগসকল! শত শত কোটি জন্ম যাবৎ তোমাদিগকে আমার নমস্কার। লালনকর্ত্তা শিশুকে যেমন লালন করে, তেমনি তোমরাই এই লোকদিগকে লালন করিতেছ। আর বারবার নমস্কার আমার সেই সংসারসুখে;—যে সুখ এতদিন ধরিয়া আমাকে এই পরম পুণ্য নির্ব্বাণ-পথ ভুলাইয়া রাখিয়াছিল। ওরে দুঃখ! ধন্য তুমি; তুমি আমার সন্তাপ জন্মাইতেছিলে বলিয়াই আমি বহু যত্নে

বহু চেষ্টায় আত্মার সন্ধান লইয়াছি। কাজেই আমি একরূপ নিসঃন্দেহে বলিতে পারি, আমার অবলম্বিত এই বিবেকপথের তুমিই বটে গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা। সুতরাং তোমাকেই আমি বারম্বার নমস্কার করি। দুঃখ! সত্যই বটে, তোমারই অনুগ্রহে আমি এই শান্ত শীতল পথে উপনীত হইয়াছি; সুতরাং তুমি দুঃখ-আখ্যাধারী হইলেও কর্ত্তব্যে তুমি সুখপ্রদ বলিয়া তোমাকেই আমার বহুবার নমস্কার। ওহে দেহ! ওহে সংসারের অসার পদার্থ! তোমার সহিত আমার পরম মিত্রতা ছিল; তোমার কল্যাণ হউক, অধুনা আমি স্বস্থানে প্রস্থান করিতেছি। দেখ, তোমার সহিত আমার বিয়োগ-ঘটনা অনাদি ও অনিয়ত কাল হইতেই চিরসিদ্ধ। প্রাণীদিগের স্বার্থ-ব্যাপারের ইহাই বটে বিষম রীতি। ফলে পুরুষেরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য একান্ত মিত্র-স্বজনদিগকেও পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। ওহে মিত্র কলেবর! এইরূপে আমি শত শত জন্ম ধরিয়াই জন্মিয়া-জন্মিয়া তোমা হইতে বিযুক্ত হইতেছি। সুতরাং তুমি চিরবান্ধব হইলেও তোমাকে এখন আমার ত্যাগ করিতে হইল। দেখ, এই ত্যাগ-ব্যাপারে আমার কোনই অপরাধ নাই; কেন না, তুমি নিজের ধ্বংস-নিমিত্তই আমার উপকার করিয়াছ। আত্মবিজ্ঞান অধিগত হইয়া তোমার নিজের নাশের তুমি নিজেই হেতু হইয়াছ; আত্মজ্ঞান-বশে আত্মাতেই আত্মক্ষতি আনয়ন করিয়াছ। তাই বলি, অন্য কেহই তোমাকে ধ্বংস করে নাই; তুমি নিজেই নিজের ধ্বংসাশ্রয় হইয়াছ। মাতঃ তৃষ্ণে! আমি দীন সন্তান প্রশান্তভাব অবলম্বন করিলে তুমি একাকিনী শুষ্ক বা শীর্ণ হইয়া যাইবে বলিয়া দুঃখ করিও না। আমি এক্ষণে সত্য সত্যই চলিলাম। হে ভগবন্ কাম! তোমাকে ত্যাগ করিব বলিয়া বিবেক-বৈরাগ্যাদির উপাসনায় আমার যে সকল অপরাধ জন্মিয়াছে, তুমি তৎসমস্ত ক্ষমা কর। আমি একান্ত উপশম প্রাপ্ত হইতে চলিয়াছি; আমার মঙ্গল বিধান কর। হে মাতঃ তৃষ্ণে! অদ্য আমাদের উভয়ের বিচ্ছেদ নিত্য কালের নিমিত্ত হউক। আর এই বিচ্ছেদ-ব্যাপারে আমার কোনই দোষ নাই; তুমি যোগের দোষেই বিযুক্ত হইতেছ। কেন না, যোগই বিয়োগান্ত, ইহাই সংসারে চিরসিদ্ধ। অতএব এই আমার শেষ প্রণাম গ্রহণ কর। হে পুণ্যদেব!

তোমাকেও আমার নমস্কার। কেন না, তুমিই পূর্ব্বে আমাকে নরক হইতে উদ্ধার করিয়া এই স্বর্গ-পথে প্রেরণ করিয়াছ। হে পাপ-পাদপ! তুমি কুকার্য্যরূপ ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন হইয়াছ; নরক নিচয় তোমার স্কন্ধ-স্থানীয় এবং সমস্ত নারকীয় যাতনাই তোমার পুষ্প-ভার; তোমাকেও আমার নমস্কার। যাহার সহিত মিলিত হইয়া বহুতর প্রাকৃত যোনির আশ্রয়ে কত শত সংসারভাব এতকাল আমি ভোগ করিয়াছি, অদ্য হইতে সেই মোহ আমার অন্তর্হিত হইল; আমি তাহাকে নমস্কার করি। যিনি শব্দায়মান বেণুরব-চ্ছলে আমার সহিত মধুরালাপ করিয়াছেন, পাদপের পত্রপুঞ্জ যাঁহার বসনের ন্যায় বিভাত হইতেছে এবং যিনি আমার সমাধি-সময়ের সহচরী ছিলেন, আমি সেই গুহারূপিণী তপস্বিনীকে প্রণাম করি। হে গুহে! আমি সংসারপথে পর্য্যটন করিয়া খিন্ন হইয়াছিলাম; তখন তুমিই আমায় আশ্বাস দিয়াছিলে এবং স্নেহশীলা সহচরীর ন্যায় আমার সমুদায় লোভ-লালসা হরণ করিয়াছিলে, আর আমিও নানা সঙ্কটে ক্ষুব্ধ ও সমাধি-ভঙ্গ-ভয়ে ভীত হইয়া সকল শোকে জলাঞ্জলি দিবার জন্য একমাত্র তোমাকেই পরম সখীস্থানে আশ্রয় করিয়া ছিলাম। আর ওহে আমার বার্দ্ধক্যের একান্ত সুহৃৎ দণ্ডকাষ্ঠ! সর্পাদি ভয়ে, বিষম প্রদেশে, গর্ত্তে, কিম্বা কুঞ্জে, সর্ব্বত্রই তুমি আমায় হস্তাবলম্বন দিয়াছিলে; সুতরাং তুমিও আমার নমস্য। হে দেহ! দেহভাগ সকল তোমাকেই নিবেদন করিয়া দিতেছি। এই যে অস্থিপঞ্জর ও এই যে রক্তাক্ত নাড়ীনিচয়, এই সকলই তোমার নিজস্ব; তুমি এই সমুদায় গ্রহণ করিয়াই এক্ষণে প্রস্থান কর। ওহে দেহ! তোমার মল-দৌর্গন্ধ ও স্বেদাদি অপনয়নের নিমিত্ত যে জলাবগাহন-রূপ স্নানাদি নিত্যক্রিয়া সকল নির্ব্বাহ করিয়াছি, আমি এক্ষণে সেই সমুদায় শুচিত্ব-সম্পাদক উপায়সমূহকেও নমস্কার করি। আমার পান ও ভোজনাদি ব্যবহারসমূহকেও আমি নমস্কার করিতেছি। শয়ন, আসন, অভ্যঞ্জন ও অলঙ্করণাদি সংসার-ভাবদিগকেও আমার নমস্কার। হে প্রাণগণ! তোমরা আমার পূর্ব্বতন সহজ সুহৃদ্; অদ্য তোমাদিগকে আমি ক্রমশঃ উৎখাত করিলাম। তোমাদের মঙ্গল হউক; আমি অদ্য প্রস্থান করিলাম। দেখ, তোমাদের সহিত আমি বহুদিন বহু বিচিত্র

যোনিতে উপগত হইয়া গিরিসমূহের কুঞ্জে কুঞ্জে বিশ্রাম করিয়াছি, লোক হইতে লোকান্তরে ভ্রমণ করিয়া-করিয়া শ্রান্ত হইয়াছি, সিদ্ধ ক্ষেত্রসমূহের অভ্যন্তরে কতবার কত ক্রীড়া করিয়াছি, পর্ব্বতে পর্ব্বতে বাস করিয়াছি, কত কাল কত কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছি এবং কতবার বিবিধ পথে বহু দিন ধরিয়া ভ্রমণ করিয়াছি। বলিতে কি, এই জগদভ্যন্তরে এমন কিছুই নাই,—যাহা তোমাদের সহিত করি নাই, যথায় আমি যাই নাই, যাহা আমি হরণ করি নাই, যাহা দেই নাই, বা যাহা অবলম্বন করি নাই। হে প্রিয় বয়স্যগণ! তোমরা স্ব স্ব দিকে প্রস্থান কর। বয়স্যগণ! আমি এক্ষণে চলিলাম। তোমাদিগকে ছাড়িয়া গেলাম বলিয়া আমার জন্য তোমাদের দুঃখিত হইবার কোনই কারণ নাই। ভাবিয়া দেখ, এই সংসার-পদবীতে দৃশ্যবস্তু মাত্রেরই যেমন অন্তে ক্ষয় নিশ্চয় এবং উন্নত মাত্রেরই যেমন অবনতি হয়, তেমনি সংযোগ মাত্রই বিয়োগান্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে এই আমার চাক্ষুষ আলোক আদিত্যমণ্ডলে প্রবিষ্ট হউক! এই ঘ্রাণেন্দ্রিয় নিখিল সুগন্ধ-দুর্গন্ধ-বিষয়ের গ্রাহক; ইহার শক্তি অধুনা বনপুষ্প-সমূহে প্রয়াণ করুক। অদ্য প্রাণপবনও বাহ্যিক স্পন্দন পবনে মিলিত হউক। শব্দ-শ্রবণের শক্তি এক্ষণে আকাশবিবরে বিলীন হইয়া যাউক। রসনার রসশক্তি ইন্দুমণ্ডলে প্রয়াণ করুক। আমি মন্দন ক্ষোভহীন মহাব্ধির ন্যায়, দিবাকরহীন দিবসের ন্যায়, শারদীয় মেঘের ন্যায় ও প্রলয়কালীন বিশ্বের ন্যায় বিরাজিত হইয়া ঐকান্তিক মানসী শান্তি লাভ করি,—করিয়া প্রণবের দীর্ঘোচ্চারণে স্নেহ-বিরহিত প্রদীপের ন্যায় ও দগ্ধেন্ধন বহ্নির ন্যায় আপনিই আপনাতে শান্ত হইয়া যাই। এইরূপে আমার সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যাইবে। আমি সমস্ত দৃশ্যদশার অতীত পথে অবস্থান করিতে পারিব এবং প্রণবের দীর্ঘোচ্চারণের পরিসমাপ্তি হইলেই মদীয় বুদ্ধি ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হইয়াই বিলীন হইয়া যাইবে। আমি মোহমল-বিরহিত হইয়া অবস্থান করিব।

ষড়শীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৬ ॥

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সেই যোগিশ্রেষ্ঠ বীতহব্য তখন নিম্নোক্ত-রূপে ধীরে ধীরে দীর্ঘ প্রণব উচ্চারণ করিয়া ষষ্ঠ ও সপ্তম ভূমিকায় আরোহণ-পূর্ব্বক মনোবৃত্তির উপশম হইবার সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইলেন। তিনি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ 'অ' 'উ' 'ম' ইত্যাকার মাত্রা ও স্থূল সূক্ষ্মাদি ভেদে ওঙ্কার উচ্চারণপুরঃসর স্বকল্পনা-কল্পিত ত্রিভুবনসম্বন্ধীয় স্থূল সূক্ষ্ম প্রভৃতি ভাগনিচয় পরিহার করিয়া ওঙ্কার উচ্চারণের কাল পর্য্যন্ত চিন্তামণিবৎ আত্মাতেই চিন্ময় হইয়া রহিলেন। অর্থাৎ শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, ব্রহ্ম-ধ্যানের প্রধান অবলম্বন,—'ওম্'। উহার অঁ, উ, প্রভৃতি চারি মাত্রা বা বিভাগের মধ্যে প্রথম বিভাগের স্থূল প্রপঞ্চ, দ্বিতীয় বিভাগের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ, তৃতীয় বিভাগের মূল কারণ এবং চতুর্থ বিভাগের লক্ষ্য তুরীয় বা স্থূল-সূক্ষ্ম কারণাতীত ব্রহ্ম। ভূত, ভাবী, বর্ত্তমান, এই কালত্রয়ও ত্রিকাল-কল্পনার অতীত ব্রহ্ম এবং বিরাট হিরণ্যগর্ভ ঈশ্বর ও উল্লিখিত তিনের অতীত ব্রহ্মও পূর্ব্বোক্ত বিভাগচতুষ্টয়ের লক্ষ্যীভূত। এই তুরীয় ব্রহ্ম যে প্রকারে এই বিশ্ব সৃষ্টিনিয়মে অনুভূত হন, সেই প্রকার বা ক্রমের নামই অধ্যারোপ। এই অধ্যারোপ ক্রমের বিপরীত ক্রমই অপবাদ। যোগী বীতহব্য প্রথমে ওঙ্কার উচ্চারণ করিতে করিতে অধ্যারোপ-ক্রম সন্দর্শন-পূর্ব্বক অপবাদ ক্রমানুসারে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক স্থূল সূক্ষ্ম-কারণ-প্রপঞ্চ ত্রৈলোক্যভাগ বিলয় করিয়া লইলেন। ওঙ্কারধ্বনি শেষ হইতে হইতেই ত্রৈলোক্যভাগ বিলীন হওয়ায় তাঁহার স্বস্বরূপ ভাগ প্রকটিত হইল। তখন তিনি ওঙ্কার উচ্চারণের শেষাবধি পরিপূর্ণ-মণ্ডল সুধাংশুর ন্যায়, বিশ্রান্ত মন্দরাচলের ন্যায়, কুম্ভকার-গৃহস্থিত ভ্রমনিবৃত্ত চক্রের ন্যায়, নির্ম্মল নিশ্চল নীরনিধির ন্যায়, অথবা চন্দ্র নাই—সূর্য্য নাই—এই অবস্থায় যাহা হইতে আলোক ও অন্ধকার উভয়ই চলিয়া গিয়াছে, এবং যাহাতে ধূম-ধূলি বা মেঘাদি কিছুরই সম্ভব নাই, তথাবিধ শারদীয় অনন্ত অমল আকাশের ন্যায় হইয়া রহিলেন। অনিল যেমন গন্ধ মোচন করে, তেমনি সেই

বীতহব্য মুনি ওঙ্কার উচ্চারণের শেষ প্রতিধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই ইন্দ্রিয়-তন্মাত্রকে পরিত্যাগ করিলেন।

অনন্তর সেই প্রাজ্ঞ মুনিবর চিদাকাশে ভাসমান তমঃস্বরূপ ও প্রতিভা-সম্পন্ন তেজঃস্বরূপ, এই উভয়কেই নিমেষার্দ্ধকাল বিচার করিয়া কোপ-লেশ সহ পরিত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার নিকট না আলোক, না অন্ধকার, কিছুই রহিল না। তদবস্থায় তিনি তাঁহার তৃণ-তুচ্ছ স্ফুরণশীল মনকে অর্দ্ধ নিমেষ মধ্যে উচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। শিশু যেমন নিজের কোন-বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে না জন্মিতেই তাহা তখন ভুলিয়া যায়, তেমনি তিনি নির্ব্বাত দীপবৎ স্ফুটপ্রকাশতাকে অবলম্বন করিয়াও প্রকাশ-সম-কালেই তাহা পরিত্যাগ করিলেন। পবন যেমন নিমেষ মধ্যে নিজ স্পন্দ-শক্তি পরিহার করে, তিনিও তেমনি নিমেষার্দ্ধেরও অর্দ্ধাংশকাল মধ্যেই পূর্ব্বোল্লিখিত কল্পনাকেও বিসর্জ্জন দিলেন। এইরূপ পরিবর্ত্তনকেই যোগিজন চিত্তের চেত্যদশা পরিহার ও অবিদ্যার উচ্ছেদ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। যাহা সত্তামাত্র-স্বরূপ ও প্রসুপ্ত সংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট, তাদৃশ সাক্ষিমাত্র পদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি তখন পর্ব্বতবৎ অচল ও অটল হইয়া রহিলেন। অনন্তর বীতহব্য তথাবিধ সৌষুপ্ত পদে কিছুকাল অধিরূঢ় হইয়া পরক্ষণেই তুরীয় পদে প্রবেশ করিলেন। তখন তাঁহাতে না আনন্দ, না নিরানন্দ, কিছুই রহিল না; কাজেই তিনি সৎ ও অসৎস্বরূপী হইয়া বিরাজিত হইলেন। তিনি তখন প্রকাশবৎ কিঞ্চিৎস্বরূপ হইলেও তিমির-বৎ কিছুই রহিলেন না। তাঁহার তৎকালের সেই অবলম্বিত পদ বিষয়ানন্দ-বর্জ্জিত হইলেও স্বরূপান্তর্গত আনন্দময়, পদার্থান্তরের সত্তা বা অসত্তাহীন স্বসত্তামাত্রের স্ফুরণ, চেত্যাভাবে অচিন্ময়, স্বতই চিৎ বলিয়া চিন্ময়, বাক্যের অগোচর এবং তন্ন তন্ন রূপে শ্রুতিবাক্যে নির্দ্দিষ্ট। যাহা সুগম, সুবিশাল, ও সর্ব্বভাবের অন্তর্গত হইয়াও সর্ব্বভাবহীন, বীতহব্য তথাবিধ পরম পূত-পদেরই অন্তর্ভূত হইয়া রহিলেন। বলিতে কি, শূন্যবাদীরা যাঁহাকে শূন্য আখ্যা প্রদান করেন, ব্রহ্মবাদীরা যাঁহাকে ব্রহ্ম নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন, বিজ্ঞান-বাদীরা যাঁহাকে বিজ্ঞানস্বরূপ বিমল পদ বলিয়া কীর্ত্তন করেন, সাংখ্যদর্শনের মতে যিনি পুরুষ নামে নিরূপিত হন, যোগিগণ

যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, শৈবগণ যাঁহাকে শিব বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, কালবাদীরা যাঁহাকে কাল আখ্যা প্রদান করেন, আত্মজ্ঞানী-দিগের নিকট যিনি আত্মা নামে পরিচিত হন এবং মাধ্যমিকদিগের মতে যিনি চিদচিতের মধ্যম শূন্যমাত্র তত্ত্ব বলিয়া প্রথিত হইয়া থাকেন; বীতহব্য মুনি তৎকালে তৎস্বরূপই প্রাপ্ত হইলেন। যাহা নিতান্ত নিষ্ক্রিয়ভাবে নিখিল তেজের উপর দেদীপ্যমান, সেই স্বানুভব-মাত্র-সিদ্ধ সৎস্বরূপেই তাঁহার অবস্থান হইল। যাহা সর্ব্ব শাস্ত্রের শেষ সিদ্ধান্ত, যাহা জীবের হৃদয়-গুহাগত আত্মা, যাহাকে সর্ব্বময় ও সর্ব্বব্যাপী বলিয়া নির্ণীত করা হয়, সেই বীতহব্য মুনি তখন তাহাই হইয়া রহিলেন। যাহা এক অথচ অনেক, যাহা সাঞ্জন, অথচ নিরঞ্জন বা অন্ধকারময় হইয়াও প্রকাশমান এবং যাহা সর্ব্ব বস্তুর অতীত হইয়াও সর্ব্বস্বরূপে বিরাজমান, সেই মুনিবর তখন তৎ-স্বরূপেই অবস্থিত হইলেন।

রামচন্দ্র! সেই বীতহব্য মুনি উল্লিখিতভাবে মুক্তদর্শনে আকাশ অপেক্ষাও নির্ম্মল হইয়া অজ, অজর, এক ও অনেক, পূর্ণ ও অপূর্ণ তুরীয় পদে তদভিন্নভাবে রহিলেন। কিন্তু বদ্ধদৃষ্টিতে তিনি ক্ষণমধ্যেই ঈশ্বর হইয়া স্বকার্য্য-ভেদে অনেক ও সকল হইয়া অবস্থান করিলেন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৭ ॥

অষ্টাশীতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনন্দন! বীতহব্য মুনির মন উল্লিখিতরূপে ঐকান্তিক নাশ প্রাপ্ত হইবার পর তিনি সংসারের সীমান্তে উপনীত হইলেন এবং দুঃখজলধির পর-পারে উপস্থিত হইয়া শান্তি আশ্রয় করিলেন। জলবিম্ব যেমন জলেই মিশিয়া যায়, তেমনি সেই মুনিশ্রেষ্ঠ শান্তি-লাভান্তে পরমা নির্ব্বৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বপদে মিলিত হইলেন। তখন তাঁহার দেহ নিষ্পন্দভাবে অবস্থানপূর্ব্বক নিতান্ত মালিন্য প্রাপ্ত হইল। হেমন্তকালে

পদ্মের মধ্যদেশ নীরস হইয়া যায় বলিয়া সে যেমন শুষ্কভাব ধারণ করে এবং স্বীয়-আবাস পাদপের অবস্থান্তর ঘটিলে পক্ষী যেমন নিজ কুলায় পরিত্যাগ করিয়া যায়, তেমনি সেই মুনিবর বীতহব্যেরও প্রাণগণ তখন দেহ-পাদপের মধ্যগত হৃদয়রূপ নিজাবাস পরিহার করিল এবং প্রাণাদি ষোড়শ কলাময় ভূতবৃন্দ ভূতপরম্পরাতেই মিশিয়া গেল। তখন রহিল কি? পিতামাতার শুক্র-শোণিত-সম্ভূত মাংসাস্থিময় স্থূল দেহমাত্রই তত্রত্য ভূতলে পড়িয়া রহিল। মুনিবর উপশম প্রাপ্ত হইলে তদীয় লিঙ্গরূপিণী চিৎশক্তি স্বীয় প্রতিবিম্ব স্বরূপ চিদর্ণবে প্রবেশ করিল এবং মাংসশোণিতাদি দেহধাতুগুলি একে একে স্ব স্ব উপাদান ধাতুসমূহে মিলিয়া গেল।

হে রাঘব! এই আমি তোমার নিকট বীতহব্যের উপশম প্রকার বর্ণন করিলাম, ইহা বহু বিচারালোচনার পর স্থিরীকৃত হইয়াছে। তুমি বিচার করিয়া এ কথার রহস্য হৃদয়ঙ্গম কর। বৎস! এবম্বিধ বিচারসিদ্ধ সুচারু বুদ্ধিবলে তত্ত্ব-দর্শনে নিরত হও,—হইয়া যাহা সারাৎসার, তাহারই আশ্রয় লও এবং সতত উত্থানশীল হইয়া থাক। হে রাম! তোমার নিকট আমি অদ্য যে সকল কথা বলিলাম, বলিতেছি এবং পরেও বলিব, তৎসমস্ত আমি ত্রিকালদর্শী ও চিরজীবী হইয়া বিশেষরূপে বিচার করিয়াছি এবং নিজেও প্রত্যক্ষতঃ উপলব্ধি করিয়াছি। হে প্রশান্তমতে! তোমায় বলি, তুমিও অধুনা এবম্বিধ অসার দৃষ্টির আশ্রয় লইয়া জ্ঞান প্রাপ্ত হও। জানিও,—জ্ঞানোদয় হইলেই মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, জ্ঞানের সাহায্যেই দুঃখ নাশ ঘটিয়া থাকে, জ্ঞানের বিকাশেই অজ্ঞান অপগত হয় এবং জ্ঞানের প্রভাবেই পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়। জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু হইতেই সিদ্ধি লাভ হয় না। বীতহব্য মুনি জ্ঞানাস্ত্র দ্বারাই নিখিল বাসনাজাল ছেদন করিয়া চিত্তরূপ অদ্রিকেও অশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন। বলিতে পার, বীতহব্য জগদতীত, অথচ কিরূপে তিনি জগদন্তর্গত সূর্য্যানুচর পিঙ্গলের সহায়তায় স্বদেহের উদ্ধার সাধন করেন? এ কথার উত্তরে বক্তব্য এই যে, বীতহব্য মুনির সম্বিৎ তদীয় হৃদয়মধ্যে স্বপ্নানুভূতির ন্যায় এই দৃশ্য বিশ্বকে সঙ্কল্প-জগৎ বলিয়াই অনুভব করেন। এই দৃশ্য বিস্তারে বাস্তব বোধ তাঁহার হয় নাই।

রামচন্দ্র! বীতহব্য মুনি বিবেকী হইয়া অবিদ্যা-জনিত সকল মল হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার ইন্দ্রিয়-বিকার ও প্রিয়-সঙ্গাদি দোষ বিদূরিত হইয়াছিল। তিনি রাগাদি নিখিল দোষ বিনাশ করিয়া পরম বস্তু সম্যক্ সম্পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন। বারম্বার শ্রবণ-মননাদির অনু-শীলনে স্বীয় হৃদয়মধ্যেই অনুভূত স্বস্বরূপ অমল অনন্ত মোক্ষপদ তাঁহার অধিগত হইয়াছিল।

অষ্টাশীতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৮ ॥

ঊননবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! পূর্ব্বোক্ত বীতহব্য মুনির ন্যায় তুমিও আত্মলাভ করিয়া বিদিতবেদ্য ও সতত রাগ, দ্বেষ, ভয় ও উদ্বেগ-বিরহিত হইয়া অবস্থান কর। বীতহব্য মুনি শোক-মোহাদির হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর সুখে যাপন করিয়াছিলেন, তোমায় বলি, তুমিও তাঁহারই ন্যায় শোক-নির্ম্মুক্ত হইয়া কালাতিপাত কর।

হে রাজন্! বীতহব্যের ন্যায় পূর্ব্বে আরও কত প্রজ্ঞাশালী মুনি বিদিতবেদ্য হইয়া স্ব স্ব আবাসেই বাস করিয়াছিলেন। ঐরূপ তুমিও পরমার্থজ্ঞ হইয়া স্বরাজ্য মধ্যেই সুখে বাস করিতে থাক। হে মহাভুজ! আত্মা সর্ব্বগ বটেন; কিন্তু সুখে কিম্বা দুঃখে তিনি কদাচ আকৃষ্ট নহেন। সুতরাং কেন বৃথা তুমি শোক করিতেছ? এ ভূতলে বিদিতাত্মা বহু জ্ঞানী ব্যক্তি বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু বলিতে কি, তোমারই ন্যায় কেহই কখন সুখের বশবর্ত্তী হন নাই। তুমি স্বস্থ হও, উদার হও, সম হও, সুখী হও। তুমিই সর্ব্বগ এবং তুমিই আত্মা। তোমার কখন পুনরুৎপত্তি নাই। মৃগেন্দ্র যেমন ময়ূরের বশ হয় না, তেমনি ভবাদৃশ জীবন্মুক্তগণ কদাচ হর্ষ বা অমর্ষের বশীভূত হন না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! ভবদীয় বাক্য প্রসঙ্গেই আমার এক্ষণে এক সংশয় উপস্থিত হইতেছে। শরৎকাল যেমন মেঘাপনয়ন করে, আপনি তেমনি আমার এ সংশয় নিরাস করুন। হে আত্মজ্ঞবর! আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের গগন-গমনাদি অসাধারণ শক্তি সকল দেখা যায় না কেন? আপনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুনায়ক! আকাশ-গমনাদি যে সকল অলৌকিক সিদ্ধি আছে, তৎসমুদায় পদার্থ-পরম্পরার স্বাভাবিক শক্তি বলিয়া প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হইয়াছে। রাম! যে কিছু বিচিত্র ক্রিয়া-কলাপ দেখা যায়, বা অনুভব-গম্য হয়, তৎসমস্ত বস্তুরই স্বভাব; কাজেই আত্মদর্শী মহাত্মাগণের ঐ সকল ব্যাপার অভিপ্রেত নহে। ফল কথা, গগন-গমনাদি ক্রিয়া সকল বিশেষ বিশেষ বস্তু ও বিশেষ বিশেষ যোনিজ দেহেরই স্বভাব। বুঝিয়া দেখ, মশকাদি দেহ আপন স্বাভাবিক ধর্ম্মেই গগন-গমনাদি করিয়া থাকে। মানবাদি দেহ স্বীয় স্বভাব প্রযুক্তই গগন-গমনাদি ব্যাপারে অশক্ত। তবে যে মানবদেহেরও গগন-গমনাদি ব্যাপার প্রত্যক্ষ হয়, তাহা কেবল মণি, মন্ত্র, ওষধি বা যোগাভ্যাসাদি বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াকৌশলেরই শক্তি। উহাকে আত্মার শক্তি বলা যায় না। কেন না, যে ব্যক্তি আত্ম-তত্ত্ব অবগত নহে এবং মুক্তিমার্গেও উপনীত হয় নাই; তথাবিধ অজ্ঞ লোকও দ্রব্য, কর্ম্ম, মন্ত্র, ক্রিয়া বা কাল-শক্তির আবেশে অনায়াসে গগন-গমনাদি বিচিত্র ব্যাপার অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হইয়া থাকে। পরন্তু আত্মজ্ঞ ব্যক্তি এই গগন-গমনাদি ব্যাপার অতি তুচ্ছ বলিয়া মনে করেন; তাই তাঁহার এ সকল, ইচ্ছার বিষয়ীভূত নহে। কেন না, তিনি আত্মার স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, আত্মাকে লাভ করিয়াছেন, এবং আত্মাতেই আত্মতৃপ্ত হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। অবিদ্যা জন্য তুচ্ছ ফলের প্রয়াস তাঁহার নাই। যে কিছু জগদ্ভাব আছে, সকলই অবিদ্যার বিকার বৈ আর কিছুই নহে। সুতরাং যিনি অবিদ্যাকে বিসর্জ্জিয়া মুক্তভাবে অবস্থান করিতেছেন, তিনি আর কেন তাহাতে বিজড়িত হইবেন? যাহারা যোগাভ্যাস করিতে গিয়া অবিদ্যাকেই সুখের কারণ জ্ঞানে বরিয়া লয়, তাহারাই অবিদ্যাময় হইয়া পড়ে। কিন্তু যাঁহারা আত্মজ্ঞ পুরুষ, তাঁহারা সেরূপ নহেন। তাঁহারা

অবিদ্যার সাধনা করেন না ; অবিদ্যাকে তাঁহারা দূরেই পরিহার করিয়া থাকেন। আত্মজ্ঞ হউন বা অনাত্মজ্ঞ হউন, কাল, দ্রব্য ও কর্ম্ম প্রভৃতির ক্রম-বিজ্ঞানে যিনিই সম্যক্ চেষ্টা করেন, তাঁহারই গগন-গমনাদি ব্যাপার সুসিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞানী মানুষ, তাঁহার কোনই বাসনা থাকে না ; সুতরাং তিনি সর্ব্বাতীত ও আত্মাতেই পরিতৃপ্ত থাকেন। সেই জন্য আত্মবান্ জন কোন কিছুই করেন না বা কোন বিষয়ে চেষ্টা করেন না। তাঁহার গগন-গমনে কোন প্রয়োজন নাই, কোনরূপ সিদ্ধি লাভেও তাঁহার আবশ্যক নাই। এইরূপ কি ভোগে, কি প্রভাবে, কি সম্মানে, কি অহঙ্কারে, কি আশায়, কি মরণে, কি জীবনে, কোন কিছুতেই তাঁহার প্রয়োজন নাই। তিনি নিত্যতৃপ্ত, সদা সন্তুষ্ট এবং সদা প্রশান্ত। তাঁহার বিষয়ানুরাগ নাই, কোন বাসনা নাই ; তিনি আকাশবৎ সতত নির্ম্মলাকার। তাঁহার অন্তর তত্ত্ব-জ্ঞানে পরিপূর্ণ। তিনি সর্ব্বদাই আত্মাতে অবস্থিত। অতর্কিতভাবে উপগত সুখ কিম্বা দুঃখ কোন কিছুতেই তাঁহার আসক্তি নাই। তিনি কি জীবনে, কি মরণে, উভয়ত্রেই নিত্য-তৃপ্ত। সাগর যেমন প্রতিকূল বা অনুকূল এই দ্বিবিধ নদীযোগেই পরিপূর্ণ হয়, তেমনি সেই আত্মজ্ঞানী জন ক্রমাগত অনুকূল বা প্রতিকূল এই দুই প্রকার ভোগ্য পদার্থেই সমানভাবে অবস্থান করেন। এই অবস্থায় তিনি কেবল আত্মারই অর্চ্চনা করিতে থাকেন। কোন দ্রব্যেই তাঁহার প্রয়োজন নাই এবং কোন কিছুতেই তাঁহার প্রয়োজনা-ভাবও নাই। কোন প্রয়োজনাভিসন্ধি লইয়া তিনি সর্ব্বভূত মধ্যে অবস্থানও করেন না। যাহার আত্মজ্ঞানের লেশমাত্র নাই, সে—যে যে সিদ্ধি বাঞ্ছা করে, সিদ্ধিসাধক দ্রব্যসমূহের সহায়তায় তাহার সেই সেই সিদ্ধিই ক্রমশঃ সাধিত হইয়া থাকে। মণি, মন্ত্র ও ওষধি প্রভৃতির প্রভাবে গগন-গমনাদি অলৌকিক ব্যাপার সকল নিষ্পন্ন হইতে পারে ; এইরূপ নিয়ম শাস্ত্র-সঙ্গত। এই শাস্ত্রীয় নিয়ম ব্যত্যয় করিবার ক্ষমতা মহাদেবাদি প্রভুদিগেরও নাই। দেবতারা গগন-পথে গমন করেন, কি আরও কত কি অলৌকিক কাণ্ড করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের এইরূপ সিদ্ধি, স্বতঃসিদ্ধ বস্তুস্বভাব বলিয়াই বিখ্যাত। সুতরাং বলা যায়, চন্দ্র যেমন শৈত্য পরিহার করে না, তেমনি ঐ সিদ্ধি কখনই নিয়ম উল্লঙ্ঘন করে না। কেহ সর্ব্বজ্ঞ হউন, বা বহুজ্ঞই

হউন কিম্বা সাক্ষাৎ নারায়ণ, বা হরই হউন, নিয়তি অন্যথা করিবার শক্তি কাহারও নাই।

রামচন্দ্র! এই গগন-গমনাদি বিচিত্র ব্যাপার সকল দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া বা মন্ত্র প্রয়োগেরই স্বাভাবিক শক্তি। এতদ্ব্যতীত ইহাদিগকে আর কিছুই বলা যায় না। যেমন বিষের শক্তি—বিনাশ করে, মধুর শক্তি—মাদকতা জন্মায়, এবং মাক্ষিক মধু বা মদনফল স্বাদিত হইয়া বমন করাইয়া থাকে, তেমনি দ্রব্য, কাল ও ক্রিয়াক্রম সকল যুক্তিপূর্ব্বক যোজিত হইয়া স্বভাবতই সিদ্ধিসমূহ সাধিত করিয়া থাকে। হে রাঘব! যিনি অবিদ্যাকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, দ্রব্য, কাল ও ক্রিয়াক্রম প্রভৃতি অবিদ্যার বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার অজ্ঞান বাধিত হইয়াছে, তথাবিধ আত্মজ্ঞানী জনের এই সকল ব্যাপারে কর্তৃত্ব বা অকর্ত্তৃত্ব কিছুই নাই। দ্রব্য বল, ক্রিয়া বল, দেশ-কাল বা যুক্তির কথাই বল, তত্ত্বজ্ঞদিগের পরমাত্ম-পদ প্রাপ্তির পক্ষে ঐ সকলে কোনই উপকার দর্শে না। কেন না, অতত্ত্বজ্ঞদিগের মধ্যে যাহার কোন একটা বিষয়ের ইচ্ছা থাকে, সে অধিকাংশ স্থলেই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে; কিন্তু যিনি আত্মজ্ঞ,—সুতরাং সর্ব্বথা পরিপূর্ণ, তাঁহার কখন কোন ইচ্ছার উদ্রেক হওয়া অসম্ভব। কারণ এই যে, যখন সমস্ত ইচ্ছার উপশম হইয়া যায়, তখন আত্মলাভোদয় হয়। জ্ঞানোদয়ে আত্মলাভ ঘটিলে তখন আর তাহার বিরুদ্ধ ইচ্ছার উদ্রেক কিছুতেই হইতে পারে না। তবে এ কথাও ধ্রুব যে, নিরিচ্ছ হইলেও সেই জ্ঞানী জনের যদি কোন বিষয়ে কৌতুকক্রমে ইচ্ছা জন্মে, তবে অজ্ঞ জনের ন্যায় তিনি তাহা যথাকালেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মুনিবর বীতহব্য বাহ্য সিদ্ধি-লাভ-লালসায় কোনই চেষ্টা করেন নাই, তিনি কেবল জ্ঞানপ্রাপ্তির আশায় যে-রূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং সে জন্য বনমধ্যে তাঁহার যেরূপ উদ্যোগ আয়োজন হইয়াছিল, সে সকল বিষয় পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে কাল, ক্রিয়া, দ্রব্য ও যুক্তির স্বভাবসিদ্ধ সিদ্ধিনিচয়ই স্বাভাবিক ক্রমানুসারে জীবের ইচ্ছাতেই সুসম্পন্ন হইয়া থাকে।

রামচন্দ্র! জানিয়া রাখ, যাঁহার যেরূপ সিদ্ধিফল অধিগত হইয়াছে, তিনি স্বীয় প্রযত্নরূপ পাদপ হইতেই সে ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা

শুদ্ধাত্মা হইয়াছেন, সর্ব্বাভীষ্ট পরম প্রেমাস্পদ আত্মসুখ যাঁহাদের অধিগত হইয়াছে, সেই সকল ব্রহ্মজ্ঞানী নিত্য-তৃপ্ত মহাত্মাদিগের পক্ষে সিদ্ধিসমূহ কোনই উপকারে আইসে না।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমার আরও একটা সংশয় এই যে, বীতহব্য মুনির সেই পরিত্যক্ত দেহ হিংস্র জন্তুগণ ভক্ষণ করে নাই কেন? এবং কেনই বা তাহা ভূগর্ভে থাকিয়াও ক্লিন্ন বা বিশীর্ণ হইল না? অপিচ বীতহব্য যখন ভূগর্ভে প্রবেশ করেন, তখনই বা কেন তাঁহার বিদেহ-মুক্তি ঘটিল না? হে প্রভো! আপনি এই প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর প্রদান করিয়া আমায় অনুগৃহীত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! অজ্ঞ সম্বিদই 'দেহই আমি' এই প্রকার বাসনায় মালিন্য প্রাপ্ত হয়, এবং তাদৃশ দেহই ছেদ-ভেদাদি বিবিধ অবস্থায় উপনীত হইয়া থাকে, অপিচ তদনুস্যূত সম্বিৎও সেই দেহের ছেদ ভেদাদি নিবন্ধন সুখ দুঃখ দশা ভোগ করিয়া থাকে। পরন্তু ঐ যে বীতহব্য মুনির দেহের কথা কহিলে, উহাতে বাসনার লেশ মাত্র ছিল না; সুতরাং উহা শুদ্ধ সম্বিন্ময়ই ছিল। কাজেই এ কথা নিশ্চিতই যে, ঐ দেহের ছেদনাদি কার্য্যে কেহই সক্ষম নহে। হে মহাভুজ! যোগী জন যে কোন্ যুক্তিবলে শত শত বর্ষেও দেহের ছেদ-ভেদাদি ভ্রমপরম্পরায় অভিভূত হন না, তাহা তোমায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। চিত্ত যে যে কালে যে যে পদার্থে পতিত হয়, তত্তৎকালে সেই সেই পদার্থে থাকিয়া সত্বরই তন্ময় হইয়া তখনই তাহার সমান হইয়া যায়। ইহার যে সকল প্রত্যক্ষ উদাহরণ আছে, তন্মধ্যে শত্রু-দর্শন বা মিত্র-দর্শনের কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ করা যাইতে পারে। দেখ, যে যাহার প্রতি দ্বেষ করে, সে তাহার শত্রু হইয়া থাকে। একজন অপর জনের প্রতি দ্বেষ করিলে সেই অপর ব্যক্তিই তৎপ্রতি বিদ্বিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, কোন এক কারণে একের হৃদয়ে অন্যের প্রতি বিদ্বেষ জন্মিলে, সেও তাহার বিদ্বেষী হইয়া উঠে। কেন না, তাহার হৃদয়নিহিত বিদ্বেষবশে প্রতিবিম্বক্রমে সে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া থাকে। এইরূপ মিত্র-সন্দর্শনেও মিত্রের হৃদয় সৌহার্দ্দরসে গলিয়া যায়। বলা বাহুল্য, এখানেও মিত্রের হৃদয়নিহিত প্রীতি-সৌহৃদ্য

প্রভৃতি প্রতিবিম্ব ক্রমেই মিত্রদর্শীর চিত্তকে প্রীতি ও সৌহার্দ্দময় করিয়া তুলে। শত্রুতা বা মিত্রতা-উৎপত্তির এইরূপই নিয়ম। ইহা প্রত্যেক জীবেরই স্ব স্ব অনুভব-গম্য। পক্ষান্তরে দেখা যায়, একজন যদি শত্রুতা বা মিত্রতাবিহীন হয়, তবে অপর কেহও তাহার শত্রু বা মিত্র হয় না। রাগ-দ্বেষ-রহিতের প্রতি রাগ-দ্বেষ-রাহিত্যের দৃষ্টান্ত,—পথিক, পর্ব্বত ও বৃক্ষাদি। ইহাদিগের রাগ, দ্বেষ কাহারও প্রতি থাকে না, কাজেই মনও ইহাদের প্রতি রাগ-দ্বেষ-বিহীন হয়, ইহাও সকলের প্রত্যক্ষীভূত সত্য। আবার সুস্বাদ, মিষ্ট, কটু বা বিরস প্রভৃতি দ্রব্যে যে অনুরক্তি বা বিরক্তি জন্মে, তাহাও সেই সেই দ্রব্যের গুণ-দোষ চিত্তে প্রতি-ফলিত হয় বলিয়াই হইয়া থাকে। ইহাও নিজের অনুভূত বিষয় বটে। এখন বুঝিয়া দেখ, বীতহব্যের দেহ ব্যাঘ্রাদির কবলে পতিত হয় নাই কেন? বীতহব্য যোগিজনের প্রধান; যোগীর দেহে রাগ-দ্বেষাদি প্রতিষ্ঠা কখন হয় না। রাগ-দ্বেষাদি বৈষম্য-বিহীন সম্বিদ্ সদাই তাঁহার দেহে স্ফুরিত হইতে থাকে; এই জন্য ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুদিগের মন যোগীর দেহে পড়িবা মাত্র তৎক্ষণাৎ প্রতিবিম্বক্রমে রাগ-দ্বেষাদি-বৈষম্য-বিহীন হইয়া পড়ে। চিত্ত সমতা প্রাপ্ত হওয়ায় সে তখন হিংসাদি বৃত্তি ভুলিয়া যায়। পথের পার্শ্বে বন-লতাদি কত বস্তু থাকে, পথিক ভ্রমণকালে সে সমুদায়ের প্রতি যেমন হিংসা বুদ্ধি না রাখিয়া আপনার গন্তব্য স্থানে চলিয়া যায়, তেমনি হিংস্র জন্তুগণ যোগীর প্রতি হিংসা বুদ্ধি পোষণ করে না, তাহারা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিয়া থাকে। তাহাদের হিংস্রভাব যোগীকে ছাড়িয়া অন্যত্র প্রকটিত হয়। এই জন্যই মৃগ, ব্যাঘ্র, সিংহ, কীট কিম্বা কোন সরীসৃপ বীতহব্য মুনির সেই ভূতলগত দেহ ভক্ষণ করে নাই। সম্বিৎ সর্ব্বত্রই বিদ্যমান আছে। কাষ্ঠ বল, লোষ্ট্র বল, পাষাণ বল, কোথায় সম্বিৎ নাই? সর্ব্বত্রেই বাক্শক্তিহীন বালকের ন্যায় তাহার অব্যক্তভাবে বিদ্যমানতা রহিয়াছে। যাহাদের চিত্তৈকাগ্র্য নাই, তাহারাই উহার ব্যক্ততা বা কার্য্য-কারিতা প্রতিবিম্বজলের ন্যায় ভূত, মন, বুদ্ধি, বাসনা, কর্ম্ম ও অবিদ্যায় কেবল প্লবমানবৎ তরল ও পরিচ্ছিন্নাকারে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাকে। হে রাঘব! বীতহব্যের পুর্য্যষ্টক বা লিঙ্গাত্মা তত্ত্বজ্ঞান বা সমাধিযোগে

বৈষম্য-বর্জ্জিত বা নির্ব্বিকার ব্রহ্মভাবে পর্য্যবসিত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার দেহও নির্ব্বিকার ব্রহ্মসম্বিদে পর্য্যবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এই জন্যই তাহা ক্লিন্ন হইতে পারে নাই। রামচন্দ্র! বীতহব্যের দেহ ক্লিন্ন না হইবার পক্ষে আরও একটী যুক্তি আছে, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বিনাশের মুখ্য কারণ স্পন্দন বা বিকারক্রিয়া; তাহার উৎপত্তিস্থান চিত্ত। লোকব্যবহারে চিত্ত ও বায়ু হইতেই স্পন্দ উৎপন্ন হয়। প্রাণ ও প্রাণের প্রস্পন্দ বা বায়বীয় গতিবিশেষ ঐ চিত্তের অবান্তর কার্য্য। প্রস্পন্দ হইতেই হ্রাস বৃদ্ধি ঘটিয়া থাকে। পরন্তু ঐ প্রস্পন্দ যখন প্রশান্ত হইয়া যায়, তখন কাজে কাজেই ঐ প্রাণসকলও পাষাণতুল্য হইয়া পড়ে। তাহারা দেহে দৃঢ়ীভূত হইয়া যায়; এই জন্যও সেই বীতহব্যের দেহ ধারণা-বলেই নষ্ট হইতে পারে নাই। বাহ্য হস্ত-পদাদি এবং আভ্যন্তরিক প্রাণাদি, ইহাদের সহিত যাহার চিত্তজ বা বাতজ স্পন্দ বর্ত্তমান নাই, বৃদ্ধি কিম্বা উপক্ষয় তাহার থাকে না; সে সকল তাহার দূরে চলিয়া যায়। হে তত্ত্বজ্ঞ! বাস্তবিকই বাহ্য ও আভ্যন্তর স্পন্দ প্রশান্ত হইয়া গেলে ত্বগাদি দেহধাতু সকল সমভাবেই থাকে, কদাচ তাহারা প্রণষ্ট হয় না; অপিচ চিত্ত ও বাত-জাত দেহস্পন্দের উপশমে স্তম্ভিতাত্মক হইয়া সে, সকল শৈলবৎ স্থৈর্য্যসম্পন্ন হইয়া উঠে। এ ভুবনমণ্ডলে এরূপও দৃষ্ট হয় যে, স্পন্দপ্রশমনহেতু দৃঢ় স্থিতি সুসিদ্ধ হয়—অচঞ্চল কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় শবদেহও স্পন্দহীন হইয়া থাকে। অতএব এই যুক্তিসামর্থ্যে ভাবিয়া দেখ, মেঘে জল থাকে, সে জল যেমন মেঘকে ক্লিন্ন করিতে পারে না, এবং মৃত্তিকাগর্ভে প্রস্তর থাকে, সে প্রস্তরকে যেমন পচাইয়া মৃত্তিকা তাহার আত্মভাব সম্পন্ন করিয়া লইতে পারে না, যোগীদিগেরও দেহ সকল সহস্র সহস্র বর্ষ পর্য্যন্ত এ জগতে থাকিলেও কিছুতেই ক্লিন্ন বা ভিন্ন হয় না। এখন শ্রবণ কর, সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ বীতহব্য মুনি স্বীয় দেহ পরিত্যাগপূর্ব্বক কেনই বা না তখন শান্তি লাভ করিলেন? অর্থাৎ তৎকালেই তিনি বিদেহমুক্ত হইলেন না কেন? জানিও,—এ জগতে যাঁহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক সকল বন্ধন ছেদন করিয়াছেন, রাগ দ্বেষ প্রভৃতি বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং সম্যক্ প্রকারে জ্ঞেয় বস্তু বিদিত হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বথা অপরাধীন;

দেহ ত্যাগ-ব্যাপারেও তাঁহাদের পূর্ণ স্বাধীনতা বিরাজমান। কোনও রূপ দৈব, প্রাক্তন বা ঐহিক কর্ম্ম অথবা কোন প্রকার বাসনা তাঁহাদের প্রারব্ধ শেষ ভোগ করিবার নিমিত্ত সমুদ্যত চিত্তকে কোনওরূপে আয়ত্ত করিতে পারে না। হে তত্ত্বজ্ঞ! এই জন্য তত্ত্বজ্ঞদিগের মন কাকতালীয় ন্যায়ে বা যদৃচ্ছাক্রমে যখনই জীবন বা মরণ যাহাই ভাবনা করুক, সেই ভাবনাই তখন তাহার অবিলম্বে সুসিদ্ধ হয়। অতএব বীতহব্য মুনির সম্বিদ্ যে পর্য্যন্ত প্রবুদ্ধ হইয়া জীবনধারণ স্থির করিয়াছিলেন, সেই পর্য্যন্তই তিনি জীবিত ছিলেন। অনন্তর যখন তাঁহার প্রতিভা দেহ-ত্যাগ করিবার জন্য কাকতালীয়বৎ সমুদিত হইয়াছিল, তখনই তাঁহার বিদেহমুক্ততা-প্রাপ্তি ঘটিল।

বৎস! মন বাসনাজাল পরিহারপূর্ব্বক পাশমুক্ত-ভাবে বিশুদ্ধ আত্মরূপে প্রকাশিত হইয়া যখন যাহাই প্রার্থনা করে, তখনই তাহা সুসিদ্ধ হইয়া থাকে ; কেন না, যিনি মহেশ্বর, তাঁহাতে সকল শক্তিই বিরাজমান।

উননবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৮৯ ॥

নবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আত্মবিচার করিতে করিতে বীতহব্য মুনির চিত্ত যখন অস্তগত প্রায় হইয়া আইসে, তখনই তাঁহার মৈত্রী করুণা প্রভৃতি গুণনিচয় আবির্ভূত হয়।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ভগবন্! আত্মবিচার করিতে করিতে সেই বীতহব্য মুনির চিত্তস্বরূপ অন্তর্হিত হইবার পর তাঁহার মৈত্রী প্রভৃতি গুণরাশি প্রকাশ পাইয়াছিল, এ আপনার কিরূপ কথা হইল? কিরূপে এ কথার সামঞ্জস্য হইবে? কেন না, চিত্ত যদি ব্রহ্মেতে বিলয় প্রাপ্তই হইয়া আসিল, তবে মৈত্রী প্রভৃতি গুণগ্রাম কাহার থাকিবে এবং কিরূপেই বা কোথায় তাহারা প্রকাশ পাইবে! হে বক্তৃবর! এ রহস্য আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! সরূপ ও অরূপ ভেদে চিত্তনাশ দুই প্রকার; তন্মধ্যে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের চিত্তনাশ সরূপ আর বিদেহ-মুক্ত বা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তির চিত্তনাশ অরূপ অর্থাৎ যেমন স্ফটিকময় ভিত্তি-ভূমিতে নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া পুরুষান্তর বলিয়া ভ্রম উৎপন্ন হয়, তেমনি চিত্ত-প্রতিফলিত স্বাত্ম-প্রতিবিম্বে যে স্বাত্ম-ভ্রম, সেই ভ্রম ও সেই প্রতি-বিম্বের সহিত যে চিত্তনাশ, তাহাই অরূপ; আর চিত্ত আছে অথচ তাহাতে স্বাত্মভ্রম নাই, এরূপ হইলে সেই স্বাত্মভ্রমের বিনাশ—সরূপ চিত্তনাশ নামেই নিরূপিত। এই দেহে চিত্তের সত্তাই যত কিছু দুঃখের কারণ আর চিত্তের বিলয়ই যত কিছু সুখের উৎপাদক। অতএব প্রকৃত সুখৈষী ব্যক্তি চিত্ত-সত্তার ক্ষয় সাধন করিয়া চিত্তনাশকেই সাদরে গ্রহণ করিয়া লইবেন। যে মন তামস বাসনায় পরিগত, তাহা জন্মাদি ও দুঃখ ভোগের কারণ। দেহে-ন্দ্রিয়াদির অনাদি অনন্ত ধর্ম্মে যাহার মমতা বা আমার বলিয়া অভিমান আছে, সেই চিত্তই দুঃখভারগ্রস্ত এবং তাহাকেই লোকে জীব-আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকে। মন যত দিন থাকিবে, ততদিন দুঃখ নাশের কোনই সম্ভাবনা নাই। যদি কখন মন অস্তগত হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে সংসারও অস্তমিত হইয়া যায়। এই অজ্ঞ জীবেই মন বাসনা-প্ররোহে দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত; সুতরাং জানিবে,—এই বিদ্যমান অবিচল মনই দুঃখ-বৃক্ষের প্রথমাঙ্কুর।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে প্রভো! কাহার মন নষ্ট হয়? কিরূপে নষ্ট হইয়া থাকে এবং ঐ নাশ কীদৃশ এবং নাশের সত্তাই বা কি প্রকার? এই সকল কথা আমাকে বুঝাইয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রঘুকুলনায়ক! চিত্তের সত্তা আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি। হে প্রশ্নজ্ঞপ্রবীণ! অধুনা উহার নাশের কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যেমন নিশ্বাস-সমীর শৈলেন্দ্রকে পরিকম্পিত করিতে পারে না, তেমনি যে ধীর জনকে সুখ-দুঃখ-দশা সমস্বরূপ পূর্ণানন্দৈক-রস স্বাত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে চালিত করিতে সক্ষম হয় না, তাঁহার মনকেই মৃত বলিয়া অবধারণ করিবে। 'এই আমি রহিয়াছি, এই আমি নাই' এই প্রকার চিন্তা যে সাধু-পুরুষকে অভিভূত করিতে পারে নাই, জানিবে,—তাঁহারই মন নষ্ট

হইয়াছে। আপৎ, কার্পণ্য, উৎসাহ, মত্ততা, মূঢ়তা, কিম্বা মহোৎসব, এই সকল যাঁহার বৈরূপ্য আনয়ন করিতে পারে না, জানিবে,—তাঁহারই মন নষ্ট হইয়াছে। হে সাধো! ইহাই মনোনাশ; কেন না, মনোনাশ হইলে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। এই চিত্ত-নাশ-দশা জীবন্মুক্ত ব্যক্তিরই বিদ্যমান।

হে অনঘ! মূঢ়তাকেই মনস্তা বা মনোভাব বলিয়া বিদিত হইবে। যখন উহা নাশ পাইয়া যাইবে, দেখিবে—তখনই চিত্তনাশ-নামক সত্তা সম্যক্ সমুদিত হইবে। মূঢ়তার বিনাশ-ঘটনায় যে সত্তা সমুদ্রিক্ত হয়, অর্থাৎ বিশুদ্ধ সৎস্বভাব প্রকটিত হইয়া উঠে, কেহ কেহ সেই শুদ্ধ সৎস্বভাব-কেও চিত্তনাশ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন; সুতরাং জীবন্মুক্তের চিত্ত মৈত্রী প্রভৃতি গুণগ্রামে পরিপূর্ণ হইয়া কেবল ব্রহ্মবাসনায় নিরত হয় এবং সে পুনরুৎপত্তি-বর্জ্জিত হইয়া বিরাজ করে। যাহাতে পুনরুৎপত্তি ঘটিবার নহে, ঈদৃশ ব্রহ্মবাসনায় পরিব্যাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত ব্যক্তির মন সত্ত্ব-সংজ্ঞায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত যখন সমাধি হইতে উত্থিত হন, সে সময়েও তাঁহাদের মনে দ্বেষাদির অভিমান স্থান পায় না। কাজেই ঐ অবস্থায় তাঁহাদের চিত্ত থাকিলেও না থাকারই মধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। জীবন্মুক্তের মন ব্রহ্মেই সমাসক্ত রহে; প্রপঞ্চ বিষয়ে তাঁহাদের মনঃপ্রসক্তি নাই। এই জন্য তাঁহাদের মন দেহাদি-পরিছিন্ন পদার্থপরম্পরাকে স্পর্শ করে না; সুতরাং চন্দ্রমণ্ডলে যেমন প্রভার প্রকাশ বিদ্যমান, তেমনি জীব-মুক্ত ব্যক্তিবর্গের চিত্তনাশে তাঁহারা মৈত্রী-করুণা-মুদিতা প্রভৃতি গুণগ্রামে বিভূষিত হইয়া সর্ব্বথা বিরাজমান। সন্তোষ-শৈত্যের আলয় সত্ত্ব-সংজ্ঞক জীবন্মুক্ত মনের নাশ হইলে বসন্তকালীন মঞ্জরীপুঞ্জের ন্যায় সমস্ত গুণসম্পত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে। এতক্ষণে এই সরূপ মনোনাশ বিবৃত হইল। এক্ষণে অরূপ মনোনাশের বিষয় বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমরা বিদেহমুক্তিকেই অরূপ মনোনাশ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকি। উহা নিষ্কলাত্মক; বিদেহমুক্ত-পদ পরম পবিত্র ও নিতান্ত নির্ম্মল। তাহাতে সমস্ত সদ্‌গুণাধার সত্ত্বাখ্য প্রাতিভাসিক মন বিলয় প্রাপ্ত হয়। এই বিদেহ-মুক্ত-বিষয় সত্ত্বক্ষয়াত্মক অরূপাখ্য চিত্তনাশ-অবস্থায়

কোন দৃশ্যই থাকে না ; তাহাতে গুণ বা অগুণ কিছুই নাই এবং শ্রী বা অশ্রী কিছুই থাকিবার নহে। না চাঞ্চল্য, না উদয়, না অস্ত, না হর্ষ, না বিষাদ, না তেজ, না অন্ধকার, না অন্য কিছু, না রাত্রি, না সন্ধ্যাদি, না দিক্, না আকাশ, না অধঃ, না ঊর্দ্ধ, না কোন অনর্থরূপতা, না কোন বাসনা, না কোন ঘটনা, না কোন স্পৃহা, না কোন অনীহা, না রঞ্জনা, না সত্তা, না অসত্তা, কিছুই তাহাতে থাকে না। সে পদ কিছুতেই সুসাধ্য হইবার নহে, সুতরাং যাহাতে তেজ নাই, তিমির নাই, চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-নক্ষত্রাদি নাই, সন্ধ্যা নাই, ধূলি-সম্পর্ক নাই, বা বায়ুর অবকাশ নাই, এ হেন শারদীয় সুনির্ম্মল গগনের সহিতই সে পদ তুলিত হইতে পারে। যাঁহারা বুদ্ধির পারে বা সংসার-ব্যবহারের বাহিরে গমন করিতে পারেন, বায়ুর আস্পদ অন্তরীক্ষের ন্যায় তাঁহাদেরই সেই বিতত পদ নির্দ্দিষ্ট আশ্রয় হয়। সে পদে কোন দুঃখলেশ নাই, রজঃ বা তমোভাবে উহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না, তাহা উন্মেষণাদি ক্রিয়া-বর্জ্জিত হইলেও জড়স্বরূপ হইতে অতীত ও সতত আনন্দময়-রূপেই বিরাজিত। এই স্বচ্ছ আকাশই যাহাদের দেহ, তাদৃশ বিদেহমুক্ত মহাপুরুষগণ সেই পদে চিত্ত-বিরহিত হইয়া বাস করিয়া থাকেন।

নবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯০ ॥

একনবতিতম সর্গ।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! এই সুবৃহৎ জগৎ একটা বৃহৎ বনের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড অর্থাৎ চতুর্দ্দশ ভুবন এ বনের নানা জাতীয় বৃক্ষের স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐ সকল বৃক্ষ পরমাকাশ-কোশস্থ অব্যাকৃত পর্ব্বতে সমুৎপন্ন ও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। শত শত তারকাস্তবক এই বৃক্ষশ্রেণীর কুসুমরাশির ন্যায় প্রস্ফুটিত ; সুর, অসুর ও নরগণ অত্রত্য বিহঙ্গমকুল। এই সকল বৃক্ষের শাখাপ্রান্তগুলি বিদ্যুৎরূপিণী মঞ্জরীপুঞ্জে পরিশোভিত এবং নীল নীরদখণ্ডগুলি বনবৃক্ষ-রাজির নানা বর্ণযুক্ত পল্লবদলের ন্যায় প্রতীত। সকল ঋতুতে সমান

রমণীয় চন্দ্র-সূর্য্যাদি উহার পুষ্পরাশি; এই জগৎ-কানন ঐ সকল পুষ্প দ্বারা যেন দন্ত বিকাশ করিয়া হাস্য করিতেছে। সপ্তসাগর এই জগৎ-কাননের মধ্যগত সপ্তবাপিকা এবং শত শত নদী ইহার মধ্য দিয়া প্রবাহিতা। চতুর্দ্দশবিধ অনন্ত ভূতপরম্পরা এই জগৎকাননের আশ্রয়ে জীবিত রহিয়াছে। হে ব্রহ্মন্! এ কাননে বাসনাজালের বিস্তারে অতি বিস্তৃতা সংসারলতা প্রকাশ পাইতেছে। জরা ও মরণ ইহার গ্রন্থি হইয়া রহিয়াছে। সুখ ও দুঃখ উহার ফল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অনবরত মোহরূপ জলাঞ্জলির সেক পাইয়া উহার মূলাবয়ব পুষ্ট ও স্থূল হইয়াছে। হে বক্তৃবর! এখন আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, এই সংসারলতার বীজ কি ও কিরূপ? আবার সেই বীজের বীজই বা কোথা হইতে জন্মিল? অপিচ সেই বীজেরই বা বীজ কি প্রকার এবং সেই বীজেরই বা আবার উপাদান কীদৃশ? আমার বোধবৃদ্ধি ও জ্ঞান ফল সিদ্ধি নিমিত্ত ঐ বীজ-পরাসম্বন্ধীয় প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর সংক্ষেপতঃ প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—হে রাঘব! এই যে পাঞ্চভৌতিক দেহ, ইহাকেই ঐ সংসারলতার বীজ বলিয়া বিদিত হইবে। ইহার অভ্যন্তরে যে লিঙ্গ-দেহ আছে, তাহাতে শুভ ও অশুভ কর্ম্মাঙ্কুর বিদ্যমান রহিয়াছে। যেমন শরৎকাল উপস্থিত হইলে এই বসুন্ধরা শাখা-পল্লব ও ফল-কুসুমাদিশালী বিবিধ বৃক্ষলতায় সমৃদ্ধ হইয়া উঠে, তেমনি এই সংসার-লতাও কথিত প্রকারে ফল-কুসুমাদিময়ী হইয়া ক্রমশঃ স্ফীত হইয়া থাকে। এক্ষণে কথা এই যে, ঐ শরীরের বীজ কে? তদুত্তরে বলা যায়, ঐ শরীরের বীজ আশাপথানুবর্ত্তী চিত্ত। এই চিত্তই দুঃখের আধার হইয়া সৎ ও অসৎ অবস্থারূপ আবরণে আবৃত হইয়াছে এবং এই চিত্ত হইতেই সৎ ও অসৎস্বরূপ ভূত, ভাবী ও বর্ত্তমান দেহসমষ্টি স্বপ্নাবস্থার ন্যায় অনুভব-গোচর হয়। যেমন মুমূর্ষু ব্যক্তি স্বীয় কল্পনাবলে সোপান ও বাতায়ন-বিমণ্ডিত বিচিত্র গন্ধর্ব্বনগর দর্শন করে, তেমনি এই যে সাকার দেহ, ইহা চিত্ত-সান্নিধ্য হইতেই উৎপন্ন দেখা যায়।

রামচন্দ্র! এই যে কিছু পরিদৃশ্যমান জাগতিক ভাব আছে, এ সকল চিত্তের রূপান্তর মাত্র; এ রূপান্তর মৃত্তিকার বিকার

ঘটাদির সহিতই উপমিত। জীবন-লতায় বিজড়িত চিত্ত-পাদপের দুইটী উপাদান বীজ; তন্মধ্যে একটী প্রাণপরিস্পন্দ এবং অপরটী দৃঢ় বাসনা। প্রাণবায়ু যৎকালে দেহস্থ নাড়ীস্পর্শের উপক্রমে স্পন্দিত হইয়া উঠে, তখনই সত্বর জ্ঞানময় চিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন অসংখ্য নাড়ীপথের অভ্যন্তরে প্রাণপরিস্পন্দ থাকে না, তখনই বাহ্য সংস্কারের অনুদ্রেক নিবন্ধন অন্তরে চিত্ত প্রাদুর্ভাবেরও অভাব দৃষ্ট হয়। সমস্ত চিন্ময় প্রাণস্পন্দনেই এই জগদাকার সুসম্পন্ন হয়; তাই স্ব-চিত্তস্পন্দনের দৃষ্টান্তে প্রাণস্পন্দন অনুমিত হয় এবং অম্বরে নীলিমাদিবৎ তাহাতেই জগদাভাস আবির্ভূত হইয়া থাকে। এতাবতা ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়া লওয়া হয় যে, সূত্রাত্মসংজ্ঞক প্রাণ যদি স্পন্দন-ব্যাপারে উপরত হইয়া যায়, তবে তদুপহিত চিৎও নির্ব্ব্যাপার বা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকে; সুতরাং তাহাই শান্তি এবং তাহাই প্রলয় ও মোক্ষ আখ্যায় অভিহিত। করাহত কন্দুকের ন্যায় যদি প্রাণের স্পন্দন হয়, তাহা হইলে সম্বিৎ তিরোহিত হইয়া যায়, এবং ঐ সম্বিৎ যদি প্রাণস্পন্দনে প্রবোধিত হইয়া পড়ে, তবেই দেহাভ্যন্তরে প্রস্ফুরিত হইতে থাকে। যেমন বায়ুর সহায়তায় সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম গন্ধ অনুভূতিগোচর হয়, তেমনি এই সর্ব্বগত সূক্ষ্মতম সম্বিৎও প্রাণস্পন্দ-যোগে প্রবোধিত হইয়া থাকে। যথায় প্রাণস্পন্দ নাই, তথায় সম্বিৎ অব্যক্ত, আর যেখানে প্রাণস্পন্দ বিদ্যমান, তথায় সম্বিৎ সুব্যক্ত। হে রাঘব! জানিবে,—উল্লিখিত সম্বিৎ যদি চিত্তাকারে সমুদিত না হয়, তাহা হইলেই শ্রেয়োলাভ ঘটে। কাজেই বলা যায়, সম্বিৎ চিত্তাকারে সমুদিত হইবার পক্ষে যে কারণ আছে, তাহাকে নিরুদ্ধ করিতে পারিলে, সম্বিদের চিত্তাকারে পর্য্যবসিত হওয়া নিরুদ্ধ হইতে পারে। সম্বিদের নিরোধঘটনার ফল এই দাঁড়ায় যে, সম্বিৎ প্রকাশ পাইবা মাত্র বাহ্য বিষয়ের দিকে সাগ্রহে ধাবিত হয় এবং উহা বিষয়ে প্রবিষ্ট হইবামাত্র অনন্ত দুঃখ উদ্ভূত হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ সম্বিৎ যখন বাহ্য ব্যাপারে সুষুপ্তের ন্যায় থাকিয়া আত্মবোধ প্রাপ্ত হইবার জন্য উদ্যত হয়, তখন সেই লব্ধব্য বিমল ব্রহ্ম-পদ লাভ করা যায়। তাই বলিতেছি, রাম! তুমি যদি প্রাণস্পন্দ নিরুদ্ধ করিয়া বাসনাজাল অপসারিত করত সম্বিৎ-সম্বন্ধ নষ্ট করিতে পার,

তাহা হইলে তোমার অজর অমর মুক্তি-পদ লাভ অনিবার্য্য হইবে। সম্বিদের স্ফীততাকেই তুমি চিত্ত বলিয়া বিদিত হইবে। জানিবে,—তাহাতেই এই অনর্থবহুল জীর্ণ জীবসঙ্কুল দৃশ্য বিশ্ব ব্যাপৃত রহিয়াছে। যোগিগণ চিত্তের শান্তি বিধানের জন্য প্রাণায়াম, ধ্যান ও যুক্তিসঙ্গত অভ্যাসাদি বিবিধ উপায় দ্বারা প্রাণকে নিরুদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। কেন না, তাঁহারা মনে করেন, এই প্রাণ নিরোধই চিত্ত-প্রশমনের কারণ, ইহাই পরম সাম্যের নিদান এবং ইহাই সম্বিদের স্বরূপ-স্থাপক।

রামচন্দ্র! জ্ঞানিগণ যাহা উপদেশ দিয়া থাকেন, এবং নিজেরাও অন্তরে যাহা অনুভব করেন, অধুনা সেই বাসনার মূলীভূত অন্য এক প্রকার চিত্তোৎপত্তির কথা কহিতেছি, শ্রবণ কর। যাহা প্রাক্তনা দৃঢ় ভাবনা, তাহারই নাম বাসনা; ফল কথা, 'আমি' 'আমার' ইত্যাদিরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব সুদৃঢ় সংস্কার যে পূর্ব্বাপর বিচারবিহীন হইয়া দেহাদি পদার্থাকারে পরিণত হয়, এই পরিণতিই বাসনা নামে নিরূপিত। এইরূপ বাসনার বিকাশ হইলে পুরুষ যাহাই দেখে, সদ্বস্তু-জ্ঞানে তৎসমুদায়ে মুগ্ধ হইয়া পড়ে; বাসনার তীব্র বেগে স্বরূপ পদার্থ পরিত্যাগ করে এবং মদ-মত্তবৎ অসাধুদর্শী হয়,—হইয়া সমস্তই অসাধু দর্শন করে। ঐ আন্তরিক বাসনা বিষের ন্যায় অনিষ্টকরী; উহার বশতাপন্ন হইলে অসদ্‌জ্ঞান আশ্রয় করিতে হয়,—হইয়া বিবিধ বেদনায় বিদলিত হইতে হয়। হে রাঘব! তত্ত্ব জ্ঞানের অভাব, যাহা অনাত্ম বস্তু, তাহাতে আত্মজ্ঞান ও বস্তুতে অবস্তু বোধ, এ সকলই চিত্ত নামে নিরূপিত। অনবরত অভ্যাসের বশে বাসনার দৃঢ়তা উৎপন্ন হইলেই জনন-মরণাদির মূলীভূত নিতান্ত চঞ্চল চিত্ত প্রাদুর্ভূত হয়। যখন দেখিবে যে, কি হেয়, কি উপাদেয়, কিছুই বাসনার বিষয় হয় না, সকলই পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিত হয়, তখনই আর চিত্তাবির্ভাব হয় না। অর্থাৎ বিজ্ঞগণের মতে বাসনার বিনাশ হইলেই চিৎস্বরূপে অবস্থিত হয়, এবং চিতের যে, স্বস্বরূপে অবস্থান, তাহাই মুক্তির লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। তাই বলা যায়, যখন কোনও কিছুর বাসনা থাকে না, তখন বুঝিবে চিত্ত আর জন্মিতেছে না। এইরূপ যখন দেখিতে পাইবে, বাসনা বিনষ্ট হওয়ায় মন আর কোন কিছুরই মনন করিতেছে না, সে বাহ্য ভাবে অস্পৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে,

তখন বুঝিবে,—পরম শান্তিদায়িনী মননশূন্যতা বা অমনস্ক-দশা প্রকটিত হইয়াছে। অম্বরে অভ্রের ন্যায় যখন দেখিবে, সম্বিত্তি নির্ম্মল রহিয়াছে, তাহাতে কোন কিছু স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না, আকাশে পদ্ম-বিকাশের ন্যায় তখনই বুঝিবে, অন্তরে চিত্তের প্রাদুর্ভাব নাই। যখন এই জাগতিক পদার্থে কোন ভাবেরই ভাবনা থাকে না, তখন শূন্য হৃদাকাশে কিরূপে বল—চিত্তের প্রাদুর্ভাব হইবে ?

হে রাম! আমার বিবেচনায় অন্তরে অনুরাগ সহকারে যে পদার্থ পরিভাবনা, তাহারই নাম চিত্ত। এই দৃশ্য বিশ্ব সমস্তই নশ্বর; এতন্মধ্যে কল্পনাযোগ্য কিছুই নাই। অন্তর যখন এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকাশকোশের ন্যায় স্বচ্ছ হইয়া উঠে, তখন কোথায় কোন্ আধারে চিত্তপ্রাদুর্ভাব হইবে ? যৎকালে নিরোধ-যোগের অবলম্বনে বাহ্যার্থের বিস্মরণ ঘটে এবং মাত্র পরমার্থই দর্শনপথে আবির্ভূত হইতে থাকে, তাৎকালিক সেই ভাবই আমাদের বিবেচনায় অচিত্ততা বা চিত্তনাশ। কথা হইতে পারে, জীবন্মুক্তদিগের চিত্তের বৃত্তি সত্ত্বেও কিরূপে তাঁহাদের অচিত্ততা হইতে পারে ? এ পক্ষে বলা যায়, যদিও জীবন্মুক্ত মহাত্মাদিগের চিত্তে বৃত্তির উদ্রেক থাকে বটে; কিন্তু থাকিলেও তাহা দগ্ধপ্রায় হইয়া রহে। যেমন দগ্ধ বস্ত্র বস্ত্রনামের যোগ্য নয়, কেন না, তাহা দ্বারা বস্ত্রের কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তেমনি যে চিত্ত জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়, তাহাকে চিত্ত বলা চলে না। যাহার বিষয়ানুরাগ নাই, তাহার চিত্ত অচিত্ত বলিয়াই গণ্য এবং সেই চিত্ত সত্ত্বসংজ্ঞায় নির্দ্দিষ্ট। যেমন কুম্ভকার তাহার চক্রচালক দণ্ড উত্তোলন করিয়া লইলেও পূর্ব্ব বেগের অনুবৃত্তিবশে তদীয় চক্র কিয়ৎ-কাল ভ্রমণ করিতে থাকে, তেমনি পুনরুৎপত্তি-বিধায়িনী বাসনার বিনাশ ঘটিলেও প্রারব্ধ কর্ম্মের বেগানুসারে জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণের দেহাদি কিঞ্চিৎ-কাল অবস্থান করে। যাঁহাদের বাসনায় রাগ নাই, ভ্রষ্ট বীজের তুলনায় যে বাসনা জননশক্তি-হীন; এ সংসারে তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়। এই জীবন্মুক্তগণ জ্ঞানপারদর্শী, চিত্ত-বিরহিত এবং দেহান্তে আকাশ-সদৃশ।

হে রাঘব! পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চিত্ততরুর দুইটী বীজ; এক

প্রাণস্পন্দ, অপর বাসনা। এই দুই বীজের মধ্যে যদি কোন একটী বীজ বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে অপর বীজটীও বিনষ্ট হইয়া যায়। ইহার কারণ এই যে, চিত্তজন্মের প্রতি এই দুইটীই যুক্ত কারণ। যেমন জলাশয়ের জল ঘটমধ্যে পূরণ করিতে হইলে জলাশয় ও ঘট এই উভয়ই মিলিত কারণ বলিয়া গণ্য হয়, চিত্তের জন্মব্যাপারেও তেমনি ঐ দুইটীই মিলিত কারণ হইয়া থাকে। যে বাসনা সবলে পুনর্জ্জন্ম আনয়ন করে, তাহা যতদিনে না জ্ঞানানলে দগ্ধ হয়, ততদিন বীজাঙ্কুরবৎ দেহাদিজন্মের কারণতা প্রাপ্ত হইতে থাকে; কিন্তু যখন ঐ বাসনা জ্ঞানানলে দগ্ধ হইয়া যায়, তখন আর তাহা জন্মাদি ঘটনার কারণ হইতে পারে না। বাসনা ও প্রাণস্পন্দ এই উভয়ই তিল ও তৈলের ন্যায় পরস্পর মিশ্রিতভাবে সংস্থিত এবং ঐ উভয়ই মিলিত ভাবে চিত্তোৎপত্তির কারণ। তৈল যেমন তিলের অন্তঃস্থিত, প্রাণস্পন্দ ও বাসনাও তেমনি পরস্পর পরস্পরের অন্তঃস্থিত। বীজ যেমন কালাপেক্ষায় অঙ্কুরোৎপাদনের কারণ হয়, প্রাণস্পন্দ ও বাসনাও তেমনি পরস্পর পরস্পরের কালাপেক্ষায় কারণ হইয়া থাকে। উল্লিখিত কারণতার ক্রমপর্য্যায় এই যে, অগ্রে প্রাণ, পশ্চাৎ ইন্দ্রিয়, তৎপরে তৎপ্রযুক্ত আনন্দ, এই সমুদায় সম্মিলিতভাবে চিত্তজন্মের কারণ; এতদ্ভিন্ন সম্বিদাত্মক চিত্তও সকলের উৎপাদক। ইহাদের মধ্যে জীবনাত্মক প্রাণস্পন্দ ও বিষয়ানন্দ, ইহারা উভয় যখন বাসনাকারে পরিণত হয়, তখনই চিত্তাবির্ভাব ঘটে; সুতরাং পুষ্প ও গন্ধ এবং তিল ও তৈলের ন্যায় প্রাণস্পন্দ ও বাসনা পরস্পর জন্য-জনক-রূপে ব্যবস্থিত। পূর্ব্ব সংস্কার-বলে প্রাণস্পন্দ হয়, অনন্তর তাহারই বলে বাসনার আবির্ভাব ঘটে। আবার তাহারই বলে প্রাণস্পন্দ হয়, এইরূপ ক্রমেই উক্ত উভয়ের কার্য্য-কারণ-ভাব সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। বাসনা সম্বিৎকে সংক্ষুব্ধ করিয়া তোলে, এই জন্যই প্রাণের স্পন্দন হয়, এবং তাহাতেই চিত্তাবির্ভাব ঘটে। প্রাণবায়ু স্পন্দনশীল; তাই সে হৃদয়গত রাগাদি বাসনাসমূহকে স্পর্শ না করিয়া স্পন্দিত হয় না। চিত্তরূপ বালক সম্বিৎকে বোধিত করিয়াই উৎপন্ন হয়। এই সকল কারণে বলিতে হয় যে, উক্ত উভয়ই চিত্তোৎপত্তির মিলিত কারণ। হে রাম। ঐ উভয়ের

মধ্যে একের নাশ হইলে অপরের নাশ অবশ্যই ঘটে এবং উভয়েরই নাশ-ঘটনায় তৎকার্য্য-ভূত চিত্তের নাশও নিশ্চিতই হয়।

হে রাঘব! চিত্তকে বৃক্ষ-রূপকেও বর্ণন করা যায়। সুখ ও দুঃখ-সঙ্কুল মন্ ঐ চিত্তবৃক্ষের স্পন্দন; কলেবর উহার বৃহৎ ফল এবং চেষ্টা উহার লতা, সে লতায় উহা সদাই বিজড়িত। কার্য্যস্বরূপ পল্লবদলে ঐ চিত্ত-বৃক্ষ সদাই সুশোভিত। তৃষ্ণারূপিণী কৃষ্ণ-ভুজগী উহাকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। রাগ ও রোগাদিরূপ বকের উহা আবাসভূমি, অজ্ঞান উহার সুদৃঢ় মূল এবং ইন্দ্রিয়রূপ বিহঙ্গমগণ উহাতে বিলীন। এবম্বিধ চিত্ত-বৃক্ষের ক্ষয় করিতে হইলে অগ্রে বাসনার ক্ষয়সাধন করিতে হয়। বাসনা-ক্ষয়ে ক্ষণমধ্যে চিত্তবৃক্ষ ক্ষয় পাইয়া যায়; প্রচণ্ড বায়ু যেমন কালপক্ক ফলকে বৃক্ষ হইতে পাতিত করে এবং পবন স্পন্দনহীন হইলে তদুৎক্ষিপ্ত নিখিল দৃষ্টি-প্রতিবন্ধক ধূলিজাল যেমন বিলয় প্রাপ্ত হয়, তেমনি প্রাণ-স্পন্দনের নিরোধ-ঘটনাতেই চিত্ত বিলীন হইয়া যায়। রামচন্দ্র! বাসনা ও প্রাণস্পন্দন এ উভয়ের আবার বীজ আছে; সে বীজ—সম্বেদ্য নামে নিরূ-পিত। কেন না, বাসনা ও প্রাণস্পন্দ এই উভয় অন্তরে প্রিয়াপ্রিয় শব্দাদি স্মরণ-পূর্ব্বক সর্ব্বত্র বিলসিত হইয়া থাকে। সম্বেদ্যই যখন প্রাণস্পন্দ ও বাসনার বীজস্বরূপে নির্দ্দিষ্ট, তখন মূলোচ্ছেদে যেমন বৃক্ষ বিনষ্ট হয়, তেমনি সম্বেদ্য পরিহার করিলেই সত্বর ঐ উভয়ই যুগপৎ বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া যায়। হে রাঘব! সম্বিদ্‌কেই সম্বেদ্য বলিয়া বিদিত হইবে; উহাকে পৃথক্ বলিয়া তুমি জানিও না। কেন না, সম্বিদই আপনার ধীরত্ব স্থিরত্ব পরিহার করিয়া সম্বেদ্যাকারে উপনীত হয়,—হইয়া চিত্তবীজরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিল যেমন তৈলহীন হইতে পারে না, তেমনি সম্বেদ্যও সম্বিদ্-হীন হওয়া সম্ভবপর নহে। কি বাহিরে, কি অন্তরে, সম্বিদ হইতে সম্বেদ্য কুত্রাপি পৃথক্ নহে। স্বপ্নাবস্থায় নিজ মরণ ও দেশান্তরে অবস্থান, ইত্যাদি সম্বেদ্য যেমন স্বচমৎকার মাত্র, জাগ্রদবস্থায় সম্বেদ্যও তেমনি আত্মচমৎ-কারমাত্রে পর্য্যবসিত।

হে রঘুনাথ! বালকের নিকট 'বেতাল আছে' এই ভয় যেমন স্বীয় ভ্রম বশতঃ অনুভূত হয়, তেমনি এই যে জগদ্ব্যাপার, জানিবে—ইহাও নিজ

সঙ্কল্প-জনিত ভ্রম হইতেই প্রসূত হইতেছে। স্থাণুতে যেমন পুরুষ দর্শন ঘটে, রবি কিম্বা শশীর কিরণপুঞ্জ গবাক্ষপথে প্রবিষ্ট হইলে তাহার অবস্থান যেমন দণ্ডাকারে ও রেণুর আকারে পরিদৃষ্ট হয় এবং নৌকারোহী ব্যক্তির চক্ষে যেমন অচলেরও চলন অনুভব হয়, সম্বিদে সম্বেদ্য-বোধও তেমনি হইয়া থাকে। কাজেই বলা যায়, অবিচার অবস্থায় সম্বিদ্ ও সম্বেদ্যে যে ভেদাবভাস প্রথিত হয়, তাহা মিথ্যা জ্ঞান বৈ আর কিছুই নহে। অতএব বিচারক্রমে সম্যক্ জ্ঞান সমুদ্ভূত হইলেই এই মিথ্যাজ্ঞান সম্পূর্ণই নিরস্ত হয়। যেমন সম্যক্ দর্শনে রজ্জুতে ভুজঙ্গত্ব ও আকাশে দ্বি-চন্দ্রত্ব দৃষ্টি তিরোহিত হয়, তেমনি সম্যক্ জ্ঞানোদয়েই অসদ্‌জ্ঞান অপগত হইয়া যায়। এই ত্রিভুবন বিশুদ্ধ সম্বিদেরই রূপ; তদ্ভিন্ন সম্বেদ্য বলিয়া অপর কিছুই নাই। অন্তরে এই প্রকার যে সুদৃঢ় নিশ্চয়, তাহাকেই পণ্ডিতেরা সম্যক্ জ্ঞান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন; সুতরাং পূর্ব্ব-দৃষ্ট হউক বা না হউক, সম্বিদে কোন কিছু ভাসমান হইলেই জ্ঞানী ব্যক্তি অবিলম্বে তাহা মার্জ্জিত করিয়া ফেলিবেন। কেন না, ঐ সকল মার্জ্জিত করিয়া না ফেলিলে এই বিশাল বিশ্বের সহিত আত্মার সম্পর্ক সঙ্ঘটন হয় এবং ঐ সকলের মার্জ্জনেই মোক্ষ-স্বরূপ অনুভূত হইয়া থাকে। নিয়ত যদি সম্বেদ্যই পরিদৃষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহা জনন-মরণাদি অনন্ত দুঃখেরই কারণ হইয়া উঠে। সম্বেদ্যের অদর্শন বা অনুভবই জনন-মরণাদি ধ্বংসের হেতু ও অসীম অনন্ত সুখের কারণ। বলা বাহুল্য, যে জড়—তাহার বেদ্য দর্শন নাই, তাই বলিয়া জড়কে কখনই মুক্ত বলা যায় না। অজড় অথচ বেদ্য-দর্শন নাই, এমন হইলেই মুক্তিপদের অধিকারী বলা যায়, তাই বলিতেছি, হে রঘুনাথ! তুমি বেদ্য দর্শন পরিত্যাগ করিয়া এক রসে পরিপূর্ণ ও পূর্ণানন্দময় হও।

রামচন্দ্র কহিলেন,—ভগবন্! জাড্য এবং সম্বেদন, এতদুভয়ের একতর পরিহার করিলে একতরের পরিশেষ নিশ্চিতই হয়; কিন্তু আপনার কথায় বুঝিলাম, সম্বিত্তি-ত্যাগেই জাড্য নাশ হইবে। সম্বিত্তি না থাকিলে যে জাড্য নাশ, এ ঘটনা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রাম! জীবন্মুক্ত জীব বর্ত্তমান ব্যাপারে অবস্থিত

নহেন। তিনি বাসনা-বিরহিত; কাজেই অতীত বা ভাবী বিষয়ে তাঁহার আস্থা থাকে না। কোন বেদ্যই তদীয় জ্ঞানগোচর নহে, তাই তিনি অসম্বিৎ এবং স্বপ্রকাশ চিন্ময় বলিয়া তিনি অজড়। সত্য জ্ঞানে চিত্তের যে বাহ্যার্থ অবলম্বন, তাহার নাম সম্বিৎ; এই সম্বিৎ যে জ্ঞানীয় নাই, তিনি অসম্বিৎ। অসম্বিৎ জ্ঞানী অনন্ত কার্য্যে ব্যাপৃত রহিলেও অজড়। যাঁহার বুদ্ধি সম্বেদ্য সহ কিঞ্চিৎমাত্রও লিপ্ত নহে, তিনি অজড়, অসম্বিৎ ও জীবন্মুক্ত নামে কীর্ত্তিত। জীব যখন আপনা হইতেই বাসনা-বিরহিত হইয়া কিঞ্চিন্মাত্রও ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবে না, শিশু বা মূকজনবৎ স্থিরভাবেই অবস্থিত হয়, তখনই তাঁহার জাড্য হইতে নির্ম্মুক্তি ঘটে। এই বিশাল বেদনের আশ্রয় লইয়াও তাহাতে তাহাকে লিপ্ত হইতে হয় না। তিনি সর্ব্ববিধ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া নির্ব্বিকল্প সমাধির আশ্রয় গ্রহণ করেন। আকাশের নির্ম্মলতার অনুপাতে তদীয় নীলিমার যেমন বৃদ্ধি হয়, তেমনি তাঁহার চিত্তবৈমল্যের অনুপাতে আনন্দ বৃদ্ধি হয় বলিয়া তিনি অবশেষে আনন্দময়রূপেই পর্য্যবসিত হন। সত্য বটে, সমাধি সময়ে ব্রহ্মস্বারপ্য-রূপ সম্বেদন অবশ্যই হয়; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সম্বিদ-বিরহিত যোগিগণ তৎকালে তন্ময়ভাবেই অনাদি অসীম ব্রহ্মস্বরূপে বিলীন হইয়া থাকেন। এই জন্য তাঁহাদের পৃথক্ সম্বেদন সম্ভবে না। তথাবিধ জন—গমন করুন, অবস্থান করুন, আঘ্রাণ লউন বা স্পর্শাদি বাহ্য বিষয়-কার্য্যই করুন; এই সকল করিলেও অজড় ও অসম্বেদন হইয়া পূর্ণানন্দময়রূপে সুখী হইয়া থাকেন।

হে গুণাকর! তুমি প্রাণায়ামাদি কঠোর উপায় অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত দৃষ্টির সঙ্কোচ করিয়া লও এবং দুঃখমহোদধির পরপারে প্রয়াণ কর। ক্ষুদ্র বীজ হইতে বিশাল বৃক্ষ প্রাদুর্ভূত হয়,—হইয়া কালে যেমন নিখিল আকাশপ্রদেশকে ব্যাপিয়া বিরাজ করিতে থাকে, তেমনি আপনার যে ক্ষুদ্র সঙ্কল্প, তাহা হইতেই এই মিথ্যাময় অনন্ত সম্বেদ্য সমুদ্ভূত হয়। বারম্বার সঙ্কল্প করিয়া আপনার সঙ্কল্প-জনিত দেহকে সম্বিদ্ যখন লাভ করে, তখনই সে এই জন্ম-পরম্পরার কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। হে রঘুনন্দন! এ সম্বিৎ নিজেই নিজেকে আবির্ভূত করিয়া বারবার মুগ্ধ করে; অনন্তর

নিজেই অন্তরবস্থিত স্বস্বরূপকে অবগত হইয়া কদাচিৎ স্বীয় প্রযত্নে মুক্তাবস্থায় উপনীত করিয়া থাকে। ঐ সম্বিৎ আপনাকে যে ভাবেই ভাবনা করুক না, অচিরাৎ তাহাই আসিয়া উপস্থিত হইয়া থাকে। অতি দীর্ঘ-কাল ধরিয়া চেষ্টা করিলেও সে রাগাদি দোষ পরিহারপূর্ব্বক স্বরূপ-স্থিতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। দেবতা বল, অসুর বল, যক্ষ বল, রাক্ষস বল, কিন্নর বল, নর বল, এ সকলের কেহই পৃথক কিছুই নহে; সমস্তই সেই পরমাত্মার কল্পিত বেশ মাত্র। এক মাত্র পরমাত্মাই স্বীয় বিলাসিনী মায়ার সহিত মিলিত হইয়া এই জগৎনাট্যে নৃত্য করিতেছেন। মায়াবী নট যেমন আপনাকে কখন বদ্ধ ও কখন মুক্তের ন্যায় দেখাইয়া থাকে এবং কোষকার কীট যেমন নিজেই নিজেকে বন্ধন করিয়া ক্রন্দন করে, ও অবশেষে দারুণ যাতনায় কখন যেমন নিজেই কোষবন্ধন ছিন্ন করিয়া মুক্ত হয়, তেমনি সম্বিৎস্বরূপ চিদাত্মাও কখন স্বীয় মায়ায় আবদ্ধ হন,—হইয়া কখন সেই বন্ধন-জনিত দুঃখানুভব করেন, আবার কখন সেই মায়াবন্ধনের ছেদন করিয়া মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ করেন। সম্বিৎকেই এই জগৎজলধির জল বলা যায়। পূর্ব্বাদি দিক্‌চক্রবাল ও শৈলাদি স্থাবর পদার্থনিচয় সকলই সেই সম্বিদের বিলাস। পৃথ্বী বল, স্বর্গ বল, সমীর বল, আকাশ বল, সরিৎ বল, এ সকলই সেই সম্বিৎসলিলের লহরী ব্যতীত আর কিছুই নহে। অধিক বলিয়া কি হইবে? এই সমগ্র জগৎই সম্বিৎ, অন্য কোন কল্পনা নাই, এই প্রকার সম্যক্ জ্ঞান প্রকাশিত হইলে সমস্ত ভেদজ্ঞান নিরস্ত হয় এবং সম্বিদেরই অদ্বয়ত্ব স্থিরীকৃত হইয়া যায়। যখন দেখিবে, সম্বিদ্ কোনও কিছুরই আকাঙ্ক্ষা করে না, কোনও কিছু চাহিয়া লয় না, কোনরূপ কলন বা কল্পন কিছুই করে না, কেবল আপনাতেই আপনি অবস্থান করে, তখনই বুঝিবে—সম্বিদ্ সুবিশুদ্ধ হইয়াছে।

হে রাম! সন্মাত্রকেই এই সম্বিদের বীজ বলা যায়। যেমন তেজ হইতে প্রভার প্রকাশ হয়, তেমনি সন্মাত্র ব্রহ্ম হইতেই সম্বিদের আবির্ভাব ঘটে। ঐ সন্মাত্র বা সত্তার দুইটী রূপ আছে। তন্মধ্যে একটী রূপ নানাকারে বিরাজিত এবং দ্বিতীয় রূপটী এক অদ্বয়ভাবে বিভাত। ঘটত্ব, পটত্ব, তুমিত্ব, আমিত্ব, এই সকল রূপই সত্তার নানাকার এবং বস্তুগত

বিভাগ পরিহার করিয়া জগতের অধিষ্ঠানরূপে যাহা বিরাজিত, তাহাই সত্তার এক রূপ বলিয়া অভিহিত। নিখিল বিশেষ বা ভেদভাব পরিত্যক্ত হইলে যে একরূপ সত্তার পরিশেষ হয়, সেই সত্তাই বস্তুত্ব। বস্তুকল্পে সত্তার নানারূপত্ব অসম্ভব; সুতরাং নানারূপ অবস্তু বা ভ্রান্তি-কল্পিত। সত্তার যে একরূপতা, তাহাই বিমল ও অবিনশ্বর; তাহা কদাচ বিস্মৃতির পথে উপনীত হয় না।

হে রঘুনাথ! তুমি কালসত্তা, কলাসত্ত ও বস্তুসত্তা প্রভৃতির বিভাগ কল্পনা পরিহারপূর্ব্বক একরূপ সত্তায় অবস্থান কর। সত্য বটে, কালসত্তা কল্পনাধীন হইলে উত্তম একরূপ সত্তাতেই পর্য্যবসিত হয়, তথাপি উহার বিভক্ত সত্তাগুলি অবাস্তবী বা মিথ্যা। যাহাতে বিভাগ কল্পনা হয়, তাহা বিভাগানুসারে বিভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে। যাহা ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করে, তাহা কিরূপে পবিত্র হইবে? হে রাম! তুমি সত্তাসামান্য-রূপে নিখিল দিক্ পরিপূর্ণ করিয়া পূর্ণানন্দরূপে বিরাজ করিতে থাক। হে বিজ্ঞবর! সত্তাসামান্য-মাত্রের যে চরম সীমা, তাহাকেই তুমি এ সংসারের প্রতিবিম্ব চিতের বীজ বলিয়া জানিবে। সেই বীজ হইতেই ঐ সমুদায় প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ ঘটসত্তা, পটসত্তা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সত্তা যে এক মূলসত্তায় বিলয় পায়, সেই মূলসত্তাই এই সকল বিশেষ সত্তার বীজরূপে বিরাজমান। সকল সত্তার সীমাগত কল্পনা-কলঙ্ক-বিরহিত সেই বীজীভূত সত্তাই পরম পদ এবং তাহাই অনাদি ও অনন্ত পদ। যথায় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী ইত্যাকার বিভাগ-বিলয়ে সত্তারও বিলয় ঘটে, তথায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তিই পুরুষ-পদ-বাচ্য হয় এবং তাদৃশ পুরুষ পুনরায় কখন দুঃখ-মগ্ন হয় না। এতদ্ব্যতীত অন্য পুরুষ প্রায়শঃ স্ত্রী বলিয়াই গণ্য। হে রাম! ঐ চিৎসত্তাই সকল কারণের কারণ তাহার কারণ; কিছুই বিদ্যমান নাই। তাহাই সমস্ত বস্তুর সার; তদপেক্ষা সার আর কিছুই কোথাও নাই। যেমন তীরগত তরু-গুল্মাদি সরোবরে প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি সেই সুবি-শাল চিন্মুকুরে এই সমস্ত পরিদৃশ্যমান বস্তু প্রতিফলিত হইতেছে। যেমন জিহ্বা হইতেই নিখিল বস্তুর বিবিধ স্বাদ অনুভূত হয়, তেমনি সেই আনন্দার্ণব —চিন্ময় হইতেই এই সমুদায় ভাবপ্রবাহের স্বাদ গ্রহণ হইয়া থাকে।

চিন্ময় বস্তুর সম্পর্ক বশতঃ সমস্ত স্বাদু বস্তুরও যখন স্বাদানুভব হয়, তখন সেই একান্ত স্বচ্ছ চিদম্বরের পদ বা স্বরূপ যে সমস্ত স্বাদুজাতীয় আনন্দময় পদার্থের মধ্যে অত্যধিক আনন্দময় ও প্রিয়তম, তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

রামচন্দ্র! সেই আনন্দ হইতেই এই সংসার-প্রবাহ জন্মিতেছে, তাঁহাতেই রহিয়াছে, তাঁহা হইতেই বৃদ্ধি পাইতেছে, তাঁহাতেই ক্ষয়োন্মুখ হইতেছে এবং বিপরিণাম ক্রমে তাঁহাতেই লয় পাইতেছে। তাহা গুরু হইতেও গুরুতম, লঘু হইতেও লঘুতম, নিখিল স্থূল হইতেও স্থূলতম এবং অণু হইতেও অণুতম। সে পদ দূর হইতেও দূর, সন্নিহিত বস্তু অপেক্ষাও সন্নিহিত, সমস্ত কনিষ্ঠ হইতেও কনিষ্ঠতম এবং যাবতীয় জ্যেষ্ঠ অপেক্ষাও জ্যেষ্ঠতম। তাহাই তেজের তেজ, তমের তমঃ, বস্তুর বস্তু ও দিকেরও দিক্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহা কিছুই নয় অথচ তাহাই কিছু বটে। তাহা অস্তি নহে, অথচ তাহা নাস্তিও নহে। তাহা দৃশ্যও বটে এবং তাহা অদৃশ্যও বটে। তাহা আমি বা আমার কিছুই নহে।

হে রাম! তুমি সর্ব্ববিধ যত্নসহকারে যেরূপে সেই চিন্ময় পূতপদে অবস্থান করিতে পার, সত্বর তাহারই উপায় উদ্ভাবন করিয়া লও। সেই আত্মতত্ত্ব অজর ও অমল, তাহা লাভ করিতে পারিলে চিত্ত উপশান্ত হয়। অধুনা তুমি সেই বিমল ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হইয়াছ; সুতরাং চিরকালের জন্য পুনরাবৃত্তি-রহিত ভবভয়-বর্জ্জিত পরম পদের স্বরূপত্ব তোমার লব্ধ হইয়াছে।

একনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯১ ॥

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মান্যবর! আপনি এই যে সকল সংসার-বীজের কথা কহিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন্ উপায়ের নিবৃত্তিক্রমে সত্বর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! আমি এই সকল দুঃখ-বীজ প্রশমনের নিমিত্ত উত্তরোত্তর যে যে উপায় নির্দ্দেশ করিয়াছি, ক্রমে ক্রমে প্রয়োগ করিলে তাহাদের প্রত্যেক উপায় দ্বারাই সত্বর সেই পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তুমি যদি বাসনারে বিসর্জ্জন দিয়া পৌরুষ প্রযত্ন সহকারে বলপূর্ব্বক চিদাকার-শোধিত অখণ্ড আনন্দময় পদে ক্ষণকালও অচলভাবে চিত্ত স্থাপিত করিতে পার, বলা বাহুল্য, তাহা হইলে এইক্ষণেই তোমার সেই সচ্চিদা-নন্দময় পরম পদ লব্ধ হইতে পারে। পরন্তু হে তত্ত্বজ্ঞ! যদি বা তুমি সত্তা-সামান্য পদে অবস্থিত হও, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিদধিক যত্ন করিলেই সে পদ তোমার অধিগত হইতে পারে। হে অনঘ! যদি তুমি সম্বিৎস্বরূপে ধ্যানপরায়ণ হইতে পার, তাহা হইলে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও কিঞ্চিৎ বিশিষ্ট যত্ন করিলেই সেই সর্ব্বোচ্চ পদ লাভ করিতে পারিবে। এ পক্ষে যে অধিক যত্নের আবশ্যকতা আছে, তাহার কারণ এই যে, কেবল সম্বেদ্য হইতে যে সম্বিদের স্ফুরণ হয়, তাহার ধ্যান অসম্ভব। এই সম্বিদের সম্ভাবনা সর্ব্বদা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। দেখ, যাহা চিন্তা কর, তাহাই সম্বিদ্, যাহা চিন্তা, তাহাও সেই সম্বিদ্। এইরূপে গমন, অবস্থান, বিধান, যাহাই কর—সমস্তই সম্বিৎ; সর্ব্বত্রই সম্বিৎ অবস্থিত। যদি বাসনারে বিসর্জ্জিয়া যত্ন করিতে পার, তাহা হইলে তোমার সর্ব্ববিধ আধিব্যাধি ক্ষণমধ্যেই শিথিল হইতে পারে। আমি পূর্ব্বে যে কিছু উপায় উপদেশ করিয়াছি, তৎসমুদায়ের মধ্যে এই বাসনা-বিসর্জ্জনরূপ উপায় বড়ই কঠিন। ইহা সুমেরুর মূলোৎপাটনের ন্যায় একান্তই অসাধ্য ব্যাপার। যতদিনে না মনের বিলয় ঘটে, সে পর্য্যন্ত বাসনা ক্ষয় অসম্ভব; এ দিকে আবার বাসনা

ক্ষয় না হইলে চিত্তের শান্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাবৎ চিত্তের উপশমই বা কিরূপে হইবে? অথচ যাবৎ না চিত্তোপশম ঘটে, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞান হওয়াও অসম্ভব। যে পর্য্যন্ত বাসনার বিনাশ না হয়, তাবৎ তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবনা কৈ? আবার দেখ, যাবৎ না তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হয়, তাবৎ বাসনাক্ষয় হওয়াও অসম্ভব। অতএব দেখা যায়, তত্ত্বজ্ঞান, মনের নাশ ও বাসনার বিলয়, এই কয়েকটী পরস্পর পরস্পরের কারণত্ব প্রাপ্ত হইয়া দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে; সুতরাং হে রাঘব! বিবেক সহকৃত পৌরুষ যত্ন প্রয়োগ করিয়া ভোগবাসনাকে দূরে পরিহার করিতে হয়,—করিয়া উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞান, মনোনাশ ও বাসনা ক্ষয়, এই তিনটীরই অভ্যাস করিতে হয়। যদি একই সময়ে বারম্বার উহাদিগকে অভ্যাস করিতে অক্ষম হও, তাহা হইলে জানিবে,—শত শত বর্ষ ধরিয়া চেষ্টা করিলেও তোমার ব্রহ্মপদ লাভ হইবার নহে।

হে মহামতে! বাসনার বিনাশ, তত্ত্বজ্ঞান ও চিত্তক্ষয়, এই তিনটী যদি একই সময়ে বহুবার সেবিত হয়, তাহা হইলেই ইষ্ট ফল অর্পণ করে; অন্যথা ইহাদের মধ্যে এক একটীকে আশ্রয় করিয়া যদি অতি দীর্ঘকালও অভ্যাস করিতে থাক, তথাচ দুষ্ট মন্ত্রের ন্যায় কদাচ ইহারা সিদ্ধি প্রদানে সমর্থ নহে। স্বীয় সৈন্যদলকে বহুদিন যাবৎ সামরিক শিক্ষা দানে কৃতবিদ্য করিয়া রাখিলেও কোন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালী ব্যক্তিই যেমন সেই সৈন্যদল হইতে একটী মাত্র সৈন্য লইয়া শত্রুপক্ষের সম্মুখীন হইতে পারেন না, তেমনি কোন সুবোধ সাধকই ঐ তিনটীর মধ্যে মাত্র একটীকে দীর্ঘদিন অভ্যাস করিয়া পরম পদ প্রান্তে উপনীত হইতে পারেন না। তবে যদি কোন ধীমান্ সাধক একই কালে একই উদ্যোগে উক্ত তিনটীকেই আয়ত্ত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে সংসারাব্ধি পার হওয়া সহজ হইয়া উঠে। দৃষ্টান্ত দেখ, বিন্দু বিন্দু জল কোন সামর্থ্যই প্রকাশ করিতে পারে না; কিন্তু একত্র যদি বহু জল মিলিত হয়, তাহা হইলে অদ্রিতটকেও বিদীর্ণ করা সেই জলরাশির পক্ষে অসম্ভব নহে। তাই বলিতেছি, হে তাত! তুমি বাসনার বিলয়, তত্ত্বজ্ঞান ও চিত্তনাশ, এই তিনটীকে একদা একই সঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরিয়া সেবা কর। এই ভাবে সেবা করিলে আর কখনই

তোমাকে সংসারভাবে লিপ্ত হইতে হইবে না। যেমন মৃণালখণ্ড ছেদন করিলে তদন্তর্গত তন্তুও বিচ্ছিন্ন হয়, তেমনি দীর্ঘ দিন ধরিয়া উল্লিখিত উপায়ত্রয় অভ্যস্ত হইলেই অপরাপর সংসারপোষক হৃদয়গ্রন্থি সকলও একেবারেই সমূলে ছিন্ন হইয়া যায়।

রামচন্দ্র! শত শত জন্মের অভ্যাস-নিবন্ধন এই সংসারভাব একান্ত দৃঢ়তা প্রাপ্ত হইয়াছে; কাজেই ঐ চিত্ত-ক্ষয়াদি উপায়ত্রয়ের চিরাভ্যাস ব্যতীত কিছুতেই ইহা ক্ষয় প্রাপ্ত হইবার নহে। তাই বলিতেছি, রাম! তুমি গমন কর, শ্রবণ কর, স্পর্শ কর, ঘ্রাণ লও, অবস্থান কর, জাগরিত থাক বা নিদ্রা যাও, যাহাই যখন কর, সকল অবস্থাতেই পরম শ্রেয়ঃ-প্রাপ্তির নিমিত্ত সতত এই উপায়ত্রয়ের অভ্যাস করিতে থাক। তত্ত্বজ্ঞগণ বলেন;—বাসনা-ত্যাগের ন্যায় প্রাণায়ামও ব্রহ্মলাভের অন্যতম উপায়। সুতরাং উল্লিখিত উপায়ত্রয়ের সহিত এই চতুর্থ উপায় প্রাণায়ামও অভ্যাস করিতে হয়। বাসনা-বিসর্জ্জনের ফলে চিত্ত স্বরূপশূন্য হইয়া পড়ে, আর প্রাণস্পন্দের নিরোধ-ঘটনায় যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই করা যায়। যোগী ব্যক্তি গুরুর উপদেশানুযায়ী উপায় অবলম্বনপূর্ব্বক দীর্ঘকাল যাবৎ প্রাণায়ামাদির অভ্যাস করিতে করিতে স্বস্তিকাদি আসনে উপবেশন ও পরিমিত পান ভোজনাদি করিয়া প্রাণস্পন্দ নিরোধ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন। নিখিল বস্তুরই আদিতে, অন্তে এবং মধ্যে যে সন্মাত্ররূপ, তাহাই প্রকৃত বস্তুস্বরূপ; ঈদৃশ বস্তুস্বরূপ দর্শনে বাসনার বিকাশ থাকে না। কেন না, বস্তুর যদি স্বরূপ-দর্শন বা সম্যক্ জ্ঞান হয়, তাহা হইলে জীব অসঙ্গব্যবহারী ও ভব-ভাবনা-বর্জ্জিত হয় বলিয়া বাসনার অবসান তখনই ঘটিয়া থাকে। জীব তখন দেহের নশ্বরত্ব দর্শন করে বলিয়া তাহার অন্তরে বাসনার বিকাশ হয় না, আর যদি বাসনারূপ বৈভব নষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে চিত্তও তখন কোনক্রমে প্রকটিত হয় না। পবন যদি স্পন্দন-বিহীন হয়, তাহা হইলে আকাশে যেমন ধূলিসম্পর্ক থাকে না, তেমনি প্রাণবায়ুর স্পন্দনাভাবে চিত্তস্পন্দনেরও সম্ভাবনা হয় না। ইহার কারণ দেখ, ধূলি হইতেই যেমন ধূলি প্রকাশ পায়, তেমনি প্রাণস্পন্দ হইতেই চিত্তস্পন্দ প্রকটিত হয়। এই জন্য ধীমান্ ব্যক্তি প্রথমেই প্রাণস্পন্দ জয় করিবার জন্য বিশেষ যত্ন লইবেন।

অথবা যদি প্রাণায়াম না করিয়া একেবারে চিত্ত নিরোধ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে একচিত্তে পুনঃপুন উপবেশন ও যোগ প্রভৃতির অবলম্বন দ্বারা চিত্ত নিরোধ করা যাইতে পারে। এরূপ করিলেও বহুকালে অভীষ্ট পদ লব্ধ হইবে। যেমন অঙ্কুশ না হইলে দুষ্ট দন্তীকে আয়ত্ত করা যায় না, তেমনি ঐ পূর্ব্বোল্লিখিত যুক্তিসন্দর্ভ ব্যতীত চিত্তকে আয়ত্ত করিয়া লওয়া সম্ভব নহে। যাহা হইতে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়, এবম্বিধ শাস্ত্র, সাধুজনের সঙ্গ, বাসনার বিসর্জ্জন এবং প্রাণস্পন্দ-নিরোধ বা প্রাণায়াম, চিত্ত-জয়-ব্যাপারে এই যুক্তিচতুষ্টয়ই প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হইয়াছে। যাহারা এই সকল মনোজ্ঞ যোগ পরিত্যাগ করিয়া সবলে হঠ যোগ দ্বারা চিত্তনিরোধ করিতে চায়, তাহাদের শ্রম বৃথা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ দীপের সাহায্য না লইয়া যাহারা অন্ধকারের নিরাস করিতে চায়, তাহাদের শ্রম কি কখন সার্থক হইতে পারে? যাহারা হঠ-যোগের সাহায্য লইয়া চিত্ত-জয়ের চেষ্টা পায়, তাদৃশ মূঢ়দিগের চেষ্টা মৃণালসূত্র দ্বারা উন্মত্ত গজরাজকে বাঁধিবার চেষ্টারই অনুরূপ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে চারিটী সুগম বা সহজ উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই উপায়চতুষ্টয় পরিত্যাগপূর্ব্বক চিত্ত এবং তৎসন্নিহিত দেহকে যাহারা স্থির করিবার প্রয়াস পায়, পণ্ডিত-গণের মতে তাহাদের সে শ্রম ব্যর্থ বলিয়াই গণ্য হয়। তাহারা একরূপ ক্লেশ হইতে অন্যরূপ ক্লেশে এবং একপ্রকার ভয় হইতে অন্যবিধ ভয়ে পতিত হইয়া থাকে। পাপাত্মা প্রাণীদিগের ন্যায় তাহাদের অন্তরে শান্তি কিছুতেই হয় না। নিয়ত ভীরুস্বভাব মুগ্ধ মৃগপালের ন্যায় তাহারা মাত্র ফল-পল্লব-ভোজনে তৎপর হইয়া পর্ব্বতের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ভ্রমণ করিতে থাকে। ভীরু মৃগাঙ্গনা গ্রামের ভিতরে প্রবেশ করিয়া যেমন কুত্রাপি বিশ্বাস স্থাপন করে না, তেমনি তাদৃশ মূঢ়দিগের কোমল বুদ্ধিও ভীরুতা নিবন্ধন কোন কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারে না। তৃণ যেমন বায়ু-বাহিত হইয়া গিরি-নদীর জলে নিপতিত হইলে স্রোতোবেগে দূর-দূরান্তরে অপবাহিত হয়, তেমনি অজ্ঞলোকেরাও যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও তীর্থ ভ্রমণাদির প্রবাহে পড়িয়া মুগ্ধ মৃগপালের ন্যায় দেশ-দেশান্তরে পরিভ্রমণ করত বৃথাই কাল যাপন করে। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বা রাগাদি শত শত দুঃখে ক্লিষ্ট

হইয়া কদাচিৎ দৈবক্রমে আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া থাকে। কেহ কেহ বা আবার এই প্রকারেও বিদিত হইতে পারে না। তাহারা একবার নরকে ও একবার কর্ম্মভূমিতে, এইরূপে অনবরত এক এক স্থানে যাতায়াত করিতে করিতে পতন ও উৎপতনশীল কন্দুকের ন্যায় ক্রমশঃ মরণাদি-জনিত যাতনা-ভোগই করিতে থাকে। সরসীগত তরঙ্গরাজি যেমন এক স্থান হইতে স্থানান্তরে ও সে স্থান হইতে অন্য কোথাও অনবরত যাতায়াত করে, তাহারাও তেমনি এই কর্ম্মভূমি হইতে একবার নরকে, নরক হইতে স্বর্গে এবং স্বর্গ হইতে আবার এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়া বারম্বার বিপরিবর্ত্তিত হয়।

হে রঘুনায়ক! এই সকল কারণেই তোমায় বলিতেছি, তুমি হঠ-যোগাদিরূপ অগম্যক্ দৃষ্টি ত্যাগ কর,—করিয়া বিশুদ্ধ সম্বিদের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক রাগাদিরে দূরে বিসর্জ্জন করিয়া স্থির হইয়া থাক। জানিও,—যিনি জ্ঞানী, তিনিই সুখী, যিনি জ্ঞানশালী, তিনিই প্রকৃত জীবিত, যিনি জ্ঞানবান্, তিনিই যথার্থ বলবান্। অতএব তোমায় বলি, তুমিও প্রকৃত জ্ঞানবান্ হইয়া বিরাজ কর।

হে মহাত্মন্! যাহাতে সম্বেদ্য নাই, কল্পনা নাই, এ হেন অনুত্তম আদ্য অদ্বিতীয় সম্বিৎপদ আশ্রয় করিয়া তুমি চিত্তকে বাহ্য ব্যাপার হইতে নিবর্ত্তিত করিয়া লও। স্বয়ং কার্য্য করিতে থাক; পরন্তু তাহাতে অনাসক্তি বশতঃ কর্ত্তৃত্বপদে অধিষ্ঠিত না হইয়া জীবন্মুক্ত ব্যক্তির নিখিল গুণ-সম্পদে বিভূষিত হও,—হইয়া স্বীয় হৃদয়-মধ্যেই অবস্থান করিতে থাক।

দ্বিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯২ ॥

ত্রিনবতিতম সর্গ।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—রামচন্দ্র! জীব যদি বারেকের জন্যও বিচার-পরায়ণ হয়, আর সেই বিচারবলে তাহার চিত্ত যদি কিঞ্চিন্মাত্রও নিগৃহীত হয়, তাহা হইলে বলিব,—সে তাহার জন্মের সাফল্য প্রাপ্ত হইয়াছে। বিচার-

তরুর কোমল কণামাত্র বীজও যদি হৃদয়ে স্ফুরিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে নিয়ত অভ্যাসজলের সেক পাইয়া ক্রমশ তাহা অগণিত শাখা প্রশাখাশালী বিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। জলপূর্ণ জলাশয়ে আসিয়া মৎস্যাদি যেমন আশ্রয় লয়, তেমনি শমদমাদি শুদ্ধ গুণরাশি আসিয়া বৈরাগ্যশালী বিচারনিষ্ঠ নরকে আশ্রয় করিয়া থাকে। যিনি প্রাজ্ঞবান্ হইয়াছেন, বিচারবলে আত্মস্বরূপ দর্শন করিয়াছেন, অতি বড় অবিদ্যাবৈভব তাঁহাকে কখনই প্রলোভিত করিতে পারে না। কি বিষয়রাশি, কি মনোবৃত্তি, কি আধিব্যাধি, কোন কিছুতেই সেই তত্ত্বদর্শীকে কখন টলাইতে পারে না। যে বিদ্যুৎপুঞ্জ-পাটলিত পুষ্করাবর্ত্তাদি মেঘবৃন্দ প্রলয়কালীন তীব্র বায়ুবেগে বিঘূর্ণিত হইতে থাকে, কোথায় দেখিয়াছ, বালকেরা তাহাদিগকে স্বীয় মুষ্টিমধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে? কোথাও কি সুন্দর নীলোৎপল মনে করিয়া মুগ্ধ রমণীরা অম্বর-গত চন্দ্রমাকে স্ব স্ব মণিময় পেটিকা মধ্যে বদ্ধ রাখিতে পারে? গণ্ডস্থল হইতে অজস্র মদস্রাব হইতেছে; মদগন্ধ লুব্ধ মধুপকুল চঞ্চল নীলোৎপলবৎ মস্তকে শোভা পাইতেছে, এ হেন মত্ত মাতঙ্গদিগকে কখন কি মুগ্ধ মহিলার নিশ্বাস হইতেও অসার মশক-দল দলিত করিতে পারে? যাহারা স্বীয় শক্তিমত্তায় গজকে নিপাতিত করে, সেই নিহত গজের মস্তক-মুক্তায় যাহাদের নখর-বিবর শোভা পায়, তাদৃশ অতি পরাক্রান্ত পশুরাজকে কি কোথাও কখন ক্ষুদ্রকায় হরিণ-শাবকে নিহত করিতে পারে? যাহাদের বিষম বিষের প্রভাবে মহারণ্যও ভস্মীভূত হয়, দেখিয়াছ কি সেই ক্ষুধার্ত্ত অজগরদিগকে ক্ষুদ্র মণ্ডূকেরা কখন গিলিয়া ফেলিয়াছে? এইরূপ যিনি ধীর,—যিনি জ্ঞাতজ্ঞেয়,—যিনি বিবেক-সম্পন্ন, —যিনি, চতুর্থ-পঞ্চমাদি ভূমিকায় আরূঢ়, তথাবিধ বিক্রমী ব্যক্তিকে কখন কি বিষয়েন্দ্রিয়রূপ দস্যুদল আক্রমণ করিতে পারে? প্রবল বায়ু যেমন কোমল ছিন্ন লতাকে হরণ করিয়া লয়, তেমনি অপরিপক্ব বিচার-বুদ্ধিকেও বিষয়-রিপুগণ অনায়াসে বশীভূত করিয়া ফেলে। পরন্তু রাগাদি-ব্যাপার যতই দুষ্ট হউক, তাহারা পরিপক্ব কণামাত্র বিবেককেও ভঙ্গ করিতে পারে না। বস্তুতঃ কল্পান্ত-কালীন পবনপ্রবাহেও যাহা ধীর স্থিরভাবে অবস্থান করে, তথাবিধ শৈলবর কি কখন

মন্দানিল-বেগে পরিচালিত হইয়া থাকে? যে বিচাররূপ পুষ্পাদ্রুম মূলবন্ধকে গ্রহণ করে নাই বলিয়া অস্থিরভাবে অবস্থিত হয়, চিন্তানিল সহজেই তাহাকে কম্পিত করিয়া তুলে। গতি, অবস্থিতি, জাগরণ বা স্বপন, সকল অবস্থাতেই যাহার চিত্ত না সংস্বরূপের বিচার করিতে থাকে, সে জীবন ধারণ করিলেও শাস্ত্রবাক্য তাহাকে মৃত বলিয়াই নির্দ্দেশ করে। তাই বলি, জ্ঞানযোগে তুমি নিজেই অথবা কোন সদ্গুরুর সহায়তায় 'এ জগৎ কি? আর এই দেহই বা কি? কাহার সহিত ইহার সম্বন্ধ?' ইত্যাদি বিষয় ধীর স্থিরভাবে নিরন্তর চিন্তা করিতে থাক। তুমি চিন্তা বা বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিমির-হর উজ্জ্বল দীপালোকে যেমন বস্তুর আকার সম্পূর্ণ লক্ষিত হয়, তেমনি ভ্রমান্ধকারের অপহারক বিচার-সাহায্যে অবিলম্বে সেই বিমল ব্রহ্মপদ প্রত্যক্ষ হইবে। প্রভাকরের প্রভাপটল-বিস্তারে যেমন অন্ধকারপুঞ্জ বিধ্বস্ত হয়, তেমনি সেই ভাস্বর ব্রহ্মজ্ঞান সমুদিত হইলে নিখিল দুঃখই যুগপৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়া যায়। সূর্য্যোদয়ে ভূতলে যেমন আলোক বিকাশ পায়, তেমনি জ্ঞানোদয় হইবা মাত্রই সেই জ্ঞেয় বস্তু ব্রহ্মতত্ত্ব আপনা হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যে শাস্ত্রের বিচারালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে ব্রহ্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায়, তাহা সেই জ্ঞেয় ব্রহ্মের স্বরূপ হইতে অভিন্নভাবেই দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত বলিয়া নিরূপিত হয়। পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, যে আত্মবিজ্ঞান বিচার হইতে উৎপন্ন হয়, তাহাই প্রকৃত জ্ঞান। দুগ্ধমধ্যে মাধুর্য্যের ন্যায় সেই জ্ঞান মধ্যেই জ্ঞেয়-স্বরূপ বিরাজমান। যেমন মদ্যপায়ী ব্যক্তি সততই মত্ততাময় হয়, তেমনি যাহাতে জ্ঞানালোক বিকাশ পায়, তথাবিধ ব্যক্তি অন্তরে জ্ঞেয়-স্বরূপ ব্রহ্মানন্দের অনুভব সর্ব্বদাই করিতে থাকেন। জ্ঞেয় ব্রহ্ম স্বভাবতই নির্ম্মল; সেইজন্য জ্ঞানোৎপত্তি হইবা মাত্রই তাহা আপনা আপনি নির্ম্মল হইয়া উঠে। সে নৈর্ম্মল্যের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয় না। জ্ঞানী জন পরমানন্দে পরিপ্লুত থাকেন, এইজন্য তিনি অন্য কোন কিছুতেই মগ্ন হন না। তিনি আসঙ্গ-বিহীন, জীবন্মুক্ত ও রাজরাজাধিপের ন্যায় পূর্ণকাম্ হইয়া বিরাজমান। জ্ঞানবান্ জন কোন কিছুতেই অনুরাগ প্রকাশ করেন না। মনোরম বীণা-বেণুর রবে, কামিনীর কমনীয় কণ্ঠ-ঝঙ্কারে, মধু-মদমত্ত মধুকরকুলের মধুর

নিস্বনে, বর্ষার প্রস্ফুট পুষ্পস্তবকে, গুরুগম্ভীর মেঘ নির্ঘোষে,নৃত্যরত নীলকণ্ঠ-কুলের মধুরতর কেকারবে, গর্জ্জনশীল মেঘবৃন্দে, সারসকুলের কলকল-নাদে, বিবিধ বাদ্যোদ্যমের মধুর শব্দে কিম্বা অপরাপর প্রখর মধুর নিস্বনে, কোন কিছুতেই জ্ঞানী জন অনুরক্ত হন না। অনাসক্ত জ্ঞানী ব্যক্তি বাল-কদলীস্তম্ভের মনোজ্ঞ পল্লবোদ্ভাসিত—সুর-গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-রমণীর অঙ্গ-রূপিণী লতায় জড়িত—নন্দন-বন-বিলাসের ভোগ-বাসনাও পোষণ করেন না। হংস যেমন মরুমহীকে স্পর্শ করিতে চাহে না, তেমনি ধীর জ্ঞানী জনও নিজের আয়ত্ত থাকিলেও কদাচিৎ কোন কিছুতেই স্পর্শানুরাগ ধারণ করেন না। যথায় পিণ্ডখর্জ্জুর, কদম্ব, পনস, দ্রাক্ষা, অক্ষোট, বিল্ব, জাম্বীর বা জাতি প্রভৃতি নানাজাতীয় ফল-পুষ্পময় পাদপরাজি বিরাজিত, জ্ঞানী জন তথাবিধ বনপ্রদেশেও বাস করিতে ইচ্ছা করেন না। মদ্য বল, মধু বল, মাধ্বীক বল, বা আসবাদির আকর বল, অথবা দধি, ক্ষীর, ঘৃত, আমীক্ষা বা নবনীত প্রভৃতি অন্যান্য যে কিছু উত্তম খাদ্য বস্তুই বল, জ্ঞানীর আসক্তি কিছুতেই থাকে না। লেহ্য-পেয়াদি ছয় রস কিম্বা ফল-মূল-শাকাদি অন্যান্য ভোজ্য সামগ্রী কিছুতেই তিনি তৃপ্তি বোধ করেন না। নিজের মাংসের আস্বাদ লইতে কাহারই যেমন প্রবৃত্তি হয় না, তাঁহারও তেমনি কোনও বস্তুতে বাসনার উদ্রেক হয় না। তিনি ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু বা রুদ্র প্রভৃতি দেববৃন্দের স্বর্গীয় বাসে বাস করিতে চাহেন না; মেরু, মন্দর, কৈলাস, সহ্য বা দর্দ্দুরাদি পর্ব্বতের মনোরম তটভূমিতে তাঁহার বাস করিবার প্রবৃত্তি হয় না। যাহার ফল সকল চন্দ্রবিম্বের ন্যায়, পল্লবদল কৌশেয়বৎ মৃদু স্নিগ্ধ, তথাবিধ কল্পপাদপের কুঞ্জমধ্যে দিব্য দেহ লাভ করিয়া বাস করাও তিনি প্রীতিকর বলিয়া মনে করেন না। বিবিধ রত্নকাঞ্চন-ময় মণি-মুক্তা-খচিত রম্য ভবনে বাস করিয়া তিনি উর্ব্বশী, মেনকা, রম্ভা বা তিলোত্তমাদি সুরসুন্দরীগণের সহিত পরমানন্দে বিহার করাও অকিঞ্চিৎ-কর জ্ঞান করেন। সেই অসঙ্গ পূর্ণাত্মা জ্ঞানী ব্যক্তি দ্বেষ-পৈশুন্যাদি-বিরহিত হইয়া সকল বিষয়ে—সকল ভাবেই মৌনাবলম্বনপূর্ব্বক বাসনা পরিত্যাগ করেন। জ্ঞানীর প্রীতি—কুন্দ বল, মন্দার বল, কহ্লার বল, কমল বল, উৎপল বল, পুন্নাগ বল, বা কেতকীপ্রভৃতি পুষ্পবৃক্ষ বল,

কোন কিছুতেই নাই, অথবা কদম্ব, জম্বু, চূত, আম্র, কিংশুক কিম্বা অশোক, কিছুতেই তাঁহার অনুরাগ নাই। না জপা, না অতিমুক্ত, না সৌবীর, না বিল্ব, না পাটল, না কোন অন্য লতাজাতীয় তরু, অথবা না চন্দন, না অগুরু, না কর্পূর, না লাক্ষা, না মৃগমদ, না কুঙ্কুম, না লবঙ্গ, না এলা, না কক্কোল, না তগর বা অন্য কোন সুগন্ধি অঙ্গরাগাদি, কোন কিছুতেই জ্ঞানী ব্যক্তি অনুরাগ স্থাপন করেন না। ব্রাহ্মণ যেমন মদ্যপান-জনিত আমোদ অভিলাষ করেন না, তেমনি জ্ঞানী জনও কোন কিছুতেই স্পৃহা রাখেন না। প্রিয় বা অপ্রিয় সকল পদার্থেই তাঁহার সমান বুদ্ধি; তিনি সম-বুদ্ধিতেই সমস্ত উপেক্ষা করেন। সাগরের গুরু গম্ভীর নাদে, ঘন ঘোর প্রতিধ্বানে, দুর্গম পর্ব্বতে কিম্বা সিংহ-গর্জ্জনে, তিনি বিচলিত হইবার নহেন। অরাতিবর্গের সামরিক ভেরী-নাদে, পটহের ঘোর আরাবে কিম্বা সুদৃঢ় ধনুষ্টঙ্কারেও তাঁহার কিছু মাত্র ভীতির সঞ্চার হয় না। মত্ত মাতঙ্গের বৃংহণে, কোনরূপ ভৌতিক ব্যাপারে, কিম্বা রাক্ষস-পিশাচাদির ভীষণ নর্ত্তন-কুর্দ্দনেও তিনি কিছু মাত্র ক্ষুব্ধ হইবার নহেন। জ্ঞানী ধ্যাননিষ্ঠ হইলে কি বজ্রপাতধ্বনি, কি পর্ব্বতাস্ফোটনের ভীষণ নাদ, কি ঐরাবতের গম্ভীর গর্জ্জন, কোন কিছুতেই তদীয় দেহ কিঞ্চিন্মাত্রও চঞ্চল হয় না। অধিক কি, চঞ্চল ক্রকচের ঘর্ষণে, শাণিত খড়্গের আঘাতে কিম্বা ভীষণ অশনি-সম্পাতেও জ্ঞানী ব্যক্তি সমাধি হইতে স্খলিত হন না; তিনি সমাধি-অবস্থায় যে স্বস্বরূপে অবস্থান করিতে থাকেন, তাহার বৈলক্ষণ্য কিছুতেই ঘটে না। জ্ঞানী জন উদ্যানবিহার করুন, তাহাতেও তাঁহার আনন্দ বা খেদানুভূতি নাই, আর তিনি মরুপ্রদেশে থাকুন, তাহাতেও তাঁহার খেদ বা আনন্দানুভব হয় না। তিনি জ্বলদঙ্গারবৎ অসহ্য সন্তাপ-সঙ্কুল বালুকা-ময় মরুপথে ভ্রমণ করুন, কিম্বা পুষ্পময় কোমল নব তৃণাচ্ছন্ন ভূভাগে বিচরণ করুন, অথবা তীক্ষ্ণ ক্ষুরধারায় বা নবোৎপল-শয্যায় শয়ন করুন, কিছুতেই তাঁহার সুখ-দুঃখানুভব নাই। জ্ঞানী জন অত্যুন্নত গিরিশৃঙ্গেই আরোহণ করুন, কিম্বা গভীর কূপের অন্তস্তলেই প্রবেশ করুন, অথবা রবি-কর-তপ্ত পাষাণপ্রতিমায় বা কোমলাঙ্গী বরাঙ্গনায় আলিঙ্গন দান করুন, সর্ব্বত্রই তাঁহার সমজ্ঞান; তাই সম্পদ-বিপদ, প্রিয়-অপ্রিয়, সর্ব্ব ব্যাপারেই

সমান বুদ্ধিতে বিহার করিয়া কখন কোন বিষয়েই তিনি আনন্দ বা বিষাদগ্রস্ত হন না। জ্ঞানী ব্যক্তি চিত্তকে কেবল অন্তরভিমুখী করিয়া নিত্য কাষ্ঠকর্ত্তার ন্যায় অবস্থান করেন। যেখানে প্রতিনিয়ত নারকীদিগকে শূলাদি লৌহযন্ত্র দ্বারা যন্ত্রণা দেওয়া হয়, যথায় পরস্পর কুন্ত-তোমরাদি ভীষণ অস্ত্র শস্ত্র অজস্র বর্ষিত হইয়া থাকে, এ হেন নরকপ্রদেশের সহিত সম্পর্ক ঘটিলেও জ্ঞানী ব্যক্তি না ভীত, না দুঃখিত বা না হতাশাগ্রস্ত, কিছুই হন না। তিনি সমভাবে স্বস্থমনে মৌন হইয়া শৈলবৎ ধীরভাবে অবস্থান করিতে থাকেন। অন্ন—নিতান্ত অপথ্য, অপবিত্র বা বিষাক্ত হউক অথবা গোময়াদি অপরিষ্কৃত বস্তুই হউক, জ্ঞানবান্ ব্যক্তি তৎসমস্ত পথ্য, পবিত্র ও পরিষ্কৃত অন্নাদির ন্যায় ভোজন করিয়া সত্বরই জীর্ণ করিয়া ফেলেন। বিম্বফল সদ্যই বুদ্ধিহর বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং কল্ক—বিষের ন্যায় অনিষ্টকর হইলেও সেই সকল বস্তু এবং জল, ইক্ষু, ক্ষীর, ও অন্যান্য দ্রব্য সামগ্রী, এতৎসমস্তই তিনি অভেদ-জ্ঞানে উদরসাৎ করেন। মদিরা, ক্ষীর, রক্ত, মেদ ও মজ্জাদি অমেধ্য বস্তুর সংসর্গে জ্ঞানীর অস্থি, চর্ম্ম, বা কেশরাশি একান্ত রূক্ষ বা বিবর্ণ হইলেও তিনি তাহাতে ক্রুদ্ধ বা হৃষ্ট কিছুই হন না। বলিতে কি, যদি কেহ তাঁহার জীবন-হননে উদ্যত হয় আর কেহ যদি তাঁহার জীবন-দানে তখন প্রস্তুত হয়, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি সেই শত্রু ও মিত্র-স্থানীয় উভয় ব্যক্তি-কেই একই প্রকার স্নিগ্ধ মধুর দৃষ্টিপাতে আপ্যায়িত করেন। তাঁহার নিকট দেবাদির চিরস্থির শরীর আর মর্ত্ত্যবাসীদিগের একান্ত অস্থির কলেবর, এই উভয়ই সমান বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি প্রিয় কিম্বা অপ্রিয় সমস্ত ভোগ্য বস্তুতেই অভিন্ন দৃষ্টি অর্পণ করিয়া থাকেন। তাই পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জ্ঞানী জনের কোন কিছুতেই আনন্দ বা গ্লানি কিছুই নাই।

রামচন্দ্র! সেই সাধু পুরুষের অন্তরে কোন রাগরঞ্জনা স্থান পায় না, তিনি বিদিতবেদ্য হইয়া অবস্থান করেন; জগৎস্থিতির অনুপাদেয়তা তাঁহার অবধারিত বিষয় হয়। এই সকল কারণেই তিনি সর্ব্ব বিষয়ে আস্থাহীন হইয়া থাকেন এবং তাঁহার ব্যথাবিহীন বুদ্ধিযোগেই তিনি অপর কোন ইন্দ্রিয়কে কদাচ বিষয়াভিমুখে ধাবিত হইতে দেন না। পরন্তু যিনি অতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া আত্মাকে অবগত হইতে অক্ষম; যাঁহার বিশ্রাম

কখন নাই। যিনি সর্ব্বদাই অস্থির-চিত্ত, হরিণ কর্ত্তৃক পল্লবগ্রাসের ন্যায় ইন্দ্রিয়বর্গ মিলিয়া তাঁহাকেই সত্বর গ্রাস করিয়া ফেলে। অজ্ঞ জীব ভবাব্ধি মধ্যে পড়িয়া বাসনা-তরঙ্গে ভাসিয়া বেড়ায়, সে সর্ব্বদাই উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করে, ইন্দ্রিয়রূপ জলজন্তুগণ তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলে। পরন্তু যিনি আপনার বুদ্ধিবলে বিচার করিয়া আপনাতেই বিশ্রান্তি লাভ করেন, তাদৃশ আত্মজ্ঞ ব্যক্তিকে লোভ-মোহাদি বিকল্পজাল কিঞ্চিন্মাত্রও বিচলিত করিতে পারে না। বস্তুতঃ জলরাশি কি কখন পর্ব্বতকে কম্পিত করিতে পারে? যাঁহারা সঙ্কল্পসমূহের সীমান্ত-গত পরমপদে বিশ্রাম লাভ করেন, সেই আত্মস্বরূপতায় উপনীত ব্যক্তিবর্গ সুমেরু-গিরিকেও অতি তুচ্ছ তৃণের ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন; কাজেই বলা যায়, সামান্য সঙ্কল্প তাঁহা-দের কোনই অনিষ্ট আনয়ন করিতে পারে না। জীর্ণ বিস্তৃত জগৎ ও ক্ষুদ্র একগাছি তৃণ, বিষ ও পীযূষ, ক্ষণকাল ও কল্পসহস্র কাল, এই সমুদায় নিত্য বিভিন্ন হইলেও আত্মজ্ঞানী পুরুষেরা একই ভাবে অবলোকন করিয়া থাকেন। অপিচ সেই বিমলপ্রজ্ঞ মহাত্মগণ এই জগৎকে মাত্র সম্বিৎ-স্বরূপ বলিয়াই বিবেচনা করেন, আপনারাও সম্বিন্ময় হইয়া স্ব স্ব অন্তরে জগৎকে স্থাপিত করত যথেচ্ছ বিহার করিতে থাকেন। তাঁহাদের মনোভাব এই যে, এ জগতের যে কিছু বস্তু, তৎসমস্তই একমাত্র সম্বিৎ-স্পন্দন; কাজেই তৎসমুদায়ের 'ইহা হেয়, আর উহা উপাদেয়' এরূপ ভাব কিছুই নাই।

রামচন্দ্র! সকলই সম্বিদ্; সম্বিদ্ব্যতীত অন্য ভ্রম যে কিছু পরিহার কর। দেখ, দেহই যাহার সম্বিন্ময়, সে কি কখন কিছু কামনা করে বা পরিহার করিয়া থাকে? বলা বাহুল্য, অতীত বিষয়ে কাহারও স্পৃহার উদ্রেক হয় না; বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বিষয়েই কেবল স্পৃহা জন্মিয়া থাকে। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট অতীত, বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ সমস্তই তুল্যমূল্য; তাঁহারা অতীতের ন্যায় বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ বিষয়েও নিঃস্পৃহ। কারণ এই যে, তাঁহাদের চক্ষে অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ, সমস্তই সম্বিৎপ্রকাশ। যাহা প্রথমে ছিল না, পরেও থাকিবে না, বর্ত্তমানে সেই বস্তুকে কিয়ৎ কাল দেখিয়া বস্তুর সত্তাবধারণ করিয়া লওয়া সম্বিদেরই ভ্রম।

হে রাঘব! তোমায় বলি, তুমিও এইরূপ বিবেচনা করিয়া সৎ ও অসদ্-বিকল্পময়ী বুদ্ধিকে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অসঙ্গভাবে সম্বিৎস্বরূপে অবস্থানপূর্ব্বক ভবভাবের সীমান্ত ভাগে উপনীত হও। কায়, মন, বাক্য, বুদ্ধি বা কেবল ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কেহ কর্ম্ম করুন বা নাই করুন, তিনি নিঃসঙ্গ হইলেই নির্লিপ্ত। যেমন মনোরথ-রচিত রাজৈশ্বর্য্য নষ্ট হউক বা নাই হউক, তাহাতে যেমন কেহই সুখে বা বা দুঃখে লিপ্ত হয় না, তেমনি অনাসক্ত মনে কর্ম্ম করিলেও জীব তাহাতে লিপ্ত নহে। যোগী ব্যক্তি যদি স্বীয় মতিকে অনাসক্ত রাখেন, তবে স্বশরীর দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম সমাধা করিয়াও সুখে কিম্বা দুঃখে কখন লিপ্ত হন না। অসঙ্গমনা মহাত্মা বাহ্য ব্যবহারে সমস্ত কার্য্য দেখিলেও অন্তরে কিছুই দেখেন না। অন্যত্র অনাসক্ত চিত্ত বলিয়া বালকের দৃষ্টান্তেও ইহা অনুভবগোচর হয়। বাস্তবিকই সেই নিঃসঙ্গমনা জীব দেখিয়াও দেখেন না, শুনিয়াও শুনেন না, স্পর্শ করিলেও করেন না, ঘ্রাণ লইয়াও লন না, নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়াও করেন না; অথবা ইন্দ্রিয়-বর্গের বিষয়ীভূত পদার্থপুঞ্জে পড়িয়াও পড়েন না। এইরূপ দেখিয়াও না দেখার ভাব অতি পামর ব্যক্তিও অনুভব করিয়া থাকে। এতাবতা স্থূল সিদ্ধান্ত এই যে, সঙ্গ সহকারে যে পদার্থ দর্শন হয়, তাহা হইতেই বস্তুর বিকাশ হয় এবং সঙ্গই সংসারের কারণ হইয়া থাকে। সঙ্গই আশা-পাশের মূল এবং সঙ্গই আপৎসমূহের নিদান। এই সঙ্গ পরিহার করিতে পারিলেই এই বর্ত্তমান দেহাদির সহিত সম্বন্ধ ঘুচিয়া যায়, সঙ্গ-ত্যাগেই মুক্তি হয় এবং সঙ্গ-ত্যাগেই পুনরুৎপত্তি নিবৃত্তি পায়। এই জন্যই বলিতেছি, হে অনঘ রামচন্দ্র। তুমিও বস্তুর সঙ্গ ত্যাগ কর,—করিয়া জীবন্মুক্ত হও।

রামচন্দ্র কহিলেন,—হে মহামুনে! আপনি নিখিল সংশয়রূপ নীহার রাশির শারদীয় সমীরণস্বরূপ; সুতরাং সঙ্গ কি, তাহা আমার নিকট সংক্ষেপে ব্যক্ত করুন।

বশিষ্ঠ কহিলেন,—বৎস। ইষ্ট ও অনিষ্ট পদার্থপরম্পরার সংযোগ ও বিয়োগ-সঙ্ঘটনায় হর্ষ ও অনর্থপ্রদা যে মলিন বাসনা, তাহারই নাম সঙ্গ। জীবন্মুক্ত ব্যক্তিবর্গের বাসনা হর্ষ বা অমর্ষাদির উৎপাদিকা নহে; এই জন্য

তাঁহাদের সেই বাসনা শুদ্ধা নামে নিরূপিতা এবং তাহা পুনর্জ্জন্ম-বিনাশের হেতুভূতা। এই বাসনাই অসঙ্গা নামে নির্দ্দিষ্টা। ইহার আশ্রয়ে যে কিছু কার্য্য করা হয়, তৎসমস্ত আর পুনর্ব্বন্ধনের কারণ হয় না। যে সকল মূঢ় লোক জীবন্মুক্ত-পদে সমাসীন নহে, তাহাদের বাসনাই সতত হর্ষে ও অমর্ষে পরিপূর্ণা এবং সেই বাসনাই তাহাদের বন্ধনের কারণ হওয়ায় বন্ধনী নামে নির্ণীতা। এই বন্ধনী বাসনা পুনরুৎপত্তির বিধানকর্ত্রী এই জন্য পণ্ডিতগণ ইহাকে সঙ্গ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকেন। এই বাসনার সহায়তায় যে কিছু কার্য্য করা হয়, সে সকল কেবল বন্ধনেরই কারণ হইয়া উঠে।

হে রাম! তুমি আত্মারই বিকার-জনিত ঈদৃশ বাসনা-সঙ্গকে পরিহার করিয়া যদি অব্যাকুলচিত্তে থাকিতে পার, তবেই নিশ্চয় তোমাকে কার্য্য করিয়াও তাহাতে লিপ্ত হইতে হইবে না। আনন্দই বল, আর বিষাদই বল, যদি তাহার কোন একটারই বশীভূত না হও, তাহা হইলেই নিশ্চয় তোমার রাগ, ভয় ও ক্রোধাদি বিদূরিত হইয়া যাইবে এবং তাহাতেই তুমি সঙ্গহীন হইতে পারিবে।

হে রঘুনায়ক! তুমি যদি দুঃখের আক্রমণে আকুল না হও আর যদি সুখের সমাগমে উৎফুল্ল হইয়া না উঠ, তাহা হইলেই তোমাকে আর আশার দাসত্ব করিতে হইবে না; তখনই তুমি সঙ্গহীন হইতে পারিবে। জগতে যে কিছু ব্যবহার আছে, যে কিছু সুখ-দুঃখ-দশা আছে, তৎসমুদায়ে তুমি বিহার করিয়াও যদি ব্রহ্মস্বরূপ পরম রম্য ভাব পরিহার না কর, তাহা হইলেই তোমার অসঙ্গভাব উপস্থিত হইবে।

রামচন্দ্র! সম্বেদ্য চিত্তেরই স্বভাব; যদি তুমি এইরূপই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যথাপ্রাপ্ত কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, তাহা হইলেও তুমি বুঝিতে পারিবে যে, তোমার অসঙ্গভাব উপস্থিত হইয়াছে। হে অনঘ রাঘব! তুমি অনায়াসে অসঙ্গতারূপ স্থিরা জীবন্মুক্ত-স্থিতি অবলম্বন করিয়া সম, স্বচ্ছ ও বীতরাগ হইয়া থাক। আর্য্যগণ জীবন্মুক্ত পদ প্রাপ্ত হইয়া মৌনী, ইন্দ্রিয়-বিজয়ী মদ, মান, ও মাৎসর্য্য-বিহীন এবং বিজ্বরভাবে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ভোগ ও বিক্ষেপাদির হেতুভূত-প্রচুর সামগ্রী সম্মুখে উপস্থিত

থাকিলেও জীবন্মুক্ত-ব্যক্তিগণ তাহাতে স্পৃহা বা যাচ্ঞা কিছুই করেন না। ঐ সমুদায়ের অপ্রাপ্তি নিবন্ধন কোন দৈন্যও তাঁহাদের হয় না। তাঁহারা স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত স্বাভাবিক ক্রমানুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুই করেন না। আপনার কর্ত্তব্য বলিয়া যে কিছু কার্য্য উপস্থিত হয়, অভিনিবেশপূর্ব্বক ফলাকাঙ্ক্ষাহীন বুদ্ধিযোগে তৎসমুদায় কর্ম্ম ক্রমিক অনুষ্ঠান করিয়া জীবন্মুক্ত জন আপনিই আপন অন্তরে স্বচ্ছন্দে আনন্দানুভব করেন। যেমন ক্ষীরার্ণবের ধবল জলরাশি মন্দর-সংঘর্ষণে সংক্ষোভিত হইলেও স্বীয় সহজ শুক্লতা পরিত্যাগ করে না, তেমনি সেই প্রজ্ঞাবান্ জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সম্মুখে যতই বিপদ্ বা সম্পদ্ উপস্থিত হউক, তথাপি আপনার পূর্ব্বোল্লিখিত শম-দমাদি স্বভাব পরিহার করেন না। তিনি যদি সর্ব্বভূমির অধীশ্বর হন কিম্বা কোনরূপ বিপদজালেও বেষ্টিত হইয়া পড়েন, অথবা ক্ষুদ্র সরীসৃপাদি যোনি প্রাপ্ত হন বা স্বর্গরাজ্যের ইন্দ্রত্ব পদও লাভ করেন, তথাপি কোন কিছুতেই তাঁহার হর্ষ বা বিষাদোদয় নাই। তিনি অস্তোদয়ে একরূপ-সম্পন্ন সুধাকরের ন্যায় সমানভাবেই অবস্থান করেন।

রামচন্দ্র! অগ্রে তুমি ক্রোধ পরিহার কর, ভেদবুদ্ধি বিসর্জ্জন দাও, ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগ করিয়া ব্যবহার-পরায়ণ হও এবং আপনাকে বিশেষরূপে বিচার করিয়া দেখ। এইরূপ বিচারালোচনার ফলে পরিণামে তুমি চরম পরম পুরুষার্থ ব্রহ্মস্বরূপে বিরাজ করিতে পারিবে।

রাম! তুমি বিচারসম্ভূত সমাধির অভ্যুদয়ে নিখিল বাসনাক্ষয় নিবন্ধন বিশুদ্ধ বুদ্ধি-যোগে দুঃখসম্পর্ক-শূন্য নিরতিশয় আনন্দময় ব্রহ্মপদ অবলম্বন কর। এই পদ অবলম্বন করিয়া তুমি আত্মদর্শী হইতে পারিবে এবং তাহা হইলেই আর কখন তোমার জন্মবন্ধন ঘটিবে না।

ত্রিনবতিতম সর্গ সমাপ্ত ॥ ৯৩ ॥

উপশম-প্রকরণ সম্পূর্ণ।